



କାଳକୂଟ ରଚନା ସମଗ୍ର

[ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ]

ସାଗରମୟ ଘୋଷ ସମ୍ପାଦିତ

ମୌସୁମୀ ପ୍ରକାଶନୀ ॥ କଲକାତା-୧

প্রকাশকাল : ১৩৬৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :

গৌতম রায়

আলোকচিত্র : এস. তারকনাথ

প্রকাশক :

দেবকুমার বসু

মৌসুমী প্রকাশনী

১এ কলেজ রো

কলকাতা—৯

মুদ্রক :

সাধনকুমার গুপ্ত

ঔরাধাক্ষ প্রিটিং

২১/বি, রাধানাথ বোল লেন

কলকাতা-৬

সূচীপত্র

অমৃত বিষের পাত্রে (শেবাংশ)—	৯
মিটে নাই তুষণ	— ৫৭
তুষার সিংহের পদতলে	— ১৮৫
মন চল বনে	— ৩০৬
বনের সঙ্গে খেলা	— ৪৩৮



অমৃত বিষের সাধ

[চতুর্থ খণ্ডের পর]

বেলা এগারোটায় হুবহু টেলিফোন করে জানালো, ও কানপুর যাচ্ছে, আজ আর দেখা হচ্ছে না। ভালো কথা, জিজ্ঞাস করলাম, আর কাকে ও আমার অবস্থান এবং ঠিকানা জানিয়েছে। শুনে আকাশ থেকে পড়লো। নানারকম দ্বিবি গুলে বললো, ও আর কারোকে কিছু বলে নি। চশমা পরা মহিলার বর্ণনা শুনে কিছুই মনে করতে পারলো না। ঠাট্টা করে বললো, বেশি মহিলার আগমন হতে থাকলে, ব্যালান্স করার জন্য ওকে আবার কিছু পুস্তক নিয়ে আসতে হবে। আরো বললো, অনীতা সিনহা কী না। তা যেন হল, চশমাধারিণী কে হতে পারে। অনীতা হয়তো এখনো চশমা নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ও দিল্লীতে থাকে না। আমার কথা ওর জানবার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া, অনীতা সিনহা কালো নয়, রীতিমতো করসা।

সারাটা দিন এক ধরনের অস্বস্তিতেই কাটলো। কিন্তু কেউ এল না। ছটা নাগাদ হেনার টেলিফোন এল, ওর মারের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে। ও বেরোতে পারছে না। আমাকে ওদের বাড়ি যাবার জন্য অহরোধ করলো, গাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইলো। এক মুহূর্তের বিধা কাটিয়ে, জানিয়েছি, যাবার অসুবিধা আছে। হয়তো আহত হয়েছে। আমার ইচ্ছা হল না। কাল না এলে টেলিফোন করবে।

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি নামলো। আলো জ্বললো। আজ সেই ময়দানবের ধাতব ঠং ঠং শব্দটা এখনো বাজছে। ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে কনর্ট প্রেসের দিকে না গিয়ে, অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে পথে খনিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। কলকাতার কথা বারে বারে মনে পড়তে লাগলো। আর আমার খেচ্ছা-নির্বাসনের কারণ-গুলো। এক জায়গায় দেখলাম, ফুটপাথের ধারে, কিছু হিপি হিপি বসে আছে। নিয়নের আলোতে গাছের ছায়া পড়েছে, সেই ছায়ায়কারে হাতে হাতে গাঁজার কলকে কিরছে। হু'একজন ভারতীয় হিপিও আছে। একটি মেয়ে একটা রক্তার কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে সেটা হাতে ধরে রেখেছে।

এ কিসের বৈরাগ্য, কী সাধনা বুঝতে পারি না। ভোগের অবসাদ, না অবিবাসের অন্ধকার। অর্থহীনতার শিকার না তো? রঞ্জিতা রিঅ্যুভির কথা মনে পড়ে গেল। জীবন অর্থহীন। একথা কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারি না। জীবনে কী পাওয়া গেল না গেল, সে হিসাব আলাদা। কিন্তু জীবন যে নানা রূপে অর্থহীন, তা অস্বীকার করতে পারি না। যদি তা-ই না হবে, রঞ্জিতাকে দুঃখী বলতে গিয়ে, স্ববন্ধুর মতো ছেলের মুখ কেন গভীর হয়ে ওঠে। রঞ্জিতা নিজেকেই বা রাজপথে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাস পুড়িয়েছিল কেন। যদি ব্যাপারটার মধ্যে সত্য কিছু থেকে থাকে, তবে তা কি অর্থহীন। নাকি ব্যাপক একটা অর্থেরই ইঙ্গিত।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে বসবার আগেই, টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হ্যালো।’

জবাবে দুবার সম্বোধন ভেসে এল, ‘হ্যালো হ্যালো।’ নারীকণ্ঠ। কিন্তু চিনে উঠতে পারলাম না। স্বর যেন একটু ঝংকৃত, টলটলানো। ভুরু কুঁচকে ভাবলাম, মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। অথবা গত রাত্রে চশমাধারিণী? আবার একইভাবে, দ্রুত দুবার জিজ্ঞাস্য স্বরে ভেসে এল, ‘হ্যালো হ্যালো।’

ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে বলছেন?’

জবাবও ইংরেজিতেই এল, ‘কী দুঃখ, আমার গলার স্বর চিনতে পারছেন না?’

প্রশ্নের সঙ্গে একটু হাসির ঝংকার। এই মুহূর্তেই চিনতে পারলাম, কার গলা। উচ্চারণ আর ভঙ্গিতে চিনতে পারলাম। একি কোনো অলৌকিক ব্যাপার নাকি। ঘরে ফেরবার আগেই যেহেতু অর্থহীন আর অর্থহীনতার কথা ভাবছিলাম, সেইজন্যই এই কণ্ঠস্বর ভেসে এল? তা হলে আস্তানার ঠিকানা চাপা থাকেনি। কে জানে হয়তো স্ববন্ধুই বলে দিয়েছে। দিক বা না দিক, ওর সেই চোখ দুটো, হাসি মুখটা আমার মনে পড়লো। বললাম, ‘চিনতে পারছি। ঠিকানা জানলেন কি করে?’

হাসি মেশানো স্বর ভরা গলা শোনা গেল, ‘খুব কঠিন নাকি?’

‘কঠিন না। আপনি জানতেন না তো, তাই বলছি।’

‘কেন, পরশু দিন রাতে যে-রাস্তায় আপনাকে পৌঁছে দিতে গেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম, সেই রাস্তাই আপনার ঠিকানা জানিয়ে দিল। ও রাস্তায় থাকবার তো একটাই হোটেল আছে। আপনি যেখানে আছেন। ঘরের নম্বরটা অবিশিষ্ট আপনার হোটেলের লোকেরাই দিয়েছে। বাই হোক, খুব বিরক্ত করছি নাকি?’

বিরক্ত হইনি, বিব্রত বোধ করছি। বললাম, ‘না।’

‘জানতে পারি, আর কে আছে আপনার ঘরে?’

‘কেউ না।’

‘স্বল্প স্বজাতি, কেউ না?’

‘না।’

এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপরে, ‘যাবো?’

এর পরে আর জিজ্ঞেস করা যায় না, কোথায়। কিন্তু জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখে এল না। আবার শোনা গেল, ‘এখন মাত্র সাড়ে আটটা।’

বললাম, ‘আসুন। কোথা থেকে বলছেন?’

‘বলতে পারেন, দুশো গজ দূর থেকে। এর আগেও একবার ফোন করেছি, নো রেসপন্স হয়েছে। বেরিয়েছিলেন বোধ হয়।’

‘হ্যাঁ।’

‘যাচ্ছি। আমার সঙ্গে একজন থাকবেন, আপত্তি নেই তো?’

আপত্তি? এর পরে আর সে ভাবটা আমার জানা নেই। শুধু বললাম, ‘চলে আসুন।’

কে একজন থাকতে পারে? অ্যান্টনি হতে পারে। অ্যান্টনির ছাঁটা গোক-দাড়িওয়ালা বড় মুখটা চোখের সামনে ভাসছে। তাই সেই বড় বড় আরক্তিম চোখ, যেন এক বিশেষ দৃষ্টিতে রঞ্জিতাকে দেখছিল। অ্যান্টনির কথাগুলো মনে পড়ছে, রঞ্জিতা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিল। তাছাড়া সেইসব কথা, সে রঞ্জিতার পিছু পিছু ঘোরে বা রঞ্জিতাকে দেখলেই তার চিন্তাচঞ্চল্য ঘটে। কথাগুলো নিতান্তই হাসি-ঠাট্টার কী? অ্যান্টনির চোখে যেন অস্ত্র কিছু দেখেছিলাম। হোক সে কেবালের রাজনীতি করা ছেলে, বুকে আগুন সকলেরই জ্বলে। অ্যান্টনির বুকে হয়তো আগুন লেগেছে। রঞ্জিতা বিজ্ঞপ্তি অগ্নিবরী, অনেক বুকেই সে অগ্নিকাণ্ড করতে পারে।

কিন্তু—আমনার দিকে ফিরে তাকালাম, এখানে তো ছাই ছাড়া আর কিছু নেই। পুড়ে গিয়েছি অনেক আগেই। এখানে আর অগ্নিকাণ্ড ঘটবে না। ছাই না, বিব। কালকূট। এখন পিপাসা শুধু অমৃতের। অমৃতের শাস্তি। নিজের দিকে চেয়ে হেসে একটা নিশ্বাস ফেললাম। ফ্রাঙ্ক থেকে জল ঢেলে খেলাম। সিগারেট ধরতে না ধরতেই, দরজায় শব্দ বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলেও গেল, স্বর শোনা গেল, ‘আসছি।’

ফিরে তাকালাম। দরজা পেরিয়ে, আলমারির পাশে রঞ্জিতা বিজ্ঞপ্তি। পাশে

পিছনে কেউ নেই কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত বেশত্বা। এক পলকের জন্য যেন চিনে উঠতেও অসুবিধা হল। দেখলাম, হালকা গোলাপী রঙ জমিতে লাল পাড় শাড়ি, হালকা গোলাপী জামা। কপালে টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথেয় সিঁদুর আঁকা। ঠোঁটে হালকা লালের স্পর্শ, চোখে কাজল। চুল সেদিনের মতোই খোলা। কিন্তু টেনে ছ'পাশে আঁচড়ানো। হাতে সেদিনের সেই ব্যাগটি। তাতে কি অগ্নিশরীর রূপের উগ্রতা কিছু কমেছে। মনে হয় না। তবু অভ্যস্ত চোখে যেন একটা চেনা ছবির মতো লাগছে। এ পোশাকে ওকে দেখবো, ঠিক ভাবিনি। দিল্লীওয়ালী রিজুতি বিবির এও কি একটা বিব্রোহ। বললাম, 'আমুন।'

রঞ্জিতা পিছন ফিরে, ঘাড় নেড়ে কারোকে ডাকলো। এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে। ওর পিছনে দেখলাম, ওরই বয়সী আর একটি মেয়ে। রঙটা একটু কালো। টানা টানা চোখ, চোখে চশমা। চুলে বিহুনি, পরণে চুস্তের ওপরে কোমরে বেন্ট লাগানো অর্ধেক হাভা জ্যাকেট। বুকের কাছে দুটি বোতাম খোলা। হাতে ঘড়ি। রঞ্জিতা পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু, মিস লীলা ভোয়া। গতকাল রাতে ও এসেছিল আমার খোজ করতে, আপনি ঘরে আছেন কী না। আমিই অবিশ্তি পাঠিয়েছিলাম।'

এবার রহস্য উদ্ঘাটন হল। জানা গেল, গত রাতে কোন্ মহিলা আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন। বললাম, 'আপনারা বহুন।'

রঞ্জিতা লীলাকে চেয়ারে বসতে বলে, নিজে খাটে বসলো। লীলাকে বললো, 'ওঁর কথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

লীলা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার কথা কাল শুনেছি, কালই আপনার বইও রঞ্জিতার কাছে থেকে নিয়ে গিয়েছি, পড়তে আরম্ভ করেছি।'

লজ্জিত হেসে বললাম, 'এমন কিছু একটা ব্যাপার না।'

রঞ্জিতা বললো, 'লেখক কি বসবেন না?'

কথা একটু ঝিকানো। তার সঙ্গে ঘাড় এবং চোখও। বললাম, 'বসবো, তার আগে জানতে চাইছি, আপনাদের জন্য কী বলবো, চা, কফি অথবা কোনো ঠাণ্ডা পানীয়?'

রঞ্জিতা বললো, 'ছ' মিনিট ভেবে বলতে চাই। ততক্ষণ আপনি বহুন।'

আমি খাটের এক প্রান্তে বসলাম। অস্বীকার করা যাবে না, রঞ্জিতা এ ঘরের নিয়নের আলোকে নান করেছে। কপালের ফোঁটাটা লাল না হলে বলভাম, ছপুয়ের আকাশে সূর্য জলছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে,

হুয়ার ঝলক নেই। গন্ধও পাচ্ছি না। তার বদলে, হালকা সুগন্ধ, মিশ্রিত গন্ধ। রঞ্জিতা তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলো, ‘বিরক্ত করলাম এসে?’

বললাম, ‘বিরক্ত করবেন কেন?’

‘আপনি তো নিজের থেকে কখনো আসতে বলেননি। স্ববদ্ধ বলেছিল, আপনি কারোর সঙ্গে দেখা লাক্ষ্য করতে চান না। হয়তো সেদিন রাত্রে, আপনাকে আমি পৌঁছে দিলে, আপনার আস্তানাটা আমি জেনে যেতে পারি, সেইজন্যই আমাকেই আপনি বারে বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।’

বললাম, ‘তা কেন। আপনাকে পৌঁছে না দিলে, আমার অবস্থি হত।’

এক মুহূর্ত, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বললো, ‘হয়তো। কিন্তু সেদিন এ রাস্তায় ঢুকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কোথায় আপনি আছেন। আমি এসেছি জানলে, স্ববদ্ধ হয়তো রাগ করবে।’

ঘাড় নেড়ে বললাম, ‘মনে হয় না।’

‘হয়তো খুশিই হবে।’ রঞ্জিতা হেসে উঠল। আবার বললো, ‘ও আমার ভীষণ বন্ধু। ওর কাগজের বন্ধুরা, বা যে-কোনো বন্ধুরাই, আমাকে দু’ চোখে দেখতে পারে না। ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে, সামনে থেকে সরে যায়।’

বলতে বলতে আবার হাসলো, ঠোট বেঁকে গেল। বললো, ‘আমি তাদের চিনি। নিতান্ত করুণার পাত্র।’

বলে হেসে, নিজের কোলের এবং পায়ের দিকে তাকালো। লীলা ভোরা হাসি হাসি মুখে রঞ্জিতার কথা শুনছে। ওকে শব্দে মনে হচ্ছে। এমন একটি রূপসী বন্ধুর মজা কি লীলার ভালো লাগে। লাগে বলেই হয়তো সঙ্গে এনেছে। বিশেষ করে, বন্ধুর হয়ে, কাল রাত্রে আমাকে খোঁজ করতে এসেছিল। রঞ্জিতা আবার জিজ্ঞেস করলো, ‘সত্যি বিরক্ত করছি না তো?’

হেসে বললাম, ‘নিশ্চিন্ত থাকুন।’

রঞ্জিতা খুব জরত দু’বার ঘাড় নেড়ে বললো, ‘তা থাকবে না। কারণ, চিনি তো, চিনতে পেরেছি।’

ও লীলার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি একটু অবাক অবস্থি ভরা চোখে দু’জনের দিকেই দেখলাম। লীলা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। রঞ্জিতা বা হাতের তর্জনী দিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বললো, ‘আপনাকে।’

বললাম, ‘চিনতে না পারায় মতো কিছু নেই।’

রঞ্জিতা পিছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো, ‘অনেক কিছু আছে। জানি,

আমাকে নিশ্চিত থাকতে বলো, আপনি অনায়াসে হাসি মুখে বিরক্তি পুবে রাখবেন। এ রকম হাসি মাথানো ধৈর্যের নিষ্ঠুরতা আপনার আছে।’

‘নিষ্ঠুরতা?’

‘আমি তা-ই বলি। নির্বিকার বলতে পারতাম, সেটাও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। কেননা, আপনি বেশ ভালোই জানেন, এসব আপদকে এভাবেই বিদায় করতে হয়।’

রঞ্জিতা রিজ্জিভি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে বলে এসেছে নাকি। অবাক হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপদ?’

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, রঞ্জিতা এক পলকের জ্ঞান, চোখ বুজলো। আমার চোখে চেয়ে বললো, ‘তবু না এসে পারলাম না।’

দেখলাম, লীলা তার বাজুবীকে দেখছে। বললাম, ‘মিসেস রিজ্জিভি, এ রকম বলবেন না।’

রঞ্জিতা হাত উঠে গালের কাছে ঠেকিয়ে বললো, ‘দয়া করে আমাকে রঞ্জিতা বলবেন। আমি সৌভাগ্য মনে করবো।’ আঙুলের ভঙ্গি করে ভুরু তির্ধক করে বললো, ‘একটু অস্ববিধে করেই।’

কোনো যুক্তিই দাঁড় করাতে দিতে চায় না। হেসে বললাম, ‘চেষ্টা করবো।’

রঞ্জিতা ভুরু তুলে, চোখের কোণে তাকিয়ে বললো, ‘আমিও চেষ্টা করতে পারি, অহুমতি পেলে।’

কতটা কি উচিত হবে, রঞ্জিতা আমাকে নাম ধরে ডাকবে? আমার অস্বস্তি হবে। কিন্তু কথটা বলা যায় কেমন করে। রঞ্জিতা হেসে উঠলো, ঝাঁচল পিছলে পড়লো গা থেকে। ঝাঁচল তুলে নিয়ে বললো, ‘ভয় পাবেন না, আমি জানি, আপনি একজন সম্মানিত লেখক। কিন্তু আমি মনে মনে অনেকটা এগিয়ে আছি কী না। তার থেকে আপনাকে আর একটা নাম দিই, সেই নামে ডাকবো। মিস্টার আর পদবী ধরে ডাকতে আমার ভালো লাগবে না— আপনাকে বিশেষ করে।’

অবাক হেসে বললাম, ‘নাম দেবেন?’

মনে পড়লো, এর আগের দিন বলেছিল, মনে মনে নাকি আমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছে।

‘হ্যাঁ। আপনাকে আমি শ্রাম বলে ডাকবো।’

এমন একটি নাম, কোন অর্থে? বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম। যেটা ওর একটা অভ্যাস বলে মনে হয়। বা হাতের তর্জনী দিয়ে, আমাকে দেখিয়ে বললো, ‘আপনি শ্রামবর্ণ তাই।’

শ্রাম নই, আমি কালো। কিন্তু তাতেই যদি রঞ্জিতার শ্রাম বলে ডাকতে ইচ্ছা করে, ডাকুক। আর ক'দিন ডাকবে। বললাম, 'বেশ, আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাই ডাকবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।' বলে ও লীলার দিকে চেয়ে হাসলো। তারপরে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনভাবে বললো, 'ওহ, দুঃখিত, আমার এই বন্ধুর কোনো পরিচয়ই আপনাকে দিইনি। শুধু নামটাই বলেছি। ও একটা কলেজে পড়ায়। সাহিত্যের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে। আমরা সবাই একসঙ্গে সাপকু ভবনে পড়াশোনা করি।'

লীলা ভোরা একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'এ আবার বলার কী আছে।'

রঞ্জিতা বললো, 'তাহলে লীলা, কী করা যায়?'

দু'জনেই চোখে চোখে তাকিয়ে, কেমন যেন একটা ইশারা করার ভঙ্গিতে হাসলো। লীলা হেসে, দু'হাত মেলে বললো, 'আমি কী বলতে পারি?'

বলে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। রঞ্জিতাও আমার দিকে তাকালো। বললো, 'চা কফি ঠাণ্ডা পানীয়, কিছুই চাই না। আমি হার্ড ড্রিংক পছন্দ করি, তাই ড্রিংক করতে চাই। আপত্তি আছে?'

অর্থাৎ সুরা। আমার আপত্তির কী থাকতে পারে। সেদিন তো দেখেছি, রঞ্জিতার ওটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দাঁড়ান, দেখছি, গত রাতে সুরা একটা বোতল এনেছিল, তাতে এখনো কিছু আছে।'

রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'না না, তার কোনো দরকার নেই। বোতল একটা আমিই সঙ্গে করে এনেছি। আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে।' বলতে বলতে ও ব্যাগ থেকে একটি রাম-এর বোতল বের করলো। বললো, 'আপনার অসুবিধে না হলে কয়েক বোতল কোকাকোলা আনিয়ে দিন।'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'দিচ্ছি।' দরজার বাইরে দেখলাম, সিঁড়ির কাছে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডেকে কোকাকোলা আর গেলাস আনতে বললাম। ঘরে ঢুকে, আলমারি খুলে, সুরার বোতল বের করে টেবিলে রেখে বললাম, 'তবু এটাও আপনাদের সামনে রাখলাম, যদি ইচ্ছা করেন।'

রঞ্জিতা ওর রক্তিম চোঁট বাকিয়ে বললো, 'হুইকি? আমি পছন্দ করি না। রাম বা জিন আমার পছন্দ। কিন্তু এত বড় বোতল, এইটুকু রয়েছে। কে কে খেয়েছে?'

আমি হৃদয়নাথের নাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতা শব্দ করে উঠলো,

‘ওহ্!’ তারপরেই ছুই বাঁহরীতে চোখাচোখি করে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। এতটা হেসে ওঠার কী আছে, বুঝতে পারলাম না। ওদের হাসি শেষ হলে, রঞ্জিতা বললো, ‘সেই গ্রেটম্যানটিও কাল এসেছিলেন? একজন নিখুঁত বাঙালী ব্রাহ্ম!’

‘উনি ব্রাহ্ম নাকি?’

‘হুবহু আপনাকে বলেনি? উনি ভীষণ ব্রাহ্ম। কিন্তু খুব ভালো লোক, থাকে বলে অমায়িক ভদ্রলোক। তবে আমাদের সইতে পারেন না।’

না জানার ভাব করে বললাম, ‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। এক সময়ে আমাদের একটু রেহ করতেন, তারপরে অনেকের মতো, ওঁরও মনে হয়েছে, আমি একটা বাস্তব মেয়ে। যেটা হয়তো আপনার ইতিমধ্যেই মনে হচ্ছে।’

জিজ্ঞাসা না করেও একটা জিজ্ঞাসা জেগে রইলো ওর চোখে। তাকালো আমার দিকে, বাড়ি কাত করে। বললাম, ‘না, আমার সেরকম কিছুই মনে হচ্ছে না।’

আবার সেইরকম দ্রুত বাড়ি নেড়ে, ভুরু ভুলে বলে উঠলো, ‘আপনি তো মিথ্যা কথা বলেন না।’

‘বলি, কিন্তু এখন বলছি না।’

রঞ্জিতা কয়েক পলক আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে ঠোঁট নাড়লো। কী বললো, বুঝতে পারলাম না। মুখ নামিয়ে নিল। একটা নিখাস পড়তে দেখলাম। তারপর একটি অত্যন্ত চেনা গানের স্বর গুনগুনিয়ে উঠলো, ‘তুমি মোর পাও নাই পাও নাই পরিচয়/তুমি যায়ে জানো, সে যে কেহ নয়।’

এই দুটি কলি গুনগুনিয়ে হঠাৎ ধেমে গেল। আমার দিকে চোখ ভুলে দেখে হাসলো। বেয়ারা এল কোকাকোলা আর গেলাস নিয়ে। বেয়ারা রঞ্জিতাকে দেখে যেন হঠাৎ একটু অবাক হল, কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলো। আমার অগ্নি কোনো অতিথির বেলায় এরকম ঘটতে দেখিনি। রঞ্জিতা হেসে বাড়ি নাড়লো। বেয়ারা বোধহয় ‘মেমসাহেবকে’ আগে থেকেই চেনে। কিন্তু সে বাই হোক, এই একটা জায়গায় এসে আমি যেন কেমন ঠেক থেকে যাই, যখন শুনি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গুনগুনিয়ে ওঠে। এ সময়ে ওর ঈষৎ পিকল সিদ্ধ চোখের দিকে আমার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। ‘সেটা কি নিতান্ত আমি বাঙালী বলে। মনে করি না। রঞ্জিতা যে শ্রোতে বহে, গানের সময় হঠাৎ-ই বেন ও আমাদের উজান টানে টেনে নিয়ে যায়। এই গুনগুনিয়ে ওঠা, এমন একটি

রবীন্দ্র লক্ষীত যে ও জানে, যেন বিশ্বাস করতে পারি না। ইচ্ছে করে গাইতে বলি, সাহস পাই না। কেন এই দুটি কলি ও গুনগুন করে, হঠাৎ চোখের দিকে চেয়ে হাসে, তা যেমন বুঝতে পারি না, তেমনি ওর কথাকেও ভয় পাই।

এই তো, এখন আবার দেখছি, হাঙ্কা গোলাপী জমিতে লাল পাড় শাড়ি পরা, সিঁথিতে সিঁদুর আঁকা, কপালে টিপ মেয়েটি, হাতে তুলে নিয়েছে স্বরার বোতল। ছিপি খুলে ঢালছে গেলাসে গেলাসে। তৃতীয় গেলাসে ঢালবার সময় ও আমার দিকে তাকালো। আগের দুটো গেলাসে, যে পরিমাণ ঢালা হয়েছে, তাকে কী মাপ বলে জানি না। পাতিয়ালা পেগ বলে একটা কথা শোনা ছিল। এ তো তাকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে। একে কি সিঙ্কি পেগ বলে। বললাম, ‘ধাক না।’

রঞ্জিতা ষাড় নেড়ে বাঙলায় বললো, ‘সেটা হয় না মোশাই। স্ববন্ধু লিখু পানী ছিল, এটা কোক পানী, দো দিস্ ইজ অলসো ম্যাচিরোরড, অ্যাণ্ড এ ওম্যান অফারস যু।’

কথা বাড়াতে সাহস পাচ্ছি না, বললাম, ‘অল্প করে দিন।’

জানি, ‘আপনি বেশিতে নেই।’ বলে ভুরু কঁপিয়ে চোখে ঝিলিক হানলো। কিন্তু এই স্বর্ণমণ্ডিত হাত বোধহয় সূরা পরিবেশনে কৃপণতা জানে না। নিজের হাতেই কোকাকোলার বোতল খুলে গেলাসে গেলাসে ঢেলে দিল। গেলাস তুলে দিল আগে লীলার হাতে। তারপরে আমাকে। রঞ্জিতা নিজের গেলাস তুলে বললো, ‘চিয়ার্স।’

তারপরে চোখ বুজে বললো, ‘ঈশ্বর, আমাকে পাপবোধ করিয়ে দাও।’

বলে, একবার চকিত কটাক্ষপাতে লীলাকে দেখলো। আমার দিকে তাকালো। বিঘোষ্ঠ নেমে এল গাঢ় বর্ণ পানীয় পাত্রে। তৃষ্ণার্তের চুমুক, এক চুমুকই পাত্রের অর্ধেক শূন্য। গেলাস নামিয়ে রেখে, রুমাল ত্রাপকিনের দরকার নেই, হাতের পিঠ দিয়েই ঠোঁট চেপে দিল। লীলা তখন বলে উঠলো, ‘অ্যাণ্ড আই ড্রিংক দা হেলথ অব এ মিনিংফুল রাইটার।’

রঞ্জিতা ছোট করে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, ‘ওহ, তোকা লীলা, তোকা। তুমি একটা কথার মতো কথা বলেছ। এ কথাটা আমার মনে আসেনি।’

লীলা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, ‘তুমি নিজের ভাবনাতো মগ্ন ছিলে।’

রঞ্জিতা তাকিয়ে রইলো টেবিলের দিকে। লীলা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। মিনিংফুল রাইটার, কথাটা কি আমাকে বিক্ষিপ করে নাকি?

প্রতিবাদ আমি মোটেই করবো না। বোকা গেল, লীলার সঙ্গে অনেক

কথা হয়ে গিয়েছে। আমার ভয়টাও সেখানেই। অর্থহীন লেখক হিসাবে আমার কোনো দাবি নেই। কিন্তু এখন এ বিষয়ে আমি কোনো আলোচনায় বা বিতর্কে যেতে চাই না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘মি: রিজ্‌ভি কী জ্ঞান বিদেশে গিয়েছেন!’

রঞ্জিতা ঠোট টিপে একটু চুপ করে রইলো, তারপরে বললো, ‘স্বদেশ আর বিদেশের সরকারের আজকাল অনেক স্নেহভাজন আছেন, যারা বছরে কয়েকবার নানা দেশে আমন্ত্রিত হন। রিজ্‌ভিও সেইরকম আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন।’

জবাবের আগে ভূমিকা শুনে মনে হল, কোথায় একটু বেস্বর আছে। রঞ্জিতা একটু সময়ের মধ্যে গেলাস প্রায় শূন্য করে নিয়ে এল। আজ স্ববন্ধু নেই, অ্যান্টনিও নেই। লীলা অবিশ্রি আছে। ভরসা কতোখানি, জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘মি: অ্যান্টনির কী খবর?’

রঞ্জিতা হেসে উঠে, লীলার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, ‘ওহু মাই ওখেলো, মাই গ্রেট লাভার।’

লীলাও রঞ্জিতার সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলো। রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে বললো, ‘অ্যান্টনির এখন গভীর অসুখ। অবিশ্রি শরীরে না, মনে।’

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকলাম। ও ভুরু টান করে, ষাড় নাড়িয়ে বললো, ‘যে প্রেমে পড়ে, তারই অসুখ করে। আপনি কী বলেন?’

আমি হেসে জবাব দিলাম, ‘প্রেম যে অসুখ, আমি ঠিক তা মনে করি না।’

রঞ্জিতা আর লীলা একবার চোখাচোখি করে হাসলো। রঞ্জিতা বললো, ‘আপনি বোধহয় ওটাকে বেদনা বলেন। যাই হোক, শ্রাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘বলুন।’

‘মি: রিজ্‌ভি এবং তারপরে মি: অ্যান্টনির কথা জিজ্ঞেস করার মধ্যে কি কোনো সূত্র আছে?’

আমাকে একটু থমকে যেতে হলো। শুনলে হয়তো, তাই মনে হয়। কিন্তু আমি সেরকম কিছু ভেবে বলি নি। রঞ্জিতার চোখের তারা আমার প্রতি অপলক বিদ্রুপ হয়ে আছে। বললাম, ‘না, কোনো সূত্র নেই। মনে এল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।’

রঞ্জিতা ওর শূন্য গেলাস পূর্ণ করলো। লীলাও কিছু কম বায়ন না। শূন্য পাত্র বাস্কবীর দিকে এগিয়ে দিয়ে টানা চোখ ঢুলু ঢুলু করে, উর্দুতে কিছু বলে উঠলো। বুঝি না, মনে করেও রাখতে পারি না। রঞ্জিতা পাত্র পূর্ণ করতে করতে আমাকে বললো, ‘বুঝতে পারলেন?’

বললাম, ‘না।’

রঞ্জিতা বললো, লীলা একটা গজল গানের কলি বললো। অন্তর যখন কোনো কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, তখন বিষের পাত্র মুখে তুলে নিই।’

এই পানীয়কে তা হলে ওরা বিষ মনে করে। বিষ মনে করেই পান করে? কিন্তু এত অতৃপ্তি কিসের। তবে অতৃপ্ত সন্দেহ নেই। এই বিচিত্রবেশিনী গুজরাতি যুবতী মেয়ে আর সিঁদুবালাকে বাইরের থেকে যাই দেখাক, শিক্ষা দীক্ষা সমাজ পরিবেশ, সব কিছু ছাড়িয়ে ওরা যে বিষের পাত্র তুলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, সেটা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। দুই বান্ধবী পায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমুক দিল। লীলা হঠাৎ হেসে উঠলো। তাকালাম, রঞ্জিতাও তাকালো। লীলা ওর মোটা বিহুনিটা টেনে বুকের কাছে নিয়ে বললো, ‘কিছু না, এমনি একটা কথা মনে পড়ে গেল।’

তা মনে পড়ুক, কিন্তু মাতাল হলে এই আবাসে আমার হাল কী হবে। রঞ্জিতা কিছু বললো না। আবার গেলাসে চুমুক দিল। এত তৃষ্ণা কেন। ইতিমধ্যে অগ্নিশ্বরী গালে বস্তুর ছটা ফুটে উঠেছে। হঠাৎ-ই আমার মনে হল, একেবারে খাতবিহীন পান চলাটা ঠিক হচ্ছে না। ভাড়াভাড়ি উঠে বললাম, ‘কিছু মনে করবেন না, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। কী খাবেন বলুন, বেয়ারাকে আনতে বলি।’

রঞ্জিতা হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করে বললো, ‘আমাদের কোনো দরকার নেই। আপনার দরকার আছে?’

‘আমার জন্ত ভাববেন না—।’

‘তা হলে আমাদের জন্তও ভাববেন না, কালকূট আপনি বসুন।’

নামটা বলার সময়, ওর চোখে যেন একটু ঝিলিক দিল। গেলাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কি সত্যি কালকূট?’

বললাম, ‘ওটা একটা নামের পরিচয় মাত্র।’

‘এমন নাম কেন? নিজের জীবনের সঙ্গে বিশেষ কোনো অর্থ আছে?’

‘কোনো অর্থ?’

রঞ্জিতার ঘাড় ভুরু চোখ, সবই বেকে উঠেছে। ওর ‘এনি মিনিং’ কথার ওপরে জোর দেওয়া শুনেই বুঝতে পারছি, ও ওর নিজের শ্রোতে কথা টেনে নিচ্ছে। বললাম, ‘ধরে নিন, হয়তো কোনো অর্থ আছে।’

ও ঘাড় হুলিয়ে বললো, ‘ধাকতেই হবে, ধাকতেই হবে। আপনি বিষ কোনো সন্দেহ নেই, মৃত্যু আপনাকে ধিরে।’

‘অপবাদ দিচ্ছেন ?’

‘সত্যি কথা বলছি। যে মরেছে, সেই জানে।’

ও গেলাস ঠোটে ছুঁইয়ে, আমার দিকে সোজা তাকালো। এক মুহূর্তের জন্ত ওর মুখ থেকে হাসি চলে গেল। চোখের তারায় নিবিড় আবেগ। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। নদী সমুদ্রগামী অবিরত। রঞ্জিতা আপন স্রোতে বহে। কিন্তু যে ভাসতে জানে না, টান লাগে তার শিকড়ে। সেটা ঠিক না। লীলার দিকে ফিরে দেখলাম, সে মুখ নিচু করে, টেবিলে আঙুল ঘষছে। রঞ্জিতা এক চুমুকে পাত্র শূন্য করলো। আবার ঢাললো, কোকাকোলা মেশালো। আবার চুমুক দিল। তারপরে গান গেয়ে উঠলো, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,

মম শূন্যগগনবিহারী

আমি আপন মনের মাধুরী মিশারে

তোমারে করেছি রচনা—

তুমি আমারি, তুমি আমারি,

মম অসীম গগনবিহারী।

ও চোখ বুজে গাইছে। গানের সঙ্গে, শরীর একটু হুলছে, মুখটা একটু উচুতে তোলা, গ্রীবা মাঝে মাঝে স্বরের উঁচু নিচুর সঙ্গে নড়ছে। সঙ্কল্প মুখে একটা গভীর আবেশ। ওকে এখন একেবারে অন্তরকম লাগছে। যেন নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে। ও কি এগানের ভাষা বোঝে? না বুঝলে, এ আবেশ অভিব্যক্তি ফোটে কেমন করে। অস্বীকার করবো না, আমি মৃদু হয়ে যাচ্ছি। উচ্চারণ স্পষ্ট, আমার জ্ঞানত স্বর নির্ভুল, নির্ভেজাল গায়কী। এ কি শুধু শুনে শেখা, না চর্চার দ্বারা আয়ত্ত। হৃদয়নাথ কি কোনোদিন ওর এরকম গান শুনেছেন, অথবা হেনা। এখন ওকে আমার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা এমনিতেও করে, চোখ সব সময়ে সইতে পারে না যেন। এখন পারছি। লীলা রঞ্জিতাকেই দেখছে, আর গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

গানটা শেষ করে, রঞ্জিতা কোনো দিকে তাকালো না, মুখ নিচু করে রাখলো। কেবল অল্প মাথা নেড়ে বললো, ‘ভ্রাম, মাপ করে যেবেন।’

‘কেন ?’

‘আমার গানের জন্ত।’

বললাম, ‘আমি মৃদু।’

রঞ্জিতা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। যেন লজ্জা পেয়ে হাসলো।

ওকে আবার সেদিনের মতো ব্রীড়াময়ী দেখাচ্ছে। ঠোট টিপে হেসে, নিজের মনেই মাথা নাড়লে, তারপরে গেলাস তুলে চুমুক দিল। লীলা ওর গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘হাও।’

রঞ্জিতা লীলার গেলাস পূর্ণ করার আগেই, লীলা হুহাতে মুখ ঢাকলো। তারপরে হঠাৎ তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। ফুলে ফুলে উঠতো লাগলো। পরমুহুর্তেই ওর ফোপানোর অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। আমি উদ্বিগ্ন বিষ্ময়ে রঞ্জিতার দিকে তাকালাম। রঞ্জিতা লীলার গেলাস টেবিলে রেখে, তার পাশে উঠে এল। লীলার মাথায় হাত রেখে ডাকল, ‘লীলা।’

কিন্তু লীলার কান্না তাতে প্রশমিত হলো না। আরো যেন বেড়ে উঠলো। রঞ্জিতাকে উদ্বিগ্ন দেখলাম না, ওর ঝিলিক হানা চোখের দৃষ্টি কোমল আর করুণ। ও লীলার মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে, আমার দিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে শাস্ত থাকতে বললো। মুখে বললো, ‘এক গেলাস জল দেবেন?’

আমি তাড়াতাড়ি উঠে, ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিলাম। রঞ্জিতা গেলাসে হাত ডুবিয়ে লীলার ঘাড়ের কাছে বুলিয়ে দিল। তাকে ছ’হাতে টেনে তুলে বললো, ‘একটু শুয়ে থাকবে চলো।’

লীলা উঠলো, খাটের ওপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে, ভেতনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। আমি নিরুদ্বিগ্ন হতে পারলাম না। রঞ্জিতা লীলার পাশে বসে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বারে বারে বলতে লাগলো, ‘কাম বী কোআয়েট প্লিজ লীলা—প্লিজ!’...

হায় রে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত, অপরাধ তোমার নির্বাসন। এখন তোমার ঘরে, অগ্নিস্বরী গান শুনে তুমি মুগ্ধ। স্ত্রীর ঘোরে যুবতী শুয়ে উথালি পাখালি কাঁদে তোমার বিছানায় পড়ে। কিসের খেয়ালি ভাঙছে, জানি না। মনে মনে বলি, কোথায় স্তবদ্ধ, রক্ষা করো এসে। প্রায় মিনিট দশেক পরে, লীলা শান্ত হলো। কিন্তু উপুড় হয়ে শুয়ে রইলো। রঞ্জিতা ওর জায়গায় সরে বসে, গেলাসে চুমুক দিল। আমার দিকে ফিরে একটু শুকনো হেসে নিজের বুক তর্জনী দেখিয়ে, নিচু স্বরে বললো, ‘জলছে।’

বলে ওর ঠোট বঁকে উঠলো, যেন হাসিতেই ষাড় ফুলে উঠলো। আবার বললো, ‘আপনি বোধহয় বিরক্ত বোধ করছেন।’

বললাম, ‘না, উদ্বেগ বোধ করছি। ওঁর শরীর ঠিক আছে তো?’

‘বিলকুল। অসুখ গভীর, মনে। বিবের পাত্র মুখে তুলে নিয়েছে কী না।

ওকে আর একটু সময় দেওয়া থাক, তারপরে চলুন ওঠা থাক।’

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমাকেও উঠতে হবে নাকি?’

‘আজ আমাকে পৌঁছে দেবেন না?’

আবার ওর চোখের তারায় ঝিলিক। আমি একবার শায়িত লীলার দিকে দেখলাম। রঞ্জিতার কথাটা অর্থোক্তিক না। বিশেষ করে, এরকম একজন বান্ধবী যখন সঙ্গে রয়েছে। বললাম, ‘কেন দেব না।’

রঞ্জিতা ওর পাত্র শূন্য করলো। আবার ঢাললো। এখন ওর কাজল-টানা ঈষৎ পিঙ্গল চোখের ক্ষেত্র রক্তিম। সমস্ত মুখখানিই রক্তাভ। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, ‘কিছু বলছেন?’

বললাম, ‘আপনি ঠিক আছেন তো?’

গেলাস উচুতে তুলে বললো, ‘এ ব্যাপারে ঠিক আছি। আবার ঠিক নেই অনেক কিছুতে।’

বলে চোখ বুজে চুমুক দিল। ঠোঁঠ থেকে গেলাস নামিয়ে আবার বললো, ‘শ্রাম, আপনাকে কি সে কথা আর কেউ বলেছে?’

‘কোন কথা?’

‘পাপবোধ ভেসে যাওয়ার কথা।’

সেই কথা, যে কথাতে আমি যেতে চাইনি। মাথা নেড়ে বললাম, ‘না।’

রঞ্জিতার রক্তিম চোখ নিম্পলক। ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, ‘কথাটা শুনে কী মনে করেন আপনি?’

‘বুঝি না।’

রঞ্জিতা কয়েক মুহূর্ত চূপ করে তাকিয়ে থেকে বললো, ‘আপনি কেন বুঝবেন। যার ভেসে যায়, সে বোঝে। আসবার সময়ে ভেবেছিলাম, আজ আমার তা হবে না। কিন্তু দেখছি, আমি ভেসে যাচ্ছি।’

বললাম, ‘যাতে হুঃখ বাড়ে, এমন অহুঃখতিকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।’

রঞ্জিতা নিঃশব্দে হেসে উঠলো, বললো, ‘হুঃখ বাড়ে! হুঃখ বাড়ে! না না, এ আমার হুঃখ থেকে মুক্তির বোধ।’

বলেই এক নিঃশ্বাসে, দীর্ঘ চুমুকে গেলাস শূন্য করে দিল। গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে দিল টেবিলের ওপরে। আমি ডেকে উঠলাম, ‘রঞ্জিতা, আর না।’

রঞ্জিতার মুখ নিচু। চুল কপালে গালে এলিয়ে পড়লো। মাথা নেড়ে বললো, ‘না, আর না। চলুন এবার যাই।’

লীলার দিকে ঝিরে, হাত বাড়িয়ে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলো, ‘লীলা, চলো উঠি—’

একবার ডাকতেই লীলা উঠলো। বাধকমে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল, চোখে মুখে জল দিয়ে। চশমা পরে জামা ঠিক করে, বললো, ‘চলো।’

এখন আমি রঞ্জিতাকেই দেখছি। ওর কি নেশা হয়ে গিয়েছে। এখনো মুখ তুলছে না। লীলার ডাক শুনে উঠে দাঁড়ালো। ব্যাগ নিল। দেখলাম, টলছে না। বললাম, ‘আপনার বোতলটা?’

রঞ্জিতা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখ তুলে বললো, ‘ধাক, ওটা নিয়ে যাবো না, আরো খেতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু—কিন্তু আপনি সত্যি বোঝেন না?’

সেই কথা! রঞ্জিতা আমার মুখের দিকে চেয়ে। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগছে। ওর নাসারন্ধ্র যেন কাঁপছে। আমি কোনো কথা বলতে পারছি না। রঞ্জিতার চোখ নেমে, নিবন্ধ হল আমার বুকের দিকে। আমার মুখের দিকে। অশ্রুটে বললো, ‘চলুন’।

ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এখন আর বোতল গেলাস সরাবার সময় নেই। ঘরের আলো নিভিয়ে, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। লীলা রঞ্জিতার হাত ধরে করিডর ধরে হাঁটছে। লিফটে নিচে নেমে এসে, বাইরে দাঁড়াতে রূপাণধারী দরওয়ান সর্দারজী বাঁশি বাজিয়ে দিল। কোথা থেকে ছুটে এসে দাঁড়ালো ট্যান্ডি। কলকাতায় যেটা স্বপ্ন। রঞ্জিতা আমাকে আগে উঠতে বললো। তারপরে ও মাঝখানে বসে, লীলাকে এক ধারে নিল। পথের মধ্যে কোনো কথাই হল না। আলোকিত কয়েকটি রাস্তা পার হয়ে, গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা ইনস্টিটিউটের সামনে, মেয়ে হস্টেলের গেটে। লীলা নামবার আগে, আমাকে বললো, ‘যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না যেন।’

বললাম, ‘কিছুই না। আপনার শীরের ভালো তো?’

‘ভালো। আশা করি আবার দেখা হবে, শুভরাত্রি—দুজনকেই।’

লীলা নেমে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, ‘কোথায় যাবেন?’

‘আপনাকে পৌঁছাতে।’

‘না, আমাকে পৌঁছবার আগে, খেতে যেতে হবে। ওবেরয় ইন্টারকন্টিনেন্টাল?’

খেতে যাবার কথাটা নতুন শুনছি। কিন্তু ওরকম একটা আশ্রয় খেতে যেতে আমার ইচ্ছা নেই। বললাম, ‘আমার হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে।’

রঞ্জিতা বললো, ‘না ওখানে যাবো না। অশোকা?’

দুটো নামই দিল্লীর বড় উচ্চ মার্গের। এ সব জায়গার নাম করছে কেন? বললাম ‘অন্ত কোথাও গেলে হয় না?’

রঞ্জিতা বললো, ‘চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, না? আচ্ছা তাহলে চলুন, জনপথের চায়নিজ রুম ম্যাগারিনে যাই।’

মুহূর্তের মধ্যেই আমার বঠেল্লিয় সজাগ হয়ে উঠলো! এখন দিল্লীর যেখানে যেখানে সুরা পাওয়া যায়—রঞ্জিতা সেই সব জায়গার নাম করছে। দিল্লীতে কোনো পাবলিক বার নেই। যেসব জায়গাতে আছে সেসব জায়গাতেও নানান বিধিনিষেধ। সম্ভবত সেসব বিধিনিষেধকে তুচ্ছ করার মধ্য ওর জানা আছে। আমি ওকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বললাম, ‘অন্ত কোথাও যাওয়া যায় না?’

রঞ্জিতা কয়েক পলক আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে, নিঃশব্দে হাসলো। হঠাৎ টোন্টের ওপর তর্জনী রেখে একটু ভেবে নিয়ে বললো, ‘ওসব জায়গায় আমি খুব বাধ্য না হলে যাই না। এবার আর কিছু বলবো না। চলুন, আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। কিন্তু কাবাব খেয়ে পেট ভরাতে পারবেন তো। দারুণ কাবাব।’

রঞ্জিতাকে এখন একটু ছেলেমানুষ লাগছে। পেট ভরাবার প্রহ্ন না, এক রাত্রি না হয় কাবাব খেয়েই কাটবে। বিশেষত সে কাবাব যখন দারুণ! ড্রাইভার এতক্ষণ কিছু না বলেই, আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। রঞ্জিতা বললো, ‘জাম্মা মসজিদ চলুন। সর্দারজী।’

যার নাম জুম্মা মসজিদ? হাতের ঘড়িটা উল্টে দেখার চেষ্টা করলাম। রঞ্জিতা বললো, ‘রাত্রি এখন দশটা।’

‘এখন কি সেখানে সব খোলা?’

‘সেখানে সারারাত্রি খোলা। দিল্লী ওখানেই আছে, ওখানেই জাগে।’

রাত্রি দশটার সময় জুম্মা মসজিদে কাবাব খেতে কোনদিন যাইনি। দেখা যাক। গাড়ি চলেছে পুরনো দিল্লীর দিকে, রঞ্জিতা কী একটা গান গুনগুন করছে, সুর শুনে মনে হয়, গজল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কি গানের চর্চা করেন?’

রঞ্জিতা গুনগুনানি থামিয়ে মাথা নাড়লো, ‘না। বা শুনি, ভালো লাগলে, তাই তুলে নেবার চেষ্টা করি। টেগোরের গান আমি ভালোবাসি। কলকাতায় থাকতে আমি এক ডজনর ওপর গান শিখেছিলাম।’

‘আপনি কি বাঙলা ভাষা বোঝেন?’

‘অনেকটা। পড়তে বা লিখতে পারি না। বুঝতে পারি। শ্রাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি কি স্থানী মানুষ দেখেন নি?’

কথার প্রসঙ্গ অত্যন্ত দ্রুত বদলে চলেছে। যেন খেই ধরতে পারি না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন বলুন তো? যাদের দেখেছি তাদের সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহল নেই।’

ও আমার অনেক কাছে বসেছিল। ঝাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে, আমার বুকে স্পর্শ করে বললো, ‘এখানে কেবল দুঃখী মানুষের মিছিল?’

বললাম, ‘না, আমি প্রসন্ন শান্ত দেবতুল্য মানুষও দেখেছি।’

‘তার কারণ?’

‘আমাদের এই দেশের পথেঘাটে তাদের দেখা পাওয়া যায়, গাছতলায়, কুটিরে, মেলায়, মাঠে।’

রঞ্জিতা একমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে চূপ করে রইলো। আমার পাঞ্জাবীর বোতামের ঘরে ওর তর্জনীটা আটকানো। যেন কিছু ভাবছে। বাতাসে চুল উড়ছে। হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছি। বললো, ‘তবু একটা কথা, আপনারা দুঃখী মানুষেরা এক এক সময় বড় রঙীন, বড় উজ্জ্বল, কেন? তাদের দুঃখকে এক এক সময় যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।’

সহসা কোনো জবাব দিতে পারলাম না। ওর মুখের দিকে দেখলাম। তাকিয়ে আছে। মনে হল, ওর কথার মধ্যে, একটি বিশেষ মনের ছায়া আছে। এটা ওর চিন্তার কথা। মনে পড়ে গেল, অ্যাকোরিয়ামের কথা, রঙীন মাছের জার। যার পিছনে ও আমাকে হাসিমুখে লুকিয়ে যেতে দেখেছে। কথাটা অভিযোগের মত শোনায়। কিন্তু কেন বলেছে, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার কী মনে হয় বলুন তো?’

ও বললো, ‘এক এক সময় মনে হয়, তারা অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে থেকেও মুক্ত, দুঃখটা সত্য আর নির্মম হয়ে ফুটে ওঠে না।’

রঞ্জিতা আমাকে ভাবিয়ে তুলতে চাইছে। আমার বোতাম-ঘরে ওর তর্জনী নড়ছে। তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

বললাম, ‘কথাটা আমার মনে থাকবে।’

বোতাম-ঘরে তর্জনী দিয়ে, জোরে একবার টেনে, প্রায় ওর দিকে আমাকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে বললো, ‘কেবল কথা?’

তারপরেই তর্জনী সরিয়ে নিয়ে, ও নিজেই আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বললো, ‘শ্রাম, আপনি আমার মত একটি স্থানী মেয়ের জীবন নিয়ে কিছু লিখুন।’

ওর চোখের কটাক্ষে ঝিলিক, রক্তিম অধরের হাসিতে আগুন। একথা বলে কাকে বিক্রপ করছে রঞ্জিতা?

বললাম, ‘স্বথী?’

‘নয়?’ বলে ওর নিজের শরীরটাকে যেন মেলে দেখাতে চাইল। হু’হাত ছড়িয়ে, শরীর সামনের দিকে এগিয়ে বললো, ‘এর চেয়ে স্বথী মেয়ে আপনি আর কোথায় পাবেন? আমার রূপ আছে, ঘোঁবন আছে, যা খুশি করবার স্বাধীনতা আছে, স্বামীর টাকা আছে, নিজেও কিছু বোজগার করি, আমি স্বথী নই?’

স্ববন্ধুর কথা আমার মনে পড়ছে। আর এই মুহূর্তে ওর এই ঝনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, আমার পুরুষ মন বিব্রত বোধ করলেও, ওকে দেখে কেন যেন কষ্টও হচ্ছে। দুঃখ দহনের এ আর এক রূপ। বললাম, ‘একেই যে স্বথের সংজ্ঞা বলে, তা আমার জানা নেই।’

রঞ্জিতা আমার চোখে চোখ রেখে প্রায় ফিসফিস করে বললো, ‘কিন্তু শ্রাম, তুমি কিছুই জানো না, আমাকে সবাই স্বথী বলে। আমার মা ভাই বোন বন্ধু স্বামী, দিল্লীর সবাই।’

বললাম, ‘হয়তো তারা সত্যি বলে, তারা আপনাকে দেখেছে। আমি আপনার স্বথের কিছুই এখনো দেখিনি।’

‘সে কি শ্রাম, আপনার সামনে বলে এত মতপান করছি, হাসছি, গান করছি, তবু না?’

রঞ্জিতা কি আমাকে এতটা অন্ধ ভেবেছে, এই ঝলক দেখে, আমি আলো চিনবো। কিছু না বলে, ওর চোখের দিকে চেয়ে হাসলাম। ও এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপরে চোখ বুজে বলে উঠলো, ‘শ্রাম, চোখ ফিরিয়ে নিন, আমি ভেলে যাচ্ছি।’

সত্যি সত্যি আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। রঞ্জিতা হুংকে বাড়ছে। একলা ওর না, আমাকেও সেই হুংকের ছয়াতে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। অথচ আমাদের জীবনের, কারোয় কোথাও মিল নেই। কোনো কিছুতেই না। আমি চলে যাবো দূরে, আমাদের মধ্যে সারা জীবনে হয়তো আর দেখাও হবে না। আর মাহুকের মন। সে তো বহুকাল থেকেই জানি, তাঁটার পলির মতো, অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়। হয়তো ভুলে যাবো। তবু আমি বুঝতে পারছি, এক বিহঙ্গ ডাকছে। ফুলেরা নিঃশব্দে ফুটেছে। রঞ্জিতা ডাকলো, ‘শ্রাম।’

‘বলুন।’

‘তাকান আমার দিকে।’

তাকালাম। সহসা যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ওর মুখ এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। ওর চোখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না। বললাম, ‘রজিতা, দুঃখকে বাড়াবেন না।’

‘আমার চারপাশে অনেক সুখ, দুঃখকে আমি ডরাই না।’

‘আমি ডরাই।’

‘আপনি ? দুঃখকে ?’ ও আমার কোলের ওপর রাখা আমার একটি হাতের ওপর হাত রাখলো। ওর হাত গরম। ওর মুখ আবার উঠে এল আমার মুখের কাছে। সুগন্ধ উষ্ণ নিঃশ্বাসের হলকা লাগছে আমার ঘাম ভেজা মুখে। অগ্নিশরীর আগুনের স্পর্শ আমার গায়ের ছোঁয়ায়। প্রায় অশ্রুতে উচ্চারণ করলো, ‘হায় আমার মিষ্টি বিষ। একটু বিষ দাও আমাকে তোমার মিষ্টি পাত্র থেকে।’

চোখ নামিয়ে দেখলাম, তরল আগুন টলটল করছে, অথবা শরীরে, রক্তিম ঠোঁটের তৃষ্ণার্ত ফাঁকে। আর নিজের জন্তু, বাউলের সেই গানের কলি আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, ‘আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে।’ কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অসহায় একটা কণ্ঠে বিদ্ধ হচ্ছি। আমি হাত দিয়ে ওর কপালের কাছে স্পর্শ করলাম।

গাড়ি হঠাৎ বাক নিল। চলে এলাম অন্ধ এক পরিবেশে। বিজি রাস্তা, চারদিকে লোকের ভিড়। ফুটপাথে গরীবের শয্যা, শিশুরা এত রাজেশ চিৎকার করে খেলা করছে। এখানে সুপার মার্কেটের ঝলক নেই। এখনো সব হাট করে খোলা। বাতাসে বিচিত্র গন্ধ। মাছের আঁশটানি থেকে ঘোড়ার বিঠা। অপেক্ষাকৃত একটু অন্ধকার জায়গায়, রজিতা গাড়ি দাঁড় করাতে বললো। স্বাগত আর জামা পরা একটা বারো তেরো বছরের গরীব মেয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা দরজার কাছে। রজিতা তাকে আঙুলের ইঙ্গিত করতাই, সে এগিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আমিনা, তেরা আকাঙ্ক্ষা ক’হা ?’

মেয়েটি বললো, ‘অন্দর মে।’

‘বোলা।’

মেয়েটি দরজা দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। একটু পরেই, মাঝবয়সী, লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়ে একটা লোক বেরিয়ে এল, গাড়ির সামনে দাঁড়ালো। কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে, রজিতাকে সেলাম করলো। বললো, ‘করমাইয়ে মেমসাব ?’

রজিতা বললো, ‘কুছ জায়।’

‘দী হাঁ, পিলা ওর কাত্‌খই ?’

রঞ্জিতা ওর ব্যাগ থেকে পার্স বের করে, কিছু টাকা গুঁজে দিল লোকটির হাতে। লোকটি চলে যেতেই, রঞ্জিতাও ব্যাগটা সহ দরজা খুলে নেমে ঘাবার আগে বললো, ‘এক মিনিট আসছি।’

কিন্তু পিলা-ই বা কী, কাত্‌খই-ই বা কী, কিছুই বুঝলাম না। পিলা তো হলুদ রঙকে বলে জানি। কাত্‌খইয়ের অর্থ জানি না। এরকম একটা হতভাগা জায়গায়, টাকা দিয়ে কী বস্তু কিনছে। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে-ছিলাম। দেখলাম, লোকটি বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। কাগজে মোড়া কী একটা রঞ্জিতাকে দিল। রঞ্জিতা সেটা ওর ব্যাগে ভরে নিল। কী যেন বললো, ফিরে এল গাড়িতে। ড্রাইভারকে বললো, ‘সদারজী, অব এক চকর লাগানা, ফিন জামা মসজিদকে ইধার ঘুমকে আনা।’

একটু দূরে, ডানদিকে জুমা মসজিদ দেখতে পাচ্ছিলাম। গাড়ি মসজিদের পাশ দিয়েই ঘুরে, রেড ফোর্টের দিকে এগোল। রঞ্জিতা ব্যাগ খুলে, কাগজের মোড়ক থেকে বের করলো ছোট একটি রামের বোতল। তারপরে আমার দিকে তাকালো। বললো, ‘এ হল কাত্‌খই রঙের পানীয়।’

মনে মনে ভাবলাম, পিলা তা হলে ছইন্ধি। গুঁড় ভাবার কথা। বেআইনী ক্রয়। রঞ্জিতা রিজ্‌তি এটাও জানে। কিন্তু আবার কেন। সঙ্গে থাকলে খেতে ইচ্ছে করবে বলে ঘরে বোতল রেখে এল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদলে গেল? খানিকটা ভয়ে আর অস্বস্তিতে আমি বোতলটার দিকে তাকলাম। বললাম, ‘আবার কেন?’

রঞ্জিতা চোখ কুঁচকে হেসে বললো, ‘একটুখানি।’

লীলার সেই উর্‌ গজলের কলি আমার মনে পড়ছে। অন্তর যখন পূর্ণ হয় না, তখন বিয়ের পায়ে চুমুক। দেখলাম, রঞ্জিতা ছিপি খুলে শুধু রাম গলায় ঢালছে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলাম, ‘কী করছেন মিসেস রিজ্‌তি?’

রঞ্জিতা মুখ থেকে বোতল সরিয়ে, আমার দিকে চেয়ে বললো, ‘মিসেস রিজ্‌তি? ওহ্‌, আপনি রাগ করছেন?’

‘না, আমি ভয় পাচ্ছি।’

‘ভয়ের কিছু নেই শ্রাম। আমি হয়তো ঠিক ব্যবহার করতে পারছি না। নিজেকে একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি।’

বলে অবিশ্বাস্য রকমে, বোতলটাকে উপুড় করে গলায় ঢালতে লাগলো। আমি আর থাকতে পারলাম না। কাছে বসে এরকম নির্বিকার দেখা যায় না।

বোতলটা ওর হাত থেকে টেনে নিলাম। খানিকটা রঙীন পানীয় ওর বুকের শাড়িতে পড়ে গেল। ও গাড়িতে হেলান দিয়ে, দুহাত ছড়িয়ে দিল। চোখ বুজে রইলো। রক্ত ঝলঝলানো মুখ, চোখের আর নাকের পাশ কঁচকানো। ও বারে বারে ঢোক গিলেছে। খোলা হাত থেকে ছিপিটা নিয়ে, বোতলের মুখ বন্ধ করে, পিছনে রেখে দিলাম।

সর্দারজী গুনগুন করে নিজের ভাষায় গান করছে। বোধহয় তারও নেশা লাগছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, গাড়ি গান্ধীঘাট পেরিয়ে, বাদিকের মাঠের পাশ দিয়ে মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে। ওই দূরেই কোথাও যমুনা নদী আছে। এত রাত্রে বোধহয় সেখানেও যাওয়া যায় না। কলকাতা হলে, গঙ্গার ধারে যাওয়া যেত। এখানে ওখলা আছে। এত রাত্রে বোধহয় সেখানেও এখন প্রবেশ নিষেধ। সঠিক জানি না। শুনতে পেলাম, রঞ্জিতা ইংরেজিতে যেন কবিতা আবৃত্তি করছে, যার বাঙলা অর্থ: ‘প্রতি বারেই তুমি আমার ঘরে/নগ্ন, আমার শয্যায়/প্রতি রাত্রেই আমি তোমাকে খুন করি/কিন্তু সকালবেলা উঠে দেখি/তোমার কোনো চিহ্ন নেই—অথচ শয্যায় রক্তের দাগ, আমারই/তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার নগ্ন নিটোল বুক দেখি/সেখানে ক্ষতের কোনো দাগ নেই।’...শেষ করেছে বলে উঠলো, ‘সর্দারজী, গাড়ি ঘুমাও, জামা মসজিদ চলো।’

আমার দিকে পাশ ফিরে, একটা হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরলো। বাঙলায় বললো, ‘শ্রাম তুমি রাগ করে?’

ইংরেজির ‘হু’ সংঘোধন এবার বাঙলার ‘তুমি’। গাড়ির ভিতরে আবছায়ায় তাকিয়ে দেখলাম, ওর চোখ চকচক করছে, কিন্তু মাতালের মত চোখের পাতা ঠিক ভারি না। ওর মুখে এখন হাসির ঝলক নেই, কটাক্ষও ঝিলিক নেই। আমার হাতে চাপ দিয়ে আবার বললো, ‘রাগ করে?’

বললাম, ‘না। কিন্তু আপনার বোধহয় শরীর খারাপ করছে।’

নিঃশব্দ হাসিতে একটু শরীর কাঁপিয়ে বললো, ‘নিশ্চিন্ত থাকো, আমি পাথরে গড়া। শ্রাম, একটা কথা, আমাকে তোমার কী মনে হচ্ছে?’

‘অস্থির।’

‘সে কথা ভিজ্জেস করিনি, আমি—আমি—আমাকে তোমার কী মনে হচ্ছে?’

‘অশান্ত।’

ও পরিপূর্ণ চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো, বললো, ‘অ্যাকোরিয়ামের পিছন থেকে বলছো?’

একটু হাসলো, আবার বললো, ‘কিন্তু কেন আমি অস্থির অশান্ত, সে কথা তোমার জানতে ইচ্ছে করে?’

‘সে কথা আপনি বললে জানবো।’

ও একটু চুপ করে রইলো, আমার হাতের আঙুলের মধ্যে ওর আঙুল গললো। এ মুহুর্তে বাধা দিতেও পারছি না। বললো, ‘আমি যখন এক বছর আগে রিজার্ভিকে বিয়ে করি, তখন দিল্লীর লোকেরা কী বলেছিল জানো? একটা চলতি প্রবাদের মত কথা। দিল্লীতে হিন্দু মেয়ের মুসলমানকে বিয়ে করাটা অবশিষ্ট একটা অপরাধ। তোমাদের কলকাতার একটা নামী পরিবারের মেয়ে একজন মুসলমান অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। তাতে কলেজ থেকে অধ্যাপকের চাকরি চলে যায়। কারণ সেই কলেজের পরিচালকেরা একটা কমিউনাল রাজনৈতিক দলের সমর্থক। পরে অবশিষ্ট, অল্প দিকের চাপে, অধ্যাপককে রিইনস্টেট করা হয়েছে। কিন্তু দুর্নাম থেকে রেহাই পায়নি। আর সেটা হল একটা নোংরা কুসংস্কারের মতো বিশ্বাস।’

রজিতা একটু খেমে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি বুঝতে পারছো কিছু?’

‘না।’

‘ওদের ধারণা, বেশি যৌনস্থখের জগতই নাকি মুসলমানকে হিন্দু মেয়েরা বিয়ে করতে চায়।’

আবার নিঃশব্দ হাসিতে ওর শরীর কঁপে উঠলো, বললো, ‘একে মূর্খামি ছাড়া কী বলা যায়? মুসলমান মেয়েরা যখন হিন্দুকে বিয়ে করে? তা হলে পশ্চিমের স্বাধীনচেতা মেয়েরা তো সবাই আরব ইরানের ছেলেদেরই বিয়ে করতো। কারণ তো একটা ফিজিকাল অপরাধন। অনেক সময় মুসলমান রাজা বাদশাহের হারেমের কথা বলা হয়। যেন ওদের হারেমেরই শত শত মেয়ে পোষা হতো। রাজা বিশ্বাসের পুত্র রাজা অজান্ততঃ যখন বেগুনে বুকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পাঁচশো হাতীর পিঠে চেপে, কেবল পাঁচশো মহিষীই গিয়েছিলেন, তা হলে তাঁর রজিতা কতো ছিলো? তিনি মুসলমান ছিলেন না।’

আবার একটু খেমে বললো, ‘তোমাদের বন্ধিম চ্যাটার্জির ভূর্গেশনন্দিনীতে পড়েছি, আয়েযা—কী যেন নাম সেই হিন্দু বন্দীর, যার সম্পর্কে বলেছিল, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।’

রজিতার কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু ও কেন মুসলমানকে বিয়ে করেছে, সে প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি। নিশ্চয়ই রিজার্ভিকে ও প্রাণেশ্বর রূপে পেয়েছে।

যদিও এই রক্তিতাকে দেখে, ভাবতে বিধা হয়, নিজেকে সমর্পণ করার মতো প্রাণেশ্বর ওর আছে। কথাটাই বা কেন তুললো, জানি না। নিজেই আবার বললো, ‘আমাকে দেখে অবিশ্রাস্তি সকলের কুসংস্কারের বিশ্বাসটাই বড় হয়ে উঠেছে। আমার মতো মেয়ে তা ছাড়া আর কেন মুসলমানকে বিয়ে করবে। তোমার কি মনে হয় শ্রাম ?’

বললাম, ‘তুমি নিশ্চয়ই রিজ্‌ভিকে ভালবাসো।’

‘ভালবাসা ওহু, কী মিষ্টি কথা। ভালবাস—ভালবাসা। মনে হয়, কথাটাকে-মুখে পুরে, চুষে চুষে খাই।’

বলে কাঁচের চুড়ির বনাংকারের মত শব্দ করে হেসে উঠলো। হাসিটা ধামলে খানিকক্ষণ চূপ করে রইলো। আমার আঙুলগুলো নিয়ে খেললো। তারপরে গভীর স্বরে বললো, ‘আমি অস্থির, আমি অশান্ত, কিন্তু আমি বড় বোকা, আর তার জন্যই তীব্র একটা অন্ত্রায় করেছি। রিজ্‌ভিকে বিয়ে করে বসেছি। কিন্তু অন্ত্রায়টা মুসলমান বলে নয়। রিজ্‌ভি হিন্দু হলেও, একই কথা।’

আমি রক্তিতার সিন্দূর চর্চিত মুখের দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকালো না। বললো, ‘সেটা এখন আমি বুঝি, রিজ্‌ভিও বোঝে। কবে ভালাক হবে জানি না, রিজ্‌ভি ক্রমে তিক্ত হয়ে উঠেছে। কোনো বিষয়ে ভর্ক হলেই ও আমাকে অপমান করে বলে। আমি যদি বলি, পাণ্ডিত্য জিনিসটা বড় হৃদয়হীন, তা হলে ও বলে, আর সাহিত্য শিল্প কাব্য বুঝি হৃদয়ের শৈরাচার ? কী ভেবে বলে, আমি বুঝি। ও পণ্ডিত মাহুয, বন্ধুহলে প্রিয়, আমি ওকে কোনো দিক থেকেই স্থখী করতে পারিনি...।’

যেন কথাটা শেষ না করেই ও চূপ করলো। কিন্তু ও বোকা কেন, কী অন্ত্রায় করেছে, সে কথাটা পরিষ্কার করলো না। ও তখনো সামনের দিকে তাকিয়ে। আমি ওর দিকেই দেখছি। আন্তে আন্তে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। ঠোঁটের কোণে হেসে বললো, ‘প্রতিবাদ ?’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘প্রতিবাদ ?’

‘হ্যাঁ। আমার সমাজ পরিবার পরিবেশ বন্ধ, সকলের সব কিছুই বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। বোকা না হলে, এরকম একটা অন্ত্রায় কেউ করতে পারে না। এখন সেটা বুঝতে পারি, যে প্রতিবাদে কারোয় কিছু এসে যায়নি। শুধু একজনের ক্ষতি করেছি, আমি রিজ্‌ভির ক্ষতি করেছি।’

কনট প্লেসে অন্তর্বাস পোড়বার কথা আমার মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আর নিজের ?’

‘আমার আবার কতি কী। আমি বা ছিলাম, তা-ই আছি।’

ওর কথা শেষ হবার আগেই, গাড়ি জুমা মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভিড় একটু কম মনে হলো, একই রকম দেখাচ্ছে চারপাশের পরিবেশ। এখনো যথেষ্ট কলরব। পানের আর এক খাবারের দোকানগুলোতে রেডিও বাজছে। টাঙ্গাওয়ালারা একদিকে অপেক্ষা করছে। রঞ্জিতা উর্চু মেশানো হিন্দীতে বললো, ‘সর্দার বড্ডে মির্রার দোকানে চলো, ওই যে ওখানে।’ একদিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

আমার দিকে কিরে বললো, ‘শ্রাম, আমাকে আর একটু পান করতে দেবে?’

‘আমি অহ্ননয়ের স্বরে বললাম, ‘প্রিজ, নো মোর।’

ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, কাঁধের ওপর হাতটা তুললো। গাড়িটা দাঁড়ালো একটা আলোকিত খাবারের দোকানের সামনে। ও হাতটা নামিয়ে নিল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, কতো মিটার উঠেছে, এবং হালের বাড়তি ভাড়া যোগ করে, কত হচ্ছে। বলেই ব্যাগ থেকে পার্স বের করলো। আমি তার আগেই পকেটে হাত দিয়েছি। ও আমার হাত চেপে ধরে বললো, ‘আজ তুমি না। তুমি আমার অতিথি—আমার পাপবোধ হরণকারী—তুমি আমার—’

সর্দারজী বললো, ‘বারো রুপায়্যা বাট পয়সা দিজিয়ে।’

অপরূপ বিপরীত ভাষণ। আমার আপত্তি এখন টিকবে না জানি। রঞ্জিতা পার্স থেকে টাকা বের করে দিয়ে, পার্সটা হাতে নিয়েই নামতে উদ্যত হল। আমি রায়ের বোতলটা নিয়ে বললাম, ‘এটা আপনার ব্যাগে রাখুন।’

ও বলে উঠলো, ‘ওহ্, আসল জিনিসই কেলে যাচ্ছিলাম।’ বোতলটা ব্যাগে পুরে, ব্যাগ নিয়ে নামলো। আমি ওর পিছনে নেমে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ও চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন একটু টলে গেল। হাত বাড়িয়ে আমার পাঞ্জাবীর হাতা চেপে ধরলো, বললো, ‘দুঃখিত, হৌচট খেয়েছি।’

সত্যি কি হৌচট। রাস্তা উঁচু নিচু বা পাথর তো দেখছি না। যা-ই বলুক একটু কি বেশি হয়ে যায় নি। দ্রব্যগুণ বলে তো একটা কথা আছে। বড্ডে মির্রার দোকানের ভিতর থেকে একজন পায়জামা পাঞ্জাবী পরা প্রায় বড়ো মাহুয অনেকটা দৌড়েই এল। আমাদের দুজনকেই সেলাম জানিয়ে বললো, ‘করমাইয়ে বিবিলাহেবা, ক্যা চাহিয়ে।’

রঞ্জিতা আমার আমার হাতা ছেড়ে দিয়ে, বললো, ‘কাবাব দিজিয়ে বড্ডে মির্রা’, বড্ডে কাবাব দো আদমিকে লিয়ে।’

বড্ডে মির্রা জিজ্ঞেস করলো, ‘রোটি?’

‘নহি। কাবাব জারদা দিভিয়ে।’

বড়ে মিয়া ছুটলো। রঞ্জিতা এখানে বিলক্ষণ পরিচিতা মনে হচ্ছে। দোকানের ভিতর থেকে, অনেকেই ওকে তাকিয়ে দেখছে। একটু পরেই, বড়ে মিয়া একটি পাতার মোড়ক নিয়ে এল। নাকে কাবাবের গন্ধ পেলাম। রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করে দাম দিল পাঁচ টাকা। পাস’টা ব্যাগে পুরে, কাবাবের মোড়ক নিল। এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে কাবাব। বললাম, ‘আমার হাতে কিছু দিন।’

বললো, ‘কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তুমি এসো।’

কোথায় যাবো, কিছু বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকো না। ও আমার গায়ের কাছ ঘেঁষে চলেছে। আমি একেবারে তুল দেখিনি, ওর পা ঈষৎ অ-স্থির। ও জুমা মসজিদের সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আশেপাশে কিছু লোক আমাদের দেখছে। সিঁড়ির ধাপে, হুঁদিকের ধার ঘেঁষে, অনেকে শুয়ে আছে। ছেঁড়া জামাকাপড় তাদের গায়ে। রঞ্জিতা আমাকে ডাকলো, ‘শ্রাম, এসো বসি।’

ও কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে, ধুলোর ওপরেই বসলো। ঐতিহাসিক জুমা মসজিদের প্রাচীন ধূলিমলিন সিঁড়ি। আশেপাশে ভিবিবির অবস্থান। সেখানে দিল্লীর এক আধুনিক যুবতী, এখন সিঁথের কপালে সিন্দূর, সেই মসজিদের সিঁড়িতে কাবাব খেতে বসেছে। রাত্রি কতো? হাত উল্টে দেখি, এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। আবার আমার সেই অন্তর্বাস পোড়াবার কথা মনে পড়লো। প্রতিবাদ—প্রতিবাদ কিন্তু ও এভাবে বসলে, আমাকেও বসতে হয়। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও ব্যাগটা নামিয়ে রেখে, আমার আরো কাছে এসে বসলো। পাতার মোড়ক খুলতে খুলতে বললো, ‘তোমার খারাপ লাগছে না তো?’

বললাম, ‘দিল্লীতে এ সবই আমার অজানা।’

ও আমার হাতে কাবাব তুলে দিয়ে বললো, ‘আমার সবই জানা।’ বলে ও কাবাবে কামড় বসালো।

ছুটো কুকুর কোথা থেকে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়ালো। সিঁড়ির এখানে ওখানে ছাত্রের মতো কয়েকজন উঠে বসে আমাদের দেখতে লাগলো। দেখছে সিঁড়ির নিচে থেকেও অনেকে। একটু দূরে কয়েকজন তা দাঁড়িয়েই দেখছে। আমার অসুস্থি হচ্ছে। কাবাব মুখে দিচ্ছি, খেতে পারছি না। কিন্তু এ ব্যাপারে রঞ্জিতা নির্বিকার। তারপরেই দেখি জুতো হসমসিয়ে একজন লেপাই, সিঁড়ির নিচে, আমাদের সামনেই এসে দাঁড়ালো। শুনেছি, দিল্লীর পুলিশ

সাক্ষাৎ যম। আমি অপমানের ভয় পেলাম। রঞ্জিতা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'ক্যা সিপাইজী, ক্যা দেখতে হেঁ ?'

সেপাই বললো, 'আশহি কো। খানা খানেকা বহোত বঢ়িয়া জাহ্‌গা আপকে মিলি।'

রঞ্জিতা ঘাড় হুলিয়ে, হেসে বললো, 'হ্যা ভাইসাব, জাহ্‌গা ভো বহোত আচ্ছা না ?'

সিপাই বললো, 'হী, মগর আপকি লিয়ে নহি।'

'কৈও ভাই, এ জাহ্‌গা সবকে লিয়ে ঠিক ছায়।'

সিপাই একবার আমার দিকে তাকালো। রঞ্জিতার দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'ভো ঠিক ছায়, খানা খাইয়ে।'

সে চলে গেল। কিন্তু সেপাইকে কথা বলতে দেখে, কয়েকজন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আর নড়ে না। কুকুর দুইয়ের বদলে চার। শুধু ল্যাজ নাড়ছে না, নিজেদের মধ্যে একটু গোড়ানিও হচ্ছে। সিঁড়ির আশে পাশের মাহুবেয়া ঘেন একটু কাছে এগিয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে দেখে, আমার হাত আর মূখ অনড়। রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হল শ্রাম ?'

আমি বিধা না করেই বললাম, 'রঞ্জিতা, আমি এখানে এভাবে খেতে পারবো না।'

রঞ্জিতা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললো, 'চলো উঠি।'

এবার আমি ওর ব্যাগটা নিলাম। কিন্তু এখানেই বা কোথায় যাবো, কোথায় বসে থাকবো। রঞ্জিতা একটা টাকার সামনে এসে দাঁড়ালো। টাকার ওয়াল ভাকলো 'আইয়ে।'

রঞ্জিতা পুরনো দিল্লীর একটা জায়গার নাম করলো। তারপরে টাকার উঠতে গিয়ে টলে গেল। পড়ে যাচ্ছিল। তার আগেই ওকে আমি ধরে কেঁললাম। ও একটু লজ্জিত হেসে বললো, 'হুঃখিত শ্রাম, নীট পানটা একটু বেশি হয়েছে বোধহয়।'

বোধহয় না, নিশ্চিত। আমি ওকে টাকার উঠতে সাহায্য করলাম। তারপরে নিজে উঠলাম। ব্যাগটা রাখলাম নীটের ওপরই। টাকা চলতে আরম্ভ করলো। রঞ্জিতা একটা কাবাব আমার মুখের সামনে তুলে ধরলো। খোলা টাকা এখনো আমাদের অনেকেই দেখছে। আমি হাত দিয়ে নিতে গেলাম। ও বললো, 'না, আমার হাত থেকে একটু থাও।'

আমি ওর চোখের দিকে দেখলাম। এখন ওর চোখে অলস মূখ কটাক্ষ।

ঠোঁটের হাসি জলন্ত অঙ্গারের মতো। নারীর এই রূপ—কী বলবো, একদিক থেকে ভয়ংকরী। ও আমার ঠোঁটে কাবাব ছোঁয়ালো। আমাকে মুখ খুলে নিতেই হল, তারপরে হাতে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?’

রঞ্জিতা খেতে খেতেই বললো, ‘একটা বাড়িতে।’

বললাম, ‘বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই।’

রঞ্জিতা অলস ভাবে ঘাড় কাত করে বললো, ‘আমার বেজে গিয়েছে।’

টান্ডার দোলায় ওর গোলাপী আঁচল খসে গিয়েছে। গোলাপী জামার থেকে ওর গায়ের রঙ উজ্জ্বল। শাড়ির লাল পাড় রক্তের দাগের মতো এঁকে-বঁেকে, কোলের কাছে, টান্ডার সীটে পড়ে আছে। ও কি খাচ্ছে? যেন অন্তরমনে চিবিয়ে চলেছে। আর আমার চোখের দিকে চেয়ে হাসছে। কিন্তু এই গরম বড় কাবাবের খাদ আমার বেশ ভালোই লাগছে। আমরা এখন যে রাস্তা দিয়ে চলেছি, জুমা মসজিদ অঞ্চলের মতো ভিড় ভারাক্রান্ত না। লোকজন বেশ কম। নতুন দিল্লীর মতো আলোকিত রাস্তা না। ছোট রাস্তা, শিথিল বাড়ি।

রঞ্জিতা কিছুই দিয়ে, আমার কাঁধ স্পর্শ করে বললো, ‘শ্রাম তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি?’

অস্বস্তি স্বস্তি পাচ্ছি না। বললাম, ‘না।’

‘এটাও সত্যি কথা তো?’

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। ও বললো, ‘এটা নিয়তি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে একটু কষ্ট দেব। চিরদিন তো দেব না।’

চোখ বুজে হাসলো। আবার বললো, ‘শ্রাম তোমার মাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে। বেঁচে আছেন?’

অবাক হয়ে বললাম, ‘আছেন, কেন?’

রঞ্জিতা প্রায় চুপি চুপি বললো, ‘তোমার মা বলে।’

ওর ঘাড় আর মাথা দুলে উঠলো, খুঁকে পড়লো। ধরবো কী না ভাবছি। ঈশ্বর আমার দৃষ্টিকে মাহুঘের সকল মোহমুগ্ধতা দিয়ে তৈরি করেছেন। আমি ওর দিকে যেন তাকাতে পারছি না।

তবু ওকে কাঁধে হাত দিয়ে টেনে, সোজা করে বসিয়েছিলাম। ও আমার গায়ের কাছে হেলে পড়লো। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, এক জায়গায় টান্ডা দাঁড়

করাতে বললো। টাঙ্কাতে বসেই ব্যাগ খুলে, একটা ক্রমাল বের করে, আমাকে হাত মুছে নিতে বললো। বললাম, ‘আমার ক্রমাল আছে।’

‘কিন্তু আমার ক্রমালটাই তোমাকে মুছতে দিয়েছি।’ বলে ও টাঙ্কাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। নিজে হাত মুছলো। পাতাগুলো ফেলে দিল রাস্তায়। টাঙ্কাওয়ালা রঞ্জিতাকে প্রায় হাঁ করে দেখছে। রঞ্জিতা বুকের কাছে আঁচলটা ধরে, ব্যাগ নিয়ে নামতে উদ্ভত হল। আমি প্রস্তুত থাকলাম, পড়ে গেলে যেন ধরতে পারি। কিন্তু সাবধানেই নামলো। আমি নামতে, কয়েক পা এগিয়ে, আর একটা আরো ছোট রাস্তায় ঢুকলো। খানিকটা গিয়ে, বায়ান্দায় উঠে, একটি বাড়ির দরজায় করাঘাত করলো। কার বাড়ি কে থাকে, কিছুই জানি না। সঙ্গে এই নারী, আমি এক অপরিচিত বাঙালী।

দরজা খুলে গেল। সামনেই এক যুবক, মেদবর্জিত দীর্ঘ কর্সা চেহারা। পায়জামা আর গেঞ্জি পরণে। তীক্ষ্ণ নাসা, দীর্ঘ পিঙ্গল নাভিদীর্ঘ চোখ। রঞ্জিতাকে দেখেই দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিল। হেসে বললো, ‘ওহ রঞ্জিতা?’

রঞ্জিতা হেসেই বললো, ‘অসুবিধা করলাম?’

হিন্দীতেই যুবক জবাব দিল, ‘ছেলেমানুষি করো না, এসো।’

আমার দিকে একবার দেখলো। রঞ্জিতা আমার হাত ধরে, ঘরের মধ্যে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো, ‘গৃহকর্ত্তা কোথায়?’

যুবক জবাব দিল, ‘মা নিজের ঘরেই আছে।’

‘সেখানে কেউ আছে?’

‘মি: গণ্ড আছে।’

‘উনকি বিজনেস পার্টনার? এত রাতেও! আজ থেকে যাবেন বুঝি?’

‘না না, এখুনি চলে যাবেন?’

‘তোমার বিবি?’

‘খাচ্ছে।’

‘আর ললিতা? ও নিশ্চয় কোথাও কোনো পার্টিতে গেছে?’

যুবক কোনো জবাব দিল না, হাসলো। রঞ্জিতাও একটু হাসলো। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করলো, ‘জয়শংকর বোধহয় ঘুমোচ্ছে?’

যুবক বললো, ‘হাঁ।’

এ সময়েই এক স্টেড বুটেড মানববয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন মহিলাও এ-ঘরে এলেন। মহিলার কপালের সামনেই, কানের রগের কাছে চুল কিছু সাদা হয়েছে। কিন্তু তার উজ্জল বর্ণ এবং স্বাস্থ্য দেখে, মনে হয় যুবতী।

মাথায় বড় খোঁপা বেঁধেছেন। চোখে ঠোঁটে বড়। তিনি বলে উঠলেন, ‘আহ হা বিবিজী যে? এত রাতে কোথা থেকে?’

দেখছি, রঞ্জিতার ঠোট যেন বিজ্রপে বেকে উঠেছে। বললো, ‘আমার মেহুমানকে নিয়ে একটু জল পান করতে এলাম। আমবা তৃষ্ণার্ত।’

ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘গ্নেন জলের তৃষ্ণা?’

রঞ্জিতা ভুরু কঁপিয়ে বললো, ‘পুরোপুরি নয়।’

ভদ্রলোক যেন বিব্রত, এবং খানিকটা অস্বস্তিতে বললো, ‘আমি আর দেরি করবো না, চলি।’

বলে বিদায় নিলেন। যুবক দরজা বন্ধ করে দিল। মহিলা বললেন রঞ্জিতাকে, ‘বসো।’ আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইনি কে?’

রঞ্জিতা বললো, ‘বললাম তো, আমার মেহুমান।’

আমার দিকে ফিরে, ইংরেজিতে বললো, ‘শ্যাম, এই আমার মা। ইনি চেয়েছিলেন, আমি হব দিল্লীর সেরা কল্ গার্ল। যতো দেশী আর বিদেশী রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করবো।’

মহিলা হেসেই বলে উঠলেন, ‘কী হচ্ছে রঞ্জিতা, বাজে কথা বলো না।’

রঞ্জিতা সে কথায় কান না দিয়ে বললো, ‘আমার ছোট বোন ললিতা এখন প্রায় তা-ই।’ ওর মায়ের মুখের হাসিটা বোধহয়, সবটা হাসি না। আবার বলে উঠলেন, ‘যা তা বকছো। বোধহয় অনেক টেনে এসেছ?’

রঞ্জিতা ঘাড় নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললো, ‘তুমিও কিছু কম গিয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না।’

মা মেয়ের এরকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নই। সংকোচ এবং লজ্জা দুই-ই লাগছে। ওর মা আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, ‘বহ্নন।’

দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম। বললাম, ‘আপনি বহ্নন।’

এ সময়েই ভৃত্য শ্রেণীর একটি ছেলে, দ্রৈতে করে দু’গেলাস জল নিয়ে এল। রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করলো, ‘কে জল দিতে বললো রে, বড়া ‘ভাইয়া?’

ছেলেটি হেসে ঘাড় নাড়লো। একটা গেলাস তুলে রঞ্জিতা আমাকে দিল। তারপর ব্যাগে হাত দিয়ে, দ্রুত রামের বোতল বের করে, আর একটা গেলাসের জলে ঢাললো। আমি গেলাসে মুখ লাগিয়ে, ওর দিকে তাকলাম। ও চোখের তারা কঁপিয়ে ঘাড় হুলিয়ে বললো, ‘লিটল মোর।’

বলে এক চুমুকেই গেলাস শূন্য করলো। নামিয়ে দিল ট্রে-তে। আমিও আমার গেলাস দিয়ে দিলাম।

রঞ্জিতার মা, রঞ্জিতার একটি হাত ধরে বললেন, 'তোমার মেহমানকে দিলে না?'

'না।' রঞ্জিতা আমার দিকে তাকালো। ওর মা বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। তোমার মেহমানকেও বলতে বলে। ঠর কোনো পরিচয় তো দিলে না।'

রঞ্জিতা বললো, 'ওর পরিচয় থাক, কেন না, কী বলে ওর পরিচয় দেব সে কথা আমি ঠিক জানি না।'

রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে হাসলো, তারপরেই ওর ঘাড় হুয়ে পড়লো। চুল এলিয়ে পড়লো, আঁচল খসে গেল। ওর মা ওকে ধরে, চেয়ারের কাছে টেনে নিয়ে গেলেন। রঞ্জিতা মায়ের হাত ছাড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে ডাকলো, 'শ্রাম, পাঁচ মিনিট বসো।'

তা বসবো, কিন্তু রঞ্জিতার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ওকে আর হুহু দেখাচ্ছে না। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ও পাশের চেয়ারে বসলো। লুটানো আঁচল তুলে নিল না। ব্যাগটা রেখে দিল মেঝের। আমার দিকে কাত হয়ে পড়ে বললো, 'শ্রাম, তবু একটা কথা আছে। বেঁচে থাকাটা যদি খুবই প্রয়োজনীয় হয়, তবে বলবো, আমার এই বিধবা মা, আমাদের ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এমনকি লেথাপড়াও শিখিয়েছিল, কিন্তু—কিন্তু—'

কথা বন্ধ হয়ে গেল। ও মাথা নিচু করে নিল। প্রায় আমার বুকের কাছে ওর মাথা হুয়ে এল। আমি ওর মায়ের দিকে তাকালাম। ওর মায়ের মুখে হাসি, একটু করুণ। একবার আস্তে মাথা নাড়লেন, রঞ্জিতার দিকে ফিরে ডাকলেন, 'রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা অলিত ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'উচিত হয় নি মা, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তোমার উচিত হয়নি।'

বলতে বলতেই ওর শরীর কঁপে কঁপে ফুলে ফুলে উঠলো। শক্ত মুষ্টিতে, আমার একটা হাত চেপে ধরলো। কী করা উচিত, বুঝতে পারছি না। তবু আমি একটা হাত আস্তে আস্তে ওর মাথায় রাখলাম। মনে হয়, এ কামার মধ্যে, বাধা এবং পানিয়ের ক্রিয়া, দুই-ই আছে। লীলাকেও কঁাদতে দেখেছি, কয়েক বন্ট। আগে। ওর মা পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ওরকম করো না, একটু

শান্ত হও।' কিন্তু রঞ্জিতা সহজে শান্ত হতে পারলো না। অনেকক্ষণ পরে, আন্তে আন্তে ওর শরীর চেয়ারের হাতলে এলিয়ে পড়লো। ওকে নিশ্চেষ্ট দেখালো। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাড়ে বারোটা। ওর মায়ের দিকে ফিরে বললাম, 'ও আজ আপনার এখানেই থাক। আমাকে হোটেলের ফিরে যেতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতা খাড়া হয়ে বসবার চেষ্টা করলো। আমার বুকের জামা ধরে, মাথা নেড়ে বললো, 'না না শ্রাম, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

ওর কথা ধীর, স্বরে যেন নিঃশ্বাসের কষ্ট। চোখ টকটকে লাল, ভেজা। কপালের সিঁদুরের ফোঁটা গিয়েছে বঁকে। বললাম, 'রঞ্জিতা এ অবস্থায় তুমি যেও না। রাত্রে এখানে ঘুমোও, কাল সকালে যেও।'

'আমাকে তুমি বইতে পারবে না?'

'এটা বহন করার কথা নয়, তোমার শরীরের কথা।'

ও ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকালো। ভালো করে দেখতে চাইলো আমার চোখের দিকে। বললো, 'রাগ করছো না, আমাকে ঘৃণা করছো না?'

বললাম, 'কোনো কারণ নেই তার।,

'আবার কাল দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে?'

এই মুহূর্তে এখন সত্যি বলছি কি মিথ্যা বলছি জানি না। বললাম, 'হ্যাঁ, দিয়ে যাচ্ছি।'

ও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। আমি বারণ করলাম, ওকে বসিয়ে দিলাম। ওর মা তাড়াতাড়ি চাকরকে ডেকে ট্যাকসি ডাকতে বললেন। এখানে বোধহয় টেলিফোন করে ডাকার সুবিধা নেই। আমি বললাম, 'কোনো দরকার নেই, আমি দেখে নেব।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতে গেলাম। রঞ্জিতা হাত চেপে ধরে বললো, 'শ্রাম অপরাধ নিও না, কথা রেখো।'

বললাম, 'ঠিক আছে।'

ওর মা দরজা খুলে দিলেন, বললেন, 'তবু চাকর আপনার সঙ্গে যাক, ও আপনাকে ট্যাকসি ধরিয়ে দিয়ে আসবে।'

অগত্যা। রঞ্জিতা আন্তে আন্তে আমার হাত ছেড়ে দিল। তাকিয়ে রইলো। আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। চাকর সঙ্গে এল। সুবিধাই হল। এত রাত্রে, একটা অজ্ঞকার গলির মুখে, প্রায় লুকিয়ে থাকা একটা ট্যাকসি ও আবিষ্কার করে, আমাকে তুলে দিল। ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে বিদায়

করলাম। তারপরে.....তারপরে চলো এবার নির্বাসিত। স্ববন্ধু তুমি আমাকে কোন লগ্নে দেখতে পেয়েছিল।.....

রঞ্জিতাকে মিথ্যা বলেছিলাম কিংবা সত্যি বলেছিলাম, এখন আর জানি না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়নি। স্ববন্ধুকে সমস্ত কথাই বলেছি। ওর কথা, আপনার নির্বাসনের চেয়ে, কারোকে যদি একটু শাস্তি দিতে পারেন, তা-ই দিন না।’

ওর চোখে হাসির ঝলক ছিল, মুখের হাসিতে বিষণ্ণতাও ছিল। দিন দশেকের মধ্যে রঞ্জিতা প্রতিদিনই এসেছে। কয়েকবার সঙ্গে করে লীলা ভোরা আর অম্বিকা শ্রেষ্ঠা নামে ওর এক নেপালী বান্ধবীকেও নিয়ে এসেছে। লীলা বা অম্বিকা ওরা কেউ বিবাহিতা না। রঞ্জিতা বিবাহিতা, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি। রঞ্জিতাকে ছাড়া ওরা চলতে পারে না। অম্বিকাকে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি। যদিও স্বরা পানে ওরা তিন বন্ধুই সমান। বরং লীলা একটু কম। খুব বেশি সহ করতে পারে না। একটা সময় আসে, ও যখন কেবল উহু’ গজল গায়। সব গানই দুঃখ শোক আর বিরহের। রঞ্জিতা আমাকে সেই সব গানের মানে বলে দেয়। উহু’ ভাষা মনে করে রাখি, তেমন স্বত্বশক্তি আমার নেই। মানে শুনে বুঝতে পারি, সে সব গানের ভাষা যেমন সুন্দর, তেমনি গভীর অর্থব্যঞ্জক। সেই গান শুনে শুনে, রঞ্জিতা উচ্ছ্বাসে আবেগে অনেক সময় লীলার গালে চুমোও খেয়েছে।

একটা হোটেলের নাম আমি করতে চাই না। কেন না, সেখানে সবাইকে মস্ত পরিবেশন করা হয় না, কিন্তু এসুপ্রেস্তো বার-এ, রঞ্জিতার তুক-এ পানীয় পরিবেশিত হয়েছিল। বিদেশীরা অবিশ্রিত তাদের নথিপত্রের জোরে সেখানে পান করছিল। লীলা গলা খুলে অনায়াসে সেখানে গজল গেয়ে উঠেছিল। প্রথমে রঞ্জিতাই, তালে তালে হাততালি দিয়েছিল। তারপরে, গোরা গোরা যুবক যুবতীরা সবাই মিলে তালে তালে হাততালি দিতে আরম্ভ করেছিল। সে দৃশ্য একদিক থেকে যেমন কৌতুককর, অন্য দিকে তেমনি একটা পাগলাগারদ বলে মনে হচ্ছিল। স্বভাবতঃই হোটেলের কর্তৃপক্ষের লোককে ছুটে আসতে হয়েছিল। সে বেচারি খানিকক্ষণ সকলের পাগলামি দেখে, কীভাবে ধামাবে, বুঝতে পারছিল না। তারপরে আঙুটে আঙুটে লীলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিচু হয়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, ‘ম্যাডাম, অল্পগ্রহ করে, ধামুন, হয়তো কেউ কেউ বিরক্ত হচ্ছেন।’

লীলা গান ধারিয়ে আরক্ত ভেজা চোখ মেলে বলেছিল, ‘তাই নাকি ? তাহলে আর গাইবো না ।’

কিন্তু বিদেশী যুবক যুবতীরা আরো জোরে হাততালি দিলে, লীলাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছিল। কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি কর্মচারী সবাইকে অহুন্নয় করে বলেছিল, ‘আপনারা অন্তর্দেহ কথা ভাবুন, এ ঘরের মর্যাদা রক্ষা করুন ।’

তারপরে আন্তে আন্তে সবাই ধেমেলিল। না থামা পর্বত আশি মনে মনে প্রমোদ গণহিলার। আশি পাগল হতে পারিনি। তবুটা বেশি, প্রবাস্ত কন ছিল। তারপরেও তিনটি টলানমান যুবতীকে নিয়ে, সেখান থেকে বেগিয়ে আসার সময়, লবির সমস্ত মহিলা পুরুষ যেন একটা অভিনব মিছিল বেধেছিল। তখন যতো লজ্জা এই পুরুষের, সঙ্গিনীদের কোনো দিকেই ভ্রক্ষেপ ছিল না।

রঞ্জিতার মুখে আরো শুনেছি, স্বয়ং অধ্যাপক রিজ্জি লীলা ভোরার উদ্দ’ গজল শুনতে ভালোবাসেন।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। লীলাকে প্রায়ই কাঁদতে দেখেছি। রঞ্জিতার মুখেই শুনেছি, লীলা এক ব্যর্থ প্রেমিকা। একদা যে পুরুষ শুকে এই দিল্লীর পথে পথে বুক করে নিয়ে ঘুরেছে, সেই পুরুষই এখন আর একজনকে নিয়ে ভেতনি করেই ঘুরে বেড়ায়। আর তা লীলা ভোরার চোখের সামনে দিয়েই। বলা যায়, দিল্লীর রাজপথ দিয়ে না, লীলার বুক খুঁড়ে। লীলার অপরাধ ?

রঞ্জিতা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, খাড় কাঁদ করে বলেছিল, ‘এ কথা জিজ্ঞেস করছে কালকূট ? কে কার বুক থেকে কার বুক চলে যায়, তার কার্য কারণ কি অপরাধ ? কোনো অপরাধের নিরীখে কি তার বিচার করা যায় ?’

আমাকে ঘুরিয়ে বলতে হয়েছিল, ‘তবু হুঃখটাকে তো তোলা যায় না ।’

রঞ্জিতা বলেছিল, ‘কালকূট কি জানে না, হুঃখ অমর ?’

জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কিন্তু লীলা ?’

রঞ্জিতা জবাব দিয়েছিল, ‘প্রতি রাজের কান্না, প্রতি রাজের মৃতি। এ কান্না কোনোদিন শেষ হবে না, হয় না ।’

রঞ্জিতার কথা থেকে লীলাকে এইটুকু বুকেছি। আর বুকেছি, জীবনের হাসি মুখে, কোথায় যে সেই রেখাটি লুকিয়ে আছে, যখন সে হঠাৎ নিষ্ঠুরের মতো বক্র হয়ে, বজ্রে বাজে। দেখা যায় না, জানা যায় না।

অধিকাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি, কিন্তু হিমালয় কন্তাটিকে হুঁসতে

দেখেছি। রঞ্জিতার মধ্যেও আর্দ্রতা দেখেছি। অধিকার মধ্যে তাও নেই। সে যেন মেয়ে দুর্বাঙ্গ। রাগে তো বটেই, হালিতেও। ওর এক কথা, ‘পুরুষদের চিনি।’

যথা? অধিকা শরীর কাঁপানো বাঁকানো বিদেশী নাচের ছন্দ তুলে বলে, ‘লে লে বাবু দো আনা। পুরুষরা তো আমাদের শুধু এভাবে বিক্রি করন্তেই চেয়েছে!’

রঞ্জিতার মুখে শুনেছি, অধিকার জীবনটা দুর্ভাগ্যের। ও কারোকে কখনো ভালোবাসেনি, কিন্তু ওদের গোটা পরিবারটা নিয়ে অভিজ্ঞাত বংশের লোকেরা ছিনিমিনি খেলেছে। অধিকার মা, মাসী এবং বোনরা, কেউ কখনো স্বস্থ জীবন যাপনের সুযোগ পায়নি। অধিকা নেপালে ছেলেবেলা থেকেই এসব দেখেছে, নিজেরও বড় হয়েছে সেই পরিবেশের মধ্যে। দিল্লীতে এসে অধিকা অল্প শ্রোতে বহেনি, নিজের শ্রোতেই ভেসেছে।

ভাবি, এ বিদ্রোহে ক্ষতি কার?

আমার ধারণা ওরা জানে, ক্ষতি কার। কারণ ওরা জানে, জীবন অর্থহীন। ওদের তিনজনের মধ্যে, ছাঁচে মেলানো মিল না থাকলেও, কোথাও একটা মিল আছে। প্রতিবাদ ওদের শরীর মনকে আঁকড়ে আছে। কেবল রঞ্জিতার মুখেই শুনেছি, ও তুল প্রতিবাদ করেছে। শুধাপি, অন্তর্বাঁস পোড়ানোর কথাটা ভোলা যায় না।

একদিন ওরা তিনজনেই ছিল, সেদিন হৃদয়নাথ এসে পড়েছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পালিয়েছিলেন। লীলা ভোরা গুঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘মি: অধিকারী, আমাদের সকলেরই মরে যাওয়া উচিত কী না?’

হৃদয়নাথ হেসে বলেছিলেন, ‘আমরা সকলেই একদিন মরবো।’

প্রশ্ন, ‘তাহলে জন্মাবার দরকার কী ছিল?’

জবাব, ‘মরবার জন্মই।’

প্রশ্ন, ‘তবে এ বৈচে থাকার মূল্য কী?’ হেসে জবাব, ‘তোমার মতো বাচাল প্রফেসর মেয়ে তা কোনোদিনই বুঝবে না।’ বলেই উঠে পড়েছিলেন, আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। লীলা আর অধিকা খুব হেসেছিল। আমি হাসতে পারিনি। রঞ্জিতা বন্ধুদের বলেছিল, ‘তোমরা জানো না, মি: অধিকারী আমার ওপরেই বেশি রেগে গেলেন। ভাববেন গুঁকে ভাগাবার জন্মই এসব কথা বলা হল।’

রঞ্জিতার সাথীদের সে রকম দুট চিন্তা ছিল কী না আমি ঠিক জানি না।

হেনা ওর মায়ের অস্থখের জন্য তিন চার দিন আসতে পাবেনি। টেলিফোন করেছে, তারপরে আবার যোজাই আসছে। সৌভাগ্য, ওর সঙ্গে একদিনও রঞ্জিতার দেখা হয়নি। অথচ কোনো লুকোচুরি নাটকীয় খেলার কথা ভাবিনি। তার জন্য একদিকে আমার বিব্রত লজ্জা, আর একদিকে আমার স্বেচ্ছা নির্বাসন গিয়েছে রসাতলে। আমার ঘরে রঞ্জিতা হেনার দেখা হয়ে যাওয়াটা এখন আমার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। যদিও এই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার দায় আমার থাকবার কথা না। এর মূলে রয়েছে হেনার বিরাগ বিদ্বেষ, তারো বেশি কিছু, ঘৃণা। কিন্তু রঞ্জিতার মুখে হেনার কথা কখনো শুনিনি। তবে ওদের মধ্যে পরিচয় আছে, সেটা জানি। হেনার দিক থেকে সে পরিচয় তিক্ত।

তথাপি একটি কথা আমার মনে হয়েছে। ওদের ছু'জনের মধ্যে কোথায় একটা মিল আছে। বিজ্রোহ ওদের ছু'জনের মধ্যেই আছে। যদিও চরিত্রের দিক থেকে, হেনা অন্তর্মুখী, রঞ্জিতা বহুমুখী। সেটা হয়তো ওদের জীবন ধারণের পার্থক্য, পরিবেশের বিভিন্নতা, সমাজ ও পারিবারিক ছকের তক্তাত। সম্ভবতঃ বাঙলা আর সিঙ্গুর চেহারার অমিলটাও আছে।

সেটাকে কেমন করে বুঝিয়ে বলা যায়? রঞ্জিতা অন্তর্বাস পোড়ায় দিবালোকে রাজপথে দাঁড়িয়ে। হেনা পোড়ায় মনে মনে। কিন্তু মনের ইচ্ছাকে ও রাজপথে সকলের চোখের সামনে টেনে নিয়ে যেতে চায় না। ও জীবনকে অর্থহীন মনে করে না, কিন্তু নতুন মূল্যবোধের মাপকাঠিতে যাচাই করতে চায়।

মতিমহলে খেতে গিয়ে, আমার কাছে ওর যে সব প্রশ্নের উল্লেখ করেছিল, পরে একদিন, সেইসব প্রশ্নেরই জবাব আমি দিয়েছি। কেবল একটি অল্পরোধ করেছি, ও যেন পত্রিকার ছাপবার সাক্ষাৎকার হিসাবে আমার জবাবগুলো না নেয়। হেনা আমার কাছে কী চেয়েছে জানি না। একটা দিন ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি ওর সঙ্গে আমি ঘুরেছি। সেই ঘোরাটা অল্প কিছুতে না, টাঙ্কায় করে। টাঙ্কায় করে ওর সঙ্গে ঘুরেছি হাউজ থাশ্-এর ভাঙাচোরা মূল ইमारতের ছায়ায় ছায়ায়, প্রান্তরে দূরে গাছতলায়। সেখান থেকে কুতব মিনার। কুতব মিনার থেকে ওর যাবার ইচ্ছা ছিল তুঘলকাবাদ। টাঙ্কায় এতদূর যাওয়া সম্ভব হয়নি, বিশেষ করে এক দিনের মধ্যে।

অস্বীকার করবো না, সেই টাঙ্কা ভ্রমণ আমার ভালো লেগেছিল। মাঝে

স্নানার্থে টাঙ্গা থেকে আমাদের নামতে হয়েছে কোনো ভাড়া ইয়ারতের ছায়ায়, স্নানের ঘরে গাছতলায়। বোড়ার বিজ্ঞান এবং খাবার অস্ত্র। আমরা খেয়েছি পথে পথে, যখন বা পেয়েছি। গোটা একটা দিনের মধ্যে, হেনার অনেক জিজ্ঞাসা ছিল। সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে, আমি সংকোচে ধমকে গিয়েছি। হেনার ভায়লী মুখে লজ্জার ছটা লেগে গিয়েছে। তবু ওর লজ্জা চলকানো চোখ থেকে প্রায় অশ্লারিত হয়নি। বতগুলো চিঠি ও আমাকে লিখেছিল, অথচ জবাব পায়নি, তার আন্তর্য্য বিবরণ আমি শুনেছি।

চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে, হেনাকে কখনো দেখেছি লজ্জা বিধুর বোড়ারময়ী। কখনো বা ওর চোখে একটি আবেগের ষোর, হঠাৎ নির্বাক এবং স্থান কাল পাত্র ভুলে যাওয়া আচ্ছন্নতা। কখনো হয়তো হঠাৎ বলে উঠেছে, আমরাই কোনো উপস্থানের নারিকার নাম নিয়ে, ‘সেই মেয়েটিকে আমি হিংসা করি।’

আমি অবাক হয়ে বলেছি, ‘তুমি যার কথা বলছো, শেষ পর্যন্ত সে তো এক দুর্ভাগ্যবতী।’

হেনা বলেছে, ‘তবু সে দুর্ভাগ্যের যাতনার ভিতর দিয়ে, জীবনকে অল্পতব করেছিল।’

‘তুমিও কি জীবনকে অল্পতব করছো না।’

‘এ অল্পভূতি অসার। কিছু না পাওয়া শূন্যতা।’

‘কবিতা তোমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করছে।’

হেনা প্রতিবাদে কংকত হয়ে উঠেছে, ‘না না, নিজেকে পূর্ণ করে তুলি, সেরকম কবিতা আমি লিখতে পারি না। তা ছাড়া—’

একটু থেমে, আবেগ ঘন করে, মাথা নেড়ে বলেছে, ‘কবিতা লিখে আমি পূর্ণ হতে চাই না। আমি রাগের হিসাবে পূর্ণ হাত চাই—আমি একটি মেয়ে, হেনা। হেনা হিসাবে পূর্ণ হতে চাই, আমার মতো করে।’

সারাদিনে হেনা অনেক কথা বলেছে। অনেক জবাব নিয়েছে। বেলা শেষে আমরা যখন কুতব থেকে কিরেছি, তখন হরিরানার শুভ বাতাস দিল্লীতে উড়ে এসে একটু ঠাণ্ডা। আকাশে অস্ত্র ছটা। হেনার ঘাম শুকনো মুখে গুলার ক্ষর। তথাপি সেই মুহূর্তেই শুকে দেখাচ্ছিল অপক্লপ। বারে বারে আমার দিকে দেখছিল, যেন লজ্জায় কিছু বলতে পারছিল না, চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল। তারপরে বলেছিল, ‘আপনার চলে যাবার আগে, একটা কথা বলবো।’

বলোছ, ‘এখনই বলো না।’

হেনা মুখ নিচু করে, ঘাড় নেড়ে বলছে, ‘এখন না। একেবারে শেষ দিন।’
কিন্তু সে কথা আমার আর কোনোদিনই শোনা হয়নি।

ও কয়েকদিন ধরেই বেশ গভীর হয়ে থাকছিল। ওর কালো চোখের তারায়
একটা তীব্র জিজ্ঞাসা আর কোঁতুহল যেন ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। হঠাৎ হঠাৎ
জিজ্ঞেস করেছে, ‘আপনার অজ্ঞাতবাস ভালো কাটছে তো?’

হেসেই বলতে হয়েছে, ‘মন্দ বলবো কেমন করে?’

কিন্তু গতকাল ও একটা কাণ্ড করে গিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করার
পরে, বিকায় নেবার সময়ে, হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, ‘একটা কথা
জিজ্ঞেস করবো?’

‘কল।’

‘আপনার সঙ্গে রক্তিতা রিজ্‌ভির পরিচয় হয়েছে?’

একটু অস্বস্তির ভাব নিয়ে বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘আপনি ওর সঙ্গে হোটেল, রেস্টুরাঁয়, নানান জায়গায় যুরে বেড়াচ্ছেন?’
বলতে বলতে ওর ঠোঁট যেন কঁপে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে বললো তোমাকে, স্ববন্ধু?’

এবার ষট্‌ভই ওর ঠোঁট কাঁপলো, গলার স্বর নিচু আর রুদ্ধ শোনালো। ঘাড়
নেড়ে বললো, ‘না, স্ববন্ধুদা ছাড়াও দিল্লীতে লোক আছে, তাদের চোখ আছে,
তাদের কাছেই নানান কথা শুনেছি। সবশেষে শুনেছি, আমার বাবার মুখে।’

এই পর্যন্ত বলেই, ওর কালো চোখে জল এসে পড়লো। আমি ডাকলাম,
‘হেনা।’

হেনা পিছন ফিরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি ওর পিছনে পিছনে
গেলাম। দেখলুম, করিডর দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমিও যেতে
যেতেই আবার ডাকলাম, ‘হেনা, শোন।’

শুনলো না। করিডরের শেষে পৌঁছে দেখলাম, ও লিফটে উঠে, নিজেই
গেট টেনে দিল। হাত বাড়িয়ে, বোতাম টিপে লিফট নিয়ে নেমে গেল। ও
নাথা নিচু করে ছিল, মুখ দেখতে পাইনি।

চমৎকার আমার নির্বাসনের পালা। ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে বলে
থেকে টেলিফোনের গাইড ভূলে নিয়েছিলাম। ট্রেনের বুকিং-এর নথর বেখে
নাথার চেয়ে আনিরেছিলাম, পরবর্তী রাজধানী এক্সপ্রেসের একটা টিকিট চাই।
সৌভাগ্যবশতই তা পাওয়া গিয়েছে। আগামী পরন্ত আমার নির্বাসনের
খোয়ারির শেষ দিন। বাবার দিন। খবরটা জানালাম শুধু স্ববন্ধুকে। স্ববন্ধু

বারে বারে বললো, ‘রঞ্জিতাকে একটু জানিয়ে যান।’ বলেছি, ‘আপনার এই কথাটা রাখবো না।’

লক্ষ্যাবেলা রঞ্জিতা এল একলা। ওর ইচ্ছা, আজ রাতটা ওর হিপি-হিপিনী বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় কাটাই। বললাম, ‘সারা রাত পারবো না। কিছুক্ষণ।’

‘ও তাতেই রাজী হল। রঞ্জিতাকে দেখলাম, ওর অঙ্গার ঠোটে দিবি গঞ্জিকা সেবন করলো। আমি পারলাম না। ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় বললো, ‘কাল তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় বাবে?’

‘কোথায়?’

‘বাদ্বেল লেক, হরিয়ানায়। বেশি দূরে না, পচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যেই।’

আগামীকাল শেষ দিন, পরন্তু আমার প্রত্যাবর্তন। রঞ্জিতা রিজ্‌ভির এই কথা রেখে যাবো। এই তো শেষ কথা। বললাম, ‘কেমন করে যাবো, কিসে যাবো?’

ও বললো, ‘আমার এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে যাবো। কাল বেলা তিনটেয় যাবো।’ রাজী হয়ে কিরে এলাম। পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় রঞ্জিতা এল। তৈরি ছিলাম বেরিয়ে গেলাম। ওর বন্ধুর গাড়ি, ড্রাইভারও তারই। এক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ত রাজ্যের অস্ত পরিবেশে চলে এলাম। ছোট ছোট টিলা বেষ্টিত, গ্রামীণ জায়গা। গ্রাম দূরে, এদিকটা প্রান্তর। দেখলাম, চারদিকে উঁচু টিলা, আর বাঁধ, মাঝখানে একটা জলাশয়। বাঙলা দেশে এরকম দীঘি এখনো অনেক চোখে পড়ে। এটা আকাবাকা ছড়ানো, প্রাকৃতিক জলাশয়। বিভিন্ন ধরনের কিছু নৌকা রয়েছে বেড়াবার জন্য। একটি উঁচু টিলার ওপরে, বড় একটি গোলঘর, বার-কাম-রেস্তোরাঁ, শীততাপনিয়ন্ত্রিত। সামনে খানিকটা সবুজ ঘাস, বাগান। স্বরনার উৎস মুখে জল স্বরছে। হরিয়ানায় পাবলিক বার থাকার অহুমতি আছে। রঞ্জিতা মীনের মতো, ওপরের জলের দিকে ছুটলো। বললো, ‘বড় পিপাসা, আগে একটু জল পান করে নিই।’

‘কী জল, তা জানি। কিন্তু জায়গাটা সুন্দর, ভালো লাগছে। বোদের উদ্ভাপণও কম। জিড় মোটেই নেই। রঞ্জিতার মুখেই শোনা গেল, রবিবারে নাকি মেলা লেগে যায়। টিলার উপরে উঠে, গোলঘরে ঢুকে দেখলাম, ঠাণ্ডা বেসিন চলছে না। খুব গরমও লাগছে না। এতবড় ঘর, অনেক টেবিল চেয়ার কিন্তু খরিকার প্রায় নেই। এক পাশে, লম্বা টেবিলের ধারে, সোফার ওপরে

একটি দল বসে আছে। প্রায় সাত-আটজন যুবক-যুবতী। তাদের পোশাক অত্যাধুনিক। সকলেই পানীয় নিয়ে বসেছে।

রঞ্জিতা আজ র সিকের গাঢ় রঙের লুঙ্গির ওপরে, একটা হাত-কাটা ছাপানো জ্যাকেট পরে এসেছে। আর সব সাজ যেমন তেমনই। আমরা গিয়ে বসতে, বেয়ারা এগিয়ে এল। রঞ্জিতা বললো, ‘পহুলে ঠাণ্ডা পানী, উস্কে বাদ বীয়ার।’

যাক, এই প্রথম, খানিকটা অস্ত্র ধরনের পানীয়র করা ওর মুখে শুনলাম। তীব্র স্বাদ ছাড়া—আগে কখনো পান করতে দেখিনি। বেয়ারা জল বীয়ার বরফ সব এক সঙ্গেই নিয়ে এল। বীয়ারের জুটো গেলাসে বীয়ার ঢাললো। আমি বললাম, আমি কিন্তু মোটেই তৃষ্ণার্ত নই।’

রঞ্জিতা চোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে বললো, ‘জানি তুমি মকতুমির উট। বিশেষ করে আমি কাছে থাকলে ভোয়ার এ সবের তৃষ্ণা একদম ঘুচে যায়।’

রঞ্জিতার কথা মধ্যো কি অস্ত্র কোনো অর্থ রয়েছে। ও কাছে থাকলে আমার এ সবের তৃষ্ণা ঘুচে যায়, তার কারণ কি, আমার তৃষ্ণা মিটে যায়? প্রশ্ন করতে পারবো না, কথা কোন্ দিকে বইবে, বলতে পারি না। যদিও আগের ভুলনায় ওর কাছে আমি এখন অনেকখানি সহজ। ওর সবটুকু বুঝি বা বুঝেছি তা বলতে পারবো না। কিছুটা বুঝেছি। জীবনটা ওর নানান ধাঁধার জট পাকিয়েছে, ছেলেবেলা থেকেই। পারিবারিক জীবনটা খুব স্বস্থ ছিল না। অথচ মায়ের জবরদস্ত একটা পরিচালনা ছিল, যার সঙ্গে ওর ছেলেবেলা থেকে বিরোধ, কিন্তু লড়ে উঠতে পারিনি। ফলে ভিতরে ভিতরে দানা বেঁধেছে প্রতিবাদ প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদগুলো ওকে ভাবিয়েছে। তার কারণ ওর ভিতরে প্রতিবাদগুলোর কেবলমাত্র রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না, বেদনাও ছিল। ছেলেবেলা থেকে যে সব অপমান ওকে সহ করতে হয়েছে, তার জন্ত লুকিয়ে অনেক কান্দতে হয়েছে। সেই অপমান, ব্যথা এবং কান্না থেকে যে ভাবনা জন্ম নিয়েছে, পরবর্তী কালে তাই ওর শিল্পসাধনার রূপ। সেখানে ও কতোখানি সার্থক, আমি জানি না। অস্বীকার করবার উপায় নেই, বাইরে থেকে ওকে দেখলে যা মনে হয় তার চেয়ে গভীরতর ওর মনের ভাবনা। অথচ ভুগছে একটা তীব্র অর্থহীনতায়।

তারও কারণ আছে। এই যে ওর অগ্নিনব্বী রূপ, দুঃস্থ বোবন—এসব ওর জীবনের চারপাশে ভেকে নিয়ে এসেছে অনাচারের অঙ্ককার। ওর মা তার জন্ত অনেকখানি দায়ী। অঙ্ককারের পথে তিনি অনেকখানি টেনে নিয়ে গিয়ে-

ছিলেন এবং সেই একান্ত মূঢ় অন্ধকার থেকে রক্তিতা ওর নিজের শক্তিতেই কিয়ে এসেছে। ওর আজকের জীবনটা আলোকবহু তা বলবো না, কিন্তু যে অসহায় মূঢ় অন্ধকারে নারী কেবল একটা শিকার মাত্র, ও তা নয়।

কোনো কোনো রূপ অভিশাপ। রক্তিতার রূপ ওর অভিশাপ। এই রূপ আশুনের মতো। পতঙ্গেরা পুড়ে মরে, কিন্তু মানুষ এই আশুন নিয়ে বোধহয় স্বপ্নের ঘর বাঁধতে ভয় পায়। রক্তিতাকে চেয়েছে অনেকে, কিন্তু যা ও পারনি সেটা ভালবাসা। রেহ ভালবাসা কোনোটাই পারনি। তৃষ্ণা ওর প্রবল। পেতে চাওয়াটা তীব্র। এই না পাওয়াটাই ওর চরিত্রে এনেছে যতো অসাম্য, নানান বিপরীত সংঘর্ষ। অথচ ওর হৃদয় অহলিন, বুদ্ধিতে নীপ্তির খার, অহুভূতি গভীর। ওকে যতটা অসহজ মনে হয় তা নয়। আবার ও-ই অসহজ হয়ে ওঠে অস্ত কক্ষে। প্রথম দিন যে রাতে জুয়া মসজিদে গিয়েছিলাম, আকর্ষণ পান করে যে কবিতা ও আবৃত্তি করেছিল, সে কবিতা ওর নিজেরই সৃষ্টি।

একটুকু থেকে আমি বিড়ম্বিত বোধ করছি, আমার নির্বাসনটাকে ও কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু এখন আর ওকে আমি ভয় পাই না। ভয় ঠিক কখনোই পাইনি, ওর চারিত্রের তীব্রতায় কোন্ অশক্তি আর অশক্তির আবর্তে পড়ে বাবো, সেই একটা আশঙ্কা ছিল। সেটা আমার ভুল। আমার মধ্যে ও যা আবিষ্কার করেছে, সেটা একান্ত ওর। দুঃখ কী, আমি তা জানি, তাই স্ববন্ধুর মতো এখন আমিও বলতে পারি, ও একটি দুঃখী মেয়ে। অস্বীকার করবো না, এই মেয়েটির প্রতি এখন আমার একটি সমতাবোধ, প্রীতি এবং স্নেহের অহুভূতি ভেগে উঠেছে।

হঠাৎ আমি চুপি চুপি স্বর শুনে পেলাম, ‘শ্রাম, শ্রাম, আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি, আমাকে এভাবে ভানিও না।’

আমি অস্বাক হয়ে জিজ্ঞাস করলাম, ‘কী হল?’

রক্তিতা বেন লজ্জায় লাল, ব্রীড়াময়ী হয়ে উঠেছে। বললো, ‘তুমি তো আমার দিকে কখনো এমন নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখনি।’

আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নিজেরই মনে নেই। অকপটেই বললাম, ‘তোমাকে দেখছিলাম, তোমার কথাই ভাবছিলাম।’

ও আমার পাশের চেয়ারে বসেছে। আমার দিকে খুঁকে এসে জিজ্ঞাস করলো, ‘কী ভাবছিলে শ্রাম?’

‘তোমার জীবনটা।’

‘কী দেখতে পেলেন?’

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। এত সহজে কেমন করে সে কথাটা বলি। এক কথাতে কীই বা বলি। সহসা ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। চোখ নামিয়ে নিল। ওর ঠিক এই রূপটা দিল্লীতে কেউ দেখেছে কী। সামনে কেনিলাচ্ছল বীয়ারের পাত্র। অগ্নিধরী রঞ্জিতা লঙ্কার ব্রীড়ারী, আবার পরমুহুর্তেই চোখ ছলছলিয়ে উঠছে, দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে।

আবার চোখ তুলে বললো, ‘তুমি এরকম করে দেখলে আমার চোখে জল আসে।’

‘কেন।’

‘এমন করে যে আমাকে কেউ দেখে না।’ বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, ‘কী দেখলে ভ্রাম বল। আমাকে কী দেখলে?’

বাধা নেড়ে বললাম, ‘না। সুখ। অবৃত।’

‘আহু।’ রঞ্জিতা শব্দ করে চোখ বুজলো। কয়েক পলকের মধ্যেই চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। কিন্তু বলতে পারলাম না, এই সুখ, এই অবৃত রয়েছে বিষের পাত্র। যে বিষের পাত্র এমনি দেখা যায় না, বা ছড়িয়ে আছে এই দিল্লী নগরে, লম্বা পরিবারে। আমি ওকে ভাকলাম, ‘রঞ্জিতা।’

রঞ্জিতা চোখ মেললো। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখের কোণ চেপে মুছলো। তারপরে একটু হেসে বীয়ারের পাত্র তুলে বললো, ‘ভিত্ত তৈরি করা যাক।’

মনে মনে বললাম, ‘শেষ দিনের জন্ত।’ মুখে বললাম, ‘ভিত্ত তৈরি করছো মানে কী, এর পরে—।’

ও বাধা দিয়ে বললো, ‘দেখা যাক না।’

আমরা বসেছি কাচের দেওয়াল বেঁধে। পর্দা সরিয়ে দেখতে পাচ্ছি রৌদ্র-চকিত আকাশের ছায়ার বাদখেল লেকের নীল জল। ওপারে অনেকখানি সবুজ প্রান্তর। ভাইনের টিলাটিও সবুজ।

সুবক সুবতীদের দলটা ক্রমেই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। ছুঁতিনজন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বোধহয় হিন্দী ছবির গান করছে। বাকির শরীর জুলিয়ে টেবিলে চাট মেয়ে তাল দিচ্ছে। আধঘণ্টা না যেতেই রঞ্জিতার বীয়ার শেষ। বেরারাকে ডেকে বইছি চাইলো। আমি বললাম, ‘থাক না, বেশি হয়ে যাবে।’

ও ভর্জনী তুলে বললো, ‘ওনলি ওয়ান।’

এ ব্যাপারে ওকে আমি বিশ্বাস করবো না। ওনলি-ওয়ান কতো ওনলিতে যে গিয়ে দাঁড়াবে, বলার মতো না। ঠিক এ সময়ে এক ব্যক্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। তাঁর মোটা ভুরু কৌচকানো। সাদা কালোর ধূসর চুল উসকো খুসকো। বয়স পঞ্চাশের মতো। ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট গায়ে। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা। হিন্দীতে বা বলে উঠলেন, তার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়, ‘আরে শঠ, প্রবঞ্চক, ভালক, তুই এখানে বসে আছিস, তাও আবার রক্তিতা রিজ্‌ভির সঙ্গে, ঠ্যা ? একি শালা আমি ঠিক দেখছি, না খোয়াব ?’

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘আরে আসুন উপাধ্যায়দা, আপনি এখানে কোথা থেকে ?’

চুল ঝাঁকিয়ে, খাড়া নাক কুঁচকে, তেড়ে বললেন, ‘আমি আসছি জাহাঙ্গীর থেকে। তোকে আমি সত্যি দেখছি কিনা বল।’

হেসে বললাম, ‘নিশ্চয়ই। আমি ভূত নই।’

‘তুই ভূত না, ভূত ভোর থেকে ভালো। তুই আমার হাফ ডজন চিঠির জবাব দিসনি। শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম করলাম, তারও জবাব নেই। আমি তো তেবেছি, তুই মরে গেছিল, একটা মূর্দা।’

রক্তিতা একটা শব্দ করে বললো, ‘এতোটা বলবেন না উপাধ্যায়দা।’

‘আরে বিবিজী, তোমাকে কী বলবো। গেল বছর ও লখনৌতে আমার ওখানে গিয়েছিল। আর ওকে দেখে তুমি বুঝতেই পারছো, তুমি হলে দিল্লীর রক্তিতা রিজ্‌ভি, এ শালা মন কাড়তে ওস্তাদ। আমি তো মরেইছি, আমার বিবি লেড়কীগুলো পর্যন্ত মরেছে।’

রক্তিতা আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার চন্দ্রনাথ উপাধ্যায় হাত তুলে বললেন, ‘আরে না না, শোন, মনে হয়েছিল আমাদের জন্ত ও কী না করতে পারে। মনে হয় ওর সবটা ভালবাসার ভরা। কিন্তু ওর মতো ক্রুয়েল হার্টেড অন্তর আর দেখিনি। আমার বিবি একজন লেখিকা, ওর সমগোত্রের, ও তাকে তাবী বলে, তাকে পর্যন্ত একটা চিঠি লেখেনি। আমার টেলিগ্রামের কোনো জবাব পর্যন্ত দেয়নি। আমি টেলিগ্রাম করতে বাধ্য হয়ে ছিলাম, কেননা ও আমার চিঠিগুলো পাচ্ছে কী না, সেটা জানবার জন্ত।’ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘চিঠিগুলো পেয়েছিলে তো। মিথ্যা বললে লড়ে যাবো।’

বললাম, ‘পেয়েছিলাম দাদা, কিন্তু আমার কথা একটু শুন।’

উপাধ্যায় ধমকে উঠলেন, ‘কোনো কথা শুনতে চাই না। কান মলা দিয়ে বলো অন্তায় হয়েছে।’

আমি একেবারে সোজা হুকানে হাত দিয়ে মলে বললাম, ‘অন্তায় হয়েছে।’

রঞ্জিতা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। হুবাসা দাদা বললেন। অবিশ্বাস মানতেই হবে, আমার দিক থেকে খুবই অন্তায় হয়ে গিয়েছে। যদিও ভাতে কারোর কোনো কাজের ক্ষতি বা অমঙ্গল করিনি। জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে লখনৌতে তাঁর গৃহে আমাকে ষথেষ্ট আদর যত্ন করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী কস্তাদের আমি ভুলিনি, ঠুকে তো নয়-ই। উপাধ্যায় বলবার পরে আমি বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কী নেবেন দাদা?’

উপাধ্যায় একবার রঞ্জিতার পাত্রের দিকে দেখে নিয়ে বললেন, ‘ছইন্ধি।’

বেয়ারাকে ভেকে-ছইন্ধি দিতে বললাম। আজ দেখছি সকলেই রেচকের আকর্ষণ। রঞ্জিতাকে আসে কখনো দেখিনি। বললাম, ‘রঞ্জিতার সঙ্গে আপনার আগে থেকেই পরিচয় আছে দেখছি।’

উপাধ্যায় চোখ বড় করে রঞ্জিতার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘কতো দিন হবে রঞ্জিতা বিবি, চার বছর?’

রঞ্জিতা বললো, ‘ওইরকমই হবে, দিল্লী রেডিওতে।’

উপাধ্যায় গেলাসে চুম্বক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, ‘আরে তোমাকে যে চেনে না, সে দিল্লীর কিছুই চেনে না। এমন একটি মক্ষীরাগী।’

রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। গেলাসে চুম্বক দিল। উপাধ্যায় শুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি একে তেড়ালে কোথা থেকে?’

উপাধ্যায়দার ভাষা একটু এইরকমের, তবু কানে লাগছে। রঞ্জিতা বললো, ‘কলকাতা থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছি।’

উপাধ্যায় এক চোখ বুজে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, ‘আহুহা, তাই বলো। কী ব্যাপার, টি ভি না রেডিও, না জার্নালের সাফাংকার?’

রঞ্জিতা বললো, ‘ওসব কিছুই না!’

উপাধ্যায় আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে, রঞ্জিতাকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, ‘ধরেছ বুঝি?’

রঞ্জিতার মুখ লাল হয়ে উঠলো। মুখের হাসিটা বজায় রেখে বললো, ‘ঠুকে ধরা যাব না।’

‘তোমার মত মেয়ে এ কথা বলছে?’ রঞ্জিতা গেলাসে হৃদীর্ঘ চুম্বক দিল। উপাধ্যায় আবার বললেন, ‘তুমি তো এসব বাজীতে হারো না।’

রজিতার হাসিটা আর তেমন নেই। জিজ্ঞেস করলো, ‘কিসের বাজী?’
আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ‘এসব কথা থাক দাদা, আপনি দিল্লীতে
কবে এলেন বলুন।’

‘আমি চার পাঁচদিন এসেছি, আবার দু’একদিন বাদেই চলে যাবো। আজ
হঠাৎ কী খেয়াল হল, এখানে একলা বেড়াতে চলে এলাম। অবিস্ত্রি ক্যামেরার
কাজ তেমন কিছু নেই এখানে, কিছু স্ট নিয়েছি। কিছু—’

তিনি আবার রজিতার দিকে তাকালেন। বললেন, ‘ব্যাপারটা আমার জানতে
হচ্ছে, তোমরা জোট বাঁধলে কোথা থেকে? সেই জম্মই বলছি, তুমি তো বাজীতে
হারো না। আর কিসের বাজী বলছো বিবিজী? আমি বলছি ধরা ছোঁয়ার
বাজী।’

রজিতা একদৃষ্টে উপাধ্যায় দেখছে। উপাধ্যায়কে আবার বললেন, ‘গোটা
দিল্লী তোমার কটাক্ষে ধরা পড়ে আছে, আর একেই পারছো না।’

রজিতা বললো, ‘না।’

ওর গলায় স্বর গভীর। উপাধ্যায় সেটা খেয়াল করলেন না যেন, বা গায়ে
মাখলেন না। মুখের অন্তত ভঙ্গি করে বললেন, ‘তা হলে বা দিয়ে সবাইকে
মজাচ্ছো, ওকেও তাই দিয়ে মজাও।’

‘সেটা কী?’

উপাধ্যায় রজিতার শরীরের দিকে চেয়ে বললেন, ‘ঘোড়াই জানে, তার বাজীর
আসল জিনিস কী।’

‘স্টুপিড!’ রজিতা চাবুকের শিসের মতো বেজে উঠলো। পরমুহুর্তেই
হাতের গলাসটা মেঝের ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাত বাড়িয়ে টেবিলের বোতল
গলাস সমস্ত মেঝের ছড়িয়ে দিল, চিংকার করে বললো, ‘হু রট্, রাস্কেল,
হোয়াট ডু ইউ থিংক অব মী।’

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো।

রজিতা যেন আগুনের মতো লকলক করছে, কাঁপছে, চোখ মুখ টকটকে
লাল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বেরারারা ছুটে এল। উপাধ্যায় বিমূঢ় কিয়রে
তাকিয়ে আছেন। আমি ডাকলাম, ‘রজিতা।’

রজিতা চোয়াল শক্ত করে চোখ বুজলো। আমি আবার ডাকলাম ওকে।
ও হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর দু’হাত রেখে বুকে মুখ ঝুঁজে দিল। স্বরকর
করে কেঁদে উঠলো, কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলো, ‘একসকিউজ মী ডাদা,
একসকিউজ মী!...’

আমি ওর মাথায় একটা হাত রাখলাম। মূবক মূবতীঘের ওমিক থেকে হালি আর বিল বেজে উঠলো। আমার দুই কানে ঘেন ভালো লেগে গেল। আমি ওদের হিকে কিয়ে তাকালাম না। রক্তিতা আবার বললো ‘ভায়, আমি এখানে আর বসবো না।’

বললাম, ‘ঠিক আছে।’

ইলারায় বেয়ায়াকে ডেকে বিল হিতে বললাম। রক্তিতার ব্যাগটা তুলে, ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, ‘তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আসছি।’

ও ব্যাগ নিয়ে, মাথা নিচু করে গোল ঘরের বাইরে চলে গেল। উপাধ্যায় বিস্মিত আচ্ছন্ন হয়ে বললেন, ‘আমি এটা আশা করতে পারিনি।’

বললাম, ‘ছেড়ে দিন।’

‘ছেড়ে তো নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু রক্তিতা-রিজ্‌তির এতো ভেজ, আমি জানতাম না।’

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। টাকা মিটিয়ে, বললাম, ‘যাচ্ছি উপাধ্যায়দা, পরে দেখা হবে।’

‘কোথায়?’

‘তা জানি না। আমি আগামীকালই চলে যাচ্ছি কলকাতায়।’

বলে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম, রক্তিতা করনা উৎসবের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতে, ও মুখ নামিয়ে রেখে বললো, ‘ভায়, চলো আমরা নৌকায় ভেসে বেড়াই।’

‘চলো।’

বাঁধের নিচে নেমে দেখলাম, নৌকা ভাড়া দেবার জন্য লোক রয়েছে। আমি রক্তিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সাঁতার জানো।’

একটু হাসলো, বললো, ‘না ভুবতে জানি।’

আমরা দু’জনে ছোট টিনের নৌকায় উঠলাম, পাশাপাশি বলে প্যাডেল করলেই নৌকা চালিত হয়, নৌকা চলতে থাকে। দু’জনেই পা চালাতে লাগলাম আস্তে আস্তে। মোদের তাপ কম। জলের বুকে আরো কম। দু’পাশে ছোট ছোট তরঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। একটু আগের ঘটনার উত্তেজনা যেন এই জলের বুকে ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। রক্তিতা গুনগুন করছে, চেনা গান : আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান/তুমি জান নাই, তুমি জান নাই—

ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে গেলাম, সবুজ পাড় ছুঁয়ে আবার মাঝখানে
কিরে এলাম। দূরের টিলায় ছায়া নামছে।

রঞ্জিতা বললো, ‘শ্রাম, এখনো কি আমাকে অমৃত মনে হচ্ছে?’

বললাম, ‘হচ্ছে, তুমি অমৃত।’ এবং এবার বললাম, ‘তুল বুঝো না, কিন্তু
বিষের পাত্রে।’

কথাটা বলতে আমার কণ্ঠ হল। ও আমার চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে
রইলো। তারপরে বললো, ‘তাই বুঝি একটুও গ্রহণ করলে না?’

বলে ও আমার একটা হাত চেপে ধরলো। ওর ঠোট কাঁপা দেখে বুঝতে
পারছি, ওর চোখে জল আসছে। আমি ডাকলাম, ‘রঞ্জিতা!’

রঞ্জিতা মাথা নেড়ে অশ্রুটে বললো, ‘কিছু না।’

তারপর ভেজা চোখ তুলে হেসে বললো, ‘এই মাঝখানে, জল কত গভীর?’
‘মনে হয় অনেক?’

‘তবে ডুবি!’ বলে হালকা টিনের নৌকায় এক পাশে চাপ দিতেই, নৌকা
কাত হয়ে ছড়ছড় করে জলে ঢুকে পড়লো। আমি দু’হাতে ওকে কাছে টেনে
নিয়ে, উদ্বেগে প্রায় চিংকার করে উঠলাম, ‘কী করছো? কী করছো তুমি?’

ও আমার কোলের ওপর মুখ গুঁজে, দু’হাতে আমার কোমর জড়িয়ে
ধরলো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠলো। আসলে উদ্বেজনাতা কি এখনো
ওর মধ্যে বর্তমান? কান্নাটা বুঝি ওর শেষ হয়নি।

আমি ওকে ডাকলাম। ও আন্তে আন্তে মুখ তুললো। চোখের কান্নাল
ধোয়া, চোখ মুখ ভেজা লাল। বললাম, ‘দীন যে কেবল দান করতে পারে না,
তা নয়, গ্রহণের যোগ্যতাও তার নেই। তবু বলি, তোমার কাছ থেকে যা
নেবার তা আমি নিয়েছি।’

ও আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, ‘কী, বিধ?’

‘অমৃত।’ বলতে গিয়ে আমার গলায় যেন ঠেক লাগছে। ওর ভেজা চোখ
ছুটো চিকচিক করছে।

নৌকা বাতাসে ভাসতে লাগলো।

রাজধানী একসুপ্রেসের কামরায় বসে আছি। হুবহু কাছ থেকে টেলি-
ফোনে বিদায় নিয়েছি। বাইরের দিকে তাকিয়ে লোকের আনাগোনা দেখছি।
ভিড় আর ব্যস্ততা। লোকজনের ছুটোছুটি। তার মধ্যেই চোখে পড়লো,

রঞ্জিতা ছুটে প্র্যাটকরমে ঢুকলো। শাড়ি পরা, সিঁথের কপালে সিঁদ্বর। চুলগুলো বেন আলুখালু। কী করে জানলো? স্ববন্ধু? একটি ন্যূনই আমার মনে এল। কিন্তু এই দেখাটা আর আমি করতে চাই না।

একটু পরেই দেখলাম, অ্যান্টনি প্র্যাটকরমে ঢুকলো। ওর গৌণ শাড়ি-ওড়লা মুখে, চোখের কালো চশমায় রঞ্জিতাকে খুঁজে ফেরার উদ্দেশ্যে টের পাওয়া যায়। এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ির কামরার ভিতর থেকে সব দেখা যায়। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। দেখছি রঞ্জিতা, এপার ওপার ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যাত্রী নয় বলে কামরার মধ্যে প্রবেশ নিষেধ। অ্যান্টনি রঞ্জিতাকে দেখতে পেয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছে।

অস্বস্তি বোধ করছি। ঘড়ি দেখলাম। এখনো সাত আট মিনিট বাকী আছে গাড়ি ছাড়তে। অ্যান্টনি চোখ থেকে কালো চশমা খুললো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি চলাচলে বুঝতে পারছি রঞ্জিতা কখন কোন্ দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। কী করবো? হঠাৎ গাড়ির মধ্যে লাউডস্পীকারে আমার নার ধরে সম্বোধন শুনে পেলাম, ‘এত নম্বর কামরা, এত নম্বর সীট, আপনি একবার বাইরে আসুন। মিসেস রঞ্জিতা রিজ্জি আপনায় সঙ্গে দেখা করতে চান।’

এর পরে আর বসে থাকি যায় না। কামরার বাইরে এলাম। রঞ্জিতা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলাম, ও তাকালো, কিছু বলতে পারলো না। ভাকলাম, ‘রঞ্জিতা।’

ওর ঠোঁট কাঁপছে। আশেপাশে অনেক লোক। অ্যান্টনি নিশ্চয় আমাদের দেখছে। রঞ্জিতাকে ও নিয়ে যাবে।

রঞ্জিতা অম্বলুটে বললো, ‘চলে যাচ্ছে? বলোনি কেন?’

বললাম, ‘চলে যাচ্ছি বলে।’

ওর লিঙ্গু চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো, হাসতে চাইলো, বললো, ‘তাহলে তোমাকে চিনেছিলাম ঠিকই।’

‘কে তোমাকে খবর দিল।’

‘স্ববন্ধু।’

জানতাম, স্ববন্ধু শেষ মুহূর্তে না বলে পারবে না। রঞ্জিতাকে ও ভালবাসে, স্নেহ করে। রঞ্জিতার গলা প্রায় রুদ্ধ, তবু বললো, ‘কিন্তু শ্রাম, এ কী রকম করে যাচ্ছে? এমন করে যাচ্ছে কেন?’

বললাম, ‘যেতেই যখন হবে, তখন বোধহয় এমনি করে যাওয়াই ভালো।’

বাইরের বাইক ঘোষণা করলো, প্যালেঞ্জাররা বেন তাদের আসনে গিয়ে বলে। গাড়ি ছাড়বার সময় হল। রক্তিতা আমার দিকে তাকালো, কী বেন বলতে চাইলো। পারলো না। চোখ বুজে গেল। এবার অলংকোচে ওর একটি হাত ধরলাম।

বললাম, 'ঘাচ্ছি।'

ও আমার হাতটা মুঠি পাকিয়ে ধরলো, ছেড়ে দিল। আমি গাড়িতে উঠে আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম। রক্তিতা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ নিচু। দূরে দাঁড়িয়ে অ্যান্টনি ওকে দেখছে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। অ্যান্টনি রক্তিতার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। রক্তিতা চোখ মেলে তাকালো। ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমি পাচ্ছি। মনে হল কলকল করে আমার কোথায় বেন ভেসে যাচ্ছে।...জানি, যতো বিবই থাক। কলকল করে যা তালছে, তা অমৃত। নির্বাসনে এসে অমৃত নিয়ে কিয়ছি। আমার চোখের সামনে, সমুদ্রের ওপরে আকাশ টলমল করছে, একটি মুখ তালছে। অমৃতের মুখ, বিয়ের পাত্রে টলটলানো।

মিটে নাই হুসা

লোকে বলে, ছক ছাড়া তোর নাই রে গতি। সত্যি কি তাই? বাইরে থেকে দেখলে পরে, ছকেই সবার আনাগোনা। মন চলে কোন্ ছকে, কিসের ছকে? বে-ছকে। কিংবা বলি, মন চলে তার নিজের ছকে, যে-ছকেতে নেই বাহ্য জগতের নিয়ম কানুন বিধি নিষেধের নির্দেশ। সে হিসাবে মন কারোর দাস না। যাকে বলে দশের সঙ্গে এক হয়ে মিছিল করে থাকো, মন সেখানে বে-মিছিল।

শুনতে ভারি ভালো লাগে, ‘মোঁমাছি মোঁমাছি, কোথা বাও নাচি নাচি।’ কিন্তু মোঁমাছি জীবনটা কি সুখের? মধুর সঙ্গে যুক্ত বটে, প্রকৃতির এমন লাহুতি পরাধীন বন্দী বোধ হয় আর কেউ নেই। বিদ্রোহী সাহিত্যিক দার্শনিক ভলতেয়ারের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর যে-কথাটি ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, তা হলো ‘ফ্রান্সের জনসাধারণ মোঁমাছি না, তারা ঐশ্বরাত্মিক রাজপরিবারের চাকের জন্ত মধু সংগ্রহের শ্রমিক না।’

মোঁমাছি প্রকৃতির হাতের অঙ্ক ক্রৌড়নক। সে বেঁচে থাকে কেবল মক্ষীরাগীর চাকে মধু সংগ্রহের জন্ত। নির্বীথ সেই পতঙ্গের কোনো সৃষ্টি ক্ষমতা নেই, তার আছে শুধু শ্রম। কথাটা এলো ছক বে-ছকের কথায়। মন যদি জীবনের বাহ্য চলনের ছকে চলতো, তাহলে মানুষকে আর মানুষ বলা যেত কী না সন্দেহ। চলে না বলেই, তার নানা রূপ, নানা ছন্দ। ধন্দ তো লাগেই, কারণ নানা রঙে ভরা। সেই মনকে পাছে কেউ মোঁমাছি বলে রঙ দিতে চায়, তাই মনোবী বাক্য মনে পড়ে গেল। মন মোঁমাছি না, সে অভিলাষ থেকে মনমুক্ত। মানুষ পরাধীন, যে-কোনো তন্ত্রের কাছে, মন স্বাধীন।

কিন্তু কথাটা, মূলে এলো কেন?

রহস্তটা সেইখানে। কথাটা মনে এলো, বানিকটা আত্মবিজ্ঞপের কারণে। এবার কোনো কান্ডে না, অকাজেই চলেছি আরব সাগরের কূলে। কবির কথায় হয়তো অতিশয়োক্তি আছে, তবু কেন জানি না, অনেকবার সেই লবণাক্ত কালকূট (পঞ্চম)—৪

অবুজরাশির ফেনিলোচ্ছল রূপোলি তরঙ্গ দেখে, আকাশের দিকে হাত বাড়ানো তার মাতাল ধ্বনি শুনেও, চোখের তৃপ্তি হলো না। হৃদয় জুড়ানো গেল না।

আত্মার সন্ধানী আমি না, সে যোগ্যতা আমার নেই। আরব সাগরের কুলের আত্মাকে খোঁজা আমার তান লয় মানে নেই। কী তৃষ্ণা সে আমার প্রাণে আগিয়ে রেখেছে আমার চোখের কুলায় হৃদয় মধ্যে। সে নিজেকে আমাকে ডাকে না, ডাক আসে আমার ভিতর থেকে। যে-দেবীর নামে সাগর কুলের নগরের নাম সে-দেবীর বিগ্রহ আমার অচেনা। কিন্তু আমার ভিতরের ডাকটা যে বহুকালের ওপার হতে, তা বুঝতে পারি, কেননা, তার স্বরে স্বরে বিশ্বের নানা ধ্বনি বাজে। সাত সাগর তেরো নদীর স্রোত এসে মিলেছে সেখানে, মহামানবের অনেক খেলা ঘটেছে সেই কূলে, ঘটছে এখনো। তার সাগরদীপের পাথরের গায়ের বিগ্রহে, গুহাগাত্রের নয়ম পাথরের গায়ে বহুকালের ছবিরা সজীব হয়ে নেমে আসে নিচে, নিজেদের বহুযুগের ফেলে আসা জীবন নাট্যের ভূমিকা গ্রহণ করে, আর তারও অনেক পরে, সাগরের অন্ত কুলের মাহুষেরা আসে তার ধর্মের বাণী নিয়ে, আরব-দেশ যার নাম। তখন ইতিহাসের অনিবার্য কারণে, নিরস্ত্র সংগ্রামীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, ঘোষণা করতে হয়, ঈশ্বর এক। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তেত্রিশ কোটির দল ভাগ নেই। বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের ভিন্ন নাম সত্য না, বিভিন্নের জন্মও বিভিন্ন বিগ্রহ নন। সকলের জন্ম এক, তিনি একজন, সমস্ত হিন্দুর তিনিই আরাধ্য, এক ঈশ্বর। সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামীর নাম শকরাচার্য। দক্ষিণ পশ্চিম কূল দিয়েই, আরবরা এসেছিলেন জাতিপাতি বর্ণ ভ্রষ্ট অন্ধকার কূলে। তবে, হয়, সেই যে এক কথা আছে, সর্ষের মত ভূত। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, আর, এক ঈশ্বরের নাম নিয়ে ধারা এসেছিলেন, রাজনীতি তো তাঁদের ছিলই, থাকেই, তার সঙ্গে ছিল, সেই ঈশ্বরের অঙ্কতা, বা একদিক থেকে মুচ, নিঃশব্দ। তার সব কিছু সমর্পিত ধর্মের কাছে, নিঃশব্দ, নিরেট, ইংরেজিতে বলে বুঝি ফ্যানাটিক্স, বিপরীত বলেছি কি, মুগ্ধেছন।

অঙ্কতাকে অঙ্কতা দিয়ে উচ্ছেদ করা যায় না।

তবু হয়, শকরাচার্যের স্লোগান, এ দেশের কোটিকে গোটিক শুনেছিল। আরবরা কিছুটা নিশ্চয় সার্থক হয়েছিলেন, বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী ছবি কি? বেশি দূরে কি যেতে হবে? এই সেদিনও এ দেশের মাটিতে হরিজন পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পত্নীগীজ আরমেনিয়াম ডাচেরা যখন এসেছে, তখন দেখা গিয়েছে, খোদ শকরাচার্যের দেশে, শ্রুতানীর শুনে

আবরণ নিষেধ, ব্রাহ্মণের সামনে। সাবধান, ছায়া যেন স্পর্শ না করে। সে তো প্রায় সারা ভারতের ছবি। তবু রাজশক্তির ভয় ছিল বৈ কী! মুসলমান শাসকেরা অনেকে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টানরাও দিয়েছিলেন। তারও আগে বৌদ্ধ জৈনরা। কিন্তু আসল কথাটা ছিল রাজশক্তি। যখন যে-রাজশক্তি আসনে, তখন তার ধর্ম শ্রেষ্ঠতম। নিয়ম তাই। ধর্মের পরে এসেছে রাজনীতি—রাজশক্তির অন্তরূপ—রাজার নাম গণেশ। কারণ তিনি গণনেতা। তাদের সম্প্রদায় নেই, হালকিল বলা হয়, পাটুটি। তাদের আছে পাটুটি। যে পাটুটি যখন আসনে—তখন তার নীতি আদর্শই অমোঘ। আর হরিজনরা?

হরিজনকে যদি প্রলেতারিয়েত্ বলা যায়, তাহলে বিশ্বের শত কোটি প্রলেতারিয়েতের জ্ঞাত, অনেক গণেশ, অনেক পাটুটি এসেছে, আসবে। কিন্তু কি প্রমাণিত হয়েছে? আর হবে?

আহ, এ সব কী কথা? এ আবার কী চিন্তা কালকূটের ভাবনায়?

পরের নাটো, ভূমি কেন নাট হতে যাও? এঁড়ে গরুতে তোমার দরকার কী? তাঁত চালাও, বুনে যাও তাঁতী?

সেই ভালো। ভাবেতে থাকো, ভজনে থাকো। যা তোমার আপন ভাব ভজন। আসলে কথাটা ছিল, সেই সাগর কুলের রূপ আর অরূপের খেলায়, ভিতরের ডাক, আমার তৃষ্ণা। তার বহুদিনের ওপার হতে, এপারের সীমানায়, যা কিছু বিরাজ করে, দেব-দেবী মানব-মানবী তার প্রকৃতি, নানা লীলা। কেন আমাকে ডাকে, আমার নিজের সেই অতৃপ্তি আর তৃষ্ণার মরুক্ষেত্রটি খুঁজে দেখতে ইচ্ছা করে। এক কথায় বলি, সেই কূপেতে নিজেকেই একবার দেখবার বাসনা।

এই ডাকের যাত্রাটাকে, অকাজের যাত্রা বলা যায়। রথ দেখা, কলা বেচা, দুয়ের মাঝে নেই। এবার তাই হুঁ করে হাওয়াই জাহাজে ওড়া না, এমন কি যেল গাড়িতেও না। একটু আলস্তে বিলাসে চলি এক্সপ্রেস গাড়িতে। ভিড়-ভাট্টা নেই, যাত্রীর ওঠা-নামার দোঁড়-কাঁপ কল-কলরব নেই, অথচ গাড়ি চলছে বিস্তর ঠেক খেতে খেতে, অনেক ইন্ট্রিশন ছুঁতে ছুঁতে। একটা রাজি পার করে দিয়েছি। গতকাল দুপুর থেকে সারা দিনটাও।

অলসের পর বিলাসের কথাটাও বললাম, কারণ চলেছি কাস্টোকেলাসে। চার বারের এ কুঠরিখানি, আজ সকাল-ইত্তক ভরাট ছিল। এক ভায়তীয়

সেনা ছিলেন সপরিবারে। সকালবেলা কুঠরি খালি করে দিয়ে নেমে গিয়েছেন। গোটা কুঠরির মালিক হয়ে একটি কোণ নিয়ে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে একটু সেনা-দেনা চলছে। পানপাত্র থেকে অনেকেই বসে চুম্বক দেয়। কিন্তু পাত্র হাতে না নিয়েই আমার চোখ দিয়ে পান করি, আকর্ষণ করে ওঠে, মনে মনে বলি, সব কিছু তফাত বাণ, আরি এখন সাগরকুলের রাজী। কাজের কাজীর কোনো ধান্দা এখানে নেই।

আত্মবিক্রপের কথাটা এখানেই এলো। হঠাৎ একটি করণ মূখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে, আর সকল অল্পবোধ, 'দাদা, গিয়েই পোস্ট করবেন কয়েক পাতা, না হলে মারা পড়ব।'

আহ, মনে হলো, ঝাপড় মারি নিজের গালে। মন নিয়ে এত কথা, বে-ছকে চলি। কিন্তু ভুলে গেলে চলে না সেই প্রবচন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কথাটা তো আর এমনি এমনি মাহু বানায়নি। মাহু কোনো কথাই এমনি এমনি বানায় না। বিজ্ঞানসাগর সেইজন্মই বোধ হয় বলেছেন, ভেতরে ভাব থাকলেও, ভাবার ভাবনা নেই। সে তো ভাবের দানী। তার অর্থ হলো, যত নিকৃতি চাও, যেখানেই যাও, তোমার কাজ তোমাকে করে যেতে হবে। এই ভাবটি ভেতরে আছে বলেই, ঢেঁকি আর স্বর্গের উল্লেখ।

অতএব সেই 'কয়েক পাতা' লেখবার জন্ত এ্যাটাচি কেস্টা টেনে নিই। কাগজ কলম সাজিয়ে বসি। ধান ভানতে বসি।

কখন এক সময়ে বাইরের প্রকৃতি থেকে, অগ্র জগত নিয়ে অক্ষরমালার সঙ্গে মিশে গিয়েছি, খেয়াল নেই। থানাওয়াল থাবার নিয়ে চুকলো। জানিয়ে দিল, 'সাব্ আপকা থানা, দাল রোটি কারি ভাজি—ইয়ে হ্যায় পানী।'

বলে একটি বোতল বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, গাড়ি ইন্টিনে দাঁড়িয়ে। স্নানাদি সকালেই সারা হয়েছিল। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বাইরের করিডর দিয়ে বাথরুমে হাত ধুতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, কুঠরিতে নতুন যাত্রীর আগমন ঘটেছে। দুই পুরুষ, এক মহিলা। একদিকের পুরো আসনটি ছেড়েই তাঁরা বসেছেন। একজন কুলির মজুরি মেটাতে ব্যস্ত। মেঝের ছড়ানো বেডিং স্ট্রাকেস।

মেজাজ মিয়োনো বলে একটা কথা আছে। আমার সেই রকম মেজাজটা একটু মিইয়ে গেল। পরের সামনে খেতে পারি না, এমন গ্রামীণ গৃহস্থ বধু আমি না। তবে একেবারে অচেনা লোকের সামনে একটু অস্বস্তি হয়। যদিও ছুরপান্নার গাড়িতে চেপে ও সব মনে রাখলে চলে না। মনে রাখতে হয়,

তুমি আপনার আমি আপনার। তোমরা তাকিয়ে থাকো বা যা খুশি তাই করো, আমার অনিবার্ধ প্রয়োজন আমাকে মেটাতেই হয়। খাওয়া তেমনি একটি অনিবার্ধ প্রয়োজন, সবাই তা যে যার মতো মিটিয়ে থাকে। অবিশ্টি সবাই একসঙ্গে খেতে বসলে, এ কথাটা আর মনে আসে না। কিন্তু এ গাড়ি সে গাড়ি না। মেল ট্রেনে খাবার বগী থাকে, এক্সপ্রেসে তা থাকে না।

আমি বেডিং স্ট্রাক্‌স ডিভিজে নিজের জায়গায় যাই। দেয়ালের পায়ে হুক দোলানো তোয়ালের মুখ মুছে, মুখ ফিরিয়ে খাবার নিয়ে বসি। এই এক দুঃখ, এ পথের যাত্রায় খাবার স্থখ নেই, যা থাকে দিল্লী উত্তর প্রদেশের পথে। এ পথে দামে বেশি, কামে কম। কামে কম অর্থে, রান্নার স্বাদ। রান্নার অন্ততম প্রধান ভূমিকা সরষের তেল, দেশের এ সীমানায় তার বিশেষ চল নেই। কলে আসল মারটা সেখানেই। বাঙালীর রসনায় সরষের তেল মানে অল্প এক জিনিস। নিতান্ত দুঃখের বরাত, তাই আমাদের খাটি সরষের তেল মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ব্যাপারীরা টাকা করে, ভেজাল মিশিয়ে তিল তিল বিবে খুন করে না, কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ করে রাখে। তার চেয়ে এক কোপে মারা ভালো, মরা ভালো, প্রতিদিন ব্যাধির জ্বালা থেকে। তাতে কোনো লাভ নেই। তাতে ব্যাপারীর টাকাও হবে না, খুনের দায় আসবে। সরষের তেল দিয়ে কেবল রান্না কেন, কাঁচা সরষের তেল দিয়ে বাঙালী শুধু ভাত মেখে খায়, একটু কাঁচা লংকার টাকনা দিয়ে, তাও দেখেছি। ইদানিং কালের একজন বর্ষীয়ান দিকপাল সাহিত্যিককে দেখেছি দক্ষিণ কলিকাতায় তাঁর রম্যপ্রাসাদে, আধুনিক ডাইনিং রুমে টেবিলে খেতে বসে ঝকঝককে স্টিলের বাটি ভরে সরষের তেল নিয়েছেন, আর আলু সেক্‌ গরম ভাত, আর কিছু না, একেবারে থাকে বলে কনুই ডুবিয়ে খাচ্ছেন। একটা অক্ষর মিথ্যে না, সত্যি সত্যি কনুই ডুবিয়ে। খেতে খেতে তাঁর কনুই বেয়ে তেল পড়ছিল। অথচ আমাদের পরিবেশন করা হয়েছিল কালিয়া কোপ্তা। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, সরষে কিনে, বিশেষ জায়গার ঘানিতে ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন, অতএব নির্ভয়।

শিবের গীত গাইতে আরম্ভ করেছি খান ভানতে গিয়ে। তবে কী না, এই শুকনো লঙ্কার ঝাঁজ মিশিয়ে, কী এক অভুত তৈলাক্ত বস্তু দিয়ে রান্নার স্বাদ নিতে, খাটি সরষের তেলের স্মৃতি মধন না করে পারি না। এ দেশের লোকেরা বোধ হয় কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্নাও জানে না, একমাত্র চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া। কোনো রকমে পিঠি পড়ানো থেকে পাকস্থলীকে রক্ষা করে খাবার থালাকে সরিয়ে দিই। ওদিকে তখন গোছ-গাছের পালা চলেছে। কথাবার্তা যতটুকু কানে এসেছে,

সেটাকে বোধ হয় ঝকঝকে হিন্দীই বলা যায়। ঝকঝকে বলতে, আমরা বাংলাদেশে পথ-চলতি কাজে-কর্মে যে হিন্দী শুনি, তার থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। বাকভঙ্গির স্বর আর উচ্চারণও ভিন্ন রকম, তার সঙ্গে কিছু ইংরেজির মিশেল আছে। তার থেকে অনুমান হয়, যাত্রীজন্মের সঙ্গে নগর জীবনের যোগাযোগ আছে। নাম মাত্র একজনেরই শুনেছি, ইয়াকুব। ইয়াকুব ইয়াকুব কি না জানি না, তবে ইয়াকুবই যোয়োপের সীমায় পৌঁছলে সম্ভবত জ্যাকব হয়ে যায়। আমার সহযাত্রীরা তাহলে মুসলমান ?

কতি রুদ্দি কিছুমাত্র নেই। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ, খারাই উঠুন, লেখার কাজ আপাতত বন্ধ। তিনজনের কথা-বার্তার মধ্যে, মনোযোগ দেওয়া একটু কঠিন হবে। খাবার শেষ করে এবার সামনে ফিরে বসি। গোছানো-গাছানো সাজ। বেডিং উঠে গিয়েছে উপরে। বাস্ক-প্যাটরা চলে গিয়েছে আসনের নিচে, কিন্তু নিচের আসনে চণ্ডা শোবার গদী এই দ্বিপ্রহরেই নামিয়ে দেবার কারণ কি ? দিবানিত্রা হবে নাকি ?

তাতেই বা আমার কি ? আমি হত্যারহস্তের বইটি টেনে নিয়ে সিগারেট ধরাই। গাড়ি ইতিমধ্যে চলতে আরম্ভ করেছিল। বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার আগে, সহযাত্রীদের দিকেও একটু মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। মনোযোগ অর্থে, দৃষ্টিযোগ। একটু বাইরে থেকে দেখা যাকে বলে।

পুরুষ দু'জনকেই মনে হলো সমবয়সী, প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। যদিও হালফ করে তা বলা যাবে না, কমবেশিও হতে পারে। দু'জনেরই পরণে হালফিল সময়ের চলতি ট্রাউজার আর শার্ট। দু'জনেরই দেখছি চুলের বহর বেশ বড়, ষাড় অবধি বেয়ে পড়া। দু'জনকেই উজ্জল বর্ণ আর স্বাস্থ্যের অধিকারী বলতে হয়। চুলের বড় বহরের মধ্যেও একজনের মাথার মাঝখানে একটু টাঁদির দর্শন মেলে। একজনকে একটু গম্ভীর, আর একজনকে একটু চঞ্চল মনে হয়। চঞ্চলতা চোখের দৃষ্টিতে, মুখের অভিব্যক্তিতে তার, যার চেহারায় স্থূলতা বলে কিছু নেই। অগ্ন জনকে চেহারায় একটু স্থূল মনে হয়, দৈর্ঘ্যের জগু তা বেমানান লাগে না।

তৃতীয়জন মহিলা, পা তুলে কোণ নিয়ে জানালা ঘেঁষে বসেছেন। বয়স ? নারীর বয়স কি হিসাব করা যায় ? বিশেষ করে, যে নারীর মুখে গলায় হাতে পায়ে কোথাও রেখা পড়েনি। খ্রীচরণ থেকে যদি শুরু করা যায় তবে বলি, খ্রীচরণকে যদি পদ্ম বলা যায়, তাহলে এ চরণ যুগল পদ্ম-খ্রী অর্থাৎ পদ্মের খ্রী আছে স্বর্গের চরণে, তার সঙ্গে আছে রঞ্জিত নখখ্রী, নখরজনে। তিনি যা পরে

আছেন, তা বর্ণবিচিত্র। অনেকটা ঢোলা পায়জামার মতো। তার ওপরে যেটা, সেটা নিশ্চয় রঙ-বেরঙের, ছেলেদের হাওয়াই শার্ট না, তবে প্রায় তা-ই। পোশাকটির নাম আমার জানা নেই। জামাটির কাঁধের কাছে কলার না থাকলে বলতে পারতাম, কলকাতায় বেটিক স্ট্রিটের চৈনিক মহিলাদের গায়ে এরকম জামা দেখেছি। চৈনিকরাই বা তাঁদের সেই জামাকে কী নামে ভূষিত করেন জানি না। মহিলার চুল মক্ষণ কোমল, ঘাড়ের কাছে ইতি। প্রায় গোল ফর্স তাঁর মুখ, কিন্তু ষিগুণ চিবুকের ভাঁজ নেই। নাক টিকলো, চোখ আর ভুরু আঁকা নিঃসন্দেহে, এবং ওঠ তো বটেই, রঙে রাঙানো। চোখ দু'টিকে ডাগরই বলতে হবে, দৃষ্টি হাতে ধরা ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতায়। ম্যাগাজিন ধরা আঙুলের নখেও, চোখ-সাপুয়া-রঙের পালিশ। সারা গায়ে অলঙ্কার নাস্তি, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি মাত্র। হালকিল এরকম দেখি, মহিলাদের হাতের ঘড়ি ক্রমে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘড়ির বন্ধনী ক্রমেই পাখালিতে বাড়ছে। কামরার মধ্যে যে গন্ধটা ছড়িয়ে গিয়েছে, তা ওঁর পোশাক-আশাক থেকেই নির্গত কী না বলতে পারি না, সন্দেহটা সেই রকম। এঁকে তরুণী বলব কী না বুঝতে পারছি না, অভিজ্ঞতা আন্দাজে বলছে, বয়স ত্রিশের উদ্দেশে।

গম্ভীর ব্যক্তি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। তিনি গম্ভীর বা অন্তমনস্ক কী না ঠিক বুঝতে পারছি না। যার দৃষ্টি আর অভিব্যক্তিতে একটু চঞ্চলতা লক্ষ্যীয়, তিনি কিন্তু একটা বই হাতে নিয়ে বসেছেন। তথাপি, বইয়ের দিকে যে তার মনোযোগ নেই, চঞ্চলতা সেটাই প্রমাণ করে। একমাত্র তার সঙ্গেই আমার হুঁএকবার চোখাচোখি হয়ে গেল। করিডরের সামনে খোলা দরজার দিকে তিনি কখনও ফিরে তাকাচ্ছেন। কখনও বা তার নিজের সঙ্গীদের দিকে। আবার কখনও বইয়ের দিকে।

একে সরেজমিন তদন্ত বলে না। একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া। এবার আমি বইয়ের দিকে মনোযোগ দিই, সে সময়েই মহিলার স্বর শুনে পাই। তিনি হিন্দীতে যা বললেন, তার বাড়লা মানেটা এই রকম দাঁড়ায়, 'কী হলো বের করলে না?'

গম্ভীর বা অন্তমনস্ক ব্যক্তি বললেন, 'তোমরা বললেই বের করতে পারি। কিন্তু তোমরা তো বই নিয়ে বসে গেলে।'

মহিলা ম্যাগাজিনের পাতা বন্ধ করে রেখে দিলেন। পুস্তক-পাঠকও বইটি আসনের উপর কেলে দিয়ে বললেন, 'বের করে ফ্যালো, বসা থাক।'

‘মহিলা বললেন, ‘হাক্কেজ, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।’

বলেই তিনি চকিত দৃষ্টিপাতে একবার আমার দিকে দেখলেন। পুস্তক-পাঠক, চক্ৰ-দৃষ্টি পুরুষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ই্যা করছি।’

হাক্কেজ কে, জানা গেল। বাকি পুস্তকটি যিনি, তিনি ওপরের বার্থে রাখা মহিলারই ব্যাগ খুলে কি যেন বের করছিলেন, অনুমান করছি, তিনিই তাহলে ইয়াকুব। বুঝতে পারছি না, কি বের করা হচ্ছে, দরজা বন্ধ করারই বা কি দরকার হয়ে পড়লো। মহিলার স্বর আবার শোনা গেল, ‘সাহাব, আমার ব্যাগটা আমার কাছেই নামিয়ে দাও।’

সম্বোধনে সাহাব, সম্পর্কটা কি? নিজেই বিজ্ঞপ করতে ইচ্ছা হলো, কোতুহল যদি দমন না করতে পারে, জিজ্ঞেস করলেই হয়। ছি ছি ছি, তাই আবার কখনও করা যায় নাকি? সম্মান দেখানো হতে পারে, প্রীতিবশতও সাহাব সম্বোধন হতে পারে, কিংবা হয়তো আরো কিছু। যা আমার জানার নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। দেখলাম ইয়াকুব সাহাব ব্যাগ থেকে দু’বাক্স তাস বের করে ব্যাগটি নামিয়ে দিলেন মহিলার সামনে। ইয়াকুব সাহাব একবার আমার দিকে দেখলেন, তারপরে মহিলার দিকে। মহিলা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। দু’জনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইয়াকুব প্যাকেট থেকে তাস বের করে কায়দা মতো এলোমেলো করতে লাগলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে সাফল করা। হাক্কেজ দরজা বন্ধ করে বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, ‘আরে ইয়ার, তাসগুলোকে একেবারে নয় ছয় করে দিও না, ওদের একটু নিজেদের মতো থাকতে দাও না।’

মহিলা হাক্কেজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপরে ব্যাগের ভিতর থেকে বের করলেন কিছু টাকার নোট আর খুচরো পয়সা। হাক্কেজও বুকপকেট থেকে টাকা পয়সা বের করে আসনের ওপর রাখলেন।

ইয়াকুব বললেন, ‘ভুলেই গেছি।’ বলে উরত-পকেট থেকে বের করলেন একটি মোটা চর্ম-পেটিকা, মানি ব্যাগ পার্স, যা-ই বলা যাক তাকে, সেটা খুলে কিছু টাকা পয়সা বের করে তিনিও রাখলেন আসনের ওপর।

মহিলা তখনও টাকা পয়সা হাতেই রেখেছেন। বললেন, ‘আমি মাঝখানটার বসি, তোমরা দু’জনে দু’দিকে বস।’

এরপরেও আর বুঝতে বাকী থাকে না, আরোজনটা কিসের। কেনই বা প্রথম থেকেই শোবার চওড়া গদীটি টেনে নামানো হয়েছে। বোধ হয় ঠিক ছিল আগে থেকেই, খেলা হবে। মহিলা দেওয়াল ঘেঁষে মাঝখানে সরে

বসলেন। ইয়াকুব আর হাফেজ, পাশ করে মুখোমুখি। চণ্ডা গদীর ওপর মোটামুটি তিনজনে বসে খেলা যায়। তবে খেলাটা একেবারে নির্জলা না, উত্তেজনার খোরাক হিসেবে পয়সার বাজীর খেলা। তাতে বোধ হয় খেলার দায়িত্ব বাড়ে, প্রতিযোগিতা জমাট বাঁধে।

আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে এসেছি বইয়ের দিকে। সে সময়েই স্তনতে পেলাম, ককককে ইংরেজিতে, ‘যদি কিছু মনে না করেন, স্মার, আপনি কি খেলতে উৎসাহী।’

জিজ্ঞাসাটা কি আমাকেই নাকি? চোখ তুলে তাকালাম। তিনজনেই আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনজনের মুখেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে একটু ভদ্রতার হাসি। ইয়াকুব সাহেবের হাসিটিই একটু বেশি বিস্তৃত। জিজ্ঞাসাটা বোধ হয় তিনিই করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা এতই আকস্মিক এবং অভাবিত, হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। তা ছাড়া জবাব দেবার আগে নিজের গুণের কথাটাও তো ভাবতে হবে। বলব না যে, ও রসে আমি একেবারেই বঞ্চিত গোবিন্দদাস। তবে রসের দু-এক ধারায় ভাসতে পারি, তার বেশি না।

আমার কুণ্ডা বিব্রত ভাব দেখে তিনজনেই নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইয়াকুব সাহেব বললেন, ‘অবিশ্রি, আপনার যদি আপত্তি থাকে—।’

আমি তাড়াতাড়ি ইয়াকুব সাহেবের ভাষাতেই জবাব দিই, ‘না না, আপত্তির কোনো প্রশ্ন নেই। আসলে তাস খেলার ব্যাপারে আমি খুবই আনাড়ি, আর জানি মাত্র দু’একটি খেলা।’

মহিলা হঠাৎ হেসে কিছু একটা বললেন দু’জনের দিকে তাকিয়ে, তারপরে তাঁর বাঙানো নখর-আঙুল দিয়ে ঠোট চেপে আমার দিকে তাকলেন। সাহেবদর হেসে উঠলেন, এবং যিনি হাফেজ, তিনি ইংরেজিতে যা বললেন, তার বাড়লা করলে দাঁড়ায়, জেসমিন একজন প্রকৃত শোষণক।

জেসমিন! সুন্দর নাম। এবার মহিলার নামটিও জানা গেল। জেসমিন মানে কি জুঁই? বোধ হয়। জুঁইয়ের রূপ আর গন্ধের সঙ্গে বাঙালীর দুর্বলতা গভীর। ইয়াকুব আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না, ইনি (জেসমিনকে দেখিয়ে) জেসমিন—আমার স্ত্রী, বলছেন, আপনার মতো আনাড়ি খেলোয়াড়ই ভালো, বেশ ভালো করে আপনার পকেট শোষণ করা বাবে।’

জেসমিন আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। আমি হেসে উঠে কেতার সঙ্গে মিসেস ইয়াকুবকে বললাম, ‘অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, ধন্যবাদ।’

তিনজনই হাসিতে বেজে উঠলেন এবং আমিও। হঠাৎ-ই যেন আমাদের অপরিচয়ের আড়টতা অনেকখানি কেটে গেল। বলতে হবে, তা সম্ভব হলো ওঁদেরই অগ্রসরতায়। ইয়াকুব আবার বললেন, ‘আমার নাম এম. কে. ইয়াকুব, ইনি আমার বন্ধু, ইউ. এল. হাফেজ। আর আমার স্ত্রীর কথা আপনাকে আগেই বলেছি।’

ইয়াকুব সরাসরি নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলেন এবং হাফেজ সাহেব ও জেসমিন বিবি একসঙ্গেই প্রায় মার্কিন কেতায় ঘাড় ঝাঁকিয়ে আওরাজ দিলেন, ‘হেলো!’

অর্থাৎ নমস্কার জাতীয় সম্বোধন। অতএব আমার নিজের নামটাও বলতে হলো।

হাফেজ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বাঙালী, নিশ্চয় কলকাতা থেকে আসছেন?’

বাঙালীরা আর কোথা থেকে আসে—আমার মতো ঠেট্ বাঙালী। বললাম, ‘হ্যাঁ, আমার গন্তব্য বম্বে।’

ইয়াকুব বললেন, ‘আমাদেরও। ভালোই হলো, শোবার আগে পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে খেলে গল্প করে কাটাতে পারবো।’

জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মাক করবেন, যে ছ’একটি খেলা আপনি জানেন বলছিলেন, সেগুলো কী?’

সেখানেই তো গলদ। মথ খুলতে গেলেই এ কেরামত আলীর কেরামতি সব বেরিয়ে পড়বে। তবু বলতে তো হবে। সংকোচের সঙ্গে বললাম, ‘দয়া করে হাসবেন না, আমি জানি ত্রে আর ফিশ।’

জেসমিন বিবি একটু হতাশ বিষয়ে বললেন, ‘ত্রিজ বা ক্রাশ জানেন না?’

আগেই জানতাম, খেলাব বিষয়ে হতাশ করা ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারি না। বিবির কথায় আরো সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, ‘ফ্লাশটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্ধ খেলা খেলতে পারি।’

ইয়াকুব আর হাফেজ হাসলেন। হাফেজ বললেন, ‘কিশ চলুক না।’

জেসমিন বললেন, ‘চলুক। কিশ খারাপ না।’

খারাপ না ঠিকই, কিন্তু আমি ভূবে জল খেতে পারি না, শেষ পর্যন্ত ডাঙায় পড়ে না থাবি খেতে হয়। কিন্তু এখন আর তা ভাবতে গেলে চলে না। সব কিছুই ভাল আছে, লয় আছে, ঠোকা দিয়ে ঠিক মতো বাজাতে হয়। ডাক দিলে লাড়া না দিয়ে উপায় কী। তা না হলে ভদ্রজ্ঞ আর কাকে বলে। তুমি

মুখ কিয়িয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারো, সেটা সব থেকে সহজ কাজ। তার মধ্যে আনন্দ নেই। দেশের মধ্যে নিজেকে একঘরে রাখা, দলছুট বিষন্নতায় ভুগতে হয়। তার চেয়ে সাড়া দিয়ে দুঃখের ভাগীদার হওয়া ভালো। তা ছাড়া, এই খুপরিয়ার মধ্যে বসে বই নিয়ে নিরঙ্কুশ মনোযোগ দিতে পারতাম কী? মন আর নজর নিয়ে টানাটানি হতো। মন আর নজর থাকলেই, তা হয়ে থাকে। অন্তএব খেলোয়াড়দের মতো আমিও পকেট থেকে টাকা বের করি।

ইতিমধ্যে চারজনের ঠিক মতো বসা নিয়ে যে সমস্ত দেখা দিয়েছিল, ইয়াকুব সাহেব সেটি সমাধান করেছেন। আসনের নিচে থেকে টেনে বের করেছেন স্টীলের ট্রাংক। সেটিতে বসে খেলতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি ট্রাংকের দিকে এগিয়ে গেলাম, ইয়াকুব বাধা দিলেন, গদীর ডানদিকে দেখিয়ে বললেন, ‘আপনি ওখানে উঠে বসুন, আমি ট্রাংকের ওপর বসব, জেসমিনের মুখোমুখি।’

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, বললাম, ‘আপনি ওখানে বসুন, আমি এখানে বসেই বেশ খেলতে পারবো।’

ইয়াকুব বললেন, ‘পারবেন, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু ট্রাংকটা একটু নিচু। আমি লম্বা আছি, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।’

সে কথা হাজারবার মানতে হবে। এই দুই পুরুষের তুলনায়, আমার খাটোও একেবারে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। এ শরীর জন্মান্ত্রে পাওয়া, বাবা মায়ের কাঠামোটা ছেড়ে আমার উপায় কী। অন্তএব আমি গদীতে উঠে জেসমিন বিবির বামে বসলাম। তাঁর দক্ষিণে হাফেজ এবং মুখোমুখি ইয়াকুব। তাস কেটে দিলেন হাফেজ, দ্রুত হাতে বাটলেন ইয়াকুব।

জেসমিন জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোনো বোর্ড মানি নেই তো?’

ইয়াকুব বললেন, ‘না। বোর্ড তো আমাদের নিজেদেরই, অন্তের বোর্ডে বসে আমরা খেলছি না।’

প্রথম চিত-করা তাসটি দেখলাম, ইসকাবনের বিবি। অন্তএব জোকার হলেন রাজা। তাস দেখতে গিয়ে সকলের মুখের দিকে একবার দেখলাম। জেসমিন বিবির ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখলেন হাফেজের দিকে। ইতিমধ্যে আমার আয়ুতে চাপ পড়তে আরম্ভ করেছে।

ইয়াকুব বললেন, ‘প্রতি পয়েন্টে পাঁচ পয়সা।’ বলে তিনি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম, কারণ হাড়িকাঠে মাথা গলানো জীবের থেকে

আমার অবস্থা ভালো না। দু'চারবার যা খেলেছি, জয়ের টিকা কখনও আমার ললাটে পড়েনি, আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গিয়েছে। আর হারলেই আমার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। অহুশোচনায় ভুগি। তবে ভোগান্তিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, এটাই যা রক্ষে।

খেলা শুরু হলো। সিগারেট জ্বললো, আমার আর হাফেজের। ইয়াকুব খেলতে ব্যস্ত। তাস তোলা আর ফেলা নিয়ে, এ ওকে, ও তাকে, কিছু কিছু আন্দাজের মার দিতে লাগলেন। জেসমিন বিবি হঠাৎ আমাকে বললেন, 'দুটো জোকার খেয়ে তো বসে আছেন, ফেলুন না।'

আশ্চর্য! সত্যি তো! কি করে বিবিজী জানলেন? প্রবৃত্তিবশতই তাড়াতাড়ি হাতের তাস সরিয়ে নিলাম। জেসমিন খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'না না, আমি আপনার তাস দেখিনি, ওটা আমার স্পেকুলেশন।'

আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার হাত এগিয়ে নিয়ে এলাম। বললাম, 'না না, আপনি দেখেছেন, তা বলছি না।'

ইয়াকুব আমাকে বললেন, 'কিন্তু স্ত্রার, আপনার আচরণেই আপনি ধরা পড়ে গেছেন, জেসমিন বোধহয় ঠিকই বলেছে।'

হাকেকজ বললেন, 'সে কথা তোমার শোনবার দরকার নেই। গুঁর খেলাটা গুঁকেই খেলতে দাও।'

জেসমিনের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার স্পেকুলেশন তোমার মনে মনেই রাখো, প্রকাশ করবার দরকার নেই। মনে রেখ স্পেকুলেশন আমাদেরও কিছু আছে।'

জেসমিন হেসে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, অত গুস্তাদি করতে হবে না। দেখবো, তুমি কখনও মুখ খোলো কী না।'

জেসমিন আমার বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা একেবারে অব্যর্থ। দুটি জোকার আমার হাতে, ছ'টি তাস পেকেছে। বাকী দুটোর জন্তাই আমার যতো হাঁসফাঁস। কিন্তু একবার জানাজানির পরে আর ধরে রাখতে সাহস পেলাম না। হাতের দান আসতেই, ছ'টি তাস নামিয়ে দিলাম। জেসমিন আমার দিকে চোখের তারা আর পাতা কাঁপিয়ে হাসলেন, বক্তব্য, কী রকম বলেছিলাম?

তারপরেই জেসমিনের হাতের দান যখন এলো, তিনি সাতটি তাস নামিয়ে দিলেন এবং ঠোট কুঁচকে, শরীরে একটি বক্র ভঙ্গিমায়, চোখের পাতা নামিয়ে রাখলেন। হাকেকজ গদীতে চাপড় মেয়ে বললেন, ‘একে বলে ডাকিনীতন্ত্র।’

জেসমিন চোখ ঘুরিয়ে বললেন, ‘ওটা আমি ভালোই জানি, তুমি জানো।’ বলতে বলতেই, তাঁর চোখে যেন একটি ইশারার ঝিলিক হেনে গেল।

হাকেকজ চকিতে একবার তাকালেন ইয়াকুবের দিকে। ইয়াকুব তখন হুকু কুঁচকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নিজের হাতের তাস আর আমাদের নামিয়ে দেওয়া তাসের দিকে দেখছেন। তারপরেই তিনটি তাসের সঙ্গে বাকী দুটি তাসের একটি আমার সঙ্গে আর একটি জেসমিনের তাসের সঙ্গে গুঁজে দিলেন। হাকেকজ ঠোট উল্টে ঘাড় নাড়লেন, আর জেসমিন যেন ইয়াকুবের তাস নামাবার অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর হাতেই অবশিষ্ট তাসটি আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা ইয়াকুবের তাসের পাশে গুঁজে দিলেন। হাকেকজ বললেন, ‘সাপের দংশন।’

জেসমিন ঘাড়ের চুলে ঝটকা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, ‘আমি জানতাম, ইয়াকুব সাহেব তাস নামালেই আমি শেষ তাস নামাতে পারব, ওঁর সঙ্গেই আমার ভাগ্য জড়ানো ছিল।’

ইয়াকুব হাতের তাস ফেলে দিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জেসমিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, ‘সত্যি?’ বলেই চোখ নামিয়ে পয়সা গুনতে লাগলেন।

জেসমিন আর হাকেকজ দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দেখলে মনে হয়, সেই দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে যেন বিশেষ কোনো কথাও বিনিময় হয়ে গেল। কিংবা তা না-ও হতে পারে, আমার দেখার মধ্যেই হয়তো ভুল।

জেসমিন বললেন, ‘তাস তাই প্রমাণ করে দিল।’

ইয়াকুব টাকা পয়সার হিসাব করতে করতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘তাসের প্রমাণ?’

‘হ্যাঁ, তা বটে! তাস খেলার ভাগ্য আমার খুব খারাপ না।’

জেসমিন বললেন, ‘আপনার কথা বলিনি, আমার ভাগ্যের কথা বলছি।’

ইয়াকুব সে কথার জবাব না দিয়ে সামান্য কম দু’টাকা আগে দিলেন জেসমিনকে, একই হিসাবে আমাকেও দিলেন। সেই কীকে জেসমিন একবার হাকেকজের দিকে তাকালেন। হাকেকজ তখন তাঁর তাসের হিসাব করে টাকা গুনছেন। কেন যেন বায়েবায়েরই, আমার মনের মধ্যে যি’য়া বিবি’র কথাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে অজ্ঞমনস্ক করে দিতে লাগলো। সেই সঙ্গে বিবি’র সঙ্গে হাকেকজের দৃষ্টি বিনিময়টাও আমার মনে জেগে রইলো। সঙ্গত কোন কারণ

থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কৌতূহল নিশ্চয়ই অহেতুক, রীতিবিরুদ্ধও। ভাগ্য ভালো, মনের কথাটা ছবির মতো গুর চোখের সামনে জেগে ওঠে না।

আমি আমার তাসের হিসাবে আশী পয়সা জেসমিনকে দিলাম। জেসমিন বাড়ি কাত করে বললেন, ‘ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে যতোটা আনাড়ি ভাবা গেছলো, আপনি তা নন দেখছি।’

বললাম, ‘প্রথম হাতেই রায় দেবেন না। আমার হাতে দুটো জোকার ছিল, সে হিসাবে আমি কুশলী খেলোয়াড় না। কিন্তু আপনার স্পেকুলেশনেই বুকেছি, আপনি আমাকে নখে টিপে মারতে পারেন।’

হাফেজ সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে পুরো দিশি বচনে বললেন, ‘বাহ্ সাব্ বাহ্, কেয়াবাত? ইস্‌সে বড়া বাত নহি।’

জেসমিন হেসে উঠে বললেন, ‘আরে পয়সা তো ছাড়ো জী।’

ইয়াকুব সাহেব তখন তাস ভাঁজছেন। হাফেজ আমাদের তিন জনকে দিলেন প্রায় চার টাকা করে। দেখে আমার পিপীলিকা-প্রাণ ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলো। জানি ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, এমন দিন সবারই আসে। এখন হাত বাড়িয়ে টাকা নিতে বড়ই ভালো লাগছে। দেবার সময়ও ভালো লাগবে তো? কেন যে লাগে না, বুঝি না। বোধ হয় মনটা খাঁটি খেলোয়াড়-স্বভাব না।

জেসমিন তাস কেটে দিলেন। হাফেজের বাটা। জেসমিন তাস বাটার দিকে চোখ রেখে বললেন, ‘খোদা যেন তোমার হাত সোনা দিয়ে বাধিয়ে রাখেন।’

হাফেজ বললেন, ‘আগে তাস দেখ, তারপরে বল।’

জেসমিন বললেন, ‘তোমার হাত দিয়ে আমার হাতে কখনও খারাপ তাস আসবে না।’

হাফেজ বললেন, ‘এতটা আশা কোরো না।’

জেসমিন বললেন, ‘দেখা যাক।’

ইয়াকুব সাহেব একটি একটি করে তাস তুলে নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সাজাচ্ছেন। জেসমিনবিবির পোশাক থেকে বিদেশী স্বগন্ধির গন্ধ ক্রমাগত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ তিনি ঝাঁক দিকে, অর্থাৎ আমার দিকে, হাঁটু পিছনে মুড়ে বসেছিলেন, অতএব তাঁর রাজানো নখযুক্ত শ্রীপদ্ম আমার দিকে ছিল, তাঁর শরীরের সম্মুখ ভাগ অনেকটা হাফেজের দিকে। এবার তিনি আসন পরিবর্তন করলেন। তাঁর সম্মুখভাগ কিছুটা আমার দিকে ফিরলো, কিন্তু পদযুগল স্পর্শ

করলো হাফেজের কোমরের কাছে। আমি তাস তুলে নিলাম। প্রথম চিত করা তাস রুহিতনের টেকা। জোকায় তবে ছয়।

খেলা চলতে লাগলো। প্রথম দিকে, আমার হারজিত একটা সমতা রক্ষা করে চলতে লাগলো। কিন্তু ক্রমেই আমার অগ্রমনস্কতা বাড়তে লাগলো। একবার জোকায় হলো টেকা, তাস কেটেছিলেন হাফেজ সাহেব, চিত করে দিয়েছিলেন চিড়িতনের রাজা। প্রথম তাস তুলেছিলেন জেসমিন, আর চকিতেই সেটা পাশ কিরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, হরতনের টেকা।

ইয়াকুব সাহেব বলে উঠেছিলেন, ‘কি ব্যাপার, তুমি কি বাঙালী সাহেবের সঙ্গে তাস দেখাদেখি করে খেলছো নাকি?’

জেসমিন হাফেজকে আড়াল করে তাসটা ইয়াকুবকেও দেখিয়েছিলেন। ইয়াকুব ইংরেজীতে যা বলেছিলেন, তার বাংলা হল, সন্দর! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

জেসমিন হেসে ভুরু তুলে জিজ্ঞাস করেছিলেন, ‘তাৎপর্যপূর্ণ কেন?’

ইয়াকুব বলেছিলেন, ‘তুমি তা ভালোই জানো।’

হাফেজ জিজ্ঞাসু কোঁতুহলিত চোখে সকলের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তারপরে দাবী করেছিলেন, ‘এটা খুব অগ্নায়। জেসমিন সবাইকে তাসটা দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাকে নয় কেন?’

ইয়াকুব জবাব দিয়েছিলেন, ‘তোমাকে দেখালে, সব আনন্দ মাটি।’

জেসমিন ফিক করে হেসে উঠে হাফেজের দিকে তাকিয়েছিলেন। হাফেজ একটু জেদ করে বলেছিলেন, ‘কেন, আনন্দ মাটি হবে কেন? তা বললে আমি শুনবো না। সবাই যখন তাসটা দেখেছে, তখন আমিও নিশ্চয়ই দেখবো।’

ইয়াকুব বলেছিলেন, ‘না দেখলেও তোমারই জিত হয়েছে, মনে করো।’

হাফেজ একটু বিভ্রান্তভাবে জেসমিনের দিকে তাকিয়েছিলেন। জেসমিন চোঁট টিপে হেসে চুপ করে ছিলেন। তারপরে ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ‘হাফেজের না, জিতটা আমারই।’

ইয়াকুব বলেছিলেন, ‘কিন্তু তাস কেটেছে হাফেজ, ওর হাত দিয়েই ওটা তুমি পুয়েছো।’

জেসমিন ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, ‘সেটা কি ওর জিত বোঝায়?’

ইয়াকুব জেসমিনের চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছিলেন, তারপরে হেসে উঠেছিলেন, সে হাসিটা অবিশিষ্ট আনন্দের ধারায় ভাসেনি, কেমন

একটা ক্লাস্ট্রি যেন ফুটে উঠেছিল। জানি না, ঠিক দেখেছিলাম কি না। আমার চোখের সামনে একটি রক্ত রঙ হরতনের ছবি ভাসছিল। ইংরেজিতে বাক্য বলে হৃদয়। হাক্কেজ তাস বেটে অবশিষ্ট তাস থেকে একটি চিত্র করে দিয়েছিলেন, যেটি ছিল রাজা। অতএব টেকা-ই জোকার। প্রথম তাস টেনেছিলেন জেমসমিন, সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যের সূচনা, টেকা পেয়েছিলেন, আর সেটি হরতনের টেকা, যার অর্থ একটি হৃদয়। তৎক্ষণাৎ আমাকে দেখিয়ে ছিলেন এবং পরে ইয়াকুব সাহেবকেও। বাদ কেবল হাক্কেজ। এই বাদ দেওয়া আর ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে জেমসমিন বিবির কথাবার্তা, এবং ইয়াকুব সাহেবের স্থির চোখে তাকিয়ে ক্লাস্ট্রি হেসে চূপ করে যাওয়া, আমাকে যেন অন্তঃমনস্ক করে দিচ্ছে। অন্ত এক দিগন্তে চিন্তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। ইয়াকুব সাহেবের মতে, সৌভাগ্যটো জেমসমিনের না, হাক্কেজের। কেন? সহজ ভাবে দেখতে গেলে তো, সৌভাগ্যটো জেমসমিনেরই। আমার সামনে বসে তিনি মিলে, কি এক রহস্যের খেলা খেলে যায়, আমি তার খেই ধরতে পারি না। রহস্যটা কি হৃদয়-ঘটিত? মিস্সা বিবির রকম এক। আর এক বিবির সঙ্গে হাক্কেজের রকম স্কম আর এক। আপনা থেকে দুয়ার না খুললে, এ দুয়ার আমি হাত দিয়ে খুলতে পারি না। নতুন পরিচয়, কোনো পশ্চাদ্দৃষ্ট আমার জানা নেই।

আমি তাস তোলবার আগেই হাক্কেজ বললো, ‘কিন্তু এটা তোমাদের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। কি একটা ঘটে গেল, আমি জানতে পারলাম না।’

‘নীতিবিরুদ্ধ?’ বলে, ইয়াকুব সাহেব হাস্য করলেন উচ্চরবে। আবার বললেন, হাক্কেজ, ‘নীতিবিরুদ্ধ বলতে তুমি কি বোঝো একটু বলে দাও।’

জেমসমিন বিবি তাঁর রাঙানো ঠোঁট টিপে টিপে হাসেন, দৃষ্টি তাসের দিকে। হাক্কেজের দৃষ্টিতে এখন একটা জিজ্ঞাসা আর বিভ্রান্তি। জেমসমিন বললেন, ‘শুনেছি, পৃথিবীতে কিছু কিছু ব্যাপার আছে, সেখানে নিয়ম নীতির মানামানি নেই।

ইয়াকুব বাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘সেটা হলো যুদ্ধ আর প্রেম।’

জেমসমিন আর ইয়াকুবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলেন, ‘ঠিক বলেছি জেমসমিন?’

জেমসমিন তাঁর কাজলদীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, ‘আপনি কি বলেন?’

আমি সত্য ভাষণের আশ্রয় নিয়ে বললাম, ‘মিসেস ইয়াকুব, আমি নিজেকে একজন দর্শক আর শ্রোতা মনে করছি। নাটকের সব ঘটনা আমার জানা নেই, কুশীলবদের কথা শুনিছি মাত্র। কি মন্তব্য করব, বলুন।’

‘চমৎকার!’ জেমসিন চোখে-মুখে হাসির ঝলক তুলে তাঁর রাঙানো নখ, হৃন্দর দক্ষিণ হস্তটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, আবার বললেন, ‘আপনাকে প্রশংসা না করে পারছি না, হৃন্দর কথা বলেছেন।’

প্রশংসার সঙ্গে এই স্পর্শের দানটুকুও আমার পাওনা? রূপসীর হাত, কেতার কথা বাদ, প্রত্যাখানের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না, যদিও চকিতেই আমার চোখে ভেসে উঠলো কৃষ্ণকাস্তুর উইলের সেই দৃশ্য, উড়িয়া মালী যেখানে শান বাঁধানো ঘাটের ওপর, অচেতন রোহিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। জলে ভোবা রোহিনীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য, তার মুখের কাছে হুঁ দিতে মালীর সাহস হয় না, যদি রোহিনী তার বক্ষি চোখে সহসা রোষ কটাক্ষ হানে।

এদিকে তাসের খেলা বৃষ্টি রসাতল, খেলা অন্তদিকে বহে। জেমসিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাঙালী মহাশয় কি কবি?’

আমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললাম, ‘বিশ্বাস করুন, আজ পর্যন্ত আমি একটিও ছন্দ আর ভাষা মেলাতে পারিনি।’

জেমসিন খিলখিল করে হেসে উঠে ইয়াকুবের দিকে তাকালেন। ইয়াকুব আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকালেন। জেমসিন আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনি শুধু হৃন্দর কথা বলেননি, একটি হৃন্দর সত্যি কথা বলেছেন, নাটকের ঘটনা জানেন না, কুশীলবদের কথা শুনেছেন যাত্র।’ বলেই তিনি রেশম কালো চুলে একটি ঝটকা মেরে হাফেজের দিকে ফিরে, সেই হরতনের টেকাটি দেখিয়ে বললেন, ‘তুমি রাজা চিত্র করেছিলে, তারপরেই তাস টেনে আমি এইটি পেয়েছি। এবার খেলা শুরু করো।’

আমার মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে হাফেজের দৃষ্টি বদলে গেল। দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা, না মুগ্ধতা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু জেমসিনের দিক থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে সময় লাগছে। জেমসিন তাকালেন ইয়াকুবের দিকে। ইয়াকুব আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, ‘আপনি তাস তুলেছেন, এখনও ফেলেননি স্ত্রার।’

আমি ত্রস্ত লজ্জায় হেসে তাড়াতাড়ি হাতের তাসের দিকে তাকালাম। কোন্ তাস তুলেছি তাও মনে করতে পারছি না, ছ’ সেকেন্ড দেখেই একটি তাস কেলে দিলাম। ইয়াকুব সাহেব নিজের হাতের তাস দেখে আমার ফেলে দেওয়া তাসটি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, ‘ধন্যবাদ স্ত্রার।’

হাফেজের খেলায় তেমন মনোযোগ নেই, তবু খেলা চলতে থাকে। কোনো একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে, ক্যাটারিং বেয়ারা দুটি ট্রে নিয়ে চুকল।

বৈকালিক চা। ছপুরে খাবার সময়েই বলা ছিল। খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ। আমার বলা ছিল শুধু চা। ওঁদের এসেছে ডিম মাখন কুটি আর চা। বণ্টনের দায়িত্ব নিলেন জেসমিন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। একটু আড়মোড়া ভাঙ। তারপরে চা ঢালতে বললাম আমার নিজের আসনে সরে গিয়ে।

জেসমিন বললেন, ‘শুধু চা খাবেন না, একটু খাবার নিন।’

বিনয় করেও সত্যি বললাম, ‘ধন্যবাদ, মাফ করবেন, এ সময়ে আমি কিছুই খাই না এবং সেটা ভুলতা করে বলছি না।’

‘ঠিক তো?’ জেসমিন ঘাড় ঝুকিয়ে তাকালেন, দৃষ্টিতে কিস্কিৎ অবিশ্বাস।

আমি বললাম, ‘তাহলে তো আমি খাবার দিতেই বলতাম।’

জেসমিন বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি দেখব কোন্ সময়ে আপনি কী খান।’

কথার মধ্যে একটু ঘেন বক্রতা, ইতির শেষে কিছু থেকে যাওয়ার মতো। হাফেজ আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ‘এদিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন?’

বলে, সে গদীয় ওপরে জেসমিন আর ইয়াকুবের টাকার দিকে দেখালো। দেখবার মতোই। এখন বিকেল পাঁচটা। যদিও আমাদের গতি, সূর্য অয়নের বিলম্বিত চক্রের দিকে। বিকেল পাঁচটা যেন কলকাতার প্রায় চারটির মতো মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই যতো টাকা নিয়ে প্রথমে বসেছিলাম, তার প্রায় সমুদয় মিয়ান-বিবির তহবিলে চলে গিয়েছে। আমার একলার না, হাফেজের তহবিলও। প্রথম দিকে যদিও বা কয়েক হাত দিয়ে নিয়ে চলছিল, পরে আর তা হয়নি। তারপর থেকে শুধু দিয়ে যাওয়া। খেলার ভাগ্য কখন থেকে জেসমিন আর ইয়াকুবের দিকে সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল, খেয়াল করিনি। তবে দিয়ে চলেছিলাম, সেটা মনে ছিল। এ অভিজ্ঞতা আমার নতুন না। জুয়ার আমি বরাবর হারাধন।

জেসমিন ঘাড়ে দোলা দিয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আফশোস হচ্ছে হাফেজ সাহেব?’

হাফেজ বললেন, ‘মোটেই না। খেলায় হারজিত আছেই।’

ইয়াকুব বললেন, ‘বিশেষত জুয়ার। জুয়ার হারজিতের মধ্যে, কিছু কিছু প্রবচন আছে।’ বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। একটু হেসে তাঁর ভাগের কুটিতে কামড় বসালেন। জেসমিন আর হাফেজ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইয়াকুব আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, ‘আমি বধেতে ব্যবসা করি, হাফেজও তাই করে। আপনি কী করেন।’

আমি ? ইয়াকুব আগেই নিজের জীবিকার কথা বলে নিলেন প্রাণহুয়ায়ী, অতএব আমাকেও তারপরে বলতে হয়। কিন্তু সব জায়গায়, সব সময়ে সত্যি ভাষণ করতে ইচ্ছা করে না। সম্ভবত তাতে অপরিচয়টাই বাড়ে। যে-অর্থে আমি মসীজীবী, সেটা হয়তো এঁদের কাছে অর্থহীন মনে হবে। এমন আশা করতে পারি না যে, এঁরা আমার ক্ষুদ্র রচনার সঙ্গে পরিচিত। নামটাও হয়তো জীবনে কখনো শোনেননি। বললাম, ‘আমি চাকুরিজীবী।’

জেসমিন বললেন, ‘আমি ভেবেছিলাম আপনি শিল্পী।’

ইংরেজিতে বললেন, ‘আর্টিস্ট।’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘শিল্পী ? কী রকম ?’

জেসমিন নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য হঠাৎ যেন কথা খুঁজে পেলেন না। বললেন, ‘এই ধরন, মানে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এক একজনকে দেখলে মনে হয়, ইনি বোধ হয় একজন শিল্পী। আপনি কবিতা লেখেন না আগেই বলেছেন। শিল্পী অনেক রকম হতে পারে, যেমন ধরন গায়ক বা আর কিছু, হয়তো ছবি আঁকেন।’

আশ্চর্য, সেসব কি চেহারায় বা গায়ে লেখা থাকে নাকি ? আমার চোখের সামনে অনেক গায়ক, চিত্রাঙ্কন-শিল্পীর চেহারা ভেসে উঠলো। তাদের কারোর সঙ্গে কোথাও নিজের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না, বা তাঁদের গায়েও কোথাও শিল্পীর বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তবে ইয়া, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের কথা আমার মনে পড়ছে, যেখানে বলতে গেলে গায়েই শিল্পীর লক্ষণ থাকে, দেখলেই তা মনে হয়। কিন্তু সেটা নিতান্ত কলকাতাই—যাকে বলে বাঙালী শিল্পীর লক্ষণ। সে কথা ওদের বলে লাভ নেই, কারণ তা একান্তভাবে প্রাদেশিক।

আমি হেসে বললাম, ‘না, সেরকম কিছু আমি নই।’

ইয়াকুব বললেন, ‘আমিও প্রায় জেসমিনের মতোই ভেবেছিলাম। যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যে কথা জিজ্ঞেস করছি, তার সঙ্গে পেশা বা জীবিকার কিছু যায় আসে না। নিতান্তই একটু হাল্কা মেজাজী গল্প করা যাক, অল্প ভাবে নেবেন না, কিন্তু কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবেন। আপনার প্রেমের ভাগ্য কেমন ?’

প্রেম ! আমার প্রেমের ভাগ্য ! হঠাৎ, কথা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে চলছে তার স্পষ্ট গতিবিধি ধরতে পারছি না। প্রেম মানে কী, পীরিতি ! সে তো শুনেছি বিবম জালায় ব্যাপার। তার আবার ভাগ্য ! সে বস্তুই বা

কেন। দেখছি তিনজনেই আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন, প্রতীক্ষা, অপেক্ষা। বললাম, ‘বিপদে ফেললেন।’

জেমসন হেসে উঠলেন, বললেন, ‘সত্যি ব্যাপারটা বিপদেরই। সাহেব যেভাবে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, অবাবটা বোধ হয় সে রকম সোজাসুজি সহজভাবে দেওয়া যায় না।’

আমি বললাম, ‘তার আগে আর একটু কথা আছে, সেটা হলো, প্রেমের বিষয়ে ভাগ্যের ব্যাপারটা কোনোদিন ভেবে দেখিনি।’

জেমসন চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন, কাপ নামিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা হচ্ছে অবাব এড়িয়ে যাওয়া। এটা ভাববার বিষয় না, ঘটবার বিষয়। যা ঘটেছে, সেই অভিজ্ঞতার একটু পরিচয় দেওয়া। কিন্তু প্রথম থেকেই আপনি পালাবার মতলব করছেন।’

বুদ্ধিমতী জেমসন কথাও বেশ স্থল্লর বলতে পারেন। উনি আমার পথ-বন্ধনের উদ্ভোগ করছেন। বিরত হেসে বললাম, ‘পালাবার মতলব করব কেন?’

জেমসন বললেন, ‘আমি যে বুঝতে পারছি, আপনি পালাবার চেষ্টা করছেন।’

ইয়াকুব হেসে বললেন, ‘আমাদের পরিচয় খুব কম, সেরকম ভাবে বন্ধুত্বের দাবী করা যায় না। কিন্তু আমি বিষয়টাকে খুব সহজ ভাবে নিতে চাই। সম্ভবত আপনার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না কখনও, তবু বলব, পথ চলতি এরকম একটা আসর, ভাগ্যে না থাকলে হয় না। আমরা কেউ আপনার সমালোচক নই, আপনিও আমাদের নন। আমাদের এই টেনের কামরার কথার জন্ত, কোনো দায়িত্বও কাউকে বহন করতে হবে না। এটা নিতান্তই একটা আনন্দের খেলা।’

ইয়াকুব সাহেব কথাগুলো অত্যন্ত দ্রুত বললেন, চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, ‘আমার মনে হয়, আপনার প্রেমের ভাগ্য ভালোই। জুয়ার প্রবচনটা একেবারে মিথ্যা না। আমার প্রেমের ভাগ্য সত্যি খারাপ, মানে আমাকে দুর্ভাগ্য বলতে পারেন।’

কথাটা শোনা মাত্রই আমার দৃষ্টি জেমসনের দিকে পড়লো। নিজেকেই হিঁকার দিতে ইচ্ছা করলো। কারণ ইয়াকুব সাহেবের কথা শুনেই তাঁর বিবির দিকে ক্রি়ে দেখাটা একান্ত অশোভন। কিন্তু জেমসন বিবি হঠাৎ-ই যেন মুখ নিচু করে তাঁর সেই রঙীন ছবির পত্রিকার পাতা ওলটতে লাগলেন। হাতে

চারের কাপ, চৌচৌর কোণে যেন একটু হাসির চিকুর হানছে। হাফেজ বাইরের দিকে তাকিয়ে খাবার খেতে ব্যস্ত।

তবু না ভেবে পারি না এমন অনায়াসে ইয়াকুব সাহেব নিজের কথা বললেন কেমন করে। বিশেষ করে তাঁর আলোকপ্রাপ্তা রূপসী বিবিরই সামনে।

পরমুহূর্তেই ইয়াকুবের গলায় প্রশ্ন শোনা গেল, ‘তাই না জেসমিন?’

দেখলাম ঠুর মুখে হাসি। জেসমিন ঠুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কেমন করে বলব সাহেব বলুন, আপনি দুর্ভাগা প্রেমিক কী না?’

ইয়াকুব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘অবিশ্রি আমি একজন ভাগ্যবান স্বামী, জেসমিন আমার বিবি।’

জেসমিনও সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ‘সেটা আমার ভাগ্য।’

ইয়াকুব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। এতটা উচ্চস্বরে, আশা করা যায়নি, এবং ঠুর উচ্চহাসির সঙ্গে, আর কারো গলা বেজে উঠল না বলেই, কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো। জেসমিন চোখের কোণে তাকালেন হাফেজের দিকে, হাফেজ দেখছিলেন ইয়াকুবের দিকে।

জেসমিন বললেন, ‘কী হাফেজ সাহেব, তুমি কোনো কথা বলছ না কেন?’

ইয়াকুব সহসা হাসি ধামিয়ে বললেন, ‘ও আবার কি বলবে? ওর তো জুয়ার ভাগ্য খারাপ, প্রেমের চক্রে ওর ললাটে হাসছে।’

হাফেজ হেসে বললেন, ‘আমি জানি তুমি এ কথা বলবে।’

ইয়াকুব বললেন, ‘অনেক আগেই বলেছি। আর তুমি নিজেও জানো তোমার প্রেমের ভাগ্য কী রকম ভালো।’

জেসমিন বলে উঠলেন, ‘তাহলে আমার ভাগ্যকে কী বলতে হবে? মানে প্রেমের ভাগ্যকে?’

ইয়াকুব বললেন, ‘যেয়েদেব প্রেমের ভাগ্য জিতলেও ভালো হারলেও ভালো। রূপসী মাজেরই প্রেমের ভাগ্য ভালো।’

সাহেব দেখছি বিবির রূপ সম্পর্কে খুবই সজাগ। কথাটাও বোধ হয় একেবারে মিথ্যা বলেননি। রূপসী মাজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। পহলে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি। আমি এখনও পৃথক জেসমিন বিবির গুণের খবর জানি না। কিছু কিঞ্চিৎ ষ্টেটু আপাতত জানা গিয়েছে তাতে বুঝেছি, তিনি বাকপটিলসী এবং রসিকাও। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে কুণ্ঠিত না, খেলাতেও না, অবিশ্রিই তাস। ভিতরের খবর কে বলতে পারে? কিন্তু মাহুঘটা আমি কালকূট, হলাহল আমার ভিতরে। আমি সিঁদুরে মেঘ দেখলে

ভয় পাই। আমার মন বারে বারে ঠেক খায়, চমকায়। আমি যেন এই তিনের মধ্যে সিঁহুরে মেঘের রক্তাভা দেখতে পাই। যে সিঁহুরে মেঘের কোলে জমা আছে ব্যথা বঞ্চনা প্রেম আকাঙ্ক্ষা, তার মধ্যে কার কতখানি দায়, তা জানি না। ধরতাই পাই না, কিন্তু মনে হয় কোথায় যেন ভাল বেজে যায়।

জেসমিন বললেন, ‘কিন্তু আমি জানি, আমার প্রেমের ভাগ্য মোটেই ভালো না।’

ইয়াকুব বললেন, ‘কি রকম?’

জেসমিন বিবি গলার স্বর টেনে টেনে একটি কবিতার লাইন উচ্চারণ করলেন, উহুঁতে বা আরবীতে, যা আমার মতো আনাড়ি লোকের পক্ষে বোঝা যেমন সম্ভব না। মনে রাখাও তেমন সম্ভব না। আমি তাকিয়েছিলাম জেসমিনের দিকেই, ইয়াকুব আওয়াজ দিলেন, ‘ওয়াহু ওয়াহু!’

জেসমিনের দৃষ্টি পড়লো আমার দিকে। বললাম, ‘দয়া করে আমাকে একটু ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিন, আমি ধরতে পারলাম না।’

জেসমিন বললেন, ‘এর মানে হল, “তোমরা তার মদিহা ক্ষিতে কেবল হাসির ঝিলিক দেখেছ, চোখের জল দেখনি। তোমরা তাকে পেয়ালা ভরে পান করতে দেখেছ, শুধু তার ছাতি ফেটে যাওয়া দেখনি।”

এবার আমাকেও বলতে হয়, ‘চমৎকার।’

এবং এ ক্ষেত্রেও জেসমিন বিবির নয়া পরিচয়। ইয়াকুব সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি লব্জের প্রশংসা করছেন, না জেসমিনের হৃদয়ের ব্যাখ্যার?’

চমকে উঠি। তাইতো, শুধু মাত্র ছন্দ আর কথায় মুগ্ধ, না কি জেসমিনের প্রেমের ভাগ্যের তুলনায়? নিশ্চয়ই কথা ও ছন্দে। জেসমিনের এমন বেদনাদায়ক ভাগ্যকে আমি উজ্জ্বলিত প্রশংসা করব কেমন করে? বললাম, ‘আমি কবিতারই প্রশংসা করেছি।’

জেসমিন তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘাড় ছাঁটা চুলে ঝাপটা দিয়ে আমার দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন? আমার প্রেমের ভাগ্যের কথাই তো আমি বলতে চেয়েছি। আপনার কি বিশ্বাস হয়নি?’

এ যে বড়ো বিপদের কথা। মিয়ঁা বিবি যে শাখের করাত হয়ে ওঠেন! উনি বললেও কাটা পড়ি, উনি না বললেও কাটা পড়ি।

ইয়াকুব সাহেব বলে উঠলেন, ‘বিশ্বাস করার কোনো উপযুক্ত কারণ নেই বলেই উনি করেননি। তাহলে শোনো, আমি বলি।’ বলে তিনিও

জেসমিনের মতোই কোনো কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তার অর্থ ধরিয়ে দিলেন, এর মানে হলো, “বাদশা যখন ফকির সঙ্গে বোয়োর তখন তাকে চেনা যায় না। স্বখে যে কাঁদে, কে বলবে সে স্বখে আছে? জলের মধ্যেই যে মাছ থাকে, কে যেপে বলতে পারে কত পেয়ালা জল সে পান করেছে?”

শুনতে সবই ভালো লাগে, কিন্তু প্রশংসা করব কী না বুঝতে পারি না। কিয়ং তাকাই জেসমিন বিবির দিকে। জেসমিন ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, ‘তার মানে সাহেব আমাকে কপট বলছেন?’

ইয়াকুব বললেন, ‘না, কপট বলব কেন? অনেক সময়েই, অনেকের কথাবার্তা আচরণ থেকে সব ঠিক বোঝা যায় না, এ কথাই বলছি।’

জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে চোখের তারার ঝিলিক দিলেন। এ সময়ে কাপ ডিস ট্রে আর বিল নেবার জন্ত বেয়ারা এল। আমি বিল নেবার আগেই ইয়াকুব নিয়ে নিলেন, বললেন, ‘আপনার চায়ের বিলটা আমাকে মেটাতে দিন, কারণ এর পরে অনেক দানই তো আমার কাছে আপনাকে হারতে হবে। আমি না হয় একটু প্রতিদান দিলাম।’

কিছু বলা গেল না, যদিও বলার ইচ্ছা ছিল, গলা যখন কাটবেনই, তখন আর এ প্রতিদানটুকুই বা কেন? বলতে পারলাম না। বেয়ারা বিল টিপস্ আর কাপ ডিস ইত্যাদি নিয়ে চলে গেল। হাফেজের ঠোঁটে তখন সিগারেট, তিনি বললেন, ‘তাহলে আমিও একটা বয়েদ বলতে চাই।’ বলে তিনিও জেসমিন আর ইয়াকুবের মতোই কবিতা বলে আমাকে মানে বলে দিলেন, “আমি গোলাপ ভেবে যখন ফুল ছুঁতে গেছি, তখন আমার কাঁটা বিঁধেছে। যখন রবাব বাজাতে গেছি, তার ছিঁড়ে গেছে। পেয়ালা তুলে যখন সরাব পান করতে চেয়েছি, তা বিষ হয়ে গেছে। নারীকে যখন আলিঙ্গন করতে গেলাম, তখন আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে গেলাম। খোদা আমাকে জানালেন, হুনিয়ায় সকলের ভাগ্যে সব কিছু জোটে না।”

জেসমিন সঙ্গে সঙ্গে যেন বড় সমবেদনায় জিত দিয়ে তু তু শব্দ করলেন। কিন্তু চোখের কটাক্ষে, ঠোঁটের হাসিতে বিদ্রূপ।

ইয়াকুব বললেন, ‘ওয়াহু ওয়াহু, হাকেক তোমার মতো এমন দুঃখী আর হয় না।’

জেসমিন বিবি তাঁর উন্নত বক্ষে হাত চাপা দিয়ে সনিখাসে বললেন, ‘আমার বুক ফেটে যাচ্ছে হাকেক, তুমি হাত দিয়ে দেখতে পারো।’

হাফেজ হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, ‘হাত দিয়ে কি কাটা বোঝা যায়? কাটা বোঝা যায় দিল কাটা মাহুবকে দেখলেই।’

ইয়াকুব আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘বাঙালী দাদা, এবার আপনি কিছু বলুন।’

হাত জোড় করে অসহায় ভাবে বললাম, ‘বিশ্বাস করুন, আপনাদের এরকম কোনো কবিতা আমার জানা নেই।’

জেসমিন ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘মানতে পারি না। বাঙালীরা খুব কবিতা জানে।’

বললাম, ‘জানি, কিন্তু আপনারা যে রকম সুন্দর সব ছড়ার মতো বললেন, এ জিনিস আমাদের কবিতায় ঠিক নেই।’

জেসমিন বললেন, ‘তবু যা হোক কিছু বলুন, যে কোনো ভাষা থেকে।’

একে বলে বিপদ! বিপদ নানা রকমের, এও তার রকমকের। বাঙলা থেকে সহসা কিছু খুঁজে না পেয়ে বাঙলায় অনুদিত একটি ছোট জাপানী কবিতা বললাম—

‘কী করি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই।
ভাবিলাম বনে গিয়া
জুড়াব তাপিত হিয়া।
তুনি লেখা অর্ধ রাত্রে
কাদে মৃগী কম্প গাজ্রে।’

আমার অকম ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে হলো। ওয়া সবাই উল্লসিত হয়ে বাজলেন, ‘চমৎকার, চমৎকার!’

জেসমিন আলাদা ভাবে বললেন, ‘আমরা সবাই যা বলেছি, তার মধ্যে আপনারটাই সব থেকে সুন্দর।’

ইয়াকুব বললেন, ‘এটা আমারও বক্তব্য এবং মনে হলো আপনি যেন আমারই মনের কথা বললেন।’

হাফেজ বলে উঠলেন, ‘আমার মনে হলো আমার নিজের মনের কথা।’

‘চমৎকার! পাণ্ডনাটা এখন আমার ভাগেই বেশি দেখছি।’ জেসমিন বললেন, ওর কথাটা ওর নিজেরই থাকতে দাও না, নিজেদের দলে টেনে নিতে চাইছে কেন?’ বলে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ‘বড় করণ

আপনার কবিতা। কোথাও শাস্তি নেই, এমন কি বনের গভীরেও না, কারণ সেখানেও হরিণী কাঁদে। আপনার অভিজ্ঞতা মর্যাস্তিক।’

তাড়াতাড়ি বলি, ‘না না, আমার অভিজ্ঞতা না। আপনাদের আমি শুনিয়েছি এক জাপানী কবির কবিতা।’

জেসমিন বললেন, ‘কবিতা ষারই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কবি যখন লিখেছিলেন, সেই মুহূর্তে সেটি কবির অভিজ্ঞতা। পাঠকের বখন তা কোনো কারণে মনে পড়ে যায়, তখন তা পাঠকেরই অভিজ্ঞতা।’

জেসমিনকে এই মুহূর্তে মনে হলো সে বিহুশীও বটে। একদিক থেকে কবি, কবিতা এবং পাঠকের সম্পর্কটা এই রকমই। স্টার বৈশিষ্ট্য এই, তিনি অমৃতবের জগতে তাঁর ভাষা দিয়ে আমাদের মধ্যে বিচরণ করেন। নিজেদের প্রকাশের জন্য আমরা কবির ভাষাকে ছেকে তুলে নিই। জেসমিনকে বললাম, ‘সে হিসাবে আপনার কথা ঠিক, সম্ভবত জাপানী কবির অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনেও কখনও কখনও ঘটে।’

ইয়াকুব বললেন, ‘মানতেই হবে, জেসমিনের কথা আপনাকে মানতেই হবে। আমিও মানি। আরও বেশি করে বলতে পারি, অভিজ্ঞতাটা আমার বড়ো বেশি নিজস্ব বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য আমি কবিতার লাইনগুলো ইংরেজিতে লিখে রাখতে চাই, উহূর্তে অনুবাদ করার চেষ্টা করব।’

বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে একটা মোটা পার্স বের করলেন। আমার সঙ্গে একবার জেসমিনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। তিনি হেসে হাকেকের দিকে তাকালেন। হাকেক তাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে জেসমিনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জেসমিন আসন ছেড়ে নেমে বললেন, ‘আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।’

প্রথমে তেমন ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি, এখন জেসমিন বিবিকে দেখছি, যা দেখেছিলাম, তিনি তার থেকে অনেক বেশি সুন্দরী। দাঁড়াবার আগে তাঁর উজ্জল স্বাস্থ্যের স্ফুটিত শরীরের পূর্ণ ছবিটিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর নিটোল অনেকখানি থোলা কাঁধ, ঈষৎ দৃশ্যমান কণ্ঠা, বুকের নিচে মেঘবর্জিত নান্তিস্থল, ক্ষীণ কটি এবং প্রায় বন্ধ সমান নিতম্ব তাঁর রূপকে অনেকখানি যেন শাণিত করেছে। তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে ইয়াকুব সাহেব তৈরি। পার্স থেকে বের করেছেন ছোট এক টুকরো কাগজ, হাতে কলম। বললেন, ‘দয়া করে আপনার কবিতাটি আর একবার পুনরুক্তি করুন।’

অগত্যা। তবে এখানে যে যা-ই বলুন, কেন যেন বারে বারে মনে হচ্ছে, সব থেকে মর্যাস্তিক অবস্থাটা যেন ইয়াকুব সাহেবেরই। আমি বলতে আরম্ভ

করার সময়ই হাফেজ উঠে বাইরে গেলেন। ইয়াকুব ফিরে তাকিয়ে দেখলেন না, লিখতে ব্যস্ত থাকলেন। আর কবিতা বলতে বলতে আমার মনে হলো, সম্ভবত আমার সামনে একটি ত্রিকোণ চক্রের বর্ণালীবীক্ষণ দেখছি, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লাডিফিকেশন...ছেলেবেলায় এ খেলাটা আমার নিজেরা খেলনা তৈরি করে দেখেছি। তিন খণ্ড কাঁচের টুকরো, ত্রিকোণ ভাবে লুকাড়ি দিয়ে বেঁধেছি, যেন একটি নলের মতো। তার নিচের দিকটা থাকতো এক ভাঁজ সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার মধ্যে কেলে দিতাম কয়েকটি মুহুরির ডাল, হলুদে রঙের মুগ ডাল, আর গুটিকয়েক কালো জিরা। তারপরে এক চোখ বন্ধ করে ঘুরিয়ে দেখতাম প্রতিবারেই বিচিত্র আকারের ত্রিবর্ণ তিনটি চিত্র ফুটে উঠত। ঘোরালেই চিত্রে পরিবর্তন, রঙ কালো লাল হলুদ। মিলেমিশে তিনটি চিত্র বদলে বদলে নানা ছন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠতো।

আজ এই মুহূর্তে সেই হাতে বানানো খেলনা, বর্ণালীবীক্ষণের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি যেন সেই রকম বর্ণালীবীক্ষণের মধ্যে ত্রিবর্ণের তিনটি ছন্দের রূপ দেখছি। কখনই কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নেই। এখানেও সময়ে মিল নেই, আর এঁরা নিতান্তই তিনটি রঙের দ্রব্য মাত্র না, তিনটি মাতৃব। অবধারিত ভাবে এখানে একটি ত্রি-হৃদি নাটক চলেছে, যার অভ্যন্তরের চেহারাটির পুরোপুরি দেখতে পেয়েছি বলব না, ক্ষীণ একটা অল্পমান যেন পাচ্ছি। আমার সেই ক্ষীণ অল্পমানের মধ্যে যদি সত্যের সূত্র কিছুমাত্র থেকে থাকে, তবে বলতে পারি, জাপানী কবিতার মর্যাদাসিক অভিজ্ঞতা এখন ইয়াকুব সাহেবের ক্ষেত্রেই বোধ হয় সব থেকে সত্যি।

কবিতাটা লেখা শেষ হয়ে গেলে, ইয়াকুব তা পাঠ করলেন, কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপরে একটু হেসে বললেন, ‘একটু শাস্তির জন্তু যার কোথাও ঘাবার নেই, আমার মনে হয়, একটি মাত্র জিনিসই তাকে শাস্তি দিতে পারে।’

আমি কোতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘কী সেটা?’

ইয়াকুব বললেন, ‘মৃত্যু!’

আমি যেন সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলাম, চমকে ইয়াকুবের দিকে তাকালাম। ইয়াকুব বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাইরের অপরাহ্নের আলোয় একটু রক্তাভা দেখা দিয়েছে। গাছপালা মাঠের শস্য সবই যেন বিকালের স্নান রক্তাভায় বিষন্ন মুখে হাসছে। যদি ঠিক দেখে থাকি, আমার মনে হলো, ইয়াকুবের মুখেও একটি রক্তাভা; কিন্তু বিষন্নতার থেকেও যেন একটি ঘাতন। দমনের কষ্ট তাঁর মুখে। পথ চলতি সামান্য পরিচয়। এমন অনেকের সঙ্গে

হয়। রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে হয়তো সারা জীবনে আর কখনও দেখা হবে না, তাঁদেরই একজনের জ্ঞান সহসা আমার বুকের কাছে একটা তীর বঁধা অস্থূল চিন্টি করে উঠেছে। আমি বললাম, ‘কিন্তু মাক করবেন ইয়াকুব সাহেব, মৃত্যুই কি সব শান্তি এনে দিতে পারে?’

ইয়াকুব যেন একটু চমকালেন, হয়তো আমার অস্তিত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। বললেন, ‘তা ছাড়া এমন মানুষের শান্তি আর কিসে আসতে পারে। সে তার শেষ অভিজ্ঞতার কথাই মনে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে এবং শান্তি যে কোথাও নেই এটাই বলেছেন। অতএব?’

আমি বললাম, ‘মৃত্যু নয়। যদি মৃত্যুই সেই শান্তি হয় তবে সেই শান্তি ভোগ করবে কে? মৃত্যু শীতল শূন্য অন্ধকার, তারপরে আর কিছুই থাকে না।’

ইয়াকুব বললেন, ‘ধাকবার দরকার কী? জীবন যদি এমন জায়গায় আসে, যখন যেকোনো ছুটে যাওয়া যাক, তাতে শুধু আগুন বেড়ে ওঠে, আরও বেশি জ্বলে থাকে, তখন তো মৃত্যুই শ্রেয়, সে-ই তো শ্রেষ্ঠ বন্ধু।’

আমার মনে পড়ে যায়, ‘মরণেরে, তুই মম শ্রাম সমান।’ কিন্তু সে তো শ্রামের মধ্যে লীন করে দেওয়ার মৃত্যু। সে মৃত্যুতে স্থখ আছে। ইয়াকুব সাহেব যে মৃত্যুর কথা বলেন তার মধ্যে জীবনের রূপ নেই। আবার ঠাকুরের কথাই মনে আসে,

“রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে

রহে না যে

বিলাপের অবকাশ....।”

ইয়াকুব সাহেব যে রূপহীন মৃত্যুর কথা বলেন, তার মধ্যে মৃত্যুহীনতার অপরূপ সাজ দেখতে পাই না। আসলে আমার বিদ্যাস্পৃষ্ট চমক যেখানে, তা হলো আত্মবিনষ্টি। আমার মনে হয়েছে তিনি আত্মহত্যার কথা বলেছেন।

আমি বললাম, ‘দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যেও একটা শান্তি আছে। মাফ করবেন, এটা নিতান্ত আমার ধারণার কথা। অন্তিমায় কী নিয়ে আমরা থাকতে পারি? আমার মনে হয়, হরিণীর কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়েই জীবনকে বুঝে নিতে হবে। অবিমিশ্র শান্তি বলে বোধ হয় কিছু নেই।’

ইয়াকুব বিষম হাসলেন, বেলা শেষের স্নান আলোর মতোই। বললেন, ‘হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু এমন মানুষ যদি থাকে, যে মনে করে, তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আর নেই, সে অপ্ৰয়োজনীয়, তার কী জবাব?’

বহুকথিত জবাব হয়তো অনেক আছে, জাবর কাটার মতো কিন্তু আবার
ঠাকুরের কথা মতোই প্রসন্ন আসে মনে,

‘ঘরেও নহে পারেও নহে

যে জন আছে মাঝখানে

সঙ্কাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে।’

সংসার যাকে অপ্রয়োজনীয় বলে জবাব দিয়ে দেয়, সেখানে সংসারের
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্রয়োজন অপ্রয়োজনকে যাচাই করা যায়। তার অবকাশ
থাকে। কিন্তু যে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বলে জবাব দিতে চায় তাকে কী বলার
থাকতে পারে। চরিতচরন কথা বলে লাভ নেই, কারণ কথা এক জিনিস, বঞ্চনা
যন্ত্রণা আর এক জিনিস। যে জলে সে-ই জানে আগুন কী। কথা দিয়ে আগুন
নেভানো যায় না, অন্তরের জ্বালাও না। ইয়াকুব আমার দিকেই তাকিয়ে
ছিলেন। ঠুকে আমি কোনো মামুলি কথা বলতে পারলাম না। বললাম,
‘ইয়াকুব সাহেব, আপনি অল্পভূতিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আপনাকে আমি নতুন
কথা কিছু বলতে পারব না।’

ইয়াকুব বললেন, ‘পৃথিবীতে নতুন কথা খুব কম আছে, আমরা তাতে নানান
রকম রঙ দিতে পারি। তবু আপনি যে কথা বলেছেন, হরিণীর কান্নার সঙ্গে
একাত্ম হয়ে থাকতে হবে, সেটাই ঠিক। আরো একটা ঠিক আছে, তা
হলো জোর করে থাকা। মৃত্যু না, হত্যা। অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নাশ করা।’

বলতে বলতে ইয়াকুবের মুখ যেন টকটকে লাল হয়ে উঠলো, তাঁর দুই চোখ
যেন রাগে আর ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। শক্ত চোয়াল আর ছুরির মতো শাবিত
তাঁর বহু চোঁটের অস্তিত্ব। এক মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠলো তাঁর প্রকাণ্ড
হাতের মুঠি। পরমুহূর্তেই আবার শিথিল হয়ে গেল। একটি নিশ্বাস পতনের
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কঠিন মুখের অগ্নিস্নানক অপসৃত। ফিরে এলো সেই অন্তরঙ্গ
বিশ্বস্ততা। নিজের মনেই মাথা নেড়ে হাসলেন, বললেন, ‘না, পৃথিবীতে সকলের
জন্ম সব পক্ষা নয়। অনেকে হয়তো বিকল্প অস্তিত্বকে নাশ করার মধ্যোই নিজের
অস্তিত্বের মূল্য বোঝে। কিন্তু এ তো অত্যন্ত সাময়িক। বিনষ্টির মধ্য দিয়ে
কখনই নিজের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বস্তব করা যায় না। তাতে
হয়তো যন্ত্রণাই বাড়ে। তাই নয় কী?’

আমি তাড়াতাড়ি সম্মতি জানিয়ে বললাম, ‘নিশ্চয়। এর থেকে সত্যি কথা
কি হতে পারে। আপনি আপনার মহত্বের কাছাই বলেছেন।’

ইয়াকুব ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বললেন, ‘না না, মহত্বের কথা বলবেন

না। কথাটা আমাকে দু'একবার শুনেছে, তাতে মহত্ব শব্দটার প্রতি আমার অশেষ ঘৃণা। আমি মহৎ নই, মহত্ব প্রকাশের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই, তার ওপরে সেই মহত্ব, যদি হয় নিতান্তই অন্ধের অসহায়তার কারণে।'

এ সময়েই জেসমিন কামরায় প্রবেশ করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কোনো গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে নাকি?'

আমি বললাম, 'কিছুমাত্র না।'

ইয়াকুব জেসমিনের দিকে ফিরে তাকালেন, হেসে বললেন, 'অনেক গুরুতর বিষয়ও, অত্যন্ত হালকা চালে চালিয়ে নেওয়া যায়। গুরুতর বিষয় হতে পারে, গুরুত্ব না দিলেই হলো।'

ইয়াকুব শব্দ করে হেসে উঠলেন। হাফেজ ঢুকলেন। ক্রমেই আমার চোখের সামনে তিন কুশীলবদের ত্রিকোণ নাটক অনেক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। পঁচাত্তরটা জানা নেই। কিন্তু একজনের রক্তের শিরা ছিন্ন হচ্ছে, আর অন্য দু'জনের প্রাণে রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি। সঞ্চারিত রক্তের আভা দু'জনের চোখে মুখে। ছিন্ন-শিরা ব্যক্তির মুখ ক্রমাগত নীরক্ত। মূল কারণ কী? কোনো সাংসারিক স্বার্থ? অথবা একান্তই শাসনহীন হৃদয়ের খেলা?

জবাব নেই। জবাব হয়তো পাওয়াও যাবে না। রহস্যঘেরা নাটক আগামীকাল সকালে বয়ের ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকেই হয়তো অহুদবাটিত রহস্য নিয়েই শেষ হয়ে যাবে। পথ চলতে আমি কেবল হাঁতড়েই মরব। কী তার দরকার? জীবনে সব প্রশ্নের জবাব মেলে না। জবাব চেয়েও কোনো কল নেই। অতএব চলো বোম্বাই এক্সপ্রেস। তুমি যাত্রী বহন করে চলবে, যাত্রীরা তোমার গর্ভে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে যাবে। তারপরে আর কেউ কারোয় খোঁজ নেবে না।

ইয়াকুব সাহেব আমাকে ডাকলেন, 'আমুন স্তার, আপনার আসন নিন, আর টাকার ধলিটা বের করুন, বধ করা যাক।'

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা না। প্রথমে যা নিয়ে বসেছিলাম, তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। ধলিতে হাত দিতে হবে বৈ কি। আমি টাকা নিয়ে বললাম গিয়ে জেসমিন বিবির বামে। তাঁর দক্ষিণে হাফেজ ইতিমধ্যেই একগোছা টাকা সামনে রেখে বসেছেন। বললেন, 'বধ হবার জন্য বসেই আছি ইয়াকুব ভাই, তোমার অস্ত্র বের করো।'

ইয়াকুব সাহেব তাস ফাটাতে ফাটাতে খেমে গিয়ে খুব যেন অবাক হয়েছেন এমনি ভাবে হাফেজের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বধ হবার জন্তে বসে আছো ? তুমি ? আমি তো জানি তুমি ইতিমধ্যেই একটা মর্দা !’

আমি আর হাফেজ দু’জনেই ইয়াকুবের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কিন্তু জেসমিন বিবি খিলখিল করে হেসে বেজে উঠলেন, ঝুঁকে পড়লেন, তাঁর নরম কালো কেশ মুখ ঢেকে দিল। হাফেজের মুখে চকিতে একটা লাল ছটা লেগে গেল। একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে জেসমিনকে দেখলো তারপরে বিড়বিড় করে বললো, ‘তা বলতে পারো, আমি আগেই হেরেছি।’

ইয়াকুব সে কথা যেন শুনলেন না, জেসমিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ঠিক বলিনি জেসমিন ?’

জেসমিন হাসতে হাসতেই আবার সোজা হলেন, মুখে পড়া চুলের গোছা হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে দিয়ে বললেন, ‘এক রকম ঠিকই বলেছেন সাহেব, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই বধ করা যাচ্ছে না।’

ইয়াকুব জেসমিনের দিকে তাকালেন অপলক স্থির চোখে। জেসমিন হাসি-মুখ অস্ত্রদিকে ফেরালেন। ইয়াকুব একটি নিশ্বাস ফেলে নীরবে তাসের গোছা এগিয়ে দিলেন জেসমিনের দিকে। জেসমিন তাসের গোছা তাঁর হাত থেকে নিলেন। ইয়াকুব বললেন, ‘সত্যি কথা হলো না।’

জেসমিনের টেপা ঠোটে হাসি, ঝটিতি একবার ইয়াকুবের দিকে দেখে আমার দিকে তাসের গোছা বাড়িয়ে ধরলেন। আমি কেটে দিলাম। জেসমিন বিবি তাস বটন শুরু করলেন। আমি ঠাঁর হাতের দিকে দেখছি, আর অবদমিত কৌতূহলে আমার ভিতরটা যেন ফান্সের মতো ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে নিঃশব্দ কিন্তু বায়ু এই দৃশ্যের মধ্যে নাটকীয়তার একটি তীব্র মুহূর্ত উপস্থিত। অথচ চরিত্রের তাদের সংলাপ বন্ধ রেখেছে। সংলাপের ভিতর দিয়েই আমি নিকটবর্তী। ঘটনার অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই আমার জানা নেই। সেই সংলাপ বন্ধ, তার পূর্বে একজনের মুখে শোনা গিয়েছে, আপনাকে কিছুতেই বধ করা যাচ্ছে না। আর একজন স্থির অপলক চোখে কেবল তাকিয়ে বলেছেন, সত্যি কথা হলো না। তারপরে, নিঃশব্দ তাস বটন। আমি জেসমিনের হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। হাফেজও তা-ই। কেবল ইয়াকুব তাকিয়ে আছেন এখন জেসমিন বিবির মুখের দিকে। কেবল একটা ব্যাকুল আবেগের ছাপ ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। যেন এখনও কোনো জবাবের প্রত্যাশা। আর এই মুহূর্তের সমস্ত কিছুই কেন্দ্র যেন জেসমিন। দর্শক হিসাবেই যদি আমার এতখানি

ব্যাকুলতা জাগে, চরিত্রের অবস্থা কী? এই চরিত্রদের মতো ভূমিকা যদি নিজেকে কখনও গ্রহণ করতে হয়, মনে হয় খাসরুদ্ব হস্বে যাবে।

তাস বণ্টন শেষ হলো। জেসমিন তাকালেন ইয়াকুবের দিকে। তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় হলো। জেসমিন বিবি আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাত ইয়াকুবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ইয়াকুব তাঁর হাত ধরলেন। জেসমিন আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন। ইয়াকুব আস্তে আস্তে জেসমিনের হাতে ঝাঁকুনি দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যেই কি ঘটে যায়, বুকে উঠতে পারি না। ইয়াকুব আর জেসমিন বিবি হেসে উঠেন আস্তে, তারপরেই দু'জনে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। হাফেজ হেসে বলে উঠলো, 'ইয়াকুব—জেসমিন—জিন্দাবাদ!'

ইয়াকুব বললেন, 'ও হে মূর্দা, খেলা শুরু করো তো! তোমার তহবিল ফাঁক করি।'

হাফেজ বললেন, 'তোমরা যা খেলছো তাতে আমার খেলার স্বেযোগ কোথায়?'

জেসমিন বললেন, 'স্বেযোগ অনেক আছে।'

ইয়াকুব আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দুঃখিত দাদা, কিছু মনে করবেন না।'

আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'কিছুমাত্র না।'

জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আমাদের বন্ধু।'

বললাম, 'ধন্যবাদ।'

জেসমিন আবার বললেন, 'এবং আপনি বুদ্ধিমান।'

আমি আবার বললাম, 'ধন্যবাদ।'

জেসমিনের সঙ্গে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। ইতিমধ্যে জেসমিন তাস উল্টে দিয়েছিলেন, একটি রুহিতনের চার। তার মানে জোকার হলো পাঁচ। আমারই প্রথম টানা, বণ্টন করেছেন জেসমিন। তাস টানলাম একটি ইন্সাবনের টেকা, একেবারে মূল্যহীন। জেসমিন তাকালেন আমার দিকে। আমি ঠোঁট উল্টে টেকাটি দেখিয়ে দিলাম। জেসমিন বললেন, 'সরি।'

জুয়াতে যার দুঃখের কপাল তাকে আর দুঃখ জানিয়ে কি হবে। আমাদের কথায় আছে, 'কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি।' তবু খেলতে হবে।

খেলতে খেলতে কখন অজ্ঞকার হয়েছে, কে আলো জ্বলেছে, নজর করে দেখিনি। টনক নড়লো যখন দেখলাম, দ্বিতীয়বারের নিম্নে বসা তহবিল শূন্য।

ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে। আমার আর হাক্কেজের একই অবস্থা। দু'জনের তহবিলই প্রায় শূন্য। ওদিকে মিয়ঁ। বিবি তহবিল রীতিমত ফেঁপে উঠেছে। বুঝতে পারছি না এটা কেমন করে হয়। ইতিমধ্যে একটা বিষয় পরিষ্কার, জীবনের ভাগ্যে খারাপ, আজ একদিকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, খেলার ভাগ্যে তাঁরা যেন রীতিমত হাত মিলিয়ে চলেছেন। এও কী ভাগ্যের ব্যাপার?

জেসমিন ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সাহেব, উঠছেন কোথায়? খেলায় ইস্তফা দিচ্ছেন?'

বললাম, 'না ম্যাডাম, টাকা বের করতে যাচ্ছি।'

জেসমিন খিল খিল করে হেসে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কতো হেরেছেন বলে অনুমান করেন?'

হাক্কেজ বললেন, 'আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের বাঙালী সাহেব তিরিশ থেকে বত্রিশ টাকা হেরেছেন, আমি নেট পয়ত্রিশ।'

ইয়াকুব বললেন, 'তাহলে তো আমাদেরও কিছু বের করতে হয়।'

বলে, জেসমিনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় যেন কিছু জিজ্ঞেস করলেন। জেসমিন ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। ইয়াকুব উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের বার্ষ থেকে একটি চামড়ার বড় হাতব্যাগ টেনে নামালেন। আমি যখন উঠে গিয়ে নিজের অ্যাটাচি খুলে পার্স থেকে টাকা বের করছি, ইয়াকুব তাঁর ব্যাগ থেকে বের করলেন আনুকেরা ঝকঝকে একটি বিজাতি হুইস্কির বোতল, যার নাম ভ্যাট উনসন্তর। হাক্কেজ উঠে দরজা বন্ধ করে, ভিতর থেকে লক করে দিলেন।

জেসমিন বিবিও আসন ছেড়ে নেমে, আসনের নিচে রাখা একটি বেতের ঝুড়ি থেকে বের করলেন তিনটি কাঁচের গেলাস। বড় একটি রূপোলী ঝকঝকে জলের পাড়ে জল ছিল আগেই দেখেছি। সব বের করে সাজালেন দেওয়াল আয়নার নিচের টেবলে। এতক্ষণ আমি গুঁর কাছে ছিলাম মিস্টার বা স্তর।

এখন সাহাব। বললেন, 'সাহাব, আপনার পানপাত্রটা দয়া করে দিন।'

পানপাত্র আমার একটি নিশ্চয় আছে, প্রাক্টিকের রঙীন গেলাস। কিন্তু সেটাতে জলপানই হয়ে থাকে, সুরা না। এতক্ষণে দেখছি জুরার আসনের বোলকলা পূর্ণ। এতক্ষণ জুরা ছিল, নারী ছিল (অবিশ্টিই সং অর্থে), এবার সুরা। সম্ভব নাই জেসমিন বিবিও সুরাপান করবেন, কারণ তিনটি গেলাস

সাক্ষ্যাবার পরে আমার কাছে চতুর্থটি চেয়েছেন। বললাম, ‘ওটাতে আমি ঠিক স্ববিধা করতে পারব না’

ইয়াকুব বললেন, ‘অসম্ভব পরাজয়ের গ্লানিটা সামলাতে পারবেন।’ বলে হাসলেন।

আমি বললাম, ‘উটোটাই হবে। একে হারছি, ওই বস্তু আমার পেটে গিয়ে বুদ্ধি লোপাট করবে, আরও হারতে থাকবে।’

জেসমিন জিজ্ঞেস করলেন, ‘এখন যা হারছেন তার থেকেও বেশি হারবেন?’

ইয়াকুব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘তাহলে ঠকেই আগে দাও জেসমিন, সব থেকে বেশি করে দাও।’

ওঁর বলার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। তার মধ্যেই জেসমিন বললেন, ‘দিন সাহাব, আপনার গেলাসটা দিন। আমাদের সঙ্গে আপনাকে একটু নিয়ে বসতেই হবে।’

আমি জেসমিনের চোখের দিকে তাকালাম। বিবির চোখে এবার বলতে গেলে মদ্রির কটাক্ষ। শত হলেও আমি পুরুষ তো! জেসমিন বিবির রূপের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। চরিত্রকে দোষ দিয়ে কী করব। মাতৃজাতি যে আসলে প্রকৃতির অংশ। কেবল যে তাঁদের গর্ভে জন্মাই, তা না, জীবননাট্যের অনেকখানি খেলা তো তাঁদের সঙ্গেই। কোন্ গুণনিধির গান যেন শুনেছিলাম, নায়িকার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কেন এই অভাজনের নয়নের দোষ দাও, যদি নিজেকে দেখতে পেতে, তাহলে এমন দোষ দিতে পারতে না। আর মনে পড়ে যায়, সম্ভবত কে. মল্লিকের রেকর্ডেই শুনেছি, ‘বঁধু চরণ ধরে বারণ করি, টেনো না আর চোখের টানে।’ তার চেয়ে বাড়িয়ে দিই গেলাসখানি।

আমার ছোট জল বোতলের মুখে গেলাসটি ছিল। সেটা নিয়ে জেসমিন বিবির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘প্রাণে মারবেন না, কিঞ্চিৎ জীয়ে রাখবেন।’

জেসমিন তাঁর সর্বাঙ্গে প্রায় একটা সর্বনাশের কাঁপন দিয়ে খিলখিল করে হেসে বাজলেন। একটি চোখের পাতা নিবিড় করে বিহ্বলী রূপসী বললেন, ‘আপনারও কি মৃত্যু ঘটছে?’

বললাম, ‘কী করে আর তা অস্বীকার করি? শত হলেও পুরুষ হয়েই জন্মেছি যে!’

হাক্কেজ আর ইয়াকুব, একসঙ্গে আওয়াজ দিলেন, ‘ওয়াহ্ ওয়াহ্!’

ইয়াকুব সাহেব তাঁর মস্তবড় দক্ষিণ হস্তখানি বাড়িয়ে দিচ্ছে বললেন, ‘হাত মেলান বাঙালী দাদা, হাত মেলান।’ বলে আমার হাত টেনে নিয়ে, জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। হৃদয়ের উত্তাপ কতখানি আছে জানি না, সাহেবের হাতের উত্তাপ বেশ।

জেসমিন বললেন, ‘অনেক ধন্যবাদ সাহাব, আমি খুবই আহ্লাদ বোধ করছি। তবে একেবারে প্রাণে মেরে আমার সুখ হয় না। আপনি যেমনটি চেয়েছেন তেমনি ভাবেই আপনাকে আমি একটু একটু জীইয়ে রাখবো, কিন্তু চালাব আমার খুশি মতো, আপনি বাদ সাধবেন না।’

আমিও এখন প্রগল্ভ। জানি না, কতটা নিজের ইচ্ছায়। এ রকম ক্ষেত্রে প্রগল্ভ বোধ হয় আপনি আসে। অস্তুত বরুণ ওষ্ঠ সন্দ্বিধমনা ব্যক্তি ছাড়া। এখানে আমার সে রকম কোনো চিন্তা মাথায় আসছে না। বরং আমি একটু উৎফুল্লই বোধ করছি। আমার এই ঝুকঝুক এক্সপ্রেসের যাত্রায়। বললাম, ‘আমার সে সাহস নেই।’

জেসমিন আবার বললেন, ‘ধন্যবাদ।’

ইয়াকুব তাঁর হাতে বোতলটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘তোমার হাতে পরিবেশন, ছিপিটাও ভূমি খোলো।’

জেসমিন বিবি মাথা নেড়ে বললেন, ‘পুরুষের কাজটা পুরুষরাই করুক।’

কথাটা বলেই ঠর মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। তিনি চকিতে একবার আমার দিকে দেখে দৃষ্টি নত করলেন। তাঁর লজ্জাটা আমাকেও যেন বিঁধলো, আমি টাকা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জেসমিন বিবির মুখের আগলখানি বেশ খোলা, বোধ হয় প্রাণটাও। তা না হলে এমন বাক্য অনার্যাসে বলে আবার নিজেই লাল হয়ে ওঠেন?

ইয়াকুব বোতলটি হাক্কেজের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘তাহলে হাক্কেজ খোলো।’

হাক্কেজ বললেন, ‘না, বাঙালী সাহাবকে দাও।’

জেসমিন বললেন, ‘তা-ই ঠিক। আমার নতুন শিকার।’ বলেই চোখে কিলিক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

শিকার? বেশ আপাতত তাই স্বীকার করে নিলাম। আপাতত বলে না, অনেকটা তো স্বীকার করেই নিয়েছি। বললাম, ‘খুশির সঙ্গে।’

ইয়াকুব বোতলটি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। জেসমিন তাকিয়ে ছিলেন বোতলের ছিপির দিকে। আমি ছিপিতে মোচড় দিতে গিয়ে একটু যেন

অবস্থিতেই পড়ে গেলাম। জেসমিনের নিজের মুখ লাল হয়ে ওঠা, ঠঁর নিজের কথা তো এই মুহূর্তেই ভুলে যাওয়া যায় না। তথাপি খুলতেই হলো।

জেসমিন হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘এবার আমাকে দিন।’

জেসমিনের প্রতিটি কথা এবং কটাক্ষেই যেন একটি বিশেষ ইঙ্গিত। অনেকটা চর্যাপদের গানের মতো, শুনতে এক রকম, কিন্তু কথার মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় থাকে সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়েছে। সন্ধ্যার ছায়ার বা স্পষ্ট না, অথচ একেবারে অস্পষ্টও না। জেসমিনের ভাষাও সেই রকম যেন। উনি নিচু হয়ে গাড়ির ঝাঁকুনিতেও বোতল থেকে গেলাসে প্রায় এক মাপে পানীয় ঢাললেন। তারপরে জলের জাগ তুলে পায়ে পায়ে জল মিশিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হতে দিন, আপনাদের মাঝখানে। আপনারা তিনজনে কাঁচের গেলাস নিন, আমি নিচ্ছি এই রঙীন প্রাক্টিকের গেলাস। আপনার আপত্তি আছে সাহেব?’

ইংরেজিতে বোধ হয় একেই বলে আইডিয়া এবং মানতেই হবে আইডিয়াটি অপূর্ব! তিনকে এক করে, চারের এক হিসাবে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করতে চাইছেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘আপত্তির কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।’

ইয়াকুব বললেন, ‘তোমার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। অভ্যর্থনা—’

তিনি গেলাস তুলে ধরলেন। আমরা সকলেই তুলে ধরলাম। জানি না, এর পরেও উচ্ছ্বাসবশত, কেউ সব গেলাসগুলো জেসমিনকে প্রসাদ করে দিতে বলবেন কী না। স্রোতের ধারা যদি সেদিকে যায়, তাহলে অনেক দূরই যেতে পারে। ঠোঁটের স্পর্শ না হয়ে তা চরণের স্পর্শও হতে পারে অথবা তারও অধিক। কিন্তু ভতোদ্র গড়াবার মতো স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী এখানে নেই। জেসমিন তাঁর পায়ে চুমুক দিলেন এবং একে একে সকলেই।

জেসমিন তাঁর জায়গায় উঠে বসে বললেন, ‘প্রথম পরিবেশন করে আমি শুরু করে দিলাম, তারপরে যে যার নিজেকে সাহায্য করবে।’

ইয়াকুবের দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনি একটু নিশ্চিত করে দিন, আপনার ভাণ্ডারে কি এই একটি বোতলই আছে?’

ইয়াকুব বললেন, ‘চিন্তিত হবেন না। যার যতো প্রয়োজন, সে ভতোখানিই পাবে।’

হাক্কজ জিত দিয়ে অভ্যুত শব্দ করে বললেন, ‘আমি আরও বহুবার খেলায় হারতে রাজী আছি।’

জেসমিন বললেন, 'তাহলে খেলা শুরু হোক।'

তাস বস্টন এবং খেলতে গিয়ে গেলাস রাখা একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। গদীতে রাখলে গাড়ির ঝাঁকুনিতে রাখা সম্ভব না। গেলাস হাতে নিয়েও খেলা যায় না। একমাত্র আমার আর ইয়াকুব সাহেবের সুবিধা, আমরা টেবলের সব থেকে নিকটবর্তী। গেলাস পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একটু দূরে হলেও হাফেজেরও খাবার পাত্র রাখার জায়গায় অনায়াসে গেলাস রাখার সুবিধা আছে। অসুবিধা একমাত্র জেসমিনের, কেননা উনি বসেছেন একেবারে মাঝখানে। ঝাঁকুনিতেই হাতের নাগালে কোনো জায়গা নেই। কিন্তু তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত না। জোড়াসন করে বসে দিব্যি তাঁর পাজিমা পরা কোলের মাঝখানে পাত্রটি রেখে, দু'হাতে তাস নিলেন।

বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ এই আসর দেখলে নিশ্চয়ই একটি অনাচারের গন্ধ পেতেন। ক্রকুটি চোখে দেখে অনেক নীতিবিগর্হিত ঘটনার কল্পনায় সন্নিহিত হুকুও হতে পারতেন। আমি এখন লিখতে লিখতে সেই অভাবনীয় ভ্রমণের ঘটনাটি মনে করে নিজেও অবাক হই। আসলে সমস্ত আসরটাই ছিল এক মর্মস্পর্ষ ব্যাধি ও যন্ত্রণার নাটক। অথচ বাইরের চেহারাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেন নারী সুরা বিলাস খেলার এক আসর। মাহুস আর তার বাস্তবতা কোনো ছকেই বাঁধা নেই।

পানের প্রথম স্কেপ শেষ করে দ্বিতীয় স্কেপ শুরু হতেই বন্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। হাফেজ উঠে দরজা খুললেন, ক্যাটারিং বেয়ারা, খাওয়ার পাত্রের বোঝা তার দু'হাতে। কখন গাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়েছে কারোরই খেয়াল ছিল না। ইয়াকুব হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'এটাই হচ্ছে ট্রেনের মুশকিল, সন্ধ্যা না হতেই খাবার। বেজেছে মাত্র সাড়ে আটটা।'

জেসমিন বললেন, 'আমি তো কিছু খাবই না, আপনারা যা হোক একটু মুখে দিন। একটা রাত্রে ব্যাপার তো।'

মানতেই হবে। নগরবাসী কারোরই বোধ হয় এই সন্ধ্যা রাত্রে ক্ষুধার উল্লেখ হয় না। নগরজীবনে রাত্রি মাত্রেই অবসর বিশ্রাম এবং শয়ন না। তথাপি আতুরে যেমন নিরম নাস্তি, তেমনি, পৃথ চলায় অনেক অভ্যাসকেই বিসর্জন দিয়ে চলতে হয়। এখন হয়তো ক্ষুধার স্বাভাবিক গলাধঃকরণ করা হবে না, কিন্তু ভিতরের মহাপ্রাণীটি যেন কাতর না হয়ে পড়ে, সেজন্য কিছু মজুদ করে

রাখাই শ্রেয়ঃ। বেয়ারা ততক্ষণে খাবারের টে নামিয়ে দৌড় দিয়েছে। আবার ফিরে এলো চার বোতল জল নিয়ে। পান করো বা না করো তার কর্তব্য সে করে যাবে।

হাফেজ বললেন, ‘কিন্তু জেসমিন, একাবারে কিছু না খাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।’

জেসমিন তখন তাঁর আসন ছেড়ে নেমে এসেছেন। হাতে পানপাত্র এবং সেই প্লাস্টিকের রঙীন গেলাসটিই। বললেন, ‘আমার মোটে খিদেই নেই। এক আধটা রাত্রি না খেলে আমি ভালোই থাকি। তোমরা শুরু করো, এ-পাত যতো তাড়াতাড়ি মেটানো যায়, ততোই ভালো।’

মেটাও ঠিক কথা। জেসমিন সত্যিই বললেন না। তাঁর পাত্র পড়েই থাকলো। আমরা তিনজনে মোটামুটি সদগতি করলাম। গাড়ি ইতিমধ্যে চলতে আরম্ভ করেছিল। হাফেজ বাইরে গিয়ে, বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে এসে নির্দেশ দিলেন ঝটিতি বাসনপত্র সরিয়ে নিতে। এবারও বিল মেটাবার জন্য ইয়াকুব তাঁর জুয়ার জেতা তহবিলে হাত দিলেন। আমার বিলটাও তাঁর হাতে। আমি বললাম, ‘এবার বিল মেটাবার স্বযোগটা আমাকে দিন।’

ইয়াকুব বললেন, ‘কখনই না।’

জেসমিন তাড়াতাড়ি ইয়াকুবের হাত থেকে বিলগুলো নিয়ে বললেন, ‘কারোকেই দিতে হবে না, আমি দিচ্ছি।’

ইয়াকুব বললেন, ‘খুব ভালো।’

জেসমিন বিল দেখে, টাকা গুণতে গুণতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এটাও আপনাকে এক রকম শিকারই করছি। আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে তাজা রাখছি।’ বলে হাসলেন। তাঁর গুণদেশে রক্তাভা, চোখেও ঈষৎ, সম্ভবত পানীয়র গুণেই। বেয়ারাকে টাকা মিটিয়ে দিলেন। সে হিসাব বুঝে বখশিসের মাত্রায় প্রায় আড়ুমি নত সেলাম হুকল। তারপর বাসন বোতল ইত্যাদি নিয়ে চলে গেল।

হাফেজ দরজা বন্ধ করলেন। খেলার আসর বসতে বিলম্ব হলো না। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, পানের মাত্রা বেড়েছে। আমার পক্ষে এঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব না। তা ছাড়া ত্রিকোণ নাটকের আমি কোনো চরিত্র না। জরীর কথোপকথনের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা তাদের পানের মাত্রাকে বাড়ানো, স্বরাস্ত করছিল। জেসমিন আমাকে একেবারে রেহাই দিচ্ছিলেন না, তবে

পরিমাণের দিক থেকে কিঞ্চিৎ দয়া প্রদর্শন করছিলেন। সেটাও আমি তেমন সহজে গ্রহণ করতে পারছিলাম না।

একটি বোতল শেষ হতে ইয়াকুব সাহেব দ্বিতীয় বোতল বের করলেন। এ বোতলের চেহারা ভিন্ন, গায়ে কালো কুকুরের ছবি। পানীর নাম কালো কুকুর। কারণ বা পশ্চাৎ ইতিহাস, কিছুই জানি না। কিন্তু নিজেই ক্রমেই বিপাকে পতিত বোধ করছি। ইতিমধ্যে হাকেক এবং জেসমিনের মধ্যে একটু খত্মাখতি হয়ে গিয়েছে। হাকেক খেলার একটু কারচুপি করতে গিয়েছিলেন। এক তাস তুলতে গিয়ে দুই তাস তুলেছিলেন, কিন্তু এক তাস ফেলতে গিয়ে দুই তাস ফেলেই ধরা পড়েছিলেন। কলভঃ, তাস দেখতে চাওয়ার দাবী, টানাটানি, লুকানোর চেষ্টা—হাসি আর জেদ একসঙ্গে চলেছিল।

ইয়াকুব সাহেব গম্ভীর হেসে বলেছিলেন, ‘শিন্তরা কেবল খেলার সুযোগ খোজে।’

জেসমিন পান করে কী বলতেন জানি না। তখন বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ লাহাব, শিন্তরা তাই করে, বড়োরা (এল্ডারস) কী করেন?’

ইয়াকুব বলেছিলেন, ‘শিন্তর খেলা দেখে।’

জেসমিন বলেছিলেন, ‘দুঃখ সেইখানে। বড়োরা যখন নিজেদের বড়ো ভাবেন, তখন তাঁরা কিছুতেই শিন্ত হতে পারেন না।’

ইয়াকুব বলেছিলেন, ‘আমার ধারণা বড়োদের তাতে দুর্ভোগ বাড়ে। আমি সেই দুর্ভোগ ভোগ করতে চাই না।’

জেসমিন বলেছিলেন, ‘দুর্ভোগ ভোগ করতে না চাইলেও দুর্ভোগ অনেক সময় ভাগ্যে থাকে।’

ইয়াকুব বলেছিলেন, ‘ভাগ্য অনেক সময় সুন্দর, কখনও নির্দয়।’

জেসমিন বলেছিলেন, ‘আমার ভাগ্য নির্দয়। তাই দুর্ভোগ।’

ইয়াকুব হেসেছিলেন, তাঁর চোখ রীতিমত রক্তিম এবং মুখও।

দ্বিতীয় বোতল আসবে নামতেই আবার আমার সেই ‘ঘর পোড়া গরুর সিঁড়রে মেঘের ছশিস্তা। নাটকের পরিণতি কোনদিকে যাবে, কোথায় তার সবনিকা কিছুই বুঝতে পারছি না।

এক সময়ে ইয়াকুব সাহেব গুনগুনিয়ে উঠলেন। দৃষ্টি তাসের দিকেই, কিন্তু চোখের তারা যেন ক্রমেই অনড় হয়ে উঠেছে। জেসমিনের মুখ লাল, চুল কপালে ও গালে পড়েছে। কখন যেন তিনি আর হাকেক পরস্পরের অনেকখানি ঘনিষ্ঠ স্পর্শে এসেছেন, যদিও তাঁদের তাস কেউ দেখতে পাচ্ছেন না।

ইয়াকুব সাহেবের গুনগুনানি ক্রমে ভাষায় ফুটলো, স্বর চড়লো। স্বর শুনে মনে হলো তিনি গজল গাইছেন। গানের ভাষা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল। কেবল কয়েকটি শব্দ আমার চেনা মনে হচ্ছিল। ‘বেদরদ’ ‘ইনতজার’ ‘দিল’ ইত্যাদি জাতীয় শব্দ। গান গাইতে গাইতেও তিনি খেলছিলেন। কিন্তু প্রথম খেলা বন্ধ করলেন জেসমিন, তারপরে হাকেম। দেখলাম, জেসমিন চোখ বুজে দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছেন। হাকেম মাথা নিচু করে গানের সঙ্গে তাল দিয়ে একটু একটু মাথা দোলাচ্ছেন। তারপরেই ওপারের বার্ষের ছায়ায় ঢাকা জেসমিনের চোখের কোণে দুটি মুক্তা বিন্দু চিকচিক করে উঠতে দেখলাম। মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে যেন সমস্ত পরিবেশ বদলিয়ে গেল।

আমি গানের ভাষা বুঝতে পারি না। স্বর এমন জিনিস, সে ভিতরে একটা ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইয়াকুব সাহেবের গলা এমন কিছু মিষ্টি না, কিন্তু তিনি যে গভীর আবেগে গাইছেন, তা বোঝা যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝি না, তবু ‘অন্ন গুল’ মানে ‘হে গোলাপ’ তা বুঝতে পারি। ‘আনু’ শব্দের অর্থ যে অশ্রু তাও জানি। সবটা জোড়া দিতে পারি না, কিন্তু জেসমিনের চোখ গলানো মুক্তাবিন্দু সহসা যেন আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল।

নাটক এবার সত্যিকারের। কুশীলবেয়া এখন কেউই এই দর্শকের দিকে তাকিয়ে দেখছেন না। ইয়াকুব সাহেবের হাতে তাস ধরা, গান করছেন চোখ বুজে। আমি দেখতে পাচ্ছি, জেসমিন ঠোট টিপছেন, তাঁর নাসারন্ধ্র ফীত, মুক্তাবিন্দু ঝরে তাঁর কপালে। আমার করনীয় কিছুই নেই। আমি তাস নামিয়ে দিয়ে বসলাম। ইচ্ছা করছে কামরার বাতি নিভিয়ে দিই। কিন্তু নাটকে সে-রকম কোনো অংশ গ্রহণের অধিকার আমার নেই। আলোক সম্পাতের টেকনিশিয়ান আমি না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, জ্যোৎস্না ফুটেছে। তেমন ফুটফুটে না, হয়তো শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী। মনে হচ্ছে, গাড়ির গতি যেন কমে আসছে। মহারাষ্ট্রে প্রবেশের বিলম্ব আছে নিশ্চয়ই। আমার ভ্রমগণা কখনোই এমন না, যে ভৌগোলিক নাম-ধাম জেনে নিয়ে ঘাড়া করি। কোন্ দেশের ওপর দিয়ে এখন চলেছি, কিছুই জানি না। উজ্জয়িনীর সীমানা হয়তো এখনও দূরে। নর্মদা রাত্রে ঘুমেই হয়তো হারিয়ে যাবে। উজ্জয়িনী আর নর্মদার কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায়, মহাকবি কালিদাসের কথা। আর এখন ভাবতে ইচ্ছা করে, তিনি যদি থাকতেন, আজ এই রেলগাড়ির কামরায়, তা হলে কী কাব্য সৃষ্টি করতেন ?

গাড়ি-একটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। যাত্রীদের ওঠানামার কোনো সাড়া শব্দ নেই। যেন কোনো ঘুমন্ত স্টেশনে গাড়ি ঢুকলো, আর স্বদীর্ঘ যান্ত্রিক শব্দ করে অনিচ্ছায় দাঁড়ালো। ইয়াকুব সাহেবের গান চলেছে। এঁদের কারোর কাছেই, এখন আমার অস্তিত্ব নেই। গান চলুক, আমি একটু বাইরে যাবার জন্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। অনেক সময় নাটক সামনে বসে দেখলে, তার সব খানিকে পাওয়া যায় না। একটু দূরে যেতে হয়, একটু আড়াল নিয়ে ভাবতে হয়।

যতোটা সম্ভব শব্দ না করে দরজা খুলে বেরিয়ে, আবার দরজা বন্ধ করে, কন্সিডার দিয়ে গাড়ি থেকে নামবার দরজার সামনে গেলাম। কণ্ডাক্টর গার্ড কাছেই বসে ছিল, একবার দেখলো। আমি দরজা খুলে নেমে আগে সামনের দিকে সিগন্যাল দেখলাম। লালবাতি জ্বলছে। স্টেশনে বিদ্যুতের কোনো ব্যাপার নেই, কেরোসিনের কয়েকটি আলো টিমটিম করে জ্বলছে। তাতে অন্ধকার তেমন ঘোচেনি। স্টেশন মাস্টারের ঘর বা টিকেটঘর, যা-ই হোক, সেখানে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। ছ'একজন লোকের অস্তিত্ব সেখানে টের পাওয়া যায়। কেউ একজন টেলিকোনে কিছু বলছে। যাত্রী একজনও দেখি না। বোঝা যাচ্ছে এ স্টেশনে এক্সপ্রেসের থামবার কথা না, কোনো বিশেষ কারণে দাঁড় করাতে হয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে সামনের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। জ্যোৎস্নাকে কুহেলীর আলোর মতো মনে হচ্ছে। প্রতি কামরায় আলো জ্বলছে, যাত্রীরা কথাবার্তা বলছে। আমার মতো আরও কয়েকজন এদিকে ওদিকে নেমেছে। লাল বাতির দিকে তাকাতে ভুলছি না, কারণ কখন সবুজ আমন্ত্রণের আলো জ্বলে উঠবে, কে জানে। তখন আবার দৌড় দিতে হবে।

অনেকখানি এগিয়ে, পিছন ফিরতে যেতেই বাধা পেলাম। আমার পথ আটকেই যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে দেখি ইয়াকুব সাহেব। বললেন, ‘আপনাকে খুবই বিরক্ত করা হয়েছে, মাফ করবেন।’

বলে তিনি হাত বাড়াতে, আমিই এবার সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে, ওঁর হাত ধরে বললাম, ‘না না, বিশ্বাস করুন। আমাকে মোটেই বিরক্ত করা হয়নি।

আমার বাইরে আসাটা নিতান্তই অল্প ব্যাপার।’

ইয়াকুব বললেন, ‘আমি বুঝতে পারি, অল্প কোনো ব্যক্তির পক্ষে ও রকম পরিবেশে বসে থাকা সম্ভব না।’

বললাম, ‘আমার পক্ষে তা মোটেই অসম্ভব ছিল না। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ চিত্তে আপনার গান শুনছিলাম। সম্ভবত আপনি উত্থাতে গজল গান করছিলেন?’

ইয়াকুব মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘ঠিক ধরেছেন।’

বললাম, ‘আমি স্বর বুঝি, ভাষাটা আনন্দে নেই। কিছু শব্দের মহিমা আমাকে কিছুটা ধরতাই দিচ্ছিল। আর, আপনি যদি আমাকে অহুমতি দেন, তাহলে বলতে পারি আপনার গানের সঙ্গে, মিসেস ইয়াকুব এবং মিঃ হাফেজও অত্যন্ত মিশে গেছিলেন। আমি ততোটা মিশে না যেতে পারলেও, শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার গান আর সমস্ত পরিবেশ আমার বুকের মধ্যে টনটনিয়ে দিচ্ছিল।’

ইয়াকুব কিছু বলতে পারলেন না, আমার হাতে একটু জোরে চাপ দিলেন।

আবার বললাম, ‘যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, আমার মনে হয়েছিল আমার সামনে গায়ক এবং বাকী দুই শ্রোতা, সকলেরই আলাদা আলাদ সমস্তা আছে।’

ইয়াকুব এবার দু’হাত দিয়ে আমার হাতটি চেপে ধরে বললেন, ‘আহ, এর থেকে সত্যি আর হয় না। হয়তো আপনার মতো এ ভাবে ব্যাপারটা আমিও ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। আশ্চর্য আপনার দৃষ্টিশক্তি, সেই সঙ্গে আপনার অহুভূতিশীল মন।’

লজ্জা পেলাম, বললাম, ‘না না, এ রকম করে বলবেন না। আমার যা মনে হয়েছে, তাই বললাম।’

ইয়াকুব বললেন, ‘জানি। আপনাকে অহুভূতিশীল বললাম এই কারণে, আপনি আমাদের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন। আমি জানি কোনে চতুর্থ ব্যক্তি থাকলে, এত অনায়াসে আমাদের প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করতে পারতাম না। কারণ, সে আমাদের এ মর্যাদা দিতে পারতো না, সমস্ত ব্যাপারটাকে হয়তো অস্ত্র চোখে দেখতো।’

আমি বললাম, ‘আমার সে কথা কখনও মনে হয়নি। বরং, আপনার গান শুনতে শুনতে আমার মনে একটা বাংলা গানের কলি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে সেটা কতোখানি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব, জানি না।’

‘তবু বলুন, আমি শুনি।’ ইয়াকুব বিশেষ ভাবে অল্পরোধ করলেন।

আমি ইংরেজিতে যা বললাম, তা এই রকম, ‘মাই কাপ ইজ ফুল উইথ্‌ গ্রেট পেইন। ড্রিংক, ওহু ডার্লিং, ড্রিংক।’ যার বিখ্যাত কলি এই রকম, ‘বেদনায়, ভরে গিয়েছে পেরালা, পিও হে পিও।’

ইয়াকুব যেন একটা ব্যথা ধরা উজ্জ্বলে আমার হাত ধরে বারবার বাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, ‘চমৎকার! অপূর্ব! আমি জানি, বাঙলা গানের শব্দ অত্যন্ত ধনী, দুঃখের বিষয় আমি বুঝি না। কিন্তু আমার গান শুনে শুনে, আমাদের দেখে, এ গান কেমন করে আপনার মনে এলো? যে আমাদের জীবনের অংশভাগী নয়, কিছুই জানে না, সে কেমন করে, এমন গভীরে বেতে পারে?’

জ্যোৎস্নার কুহেলি আলোর ইয়াকুব সাহেবের রক্তিম চোখে অপার কৌতূহল চিকচিক করছে। যেন তিনি বহুদূর থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, চিনতে চাইছেন, আমি কে। বললাম, ‘ইয়াকুব সাহেব, বিগত ঘটনাবলীই যে মানুষকে সব সময় চিনিয়ে দেয়, তা না। এবং বলব না, আপনাদের আমি চিনতে পেরেছি। তবে এ কথা ঠিক, কোনো কোনো বিষয়ে কারো কারো বঠেস্রিয় বলে একটা ইন্দ্রিয় থাকে যা তাকে অনেক জানিয়ে আর চিনিয়ে দেয়। যেমন শিকারীর বঠেস্রিয় তাকে জানিয়ে দেয়, শিকার কাছাকাছি এসে গেছে, যদিও তাকে চোখে দেখা যায়নি। তেমনি আপনাদের ক্ষেত্রেও। আমার বঠেস্রিয় বোধ হয় কাজ করেছিল।’

ইয়াকুব সাহেব আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে হেসে বললেন, ‘ওহ, আপনিও দাগা খাওয়া। দাগা না খেলে তো এমন ভাবে কেউ বুঝতে পারে না? সেইজন্যই আপনার অহুত্বের এই গাঢ়তা, এখন বুঝতে পারছি।’

এই সময়েই হঠাৎ গাড়ির হুইসল বেজে উঠলো। এত অশ্রমস্ব হয়ে গিয়েছিলাম দু’জনের কেউই লক্ষ্য করিনি, কখন সবুজ বাতি জলে উঠেছে। ‘যারা নেমেছিল, তারা সবাই উঠে গিয়েছে, এখনও কেউ কেউ উঠেছে। আমাদের বাগীটা বেশ পিছনে, আমরা অনেকখানি সামনে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। আমি পিছন দিকে ছুটতে গেলাম, ইয়াকুব আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, ‘থাক, পিছন দিকে আর ছুটবেন না! গাড়ির গতি বেড়ে যাবো। আসুন, আমরা এই কামরাতেই উঠে পড়ি।’

বলেই, তিনি আমার হাত ধরে, এক রকম জোর করেই সামনের একটি দরজার হাতল ধরিয়ে দিলেন। আমি লাফ দিয়ে উঠতে না উঠতেই, তিনিও পিছন থেকে আমার গা লেপটে উঠে হাতল ধরলেন, দরজা খোলবার চেষ্টা করতেই একজন যাত্রী ভিতর থেকে বলে উঠল, ‘ইয়ে রিজার্ভ সিটার হ্যাঁ।’

ইয়াকুব একটু ধমকের স্বরে বললেন, ‘ম্যারলোগ এক্সপ্রেসকে ফাস্ট ক্লাসকি

প্যাসেঞ্জার। গাড়ি ছোড় দি তো ইধার উঠ গয়া, রোখনে সে ফিন্ উত্তর যায়েকে ।’

বলেই দরজা খুলে, আমাকে আগে ভিতরে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, ‘আপলোগকা কুছ তথলিক নেহি দেকে, মায় লোক দরওয়াজে লামনেই ঠাহুরতে হায় ।’

একজন ঘাত্রী বললেন, ‘কোই বাত নাহি হায় জী, ‘আরামসে ঠাহুরিয়ে ।’

ইয়াকুব সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন। কিন্তু আমি অবশি বোধ করলাম অন্য কারণে। বললাম, ‘মিসেস ইয়াকুব আর মিঃ হাকেকজ নিশ্চয়ই হুশিয়ার করবেন, জানতে পারবেন না, আমরা উঠতে পারলাম কী না ?’

ইয়াকুব খানিকটা নিশ্চিত ভাবে বললেন, ‘হয়তো একটু হুশিয়ার করতে পারে, কিন্তু বুঝে নেবে, আমরা তাড়াতাড়ি অন্য কোনো কামরায় উঠে পড়েছি। আমি আপনাকে খোজবার কথা বলেই, কামরা থেকে বেরিয়ে ছিলাম। আপনাকেও ফিরতে না দেখে, বুঝতে পারবে, আমরা দু’জনেই একসঙ্গে আছি।’

ইয়াকুব সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো অন্য কামরায় উঠে পড়ার এই দ্রুত সিদ্ধান্তটি তিনি যেন ইচ্ছা করেই নিয়েছেন। তিনি একটু হেসে আবার বললেন, ‘পাখিরা সকলেই বাসায় ফিরবে। কখনো কোনো কোনো পাখি কোনো সময় পথভ্রষ্ট হয়, ফিরতে একটু দেরি হয়।’

ওর শেষের কথা যেন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, তিনি ইচ্ছা করেই অন্য কামরায় উঠেছেন। কেন এই ইচ্ছাকৃত বিচ্ছিন্নতা? নিতান্ত দার, না দয়া, হাকেকজ আর জেসমিনের প্রতি এবং নিজের প্রতি?

আমি একটা সিগারেট ধরলাম। ইয়াকুবকে ইতিমধ্যে, একটা সিগারেটও পান করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি নিজের থেকেই বললেন, ‘সাহাব, একটা সিগারেট আমাকে দিন, একটু ধূমপান করা যাক।’

আমি একটু অবাক হয়েই, সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘নিশ্চয়ই।’

সিগারেটটি দিয়ে আমিই দেশলাই জ্বলে ধরিয়ে দিলাম। ইয়াকুব আনাড়ির মতো সিগারেট মুখে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘দেখুন, আপনি কে, কেমন লোক, আমি তা জানি না, শুধু জানি আপনি কোনো কাজ করেন, বসে যাচ্ছেন, একজন বাঙালী। কিন্তু অধীকার করা যাবে না, ইতিমধ্যেই আপনি আমাদের বন্ধ হয়ে গেছেন। এটা খুবই আশ্চর্যের, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার লামনে আমাদের জীবনের ঘটনাবলীর সম্পষ্ট অধ্যায়, ইতিমধ্যেই পড়ে কলেছেন, তাই, নয় কী ?’

এ কথা শ্রুতি জবাব কী হতে পারে আমি জানি না। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, ‘আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন।’

ইয়াকুব বললেন, ‘বলব বলে তো আপনাকে নিয়ে এ ভাবে আলাদা কামরায় উঠলাম, আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সম্ভবত আমার এ আচরণকে হাফেজ এবং জেসমিনও ভুল বুঝবে। তা বুঝুক, সেটা পরে মিটে যাবে। কিন্তু আপনাকে আমি সামান্যই দু-একটি কথা বলে নিতে চাই। আমি জানি আপনি কিছু একটা অহুমান করেছেন, যে একটা ত্রিকোণ ঘটনা আপনার ঘটেছে। সত্যি নয় কী?’

আমি ইয়াকুব সাহেবের চোখের দিকে তাকালাম। দ্বিধাবোধ করছি, তবু বললাম, ‘আপনার অহুমতি নিয়েই বলছি, আমার সেই রকমই মনে হয়েছে।’

ইয়াকুব বললেন, ‘সাহাব, আমি বেয়াকুফ না, আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আর এটুকু বুঝতে পারি না? এর জন্য আবার অহুমতি নিয়ে বলবার কী দরকার আছে?’ বলে তিনি হেসে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, ‘এই ত্রিকোণের ত্রয়ো, আমি, আমার স্ত্রী আর আমারই স্ত্রীর সম্পর্কিত তাই হাফেজ।’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হাফেজ সাহেব আপনার শ্রালক?’

ইয়াকুব বললেন, ‘হ্যাঁ। হাফেজ জেসমিনের মায়ের বোনের ছেলে। হাফেজের সঙ্গে জেসমিনের ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। ওরা যদি বিয়ে করতে চাইত বিয়ে করতে পারত। কিন্তু ওদের মধ্যে সেরকম কোনো ব্যাপার ছিল না। ব্যাপারটা ঘটলো অনেক পরে, আর ঘটেছিল এমন ভাবে, স্বীকার করতেই হবে, হাফেজ আর জেসমিনও তা বুঝতে পারেনি, ওরা নিজেদের এত কাছাকাছি ক্ষেত্রে চলে আসছে, যখন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারে না।’

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটে আবার টান দিয়ে বিশ্বাস বোধ করায়, জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ‘বরং ব্যাপারটা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারিনি। হাফেজের স্ত্রী একজন পারস্যান মহিলা। হাফেজ দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ছিল। ওর দুটি সন্তান আছে। আমারও আছে, আমার আর জেসমিনের এক মেয়ে। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা বলতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। আপনাকে শুধু এইটুকু বলছি, এখন এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। হিংসা বা ঈর্ষার স্বীকার আমরা কেউ হইনি, তা বলবো না।

বিশেষ করে হাক্কেজের স্ত্রী আর আমি ঈর্ষায় যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি। আমার দিক থেকে কষ্ট পর্যন্তই, আমি কোনো ইতর আচরণ করতে পারিনি। পারিনি তার কারণ—’

ইয়াকুব সাহেব একটু থামলেন, এক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে তাকালেন, তারপরে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ‘জেসমিনকে দুঃখ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। জেসমিনকে বিয়ের আগে থেকে চিনি, আট বছর একসঙ্গে সংসার করেছে, জেসমিন আমার জীবনেরই আর একটি সখা। আমার অস্তিত্বের অন্য একটা রূপ! ঈর্ষা করেও, ওকেই যদি হারাই, তবে সে ঈর্ষার মূল্য কী? মানি, মন তথাপি মেনে না। অসহ্য কষ্টে, বুকের মধ্যে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। তবু জেসমিনকে তো আমি পাবো না। জেসমিন আমাকে নিজেকে থেকেই সব বলেছে, তারপরে আমি হাক্কেজের সঙ্গেও কথা বলেছি। হাক্কেজ বা জেসমিন কেউই বিগেমস্টি আচরণ করতে চায়নি, তাহলে ওরা লুকিয়ে, নিজেকে সঙ্গে অনায়াসে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারতো। জেসমিন অন্তত সে ভাবে ঠকাতে চায়নি।’

ইয়াকুব সাহেব আবার থামলেন। আর আমি যেন একটা ত্রিকোণ নাটকের, আবহ সঙ্গীতের মতো ট্রেনের ঘরঘর শব্দ শুনে চলেছি। ইয়াকুব সাহেব আবার বললেন, ‘আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, জেসমিনকেও বলেছি, ভেবে দেখতে যে, এটা একটি সাময়িক অবসেশন কি না। জেসমিন পরিত্যক্ত করে তা বলতে পারেনি। তবে পরিত্যক্ত করে বলেছে, আপনি আমাকে তালাক দিন। বিচ্ছিন্ন হতে দিন, আপনার কাছে থাকবার সব অধিকার আমি হারিয়েছি। এর পরে আর এক দণ্ডও থাকা চলে না। আবার যদি আপনার কাছে কখনও ফিরে আসতে হয়, তখন কি আপনি আমাকে আর গ্রহণ করবেন?’

ইয়াকুব সাহেব হাসলেন। বললেন, ‘জেসমিনকে এ-কথার কী জবাব আমি দিতে পারি? এখন আমাদের তালাক হয়নি, একমাত্র কারণ জেসমিনের দ্বিধা। কোনো সময় সে হঠাৎ তালাক চেয়ে বসে, আবার পরমুহূর্তেই বলে, না না; এখন না। আর একটু ভাবি। তবে তার আর দরকার নেই। সে পূর্ব শেষ হয়েছে। এবার বসে গিয়েই আগে তালাক। হাক্কেজের পারসিয়ান স্ত্রী, এক সপ্তাহ আগে, একটি বাচ্চাকে নিয়ে প্যারিসে চলে গেছে। আমি জেসমিনকে নিয়ে আমাদের নিজেকে বাড়িতে, শেষবার গেছলাম। আপনাকে এইটুকু না বললে, আমার ভালো লাগত না। আপনি যখন বসে থাকবেন,

আমার ঠিকানায় কয়েক দিন বাঁধে এলে খুশি হবো। কামরায় ফিরে গিয়ে আপনাকে আমার কার্ড দেব।’

‘আমি ইয়াকুব সাহেবের দিকে তাকালাম। কার কষ্ট বেশি, ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। জেসমিন-চরিত্র আমার কাছে কেমন জটিল হয়ে উঠলো। হাফেজ তার জীবনের অনেকখানি পার হবার পরেও বুঝতে পারেনি, পরবর্তী-কালে, একজনের স্ত্রী এবং একটি জননীকে দেখে হয়তো সে তার জীবনের তুফার জলাশয় খুঁজে পেয়েছে। কারোকে দোষ দেওয়ার চিন্তা অবাস্তব। কেননা, ব্যাপারটা সে ভাবে ঘটেনি! তথাপি কেন জানি না, ইয়াকুবের মূখের দিকে তাকিয়ে, আমার কোথায় যেন টনটনিয়ে বাজছে। কেবলই মনে হচ্ছে, বা হারাবার, তা উনিই হারাচ্ছেন। আমি আমার হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘ধন্যবাদ।’

ইয়াকুব আমার হাতটি চেপে ধরে, আন্তে আন্তে ঝাঁকুনি দিলেন।

গাড়ি একটি স্টেশনে এসে দাঁড়ালো।

আমরা দু’জনে নেমে, থানিকটা অগ্রসর হতেই, হাফেজকে দ্রুত উদ্ভিন্ন মূখে আসতে দেখা গেল।

সামনে এসেই ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলো, ‘কোথায় ছিলে তোমরা?’

ইয়াকুব হেসে বললেন, ‘খুব ভাবছিলে তো? আমরা অন্য কামরায় উঠেছিলাম।’

হাফেজ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিন্তু তোমাদের সঙ্গে জেসমিনকে দেখছি না কেন?’

আমরা দু’জনেই অবাক হয়ে গেলাম। ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলেন, ‘তার মানে? জেসমিন কামরায় নেই?’

হাফেজ বললেন, ‘না তো? সেও তো নেমে গেছে।’

ইয়াকুব উৎকণ্ঠিত বিষয়ে বলে উঠলেন, ‘কী বলছ তুমি!’

হাফেজ বললেন, ‘ঠিকই বলছি। অ্যাটানডেট গার্ড জেসমিনকে নামতে দেখেছে।’

ইয়াকুব হস্তদস্ত হয়ে স্টেশন মাষ্টারের কাছে গেলেন। বলে গেলেন, ‘আমি আর হাফেজ যেন প্রত্যেকটি কমপার্টমেন্ট তন্নতন্ন করে খুঁজি। হাফেজ পিছন দিকে যেতে যেতে বললেন, ‘আমি গার্ডকেও একটু বলি।’

ভারপরে চলে খোঁজার পালা। স্টেশনটিতে বিছাভের আলো ছিল, সেটাই যা ভয়সা। জেসমিনের বর্ণনা নিয়ে, আরও কয়েকজন খুঁজতে লেগে গেল। কিন্তু আমি ব্যাপারটা ঠিক ভাবে নিতে পারছি না। যত সূরাপানই করুন, জেসমিন বিবি এ বকম একটা কৌতুক করতে পারেন না, যে তিনি অস্ত্র কোনো কামরার গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকবেন। কথাটা মনে হতে, আমি স্টেশন মাঠারের অফিসে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধানে গেলাম।

অফিসের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। ইয়াকুব সাহেব টেলিফোনে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছেন, তাঁর হাতে রিসিভার খরখর করে কাঁপছে, তিনি চিৎকার করে বলছেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, পায়জামা আর ছোটো কলার জ্যাকেট ছিল। আঙুলে ডায়মণ্ডের সোনার আংটি ছিল। আছে? ওহু হ্যাঁ হাতে ঘড়ি? ওহু খোদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব-সব বিলকুল মিলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি যে ভাবেই হোক ফিরে যাচ্ছি।’

রিসিভার রেখেই, ইয়াকুব সাহেব ঠাস করে টেবিলের উপর মাথা ঠুকলেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন রেল কর্মচারী দাঁড়িয়ে। কেউ কথা বলছে না। আমি কাছে গিয়ে, দ্বিধা করে, তাঁর কাঁধে হাত দিতেই চমকে মুখ তুলে তাকালেন, বললেন, ‘ওহু, আপনি? জেসমিন আমাদের ছেড়ে গেছে।’

‘ছেড়ে গেছে?’

ইয়াকুব সাহেব বললেন, ‘হ্যাঁ। আগে গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই জেসমিন নেমেছিল আর সেখান থেকে যখন গাড়ি ছাড়ে, সকলের অগোচরে সে চাকার তলায় গলা পেতে দিয়েছে। তার ছিন্ন শিরের সংবাদ এই মাত্র পেলাম।’ বলতে বলতেই তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি নির্বাক, স্থাপুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। জেসমিনের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে!

হঠাৎ কর্তৃধ্বনি শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে কামরার দিকে গেলাম। দেখলাম ইয়াকুব আর হাফেজ তাঁদের মালপত্র নিয়ে নামছেন। গাড়ি হুইসল দিয়ে নড়ে উঠলো, ইয়াকুব আমার হাত চেপে বললেন, ‘বিদায় বন্ধু, আপনি একটা পরিণতি দেখে গেলেন।’

হাফেজ দূরের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে। গাড়ি এগিয়ে চলল।

আমার ঘরের বাইরের দ্রবস্ত তৃষ্ণা, আশা কখনও মেটে না। কিন্তু যাত্রা পথে, এমন আকস্মিক ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে মনে করতে পারছি না। গাড়ি

চলে, চলবে, আমিও চলব, তথালি, মনে হচ্ছে, আমি রয়ে গেলাম পিছনে, যেখানে রক্তাক্ত জেসমিন এখনো শায়িত।

জীবনের কার্যকারণের ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পেতে চেয়েছি। ব্যাখ্যা যে একেবারেই নেই, এমন কথা বলি না। কিন্তু এমন কথা যেন জোর কড়ে কোনো দিন না বলি, জীবনের বাস্তবতা, কতকগুলো চাক্ষুষ আর শুল্ল ছকে বাঁধা। তা যদি হতো, তাহলে এমন করে, জেসমিন বিবি আমার চলার পথটিকে তাঁর আত্মনাশের রক্তরেখায় এঁকে দিয়ে যেতেন না।

আমার যাত্রা ছিল আপাতত মহারাত্রি, রথের নাম বোম্বাই এক্সপ্রেস। তার চেয়ে দ্রুতগামী মেল গাড়ির আসন আমার কপালে জোটেনি। তাতে দুঃখ ছিল না। আমি রাজা নই, রাজার লোকও না, কোনো রাজকার্যও আমার যাত্রা না। অতএব খিকিখিকি এক্সপ্রেসের যাত্রায়, একটু অলস মন্থর গমন ভালোই লাগছিল। হাওড়া থেকে গুঠবার সময়, আমার প্রথম শ্রেণীর কুপের চারটি বার্থই ভরা ছিল। এক রাত্রি পরেই, কে কোথায় নেমে গিয়েছিল, মনে নেই। স্বার্থপরের মতো মনে মনে একটু অহ্লাদ বোধ করেছিলাম, চলন্ত রথের গোটা একখানি কামরা আমার দখলে। নিজের রাজ্যপাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া যাবে ভালোই। তারপরে অবিশ্রি মনে হয়েছিল, একেবারে নিঃসঙ্গ যাত্রাটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তা হোক, থোলা জানালা ছিল, চোখের সামনে ছিল অসীম আকাশ, উদার প্রকৃতি। তার সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ ঘটে গেলে, নিঃসঙ্গতার মধ্যেও একটি অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করা যায়।

মনে মনে যখন সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, তখনই কোন্ এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই, হড়মড় করে আমার কামরাখানি গেল ভরে! ঝপাঝপ ঢুকে পড়লো একরাশ বাক্সো প্যাটরা। রক্ষে এই, যাত্রীর সংখ্যা বেশি না, তিন। দুই পুরুষ এক মহিলা। তাঁদের সঙ্গে একটি বিশেষ জিনিস যা ঢুকলো, তা চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায় না। একমাত্র ভ্রাণেই তা পাওয়া যায়, যাকে বলে অতি নামী ও দামী প্যারিসিয়ান পারফিউম। বাঙালয় যারে কর, বিলাতী সেন্ট।

যাত্রা উঠলেন, প্রথমে তাঁদের জাত জাতি বোঝা দায়। বাত শুনেও বোঝা মুশকিল। উর্দু মেশানো হিন্দী, ভারতের অনেক জায়গাতেই চল। পরে তাঁদের কথাবার্তাতে, নিজেদের মধ্যে সন্ধানেনে জানা গেল, একজনের নাম ইয়াকুব আর একজনের হাফেজ, মহিলার নাম জেসমিন। সব মিঁয়া বিবির ব্যাপার। কিন্তু গায়ে কুঁড়পি লেখা নেই। দুই মিঁয়া হাল ফ্যাশানের পাভলুন কমিজে একেবারে

সাহাব। বিবির ঘাড় অবধি ক্লষ্ণকালো কেশ, আধুনিকাদের যা লক্ষণ। গায়ে কলারওয়ালা ছোট জ্যাকেট, হাওয়াই শার্ট বললেও চলে, আর চৈনিক মহিলাদের মতো পায়জামা। চোখে কাজল, ঠোঁটে রঙ। রাজানো নখ মুকুরের মতো, মুখ দেখলেই হয়। রূপসী তিনি বটেন, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে, চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক হানে, হাসিতেও।

সেই সঙ্গে সাহেবেদের কথাও বলতে হয়। হাফেজ সাহেব একটু রোগা আর দীর্ঘ, ইয়াকুব সাহেবও দীর্ঘ পুরুষ, চণ্ডাতে তিনি একটু বেশি। জেসমিন যেমন পৌরী, সাহেবরাও তেমনি গৌরাজ এবং সুপুরুষ। বয়স তাঁদের চল্লিশের মধ্যে। বিবির বয়স? তোবা তোবা! তেমন ক্ষ্যামতা আল্লা আমাকে দেননি, যে বিবিদের দেখেই তাঁদের হুকু বয়সটা বলে দেব। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা চরিত্তির করে বলা যায়, তিরিশের এপাশ-ওপাশ ঘেঁষে তাঁর বয়স হতে পারে।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও, মিথ্যা বিবিদের কথাবার্তায় সম্পর্কটা অস্বাভাবিক করতে পেরেছি। জেসমিন বিবি হাফেজকে হাফেজ বলে সম্বোধন করেন, ইয়াকুবকে সাহাব। অবশি সেটা আদারের ডাকও হতে পারে। পরে শুনেছি ওরা দু'জন কর্তা গিন্নি।

তারপর তাঁরা যখন তাস নিয়ে বসলেন, তখন আমার ডাক পড়লো। আলাপটা সেই সূত্রেই। যেমন তেমন তাস খেলা না, পুরো জুয়া। টাকা দিয়ে খেলা। কিন্তু এটাকে গ্যাংলিং বললে হবে না, গেম্ বলতে হবে। খেলতে খেলতে তাঁদের সঙ্গে, কখন এক সময় থেকে কিঞ্চিৎ নৈকট্য ঘটে গিয়েছে খেয়াল করিনি। যাকে বলে ইন্টিমেসি। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল, জরীকে ঘিরে একটা নাটক চলছে। দর্শক আর শ্রোতা আমি। গোয়াল পোড়া গোরু আমি এ কথা ঠিক বলা যাবে কী না জানি না, কিন্তু সিঁহুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। তিনজনের হাসি কথাবার্তায়, কেমন একটা আঁচ পাচ্ছিলাম, তাতেই একটা ভয় হচ্ছিল। কেননা, কোথায় একটা উদ্বেজনা বিরাজ করছিল। ঝগড়া বিবাদ মারামারিকে আমার বড়ো ভয়।

কিন্তু না! সে পথ তাঁদের ছিল না। ইয়াকুব সাহেবকে স্বামী হিসাবে অসহায় ব্যাধিত পুরুষ মনে হচ্ছিল। একই অসহায়তা ও বিষন্নতা মাঝে মাঝে হাফেজ আর জেসমিনের মধ্যেও ফুটে উঠছিল।

এক সময়ে উজ্জ্বল শায়ের-এর মধ্যে দিয়ে তাঁদের মনের কথা ব্যক্ত হচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে চলিত্রণও। সন্ধ্যাবেলা জেসমিন বিবির কাঁপি থেকে বেরিয়েছিল লাল পানীর বোতল, ড্যাট উনসন্তর। জানি, দৃশ্টা অনেকের চোখে ভ্রুকুটি কালকূট (পক্ষ্ম) — ৭

ক্রোধের সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, জুয়া, নারী, স্ত্রী, সবই এসেছে, আর বাকী রইলো কী ?

বাকী যা তা শোনা যাবে কালের ধ্বনিতে। শ্রবণ সচেতন রাখলে প্রাণের ধ্বনি শোনা যায়। যার তা নেই, সেই সমাজপতিরা তফাত যাও।

খেলাতে হেরে মরছিলাম আমি আর হাফেজ। জিতে নিচ্ছিলেন কেবল মিস্ত্রী বিবি। বিবি তো আমাকে জানিয়েই ছিলেন, আমি শিকারটি বেশ ভালো, তিনি আমাকে আয়েস করে খাবেন। মুখটি একটু আলগা, প্রাণের সন্ধান পেলাম তখন, যখন খেলতে খেলতে ইয়াকুব সাহেব গুনগুন করে একটি গমল ধরলেন। দেখলাম, খেলা ঝিমিয়ে আসছে, জেসমিন বিবির চোখের কোণে মুক্তাবিন্দু চিকচিক করছে।

তারপরে খেলা একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। পরিস্থিতিটা আমার কাছে অস্বস্তিকর। দর্শক হলেও। গাড়িটা সিগন্যাল না পেয়ে একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়তেই নেমে গেলাম। প্রায় অন্ধকার স্টেশন, দু-একটা টিমটিমে কেরোসিনের আলো। দূরে সিগন্যালের লাল আলো। অনেকখানি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। ফিরতে গিয়ে ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনিও বেরিয়ে এসেছেন। কয়েকটি কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ লাল আলো নীল হলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। ইয়াকুব সাহেব আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন অস্ত্র একটি কামরায়। কেন যেন মনে হলো, জেসমিন আর হাফেজকে তিনি ইচ্ছা করেই একসঙ্গে এক কামরায় থাকবার অবকাশ করে দিলেন। আর প্রীতি আর আবেগবশত আমার কাছে থুলে দিলেন নাটকের নেপথ্য ছবি।

জেসমিন আর হাফেজ মাসতুতো ভাই বোন। ছেলেবেলায় ওরা মেলামেশা করেছে এবং বড়ো হয়েছে করেছে। কিন্তু কখনো প্রেম তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয়নি। হাফেজ বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী ফরাসী মহিলা, তাঁদের দুটি সন্তান। ইয়াকুব দশ বছর আগে বিয়ে করেছেন জেসমিনকে। তাঁদের একটি আট বছরের কন্যা আছে। কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল দেখা যাচ্ছে, হাফেজ আর জেসমিনের মধ্যে গভীর প্রেম জন্মেছে। জেসমিন ইয়াকুবের কাছে তালুক চেয়েছেন। ইয়াকুব সাহেব তা দিতেও চেয়েছেন। অথচ জেসমিনই আবার বাধা দিয়েছে। এই অবস্থায়, হাফেজের ফরাসী বিবি একটি সন্তানকে নিয়ে চলে গেছেন তাঁর স্বদেশে। ইয়াকুব সাহেব শেষবারের মতো জেসমিনকে তাঁর দেশের বাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বসে গিয়েই শুধু একটি কাজ, জেসমিনকে তালুক। উদ্বেগ জেসমিন আর হাফেজ স্থধী হোক। ইয়াকুব সাহেব তাঁর

নন, জেসমিনকে তিনি ভালোবাসেন বলেই এ সিদ্ধান্ত। আমাকে অহরোধ করলেন, বসে গিয়ে, এক সপ্তাহ বাহে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কামরায় কিরে গিয়ে তিনি তাঁর নাম ঠিকানা মুদ্রিত কার্ড দেবেন।

এই নেপথ্য কাহিনীর মধ্যেই গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটি বড় স্টেশনে, বিজলী বাতির আলো সেখানে। আমি আর ইয়াকুব সাহেব ভিন্ন কামরা থেকে নেমে নিজেদের কামরার দিকে ফিরে চললাম। মাঝপথে ছুটে এলেন হাফেজ সাহেব। জিজ্ঞেস করলাম, জেসমিন কোথায়? তিনি জানানেন, আমাদের পিছনে-পিছনে জেসমিনও নেমে এসেছিলেন সেই স্টেশনে, আর তাঁর কামরায় কেয়েননি।

ইয়াকুব সাহেবের মুখ পাংগু হয়ে উঠলো। তিনি আমাকে আর হাফেজকে সারা ট্রেন ভ্রমভ্রম করে খুঁজতে বলে, নিজে গেলেন গার্ডের কাছে।

জেসমিনকে কোনো কামরায় দেখতে পাওয়া গেল না। ইয়াকুব সাহেব টেলিকোন করলেন সেই ফেলে আসা ছোট স্টেশনে। জানা গেল, এই গাড়ি ছেড়ে আসার সময়, এক মহিলা লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বর্ণনার মিলে গেল, তিনি আর কেউ নন, জেসমিন।

ইয়াকুব আর হাফেজ তাঁদের মালপত্র নিয়ে নেমে গেলেন সেই ছোট স্টেশনে ফিরে যাবার জন্য। বসে এক্সপ্রেস আবার যাত্রা করলো। চাকার তার জেসমিনের রক্তের দাগ।

করিডর দিয়ে আস্তে আস্তে সেই কুপের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। মনে মনে একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা ছিল, চারজনের সেই কামরায় মধ্যে, হয়তো এতক্ষণে অনেক নতুন যাত্রীর দেখা পাব। কিন্তু না, আমার সে প্রত্যাশাটাই ভুল। এ কামরা বসে পর্বস্ত চারজনের জন্য রিজার্ভ ছিল। রাজি ন'টা বেজে গিয়েছে, তারপরে আর প্রথম শ্রেণীর কামরায় নতুন যাত্রীর আসবার প্রস্নই থাকে না।

তথাপি প্রত্যাশা করেছিলাম, আসলে যেটা আমার আকাঙ্ক্ষা। কারণ, সারাদিন রাজি, এ কামরায় একলা থাকবো কেমন করে? কান্নাহীনের ভয় আমার অপাতত নেই। বরং জেসমিন যদি তাঁর কান্নাহীন অস্তিত্ব নিয়ে এ কামরায় আসেন, বোষণা করেন তাঁর আগমন বার্তা, তবু জানবো, আমি একলা নই। যে মহানটক সারাদিন, এই রাজি পর্বস্ত আমি দেখেছি, তার

নারিক। এই কামরার মধ্যেই কোথাও আছেন, তা যতোই উন্মাদনাকর হোক, রাজিটা কাটাবার পক্ষে তা-ই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি জানি, সংসারের বাস্তবতার তা সম্ভব না। ইংরেজিতে যাকে বলে অবসেশন, জেসমিন বিবি আমার মস্তিকে তা কতোখানি গভীরতা সৃষ্টি করেছেন, এ মুহূর্তে আমি তার পরিমাপ করতে পারছি না, শুধু ভুলতে পারছি না তাঁর কথা। ঢুকতে পারছি না শূন্য কামরার মধ্যে। আমার দৃষ্টি, জানালার ধারে আসনের ওপরে, যেখানে এসে তিনি প্রথম বসেছিলেন, এক ঝলক রূপের দীপ্তি নিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে একটি অনতিতীত স্বগন্ধ। যদি শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে, দর্শকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে মনে মনে একটু ভাবনা চিন্তা নিয়ে চলতে পারতাম। কিন্তু কখন যে আমিও একজন কুশীলব হয়ে উঠেছিলাম, সেটা খেয়াল করিনি। কুশীলব যদি না-ও হয়ে থাকি, নাটক দেখবার পরে, কোন্ দর্শক আর সাজসজ্জাহীন অন্ধকার শূন্য মধ্যে পড়ে থাকতে চায় ?

আমার অবস্থা এখন অনেকটাই সেই রকম। কুশীলবরা যে বার ভূমিকা সেরে চলে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু মঞ্চ, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি। তবু জানি, ঘটনাকে যেমন করেই ভাবি, যে চোখেই দেখি, আমাকে এ কামরাতেই ভ্রমণ করতে হবে, আগামী কাল সকালে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস পৌঁছানো পর্যন্ত।

রাতের গাড়ি, যাত্রীরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর। অধিকাংশেরই দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। করিডরের আলো স্তিমিত। কামরায় প্রবেশের আগে, আমি একবার পিছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম, শেষ প্রান্তে, দরজার কাছে কণ্ঠের গার্ড এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে পারলাম না, লোকটির চোখে বিষয়, না অহুসঙ্কিৎস্ব জিজ্ঞাসা। মুখটা কিরিয়ে নিলাম, মনে পড়ে গেল, হাফেজ সাহেবের কথা, কণ্ঠের গার্ড তাঁকে বলেছিল, জেসমিন বিবিকে সে নেমে যেতে দেখেছিল। শেষ দেখা।

আমি কামরার মধ্যে ঢুকলাম। দরজাটা তখনই বন্ধ করতে পারলাম না। ঢুকেই মনে হলো, অশ্লীল আর হালকা ভাবে, জেসমিনের সেই বিদেশী স্বগন্ধের বেশ এখনো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। অসম্ভব কিছু না, আট-ন'বট্টা সময় তিনি এ কামরায় ছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা গিয়েছিল, কিছু বিলাসিতা ছিল তাঁর জীবনে। তাঁর নানাবিধ প্রসাধনের গন্ধ কামরায় ঈষৎ ছড়িয়ে থাকে। কিছুমাত্র বিচিৎর না।

কালকূট তার যাত্রার পথে, দু'বার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলো। একটা ছিল করাল রোগের গ্রাসে মৃত্যু, যাত্রা ছিল 'অমৃত কুন্তের সন্ধানে'। শুধু আমার যাত্রা না, অমৃতের যাত্রা ছিল, সেই যাত্রীরও, যে বুকের উৎস থেকে রক্তধারা ছিটিয়ে দিয়েছিল মৃৎ থেকে। অস্বীকার করতে পারবো না, ভয় পেয়েছিলাম। সে কথা তখন ব্যক্ত করতেও বিধা করিনি। তার মৃতদেহ যখন কামরা থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পূর্বের আকাশেও তখন রক্তরেখা। সূর্যোদয়কে মনে হয়েছিল সেই অমৃত সন্ধানীর বুকের রক্তে মাখা।

অমৃতের সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে, আজকের এই যাত্রায়, মৃত্যুকে আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম। মৃত্যু না, আত্মনাশ। চান্দ্র প্রত্যক্ষ ঘটেনি শুধু জ্ঞানি, যে রথে চলেছি, দাগ তার চাকায়। আশ্চর্য! জেসমিনের সেই মৃৎ মনে করে, এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, আত্মনাশের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। কখন নিয়েছিলেন? তাঁর হাসির কথার প্রতিটি টুকরোর কংকার এখনো কানে বাজছে। শেষ দিকে, ইয়াকুব সাহেব খেলতে খেলতেই গান ধরেছিলেন, খেলা আসছিল কিমিয়ে, আর জেসমিন বিবির চোখের কোণে মস্তার মতো অশ্রুবিন্দু টলটল করে উঠেছিল, তখনই কি তিনি সেই সর্বনাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

আমার তা মনে হয় না। বরং এখন মনে হচ্ছে, নিঃশব্দ কান্নার চোখের জলে, মনে মনে তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। স্বামী, প্রেমিক, কন্যা, তাঁর সকল আপনজনদের কাছ থেকে। আসলে তিনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন, যখন সেই উর্দু শায়েরি উচ্চারণ করেছিলেন, 'তোমরা তার মন্দির আঁখিতে কেবল হাসির ঝিলিক দেখেছো, চোখের জল দেখোনি / তোমরা তাকে পেয়লা ভরে পান করতে দেখেছো, তবু তার ছাতি কেটে যাওয়া দেখোনি /...সেই কি তাঁর শেষ ঘোষণা? তোমরা আমার কান্না দেখতে পাওনি, বুক ফেটে যাওয়া দেখতে পাওনি? অতএব তাঁর আত্মনাশ আপাতদৃষ্টিতে যতোটা আকস্মিক ও বিস্ময়কর মনে হচ্ছে, বিশেষত আমার চোখে, আদতে তা না। চিন্তা করলে সে সম্ভাবনার সূত্র হয়তো ছড়িয়ে ছিল তাঁর নানা কথার মধ্যেই। তিনি তালাক চেয়েও, বারে-বারে তা রোধ করেছেন। বারে-বারে হাফেজের কাছে যেতে গিয়েও যেতে পারেননি। কেমন যেন সেই অস্তগামী পূরবীর গান মনে পড়ে যায়। 'স্বরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে/সন্ধ্যাবেলার কে ডেকে নেয় তারে/ওরে আয়'...মনে হয় জেসমিন অনেক আগেই, তাঁর অস্ত-গমনোন্মুখ জীবনের ঘাটের কিনারায় এসে বসে-

ছিলেন। বাকী ছিল, নিবিড়তর ছায়ার গ্রাস। সেই ছায়ার গ্রাসকে তিনি হুঁহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছেন।

কিন্তু কি হবে যাত্রাপথের এই নিষ্করণ ঘটনার তীব্রতাকে তীব্রতর করে। জানি, সবই নিজের ইচ্ছায় হয় না। ইচ্ছা করলেই মনের সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে যখন খুশি দমন করা যায় না। এখন আমার মনের দু-কূলে জোয়ারের কাল বহে যায়। এই চলন্তা দরিয়ার নাম জেসমিন। তাঁটাও অনিবার্য, প্রকৃতির নিয়মেই নেমে যাবে সমুদ্রের টানে, পলি পড়বে মনের তটে। এমনি পলি পড়ে পড়ে, মনের তটে অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়, অবচেতনের অঙ্ককারে ডুবে থাকে অনেক জীবন, অনেক ঘটনা। সেই চাপা পড়া পলির ওপর দিয়ে আমরা জীবনের পথে চলতে থাকি। থেমে থাকে না কিছুই। সে অর্থে, কেবল আমি বা একটি ব্যক্তি বা সস্তা যাত্র না, সামগ্রিক ভাবে জীবন অমর, মামুষ জীয়ে যুগে যুগে।

আন্তে আন্তে নিজের পুরনো জায়গাটিতেই বসি। কামরাটির চারপাশে ফিরে তাকাই, আর হঠাৎ-ই বৃকের কাছে সাপের ছোবলের মতো একটা যন্ত্রণা অনুভব করি। চোখে পড়ে আমার সেই প্রাস্টিকের পানপাত্রটি। জেসমিনদের সঙ্গে ছিল তিনটি কাঁচের গ্লাস। ওঁদের তিনজনের জন্য তিনটি। আমারটা ছিল গোলাপি রঙের প্রাস্টিকের পাত্র। জেসমিন তাঁর নিজের মনের সিদ্ধান্তে, তিনটি কাঁচের পাত্রে পানীয় ঢেলে তিন পুরুষকে দিয়েছিলেন, নিজে নিয়েছিলেন, আমার পাত্রটি। মনে আছে, জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার পাত্রটিতে তিনি পান করলে, আমার কোনো আপত্তি আছে কী না। কেন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা জানি। কিন্তু আমাদের শান্ত্রাই বলে, জী দুকুলাদপি। তায় আবার যদি জেসমিনের মতো রূপসী মহিলা তিনি হন, তারপরে আর কী কথা! আমি সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলাম। দেখছি, সহযাত্রীদের কোনো চিন্তাই নেই, পড়ে রয়েছে কেবল আমার পানপাত্রটি, যার গায়ে জেসমিনের ঠোঁটের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

সামান্য প্রাস্টিকের পাত্রটির দিকে তাকিয়ে আমি যেন চকিত আঘাতে অবশ হয়ে গেলাম। জেসমিনের হাতে পাত্রটিকে তাঁর ঠোঁটে স্পর্শিত হতে দেখতে পেলাম, সেই সঙ্গে তাঁর চোখের কোণে মহিরেক্ষণা দৃষ্টি। ইয়াকুব আর হাকেরাজ সাহেব সবই নিরে গিয়েছেন, এ পাত্রটি কেন নিয়ে গেলেন না? এ অসামান্য

ভয়ংকর বোঝা বইবে কে ? আমি পারবো না। বস্তু অতি কঠিন মায়া। এ মায়াপাশে আমি বাঁধা পড়তে চাই না। পাঁজটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি না, জেসমিনের রঞ্জিত ঠোঁটের কোনো চিহ্ন লেগে আছে কী না।

কামরার খোলা দরজায় ছায়া পড়তে চমকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, কণ্ঠার গার্ড। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলামের ভঙ্গি করল। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে তার জবাব দিলাম। তাকালাম জিজ্ঞাসু চোখে। সে হিন্দীতে বলল, ‘আপনি কিছু কিব্বির করবেন না, নিশ্চিন্তে ঘুমান।’

কেন সে এ কথা বলল, হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। আমি অগ্ন্যম্নস্বভাবে বললাম, ‘হ্যাঁ, তা তো বটেই।’

সে আবার বলল, ‘আমি জানি, আপনার মনটা একটু খলবলি (চঞ্চল) হয়েছে। একই কামরার মধ্যে আপনি ছিলেন। কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কিছু নেই, দরজা বন্ধ করে গুয়ে পড়ুন। ইচ্ছা না করলে, আলো নেভাবেন না।’

লোকটির গায়ে পড়া ভাব দেখে আমি বিকল্প হতে পারলাম না। তার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সে আমার জন্তু কিঞ্চিৎ উদ্বেগ বোধ করেছে। পরমুহূর্তেই মনে হলো, শুধু তাই না, সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতার একটা গভীর ছাপ যেন তার মুখেও চেপে বসেছে। চকিতেই আমার মনে পড়ে গেল, জেসমিনকে এই ব্যক্তিই শেখবারের জন্তু গাড়ি থেকে নেমে যেতে দেখেছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে ভিতরে ডেকে বললাম, ‘আমুন, আপনাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।’

কণ্ঠার গার্ড ভিতরে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি তো দেখেছিলেন সেই মহিলাকে নেমে যেতে?’

সে বলল, ‘জী হ্যাঁ।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কি আমাকে নামতে দেখেছিলেন?’

সে বলল, ‘হ্যাঁ দেখেছি, আপনাকে নামতে দেখেছি, সেই সাহেবকেও নামতে দেখেছি, ষাঁর বিবি—’

তাকে ধামিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তখন কি আর একজন সাহেব আর সেই বিবি কামরার মধ্যেই ছিলেন?’

সে বলল, ‘হ্যাঁ, খানিকক্ষণ ছিলেন। তারপরেই মেমসাহেব নেমে গেলেন।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তারপর?’

সে বলল, ‘তারপর তো গাড়ি ছেড়ে দিল। আপনি, সেই সাহেব আর মেমসাহেব কেউ এলেন না। তখন কামরা থেকে আর এক সাহেব বেরিয়ে

এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেউ উঠেছেন কী না। আমি বললাম, না, আপনারা কেউ ওঠেননি। তবে চিন্তার কিছু নেই, হঠাৎ গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখে, আপনারা নিশ্চয়ই কোথাও উঠে পড়েছেন, চালিশগাঁও জংশনে আবার আপনারা নিজেদের কামরায় ফিরে আসবেন। আমার কথা সাহেব শুনলেন, কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ভেতরে ঢুকলেন না। তারপর চালিশগাঁও না আসা পর্বস্ত সাহেব পায়েচাষি করতে লাগলেন। কখনো কখনো কামরাতেও যাচ্ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, সাহেব সরাসরি পান করার জন্য কামরার ভেতরে যাচ্ছিলেন। গাড়ি চালিশগাঁওয়ে দাঁড়ানো মাত্রই সাহেব গাড়ি থেকে লাক দিয়ে নেমে ছুটে গেলেন, তারপরে তো—।’

কণ্ডাক্টর গার্ড থামল, কথাটা সে পুরো শেষ করতে পারল না। আমার মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, হাফেজ কি কোনো সর্বনাশের অহুমান করছিলেন! তিনি কি কোনো ইজিত পেয়েছিলেন?

সে কথা আমি আর কোনোদিনই জানতে পারব না। জীবনে, অনেকের সঙ্গেই, অনেকবার যখন ঘুরে ফিরে দেখা হয়, তখন ভাবি, পৃথিবী সত্যি ছোট। কিন্তু জীবনে অনেক মানুষ একবারের জন্য দেখা দিয়েই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। কখনো তার দেখা পাইনি। এ ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনাই বেশি। ইয়াকুব সাহেবের ইচ্ছা ছিল, কামরায় ফিরে গিয়ে, তিনি তাঁর নাম ঠিকানা মুদ্রিত কার্ড আমাকে দেবেন। সে ইচ্ছাপূরণ আর সম্ভব হয়নি। বম্বে শহরে তাঁদের দেখা আর কখনো পাবো, সে সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। যা ঘটে গিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, আবার কবে তাঁরা বম্বে ফিরবেন, এবং কোথায় ফিরবেন, তা হয়তো চিরদিন আমার অগোচরেই থেকে যাবে। যদি দেখা হতো, তবে হাফেজ সাহেবকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম, ট্রেন থেকে নেবে যাবার আগে, জেসমিন শেষ কথা কী বলে গিয়েছিলেন? জেসমিন তাঁর জীবনের শেষ যা কথা, তা একমাত্র হাফেজকেই বলে গিয়েছিলেন। অহুমান করতে পারি, নিশ্চয় তিনি বলে যাননি, সে যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, তিনি আত্মহত্যা করতে চলেছেন। কিন্তু এমন কথা নিশ্চয় কিছু বলে গিয়েছিলেন, যার মধ্যে তাঁর শেষ বিদায়ের সংকেত ছিল।

—‘কী হয়েছিল সাব?’

কণ্ডাক্টর গার্ডের প্রশ্নে আমার সংবিত ফিরল। আমি শব্দ করলাম, ‘জ্যা?’

গার্ড হাত জোড় করে বলল, ‘সাব, কোনো গোস্বামি নেবেন না। আমি জিজ্ঞেস করছি কী হয়েছিল? কোন ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল নাকি?’

বাইরের লোকের মনে, এ চিন্তাটাই সর্বাগ্রে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কী বলবো আমি এই লোকটিকে? শুধু এই লোকটিকে কেন, কোনো লোককেই কি আমি সঠিক বিষয় ও কারণ ব্যক্ত করতে পারবো?

বললাম, 'না বগড়া বিবাদ কিছুই হয়নি। সবাই বেশ আনন্দে আর কুর্তিতেই ছিলেন। ওই স্টেশনটায় গাড়ি না থামলে বোধ হয় কোনো গোলমালই হত না।

গার্ড লোকটি বিস্ময় দৃষ্টিতে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে উচ্চারণ করল, 'তাজব ব্যাপার! হুনিয়ার হালচাল হুনিয়ার জানে। আমরা কতোটুকু জানি।' বলে, সে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'ঠিক আছে সাব, আপনি শুয়ে পড়ুন, কী আর করবেন।'

সে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল। সত্যি, কী আর করতে পারি। জোয়ারের স্রোত যতোক্ষণ মনের দুই কূল প্রাবিত করে যাবে, ততোক্ষণ ভাসতে থাকব। তাছাড়া আমার করণীয় নেই। কেবল এইটুকু পারি, জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে, হু' হাত জোড় করে, মাহুকের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে বলতে পারি, হুজুর ভূমি নও, তথাপি তোমার অতল গভীরতাকে দেখতে দাও।

দেখেছি, সন্ধ্যা সন্ধানহারা শোকার্ত জননীও নিজের কোলে ঢলে পড়েছে। আমিও ঘুমিয়ে পড়বো, তাতে আর আশ্বস্তির কী আছে। হাতের বড়িতে দেখছি সকাল আটটা বাজে। বাইরের প্রকৃতিতে নগরীর চিহ্ন স্পষ্ট। গম্বুযা নিকটেই, তারই নিদর্শন।

গত সন্ধ্যার সব ঘটনা মনে না পড়ার কিছু নেই। উঠে, শুছিয়ে নিলাম ঝোলাঝুলি। তৃষ্ণার্ত বোধ করে জলের পাত্রটি নিয়ে জানালার ধারে প্রাসটিকের প্রাসটা তুলতে গিয়ে থমকে গেলাম। এপানপাত্রে কি আর চুম্বক দেব? মনে পড়ে গেল জেসমিনের কথা। 'আপনার এই প্রাসটিই নিলাম, তবু আপনাদের তিনজনের থেকে আমাকে আলাদা করে চেনা যাবে। আপনার আপত্তি নেই তো?'

তার জিজ্ঞাসার কারণটা মনে করেই, প্রাসটা হাতে তুলে নিলাম। গরম কাপড় মোড়া এলুমিনিয়ামের পাত্র থেকে জল ঢেলে, মুখ ঠেকিয়ে পান করলাম। মনে হলো যেন, গলা দিয়ে নেমে, বুকের কাছে ঠেকে যাচ্ছে। একটি মুখ ভাসছে চোখের সামনে। কিন্তু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণা কি মিটল?

জানি না। গলাটা ভিজলো। গ্রাসটা নামিয়ে রাখলাম, যেখানে জেসমিন গ্রাসটা রেখেছিলেন।

গাড়ি দাঁড়ালো শেষ গন্তব্যে। না, এ পানপাত্র আমি বহন করব না। এপাত্র চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাক আমার কাছ থেকে। এ ভার বহন সম্ভব না। কেননা, এ নিত্যস্তুই একটি ভারি বোঝা। পথের বোঝা পথেই ফেলে যাই।

গাড়ি থেকে নামতেই একজন এগিয়ে এলেন আমার কাছে। তাঁর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি পুলিশের লোক। সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বর গার্ড। মনে মনে প্রমাদ গণলাম। এ আবার কি বিপদ?

পুলিশ! কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠায়ো ঘা। পুলিশ স্পর্শ করলে, সেটা যে কতো ঘা হতে পারে, কেউ হিসাব করে বলতে পারে না। জেসমিন বিবি আত্মবলি দিয়ে কি শেষে আমাকে ফাটকে পুরে গেলেন নাকি?

পুলিশের লোকটি বেশ সপ্রতিভ এবং মোটেই রামগুরুড়ের ছানা নন। ইংরেজি কেতাব, হেসে কমা চেয়ে, ইংরেজিতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘বম্ব্বে এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর বিশেষ ইংরেজি অক্ষরটির কামরাতেই আমি ভ্রমণ করছিলাম কি না!’

আমি বললাম, ‘তিনি ঠিকই বলেছেন।’

অফিসার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, ‘আপনাকে একটু কষ্ট দেব, কয়েক মিনিটের জন্য আপনি আমাদের অফিসে একবারটি চলুন।’

জানি, হেথা বাক্যব্যয় বুধা। কোনো জিজ্ঞাসাও অবাস্তব। তবে দেশের নাগরিক হিসাবে, এটি আমার অবস্থা পালনীয় কর্তব্যও বটে। বললাম, ‘চলুন।’

অফিসার আমার স্টাটকেস আর অ্যাটাচির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কোনো বিছানাপত্র নেই?’

আমি হেসে বললাম, ‘ওটাকে বড় বোঝা বলে মনে হয়। ছুঁরাত্রির ব্যাপার তো। কেটে গেছে কোনোরকমে।’

অফিসারও হাসলেন, বললেন, ‘ছুঁরাত্রি শয়ন করেননি বলুন?’

বললাম, ‘করেছি। আসনে গদী আর একটি বায়ুপূর্ণ ফাফুস বালিশেই আমার কাজ চলে গেছে।’

আমার কথায় অফিসার হেসে উঠলেন। এই সময়ে একজন রেলপুলিশ এগিয়ে এসে অফিসারকে বললো, ‘সাব, ইয়ে পিলাস্টিককা গিলাস কামরে মে থা।’

আমি অবাক হয়ে দেখি, পথের বোঝা-জ্ঞানে পরিত্যক্ত, এটি আমারই সেই গ্রাম। বুঝতে অস্বীকারে হলো না, আমি অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই, কায়রাটি পুখুপুখু তল্লাস করা হয়েছে। অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ গ্রাম কি আপনার?’

আমি নির্বিকার ভাবে বললাম, ‘না তো। এটা অন্য রাজাদের হাতেই দেখেছি।’

অফিসার সেপাইকে নির্দেশ দিলেন, গ্রামটি অফিসে নিয়ে যেতে। কণ্ঠস্বর গার্ডকে বললেন, ‘তুমি দফতর যে যাও।’ বলে, আমাকে ডাকলেন, ‘আসুন।’

একজন কুলি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমার স্কাটকেসটি হাতে তুলে নিল। নাগরিক হিসাবে কর্তব্যের দায় আছে ঠিকই, তবু মনে মনে না বলে পারছি না, কি ঝামেলা রে বাবা! গত পরশুদিন ভরদুপুরে গাড়িতে উঠেছি। এখন কি না খানা পুলিশ! গেরো আর কাকে বলে!

অফিসার চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনাকে কি কেউ রিসিত করতে আসার কথা আছে? থাকলে, সেটা আমি মাইকে ঘোষণা করে জানাতে চাই, আপনি কোথায় আছেন।’

অফিসার বুদ্ধিমান, কথাটা একেবারে মন্দ তোলেননি। বসেতে আপাতত যার অতিথি হিসাবে আমার আগমন, সেই বন্ধুকে পক্ষে জানানো আছে, কোন্ গাড়িতে কখন এসে পৌঁছছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানানো আছে, তাকে স্টেশনে আসতে হবে না, আমি ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাবো। তথ্যপি যদি তার মন না মানে, সে যেন তার ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়, তার আসবার দরকার নেই। বন্ধুটি কাজের লোক বলে যে আমি এব্যবহার কথা লিখেছিলাম তা না, আমি জানি, বন্ধু মহাশয় এখনো তার শস্যের নিভ্রা মগ্ন। মাহুটি একটু স্থখী, বা বলা যায়, দীর্ঘকালের তৈরি অভ্যাসের অভ্যন্তর জীবন। প্রায় উদালগ্নে যে শয়ানে যায়, বেলা দশটায় সে ঘুম থেকে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি! বন্ধুর ড্রাইভার আমার নাম জানে, আমি তার গাড়ির নম্বরটাও জানি।

অফিসারকে বললাম, ‘নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো নেই, তবে একজন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসতে পারে।’

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, ‘ড্রাইভার কি আপনার নাম জানে?’
বললাম, ‘জানে।’

অফিসার যেন স্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, ‘ভালোই হলো।’

ইতিমধ্যে প্র্যাটকর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখছি। আমি অনেকেরই অহুসন্ধিস্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। না করার কেনো কারণ নেই। গাড়ি থেকে তল্লি-তল্লা নিয়ে নালমাম ভালো মাছ, তারপরেই হঠাৎ পুলিশ ডেকে নিয়ে তার অফিসে চলেছে, সাধারণের কোতুহল হবারই কথা। শুধুই কি কোতুহল। ইতিমধ্যেই কতো জনে, কতো কি সাব্যস্ত করে বসে আছে, তা-ই বা কে জানে। এখন আমি কারোর চোখে হয়তো ঠগ, কারোর চোখে চোর বা জুয়াচোর বা দাগী আসামী। কে বলতে পারে, হয়তো খুনীও।

হায়রে কালকূট, কি তোর কপাল! একেই বোধ হয় বলে, ‘নিয়তি কে ন বাধ্যতে।’ তাছাড়া একটা ঝমেলার পড়লেই, মনে নানান কু গাইতে থাকে। জেসমিনের স্পর্শিত যে গ্লাসের বোকা বহন করতে চাইনি, তা-ই পড়লো পুলিশের হাতে। বলে তো খালাস হলাম, ও গ্লাস আমার নয়। তারপরে যদি ওটা ফরেন্সিক পরীক্ষায় যায়, তখন মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে বাকী থাকবে না। একবার মিথ্যা ধরা পড়লে, তখন এমন প্রস্নই-বা উঠবে না কেন, আমিই হয়তো জেসমিন বিবিকে বিষ পান করিয়েছি।

কল্পনার কি দৌড়! প্রাণে একবার ভয় জাগলে, কত কথাই মনে আসে। মনে মনে না হেসে পারলাম না। বিষ দেবার প্রস্নটা কোথায়। জেসমিন তো রেলের চাকর্য গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে হ্যাঁ, ক্রেসিক একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারে। গ্লাসের গায়ে আমার আর জেসমিনের হৃৎকনের হাতের ছাপই আছে। তাতেও অবিজ্ঞি প্রমাণ হবে না, গ্লাসের মালিক আমি। যা ত্যাগ করেছি, তা করেছি। এখন সবই ভবিতব্য।

অফিসার তাঁর নিজের ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। প্রথমই তিনি টেলিকোনের রিসিভার তুলে, টেলিফোন করলেন ঘোষকের কাছে। জানিয়ে দিলেন, যেন ঘোষণা করা হয়, আমি হাওড়া থেকে অমুক নামের যাত্রী এখন এই অফিসে আছি। আমাকে কেউ রিসিভ করতে এসে থাকলে, সে যেন এখানে এসে খোঁজ করে। ঠর কথায় জানলাম, ইতিমধ্যেই তিনি আমার নামটি জেনেছেন। সেটা কোনো বিশ্ময়ের ব্যাপার না। যাত্রীদের নামের তালিকাতেই আমার নাম আছে।

অফিসার তাঁর নথিপত্র কলম নিয়ে তৈরি হলেন এবং আর একদফা ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, ‘বুঝতেই পারছেন, আমি আমার কর্তব্য করছি মাত্র। আপনাকে বিরক্ত করা আমার মোটেই অভিপ্রেত না।’

আমি বললাম, ‘আপনি অসংকোচে আপনার কর্তব্য করুন। আমিও আমার কর্তব্য করতে চাই।’

অফিসার আমার কথায় খুশি হয়ে বললেন, ‘ধন্যবাদ।’

তারপরে তিনি জানতে চাইলেন, বয়েতে আমি কোথায়, কার কাছে উঠেছি এবং কী কারণে আমার আগমন। আমার জবাবের সবই তিনি লিখে নিলেন। জানতে চাইলেন, আমার কলকাতার ঠিকানা। তারপরে এলো আমার সহযাত্রীদের কথা। এক্ষেত্রে অনায়াসেই, সহযাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা আমি এড়িয়ে গেলাম। নিতান্ত প্রয়োজন বোধে, যেটুকু বলা উচিত, তা-ই বললাম। তাঁদের সঙ্গে, আহ্বানে আমি তাস খেলেছিলাম। নিতান্ত একজন সহযাত্রী হিসাবে। মোটামুটি তাঁদের নামগুলো জেনেছিলাম। আর কিছুই আমার জানা নেই। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, তাঁরা কে কী করেন, সব কথাই আমি এড়িয়ে গেলাম। জেসমিন যে স্টেশনে আত্মহত্যা করেছেন, সেই স্টেশনে ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে আমি এক কামরায় উঠেছিলাম, সে কথাটাও জানালাম।

এই সব জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই একজন মহিলা এসে পড়লো। মহিলাকে তরুণী বলাই সঙ্গত, বয়স পঁচিশ-ছাশ্বিশ হতে পারে। পুরোপুরি আধুনিক। মেদবর্জিত উদরের উপরে জামা, নাভির নিচে শাড়ির বন্ধনী। যাকে বলে সাঁট মেলানো, তেমনিই ওর হরিদ্রা বর্ণের শাড়ি জামা, ইত্থক পায়ের স্লিপার থেকে, কানের ও গলার এবং হাতের রুলি বা ওই জাতীয় কিছু আর হাতে কোলানো ব্যাগটিও। সত্যি কথা বলতে কি তরুণীর শরীরের বর্ণেও হরিদ্রাবর্ণ আভা, যাকে বলে গোঁরাঙ্গী। ওর কপালের টিপটিও হরিদ্রা বর্ণের। চোখে কাজল, ঠোঁটেও হালকা রঙ ছোঁয়ানো। মাথার চুল ঘাড়ের একটু নিচে, সমান করে কাটা, আর আঁচড়ানো। এমন কিছু রূপের অধিকারিণী সে না। তথাপি বলতে হবে, স্বাস্থ্যের দ্যুতির সঙ্গে, যাকে বাঙলায় বলে চটক, সেটি পুরোমাজায় বর্তমান। প্রথমেই ভাবলাম, বোম্বাই নগরী বলে কথা। ইনি রূপোলি পর্দার ছরী পরী নন তো!

তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকেই একটি চেয়ারের দিকে এগিয়ে, কিছু বলতে উত্তত হতেই, অফিসার বিরক্ত ভ্রুকুটি চোখে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, এবং বেশ রাশভাষি স্বরে বলে উঠলেন, ‘কোনো কথা না। আমার সঙ্গে দরকার থাকলে আপনি পরে আসবেন, এখন বাইরে যান। আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি।’

তরুণী তখনই কিছু বলবার উদ্ভোগ করতেন, অফিসার এবার বেশ কষ্ট করে বললেন, ‘আপনাকে আমার যা বলবার, তা আমি বলে দিয়েছি। আমি একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি। আপনি এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার কথা পরে শুনি।’

আমি তরুণীর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। সে যেন বিষয় মুখে, আমাকেই কিছু বলতে চাইলো কিন্তু বললো না, আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। একেই বলে পুলিশ অফিসার! স্বন্দরী আর রূপসী আছ, থাকো গিয়ে। কাজের সময় ওসব চলবে না। নিতান্ত যদি আসতেই হয়, তার জন্য সময় আছে। কিন্তু তরুণীটিরও হয়তো কোনো জরুরী ব্যাপার ছিল, যা অফিসারকে বলবার দরকার ছিল।

আমি বললাম, ‘মহিলা হয়তো আপনাকে কোনো জরুরী কথা বলতে এসেছিলেন।’

অফিসার হাসলেন। বললেন, ‘তা যে উনি আসেননি, তা ওর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা ছাড়া সাজগোজের ঘটটা দেখলেন তো? কাজের কোনো বিষয় ঘটলে বা জরুরী দরকার থাকলে, সে এই সাত সকালে সেজে-গুজে পুলিশের কাছে আসে না। বলুন, ঠিক বলেছি কী না?’

কাথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো না। বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। এই সব অফিসাররা, আমাদের থেকে লোকচরিত্র কিছু কম বোঝেন না।

অফিসার আবার বললেন, ‘অবিশ্রুতি আপনি একজন লেখক মানুষ, আপনাকে আমি আর কী বলব।’

আমি সঙ্কুচিত লজ্জায় হেসে বললাম, ‘না না, ওকথা বলবেন না। লেখক হিসাবে আমার কোনো আত্মগরিমা নেই, মানুষের চরিত্রমাজেই বুঝতে পারি। তাহলে তো, গত রাতে সেই মহিলার আত্মহত্যার কথা আমি আগেই অনুমান করতে পারতাম। ভদ্রমহিলা দিব্যি পান করছিলেন, হাসছিলেন, তাস খেলছিলেন। তারপরে গাড়িটা একটা অপ্রত্যাশিত স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়লো সিগন্যাল না পেয়ে। আমি গেলাম একটু বাইরে পায়চারি করতে। কলনাই করতে পারিনি, ভদ্রমহিলা তখন আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে বসে আছেন।’

অফিসার বললেন, ‘ঠিক বলেছেন। এ সব হচ্ছে সাময়িক ইনস্ট্যান্সিটি।’ তাঁদের ভেতরে কী ব্যাপার ছিল, আপনি কী করেই বা জানবেন। আপনি একজন যাত্রী, তাঁদের জীবনে কখনো দেখেননি, চেনেন না, মাঝপথ থেকে তাঁরা

‘আপনার সহযাত্রী হয়েছেন। আপনার জায়গায় আমি হলে, একই অবস্থা হতো। আমি বুঝি সবই, তবু আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।’

‘আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘না না, আমি মোটেই বিরক্ত হইনি। আমার কাছে আপনার যা জানবার আছে, তা জেনে নিন।’

এই সময়েই আমার পিছনে গুনতে পেলাম, ‘সালাম সাব। অ্যালাউন্স গুন কর মায় আপকা ইধার আয়া। মায় ইন্ দাবকো লেনে আয়া।’

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার বন্ধুর ড্রাইভার বব, গোয়ানিজ যুবক। আমি পিছন ফিরতেই, সে একটু হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, ‘গুডমর্নিং স্তার।’

দেখলাম, হাসলেও ববের মুখে একটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা ফুটে রয়েছে। বব সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলে। বাঙলাও কিছু কিছু বলতে পারে, বুঝতে পারে আরো বেশি। আমি বললাম, ‘গুডমর্নিং বব। তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা করো, আমি এখুনি যাচ্ছি।’

অফিসার ববকে বললেন, ‘সিরিফ অণ্ডর পাচ মিনিট। আপ বাহার বৈঠিয়ে, দাব খোড়া চা পিকে আভি আ রহে।’

বব ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে গেল। কিন্তু চা পানের কথাটা এলো কী করে? আমার ভাবনা শেষ হতে না হতেই, একজন ক্যাটারিং-এর বেয়ারা চা টোল্ট ডিম ইত্যাদি, যাকে বলে পুরা নাস্তাসহ ট্রে নিয়ে হাজির। অফিসার বিনীত অনুরোধ করলেন, ‘একটু চা পান করুন।’

আমি কোথায় ছাড়া পাবার চেষ্টা করছি। তার মাঝখানে আবার আপ্যায়ন। তাও আবার পুলিশের আপ্যায়ন। বড়ো ভয় লাগে। ব্যস্ত হয়ে বললাম, ‘এ সবের কোনো দরকার ছিল না। কেন আনতে গেলেন?’

অফিসার বললেন, ‘আপনি গাড়ি থেকে নামা মাজই যদি আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি, এটুকু আমার করা উচিত। আপনাকে আমার যা জিজ্ঞাসা ছিল, তা হয়ে গেছে। আর আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটি একটি নিতান্তই আত্মহত্যার ঘটনা। জানি না, কোনো কেস টেস হবে কী না। হলে, আপনাকে হয়তো সাক্ষীর সমন পেতে হবে, আপনাকে কোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে।’

সর্বনাশ, এ যে সত্যিই বাঘের ছোঁয়ার বেশি। সাক্ষী হিসাবে কোর্টে উপস্থিত হতে হবে? আমি বললাম, ‘কিন্তু আমি তো এখানে বেশিদিন থাকছি না।’

অফিসার হেসে বললেন, ‘তা কেন থাকবেন? আপনি এখানে এসেছেন বেড়াতে। আপনার কর্মস্থল কলকাতা। দরকার হলে আপনাকে আমরা কলকাতা থেকেই ডেকে পাঠাবো। সেটাই হবে, আপনার পক্ষে সত্যিকারের কষ্ট আর বিরক্তির কারণ। কী করবো বলুন, এ ব্যাপারে তো আমাদের কিছু করার নেই। এটা আপনার দুর্ভাগ্য, যে আপনি সেই কামরায় ছিলেন। নিন, চা খান।’

বললাম, ‘আমি তাঁদের কামরায় ছিলাম না, তাঁরাই মাঝ পথ থেকে আমার কামরায় উঠেছিলেন।’

অফিসার নিজের চায়ের কাপে, চা চিনি দুধ ঢেলে, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘একই কথা হলো। আমার বক্তব্য, আপনি সেই কামরায় ছিলেন এবং সেই কামরায়ই একজন মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেটাই আপনার দায়।’ বলে তিনি হেসে উঠলেন এবং নিজের জগু চা নিলেন।

আমি বাসি মুখে কোনো খাবার মুখে তুলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি জোর করলেন না। চা পানের পরে, অফিসার আমার করকর্মণ করে, নিজেরই আমার হাত ধরে অফিসের বাইরে এলেন।

অফিসের বাইরে আসতেই, সেই তরুণীকে দেখা গেল, তখনো সে দাঁড়িয়ে আছে।

অফিসার তার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আপনি এবার ঘান, আমার অফিসে বসুন, এক মিনিটের মধ্যে গিয়েই, আমি আপনার কথা শুনছি।’

তরুণীর মুখ যেন একটু আরক্ত হলো, বললো, ‘মাপ করবেন অফিসার, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথাই নেই।’ বলে, সে চোখের কোণে আমার দিকে তাকালো।

অফিসার দ্রুতই বিশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তবে আমার ঘরে গেছিলেন কেন?’

তরুণী বললো, ‘আমি মাইকের ঘোষণা শুনে, আপনার ঘরে গেছিলাম।’

বলে, তরুণী এবার আমার দিকে ফিরে, পরিষ্কার বাড়লায় উচ্চারণ করলো, ‘আমার নাম কলি—ফুলকলি চট্টোপাধ্যায়।’ বলে, হাত জোড় করে নমস্কার করে আবার বললো, ‘আশা করি, আসবার আগে, আমার চিঠি পেয়েছিলেন?’

কলি! ফুলকলি! যার চিঠির পর চিঠি পেয়ে, আমি মনে মনে বলতাম, ফুলকলি না, একটি আত্মান্ত পাগলী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু সে কথা এখন বলা

যায় না। আমি তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করে বললাম, ‘ওহু আপনি! আমি চিনতে পারিনি।’

ফুলকলি একটু হেসে, যদিও বা শ্রান, বললো, ‘আপনি আমাকে চিনবেন কী করে, কোনোদিন তো দেখেননি। আপনাকে আমি চিনেছি, কারণ আপনার ছবি—।’

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ‘সে ঠিক আছে। কিন্তু আমি আসবার আগে আপনার কোনো চিঠি পাইনি তো?’

ফুলকলি বললো, ‘কিন্তু আমি আপনার চিঠি পেয়েছিলাম, যে চিঠিতে আপনি আপনার আসবার তারিখ জানিয়েছিলেন। তাই আমি স্টেশনে এসেছি, আপনাকে নিতে।’

বিস্মত হয়ে পড়লাম। অদূরেই দেখলাম, বব দাঁড়িয়ে আছে। অফিসার আমাকে বললেন, ‘ইনি আপনাকে নিতে এসেছেন?’

বলেই, তিনি ফুলকলির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাকে মার্জনা করবেন, আমি বুঝতে পারিনি। আমি গুঁর সঙ্গে একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম।’

ফুলকলি বললো, ‘অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার বলা উচিত ছিল, মাইকের ঘোষণা শুনেই, আমি আপনার ঘরে ঢুকেছি। কিন্তু, ওঁকে কেন আপনারা ডেকে নিয়ে এসেছেন, কী ঘটেছে, কিছুই বুঝতে না পেরে, আমি যীতিমত উদ্বিগ্ন আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোনো গুরুতর বিপদ আপদ কিছু ঘটেছে নাকি?’ বলে, সে আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, তা বলা যায়। তবে আমার কিছু ঘটেনি। আমি একটি দুর্ঘটনার সাক্ষী মাত্র।’

ফুলকলি তাকালো অফিসারের দিকে, দৃষ্টিতে যেন একটা অসুস্থিস্থিতি জিজ্ঞাসা। কেন, ফুলকলি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না? ভাবছে, আমি তাকে মিথ্যা কথা বলছি?

অফিসার ফুলকলির দিকে তাকিয়ে, হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, ‘উনি ঠিকই বলেছেন। আর সেইজন্যই ওঁকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। এবার আপনি আপনার অতিথিকে নিয়ে যান, আপনার ড্রাইভার আপনাদের জন্ত অপেক্ষা করছে।’ বলে, তিনি অদূরে দাঁড়ানো ববকে ইঙ্গিতে দেখালেন।

ফুলকলি কাজল কালো জুহুটি চোখে ববকে দেখে বললো, ‘আমার ড্রাইভার? আমার তো কোনো ড্রাইভার নেই। আমি নিজেই আমার গাড়ি ড্রাইভ করি।’

অফিসার আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, ‘ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।’

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। ও লোকটি কার ডাইভার?’

ফুলকলি কথাটা আমাকেই জিজ্ঞেস করলো। আমি হেসে বললাম, ‘ও আমার বন্ধুর ডাইভার। তার কাছেও খবর ছিল, এই ট্রেনে আজ আমি আসছি।’

ফুলকলি তার কাজল মাথা চোখের তারা একটু ঘুরিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, বাঙলায় বললো, ‘এ রকম, আর কতোজনের কাছে খবর আছে, আজ এই ট্রেনে আপনি বসে আসছেন?’

ফুলকলির এটা গৌসী কী না জানি না, তবে একটু অভিমানের স্বর যে আছে, সন্দেহ নেই। জীবনে ওকে আমি কখনো দেখিনি, প্রায় এক বছর ধরে, কেবল পত্রালাপই চলছিল। তাও, পত্র লেখার ব্যাপারে সংসারে আমি হচ্ছি দ্বিতীয় অলস। ফুলকলির সমস্ত চিঠির জবাব যদি আমাকে দিতে হতো, তাহলে, মনে মনে ওকে পাগলী না বলে, নিজেকেই পাগল ভাবতে হতো। আমার অলসতার মধ্যে, কোনো অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না, কিন্তু ফুলকলির চিঠির বক্তব্যে এত বেশি একই কথার পুনরাবৃত্তি থাকতো, জবাব দিতে গেলেই, হাত থেকে কলম আপনিই নেমে যেত, আর মনে মনে বলতাম, একটা পাগল মেয়ে। যদিও ওর চিঠির পুনরাবৃত্তির মধ্যে, বারে বারে বেজে উঠতো প্রাণেরই ব্যাকুলতা। আমার জবাবের ব্যগ্র প্রত্যাশা। ও যে আমার একনিষ্ঠ ভক্ত পাঠিকা মাত্র, তা কখনোই বলা যাবে না। সে কথা ও প্রথমই ঘোষণা করেছিল। ওর প্রথম চিঠির বয়ান, আমার কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয়েছিল এবং এখনও তা আমার মনে আছে। কথাটা এইরকম “আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা মাত্র, তা যেন মনে করবেন না। ভক্ত হবার মামূলি ব্যাপারে আমি নেই। আপনি জাহ্ন বা না-ই জাহ্ন, আমার হুঁহাতে আপনি তুলে দিয়েছেন, অমৃত আর বিষের পাত্র। আমি কোনোটাকেই ছাড়িনি, দু’টোই পান করেছি। আমার অবস্থা কি আপনি বুঝবেন? বুঝলেও, আপনার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সেটা আপনার লেখা পড়েই বুঝেছি। এখন যা দায়দায়িত্ব, অমৃত আর বিষপানের, সবই আমার। আপনি শুধু দয়া করে, আমার চিঠির উত্তর দেবেন, তাহলেই হবে।...”

তারপরেও, বহু চিঠির মধ্যে, ওর নানান পরিচয় পেয়েছি। ও চাকুরিজীবী

মেয়ে। বাবা নেই। মা আর ছোট দুটি বোনকে নিয়ে সংসার। চিঠিতে এ কথা জানাতেও ভোলেনি, “সংসারে দুটো ব্যাপারকে আমি ভীষণ ভয় পাই। এক : জোর করে কারোর কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করা। দুই : কারোর গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটানো। কারণ কী জানেন? দু’টোরই চরম ভিত্তি অভিজ্ঞতা আমার এবয়সেই হয়ে গিয়েছে। এ সব আমি আপনার লেখা পড়ে শিখিনি, কিন্তু আপনার লেখার মধ্যে পেয়েছি, আমারই অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসের সমর্থন। আমার আপনিই এক জায়গায়, বোধ হয় “কোথায় পাবে তারে”-র মধ্যে লিখেছেন, “ভালোবাসা পেলেই তা গ্রহণ করা যায় না। অথচ মুশকিল এই, ভালোবাসাকে যাচাই করার কোনো মন্ত্র আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। তবু জানি ভালোবাসা মাত্রকেই গ্রহণ করা যায় না। আবার ভালোবেসেও ভালোবাসা পাওয়া যায় না।” কেমন করে আপনি এ সব অনুভব করেছেন? আপনার জীবনেও কি, আমাদের সাধারণ নারী পুরুষদের মতো ঘটনা ঘটে, অভিজ্ঞতা জোটে? কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আর একটা বিষয় বুঝেছি। আপনার কাছে তো নোতুন না, আমার কাছেও না। ভালোবাসা জোর করে আদায় করা যায় না, এটা যেমন বুঝেছি, তেমনি বুঝেছি, আমার নিরন্তর ভালোবাসাকেও কেউ, কোনো কিছু দিয়ে মলিন করতে পারে না, কারণ, আমার ভালোবাসা, আমার ধর্ম। তা একান্ত আমারই, তার জন্য কারোর কাছে, আমার কিছু দাবী নেই। কী মনে হচ্ছে বলুন তো? আপনার কথাগুলোই আপনাকে শুনিয়ে দিলাম নাকি? দিয়ে থাকি তো বেশ করেছি। কেন আমার প্রাণের কথা, আপনার লেখায় ফুটে ওঠে? তা-ই, এখন ঠিক করেছি, আমার দাবী, আপনার লেখা আসলে আমার প্রাণ থেকেই চুরি করা, অতএব, আপনার লেখা, আমারই লেখা।...”

চিঠিটা পড়ে, মনে মনে খুব হেসেছিলাম এবং অচেনা, অদেখা বোম্বাইবাসিনী কোনো এক ফুলকলি চট্টোপাধ্যায়কে আমার বেশ সবল মনে হয়েছিল। সেই চিঠিটা পড়েই, মনে মনে বলেছিলাম, পাগল মেয়ে। তারপরেও বহু চিঠিতে ওর নানান পাগলামি প্রকাশ পেয়েছে। পাগলামি বলছি বটে, সত্যই তা পাগলামি না, অন্তরেরই নানা কথা, যার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, সারল্য এবং অকপটতা ফুটে উঠেছে। আর আমরা, ওই ধরনের উক্তিগুলোকেই, অনেক সময়, হেসে, পাগলামি বলে থাকি। যেমন ও একবার লিখেছিল, “আমি মাত্র বারোশো টাকা বেতন পাই, তাতে আমার চলে যাবার কথা, কিন্তু চলে না। বাড়ি ভাড়া দিয়ে, সংসার খরচ চালিয়ে, উদ্ধৃত কিছুই থাকে না। তাই ভাবছি,

আমার পরের বোন কৃষ্ণকলিকেও এবার কোথাও চাকরিতে লাগাবো। কৃষ্ণকলিও আপনার লেখা পড়তে ভালোবাসে। কিন্তু চিঠি দিতে লজ্জা পায়। ও খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। আপনি কখনো বসেতে আমাদের বাড়ি এলে, ও আপনার একটা পোর্ট্রেট এঁকে দেবে। এখন ভাবুন তো, বেতনের কথাটা কেন লিখলাম? নিশ্চয়ই কিছু ভেবে পাচ্ছেন না? তাহলে শুধুন, আমার খুব ইচ্ছা কলকাতায় যাই। কলকাতায় আমার মামার বাড়ি আছে। যেতে হলে, মা বোনদের সবাইকে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু টাকার অভাবে যাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারি না। আমার অবিশ্বাস, মামার বাড়ি থেকে, আপনাকে দেখতে যাওয়াটাই আসল। এ কথায় আবার কী ভাবছেন, কে জানে? যা-ই ভাবুন আমি আমার মনের কথাটাই লিখলাম। দিনরাত ভোঁ কতো মিথ্যা কথাই বলতে হচ্ছে। এক আধটা জায়গায়, সত্যি কথা বলবার না থাকলে, দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। কিন্তু দোহাই আপনার, টাকার অভাবের কথা লিখলাম বলে, ভাববেন না যে আপনাকে আমার আর্থিক সুরাহা করতে বলছি। যা সত্যি, তা-ই লিখলাম। তবে একটা কথা, সবাই বলে, আপনি নাকি বড়লোক। মানে ধনী। যদি তা না-ও হন, তবু অহুরোধ করি, আপনিই একবার বসে আসুন। আমি নিমন্ত্রণ করছি। আমাদের বাড়ির সবাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে। একবারটি আসুন না। শুনেছি, কয়েকবার নাকি ঘুরে গেছেন। আবার একবার আসুন। কোনো কাজ নিয়ে না, শুধু বেড়াতে। অবশ্য এসে যদি দেখেন, আমাকে বা আমাদের বাড়ির কারোকে ভালো লাগছে না, তাহলে আপনার অন্ত্রান্ত পরিচিত বন্ধুদের কাছে যাবেন। জোর করে আটকাব না। আগেই বলেছি, জোর করে আমি পেতে চাই না। এমন মেয়ে কখনো পাবেন না, যে জোর করে কিছু পেতে চায় না, এই বলে দিলাম”.....

এ মেয়েকে পাগলী ছাড়া আর কী বলতে পারি? ফুলকলির চিঠির কথা বলতে ও ভাবতে গেলে, সে এক মহাভারত। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপাতত ভি. টি. স্টেশনে যে মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই যে সেই পত্র-লেখিকা ফুলকলি চট্টোপাধ্যায় ভাবতে যেন একটু অস্ববিধাই হচ্ছে। প্রথমত, ওকে আমি এতটা কম বয়সের তরুণী ভাবিনি। যদিও, দেখেই অবিশ্বাস সব বোকা যায় না আর নারীর বয়স অহুমান করার মতো সাহস যেন আমি না রাখি। তা ছাড়া, ওর পত্রগুলো পড়ে, এরকম একটা বলকানো মেমসাহেব বলে মনে হয়নি। আরো একটা কথা এ মুহূর্তেই জানা গেল, ওর একটা

গাড়ি আছে, আর সেই গাড়ি ও নিজেই চালায়। গাড়ির সংবাদটা কোনো চিঠিতে ও জানায়নি।

কিন্তু, আপাতত সমস্তটা সেখানে না। সমস্তটা রয়েছে, ফুলকলির চোখের তারায়। গলার স্বরে। ভাবার বিভ্রাসে। ওকে আমি খবর দিয়েছিলাম ঠিকই, এই তারিখে বধে এসে পৌঁছছি, কিন্তু ওকে স্টেশনে আসতে বলিনি, এমন কোনো ওয়াদাও করিনি, স্টেশন থেকে সোজা ওর বাড়িতে যাব। সংসারে কতগুলো সম্ভব-অসম্ভব বলে ব্যাপার আছে। শুধু মাত্র পড়ে যার সঙ্গে পরিচয়, এক কথায় তার অতিথ্য গ্রহণ করতে পারি না। সেইজন্যই আমার বন্ধুকেই খবর দেওয়া ছিল এবং আমি জানতাম, আমার রাত্রির বন্ধুটি আর কিছু না করুক, গাড়িটি পাঠিয়ে দেবে। এখন ফুলকলির প্রাণে একটু বিব্রতই বোধ করছি। এ পাগল মেয়ে, আরো কি বলে বসবে, কে জানে। আমি হেসে বললাম, ‘আর কারোকেই জানাইনি। আপনাকে জানিয়েছি, আর আমার এক বন্ধুকে জানিয়েছি।’

ফুলকলি মুখ গভীর করলো না, কিন্তু হাসিতে উজ্জল হয়েও উঠলো না, নিতান্ত ভক্ততার মাত্রা বজায় রেখে বললো, ‘তাহলে এখন ডিসাইড করুন, কোন্ গাড়িতে, কোথায় যাবেন। আমি অবিশ্বাস আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।’ বলে, ও একেবারে সামনে দাঁড়ানো অফিসার এবং একটু দূরে অপেক্ষমাণ ববের দিকে দেখলো।

অফিসার ভদ্রলোক আমাদের বাড়লা কথা শুনে কি ভাবলেন, জানি না। হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘আচ্ছা আমি আর আপনার কথার মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করতে চাই না। আপনার সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।’

আমি হাত বাড়িয়ে কন্ঠস্বর করে বললাম, ‘আমি কর্তব্য করেছি মাত্র।’

অফিসার আমার হাত ছেড়ে, ফুলকলির দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘বিদায়।’

ফুলকলিও তার জবাব দিল। অফিসার চলে গেলেন।

আমি একটু সন্ধ্যার সঙ্গে বললাম, ‘চলুন, আপাতত আমরা স্টেশনের বাইরে যাই, তারপরে যা হোক একটা সিদ্ধান্ত করা যাবে।’

ফুলকলির মুখের হাসিতে স্নানতা, বললো, ‘চলুন! আপনি কিন্তু আমার অনুবোধে শেষ দিকের চিঠিগুলোতে, আমাকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করেছেন।’

আমি হেসে, অসংকোচেই বললাম, ‘তা করেছি, তবে চিঠিতে। এখন মুখোমুখি হয়ে, কেমন যেন আটকে যাচ্ছে। সেটাই বোধ হয় স্বাভাবিক, তাই না?’

ফুলকলি বললো, ‘বোধ হয়। তবে আপনার পত্রের সম্বোধন যদি আস্তরিক হয় আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে ‘তুমি’ করে বলুন, আমি খুব খুশি হব।’

এই মুহূর্তেই কিছু না বলে, আমি হাসলাম। ববের দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ‘কাম বব, লেট আস্ গো।’

বব হেসে, চলতে আরম্ভ করলো। কুলিকে ডেকে বললো, ‘তুম্ সাথ্ আও।’

ফুলকলি আমার দিকে তাকালো। ওর দৃষ্টিতে যে জিজ্ঞাসা, তা বুঝতে পারছি। ওর নীরব জিজ্ঞাসা, তাহলে ববের গাড়িতেই আপনার স্যাটকেস উঠছে? ...কিন্তু ও মুখে জিজ্ঞেস করলো, ‘ওই বব লোকটি কি আপনার বন্ধুর ড্রাইভার?’

বললাম, ‘হ্যাঁ।’ বব গোয়ানিজ, অনেকদিন থেকেই আমার বন্ধুর ড্রাইভারের কাজ করছে। যদিও, ববকে কেবল ড্রাইভার বললে ভুল হবে। আমার বন্ধুর অনেক কিছুই সে দেখাশোনা করে।’

ফুলকলি বললো, ‘দেখাশোনা করে মানে? আপনার বন্ধু কি অবিবাহিত?’

বললাম, ‘না। আমার বন্ধু বিপত্নীক। ড্রাইভার পাচক ভৃত্য নিয়েই তার সংসার।’

ফুলকলি জিজ্ঞেস করলো, ‘কোথায় থাকেন তিনি?’

বললাম, ‘জুহতে।’

কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে এলাম।

বব গলা তুলে ডাক দিল, ‘স্মার, গাড়ি এখানে।’

আমি তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, ফুলকলির দিকে তাকালাম।

ফুলকলি একটু শ্বাস হাসলো, জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনার বন্ধুর ঠিকানা আর কোন নাম্বারটা পেতে পারি?’

বললাম, ‘নিশ্চয়ই। তোমার গাড়ি কোথায়?’

ফুলকলি, ‘তোমার’ শব্দটা শুনেই, চকিতে আমার চোখের দিকে তাকালো। তারপরেই, যেন মুখের অভিব্যক্তি গোপন করার জন্ত, এক মুহূর্তের জন্ত মুখ নত করলো। আবার মুখ তুলে, ববের গাড়ির তিন চারটি গাড়ি বাদ দিয়ে, একটি দুই দরজার স্ট্যাণ্ডার্ড দেখিয়ে বললো, ‘ওই গাড়িটা।’ বলে, গাড়ির নাম্বারটা উচ্চারণ করল।

আমি দেখলাম, আকাশ-নীল রঙের স্ট্যাণ্ডার্ড, কোথাও কোথাও রঙ চটে গিয়ে, লোহা দেখা যাচ্ছে। জীর্ণ বলব না, পুরনো গাড়ি।

ফুলকলি আবার বললো, ‘তিন মাস হলো গাড়িটা কিনেছি। কৃষ্ণকলির চাকরি হয়েছে, আপনাকে লিখেছিলাম তো?’

‘হ্যাঁ, লিখেছিলে।’

‘ওর চাকরি পাবার পরে, শস্য পেয়ে, গাড়িটা কিনে ফেলেছি।’

হেসে বললাম, ‘চালাতেও শিখে গেছ খুব তাড়াতাড়ি।’

ফুলকলি বললো, ‘বাবা বৈচে থাকতে, আমি আমার ঘোল বছর বয়সেই গাড়ি ড্রাইভ করতে শিখেছি। লাইসেন্স পেতে অবিশ্রান্ত দেরি হয়েছিল।’

এর পরে আর জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না, ফুলকলির বাবার গাড়ি ছিল। ওর চিঠিতে, মোটামুটি জানা গিয়েছিল, এক সময়ে এদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। সে অবস্থা থাকলে, আজ হয়তো ফুলকলিকে চাকরি করতে হতো না। যদিও, অবিশ্রান্ত, একটা কথা মানতে হবে, ওর বয়সের একটি মেয়ে, চাকরি করে মাসে বারোশো টাকা উপার্জন করে, সেটা খুব ছোট খাটো ব্যাপার না। কিন্তু, ওর চিঠিতেই জেনেছি, বারোশো টাকা উপার্জনটা ওদের পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট না, সে কারণে, ওর ছোট বোন কৃষ্ণকলিকেও চাকরি নিতে হয়েছে। ওর বাবার গাড়ি যে আর নেই, এ প্রশ্নও অবাস্তব। পুরনো স্ট্যাণ্ডার্ডই তার প্রমাণ।

বললাম, ‘চলো, এগোনো যাক।’

ফুলকলি বললো, ‘চলুন। কিন্তু আপনার বন্ধুর নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বরটা তো দিলেন না?’

বললাম, ‘দেব। এখানে না।’ বলে, আমি বরের দিকে যেতে যেতে বললাম, ‘বব, তুমি চলে যাও। তোমার সাহেব ঘুম থেকে উঠলে বলবে, আমি পরে আসছি।’

বব অবাক হয়ে একবার আমার, আর একবার ফুলকলির দিকে দেখলো। বললো, ‘ও. কে. স্তার।’

ইতিমধ্যে ফুলকলির মুখে কেবল বিস্ময় না রক্তের একটা ঝলকও লেগে গিয়েছে। আমি পকেট থেকে পয়সা নিয়ে, কুলিকে দিয়ে, ফুলকলির দিকে ফিরে বললাম, ‘চলো, যাওয়া যাক।’

ফুলকলির স্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো, ‘কোথায়? আমাদের বাড়ি?’

বললাম, ‘তা ছাড়া আবার কোথায় যাব। ববকে তো চলে যেতে বললাম।’

ফুলকলি দাঁত দিয়ে চোঁট কামড়ে ধরলো। মনে হলো, ওর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, ‘সত্যি, যে রকম লেখেন, আপনি মাহুঘটাও সেই রকম দেখছি।’ বলে, ব্যাগ খুলে গাড়ির চাবি বের করতে করতে, এগিয়ে গেল।

আমি ওর পিছনে পিছনে গেলাম। কিন্তু স্পাইই দেখতে পাচ্ছি, ওর পদক্ষেপ কিঞ্চিৎ বেতাল হয়ে গিয়েছে। গাড়ির দরজার চাবি খুলতে গিয়ে, হাত লক্ষ্যের সীমায় স্থির নেই।

ইংরেজিতে যাকে বলে স্টান্ট, এ ক্ষেত্রে ফুলকলিকে আমার তা ধোঁবার কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল না। নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল। অস্বীকার করতে পারব না, মনটাও কেমন খচখচ করছিল। ‘জোর করে ভালোবাসা আদায় করা যায় না’ কথাটাও নিজেই আমাকে অনেক আগে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। কেবল ভালোবাসা না, নিজের আবদারকে যে ও জোর করে চাপাবে না, তাও বুঝে নিয়েছিলাম। ওর চিঠিগুলোর মধ্যে, নানান ভাবে, ও মেয়েটি কেমন, ছড়িয়ে ছিল। সে সব যে ও ইচ্ছা করে জানিয়েছিল, তা বলা যায় না। নিজেকে, ও ওর চিঠির মধ্যেই অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল। আমার বন্ধুর ঠিকানা আর কোন নাথারটা দিয়ে, এখান থেকেই ওকে বিদায় করে দেওয়া যেত। সেটা কথা, আমার দিক থেকে কোনো অত্যাশ্রয় হত না। কারণ, ও আমাকে স্টেশনে নিতে আসবে, এ রকম কোনো পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে লেনা দেনা হয়নি। বরং আমার বন্ধুকে যা জানানো ছিল, সেই রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। ঠিক সময় মতই তার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে। কিন্তু ফুলকলিকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে, কেবল সঙ্কোচ বোধ করিনি, মনটাও কেমন খচখচ করছিল।

মাহুঘের যা কিছু অল্পভূতি এবং অসুস্থ্যমান, সবই তার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। নিজেকে ফুলকলির অবস্থায় চিন্তা করলে, তারপর আর ওকে ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন। প্রথমেই মনে হয়, ও চাকুরিজীবী মেয়ে। হয়তো আজ ছুটি নিয়েছে, শুধু একটি কারণেই, আমাকে নিতে আসবে। ওর সঠিক বয়সটা আমার জানা নেই। চিঠিতে ওর নিজের ভাষায়, “আমি একটা বুড়ি, বলতে পারেন, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আজ অবধি কেউ আমার এই কঠিন পানিগ্রহণে এগিয়ে আসেনি, কপালে আছে চির আইবুড়ো হয়ে থাকা। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কিন্তু নিজেকে চিরকুমারী বলছি না। একটু বোধ হয় নির্লজ্জতা প্রকাশ করলাম, তাই না? তা হোক, কেন জানি না, থাকে কোনো-

দিন চোখে দেখিনি, শুধু তাঁর লেখা খানকয়েক বই পাঠ করেছি, তাঁর কাছে কেমন করে বেন সব লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বসে আছি।”...

কিন্তু কোথায় যে ও বুড়ি, আর তিনকাল কোথায় খুঁইয়ে বসে আছে, তা ওকে দেখে একটুও বুঝতে পারছি না। তরুণী শব্দ বললে যদি কিছু কম বোঝায়, তাহলে যুবতী বলতে হয়। এটা ঠিক, ও আঠারো না, এমন কি বিশও না। তেমন উচ্চত না হলেও, ওর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে একটা প্রাণবর্ধ আছে, যা চকিতেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেটুকু দেখেছি, তাতে একথা বলা যাবে না ওর মুখশ্রী অনিশ্চিনীয় সুন্দর। অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু নজরে পড়েছে, দেখেছি, ওর মুখে অস্পষ্ট কয়েকটি দাগ। এক সময়ে বোধ হয়, ওর মুখে ব্রণের গুটিকা যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যার দাগ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। টিকলো না বলে, ওর নাকটিকে একটু বোঁচা বলাই উচিত, কিন্তু চোখ দুটি ওর ভাসা ভাসা, যেন আলাদা করে আঁকা, চোখের তারা দুটি কালো। সাজ-পোশাকে ও সর্বাংশে আধুনিক, একেবারে আজকালের হালফ্যাশনে সজ্জিত। ফুলকলির রূপের বর্ণনা দেওয়াটা আমার আপাত উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য, এই কথাটা বলা, বয়স আর রূপ ওর যা-ই হোক, ও একটি আত্মসন্ত মেয়ে। এই সাত সকালে সজে গুজে নিজে গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে একজনকে নিতে। নিশ্চয় এসেছে, অনেক সংকোচ লজ্জা কাটিয়ে, অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে, অনেক কৌতূহল আর মনের দন্দ নিয়ে। মনে মনে এতখানি বুঝে, কেমন করে ওকে ফিরিয়ে দেব? তা ছাড়া, আমার অহুমান, ওর এই নিতে আসার পিছনে, আরো কয়েকজনের কৌতূহলিত প্রতীক্ষা আছে। সেখানে একলা ফিরে যেতে, ওর মনের কোথাও একটা ক্ষীণ-ক্ষীণতর অপমানের স্পর্শ লাগতই। আমি যদি এসে না পৌঁছতাম, তাহলে আলাদা কথা ছিল। এসেছি, ওর সঙ্গে দেখা হলো, অথচ ওকে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যাব বন্ধুর বাড়ি, সেটা আর যার কাছেই হোক, আমার কাছে একটুও শোভনীয় মনে হচ্ছে না।

আমি ওর সঙ্গে যাব বলাতেই, ওর যে অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম, না গেলে কি হতো, কে জানে! অবিশ্রি, এ সবই আমার অহুমান মাত্র।

বব গাড়ি স্টার্ট করে, আর একবার আমাকে বিদায় জানিয়ে, দ্রুত চলে গেল।

ফুলকলি আমাকে ডাকলো, ‘আমুন।’

দয়জাটা ও আমার অন্ত এমন ভাবে খুলে ধরে দাঁড়ালো, বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, ‘যাও, তুমি তোমার জায়গার যাও, আমি বসছি।’

চাপল্য বলব না, একটা চঞ্চলতা যেন ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের রক্তচ্ছটা কাটছে না। কেবলই যেন একটা লজ্জা গোপন করার জন্য ঠোঁট টিপে রেখেছে। অথচ ওর চিঠির কথা মনে করলে, বলতে হয়, চিঠির ভাষায় তেমন কোনো লজ্জা বা ব্রীড়া বিশেষ প্রকাশ পায়নি ...“আমি আর দশটা মাসুকের মতোই, উদয়াস্ত খাটি, সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলি। বুঝতেই পারছেন, নারী পুরুষের মাত্রাভেদ, আমার জীবন যাপনের কোথাও নেই।”... কিন্তু আপতত যা দেখছি, তাতে এ কথা বলা যায় না, নারী পুরুষের মাত্রাভেদ বোধটা ওর জীবন থেকে একেবারে বিসর্জিত হয়ে গিয়েছে।

ফুলকলি অগ্নাদিক থেকে দরজা খুলে, চালকের আসনে বসলো। এ গাড়ির গিয়ার হলো, যাকে বলে লাট্র গিয়ার, তাই। চাবি ঘুরিয়ে, এঞ্জিন স্টার্ট করে, গিয়ারে হাত দিয়ে, ওর নজরে পড়লো, আমার অ্যাটাচি কেসটা, আমারই পায়ে কাছে রেখেছি। নিজের ব্যাগটা ও আগেই পিছনের সীটে রেখেছিল। আমাকে বললো, ‘অ্যাটাচিটা পেছনে রাখলে ভালো হতো না? বসতে তো অস্ববিধে হচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘নিশ্চয়ই রাখা যায়।’

ফুলকলি নিজেই অ্যাটাচির দিকে হাত বাড়ালো, ‘আমি বললাম, ‘আমি রাখছি, তুমি গাড়ি চালাও।’

কথাটা বলবার সময়ে, কেন যে ও আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, জানি না।

চোখাচোখি হতেই, একটু যেন লজ্জা পেয়ে ঠোঁট টিপে হেসে, গিয়ারে চাপ দিল। আমি অ্যাটাচিটা পিছনের সীটে রেখে, সামনের দিকে চোখ ফেরাবার আগেই, গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো এবং লক্ষ্যণীয়, মন্থর গতির চালিকা ও মোটেই নয়।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস অঞ্চলে এখনো তেমন জনবহুল ব্যস্ততা দেখা দেয়নি। ফুলকলি সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে বললো, ‘স্টেশনে মাইকের অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।’

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কী ভেবেছিলে? আমি কোনো অপরাধ করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছি?’

ফুলকলি আমার দিকে একবার তাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে বললো, ‘মোটেই তা ভাবিনি। তবে আমি ভয় পেয়েছিলাম, আপনার কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, সেই ভেবে। কত রকম বিপদ আপদ তো হতে পারে। মালপত্র ধোয়া যেতে পারে, বা আপনার কোনো রকম—।’

ফুলকলি কথাটা শেষ করলো না, থেমে গেল। আমিই যোগ করে দিলাম, ‘অ্যাকসিডেন্ট হলো কী না?’

ফুলকলি জবাব না দিয়ে, আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে, একবার আমার শরীরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। আমি বললাম, ‘তবে ঘটনাটা একটা অ্যাকসিডেন্টই। একেবারে প্রত্যক্ষ না হলেও, আমি তার সাক্ষী। মানে ঘটনাটা আমার কামরাকে ঘিরেই। সেজ্ঞা এখানে নামতেই, রেলপুলিশ আমার স্টেটমেন্টটা নিয়ে নিল।’

বলতে বলতেই, আমার চোখে জেসমিনের মুখ ভেসে উঠলো, আমার বুকের ভেতর একটা ভারী আর ঘন ছায়া ঘিরে এলো। সত্যি, জীবনের বাস্তবতা কি আশ্চর্য রকম অপ্রাকৃত। কথাটা যিনি প্রথম অহুভব করেছিলেন, তাঁকে আমার শত কোটি প্রণাম জানাই। তাঁর আবিষ্কারের আলোতেই তো দেখছি, গত সন্ধ্যায় এক নারীর সঙ্গে নানা রঙ্গ আর হাস্য কাল কাটছিল। সন্ধ্যার পরেই তিনি, পৃথিবী থেকে সারা জীবনের জ্ঞান বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। এখন রাত্রি প্রভাতে, দিনের আলোয়, আমি আর এক নারীর পাশে চলেছি। সে আমাকে, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। তার পোশাক প্রশাধন থেকেও একটি মিষ্টি গন্ধ আমার ভ্রাণে এসে লাগছে, যা মনে করিয়ে দিচ্ছে, গতকালের সেই গন্ধ। পোশাকটা আলাদা তবু তাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলও রয়েছে। মিলটা আপাতত হুঁজনের বহিরঙ্গের আধুনিকতায়। চোখের কাজলে, ঠোঁটের রঙে।

ফুলকলি একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, ‘কি হয়েছে বলুন তো? কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? কেউ কি—’

ফুলকলি আবার থেমে গেল, কথাটা শেষ করতে পারল না। আমিই বললাম, ‘কেউ মারা যাননি, একজন আত্মহত্যা করেছেন, একটি মহিলা।’

ফুলকলি আরো অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনার কেউ?’

বললাম, ‘না। পথেই তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, পথেই শেষ হয়েছে।’

ফুলকলির গাড়ির সেই দ্রুততা আর নেই। ও বায়ে বায়েই আমার মুখের দিকে দেখছে। স্বাভাবিক। আমি আর হাসতে পারছি না, গোপন করতে পারছি না আমার বিষণ্ণতাকে। আমি আন্তে আন্তে সংক্ষেপে, ঘটনাটা ওকে বললাম।

কোন রাস্তা দিয়ে ফুলকলি গাড়ি চালাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

মহর তার গতি। ওর মুখে নেমে এসেছে গভীর অন্তমনস্ক বিষণ্ণতা। ও নীচু স্বরে বললো, ‘জেসমিনের অবস্থায়-যে কোনো মেয়ের ওই একটি মাত্র রাস্তাই খোলা ছিল।’

আমি ফুলকলির মুখের দিকে তাকালাম। ও একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, ‘না, ভাববেন না, আমার জীবনে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেছে। আমি শুধু জেসমিনের কথা বলছি, তার আর কোনো উপায় ছিল না।’

আমি বললাম, ‘কোনো মেয়ে এ ভাবে বললে, মনে হয় সে যেন তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে।’

ফুলকলি বললো, ‘তা কেন? একদিকে ভালোবাসা, আর একদিকে অগ্নায়বোধ, মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে, তা তো আপনার লেখাতেই পড়েছি। তা ছাড়া, নিজের ফিলিংস্ বলে একটা ব্যাপার তো আছে।’

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, ‘হয়তো তাই। তবে আমার এবারের যাত্রটা অভূত। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় যখন গেছিলাম, তখনো একজন তীর্থযাত্রী আত্মহত্যা করেনি, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মাঝা গেছিল! কাল রাত্রে সে কথাই ভাবছিলাম।’

ফুলকলি বললো, ‘আর আমি ভাবছি, সকালবেলাই আমার একটা নিদারুণ গল্প শোনা হয়ে গেল।’

আমি বললাম, ‘গল্প!’

ফুলকলি বললো, ‘জীবনের গল্প। আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হয়, আমি যেন বই পড়ছি।’

আমি হাসলাম। বললাম, ‘যাক, যে চলে গেছে, তার প্রসঙ্গ আর না। তুমি কি বাড়ি থেকে বলে বেরিয়েছো, আমাকেই নিতে আসছো?’

ফুলকলি একটু অবাধ হয়ে বললো, ‘নিশ্চয়ই। বাড়ির সবাই আপনার জগৎ অপেক্ষা করে আছে। মুনাই—মানে আমার পরের বোন কুম্ভকলি আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, আমি নিয়ে আসিনি।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন?’

ফুলকলি হাসতে লাগলো, ‘কোনো জবাব দিল না। আমি ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, তাকিয়ে রইলাম। ও নিশ্চয়ই সেটা অসম্ভব করেছিল এবং মুখ না ফিরিয়েই বললো, ‘কী বলছেন?’

বললাম, ‘আমি তো কিছু বলছি না। শোনবার অপেক্ষার আছি।’

ফুলকলি বললো, ‘শোনবার মতো কিছু না, নিতান্ত ছেলেমানুষি।’

অথচ এ মেয়েই চিঠিতে জানিয়েছিল, সে নাকি একটি বুড়ি। এখন অনায়াসেই কবুল করেছে, সে ছেলেমানুষি করেছে। বললাম, ‘ছেলেমানুষি ব্যাপারটা আমি খুব উপভোগ করি।’

ফুলকলি এই প্রথম শব্দ করে হেসে উঠলো, যে হাসিটা আমাকে জেসমিনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে। বললো, ‘কেন মুনাইকে আনব? কালকূটকে প্রথম আমি একলা দেখব, তারপরে সবাই দেখবে। তাই বলে এসেছি, আমি ঠুকে নিয়ে আসব, তারপরে তোরা দেখবি।’

বলতে বলতে ও আবার হেসে উঠলো এবং আবার বললো, ‘মুনাই রাগ করে কাঁচকলা দেখিয়ে বললো, দেখতে চাই না তোর কালকূটকে। কালকূট মানে তো বিষ। তাকে আবার কেউ দেখতে চায় নাকি?’

বলে, ও হাসতেই লাগলো। আমি মনে মনে একটু বক্রগতি নিলাম, বললাম, ‘আসলে মুনাইকে তুমি সত্যি কথাটা বলতে পারোনি, তাই না?’

ফুলকলি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, ‘তার মানে?’

বললাম, ‘তার মানে, আগে তুমি সামনা সামনি লোকটিকে যাচাই করে দেখে নিতে চেয়েছ, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় কী না। দেখা নেই, শোনা নেই, কে একটা লোক, আগেভাগেই তার সামনে বোনকে নিয়ে আসা ঠিক মনে করোনি। সেটা অবিশ্রি ভালোই করেছে।’

কিন্তু গাড়িটা যে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তা একেবারে খেয়ালই করিনি। পিছন থেকে বেশ কয়েকটা গাড়ি সজোরে হর্ণ দিতে আরম্ভ করেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী হল গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলে?’

ফুলকলি ক্যাকাশে মুখ নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, ‘এসব কী বলছেন আপনি? আপনাকে আগে যাচাই করে তারপরে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব?’

আমি হেসে উঠে বললাম, ‘আমি ঠাট্টা করে বলেছি। তুমি সত্যি ভেবে রাস্তার মাঝখানে এ ভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলে? অদ্ভুত মেয়ে তো? ঠাট্টাও বোঝ না? সে বকম ভাবলে আমি তোমার সঙ্গে এ ভাবে আসতাম নাকি?’

ইতিমধ্যে পিছনের গাড়িগুলোর হর্ণে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে। ফুলকলির যেন তাতে কিছুই বাজে আসছে না। আন্তে আন্তে ওর ক্যাকাশে

মুখে স্বাভাবিক রঙ দেখা দিল। একটা নিশ্বাস কেলে বললো, ‘সত্যি, কথা তো না, জীবনটাকেই গল্প করে তুলেছেন। আমার বৃকের ভেতরটা এখনো কেমন করছে।’

বলে, ও গাড়ি স্টার্ট করলো। বললাম, ‘ছেলেমানুষদের ও রকম একটু করে।’

আমার কথা শেষ হবার আগেই, পিছন থেকে একটা গাড়ি ফুলকলির পাশাপাশি এসে, ক্ষুদ্র হিন্দী ভাষায় যা বললো, তার মানে দাঁড়ায়, ঘরের খোয়ারি ঘরে কাটালেই ভালো হয়। রাস্তার মাঝখানে এ সব খোয়ারি ভালো না। বলেই, লোকটি গাড়ি দ্রুত চালিয়ে চলে গেল।

ফুলকলির মুখটা লাল হয়ে উঠলো বললো, ‘ইভিয়ট!’

কিন্তু যতগুলো গাড়ি আমাদের ওভারটেক করলো, সবগুলো গাড়ির যাত্রীরাই আমাদের দিকে একটু বিরক্ত আর বাঁকা চোখে তাকিয়ে গেল। ফুলকলির ওলোকটাকে ইভিয়ট বলে নিজের লজ্জা চাপা দেবারও কোনো মানে হয় না, কারণ লোকটার পক্ষে আমাদের সম্পর্ক নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। বললাম, ‘লোকটা, শুনতে পেল না, তুমি তাকে কি বললে। কিন্তু তার কথা সে আমাদের শোনাতে পেরেছে। যে রকম ভাবে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ছিলে, আমি হলে বোধ হয় আরো বেশি শুনিয়ে দিতাম।’

ফুলকলি আমার দিকে না তাকিয়েই বললো, ‘আমাকে আর চটাতে পারবেন না। আপনাকে একটু একটু বুঝতে পেরেছি।’

আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, ‘সত্যি? আশ্চর্য ব্যাপার তো।’

ফুলকলিও একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘আশ্চর্য ব্যাপারটা কী?’

বললাম, ‘এই আমাকে একটু একটু চেনাটা।’

ফুলকলি কয়েকবারই আমার দিকে, আর সামনের দিকে তাকাতে লাগলো। ও যেন আমার কথা শুনে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পরে বললো, ‘হয়তো কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। আপনাকে বুঝতে পেরেছি, এটা আমি ঠিক বলিনি। কিন্তু আমি কিছু ভুল বললে, আমাকে শুধরে দেবেন।’

বললাম, ‘শোধরাবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে তুমি যে আমাকে আমাকে বুঝতে পেরেছ, এতে আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। এত তাড়াতাড়ি বুঝলে কী করে?’

ফুলকলি হেসে বললো, ‘তাড়াতাড়ি? তাড়াতাড়ি কোথায় দেখলেন? এক বছরের ওপর তো আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালিখিই চলছে। তারও

অনেক আগে থেকে আপনার লেখা পড়েছি। তাতে আপনাকে একটুও বুঝতে পারব না? কালকূট কি নিতান্তই মুখোস আটা ছদ্মবেশী লোক?’

আমিও হেসে বললাম, ‘ছদ্মবেশটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তবে বাউলের গানের মতো বলতে পারি, এই আমার এক গুণাহ্‌গার / নিজের সঙ্গে জানপহ্‌চন না হইল আমার।’ অতএব আমার, স্ব্থের বিষয় এই, তোমাদের বোঝাবুঝির মধ্যে আমি বেঁচে থাকি।’

ফুলকলি সন্দ্বিদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। বললাম, ‘মিথ্যা কথা বলিনি।’

ফুলকলি বললো ‘সেটাই আমার মৌভাগ্য। কালকূটের বুকে যে এখনো জেসমিনের স্মৃতি টনটন করছে, অন্তত সেটুকুও তো বুঝি। তবে ওই যে বললেন, মাঝপথে গাড়ি আটকালে, আপনি আরো বেশি কিছু শুনিয়ে দিতেন। তার জবাবে বলছি, শোনাতে আমিও কিছু কম জানি না। আমি খুব ঝগড়ুটে মেয়ে। ঝগড়ায় আপনি আমার সঙ্গে পারবেন না।’

বললাম, ‘এ বিষয়ে আমার তেমন উৎসাহ নেই, বরং ভয় পাই। তবে চটাতে আমি খুব ভালো পারি।’

ফুলকলি হেসে বললো, ‘তার প্রমাণও একটু আগেই পেয়েছি। তা না হলে আমার বোনকে আনিনি বলে, অন্যায়সে ও রকম ঠাট্টা, সিরিয়াসুলি করতে পারতেন না। তবে যা-ই বলুন, আমি একটু স্বার্থপর আছি।’

‘একটু?’ আমি যেন খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ফুলকলি আমার দিকে তাকিয়ে এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, মুখ নেমে গেল স্টিয়ারিং-এর কাছে।

বললো, ‘না, খুব। আমি খুব স্বার্থপর। আমার অহঙ্কার বলুন আর দাবীই বলুন, বাড়ির সকলের আগে আমি কালকূটকে দেখব, আর সবাই কালকূটকে দেখবে আমার সঙ্গে। বোন-টোন বলে, আমি খাতির করতে পারব না।’

বলতে বলতেই, ফুলকলি গাড়ির গতি কমিয়ে, রাস্তার বাঁদিকে, একটি খোলা গেট দিয়ে, প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে ঢুকলো। গাড়ির ভেতর থেকেই দেখতে পেলাম, ছ’তলা ম্যানসন হাউস। ফুলকলি প্রশস্ত চত্বরের ডাইনে গিয়ে সফ রাস্তা দিয়ে, বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি নিয়ে দাঁড় করালো একটা বেলগাছের ছায়ায়। পিছনে হাত বাড়িয়ে ওর ব্যাগ আর আমার অ্যাটাচি, দুটোই নিয়ে

দরজা খুলে নামলো। ঘুরে আমার দিকে এসে, দরজা খুলে দিয়ে বললো, ‘আস্থন।’

আমি নেমে এলাম। ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে, হলুদ রঙের বাড়িটা যেন সোনালী হয়ে উঠেছে। আশেপাশে কয়েকটি নারকেল গাছ, বাড়িটাকে ছবির রূপ দিয়েছে।

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো?’

‘কেন?’

‘এ রকম একটা জায়গায়, এ রকম একটা বাড়িতে এসে?’

‘আমায় তো খুব সুন্দর লাগছে। চারপাশে বেশ নিরিবিলি।’

‘তবু, জুহুর সমুদ্রের ধার তো এটা না।’

‘সমুদ্রের ধারটা নিশ্চয়ই সুন্দর, কিন্তু তা ছাড়াও সুন্দর জায়গা আছে। এখানে দাঁড়িয়েই তা বুঝতে পারছি।’

ফুলকলি দৈবং ত্রুটি সন্দেহে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, ‘অনেক সময় নারকেল বীথি ভালো লাগে। কখনো এ রকম দু-চারটি রোদে চিক-চিক করতে দেখলেও খুব ভালো লাগে। তা ছাড়া বেলগাছও আমার প্রিয়। আর তার ডালে ডালে অমন পুষ্ট ফল দেখলে তো কথাই নেই।’

আমার কথাতেই যেন ফুলকলির হঠাৎ বেলগাছের দিকে নজর পড়লো। আর নিটোল ত্রীকলগুলোর দিকে তাকিয়ে, একটু যেন লজ্জা পেয়ে বললো, ‘আশ্চর্য, আমাদের তো নজরেই পড়ে না।’

এই সময়ে আমার দৃষ্টি পড়লো, চারতলার একটি জানালায়। সেখানে একটি হাসি মুখ, দৃষ্টি বিনিময় মাত্র, যেন লজ্জা পেয়ে মুখ সরিয়ে নিল। লক্ষ্যটা ফুলকলিরও সෙদিকে ছিল। বললো, ‘আমার সব থেকে ছোট বোন কুম্ভকলি। চলুন, ওপরে বাই। কিন্তু এলিভেটর নেই, চারতলায় উঠতে কষ্ট হবে।’

বললাম, ‘সেটা স্বীকার করে নিয়েই ওঠা যাক।’

ফুলকলি, হেসে উঠলো, বললো, ‘দেখছি, কথা বলাও সত্যি একটা আর্ট।’

বললাম, ‘অথচ দু’রাত্রি জেগে এবং একজন মহিলার আত্মহত্যার স্টেটমেন্ট দিয়ে, আর্টের কথাটা আমার মাথায়ই নেই। এটা ব্যক্তিবিশেষের বাক্তক্তি। সেই হিসাবে, শ্রীমতী ফুলকলিকেও আমি একই কথা বলতে পারি। কিন্তু তার দরকার নেই, আঁটাচিটা তোমার হাতে মোটেই শোভা পাচ্ছে না। ওটা আমার হাতে দাও।’

ফুলকলি প্রায় অবাক হতে বাজিল, কিন্তু তার আগেই হেসে বললো,

‘তা-ই ভালো, আমি ভাবলাম, কি না জানি বলতে যাচ্ছেন। অ্যাটাচিটা শোভা-অশোভার জ্ঞান হাতে নিইনি, নিজে বইব বলে নিয়েছি।’

আমরা তখন পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। বললাম, ‘ভাগ্যবানের বোঝা, শুনেছি ভগবানে বয়। ভাগ্যহীনের বোঝা যে ভগবতী বহন করেন, তা তো কখনো শুনিনি!’

ফুলকলি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়তেই যাচ্ছিল, চোখে অবাক ক্রান্ত দৃষ্টি। তারপরেই সিঁড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে বললো, ‘তার মানে, কেউই কোনোটা নয়। আপনিও ভাগ্যহীন নন, আমিও ভগবতী নই। অ্যাটাচিটার মধ্যে আপনার দামী বস্তু থাকতে পারে। কিন্তু প্রায় উঠেই এসেছি, আর দেবার দরকার নেই।’

বললাম, ‘আমি ভাগ্যহীন কি না জানি না, তবে কালকূট। তুমি কিন্তু ফুলকলি।’

ফুলকলি হেসে উঠলো এবং কিছু বলবার উত্তোগ করতেই, ওপরের ধাপ থেকে বর্ষায়সী মহিলার স্বর শোনা গেল, ‘কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তপ্‌সি, তুই কি সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই, সব কথা শেষ করে নিচ্ছিস নাকি?’

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, দোহারী চেহারার, পঞ্চাশোর্ধের এক মহিলা। সন্ধ্যা কালো পাড়ের ধবধবে ধুতি তাঁর পরনে, গায়ে সাদা জামা। ধুতির আঁচল গলায় জড়ানো, কিন্তু একটিও পাকা চুলের চিহ্ন নেই। গলায় একটি সোনার হার ছড়া, সারা অঙ্গে আর কোনো অলঙ্কার নেই। তাঁর পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, সলজ্জ হাসিমুখী কুমকলি, যাকে একটু আগেই জানলায় দেখেছি। তবে ঠেক খেতে হলো অল্প কথায়। তপ্‌সি! তপ্‌সি কি নাম নাকি? আর সেটা ফুলকলিরই! চমৎকার!

অনেক প্রকারের ডাক নাম শোনা ছিল, এমনটি না। সন্ধানের বিষয়, তপ্‌সে যাছ থেকে তপ্‌সি হয়েছে কি না। তাহলে, মজাটা আরো বাড়ে।

চারতলার শেষ ধাপে উঠে, ফুলকলি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আমায় মা।’

ফুলকলির মা ডাকলেন, ‘আমুন, কি ভাগি আমাদের।’

যতো গোলমাল ওই ভাগি শব্দটির মধ্যে। কিন্তু একটু যেন বিধায় পড়ে গেলাম। ছেলেবেলায় গুরুজনকে প্রণাম করতে তুলে গেলে, ধমক শুনে হত, সূর্যবংশের রাজা হয়ে গেলি যে? প্রণাম করলি না? এখন সেই কথাটাই মনে পড়লো। সূর্যবংশ দূরের কথা, কোন বংশদণ্ড ঝাড়ের রাজাও নই। তবে

হালকিলের কালচারের চেহারাটা যে রকম দাঁড়িয়েছে, খুপ করে একটা প্রণাম ঠুকলেই যেন সমস্ত চেহারাটা কেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে।

ওঠে ? তবে উঠুক। না হয় থেকেই গেলাম, হালকিলের পিছন কালে। যা আসে ভিতর থেকে, তাকে বাইরে আটকে রেখে, ধন্দ ভোগ করার দরকার কী ? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম ফুলকলির মাকে। তিনি দ্রুত লজ্জায় বলে উঠলেন, ‘আহা, থাক না বাবা। সরস্বতী আপনার মুখ আরো উজ্জ্বল করুন। আসুন।’

ফুলকলি ইতিমধ্যে দরজা খুলে ধরেছে। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম, এ তো আর এক ঠেক। প্রণাম করলাম, বাবা বললেন, তথাপি, সম্বোধনে ‘আপনি’। অবশ্য ঘা লাগছে।

দরজা খুলেই বসবার ঘর, আসবাবপত্র আসন ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। সবাই ভিতরে ঢোকবার পরে, কুন্দকলি দরজা বন্ধ করলো। বিজলি পাথার বোতাম টিপে দিয়ে ফুলকলি বললো, ‘আমার সব থেকে ছোট বোন, তখনই বলেছিলাম।’

কুন্দকলির চোখে মুখে লজ্জার হাসি, বয়স অসুস্থমান কুড়ির মধ্যে। অতি সামান্য ওর সাজগোজ, পরিচ্ছন্ন নীল একটি শাড়ি, হলুদ জামা গায়ে। মুখে একটু পাউডারের প্রলেপ। স্নান বোধ হয় সারা, চুল খোলা। আমার দিকে তাকিয়ে, প্রথমটা যেন কিছুই ভেবে পেল না। আসলে, আমারই মতো ওর অবস্থা। তারপরে ডান হাতটা নামিয়ে নিয়ে এলো আমার চপ্পল পরা পায়ের কাছে। তার আগেই আমি ওর হাতটা চেপে ধরলাম, বললাম, ‘তথাস্তু ! তোমার ডাক নাম কি কাজলী, না মোরলী ?’

আমার ‘তথাস্তু’ বলা শুনে সবাই হেসে উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু পরের প্রশ্নটা শুনে, সবাই যেন চমকানো বিষয়ে থেমে গেল। কুন্দকলি বলে উঠলো, ‘না তো।’

ফুলকলি বললো, ‘এ কথা জিজ্ঞাস করলেন কেন ?’

আমার দৃষ্টি ছিল তখন মায়ের অবাধ বিভ্রান্ত হাসি মুখের দিকে। বললাম, ‘একটা নাম শুনে তপসে মাছের কথা মনে পড়ে গেল কি না, তাই ভাবলাম, তোমার ডাক নামটাও সেই রকম কিছু নাকি।’

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ, তারপরে মা ও কস্তাধর, তিনজনের হাসিতেই ঘরটা ভরে উঠলো।

ফুলকলি বললো, ‘দেখলে তো মা, ওইজন্ম সকলের সামনে আমার ডাক নাম

ডাক নাম তপ্‌সি হয়েছে।’

মা এবং কুন্দকলির হাসিটা তখনো একেবারে থেমে যায়নি। মা হাসতে হাসতে বললেন, ‘তাতে কি হয়েছে। তপ্‌সে মাছ তো খুব ভালো মাছ।’

কুন্দকলি কপট অভিমানে বললো, ‘মাছ ভালো বলে, নামটাও কি আমার তাই হবে? আমার নাম মোটেই তপ্‌সে নয়, তপ্‌সি।’

বললাম, ‘আমি কিন্তু আসলে বলতে চাইছিলাম, নামটা বেশ সুন্দর।’

কুন্দকলির চোখে সন্দ্বিগ্ন অহুসঙ্কিতা। আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে আবার বললাম, ‘সত্যি কুন্দকলির থেকেও।’

কুন্দকলির চোখে একটা কিলিক দেখা গেল। ওর মা বললেন, ‘ওদের কথা ছাড়ুন, আপনি বহন তো একটু। ট্রেনের ধকল নিয়ে, এখন আর দাঁড়িয়ে গল্প করতে হবে না।’

কুন্দকলি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, ‘সত্যি মা, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।’

মা বললেন, ‘তা হোক। তা বলে যার জন্য মাথা খারাপ, তাঁকে কষ্ট দিবি নাকি?’

আর কেউ কিছু বলবার আগেই, আমি তাড়াতাড়ি একটি লোকায় বসে পড়লাম, বললাম, ‘তার চেয়ে আমি বরং আগে বসেই পড়ি।’

এবার মায়ের হাসিটাই যেন বেশি জোরে বেজে উঠলো, বলে উঠলেন, ‘খুব ভালো। একটু চা চলবে তো?’

বললাম, ‘নিশ্চয়ই।’

মা বললেন, ‘তোরা গল্প কর, আমি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি।’

কুন্দকলি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, ‘তুমি বোসো না মা, আমি চম্পাকে বলে আসি।’

মা ইতিমধ্যে, কাঠের পার্টিশনের দয়জা ঠেলে, ভিতরে যেতে উত্তত। বললেন, ‘তোরা কথা বল, আমি আসছি।’

আমি কুন্দকলির দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘কিন্তু যা নিয়ে এত কথা, সেটাই জানা হলো না। তোমার ডাক নামটা তো বললে না?’

কুন্দকলি নিজের শাড়ির আঁচল পাকাতো পাকাতো, মাথা নিচু করে বলল, ‘তুমি বলে দাও।’

কুন্দকলি হেসে বলল, ‘তুতু।’

আমি বললাম, ‘বিউটিফুল।’

তুতু অর্থাৎ কুলকলির এমনই লক্ষ্য হলো, ও ভিতরে পা বাড়াবার উজোগ করলো।

কুলকলি ডেকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুতু শোন, খুকু কোথায় রে?’

খুকু নামটা আমার স্টেশনেই শোনা হয়ে গিয়েছিল। কুলকলি ষাট ভালো নাম, মধ্যমা ভগ্নি।

কুলকলির প্রশ্নে, কুলকলি কিছু বলতে উত্তর হয়েও, হঠাৎ যেন ওষ্ঠাগ্রে কথার রাশ টেনে ধরলো, তাকালো একবার ভিতর ঘরের দিকে, তারপরে বললো, ‘ছোড়দি অফিসে চলে গেছে।’

কুলকলির ভ্রুকুটিমুখে তৎক্ষণাৎ যেন একটু কঠিন হয়ে উঠলো। বোধ হয়, আমার উপস্থিতিও তুলে গেল। গম্ভীর বিন্মিত স্বরে বলে উঠলো, ‘অফিসে চলে গেছে?’

কথা কয়টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, কুলকলির মুখে যেন একটা আঘাতের ব্যথা ফুটে উঠলো। এক মুহূর্তের জ্ঞান দাঁত দিয়ে চোঁট চেপে ধরলো। সম্ভবত খেয়াল নেই, চোঁটে ওর ওষ্ঠরঙ্গনী আঁকা এবং দাঁতের স্পর্শে তা বিবর্ণ হচ্ছে। নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে, খানিকটা যেন আপন মনে বললো, ‘অথচ আমাকে বলেছিল, দু’দিনের ছুটি নিয়েছে। আমিই ছুটি নিতে বলেছিলাম। তার মানে, ছুটি নিয়েও, আবার অফিসে গেছে?’ বলে, শক্ত মুখ তুলে, কঠিন জিজ্ঞাসা চোখে তাকালো কুলকলির দিকে।

কুলকলি যেন দ্বিদিব দিকে চোখ রাখতে না পেরেই, মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পাটিশনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল।

আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম, কিছুটা সঙ্কোচও। সত্ত্ব পরিচিত কোনো পরিবারে এসে, যদি পারিবারিক কোনো কারণে, কারোকে বিচলিত হতে দেখতে হয়, অস্বস্তিবোধ করা খুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমি কিছুটা দ্বিধা করেই বললাম, ‘অনধিকার চর্চা করছি কি না, বুঝতে পারছি না, বোনের অফিস চলে যাওয়ার সংবাদে, মনটা কি খুবই খারাপ হয়ে গেল?’

কুলকলি প্রায় চমকে উঠলো এবং খানিকটা স্থপ্তোখিতের মতো উচ্চারণ করলো, ‘আঁ?’ তারপরেই কিছুটা লজ্জিত হেসে বললো, ‘না না, মন খারাপ আর কি! আপনি আসছেন, সেই উপলক্ষে আমরা দু’বোনই ছুটি নিয়েছি—মানে, আপনার কাছে মিথ্যে কথা কি আর বলব। আপনার আসাটা আমরা সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খুকু একটু মনটা খারাপ করে

দিল। ও যে সত্যি এ রকম ছেলেমানুষি করবে, তা বুঝতে পারিনি।’

আমি ফুলকলিকে একটু নরম আর সহজ করার জগুই হেসে বললাম, ‘আমি তো পালাছি না, আর খুকুও অফিস থেকে নিশ্চয় ফিরবে। এর জন্ত আর এতটা মন খারাপ করে লাভ কি।’

ফুলকলি বললো, ‘লাভ নেই, তবু হয়। আসলে ঠকলো তো ও-ই। কিন্তু কেন যে ও জেদ করে অফিসে গেছে, আমি জানি।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন বল তো?’

ফুলকলি বললো, ‘সেই যে আপনাকে বললাম না, ও স্টেশনে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু নিয়ে যাইনি, তাতেই আমার বোনটির মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। তাই রাগ দেখিয়ে অফিস চলে গেছে।’

আমি হেসে উঠে বললাম, ‘সত্যি ছেলেমানুষ মানে, তোমরা সকলেই।’

আমার কথা শেষ হবার আগেই, পার্টিশনের দরজা ভিতর থেকে খুলে গেল, আর লাল রঙের কিছু যেন বাতাসে উড়ে এসে, হয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে। চমকে ওঠবার আগেই, লাল শাড়ি পরা একটি মেয়ে, আমার পা স্পর্শ করে, কপালে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, ‘আমি কিন্তু ছেলেমানুষ নই, ছেলেমানুষ আসলে দিদি।’

ফুলকলি খুশিতে প্রায় চিংকার করে উঠলো, ‘ওহ্ খুকু তুই! অফিসে যাসনি?’ বলেই, উঠে ভগ্নিকে হুঁহাতে জড়িয়ে ধরলো। প্রায় হেঁচকি লাগা বিস্ময়ে আবার বললো, ‘ও মা, তুতুটা কি সাজ্বাতিক মেয়ে। আমাকে বললে কী না, তুই অফিসে চলে গেছিস!’

আমি তখন দুই ভগ্নির লীলা দেখছি। দুই না, তিন বলতে হবে। মনে হচ্ছে, এই লুকোচুরির বড়যন্ত্রের মধ্যে, স্বয়ং মা-ও জড়িত আছেন।

কুমকলি একবার আমার দিকে তাকালো, হাসলো, তারপরে বললো, ‘তুতু সাজ্বাতিক হবে কেন? ওকে যা শিখিয়ে রেখেছি ও তাই বলেছে।’

ফুলকলি আমাকে সাক্ষী মেনে বললো, ‘দেখেছেন, আমার বোনদের কাণ্ড?’

আমি কুমকলির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, ‘কাণ্ড আর দেখতে পাচ্ছি কোথায়, এ তো একটা কারখানা।’

ফুলকলি জ্রুট চোখে, আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, ‘তার মানে?’

আমি বললাম, ‘মানে রীতিমত কাণ্ডকারখানা।’

কৃষ্ণকলি হেসে উঠলো। ঠোট ফুলিয়ে রইলো ফুলকলি। আমার দিকে চেয়ে বললো, ‘তার মানে, আপনি এখন খুকুর দলে চলে গেছেন, তাই না?’

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, ‘তা বলতে পারো, আবার না-ও পারো। আমাকে যে যখন যেমন করে দেখে, আমি তেমনি।’

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘মারাত্মক আপনি!’

কৃষ্ণকলি বললো, ‘সেইজন্মই বোধ হয় উনি কালকূট।’ বলে, কাজল-টানা চোখের কোণে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

দেখছি, তেমন করে সাজেনি কেবল কুন্দকলি। ফুলকলির মতো, সাজের ঘটটা কৃষ্ণকলিরও কম না। যাকে বলে রঙ মেলানো, কৃষ্ণকলি তেমনিই শাড়ি জামায় একেবারে লালে লাল। ওরও দেখছি, ফুলকলির মতোই, ঘাড়ের একটু নিচে থেকেই, চুল সমান করে ছাঁটা। দু’জনের মধ্যে এ ব্যাপারে তফাৎ হচ্ছে, ফুলকলির চুল খোলা, কৃষ্ণকলির ঘাড়ের কাছে, রূপোর আঙুটায় বেঁধে, হর্গ-টেল করেছে। আপাতত সামনে কুন্দকলি নেই বটে, তবে খেয়াল আছে, ওর চুল দীর্ঘ, প্রায় কোমরের কাছে কটি পর্যন্ত এলানো। এখনো দুই দিদির মতো কাজের মেয়ে হয়নি বলে বড় চুল রাখতে পেরেছে, কারণ কেশ-বিস্তারের সময়টা ওর হাতে নিশ্চয় বেশি আছে।

কিন্তু চেহারার কথা বলতে গেলে, ফুলকলি অর্থাৎ তপ্‌সি, আর কুন্দকলি মানে তুতুয় মধ্যে মিল অনেকখানি। এ কথা বলা যাবে না, ওদের দু’জনের স্বাস্থ্য অসুস্থ, কুশ বা নম্র। তপ্‌সির থেকে তুতু এখনো একটু রোগা। কিন্তু ঘোবনের সরসী নীরে। টলোমলো দু’জনেই। তপ্‌সির অর্থাৎ ফুলকলির শরীরে যতটা চল নেমেছে, ততটা কুন্দকলির মোটেই না। কিন্তু তথাপি, ফুলকলির নাতিদীর্ঘ প্রায় ছিপছিপে শরীরে তেমন একটা গুরুত্ব চোখে পড়ে না, যা লক্ষ্যণীয় কৃষ্ণকলিতে। অর্থাৎ খুকু। ও অনেকটাই ওর মায়ের মতো। হয়তো তিনিও ওর বয়সে, ওরই মতো শক্ত পুষ্ট এবং শরীরে একটু উদ্ধত ছিলেন। একমাত্র এই কারণেই কৃষ্ণকলিকে একটু খাটো দেখায়।

এদিকে দেখছি, দুই বোনের মধ্যে, ও-ভাবেতে ভাব দেখা দিয়েছে। ফুলকলি বললো, ‘ঠিক বলেছিস খুকু। এমন মারাত্মক নাহলে, সে কখনো কালকূট হয় না।’

কৃষ্ণকলি বললো, ‘কিন্তু দিদি, আমার কি অবাক লাগছে জানিস?’

‘কী বল তো?’

কৃষ্ণকলি চোখের তারা সরিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললো, ‘ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কতদিনের চেনা, তাই না? একবারও মনে হচ্ছে না, উনি এই প্রথম আমাদের বাড়ি এসেছেন, এই প্রথম ওঁকে আমরা দেখলাম।’

আমি ঠোট টিপে হেসে, পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম, ‘কৃতিত্বটা নিশ্চয় আমার?’

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘ইস, মোটেই না। আমি আপনাকে চিঠি লিখতাম। আপনার জবাব এলে, আমরা সবাই পড়তাম। আসলে আপনার চিঠিগুলো পড়ে পড়ে আপনাকে আমরা যেন আগেই চিনে ফেলেছি।’

এ কথার জবাব দেবার আগে, জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমি কি ধূমপান করতে পারি?’

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘ও মা, আপনি কি আমাদের মেমসাহেব ভাবলেন নাকি, যে স্মোকিং-এর জগৎ পারমিশন চাইছেন!’

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, ‘আজকাল কি আর চেহারা দেখে আর ভাষা শুনে, মেমসাহেবদের চেনা যায়? একবার তো মার খেতে খেতে বঁচে গেছলাম।’

দুই বোনই চোখ কপালে তুলে, একসঙ্গে বলে উঠলো, ‘সত্যি?’

বললাম ‘প্রায় তাই। পরে অবিশিষ্ট ঘটনার চাকা ঘুরে গেছল, অন্তত আমি যে মহাভারত অন্তর্ভুক্ত করে ফেলিনি এবং আমাকে অপমান করাটা অন্তায় হয়েছে, সেটা কবুল করতে হয়েছে। ঘটনাটা তোমাদের বলি—’

ফুলকলি আর কৃষ্ণকলি, দু’জনেই সোফার সামনে, লাল ঝকঝকে মেঝের ওপরে বসে পড়লো। এ বসাটা আমার কাছে একটু দৃষ্টিকটু, যেন পায়ের কাছে বসার মতো। আমি বললাম, ‘উঠে বোসো না।’

ফুলকলি বললো, ‘এই বেশ আছি, আপনি বলুন।’

আমি ওদের একটি ঘটনা বললাম, যা ঘটেছিল, আমার মফস্বল শহর থেকে, কলকাতায় আসার ট্রেনের পথে। নিত্য যাত্রীরা সকলেই প্রায় চেনা। প্রথমে বলতে হয়, কামরা প্রথম শ্রেণীর। দু’চারজন মহিলাযাত্রীও নিত্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন। আমরা বাঙালী ধূমপায়ীরা আমাদেরও কিছু দোষ আছে। সব সময়ে সৌজ্ঞাত্যবোধটা মনে থাকে না। একদিন, আমার মুখোমুখি আসীন এক মহিলাযাত্রীর বিনা অনুমতিতেই সিগারেট ধরিয়ে বসেছিলাম। মহিলা প্রথমে ক্রকুটি করলেন, তারপরে নাকে ক্রমাল চাপা দিলেন। আমি একটু ঘুরে বসবার চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে, মহিলা পাশের এক নন-স্মোকার ভ্রাতৃলোকের

সঙ্গে কথা শুরু করেছেন, উপলক্ষ আমি। বক্তব্য : আমার মতো লোকেরা পোশাকে-আশাকে বাইরে থেকে দেখতে ভদ্রলোক। কিন্তু মহিলাদের মান সম্মান রাখতে জানি না। কোনো মহিলার সামনে ধূমপান করা একটা ঘৃণিত ব্যাপার।...

আমি আর শুনতে না পেরে, পোড়া মুখটা নিয়ে আসন থেকে উঠে গেলাম। কিন্তু অপমান এবং আক্রমণের ভাষা ধামলো না, আমার নীরবে উঠে যাওয়ার, যেন ঘুতাহতি পড়লো। আমার মতো লোকেরা মা-ভগ্নির সম্মান রাখতে জানে না। আমার মতো যাত্রীদের ঘাড় ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া উচিত।...

এই পর্যন্ত শুনে ফুলকলি আর থাকতে পারলো না, বলে উঠলো, 'স্টুপিড !'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা আর তাঁর সহযাত্রী বন্ধু লোকটি একটু স্টুপিডিটিই করে ফেলেছিলেন, তাঁরা মাত্রা রাখতে পারেননি, ফলে, হঠাৎ এক ভদ্রলোকের গর্জন শোনা গেল, 'নামান দেখি ঘাড় ধরে, দেখি আপনাদের ঘাড়ের কটা মাথা আছে ? নরম মাটি পেলে, বেড়ালে এ্যা করে, না ? ভদ্রলোক চুপচাপ উঠে গেলেন, তারপরেও এ সব বাক্যে কথা কেন বলছেন ? নিজের কথামূল্য একবার নিজেরা ভেবে দেখেছেন, কত বড় ছোটলোক আর ইতর আপনারা ?' তারপরেই দেখা গেল, ওই ভদ্রলোকের সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমি ভয় পেলাম, মহিলা আর তাঁর সহযাত্রীকেই না সবাই মিলে নামিয়ে দেয়।

কৃষ্ণকলি বললো, 'বেশ হতো।'

আমি হেসে বললাম, 'অত দূর গড়ায়নি। কমা'চাওয়ার ওপর দিয়েই মিটেছিল। কিন্তু সেই থেকে আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। মহিলাদের সামনে ধূমপান করতে গেলেই, আগে আমি পারমিশন নিয়ে নিই।'

কৃষ্ণকলি বললো, 'মেয়েরাই আজকাল যা সিগারেট টানে, তার আবার পারমিশন।'

আমি হেসে জিজ্ঞাস করলাম, 'চলবে নাকি ?'

কৃষ্ণকলি ফুলকলির দিকে চেয়ে হাসলো। ফুলকলি বললো, 'খেয়ে জ্বাথ, সারব এক থাপ্পড়।'

কৃষ্ণকলি খিলখিল করে হেসে উঠলো। ফুলকলি বললো, 'জানেন খুকু সব পারে।'

আমি কৃষ্ণকলির দিকে জিজ্ঞাস চোখে তাকালাম। ও হাসতেই লাগলো, বললো, 'সব আবার কী। আমার খুব মজা লাগে।'

ফুলকলি বললো, ‘তা তো লাগবেই। আজ শ্যোক করতে মজা লাগবে, কাল ড্রিংক করতে মজা লাগবে।’

কৃষ্ণকলি বললো, ‘যাহু! আমি কোনোদিন ড্রিংক করেছি, যে বলছিল? বন্ধুদের সঙ্গে এক-আধদিন কেবল দু-একটা সিগারেট খেয়েছি।’

আমি বললাম, ‘এটা একটা খেলা।’

ফুলকলি বললো, ‘ও সব পরে হবে, আমি জানতে চাই, ওই কথাটা কি সত্যি?’

‘কোনটা?’

‘ওই যে বললেন, আপনাকে যে যখন যেমন করে দেখে, আপনি তেমনই?’

আমি একটু অবাক হলাম, হেসে বললাম, ‘কথাটা ভালোনি দেখছি। কিন্তু আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই, ব্যাপারটা তা-ই নয় কী?’

ফুলকলি একটু যেন জেদের সঙ্গেই বললো, ‘কী রকম?’

বললাম, ‘খুব একটা জটিল কথা বোধ হয় বলিনি। তোমার নিজের কী ধারণা? তোমাকে, তোমার এই শহরের পরিচিতদের বা অপরিচিতদের কথাও বলি, সবাই কি এক চোখে দেখে। এক রকম ভাবে?’

ফুলকলি বেশ তর্কের স্বরে বললো, ‘তা ভাবে না। না-ই বা ভাবলো! আমাকে যে যে ভাবেই দেখুক, তাতে আমার কী যায় আসে? আমাকে যে রকম ভাবে আমি কি তেমনি হব?’

আমি জানি, আসলে ওর খটকাটা কোথায়। বললাম, ‘তা-ই বা কেন হবে? তুমি যা, তা-ই থাকবে। কিন্তু তোমাকে যে যা-ই ভাবুক, তুমি কি সবাইকে ডেকে ডেকে বোঝাতে যাবে, তুমি তেমনটি নও।’

ফুলকলি ঠোট উলটিয়ে বললো, ‘দায় কেঁদে গেছে আমার।’

হেসে উঠে বললাম, ‘আমি তো সে কথাই বলছি ফুলকলি দেবী, আমাকে যে যখন যেমন করে দেখে, আমি তেমনি। যে দেখে, দায় তো তার, আমার কী? আমি তো জানি, আমি যা, আমি তা-ই। কী বল কৃষ্ণকলি?’

কৃষ্ণকলি নিবিষ্ট মনে আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎ ওকে সান্দী মানতে চমকে উঠে বললো, ‘হ্যাঁ? হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছেন আপনি।’

বললাম, ‘তবে আমি মারাত্মক হলাম কিসে?’

ফুলকলি হাড় ঝাঁকিয়ে, তীক্ষ্ণ অঙ্গসজ্জিসায়, ভুরু তুলে আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে ছিল। কিঞ্চিৎ সন্দেহও রয়েছে ওর চোখে। বললো, ‘মনে হচ্ছে, কালকূটের লেখার ভাষা শুনছি। কিন্তু খেই পাচ্ছি না।’

হেসে বললাম, ‘তোমার খেই আমি ধরিয়ে দিতে পারি। আমি যদি কথাটাকে এমন করে বলতাম, “যখন ঘাহার কাছে থাকি / তখন তাহার মন রাখি”, তাহলে তুমি মারাত্মক বলতে পারতে। আসলে তুমি আমার কথাটা সেই অর্থেই ধরেছিলে বোধ হয়।’

ফুলকলি এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ যেন একটু লাল হয়ে উঠলো। তারপরে হাতজোড় করে বললো, ‘হার মানলাম। সেই সঙ্গে, এবার আমার নমস্কারটাও সেরে রাখি।’ বলেই, ও দ্রুত আমার পায়ে হাত স্পর্শ করে, কপালে ছুঁইয়েই উঠে দাঁড়ালো।

আমি চমকে উঠে বললাম, ‘আরে, পাগল নাকি?’

ফুলকলি বললো, ‘না, ভূত! তা না হলে, আমার ছোট বোনরা যা ভোলে না, আমি তা কেমন করে ভুলেছিলাম? আমার তো উচিত ছিল, ভি. টি.-তেই প্রণামটা সেরে নেওয়া।’

আমি হাতজোড় করে বললাম, ‘ফুলকলি, দোহাই, আমাকে ইষ্টগুরু জায়গায় বসিও না। যা আছি, তা-ই থাকতে দাও।’

‘তা-ই থাকবেন, আপনি যা।’ শেষের কথায় যেন একটু বিশেষ জোর দিয়ে বললো, ‘আমি দেখি, চায়ের কত দূর।’

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘চায়ের আগে আমি একটু মুখ ধুয়ে নিতে চাই। অ্যাটাচিতে প্রয়োজনীয় আঃ কিছু না থাকুক, দাঁত মাজা আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জামগুলো আছে। অর্থাৎ বাধে না হলে, তুমি বরং আমাকে একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।’

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘ও মা, অসুবিধের কী আছে? চলল, আপনাকে আমি বাথরুম দেখাচ্ছি।’

আমি অ্যাটাচি খুলে ব্রাশ, মাজন আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের করলাম।

ফুলকলি বললো, ‘স্নানের অভ্যাস কি দুপুরে?’

বললাম, ‘না, সকালেই। কিন্তু আমার জামা কাপড়ের পেটি তো চলে গেছে বন্ধুর ঘরে, অতএব স্নানটা সেখানে গিয়েই সারতে হবে।’

ফুলকলি বললো, ‘এ ব্যাপারে অনেক ডিসপিউট আছে, কোথায় চান করবেন বা থাকবেন। আপাতত মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে আছেন। চা খান, তারপরে দেখা বাবে।’ বলেই দরজার আড়ালে অদৃশ্য হলো।

আমি কৃষ্ণকলির দিকে খানিকটা বিভ্রান্ত চোখে তাকালাম। ও হেসে উঠে বললো, ‘আমি কিছু কমেন্ট করতে পারব না। চলুন, বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি।’

অগত্যা। আপাতত যা করণীয়, তা-ই করা যাক। বাইরের ঘরের পার্টিশনের আড়ালেই খাবার ঘর। তার একদিকে, আলাদা রান্নাঘর, অতৃদিকে বাথরুম। কোনো কিছু নিয়েই, আমার তেমন বাহানা নেই, বিশেষত যখন বাইরে, পথে নেমে পড়ি। তবু বাথরুম ব্যাপারটার মধ্যে, বোধ হয় অবচেতনে, কোথাও একটু খুঁতখুঁতানি আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, বাথরুমটি বেশ পরিচ্ছন্ন আর শুকনোই পাওয়া গেল। ফ্যাটটি তেমন রাজকীয় না, অতএব বাথরুমও না, সবই সাধারণ। তবে সাজানো গোছানো ভালো। বেসিনের ওপরে আয়নাটি ঝকঝকে পরিষ্কার, বেসিনটিও। পায়ের নিচে, শ্রাওলা জমে, পিছলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

দাঁত মেজে, দাঁড় কামিয়ে, চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে, অনেকটা গ্লানি-মুক্ত হওয়া গেল। বাথরুমের বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখি, খাবার টেবিলের ওপরে, চা সহ, ফুল কোর্স নাস্তা সাজানো। ফুলকলি ছাড়া সকলেই টেবিলের সামনে। গৃহকর্ত্রী মা বললেন, ‘বসুন।’

কথাটা কানে হঠাৎ এমন খট করে লাগলো, না বলে পারলাম না, ‘বসতে ইচ্ছা করছে না।’

কৃষ্ণকলি অবাক উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন?’

আমি গুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘মুখ ফুটে অবিশ্রি কিছু বলিনি। কিন্তু প্রণামের পরে আশীর্বাদ করলেন, এখনো আমাকে ‘আপনি’ করে বলছেন?’

মা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তাই ভালো। আমি ভাবলাম, কি না কি একটা অত্যায হয়ে গেছে বুঝি!’

আমি স্বরে অবাক স্বর ফুটিয়ে বললাম, ‘ব্যাপারটাকে কি এখনো আপনার অত্যায বলে মনে হচ্ছে না?’

মায়ের সঙ্গে, কৃষ্ণকলি আর কুন্দকলিও হেসে উঠলো। মা বললেন, ‘আচ্ছা বাবা অত্যায হয়েছে, এখন বোসো তো। একটু কিছু মুখে দাও। দু’দিন দু’রাত্রি তো গাড়িতেই কেটেছে।’

আমি দুই বোনের দিকে একবার তাকিয়ে হাসলাম, বললাম, ‘এসো, সবাই বসি। ফুলকলি কোথায় গেল?’

বলতে বলতেই ফুলকলি এলো, বললো, ‘এসে পড়েছি, বহ্নন।’

সকলেই বললাম। মা-ও বললেন একপাশে। বেলা প্রায় দশটা, কিন্তু প্রাতঃরাশের আয়োজন কিছু কম না। বিস্কুট দিয়ে শুরু করে, মিষ্টির পাশ্রে যাবার আগে, দুধ কর্ণফেল্লা, কলা, মাখন, কুটি, ডিম এবং অবাক করার মতোই, অতি উপাদেয় ককটেল্ সস্! খাওবন্ধুতেও অনেক সময় পরিবারের চরিত্রকে কিছু কিঞ্চিৎ চেনা যায়। হাল আমলের শহরে চাকুরে পরিবারের সকাল-বেলার খাবারের ব্যবস্থা বোধ হয় এ রকমই হয়। অন্তত রান্না পর্বটা অনেক সংক্ষিপ্ত করা যায়।

আমার এই ভাবনার ফাঁকেই মা বলে উঠলেন, ‘আমি কিন্তু জানিনে বাবা, তোমার এ সব খাবার ভালো লাগবে কি না। একবার ভেবেছিলাম, লুচি তরকারী করে দিই।’

হেসে বললাম, ‘আমি সব রকমেই আছি, আপনি ভাববেন না। খাওয়ার ব্যাপারে, আমার মায়ের কাছে, আমি বরাবর লক্ষী ছেলে।’

মা বললেন, ‘খুব ভালো।’

ফুলকলি চোখ ঘুরিয়ে বললো, ‘লক্ষী ছেলে হবার খুব সাধ দেখছি আপনার?’

জবাবটা গুরু মা-ই দিলেন, ‘হবার সাধ হবে কেন? ও তো এমনভেই লক্ষী ছেলে।’

ফুলকলি একটু আঁতুরে অভিমানের স্বরে বললো, ‘আর আমার বুঝি অলক্ষী?’

মা যেন চমকে উঠে, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ‘ছি ছি, অমন কথা বলিস নে তপসি। তোরা আমার সবক’টি লক্ষী মেয়ে।’ বলতে বলতে তাঁর চোখ ছুটি ছলছলিয়ে উঠলো।

দেখলাম মায়ের চোখের ছলছলানিটা, তিন কন্ডার চোখেই যেন সংক্রান্তি হয়ে পড়লো। তাঁর মধ্যে, ফুলকলির মুখে একটু লজ্জার ছটাও লেগে গেল। বললো, ‘আমি ঠাট্টা করে বলেছি মা।’

মা একটা নিশ্বাস কেলে বললেন, ‘জানি। তবু, ঠাট্টাও এক এক সময় শুনতে পারিনে মা। তোরা আমার লক্ষী মেয়ে শুধু না, আমার লক্ষী ছেলেও বটে। তোরা আমার ছেলেমেয়ে, সব।’

সকলের মুখেই একটু বিষণ্ণ হাসি দেখা দিল। খাওয়ার তালটাও যেন কিঞ্চিৎ কেটে গেল। আর আমার মনে হলো, পুরুষহীন এই সংসারে, তিনটি

কথা আর মা, চারজন নারী, সংসারের পথে চলেছে। কোথাও একটা অসহায়তা আছে। যে সংসারে পুরুষ নেই, সে সংসারই তা মর্মে মর্মে অহুতব করতে পারে। আমার অহুতব, আপাতত মায়ের এই যে চমকানো, চোখ ছলছলিয়ে ওঠা এবং কথা, সবই সেই অসহায়তাকেই কেন্দ্র করে।

ফুলকলি আমার অশ্রুমনস্কতা দেখে, আভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘কী হলো, বাচ্ছেন না?’

আমি সচকিত হয়ে বললাম, ‘খাচ্ছি তো।’

ফুলকলি এমন একটি মেয়ে যে তার পরিবারের কোনো কথাই, আমাকে চিঠি লিখে জানাতে ভোলেনি। অতএব নতুন করে, জিজ্ঞাসার কিছুই নেই। আমি জানি, ওদের একজন বৈমাত্রেয় দাধা আছেন, তিনি মস্ত বড়লোক, থাকেন হায়দ্রাবাদে। ওর বাবার প্রথম পক্ষের সন্তান সেই দাধা। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পরে ফুলকলির মাকে বিয়ে করেছিলেন। এ পক্ষে কোনো পুত্র সন্তান হয়নি, তিনটিই কন্যা, তিন বোন। দাধা ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। বাবাও কিছু রেখে যেতে পারেন নি, তাঁর প্রভিডেন্ট কাণ্ডের সামান্য টাকা ছাড়া। অতএব সংসারের পথে ওদের এমনি করেই পা বাড়তে হয়েছে। আর সেই পা বাড়ানোটাকে বলতে হবে শক্তিশালী এবং সক্ষম এবং সম্ভ্রান্তও বটে। নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের হাতে, অপরের চিন্তা মাথায় নিয়ে, কোনো অভিযোগের পাঁচালী গাইতে শেখেনি। সেই হিসাবে, চিঠির মাধ্যমে, অনেক আগেই আমি আমার সম্মান জানিয়ে রেখেছি। সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রণামটি ওদের মাকে, তিনিই তিন কন্যাকে শিশু বয়স থেকে মাহুয করে তুলেছেন।

ফুলকলি বললো, ‘মা আপনাকে লুচি তরকারি করে খাওয়াতে পারতেন ঠিকই। এ সব হচ্ছে, আমার আর খুবুর অফিসে খেয়ে যাবার খাবার। আজকের ব্যবস্থা এই, পরে আপনাকে মা লুচি তরকারি খাওয়াবেন।’

আমি একটু গম্ভীর স্বরে বললাম, ‘না, আমি লুচি তরকারি খেতে চাই না।’

সকলেই জিজ্ঞাস্ব অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। এমন কি মা-ও যেন একটু অশান্তি নিয়ে তাকালেন।

ফুলকলি জিজ্ঞেস করলো, ‘কী খেতে চান আপনি?’

বললাম, ‘কী হবে বলে? যা খেতে পাব না, তা বলে লাভ কী?’

আমার নিরস নির্বিকার বচনে সকলের অশান্তি আরো বাড়লো। তিন বোন পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। ফুলকলিই আবার বললো, ‘তবু

শুনি একটু। হয়তো এমন খাবারের কথা বলবেন; না দিতে পারলেও নামটা অজ্ঞাত আমাদের জানা থাকবে।’

ককটেল সঙ্গে কামড় বসিয়ে বললাম, ‘পোস্ত দিয়ে লাউভাঁটার চকড়ি ভালের সঙ্গে, ভাত দিয়ে ভাজা বড়ি, বড়ির ঝাল, নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ষণ্ট...’ আমার কথা শেষ করার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে হাসির তুফান বইতে শুরু করেছিল।

কুম্ভকলির তো গলায় খাবার আটকে বিষম লেগে কাসি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কুম্ভকলির হাতের কাপ থেকে চা চল্কে পড়েছে। ইন্তক মা তাঁর কালো পাড়ের ধুতির আঁচল মুখে চেপে ছেলেমানুষের মতো হাসতে আরম্ভ করেছেন।

আমি কপট বিন্ময়ে, ভ্রুকুটি চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে আছি। আবার বললাম, ‘খুব একটা হাসির কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না।’

ফুলকলি কোনোরকমে একটু হাসির কেয়ারা ধামিয়ে বললো, ‘হাসির কথা বলেননি। কিন্তু ও সব মহার্ঘ খাবার সত্যি খাওয়ানো যাবে না।’

মা বলে উঠলেন, ‘কেন খাওয়ানো যাবে না? ও যা-যা খেতে চেয়েছে, বম্বের বাজারে তার কোন জিনিসটা পাওয়া যায় না শুনি? আমি কী খেয়ে থাকি? রোজই কি আলু কাঁচকলা খাই নাকি? এই তো সেদিনও তোদের কুমড়ো ফুলের বড়া খাইয়েছি।’

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, ‘সত্যি?’

মা বললেন, ‘হ্যাঁ, কলকাতার লোকেরা বম্বের বিষয়ে অনেক কিছুই জানে না।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে চালকুমড়ো পাওয়া যায়?’

মা বললেন, ‘কেন যাবে না?’

আমি খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, চালকুমড়ো দিয়ে চাল বাটা মাথিয়ে, ভেতরে সরষে বাটা মশলা দিয়ে কি একটা হয়, আপনি রান্নাতে পারেন?’

মা প্রায় হেসেই অস্থির, বললেন, ‘কেন পারব না, ওটাকে চালকুমড়োর বড়া বলে। তোমাদের আসল বাড়ি কোথায় বল তো? ঢাকা না ফরিদপুর?’

আমি বললাম, ‘ডাহা।’

মা তাঁর কন্ঠ্যদের চেয়েও ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠে বললেন, ‘আমি তো ফরিদপুরের মেয়ে মাদার্নপুর সাব-ডিভিশন।’

ওদিকে তিনকল্লার চক্ষু প্রায় ছানাবড়া! কুক্কলি বলে উঠলো, ‘মা, তোমরা কি সব বলছো, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

ফুলকলি বললো, ‘মা, তুমি তো আমাদের কোনোদিন ও বকম চালকুমড়োর বড়া খাওয়াওনি?’

আমি আর মা দু’জনেই হেসে উঠলাম। মা বললেন, ‘তোরা তো ছেলেবেলা থেকে ও সব খেতে শিখিসনি, তাই রাঁধি না। এবার রেঁধে খাওয়াব।’ বলে, আমার দিকে তাকিয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তা হ্যাঁ বাবা, তুমি এ সব নিরিম্বিষ খাবারের ভক্ত হলে কেমন করে?’

বললাম, ‘আমিও যে বিধবা মায়ের ছেলে।’

মায়ের মুখে হঠাৎ করুণ ছায়া বনিয়ে এলো, সেই সঙ্গে কল্লাদেরও। এ আমি চাইনি। আবার বললাম, ‘আমার মা আমিষ রান্নাও অনেক জানেন। কিন্তু মায়ের হাতের নিরামিষ খাবার আমার বেশি ভালো লাগে। সে জন্তু মাকে খুব জ্বালাতন করি।’

‘জ্বালাতন করেন?’ ফুলকলি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, ‘করি না? খুব জ্বালাতন করি। মা তো এক-এক সময় রেগে মারতেই আসেন।’

আবার একটা হাসির লহরী বেজে উঠলো। মা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা ক’তাই-বোন?’

‘তিন ভাই, এক দিদি।’

‘তুমি কী?’

‘সকলের ছোট।’

মা হেসে বললেন, ‘সেই জন্তুই। তুমি মাকে জ্বালাতন করবে না তো কে করবে?’ সবাই হেসে উঠে আমার দিকে তাকালো।

ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছিল। ফুলকলি একটু গভীর ভাবে বললো, ‘একটা ব্যাপারের এখনো কোনো কিনারা হয়নি। উনি কিন্তু আমাদের বাড়ি থাকছেন না, চলে যাচ্ছেন।’

মা অবাক স্বরে চমকে উঠে বললেন, ‘সে কী?’

ফুলকলি বললো, ‘আসল কথাটা তো আমাদের বলাই হয়নি। দেখছো না, ওঁর অ্যাটাচিটা ছাড়া, সঙ্গে কিছুই নেই? সে সব উনি ওঁর বন্ধুর বাড়িতে, পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি নেহাত গেছিলাম বলে, দয়া করে একটু সময়ের জন্তু এসেছেন।’

কৃষ্ণকলি বলে উঠলো, ‘সত্যি?’

কুন্দকলি বললো, ‘আমার একবার মনে হয়েছিল, আটাচিটা ছাড়া আর কিছু দেখছি না কেন? আপনি আমাদের বাড়ি থাকবেন না?’

তুতু অর্থাৎ কুন্দকলি ওর ভাগর চোখদুটো মেলে আমার দিকে যেন অসহায় বিন্মরে তাকিয়ে রইলো। সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে, ফুলকলি ছাড়া।

বোধ হয় ও নিজে আমাকে বিপদে ফেলেছে বলেই। কিন্তু কয়েক মূহূর্তের মধ্যেই আমি আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলাম, ‘থাকব।’

ফুলকলি ভ্রুকুটি সন্দেহে আমার দিকে তাকালো। আমি আবার বললাম, ‘হু-একটা দিন আমার একটু কাজ আছে, সে সময়টা আমার বন্ধুর বাড়ি থাকা দরকার। তারপরে এখানেও হু-একটা দিন তোমাদের কাছে থেকে যাব।’

কৃষ্ণকলি জিজ্ঞেস করলো, ‘হু-একটা দিন কেন? কলকাতায় অনেক কাজ বৃষ্টি?’

বললাম, ‘না কলকাতায় যাব না। কয়েকটা দিন বসে কাটিয়ে, তাবছি ঔরঙ্গাবাদটা ঘুরে যাব।’

ফুলকলি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘ঔরঙ্গাবাদ? সেখানে কী?’

হেসে বললাম, ‘অজস্কার গুহায় যেতে হলে তো ঔরঙ্গাবাদ হয়েই যেতে হবে, তাই না?’

ফুলকলি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, ‘ওহু, তাই বলুন অজস্কার যাবেন। হ্যাঁ, ঔরঙ্গাবাদ হয়েই যেতে হয়।’

কুন্দকলি বলে উঠলো, ‘ও সব পরে যাবেন। এখন অনেক দিন আমাদের বাড়ি থাকতে হবে।’

মা হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘সব মেয়েরাই চায়, বাড়িতে একটা দাদা বা ভাই থাকুক। এমনিতেই তপসি তোমার নামে পাগল। এখন কাছে পেয়ে এত সহজে কি তোমাকে ছাড়বে?’

আমি বললাম, ‘কয়েকদিন তো থাকবই।’

ফুলকলি জিজ্ঞেস করলো, ‘আপাতত কী করবেন? আপনার বন্ধুর বাড়ি যাবেন?’

হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখে বললাম, ‘একবার যাওয়া দরকার। অবিলম্বে আমার বন্ধুর হয়তো এইমাত্র ঘুম ভাঙলো!’

কৃষ্ণকলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন উনি কি সারা রাত্রি কাজ করেন?’

আমি হেসে বললাম, ‘না অকাজ করে।’

বলেই আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমার চোখ পড়লো ফুলকলির দিকে। ও তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই। একটু যেন লজ্জা পেয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। মা উঠে পড়লেন, বললেন, ‘তাহলে আসল কথাটা কিন্তু আমার জানা হলো না। তুমি কি দুপুরে আমার কাছে থাকো না?’

তিনি এমন ভাবে আমার কাছে কথাটি উচ্চারণ করলেন, হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। কৃষ্ণকলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘কেন যে ছাই আজ অফিস ছুটি নিতে গেলাম। সব দোষ এই দিদিটার।’ বলে, ফুলকলির দিকে রুটে চোখে তাকালো।

ফুলকলি কিছুই বললো না, সামনের শূণ্য প্লেটে, নখের আঁচড় কাটতে লাগলো।

আমার নিজেই মনে হতে লাগলো, মস্ত অপরাধী। আজ রাত্রি পোহানোর কালে, জানতাম না, ফুলকলির সঙ্গে আমার দেখা হবে। সে রকম কোনো কথাবার্তাই আমাদের মধ্যে পত্রে লেখালেখি হয়নি। দ্বিতীয়ত, যা-ও বা ওর সঙ্গে এ বাড়িতে এলাম, আসবার আগের মুহূর্তেও এ রকম একটি আন্তরিক পরিবেশে এসে পড়ব, বুঝতে পারিনি, যদিও এই পরিবারের মোটামুটি সকলের পরিচয়ই ফুলকলির চিঠির বয়ানে আমার জানা ছিল। এখন নিজের কাছেও অস্বীকার করতে পারি না, মনের থেকে কোথায় যেন আমিও একটু বাঁধা পড়েছি। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি, প্রাণের মধ্যে যে একটি প্রীতির স্রব বেজে উঠছে, তার জ্ঞা, কয়েকটি প্রাণের অকৃত্রিম প্রীতিধারা স্রোত। তাকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখব, দেখছি তেমন শক্তি পাচ্ছি না।

এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসাবে, আমার কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবী নেই, নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মতো দীনতা আমাকে কখনো গ্রাস করেনি। কিন্তু সব কিছুই ছিল কতগুলো ভবিষ্যৎ ছকের লিপিতে বাঁধা। তেমন কোনো জরুরি কাজে মহারাষ্ট্রের এই নগরে আমি আসিনি, সেদিক থেকে বরং আমার এবারের যাত্রাটাই ছিল অলস আর মন্থর। আর মনের কথা যদি সত্যি করে বলতে হয়, তাহলে বলি, চলার পথে কোথাও মনোবেড়িতে ধরা দিতে চাই না। সংসারে তাবত মানুষই সম্ভবত স্নেহ প্রীতি ভালবাসার প্রার্থী। আমি তার থেকে বাদ নেই। কিন্তু প্রার্থীর পাওনাটাই সব সময়ে বড় কথা নয়। কারণ সংসারের

একটা বড় সহজ কথা বোধ হয় এই স্নেহ স্রীতি ভালোবাসার পাশাপাশি বাস করে বিচ্ছেদের বেদনা, দুঃখ আর কষ্ট। পথ চলার ক্ষেত্রে, এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে, পথ চলাটা তার নিজের স্বরে বাজে।

কিন্তু আপাতত, তা পারলাম না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফুলকলির মায়ের দিকে কিয়ে বললাম, ‘বেলা তো অনেক হলো। কখন রাঁধবেন, কখন বা খাব?’

মা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘ও মা! আমি এখুনি রান্নার যোগাড় করছি। তিনটে মেয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলে, আমাকে রোখে কে? স্বখন খেতে চাইবে, তখনই খাওয়াব।’

বললাম, ‘তাহলে তাই করুন।’

ফুলকলি নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারলো না, হাততালি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মা হাসতে হাসতে চলে গেলেন আর একদিকে।

ফুলকলি চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, আমার দিকে না, ওর দিদি ফুলকলির দিকে। ফুলকলি হাসবে না কাঁদবে, যেন বুঝতে পারছিল না, এমন ভাবে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপরে হঠাৎ, ফুলকলির দিকে চোখ পড়তেই, ওর মুখে একই সঙ্গে হাসি আর লজ্জার ছটা লেগে গেল, বললো, ‘দেখেছিল খুকু, এ সব মায়ের লেখার আর নিজের কথার সঙ্গে কোনো তফাত ধরা যায় না, তাই না?’

ফুলকলি বললো, ‘ঠিক। কিন্তু তাই দিদি, আমার খুব ভয় হচ্ছিল, তুই বোধ হয় ভ্যা করে এখুনি কেঁদে ফেলবি।’

ফুলকলি ভ্রুকুটি করে বেশ ধমকেই কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ‘আহা হা, কাঁদনি তো? এখন চলো তো মেমসাহেব, তোমার গাড়ি চালিয়ে আমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না তো?’

বিশ্বয়ের ভঙ্গিতে জবাব দিল ফুলকলি, ‘অসুবিধে? একবার দিদির বুকের কাছে কান পেতে শুনুন না, বেট ফেলে বলতে পারি, ওর হাটের ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে গেছে। অবিশি আনন্দে!’

ফুলকলির মুখ লজ্জায় একেবারে সিঁদুরবর্ণ ধারণ করলো, বলে উঠলো, ‘আহু খুকু, কী হচ্ছে? ক’বটা আলাপ হয়েছে, যে এত বাজে বাজে বকছিল?’

আমি বললাম, ‘সত্যিই তো। বাজে কথা বলতে হলে ঘণ্টা কাবারি

হিসেব করে বলবে। আমি তো সেইজন্যই জিজ্ঞেস করলাম, ওর কোনো অসুবিধে হবে কী না। কয়েক ঘণ্টার আলাপে এর বেশি কিছু বলা যায় কী?’

কৃষ্ণকলি খিল খিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু ফুলকলি মোটেই পরাজয় মেনে নেবার পাত্রী না। বললো, ‘কয়েক ঘণ্টার আলাপ বৃষ্টি? আমার তা জানা ছিল না। আমি জানতাম, কালকূটের সঙ্গে আমার প্রায় দু’বছরের আলাপ। চিঠিপত্রগুলো অন্তত সে সাক্ষী নিশ্চয়ই দেবে।’

একে বলে উপযুক্ত সময়ে কঠিন বচন। আমাকেই হার মানতে হলো, বললাম, ‘যথেষ্ট বলেছ, এর পরে আমার আর কোনো কথা বলা চলে না। তা হলে চলো বেরিয়ে পড়া যাক।’

দুই বোন তখন চোখে চোখে তাকিয়ে হাসছে। ফুলকলি বললো, ‘খুঁ আয়, দরজাটা বন্ধ করবি।’

আবার গলা তুলে ভিতরের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘মা, ঘুরে আসছি।’

কোনো ঘর থেকে মায়ের জবাব শোনা গেল, ‘এসো। তাড়াতাড়ি এসো।’

কৃষ্ণকলিও বোধ হয় মায়ের কাছে গিয়েছে। আমরা তিনজন বাইরের ঘরে এলাম। আমার আঁটাচি হাতে নিলাম। ফুলকলি শোকার ওপর থেকে তুলে নিল ওর ব্যাগ। তার ভিতর থেকে বের করলো গাড়ির চাবি।

কৃষ্ণকলি দরজা খুলে দিল। আমরা বেরোবার মুখে ও বললো, ‘দেখিস দিদি, অগ্নি কোথাও চলে যাসনে যেন, বাড়িতেই আসিস।’

ফুলকলি আকুটি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হাসতে হাসতে কৃষ্ণকলি দরজাটা বন্ধ করে দিল!

ফুলকলি গাড়ির দরজায় চাবি লাগিয়ে, দরজা খুললো এবং ভিতরে ঢুকে অগ্নি দিকের দরজা খুলে দিল। আমি ওর পাশের আসনে বসলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি, কৃষ্ণকলির কথার প্রতিক্রিয়াটা এখনো ওর মন থেকে যায়নি। সেটা বুঝতে পারছি, ওর চোখে মুখের লজ্জার ছটা দেখে, যা ও চাপাবার চেষ্টা করেও পারছে না।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করার পরে আমি বললাম, ‘একটু সাবধানে চালিও।’

কথাটা হঠাৎ শুনে, ফুলকলি প্রায় হঠাৎই গাড়ির ব্রেক কষতে যাচ্ছিল। বলে উঠলো, ‘কেন, সাবধানে চালাব কেন?’

আমি গম্ভীর ভাবেই বললাম, ‘কেউ অশ্রুমনস্ক হয়ে গাড়ি চালালে, তাকে কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত।’

আমার দৃষ্টি উইণ্ডস্ক্রীনের সামনে রাস্তার দিকে, তথাপি স্পষ্টতই অহুমান করতে পারছি, ফুলকলি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, ওর গাড়ির গতি, অতি স্লথ। পরমুহূর্তেই হঠাৎ কি হলো জানি না, গাড়ি তার স্বাভাবিক গতি নিল। আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে না ফিরেই বললো, ‘কৃষ্ণকলিটা আমাকে দিদি বলে একটুও মাগ্ন করে না।’

আমি কপট অবাক স্বরে বললাম, ‘তাই নাকি?’

ফুলকলি মুখ ফিরিয়ে ঝটিতি একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, ‘সুনলেন না, বেরোবার সময় কী রকম বাজে কথা বলছিল?’

আমি বিস্মিত ও বিস্মৃতির ভঙ্গি করে বললাম, ‘কই, সে রকম কিছু বলেছে বলে মনে হয়নি তো?’

ফুলকলি আবার একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিল। আমি আবার বললাম, ‘কৃষ্ণকলি তো বলছিল, অশ্রু কোথাও যেন চলে না যাও। এর মধ্যে এমন আর কি—’

কথাটা অসমাপ্ত রেখে, আমি ফুলকলির দিয়ে তাকালাম এবং ঙ্গকুটি সন্দ্বিদ্ধ দৃষ্টি দেখে, হাসি সংবরণ করতে পারলাম না। ফুলকলি নিজের হেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললো, ‘আপনি হয়তো কিছু ভাবতে পারেন।’

বললাম, ‘হয়তো পারতাম, যদি না, পত্রালাপে তোমাকে বা তোমাদের পরিবারের কিছু কিঞ্চিৎ না অহুমান করতে পারতাম।’

ফুলকলির মুখের ভাব এবার খানিকটা সহজ হলো, তারপরে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেমন লাগল আমাদের পরিবারকে?’

বললাম, ‘যেমনটি লাগা উচিত ঠিক তেমনটি।’

ফুলকলি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললো, ‘সকলের উচিত জান কি এরকম?’

আমি সহজ ভাবেই বললাম, ‘সকলের কথা ভেবে আমি কিছু বলিনি, আমি আমার উচিত বোধ নিয়েই কথাটা বলেছি।’

ফুলকলি বললো, ‘তবু আমি বুঝতে চাই। এমন ছোট করে বললে আমি কিছুই বুঝতে পারব না।’

আমি হেসে বললাম, ‘কাব্য করে বললে তুমি খুশি হবে?’

ফুলকলি একবার আমার দিকে দেখে নিল, তারপরে বললো, ‘কাব্য অকাব্য

জানি না, কালকূটের মুখ থেকে শুনতে চাই, কেমন লাগলো আমাদের পরিবারকে।’

বললাম, ‘প্রথমত এত অল্প সময়ে, একটি পরিবারকে বোকা কঠিন! দ্বিতীয়ত, তোমার চিঠিতে একটা মোটামুটি ছবি আমার মনে আঁকা ছিল, বর্ণনাতে যার মিলটা একেবারে ছবছ। কিন্তু—’ কথাটা শেষ না করে থামলাম।

ফুলকলি একটা গাড়িকে ওভারটেক করে জিজ্ঞেস করলো, ‘কিন্তু?’

বললাম, ‘কিন্তু সেই বর্ণনার অধিক কিছু আমি দেখলাম। আমি দেখলাম, একটি সুখী সুন্দর পাখির বাসা। পক্ষীমাতা বসে আছেন তাঁর নরম ডানা ছড়িয়ে। তাঁর শাবকগুলো ডাগর হয়েছে যতো সুন্দর ততো, এখন তারা কেউ-কেউ বাইরের আকাশে ওড়ে, খাবার সংগ্রহ করে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মতোই মা আর শাবকেরা সদাসতর্ক, নিজেদের বাঁচাতে, কেননা, তারা জানে জীবনে অসহায়তা অনেক, আক্রমণ নানা দিক থেকেই আসতে পারে।’

কথাগুলো বলে, ফুলকলির দিকে তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, গাড়ি থেমে গিয়েছে। স্ট্রিয়ারিং ছইলের দু’হাতের ওপরে, আমার দিকে পাশ ফেরানো ওর মুখ। সামনে আরব সাগর ফেনিলোচ্ছল, হাসির কিরণ তার তল্লঙ্গে-তরঙ্গে। আমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। নিজের কথাগুলো, নিজেরই কানে, আঠারো বছরের ছেলের মতো, রোমান্টিক বাচালতার ভরা শোনালো। নিজের বিব্রত লজ্জাকে চাপা দেবার জন্য, তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ‘আমার বন্ধুর বাড়ি এদিকে না, পেছনে গিয়ে, ডানদিকের রাস্তায় যেতে হবে।’

ফুলকলি সে কথার কোনো জবাব দিল না, যেমন ছিল, তেমনি রইলো। দেখলাম ওর বাঁ চোখের কোণ থেকে এক ফোঁটা জল, উর্ধ্ব নাকের পাশে টলটল করছে। আমি বিস্মিত অপ্রস্তুত তো বটেই, একটা সংশয়ের কাঁটাও ঊকি দিল। আমার কথায়, ফুলকলি আহত হয়নি তো? আমি ডাকলাম, ‘ফুলকলি।’

ফুলকলি ওর চোখের জল, আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করলো না। উর্ধ্ব নাকের ওপারে, ডানদিকে চোখের জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়লো। সম্ভবত একটা কান্নার আবেগ জমে উঠেছিল, একটু থেমে থেমে, নিচু স্বরে বললো, ‘একে কাব্য করে বলা চলে কি না জানি না, যদি চলে, তাহলে বলব, কাব্য জীবনে স্থালনা না। কিন্তু রিয়্যাল বলুন, আর ড্রুয়েল বলুন, ঙ্খু ঙ্খু ঙ্খু ঙ্খু। যা বললেন,

তার প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আমাদের পরিবারকে, যেখানে এমন আশ্চর্য সত্যি ছবি যে কারো চোখে ফুটতে পারে, না মনে বিশ্বাস হত না।’

কথার শেষ দিকে, ফুলকলির স্বর যেন ডুবে গেল। সমুদ্রের গর্জন আমার কানে, আরো জোরে বেজে উঠলো। সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপরে আবার ফুলকলির দিকে। আমি আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য হেসে বললাম, ‘কমপ্লিমেন্ট দিলে? আমি কিন্তু এ ভাবে বলে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। তবে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য এই রকমই।’

ফুলকলি বললো, ‘কমপ্লিমেন্ট আমি দেব? ভাবছিলাম, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব কি না।’

আমি ভয়ের ভাব করে চমকে বললাম, ‘ভাগ্যিস করোনি, তাহলে, সত্যি লজ্জায় ফেলতে। তবে, আমার ইচ্ছা করছিল—’ বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। ফুলকলির চোখের তারা আমার দিকে, যা এখনো ভেজা ও কিঞ্চিৎ আরক্ত।

আমি ওর মাথায় আস্তে হাত রেখে বললাম, ‘এইটাই ইচ্ছা করছিল, পাখিটা একটু সহজ হোক। চোখ মোছ।’

ফুলকলির হাত চকিতের জন্য একবার, ওর মাথায় রাখা আমার হাতের ওপর উঠে এলো এবং স্পর্শ করেই তা সরে গেল। স্ট্রিয়ারিং-এর ওপর থেকে মুখ তুলে, কোমরে গোঁজা রুমাল নিয়ে, মুখ চোখ মুছলো। তারপরে সমুদ্রের দিকে তাকালো।

আমিও তাকালাম। ঝকঝকে শুভ্র কেনিল হাসিতে পাগলা ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি আবার ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, তার মধ্যে লজ্জা ছিল। হয়তো আরো কিছু, যা নারীর প্রাণের একান্ত নামহীন অভিব্যক্তি। লাটু গিয়ায়ে হাত দিয়ে, চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে বললো, ‘আপনার বন্ধুর বাড়ি যে ছেড়ে এসেছি, আমি তা আগেই জানতাম। ইচ্ছে করেই এখানে চলে এসেছিলাম।’

আমি বললাম, ‘কৃষ্ণকলি তাহলে একেবারে মিথ্যা বলেনি?’

ফুলকলি গাড়ি ব্যাক করতে গিয়ে হেসে উঠলো। তারপরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, ‘আমার ইচ্ছেটা অবিশ্বাস্য সেই রকম।’

আমি প্রায় চোখ কপালে তুলে বললাম, ‘কী?’

ফুলকলি এবার সহজে হেসে বললো, ‘আপনাকে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাই।’

উদ্ভিন্ন স্বরে বললাম, ‘হরণ? পুরুষ হরণ?’

‘ক্ষতি কি ? চিরদিন কি পুরুষরাই নারী হরণ করবে ?’

ফুলকলি ঠোঁটের কোণে হেসে, জুহুটি চোখে আমার দিকে দেখলো। তারপরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে, আমার বন্ধুর সঠিক বাড়িটির গেট দিয়ে, পার্কিং লটে গাড়ি থামালো। বিরাট বাড়ি, ওনারশিপ ফ্ল্যাট সিস্টেমের, আজকাল যাকে বলে মালটিপারপাস বিল্ডিং, তা-ই। সমুদ্রের ধারে, আর গাছপালা নারকেল বীথির জুড়ই, চেহারাটা আলাদা।

আমি আমার অ্যাটাচিটা নিয়ে নামবার আগে, গাড়ির কাঁচ তুলে লক করে দরজা বন্ধ করলাম। ফুলকলিও দরজা বন্ধ করে নেমে এলো। এগিয়ে গিয়ে এলিভেটরে উঠে পাঁচ নম্বরের বোতাম টিপলাম। উঠতে উঠতে বললাম, ‘আশা করি আমার বন্ধু এতক্ষণে উঠে তাঁর ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন।’

ফুলকলি অবাক স্বরে বললো, ‘এখন তো প্রায় লাঙ্কের সময় ?’

পঞ্চম মেঝে, কিন্তু বাঙলার ঘষ্ঠতলায় পৌঁছে এলিভেটরের দরজা খুলতে খুলতে বললাম, ‘সকলের লাঞ্চ ডিনারের সময় এক না। ওটাও উচিত বোধের মতো ব্যক্তি বিশেষে তফাত থাকে।’

ফুলকলি বলল, ‘তা বটে।’

বন্ধুর ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজাটা খোলা দেখে অহুমান করলাম সে বোধ হয় ড্রয়িংরুমেই আছে, বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু ঢুকে দেখলাম সেখানে কেউ নেই, তবে নিত্যানন্দের একগাল হাসিসহ কপালে জোড়হস্ত নমস্কারে নত মূর্তি দেখতে পেলাম। বন্ধুর ভৃত্য পাচক এমন কি সঙ্গীও বলা যায়, নামে নিত্যানন্দ হলেও চেহারায় পোশাকে যাকে বলে একটি স্ফুদে ক্লিন স্টার। বললো, ‘আসুন, আসুন দাদাবাবু।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘দরজাটা কি তুমিই খুলে রেখেছ নাকি ?’

নিত্যানন্দ বললো, ‘হ্যাঁ। ড্রয়িংরুমের জানালা থেকে দেখলাম আপনারা গাড়ি থেকে নামছেন।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার সাহেব কী করছেন ?’

নিত্যানন্দ বললো, ‘ভেতরের ঘরে বই পড়ছেন। এই তো মাত্র চান করে জলখাবার খেলেন।’

আমি একবার ফুলকলির দিকে তাকালাম, বললাম, ‘তাহলে তো ও লস্কী ছেলে হয়ে গেছে। বেলা বারোটার মধ্যেই চান ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট।’ বলে, আমি হাসলাম।

ফুলকলি ওর হাতের ব্যাগটা সহ মুখের কাছে তুলে ধরে, নিজের হাসি

আড়াল করলো। ওকে লোফা দেখিয়ে বললাম, ‘তুমি একটু বোলো, আমি বন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা করি।’

ফুলকলি ঝাড় কাত করে গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে একটি সোফায় বসলো। আমি ভিতরে যাবার দরজা দিয়ে ঢুকলাম। বাঁদিকে ঘুরে একটি বাথরুম, তারপরেই আমার বন্ধুর শোবার ঘর সমুদ্রমুখী। ঢুকে দেখলাম, বিছানার ওপর জোড়াসনে বসে সে একটি বই পড়ছে। কিন্তু হায়, যা ভেবেছিলাম, তাই, পাশের ছোট টুলের ওপরে গেলাসে রঙীন পানীয়। পায়ের শব্দে আমার দিকে ফিরেই ঝপ করে গেলাস টেনে একটি চুমুক দিয়ে প্রথম অভ্যর্থনা করলো, ‘শালা লালটুমোহন এস।’

বন্ধুর গলাখানিও বেশ চড়া আর দরাজ। আমি বললাম, ‘লালটুমোহন মানে?’

বন্ধু প্রায় গর্জে উঠে বললো, ‘মানে যা, তা-ই। ববের মুখে আমি সব শুনেছি। তুমি শালা আমার এখানে আসবে বলে বব গেছে তোমাকে আনতে, আর তুমি শালা এক খুবস্বরং ছুকরির সঙ্গে কেটে পড়লে?’

বাধা দেবার চেষ্টা করেও বন্ধুকে থামাতে পারলাম না। তার কথা শেষ হবার আগেই জানি, ফুলকলির কানে কথাগুলো পৌঁছেছে। তবু আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করবার ইশারা করলাম।

কে কাকে বলছে। বন্ধুটি কোলের ওপর থেকে বই বালিশ ছুঁড়ে নিচে লাকিয়ে নেমে বললো, ‘তোমাকে আমি চিনি না? আমি শালা কোথায় আজ একটু সকাল-সকাল উঠলাম, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব, শুনি কী না, মেমসাহেবের সঙ্গে চলে গেছে। মেমসাহেব! শালা কোন্ ফুলটুসি মেমসাহেব তোমাকে ব্রিসিভ করতে গেছল স্টেশনে?’

আমি আর পারলাম না। অ্যাটাচিটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে, বন্ধুর গলা জড়িয়ে মুখের ওপর হাত চাপা দিতে গেলাম। সে আমার হাত সরিয়ে, ড্রয়িংরুমের দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে ডাকলো, ‘নেত্য! এই ব্যাটা নেত্য!’

সব আমার হাতের বাইরে চলে গেল। শুনতে পেলাম নিত্যানন্দর স্বর, ‘যাই আর।’

বন্ধু যেতে যেতে বললো, ‘আসতে হবে না। তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসা। দাদাবাবুর খাবার তৈরি রেখেছিস?’

আমি স্বাহুর মতো বন্ধুর শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় নিশ্চিট

খানেক চুপচাপ। তারপরেই আমি বন্ধুর স্বর শুনতে পেলাম, ইংরেজিতে কথা বলছে। নিশ্চয় ফুলকলিকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই, বন্ধু তার লুপ্টিটা কোমরের কাছে চেপে ধরে, ছুটতে ছুটতে শোবার ঘরে এলো, মুখে বিষয়, লজ্জা এবং উত্তেজনা। বললো, ‘ওই মহিলা তোমার সঙ্গে এসেছেন?’

বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘শালা।’ বন্ধু নিচু স্বরে বললো, ‘বলবে তো? আমি এই বেশে গেছি, আর ঘাঁড়ের মতো চোঁচাচ্ছি?’

বললাম, ‘সে অবকাশ তুমি দিলে কোথায়? যে ভাবে চিংকার করে, পাড়া মাথায় করতে লাগলে, সাধ্য কি তোমাকে কিছু বলি।’

বন্ধু লজ্জায় ও অল্পশোচনায় ঘরের একদিকে ছিটকে গিয়ে বললো, ‘ছি ছি ছি। আমি অবাক হয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করতে, তোমার কথা বললেন। ছি ছি ছি।’ বলেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে, টুলের ওপর থেকে পানীয়ের গেলাস নিয়ে এক চুমুকে সব শেষ করে দিল।

সত্যি, বেচারি, কী-ই বা করে? লজ্জা আর অল্পশোচনায়, ঝটিতি একটু স্বরূপান করে নিল। তারপরে এসে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, ‘এই মহিলাই তোমাকে স্টেশনে রিসিভ করতে গেছিলেন?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

বন্ধু বললো, ‘ববটা সত্যি অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছে। “এ বিউটিফুল ইয়ং লেডি, আই থিন্ক শী ইজ বেঙ্গলী।” একেবারে ছবছ। ছি ছি ছি, তুমি একবারটি বলবে তো।’ বলেই, টুলের নিচে থেকে বোতল বের করে, গেলাসে পানীয় ঢাললো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘করছোটা কী? আবার ঢাললে?’

বন্ধু বলে উঠলো, ‘ওহু, সরি, মনেই ছিল না।’

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, ‘বিপত্নীক প্রোচদের ওই রকমই হয়।’

বন্ধু আবার সব ভুলে গিয়ে চিংকার করে উঠলো, ‘হোয়াট ডু যু মীন বাই বিপত্নীক প্রোচ? অ্যাম আই এ প্রোচ?’

আমি হাত জোড় করে, মিনতির স্বরে বললাম, ‘দোহাই, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আজই মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে।’

বন্ধু তাড়াতাড়ি এক হাত জিভ বের করে, হুকান মূলে বলল, ‘ইস ছি ছি ছি, আমি আবার ভুল করলাম। কিন্তু তুমিই তার জ্ঞান দাও।’ বলে টুলের তলা থেকে, জলের বোতল নিয়ে, পানীয়ের মধ্যে মেশালো।

আমি বললাম, ‘আবার ?’

বন্ধু বললো, ‘খাব না। জল মিশিয়ে রাখলাম, তা নইলে উপে যায় কী না! কিন্তু এখন কি করা যায় বলো তো ?’

বললাম, ‘কী আবার করবে ? আমি ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসছি। তুমি একটু ভ্রমস্থ হয়ে সেখানে এসো।’

বন্ধু জোড় হাত করে বললো, ‘ম্লিজ, একটু বাঁচিয়ে, মানে সবদিক সামলিয়ে নিও।’

আমি এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে গেলাম। আমার লজ্জা আর কিছু না। ফুলকলির নামে বন্ধু যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছে, সেগুলো যদি ওর কানে গিয়ে থাকে, তাহলে কী ভাবে নেবে, জানি না। আমার বন্ধুকে, আমি চিনি। তার কথাগুলো যা-ই শোনাক, জানি, তার মধ্যে কোনো ইত্তর ইঙ্গিত বা অপমান করার ইচ্ছা ছিল না। এক্ষেত্রে আমার জানার থেকে, ফুলকলির গ্রহণ করার ভঙ্গিটাই বড়ো। অগ্রথায় ব্যাপারটা দাঁড়াবে, ডেকে নিয়ে এসে অপমান করার মতো।

আমি ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে গিয়ে, ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ফুলকলি কোনো আসনে বসে নেই। আর একটু এগিয়ে, মুখ তুলতে গিয়ে চোখে পড়লো, ও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, ডানদিকে দেখছে। অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে। ওর পাশ ফেরানো মুখের সামান্য অংশ দেখতে পাচ্ছি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ‘ফুলকলি।’

ফুলকলি চমকে তাকালো। চোখে চোখ পড়তেই মুখে একটু লজ্জার ছটা লেগে গেল। সামনে এগিয়ে এসে বললো, ‘এখন যাবেন তো ?’

বললাম, ‘যাব, একটু বোসো। আমার বন্ধু আসছে, একটু—’

আমার কথার মাঝখানেই ফুলকলি চমকে উঠে শব্দ করলো, ‘অ্যা ?’

আমি হেসে বললাম, ‘খুব ভয় পেয়ে গেলে, মনে হচ্ছে ?’

ফুলকলি নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে বললো, ‘না, ভয় আর কী! উনি—মানে, আপনার বন্ধু বোধ হয় আমার ওপর খুব রেগে আছেন।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘রেগে ? অবিশ্রি তোমাকে আগে বলা হয়নি, সে সময়ও পাওয়া যায়নি, আমার বন্ধুটি আদতে ভালো মানুষ, একটু হাঁক-ডাক করে কথা বলার অভ্যাস। আর বলতে পারো, কথাবার্তার রাশও একটু আলগা। যা যা ওকে চেনে না, তারা অনেকে ওকে ভুল করতে পারে।’

ফুলকলি আমার মুখের দিকে অস্বস্তিক্রমে দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো

শুনছিল। তথাপি, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, কেমন একটা সংশয় ওর দৃষ্টিকে ছুঁয়ে আছে। আমার কথার পরে, কিছু একটা বলবে ভেবেও, মুখ নামিয়ে নিল।

আমি বললাম, ‘তুমি বোধ হয় আমার কথাগুলো, মন থেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না, না?’

ফুলকলি অবাক ও সংকুচিত হয়ে দ্রুত বলে উঠলো, ‘না না, তা নয়, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। আমার কেমন মনে হলো, আপনার বন্ধু—আপনি না, আমি এসে পড়ায় বোধ হয় আনটাইম্লি ডিস্টার্বড্ হয়েছেন।’

ফুলকলির কথাগুলো এক মুহূর্তের জন্য ভাবিয়ে তুললো। মনে হলো, ওর কথার মধ্যে অল্প কোনো ইঙ্গিত আছে। যা ওর চোখের তারায়ও প্রতিবিম্বিত। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো, কথাটা আমার চিন্তায় হানলো, গন্ধ! আমার বন্ধুর স্বরার গন্ধ ওর ভ্রাণে গিয়েছে। অন্তত এ ক্ষেত্রে, মেয়েদের ভ্রাণেন্দ্ৰিয় যে একটু বেশি মাত্রায় তীব্র, আমার জানা আছে। তা ছাড়া, হুঁহাতে লুপ্তি চেপে, বন্ধুর প্রবেশের ভঙ্গিটি, যে কোনো অপরিচিত মহিলার পক্ষেই ভীতিজনক, তায় যদি তার সঙ্গে থাকে স্বরার গন্ধ।

আমি হেসে বললাম, ‘বুঝেছি। এই একটি ব্যাপার, ও শুরু করে এখন থেকে। সারাদিন কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝেই চলতে থাকবে, তারপর রাত্রে কখন যে থাকে, কে জানে! হয়তো ও নিজেও জানে না।’

ফুলকলি অবাক হয়ে, চোখ বড়ো করে জিজ্ঞেস করলো, ‘সারাদিন কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে চলবে? মানে উনি কি এখন কাজ করবেন?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, এখনি বেরিয়ে যাবে। আর ওর কাজ চলে প্রায় রাজি দশটা অবধি। যারা ওকে একটা বিরাট দায়িত্বের কাজ দিয়ে রেখেছে, তারা জেনে শুনেই রেখেছে, কারণ ওখানে ও হচ্ছে যোগ্যতম ব্যক্তি। আর এই যে একটু হৈকে ডেকে কথা বলা, বা কথাবার্তার রাশ একটু ঢিলে, সেটা ও ওর কর্মজীবন থেকেই আয়ত্ত করেছে। কিন্তু তার মানে এই না, আমি আমার বন্ধুর স্বরা পানের ব্যাপারে তোমার সমর্থন আদায়ের কোনো চেষ্টা করছি। কেননা, ওটা আমি নিজেই সমর্থন করি না।’

ফুলকলি যেন বুকের ভিতর থেকে পুঞ্জীভূত উদ্বেগকে একটা নিশ্বাসের ঝটকায় বের করে দিয়ে উচ্চারণ করলো, ‘ওহু! করেন না?’ বলতে বলতে ও ওর বুকের ওপর একটা হাত চেপে ধরলো।

আমি একটু হেসে বললাম, ‘কী করে করব বল। যদিও ওকে আমার কখনো তেমন ফ্রান্স্টিটেড মনে হয় না, কিন্তু অভ্যাসটা প্রায় আত্মকরী। অবিশি অনেক দিনের পুরনো। তবে আর একটা কথাও তোমাকে বলে রাখি। ও মেয়েদের দেখলেই—’

‘দেখলেই?’ ফুলকলির যেন আবার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো।

বললাম, ‘একেবারে বোকা বনে যায়, মানে, একেবারে গোবেচারা যাকে বলে।’

ফুলকলি একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, ‘আশ্চর্য!’

বললাম, ‘হ্যাঁ, আশ্চর্যের কোনো অভাব নেই সংসারে। অবিশি, তা বলে আমার বন্ধুকে মেয়েদের সামনে খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু ভেবে বোসো না। একটু নিরীহ হয়ে পড়ে, আদতে ও যা নয়।’

ফুলকলি বললো, ‘তবু শুনে ভালো লাগলো। আপনি তো বলছিলেন, উনি বিপত্নীক?’

বললাম, ‘হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে সেই প্রবাদটা মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। ওর ক্ষেত্রে বলতে হয়, দুর্ভাগার বউ মরে।’

ফুলকলির মুখে ছায়া ঘনিয়ে এলো, বললো, ‘আমি আপনার মনে কোনো কষ্ট দিইনি তো?’

বললাম, ‘না। ওর বউয়ের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি, তা না হলে ও আসতে পারবে না। তুমি একটু বোসো, কেমন?’

ফুলকলি বললো, ‘নিশ্চয়ই!’

বলতে বলতে ও ওর ব্যাগটা সোফা থেকে তুলে বসলো। আমি আবার ভিতরে গেলাম। দেখলাম বন্ধু অতি দ্রুত নিজেকে একেবারে ফুলসাহেব সাজিয়ে ফেলেছে। পুরো স্টেড্‌বুটেড্‌ টাইয়ের নটটি পর্যন্ত নিখুঁত। আমি চুকতেই, সে তার কাঁচা-পাকা চুলে, শেষবারের মতো চিরুনি টেনে, আমার দিকে ফিরলো। অর্থাৎ, তার বাইরে যাবার পোশাকে সে সজ্জিত। আমার দিকে ফিরে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, ‘সব ঠিক আছে? কোনো গোলমাল নেই?’

আমি মুখের একটু নিবিকার ভাব করে বললাম, ‘এসো।’

বন্ধু ঝটিতি গেলাস তুলে চুম্বক দিয়ে, অগন্ধি মাখানো রুমাল পকেট থেকে নিয়ে, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললো, ‘মানে, এটুকু নষ্ট হয়ে যাবে কী না তাই—’

সে কথা শেষ করলো না। আমি বললাম, ‘এসো।’

আসলে ইচ্ছা করছিল, তার কাঁচা পাকা চুলের খুঁটি ধরে টেনে দিই। আমার পিছনে পিছনে সে ড্রয়িংরুমে এলো, যেন বড়ই লজ্জিত এবং অসহায় ভাব নিয়ে। ফুলকলি উঠে দাঁড়ালো। আমি ওকে বললাম, ‘তুমি বোসো। আমার বন্ধু পুরন্দর ভট্টাচার্য।’

পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘মিস ঘোষ, ফুলকলি ঘোষ।’

পুরন্দর বলো উঠলো, ‘চমৎকার।’ বলেই, তাড়াতাড়ি মুখে রুমাল চাপা দিল। বিদেশী স্মৃগন্ধীর গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে।

ফুলকলি বসতে বসতে আমার দিকে তাকালো। ফুলকলির চোখের তারায় হাসির ঝিলিক, যদিও মুখে গান্ধীর্ষ বজায় রাখার চেষ্টা। পুরন্দরের মুখে রুমাল চাপা দেওয়ার ভঙ্গি দেখলে, হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক।

পুরন্দর দাঁড়িয়ে ছিল আড়ষ্ট হয়ে। আমি বললাম, ‘তোমার বাড়িতে কি তোমাকেও বসতে অস্বস্তি করতে হবে নাকি?’

পুরন্দর মুখে রুমাল চাপা দেওয়া অবস্থায় গোড়ানো স্বরে একটা কিছু বললো এবং তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে, দূরের একটা সিঁদুল সোফায় বসলো। আমি ফুলকলির পাশের সোফায় বসলাম। পুরন্দরের দিকে তাকালাম। তার দৃষ্টি তখন ফুলকলির দিকে। কিন্তু মুখে সেই রুমাল চাপা। ফুলকলির দৃষ্টি আমার দিকে। সমস্ত ছবিটা এক দিকে যেমন আড়ষ্টজনক, তেমনি হাস্যকর। আমি পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘দয়া করে মুখ থেকে রুমালটা নামাও। তোমার বাড়িতে একজন মহিলা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলো।’

পুরন্দর তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে রুমালটা নামিয়ে, ফুলকলির দিকে তাকিয়ে হাসলো। ফুলকলির হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে মুখ নামালো এবং ওর সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

পুরন্দর অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো, ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কী হলো ওঁর?’

ফুলকলি যে ওর হাসির বেগ সামলাতে পারছে না, তা জানি। সেটা সংক্রামিত হচ্ছিল আমার মধ্যেও। পুরন্দরকে বললাম, ‘তুমিই জিজ্ঞেস করো না।’

পুরন্দর অবাক স্বরেই বললো, ‘আমি জিজ্ঞেস করব?’

ফুলকলি এবার লম্বা হেসে উঠলো, চাপা দেবার চেষ্টা করলো, হাতের ব্যাগটা মুখের কাছ ধরে।

আমি পূরন্দরের দিকে ফিরে বললাম, ‘তা তুমি যদি ও ভাবে মুখে কামাল চাপা দিয়ে থাকো, তারপর হঠাৎ দস্ত বিকলিত করে হাসো, দেখলে হাসি পাবে না?’

ফুলকলি নিজেই সামলে নিয়ে, সারা চোখে মুখে রক্তিম ছটা নিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললো, ‘মাক করবেন, আমি ঠিক ইয়ে করতে পারিনি।’

পূরন্দর বললো, ‘না না, মাক চাইবার কী আছে, ও রকম বলবেন না। আমার আচরণটাই একটু ইয়ে, মানে—’

সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি বললাম, ‘মানে হাস্যকর।’

পূরন্দর হেসে উঠে বললো, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, হাস্যকর।’ বলেই, সে ভ্রুকুটি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘তার মানে?’

ফুলকলি এবার আর শব্দটাকে সামলাতে পারলো না, খিলখিল করে বেছে উঠলো। আমিও হেসে উঠলাম। পূরন্দর বলে উঠলো, ‘শালা!’ বলেই, ধতিয়ে গিয়ে, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টাই ধরে টানাটানি করতে লাগলো।

এই সময়ে নিত্যানন্দ ঢুকলো, চায়ের ট্রে নিয়ে। সেন্টার টেবলে ট্রে রেখে সে চলে গেল। পূরন্দর তাড়াতাড়ি উঠে, নিজেই চা তৈরি করতে উদ্যত হলো। ফুলকলি একবার আমার দিকে তাকিয়ে পূরন্দরের দিকে ফিরে বললো, ‘আপনি রাখুন আমি চা করছি।’

পূরন্দর বললো, ‘না না, আপনি কেন করবেন। আমার বাড়িতে আমিই চা করছি।’

ফুলকলি আবার আমার দিকে তাকালো। আমি পূরন্দরকে বললাম, ‘ছেড়ে দাও। যা করার অভ্যাস নেই, হঠাৎ তা করতে যাওয়ার দরকার কী? চা-ও নষ্ট হবে, নিজের হাত-টাতও পোড়াবে।’

পূরন্দর ভ্রুকুটি করে, ধমকের স্বরে বললো, ‘তার মানে কী? আমি কি চা করতে পারি না?’

আমি নির্বিকার ভাবেই বললাম, ‘কোনোদিন দেখিনি কী না, তা-ই বলছি। তবে ফুলকলিকে নিজের হাতে চা করে খাওয়াবে বলে যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে থাকো, করো। কিছু বলবার নেই।’

পূরন্দর কী বলবে ভেবে পেল না। চকিতে একবার ফুলকলিকে দেখে নিয়ে, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘প্রতিজ্ঞা মানে? প্রতিজ্ঞা করব কেন?’

এবার ফুলকলি পুরন্দরকে বললো, ‘গুর কথা আপনি ধরবেন না। আপনার বন্ধুকে নিশ্চয় আমার থেকে আপনি বেশি চেনেন!’

পুরন্দর বলে উঠলো, ‘চিনি না মানে? মিট্‌মিটে ডান।’ কথাটা বলেই, পুরন্দর খতিয়ে গিয়ে, ঝটিতি একবার জিভ কেটে বললো, ‘মাফ করবেন মিস ঘোষ। মানে, আমি ঠিক—।’

‘আপনি একটুও বেঠিক কিছু বলেননি।’ ফুলকলি চকিতে একবার আমাকে চোখের কোণে দেখে নিয়ে, আবার বললো, ‘আপনার বন্ধুকে আপনি যে রকম বলে থাকেন, সেই রকমই বলেছেন। আমার জ্ঞান সংকোচ করবেন না, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে। তবে, চা-টা আমাকে করতে দিলে আমি খুশি হবো।’

পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে বললো, ‘নিশ্চয় নিশ্চয়।’ বলে, সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। হাসির অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু ফুলকলির বচনে আমি একটু অবাক হলাম। ও বেশ সহজ হয়ে উঠেছে এবং পুরন্দরকে একটু উসকে দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। প্রবণতাটা নিষ্পাপ এবং কিছুটা আবহাওয়াটাকে খুশির মেজাজে সহজ করার চেষ্টা। তবু আমি বললাম, ‘তার মানে বলতে চাও, আমার বন্ধুর আমি শালা এবং আমি একটি মিট্‌মিটে ডান?’

ফুলকলির এখন বসার ভঙ্গিটি সুন্দর। সোফা ছেড়ে গালিচার ওপর হাঁটু পেতে শাড়ি ছড়িয়ে বসে, কাপে কাপে চা ঢালছে। সেই অবস্থাতেই, ও পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘পুরন্দরবাবু, আপনিই জবাব দিন, উনি আসলে আপনাকেই জিজ্ঞেস করেছেন।’

পুরন্দর ভ্রূট করে বললো, ‘তুমি আমার শালা হবে কেন? শালা তো আমি—ইয়ে মানে, এমনিই বলি।’ বলেই ফুলকলির দিকে কিরে তাড়াতাড়ি বললো, ‘মাফ করবেন মিস ঘোষ।’

ফুলকলি হেসে বললো, ‘মাফ চাইবার এতে কিছুই নেই। আপনি বন্ধুর সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলুন, সেটাই আমি চাই। বলেছি তো, আমার জ্ঞান সংকোচ করবেন না, তাহলে আমার খারাপ লাগবে।’

ফুলকলি ঠোট টিপে, হাসি চেপে, চা করতে লাগলো। পুরন্দর উৎসাহিত হয়ে বললো, ‘আর মিট্‌মিটে ডান? তার চেয়েও যদি বেশি কিছু হয়, তুমি তা-ই। তুমি একটি ভিজ্জে বেড়াল, ভাব করো যেন, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।’

আমি ফুলকলির প্রতিক্রিয়া দেখছি। ভিতরের রুদ্ধ হাসির উচ্ছ্বাসে,

ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, চা তৈরি করতে গিয়ে হাতের অবস্থা ঠিক থাকছে না।

পুরন্দর ফুলকলির দিকে ফিরে বললো, ‘তা নইলে আপনি ভাবতে পারেন মিস ঘোষ, ভি. টি. থেকে আমার এখানে আসবে বলে আগে থেকে ঠিকঠাক, অথচ আমার ডাইভারকে কেবল পাঠিয়ে নিজে একটি ফুলকুমারীর সঙ্গে হাওয়া! আপনিই বলুন।’

এবার আমারই হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছা করলো। ফুলকলি তাড়াতাড়ি মুখ লাল করে বললো, ‘পুরন্দরবাবু, ফুলকুমারী না, ভি. টি. থেকে আমিই ওকে নিয়ে গেছলাম, আমার নাম ফুলকলি।’

পুরন্দরও সমান অপ্রস্তুত এবং মুখ লাল করে বললো, ‘এই দেখুন, একদম ভুল হয়ে গেছে, মানে—আপনিই যে তিনি—।’

পুরন্দর কথা শেষ করতে পারলো না। আমি বললাম, ‘একেই বোধ হয় খেলায় সেম্‌সাইড বলে।’

ফুলকলি আগে পুরন্দরের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘আমার তা মনে হয় না। পুরন্দরবাবু বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন আপনার ওটাই বৈশিষ্ট্য। কখন কার সঙ্গে কোথায় চলে যাবেন, কোনো ঠিক নেই। তাই না পুরন্দরবাবু?’

পুরন্দর তৎক্ষণাৎ হেসে বললো, ‘হাণ্ডেড পার্গেট কারেক্ট আপনি। আমি ঠিক এটাই বলতে চেয়েছিলাম। তা না হলে, আপনি ভাবতে পারেন, এর আগেরবার যখন এল, তিনদিনের জন্য কোনো পাত্তাই ছিল না? আমার মতো লোক, ভেবে অস্থির। তারপর কে পৌঁছে দিয়ে গেল জানেন?’

আমি পুরন্দরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললাম, ‘পুরন্দর, ব্যাপারটা কী? তুমি হঠাৎ একেবারে এতটা উদার হয়ে উঠলে কেন?’

ফুলকলি বললো, ‘আর বলবেন না পুরন্দরবাবু। অনেকটা বলে ফেলেছেন, কে পৌঁছে দিয়ে গেছিলেন তাঁর নামটা আর বলবেন না।’ বলে, ও আমার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল। দৃষ্টি বিনিময় হলো চকিতে।

পুরন্দর বললো, ‘তা ঠিক।’

আমি বললাম, ‘না তা ঠিক না। বন্ধুদের মাঝখানে কোনো কথা বলতে গিয়ে চূপ করে যাওয়া মোটেই ঠিক না। ফুলকলিও আমাদের বন্ধু, এটা নিশ্চয়ই বলা যায়?’

আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ফুলকলি আমার দিকে না তাকিয়েই

বললো, ‘সেটা আমার সৌভাগ্য, কিন্তু বন্ধুকে সব কথা বলার দরকার কী?’

পূরন্দর হেসে উঠে বললো, ‘ঠিক বলেছেন মিস ঘোষ। আপনার সঙ্গে গুরুত্ব সম্পর্ক, সেটা কেবল বন্ধুত্ব না, তার বেশি কিছু, সেইজন্যই—।’

ফুলকলি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, ‘না না, বেশি কিছু কী আবার?’

পূরন্দর হকচকিয়ে জুঁকুটি চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপরে লজ্জিত হেসে গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, ‘না মানে আমি সে রকম কিছু মীন্ করিনি। বন্ধু, ইয়া, বন্ধুই তো। আমি তো তা-ই বলছিলাম।’

আমি আমার উচ্চহাসি রোধ করতে পারলাম না, যাকে বলে, হা হা করে হেসে উঠলাম।

ফুলকলির অবস্থা খুব খারাপ, ততোধিক পূরন্দরের। কিন্তু সে বলে উঠলো, ‘হাসি তুললে পিঁপ্টি জলে যায়।’

ফুলকলি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, ‘চমৎকার বলেছেন। আপনি সত্যি খুব সন্দেহ কথা বলতে পারেন।’

পূরন্দর ফুলকলির দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমার হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। পূরন্দর জুঁকুটি করে বললো, ‘ইচ্ছে করে শালার গলা টিপে দিই।’

ফুলকলি চমকে উঠে শব্দ করলো, ‘ঐ!’

পূরন্দর তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললো, ‘না না, এমনি বললাম, মানে—কথার কথা আর কী! পাগলের মতো এ রকম হাসবার কোনো মানে হয়?’

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, ‘শাক, এখন একটু কাজের কথা হোক। তোমার কি আজ কাজে বেরোতে হবে?’ বলে পূরন্দরের দিকে তাকালাম।

পূরন্দর হাতের ঘড়ি দেখে চমকে উঠে বললো, ‘মাই গড, আয়াম্ অলরেডি লেট! এক্সকিউজ্ মী মিস ঘোষ—।’ বলেই, সে গলা চড়িয়ে ডাকলো, ‘নেভা, নেভা!’

নিত্যানন্দ পুরো হিরোর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বললো, ‘ইয়েস স্যার!’

পূরন্দর বললো, ‘শোন আমি বেকছি, এঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর। ঘরে কিছু আছে তো?’

নিত্যানন্দ বললো, ‘সবই আছে, এখনি তৈরি হয়ে যাবে।’

ফুলকলি আমার দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি পূরন্দরকে

বললাম, ‘আমি এখন এখানে চান করে, জামা-কাপড় বদলে, ফুলকলিদের বাড়ি যাব, ওদের বাড়িতেই থাকব।’

পুরন্দর বলে উঠলো, ‘তার মানে ওখানেই থাকবে?’

তার স্বরে অসন্তোষ গোপন থাকে না। আমি বললাম, ‘না, থাকব না, রাজের দিকে ফিরে আসব। তুমি তো জানো, আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে, দু’দিনের কাজ।’

পুরন্দর বললো, ‘জানি। তার মানে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না।’

আমি বললাম, ‘কে বললো দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না? তা ছাড়াও আমি কয়েকদিন এখানে থাকব।’

পুরন্দর বলে উঠলো, ‘জানি, তারপরে তুমি দক্ষিণাত্যে যাবে, চিঠিতে সেই রকমই লিখেছিলে।’

আমার সঙ্গে একবার ফুলকলির দৃষ্টি বিনিময় হলো, বললাম, ‘সেই রকমই ইচ্ছা আছে।’

পুরন্দর বলে উঠলো, ‘ঝেড়ে কাসো! অর্ধেক পেটে রেখে অর্ধেক মুখে বোলো না। এখানে যে ক’দিন থাকবে, সেটা কী রকম থাকা হবে?’

আমি একটু হেসে বললাম, ‘তোমার সঙ্গে আর ফুলকলিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব।’

পুরন্দর জিজ্ঞেস করলো, ‘সেটা কী রকম? এই মিলেমিশে থাকাটা?’

ফুলকলির স্থির অপলক দৃষ্টি আমার দিকে। আমি বললাম, ‘মিলেমিশে থাকা মানে, ধরো, তোমার এখানেও রইলাম, ওদের ওখানেও রইলাম।’

পুরন্দর ফুলকলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কী মনে করেন? এটাকে মিলেমিশে থাকা বলে?’

ফুলকলি স্পষ্ট স্বরে বললো, ‘এটাকে দু’ নোকোয় পা রাখা বলে।’

‘গুড, ভেরি ওয়েল সেড্।’ বলেই পুরন্দর ফুলকলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং তৎক্ষণাত্ হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, ‘স্তরি।’

ফুলকলি বললো, ‘স্তরি বলছেন কেন? আমি অন্বর্থনাত্মক অন্তঃপুরিকা নাকি? আপনার অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য ধন্যবাদ।’ বলে ও পুরন্দরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

পুরন্দরই একটু অপ্রস্তুত বিব্রত ভাবে আলতো করে ফুলকলির হাত স্পর্শ করলো।

ফুলকলি বললো, 'সেইজন্য আমি বলছিলাম কী, আপনার বন্ধু যে ক'দিন বসে আছেন সে ক'দিন আপনিও আমাদের অতিথি হবেন।'

পুরন্দর বিভ্রান্ত বিন্দুতে বললো, 'আমি অতিথি আপনারা? কিন্তু আমার যে একেবারে সময়ই নেই। আমার কোনো কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। কখন খাই, কখন শুই কিছু ঠিক নেই। কারো অতিথি হবার যোগ্যতাই আমার নেই।'

ফুলকলি আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'কথাটা অবিশ্বাস্য একেবারে মিথ্যা না। আমি গুর এখানে এসে যখন থাকি, সকাল বেলায় দিকে বা একটু দেখা হয়। একমাত্র রবিবার ছাড়া। রবিবার সারাদিন পাওয়া যায়। তবে পুরন্দর যদি গুর রুটিন একটু চেঞ্জ করে—' আমি কথাটা শেষ না করে পুরন্দরের দিকে তাকালাম।

পুরন্দর জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী রকম?'

বললাম, 'এই ধরো, তুমি যদি অফিস থেকে বেরিয়ে ফুলকলিদের বাড়ি আসো।'

পুরন্দর বলে উঠলো, 'রাড্ডে? অসম্ভব! রাড্ডে কারো বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এ ভাবেই বা কত দিন চালাবে? রাড্ডে দুটো তিনটে খাবে, শোবে, এ সব একটু ছাড়ো না।'

পুরন্দর ভ্রূকুটি চোখে আমার দিকে তাকালো এবং সম্ভবত কিছু ইশারা করারও চেষ্টা করলো। আমি না দেখতে পাওয়ার ভান করে বললাম, 'তোমার কোম্পানি অবিশ্বাস্য, তোমার খুশি মতো কাজ মেনে নিয়েছে, কারণ তাদের কোনো লোকসান নেই। কিন্তু জীবনটা খুশিমত চালাবার জিনিস না। না হয় কয়েকদিন, একটু তাড়াতাড়ি খেলে শুলে। সেটাও তো একটা নতুন। একঘেয়ে, রোজ এক রকম কাটাতে কি ভালো লাগে?'

পুরন্দর এবার কটমট করে আমার দিকে তাকালো, এবং কিছু বলতে উত্তত হতেই, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'যা বলবে, একটু রেখে ঢেকে বসো। আমি কিন্তু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না। ফুলকলি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটা তোমার প্রত্যাখ্যান করা কি উচিত?'

পুরন্দর থানিকটা অসহায় ভাবে ফুলকলির দিকে তাকালো, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রত্যাখ্যান মানে রিফিউজ? না না, আমি রিফিউজ করব কেন? আসলে আমার রাত করাটাও কাজেরই ব্যাপার, অনেকের সঙ্গে আমাকে সময় কাটাতে হয়।'

ফুলকলি বললো, ‘এক আধদিনও কি সেটা একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না?’

পুরন্দর একবার আমাকে দেখে নিয়ে লজ্জিত ভাবে বললো, ‘হ্যাঁ, না, মানে হয়তো করা যায়, কিন্তু আমি রাগে—মানে—ইয়ে—হয়তো আপনাদের বাড়ির গুরুজনেরা অসন্তুষ্ট হবেন।’

ফুলকলি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো। পুরন্দরের সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি। সে তার স্বপ্নাপানের কথাটা খোলাখুলি ব্যক্ত করতে পারছে না। আমি বললাম, ‘এক-আধদিন না হয় একটু অল্প-সল্পর ওপর দিয়ে সারবে। একটু স্টেডি থেকে, গল্পগুজব করবে, তাতে ক্ষতি কী?’

আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও বললো, ‘কিছুই না। গুরুজনের মধ্যে আছেন আমার মা। মা তেমন খুঁতখুঁতে নন। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।’

পুরন্দর হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ালো, বললো, ‘অসুবিধে আমার না, আপনাদেরই। পরেও নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, একটা দিন ঠিক করে আমি যাব। আর আপনাকে বলা রইলো, আপনি যখন খুশি এখানে আসবেন কোনো সংকোচ করবেন না। আর এ যাত্রাটা—’ বলে পুরন্দর একবার আমার দিকে তাকালো, তারপরে বললো, ‘বুঝলেন মিস ঘোষ, আমার এই বাউগুলের আশ্রয়ের থেকে, ওকে আপনাদের কাছেই রাখুন।’

ফুলকলি বলে উঠলো, ‘এই অহুমতিটাই আপনার কাছে চাইছিলাম।’ বলেই, ফুলকলি লজ্জিত হয়ে পড়লো এবং আবার বললো, ‘কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি আসছেন।’

আমি বললাম, ‘পুরন্দর, তোমার এই সাজানো ক্ল্যাট যদি বাউগুলের আস্তানা হয়, তাহলে বাবুর বাড়ি কাকে বলে জানি না।’

পুরন্দর ফুলকলির দিকে ফিরে বললো, ‘মিস ঘোষ, আমি দেয় করতে পারছি না, আমাকে অহুমতি করুন, বেরোচ্ছি।’

পুরন্দরের বিনয় দেখে অবাক হচ্ছি। নিতান্ত মেয়ে বলেই তাকে এতটা কেতাছুয়ন্ত হতে হচ্ছে।

ফুলকলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘নিশ্চয়।’

পুরন্দর বাইরের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আমার দিকে ফিরে বললো, ‘একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।’

এ রকম ব্যাপার আমি খানিকটা অহুমান করেছিলাম। কিছু না বলে

ফুলকলির দিকে একবার দেখে, পুরন্দরের সঙ্গে ঘরের বাইরে এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াল। সে প্রথমেই আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, ‘কোথা থেকে তুই এ সব জোটাস্ বন্ দেখি?’

অবাক হয়ে বললাম, ‘জোটাৰ আবার কী, ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পজালাপ।’

পুরন্দর ম্খটা বিকৃত করে বললো, ‘তা শালা পজালাপই হোক আর প্রেমলাপই হোক, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তুমি জানো না, আমি কোথাও কারো বাড়ি যাই না? তুমি লেখক মানুষ, অনেক গ্রাকামো তোমার জানা আছে, আমি ও সব জানি না, পারিও না। আমাকে মজাবার কী সরকার ছিল?’

আমি নির্বিকার তৃষ্ণীভাব ধারণ করলাম, কিছু বললাম না।

পুরন্দর এলিভেটরের বোতাম টিপে বললো, ‘বেশ তো রূপসীটি পেয়েছ, বিদূষীও বটে। আমার এই গ্যাটটা তো ছিল, আবার ওদের বাড়ি কেন? ওকে নিয়ে এখানে কাটালেই তো পারতে?’

আমি বললাম, ‘ছি ছি, কী যা তা বলছো? ওর বিষয়ে কিছু না জেনেই, যা-তা বোলো না।’

এলিভেটর উঠতে আরম্ভ করেছে। পুরন্দর বললো, ‘হতে পারি বিপরীক, তা বলে কি মেয়েদের চোখের চাউনি-টাউনি দেখে, কিছুই বুঝি না? ওকে দেখে তো মনে হচ্ছে, গলায় লটকাতে পারলেই হয়।’

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘আহ পুরন্দর।’

‘চোপ শালা। তোমাকে চিনি না?’ পুরন্দর এলিভেটরে উঠতে উঠতে বললো, ‘মেয়েটা ভালো, তা আমি জানি। মরেছে রাই কিসের জন্ত তাও কি বুঝি না? শালা কালকূট।’

আমি বাধ্য হয়ে পুরন্দরের সঙ্গে এলিভেটরে ঢুকে পড়লাম। এলিভেটর নামতে লাগলো। পুরন্দর অবাক হয়ে বললো, ‘কোথায় চললে?’

বললাম, ‘পুরন্দর, তোমার কথাবার্তা খুবই আপত্তিকর। আমি ফুলকলিকে এখান থেকেই বিদায় করে দিচ্ছি।’

পুরন্দর হাসলো, আমার কাঁধে একটা হাত রাখলো, বললো, ‘ও মেয়েটি তোমার ভক্ত পাঠিকা হতে পারে, কিন্তু ওকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। তোমার কাছে আমার একটি নিবেদন, ওকে ছুঁতে দিও না।’

এলিভেটর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে থামলো। পুরন্দর বোতাম টিপে ধরে

‘এক মুহূর্ত দাঁড়ালো, আবার বললো, ‘আমার কথায় ধরন-ধারণ তুমি ভালোই জানো, কী বলতে চেয়েছি, তাও তুমি ঠিকই বোঝ। মনে রেখ, ও আমার কাছ থেকে তোমাকে নিতে এসেছে, মানে চাইতে এসেছে। যাও। আবার বলছি, ওকে ছুঁখ দিও না।’ বলেই পুরন্দর এলিভেটরের বাইরে গিয়ে, ছুটো গেটই আটকে দিল। চকিতের জন্ম মনে হলো, পুরন্দরের চোখ ছুটো যেন ছলছলিয়ে উঠেছে। আমার বোতাম টেপার আগেই এলিভেটরের ওপরে উঠতে লাগলো। পুরন্দরের জীবনের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। জীবনের একটা বেগে আমরা সবাই ছুটে চলেছি, নানা ভাবে, নানা দিকে।

আপাত দৃষ্টিতে পুরন্দরকে মনে হয়, তার সারা দিনের জীবনটার মধ্যে, মাহুঘের বৈবয়িক বুদ্ধির সঙ্গে নানা সংগ্রাম করা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা না। মাহুঘকে দেখবার এবং বোঝবার দৃষ্টি আর অহুত্বটিও ওর আছে। সেটা কারোকে জানতে বা বুঝতে দিতে চায় না। সম্ভবত ব্যাধিতের জীবনের চেহারা এই রকমই হয়। ফুলকলিও কি পুরন্দরের মতোই একজন ব্যাধিত? অন্তর্ধায় তার মধ্যে এ বেদনা কিসের?

এলিভেটর থামতেই, নামতে গিয়ে দেখলাম, দুইতলা বেশি ওপরে উঠে এসেছি। এক মহিলা দরজা খুলে, দুটি শিশুকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। আমি আগে পাঁচ নম্বরের বোতাম টিপলাম। যথাস্থানে নেমে, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে পুরন্দরের স্ন্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, খোলা দরজার সামনে ফুলকলি দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী ব্যাপার, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন?’

ফুলকলি বললো, ‘ব্যাপারটা আমিই জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। কোথায় গেছিলেন, নিচে নাকি?’

হেসে বললাম, ‘হ্যাঁ নিচে। মানে, লিফ্টে নামতে নামতে কথা বলছিলাম।’

ফুলকলি দরজা থেকে সরে গিয়ে আমাকে ঢোকবার জায়গা দিল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে, আমার পিছনে আসতে আসতে বললো, ‘আপনাদের বন্ধুদের যা নমুনা দেখলাম, ভাবলাম, আমার কথা ভুলে হয়তো দুই বন্ধু কোথাও চলেই গেলেন।’

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমাদের বন্ধুদের নমুনাটা কি এতটাই আশ্চর্য্যকর বলে মনে হলো?’

ফুলকলি হেসে বললো, 'প্রায়। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, এবার চান করে আসুন দয়া করে।'

আমি বললাম, 'অবিশ্বাস্যই। তার আগে একটু শুনি, কেমন লাগলো আমার বন্ধুকে?'

ফুলকলি বললো, 'প্রথম দর্শনে যতোটা ভয় পেয়েছিলাম, দ্বিতীয় দর্শনে ততোটাই সাহস পেয়েছি।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তা তো দেখতেই পেলাম। দু'জনে এককাটা হয়ে আমার পেছনে লেগে গেলে।'

ফুলকলি বললো, 'কিন্তু উনি তাতেও অনেক সময়সাইড করে ফেলছিলেন।' বলে ও খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমি বললাম, 'ওটা তোমারই গুণে।'

ফুলকলি জ্রুটি করে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রকম?'

বললাম, 'অত্যুৎসাহে। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, মেয়েদের সামনে ও একটু গোবেচারা হয়ে যায়। আর তা হলেই, মাহুঘের মস্তিষ্কের ভারসাম্য কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হয়ে যায়।'

ফুলকলি বললো, 'তাহলে সেটা আমার গুণ বলবেন না, বলুন দোষ। কিন্তু আপনার বন্ধুকে আমার একেবারও গোবেচারা বলে মনে হয়নি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী মনে হলো, বলোতো?'

ফুলকলি একটু ভেবে বললো, 'মনে হবার মতো আর দেখলাম কোথায়? তবে একটা ব্যাপার বুঝেছি, উনি একদিকে ভীষণ কাজের মাহুঘ, আর একদিকে ঠিক অতটাই যেন অগোছালো। আপনাকে খুব ভালোবাসেন।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'আমাকে ভালোবাসাটা কোনো বৈশিষ্ট্য না। তুমি অনেকটাই ঠিক বলেছ, কিন্তু তোমার চোখে যেটা ফাঁকি যাওয়া উচিত ছিল না, সেটা হলো, আমার বন্ধু একটি দুঃখী মাহুঘ।'

ফুলকলি এক মুহূর্তের জগ্ন অগ্নমনস্ক হলো, তারপরে বললো, 'কালকূটের নামনে আমি আর কতটুকু বলতে পারি? সংসারে তো দুঃখী মাহুঘের সংখ্যাই বেশি, তাই না?'

আমি ভিতরে যেতে যেতে বললাম, 'জবাব তো তোমার জানাই আছে।'

পৌছবার দ্বিটি কাটলো যেন একটা উৎসবের মধ্যে। একটি পারিবারিক উৎসব, যার মধ্যে অনেক হাসি ঠাট্টা এবং যাকে বলে, খুনসুটি ঝগড়া, বিশেষ

করে কুমকলি আর ফুলকলির মধ্যে যদিও সেই ঝগড়াও ছিল, হাসি ও কৌতুকে ভরা। ওদের মায়ের মুখ ভরা ছিল স্নিগ্ধ হাসির কিরণে।

তারপরে দুটো দিন, আমি নিজে ছিলাম, বিশেষ কাজে ব্যস্ত, সংসারের মাহুয যার নাম দিয়েছে তিন্ত বাস্তবতা মাহুযের জীবনের বাস্তবতা, সেটাই সবখানি না এবং সে ক্ষেত্রে বাস্তবের স্বরূপ বিষয়েও আমার ধারণা ভিন্ন। জীবনের বাস্তবতার নানা দিক আছে। আমার ব্যস্ততাও, বাস্তবের একটা দিক মাত্র। অনেক তর্ক বিতর্ক সংশয় অবিশ্বাস, নিয়ম-নীতি আইন ঘাটীঘাটি করে শেষদিকে স্বস্তি-হাসির মধ্যে কাজ সমাধা হয়েছে।

কিন্তু যেটা কখনই অলক্ষ্যে রাখা সম্ভব হলো না, সেটা হলো ফুলকলির নিয়ত সঙ্গ। নিজের কাজের কথা ওর মনেই পড়লো না, আমার কাজের সময়টাও ও আমার সঙ্গেই কাটিয়েছে; কারোকে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি, মনে মনে অস্থিত্তি বোধ করেছি। কিন্তু ওকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। জবাব ছিল ওর একটাই, কালকূটও তো কাজ-থেকে ছুটি নিয়ে অকাজেই বেশি থাকতে চায়। আমি সারা জীবন ধরে কেবল কাজ আর কর্তব্যই করে এসেছি। অকাজের স্বাদটা আমারও পেতে ইচ্ছে করছে, ক'দিনের জুতাই বা ?

তা ঠিক, তথাপি নিজের কাছে, একান্তে একটা কথা কবুল না করেও পারছি না। যে আশ্রয়টাকে আমি পাখির বাসা নাম দিয়েছি, তার উষ্ণ কোমলতা আমি উপভোগ করছি, একটা ব্যথা ছোঁয়ানো স্থলের মধ্যেই। কিন্তু একটা পাখি ক্রমাগত আমার ঘর-বিবাহী প্রাণের একটা দিক জুড়ে তার নরম পাখা বিস্তার করে চলেছে। তার চোখের দিকে তাকালে, আমার নিজের ভিতরটাই কেঁপে যায়। কোথায় একটা কষ্ট বিঁধে যায়, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। পাখিটা তার নিজের প্রাণে মনে যেমন সহজ আর রঙীন হয়ে ওঠে, আমার কাছে সেটাই অসহজ, আর রঙের ঝলকটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। পেয়ে উঠি না সব সময়ে, অভিমানব হবার মন্ত্রটা কোনোকালে আরস্ত করতে পারিনি।

অতিকথন অনাবশ্যক, পাখিটার নাম ফুলকলি। পূর্ব শর্তাঙ্কযায়ী, ওকে আমি কলি বলে সম্বোধন করি, অনেক আগে, চোখে না দেখেই, চিঠির ভাষে। এ সব কথা বলা যাবে না, যা চিঠিতে লেখালেখি বলাবলি হয়েছে, এখন তার থেকে নতুন কিছু ঘটছে। কিন্তু যা ছিল চিঠির ভাষার আদান প্রদানে, এখন সেই পত্রের লেখক-লেখিকার পুরস্কারের মুখোমুখি। যে সব কথা অনায়াসে লেখা গিয়েছিল, সে কথাগুলোই সামান্যসামান্য বলতে গিয়ে,

দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে, তার অর্থ যেন বদলে যাচ্ছে। হাসিতে বদলে যাচ্ছে তার রঙ। স্বরের মধ্যে হ্রস্ব মিশে গিয়ে, তা শোনাচ্ছে অন্য এক গানের মতো। চিঠির যে কথায় বাষ্পের সংকেত ছিল, এখন তা চোখের কোণে টলটলিয়ে উঠছে।

আমার এবারের যাত্রাটা, জেলমিনের রক্তের দাগে দাগানো। পথ চলার, সেটাও যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত ছিল, আপাতত ফুলকলির এই আত্ম-প্রকাশও তাই। পূর্ব চিন্তাহুয়ারী পুরস্কারের ঘরে আমার বাস করা সম্ভব হয়নি। অধিক রাজে ফুলকলি যখন বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে, তার অশেষ কথা বুকে নিয়ে, তখন দেখেছি, দূরের অন্ধকারে মায়ের বুকে মেয়ে পাতা পেতে রয়েছে। পক্ষিণী মায়ের দৃষ্টি যেমন সজাগ, তেমনি কঙ্কার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের জানাজানিটাও স্পষ্ট।

ইতিমধ্যে পুরস্কার এক রাজে, ফুলকলিদের বাড়ি এসেছিল। মেজাজ তার বেশ প্রসন্নই ছিল। যাত্রাতিরিক্ত না হলেও, সে পান করে এসেছিল। কোটের পকেটে এনেছিল পানীয়র বোতল। ইচ্ছাটা, সম্মতি সাপেক্ষে অধিকন্তু ন দোষায়। সম্মতি সে পেয়েছিল, আসর জমিয়েছিল কুম্ভকলিও। পুরস্কারের পানীয় সে নিজের পাত্রে নিয়ে, কিঞ্চিৎ পান করে শালানি বহুনি এবং হাসাহাসির যাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। রান্নাঘরে মায়ের কাছে ছুটি পেতে দেয়ি হয়েছিল কুম্ভকলির।

কুম্ভকলির পক্ষে, সেই আসর ছিল কিছুটা বিধা ও সংকোচের। সেটা কাটিয়ে উঠে ও গান ধরেছিল, অবিশ্রি ওর দ্বিহাদের অহরোধ আর নির্দেশেই। কুম্ভকলি যে এমন গান গাইতে পারে, ক'দিনের মধ্যে, একবারও জানতে পারিনি। গান শুনে মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের থেকে অভুলপ্রসাদেই ওর দখল বেশি। কিন্তু অব্যক্ত কী না জানি না, কুম্ভকলির গানের এক সময়ে দেখা গিয়েছিল, পুরস্কার চোখের জলে ভাসছে। ওর বাইরের পরিচরটা ডাকসাইটে মিঃ ভট্টাচার্য্য। কে জানতো, পাথর চিড় খায়, আর তার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে জলের ধারা। অবিশ্রি পুরস্কার দ্রুত নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছিল। তবু আর যেমন তার স্বতন্ত্র ভাবটি দেখা যায়নি, তেমনি আসরটাও কেমন যেন ভিজে উঠেছিল। পুরস্কার রাজে বিদায় নেবার সময় আমাকে আলাদা পেয়ে বলেছিল, 'শালা, তোমার সঙ্গে জীবনে আমার এই শেষ। যত আজোবাজে জায়গায় নিয়ে এসে মেজাজ খারাপ করিয়ে দেওয়া।...'

হেসেছিলাম। সেটাকে কি হাসি বলে, জানি না।

অতঃপর বসে থেকে বিদ্যায়ের পালা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বলতে আমি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের কথা কখনই ভাবিনি। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের নিদর্শন, অজস্র গুহাচিত্র আর ইলোরার ভাস্কর্য দর্শন। প্রত্যাবর্তনের পথটাও মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। ঔরঙ্গাবাদ থেকে পুনরায় বসে না, নিচের দিকে, হায়দ্রাবাদ হয়ে, ভিন্ন কুলের বঙ্গোপসাগরের বাতাস গায়ে মাখতে মাখতে কলকাতা।

পথের কথা ভেবে রেখেছিলাম, পথের ধাঁকের কথাটা মনে রাখিনি। সেটা জানা গেল যাত্রার প্রায় পূর্বমুহুর্তে বলা যায়। যাত্রার আগের দিন ভয়ভূপুরে ফুলকলি ঘরের নিয়ালায় ঘোষণা করলো, ‘আপনার বোঝা হয়ে যাব না, একসঙ্গে অজস্র ইলোরা দেখব। আমার আয়োজন হয়ে গেছে, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?’

প্রথমটা ঠেক খেলাম, যেন কথাগুলোর ঠিক অর্থ বুঝে উঠতে পারলাম না। ফুলকলি আবার বললো, ‘এত কাছে থাকতেও কোনোদিন যাইনি, এবার আর পাকতে পারলাম না। খুবই অসুবিধে হবে না তো?’

আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। কিন্তু চোখ নামিয়ে নিল এমন ভাবে যেন, ও একটি যুগপৎ লজ্জিত ও অপরাধী মেয়ে। অতঃপরেও আমার বোঝার কিছু বাকী ছিল না। কিন্তু যে আকর্ষণের টানে যাচ্ছিলাম, ওর মধ্যে একটি মগ্নভাবনার বিষয় ছিল, যার অংশীদার কারোকে করতে চাইনি। এই না চাওয়াকে কেউ কেউ স্বার্থপরতা মনে করতে পারে। সে রকম কোনো স্বার্থপর চিন্তা আমার মধ্যে ছিল না।

ফুলকলি কোনো জবাব না পেয়ে, আবার চোখ তুলে তাকালো। এখন আর ওর চোখে লজ্জা বা অপরাধের ছায়া নেই, একটি ব্যগ্র করণ আবেগ ফুটে উঠেছে। তথাপি ও বললো, ‘মনটা খারাপ করে দিলাম না?’

আমি বললাম, ‘না। তার চেয়ে বেশি তুমি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছ।’

ফুলকলির চোখে জিজ্ঞাসা, কিন্তু স্পষ্ট না, এবং অসুটে জিজ্ঞেস করলো, ‘উদ্বিগ্ন?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, উদ্বেগটা তোমার অজ্ঞাই।’

ফুলকলি তাকিয়ে ছিল আমার চোখের দিকেই। হঠাৎ হ’হাতে মুখ ঢাকলো। ওকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না, হাসরুদ্ধ করে ও নিজেকে

শামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারলো না, ওর বুক ফুলে উঠলো, তারপরে হাত ঢাকা মুখ নত হয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে ওর মাথায় একটা হাত রাখলাম। ওর কায়াটা আর চাঁপা থাকলো না।

কোনো রকমে হাত ঢাকা অবস্থাতেই উচ্চারণ করলো, ‘ধাক, যাব না।’
আমি বললাম, ‘আমাকে ভুল বুঝো না।’

ফুলকলি জলন্তরা আরক্ত চোখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে অনায়াসে তাকালো এবং এই প্রথম সন্দোহনের পরিবর্তন করে বললো, ‘ভুল বুঝব তোমাকে? তা বুঝলে, অনেক আগে থেকেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না। একটা সত্যি কথা বলবে?’

আমি জবাব না দিয়ে ওর ভেজা আরক্ত চোখের দিকে তাকালাম।

ও বললো, ‘যখন থেকে আমার চিঠি পেয়েছ, তখন থেকেই তো তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলে, সত্যি না?’

এ রকম একটা নির্যম সত্যি কথা শোনার প্রত্যাশা ছিল না, খানিকটা বিস্মিত আবেগেই ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম, ‘কলি!’

ফুলকলি বললো, ‘আমাকে দেখার পর থেকে আরো উদ্বিগ্ন হয়েছ। উদ্বিগ্ন তুমি আজ এখুনি হওনি, এই যাবার আগের দিনটিতে।’

প্রবাদ আছে, নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কিন্তু সেই প্রবাদের বিপরীত হলো, একবার যদি মুখ ফোটে, তবে তার থেকে কঠিন ও বেদনাতরার সত্যি আর কিছু থাকে না। আজ এখন, ফুলকলির মুখ খুলেছে। ওর একটি কথাও মিথ্যা না। আমি নির্দিষ্টায় ওর একটি হাত ধরে বললাম, ‘কলি, তুমি সত্যি বলেছ। আমার উদ্বেগ তোমাকে কি হুঃখ দিয়েছে, বা ছোট করেছে?’

ফুলকলি জবাব দিতে গিয়েও পারলো না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বায়ে বায়ে মাথা নাড়লো। আমার হাতটাই ওর হুঁহাতে চেপে ধরে অশ্রুতে বললো, ‘না না, আমি জানি কার জন্য তোমার মনে উদ্বেগ আসে। আমার সৌভাগ্য...।’ কথা শেষ না করে ওর মাথাটা নেমে এলো, প্রায় আমার পায়ের কাছে। হুঁহাতে ধরা আমার একটি হাত পাখির কোমল বৃকে, হৃদপিণ্ডের সুকণ্ঠকি সঞ্চারিত হচ্ছে আমার স্নায়ুতে। ওকে তোলবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নত হয়ে রইলো, শরীরের কম্পনকে রোধ করতে পারলো না।

জীবনের কতকগুলো মুহূর্ত আছে, মনের কতকগুলো অবস্থা, যখন কোনো-

রকমেই তার ওপর জোর চলে না, বাধা দেওয়া যায় না। ফুলকলির এখন সেই অবস্থা। আমি ওকে আর তোলবার চেষ্টা না করে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

বাইরে তখন আরব সাগরের বাতাস, দ্বিপ্রহরের রোদকেও যেন কাঁপাতে চাইছে। নারকেল গাছের পাতার ঝাপটা কানে শুনতে পাচ্ছি। ফুলকলি ওর শেষ মুহূর্তের কথায়, আমাকে একেবারে নীরব করিয়ে দিয়েছে। ওর মনের গভীরতা বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এ গভীরতার পরিচয়টা নতুন। বুঝতে পারছি আমার অনেক আগে, আমার মনের সঙ্গে ওর একটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

ফুলকলি অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললো। হুঁহাতে ধরা আমার হাতটা একবার দেখলো। ছেড়ে দিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে একটু হাসবার চেষ্টা করলো, বললো, ‘আমি বলেই তোমার উদ্বেগ চলে যাবে না। কিন্তু যা সত্যি, তা কেমন করে মিথ্যা করব। সে ক্ষমতা আমার নেই।’

এমন অনায়াসে কোনো মেয়ে তার জীবনের একটি প্রথম সত্যকে প্রকাশ করতে পারলে সেখানে কোনো কথা বলা চলে না। তাই অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে।

ফুলকলি আবার বললো, ‘বিষপান অনেক করেছে, এই দায়টুকু তোমার, আর কিছু না। তোমার মনের দরজা খোলা, পথও খোলা। হুঃখ আমার থাকবে না তা বলি না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো, তার মধ্যে একটু স্ব্থের ভাগও আছে। তা শুধু আমারই। তোমাকে ছোট করা আমার মহাপাপ, তা কখনো করিনি, করবও না। আর হুঃখ? তুমি তো জাহ্নবী, ও মূলধনটাকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয়, আমার থেকে তুমি অনেক বেশি ভালো জানো। তবে আমি নিতান্ত মেয়ে তো তা-ই বলব, একটু মনে রেখ।’

কথা শেষ করতে গিয়ে ওর চোঁট কাঁপলো না, চোখ ভেসে গেল। জানতাম ফুলকলির আজ মুখ ফুটছে, এখন আমার শোনার সময়। তথাপি ভয় হয়, আমার চোখ দুটোও না ভেসে যায়।

ফুলকলি আবার বললো, ‘ভয় নেই গো, আমি তোমার সঙ্গে অজস্রায় যাব না। একটু হাসো তোমার মতো করে।’

না হাসলে হয়তো অস্ত্র কিছু করতে হয়, তাই হাসলাম।

ফুলকলিও হাসলো, বললো গানের কলিতে, ‘না দেখা ছিল যে ভালো....’

আমি আগের কলিটি বললাম, ‘সে কেন দেখা দিল রে!’ বুঝলে কলি, এখন বুঝতে পারছি তুমি সঙ্গে না গেলে আমার অজস্র দেখা ব্যর্থ হয়ে যাবে।’

ফুলকলি জুকুটি বিন্মরে ঘাড় তুলে বললো, ‘কেন ?’

পরমুহূর্তেই জোরে মাথা নেড়ে বলল, ‘না না না, তুমি আমাকে আর যেতে বোলো না !’

আমি বললাম, ‘কারণ তুমি না গেলে আমার সেখানে প্রবেশ নিষেধ !’

ও জিজ্ঞেস করলো, ‘কে এই ফরমান জারি করলো ?’

বললাম, ‘কালকূটের বিষের জুকুটি। আমাকে একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে না। আমি সব বুঝি, এমন অহংকার আমার নেই।’

ফুলকলি আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো, তারপরে হঠাৎ বললো, ‘তোমাকে একটা অভিসম্পাত দেব ?’

বললাম, ‘দাও !’

ফুলকলি চোখ বুজে বললো, ‘পরের জন্মেও তুমি এই রূপেই এস।’

আমার বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুতের কশাঘাত হেনে গেল। কারণ, আমি জানি, এ আমার প্রতি অভিসম্পাত না। ফুলকলি ওর জীবনের দুঃখকে পরের জন্মেও ফিরে পেতে চাইছে। জানি না, পরজন্ম বলে কিছু আছে কী না। বললাম, ‘বেশ, আবার যদি ইচ্ছা করো, আবার আসি ফিরে।’ ফুলকলি আমার হাত টেনে, নিজের মুখ ঢাকা দিল।

ব্রাহ্মে ফুলকলিকে বললাম, আমার পাগলা বন্ধু পুরন্দরকে সঙ্গে ডাকলে কেমন হয় ? ও জানালো, ওর কোনো অস্থবিধে নেই, কারণ, লুকিয়ে ফেরার দায় ও ত্যাগ করেছে। তাই দু’জনেই হানা দিলাম, পুরন্দরের অক্ষিসে। বাধ্য হয়ে পুরন্দরকে কাজের ব্যস্ততা ছেড়ে আমাদের দিকে মনোযোগ দিতে হলো। তারপরে প্রস্তাব শুনেই, লাফিয়ে চিৎকার করে উঠলো, ‘ইমপসিবল !’

পুরন্দরের চোখ মুখ দেখে মনে হলো, আমার থেকে পরম শত্রু ওর কেউ নেই। এমন কি, সে ফুলকলির উপস্থিতিও যেন ভুলে গেল। আমার প্রতিটি কথার প্রতিবাদে এমন হাঁক-ডাক চিৎকার করলো, যেন ওকে আমি হাতে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছি। চলে আসা ছাড়া উপায় রইলো না।

পরের দিন সকালে পুরন্দরের কাছ থেকে যখন বিদায় নিতে গেলাম, দেখলাম, কেমন তুষীভাব ধারণ করে আছে। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলো, ‘অজস্তা কি ট্রেনে করে যাচ্ছে ?’

বললাম, ‘ফুলকলির ইচ্ছে, ওর গাড়ি নিয়ে যায়। মন্দ না, নতুন অভিজ্ঞতা। একটা মেয়ে গাড়ি চালাবে, গল্প করতে করতে যাব।’

পুরন্দর শান্ত ভাবেই বললো, ‘নতুন অভিজ্ঞতাটাই তোমার লাভ। তবে ফুলকলির গাড়িটা দূরের রাস্তায় তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় বোধ হয়। আমার গাড়িটাই নিয়ে যাব ভাবছি।’

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললাম, ‘তুমি যাবে?’

পুরন্দর সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললো, ‘অবিশিষ্ট গাড়িটা আমিই চালাব। সামনে পাশাপাশি তিনজন বসা যাবে। কখন বেয়োবে ঠিক করেছ?’

আমি তখনো বিশ্বয়ের ঝলক কাটিয়ে উঠতে পারিনি, বললাম, ‘যাত্রার জন্ত তৈরি হয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’

পুরন্দর বললো, ‘আমার তৈরি হতে আধ ঘণ্টা। এর মধ্যে তুমি ববকে নিয়ে ফুলকলির বাড়ি চলে যাও। মালপত্র সব আমার গাড়িতে তুলে, ফুলকলিকে নিয়ে চলে এসো।’

তারপরে আমার বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, ধমক দিয়ে বললো, ‘কী হলো তোমার শালা!’

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘কিছু না, যাচ্ছি।’

ফুলকলিদের বাড়ি যেতে যেতে, মনে মনে হাসলাম অনেক, কিন্তু নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগলো।

ফুলকলি শুনে প্রথমটা খুব হাসলো। তারপরে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললো, ‘পুরন্দরবাবু মানুষটি খুবই সরল।’

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও কাছ থেকে চলে যেতে যেতে বললো, ‘দেখি আবার নতুন করে আয়োজন করি।’

জীবনের সব প্রতিশ্রুতি পালন করতে পেরেছি, এ কথা কখনোই বলা যাবে না। তবু ফুলকলির মা এবং ভগ্নিদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম, আবার আসব। কুন্দকলিটা ছেলেমানুষের মতো কৈদে, প্রায় আমাকেও ভাসিয়ে দিল।

যাত্রাটা শুভই বলতে হবে। কিন্তু একটু অসময়ে হলো, কারণ ঔরঙ্গাবাদ পৌছতেই দিন কাবার।

অজস্রা দর্শন, কেবল শিল্পের বিশ্ব নয়, বিশ্ব সময়ের, যে সময়টাকে কল্পনার অহুভূতি দিয়েও স্পর্শ করা যায় না। পদ্ধতি বা কাক্সিতির সে সব আলোচনা-বিলোচনার সময়ও এটা না, বা আমি তার অধিকারীও নই। অধিকার বর্জিত যে মুহূর্ত, বা প্রকৃতির মতো অমোঘ এবং অনিবার্হ, তা আমাকে আছন্ন করেছে। ইলোরার অপক্লপ ভাস্কর্য, যা অনেকটা অকপটে ধরা দেবার একটা মরীচিকা সৃষ্টি করে রেখেছে অথচ একেবারে অন্ধকারে ফেলে রাখে না, অজস্রার গুহাচিত্র, সেই অন্ধকারেই জিজ্ঞাসায় জেগে থাকে। গুহার অন্ধকারে, আলোর উদ্ভাবনের পদ্ধতিটা কী ছিল? জবাব অনেক আছে, মন তৃপ্ত হতে চায় না। আর প্রাণের ব্যাকুলতা যেটা, তা হলো, সেই সব শিল্পীরা কোথায়? তাঁরা কি সত্যি আমাদের মতো মাহুযই ছিলেন, নাকি তাঁরা চিরকালের মায়াবী রূপকার?

পাহাড়ে গুহার ফুলকলির দিকে যতোবারই তাকিয়েছি, দেখেছি, তন্নয়, অজমনক। পুরন্দরকে মনে হয়েছে, ও যেন নিশির ঘোরে আছন্ন।

তথাপি এক সময় বিদায়ের ক্ষণ এল। আমি বুঝতে পারছিলাম, ক্ষণটি অতি কঠিন ও নির্ময়। গুহাবাদের হোটেলের ঘরে ফুলকলিকে আমার গুহাচিত্রের মূর্তি বলেই মনে হয়েছে। কথা ওর শেষ হয়েছিল, দৃষ্টিতে চঞ্চল ব্যাকুলতাও ছিল না। বিদায়ের আগের দিন রাতে, পুরন্দরের সামনেই বললো, ‘তোমার সঙ্গে এ দেখা হাওয়াটা দৈব বলে জানব। পত্রালাপটা রেখ।’

আমি হেসে বললাম, ‘নিশ্চয়ই।’

দেখলাম, সিগারেট ধরতে গিয়ে, পুরন্দরের লাইটার জ্বালানো হাত কাঁপছে। বললো, ‘বড় বাতাস এখানে।’ বলে, উঠে চলে গেল।

সকালবেলা গুহাবাদ স্টেশনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফুলকলি আর পুরন্দর বসে কিরবে এটাই ঠিক ছিল। সকালবেলা বেরোবার আগে, ফুলকলি শান্ত মুখে কাছে এসে বললো, ‘দৈব, দৈবই, এটা কিন্তু আমি মানি না। বজ্রাঘাতের মতো তা দাগ রেখে যায়।’

আমি কিছু বলতে যেতেই, ও আমার মুখে ওর ভান হাত দিয়ে চাপা দিল। বললো, ‘তোমার বলার আর কিছু নেই।’ বলে, নত হয়ে, পা স্পর্শ করলো। একটা পুরনো দিনের আবেগের ছবি, তবু মনে হয় একেবারে পুরনো হয়ে যারনি। কারণ এই স্পর্শটার মধ্যে একটি নিবিড় আদান-প্রদান হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ালো, চোখের কোণ চিকচিক করছে। তবু হাসলো, আবার হুঁ নাহালো। আমি হুঁহাত দিয়ে ওর মুখ তুলে ধরলাম। ও চোখ বুজলো। হুঁ নামিয়ে ওর কপালে স্পর্শ করলাম।

ফুলকলি হুঁহাত দিয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করলো। পিছনে জুতোর শব্দ শুনলাম। কিন্তু নড়তে পারলাম না। জুতোর শব্দ আবার ফিরে চলে গেল।

ফুলকলি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, ‘চল।’

ওকে নিয়ে বাইরে এসে দেখলাম, গাড়ি প্রস্তুত। চালকের আসনে পূরন্দর বসে আছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে।’

ফুলকলিকে মাঝখানে রেখে আমিও সামনে উঠলাম। হোটেল থেকে স্টেশনের দূরত্ব খুব বেশি না।

গাড়িতে ওঠবার আগে পূরন্দরকে বললাম, ‘তুই একেবারে চূপচাপ, কিছু বল।’

পূরন্দর ক্ষুণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো। পাশের ফুলকলির দিকে একবার দেখলো, তারপরে বললো, ‘শত্রুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না।...’ বলতে বলতে ওর চোখ ভিজে উঠল। মুখটা অন্ধদিকে ফিরিয়ে নিল।

গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চলতে আরম্ভ করার পরে হঠাৎ ফুলকলি ছোটবার উত্তোগ করলো। তার আগেই ওর সমস্ত শরীর কঁপে উঠতে দেখেছি। দেখলাম পূরন্দরও ফুলকলির সঙ্গে ছুটছে এবং এক সময়ে ফুলকলিকে হুঁহাত দিয়ে টেনে ধরলো। যতক্ষণ চোখ ঝাপসা হলো না, ওদের একভাবে দেখতে পেলাম। ফুলকলির মাথা ওর নিজের বুকের কাছে নত। পূরন্দর আমার দিকে তাকিয়ে। শত্রুর সঙ্গে ও বাক্যালাপ করতে চায়নি।...

আমার দৃষ্টি একেবারে ঝাপসা হয়ে গেল। সবুজ প্রাস্তর চিকচিক করতে লাগলো।

তুষার গ্রিণ্ডের সদাশ্রয়

সেই যে সেই কবে, সে আমাকে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে তাকে আর ভুলতে পারিনি। কতোকাল আগে? তা হবে পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে। শরতকালের জলপাইগুড়ি শহর। কদমতলা থেকে বেরিয়ে, কোন্ রাস্তা দিয়ে যেন হাঁটছিলাম, মনে নেই। মনে আছে, কমবয়সী কয়েক জন সঙ্গে। বলা কওয়া আর শোনা, সব একসঙ্গে। একে বলে, সব শোনে, সে রকম না। যে যেমন বলে, যে যেমন শোনে। ঝকঝকে সকালটির গায়ে আলস্য মাখানো। বলা কওয়াও সেই রকম। অলস অলস কথা, অলস অলস চলা। মায় হাসিগুলোও আলসেমিতে ভরা। ওদের কারোর নাম বোধ হয় দেবেশ। কারোর বা মুহুল বা কার্তিক বা। জগদীশবা নামে সেই মাহাশক্তিও ছিলেন নাকি, ঠাণ্ডা সবটাই স্নেহে ভরা। মনে করতে পারি না।

মনে করতে পারি না, রাস্তাটা কোথায়। করলা নদীর ধারে, নাকি পিলখানা থেকে হাতী দেখে কিরে আসার রাস্তাটা। সময়টা সকাল, শরতের আকাশ নীল। জলপাইগুড়ি শহরের নায়কেল গাছের পাতায়, বোদের ঝিলিমিলিকে সত্যি কী না সোনালী দেখাচ্ছিল। এ কোনো পণ্ডকারের কথা না। আর অলস চলা, অলস বলার মাঝখানে, আকাশের এক প্রান্তে চোখ পড়তেই, পায়ের নড়িতে ঠেক। কী ওটা? একটা কোন্ ইন্দ্রিয় যেন ধরধরিয়ে উঠেছিল। ও কী, আকাশের বুকে। যাকে কখনো দেখিনি, অথচ মনে হয়েছিল, বহুদিনের চেনা। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, ওটা আমার মনের বিজ্ঞম। যাকে চোখে দেখিনি, তাকে চিনবো কেমন করে। তবু সে দূরের নীলে মাথা তুলে চুষকের মতো টেনে ধরেছিল। হাসছিল নাকি? না, কেমন যেন গম্ভীর স্তব্ধ, মহিমাধিত রূপ।

‘ও, ওইটা দেখছেন তো? ওই তো কাঞ্চনজঙ্ঘা!’ কে যেন বলেছিল। দেবেশ বা মুহুল বা কার্তিকই। কাঞ্চনজঙ্ঘা! সেই প্রথম দেখা। দূরত্বের কথা মনে হয়নি। যেন জলপাইগুড়ির আকাশে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

তারপরে আমার রকম স্কম আলাদা। এগিয়ে পিছিয়ে ভাইনে বাঁয়ে, কতো-রকম ভাবে যে দেখেছিলাম। কিন্তু তার রকম স্কম এক রকম, আর নিশ্চল। ইতিমধ্যে সে ডুব দিয়েছিল আমার আকাশ্যার গভীরে। চোখ বুজেও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

সেই প্রথম। আর সেই প্রথম বড় আশা। ছুঁতে না পাই, কাছে গিয়ে দেখতেও কি পারি না?

দেখেছিলাম তো। পাহাড়ে উঠে, মনে হয়েছিল স্বর্ণশিখর প্রাক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের সেই শরতের সকালের দেখাটা কয়েক বছরের অতীত। কিন্তু পাহাড়ের যে অংশে যে স্থানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল স্বর্ণশিখর প্রাক্ষণে এসেছি, তা মনে হওয়া পৰ্ব্বস্তুই। মন মজেনি। অর্থাৎ কী না হৃদয়ে বাজেনি। পদ করে বললে, তবু ভরিল না চিত্ত।

চিত্ত কী ভরে? কে জানে। কিন্তু আশা যে মরে না, তা জানি। মরীচিকা কি মরে। মরলে আবার বারে বারে রানীর কাছে যাবো কেন। যে-অর্থে কুইনস্ অব্‌ দ্য হিমালয়, সেই অর্থে রানী। মিথ্যা না, রানীর মতোই সে সুন্দরী। রানীর মতোই তার লাজগোজ। সমতল থেকে উঠতে উঠতে, রূপে যে ভুলিনি তা না। জালা তো সেইখানে, রূপে ভুলেও মজে না প্রাণ। রূপে কী করে?

করে এইটুকু, ছুটিয়ে নিয়ে যায় বারে বারে। ছুটে ছুটে গিয়েছি তাই নানা ঋতুতে। কতোবার? গুণে দেখতে হয় তাহলে। ওইখানে আবার একটা ঠেক। আমি অন্ধেতে নেই। সংখ্যা জাহির করবো তা কারোকে হিসাবনিকাশের তত্ত্ব বাতলাতে, মোটে আমার চাড় নেই। প্রাক্ষণের দূর দিগন্তের আকাশ জুড়ে, খেলতো সে নানা রঙে। টাকি মোরগের গলার বোলা আর খুঁটির মতো তার রঙের খেলা। সত্যি, ভাবলে অবাক লাগে। তুর্কী নামের লঙ্গে ঘাড় ঝাঁকানো ঔকতোয়ই তুলনা করে সবাই। কেন তা জানি না। তুর্কী মানেই তেজী নাকি? বিদ্রোহী? হবে বা। কিংবা ওটাও এক রকমের কথার কারসাজি না তো? সুবিধা বুঝে লাগসই একটা বিশেষণ জুড়ে দেওয়া? কিন্তু মোরগগুলো মোটেই সে রকম না। আকারে অবিজ্ঞি বড়। গলায় একটা মস্ত থলি, গলকবলের মতো। খুঁটিটিও বেশ বড় আর ঝাড়াহালো। ভিতরে তার কী গুণের লীলা, পক্ষী বিশেষজ্ঞ জানতে পারে। আমি পারি কেবল, আ মরি কী চমৎকার চোখে চেয়ে থাকতে। গলার থলি আর খুঁটি, এই দেখা গেল লাল আর ধূসর। পর মুহূর্তেই দেখ সোনালী হলুদে আর সবুজে

মাখামাখি। আবার দেখ তার ক্ষণপরেই মেরুনে আর বেগুনিতে কেমন গাঢ়। কেন যে পাখি, কোথা থেকে পেলি তুই এমন রঙবাহারের জাহ্নু! আমার চোখে তো আর আঁটা নেই বর্ণালী বীক্ষণের যন্ত্র। তো?

ওই ওকেও আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করতে, আকাশের দিকে যার চিরতৃষ্ণার ঠোঁট বাড়ানো। যে কারণে সে আকাশচূষী। এত তোমার ক্ষণে ক্ষণে রঙের ছটা বদলায় কেমন করে। সূর্যালোক? সে তো অনেক কিছুই ওপরেই পড়ে। তোমার মতো এমন রঙ পাল্টায় কে?

জবাব কোনো দিন পাওয়া যায়নি। চিরমৌনতা যে তার মহিমা। তা, রূপে যা করে, ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে বারে বারে। দূর আকাশে সে খেলতো নানা রঙে, আর মানুষ খেলতো নানাভাবে। সেই মানুষের খেলাতেই আমার কিছু কিছু হিসাব আছে। যদিও তা পাকা হিসাব না। কিন্তু একটু অকপট হতে হয় যে?

হলেই বা, ক্ষতি কী? মনে রেখো, এই যে তোমার আত্মপ্রকাশ, লেখা-জোখা যাকে বলে, এইখানে তোমার অকপট জীবন সাধন। এই সহিতত্ত্ব বাইরের না, ভিতরের। লেখাজোখার যদি কোনো মহত্ব থাকে, তবে তা সেইখানে, যেখানে সে তোমার সন্ধান করে। ওই কী বলে, জীবন সন্ধানী। কথাটা মনে রেখো। দান চালতে গিয়ে, জীবনের থেকে বড় দান ওকে দিতে পারো না। হলো তো?

হলো। তাহলে অকপটেই বলতে হয়, যদিও দফাওয়ারি সংখ্যাতত্ত্ব দিতে পারবো না। সেই একবার যখন সে আকাশের নীলে মাথা তুলে রঙে খেলছিল, তখনই সেই পাহাড়ী কণ্ঠাটি, গৃহ প্রবেশের মুখে, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গৃহান্তরের নিরালা কোণে। তার দুই বাহুতে কী প্রাণের জোর। ঠোঁটে কী আবেগ! নিঃশ্বাসের উকতাই বা কী তীব্র। চুষনের গাঢ়তা যে কতো নিবিড় হতে পারে, আর নিটোল উদ্ধত বৃকের স্পর্শ, সেই অহুভূতির ব্যাখ্যা করি, এমন কথার কারিগর আমি না।

ব্যাপারটা কোনো এক পক্ষের না। আমিও কি ভুলিনি? চাইনি? তবে ভোলা বা চাওয়ার, কোনোই তেমন জোর ছিল না। থাকবে কেমন করে? পরিবার সমাজ লোক, সকলে আমাকে ঘিরে। ওকেও কি ঘিরে ছিল না? ছিল, কিন্তু ওর প্রাণের জোর সব কিছুর থেকে বেশি। আমার সংশয় আর বিশ্বাস ওর কাছে তুচ্ছ। সব ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ ওর মায়ের আশ্রয়েই আমার বাস। ওর অন্তান্ত ছোট বোনেরা আমার দিন যাপনের নানা

কাজের সহায়িকা। সমতলবাসী সীমিত সময়ের অতিথির মুক্তাকে ও কেন রেয়াত করেছিল ?

সমাজতাত্ত্বিক কালপ্যাঁচা সেবারে তখন পাহাড়ে। তাঁকে সব বলেছিলাম। বলতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম, আমার গলায় মেঘ, স্বর ঝাপসা, দৃষ্টি মেহূর। পর্বতকন্ঠা পার্বতীকে মনে মনে বলেছিলাম, অভাগী মেয়ে। সংসার তো চোখ বুজে থাকে না। ওর পাহাড়ী মা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতো, তারপরে একটু হেসে মাথা নেড়ে বলতো, ‘আমার বড় মেয়েটাকে নিয়ে যে কী কুরবো, বুঝি না।’

আহু, এর থেকে স্পষ্ট করে আর কী বলা যায় ? সেই রেখায় ভরা বিষণ্ণ মুখ, উদ্বিগ্ন চোখের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছি। আকাশের নীলে, দূরে যে রঙ বদলাতো, তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, ‘কেন এমন ঘটে ?’ জবাবে হয়তো দেখা যেতো, তুষার শাদা মুখে এক ঝলক রাঙা হাসি। তার দর্শন আর সান্নিধ্যের স্ত্রেই এইসব ঘটনা। তার নানা রঙের খেলার সঙ্গে তাই মাহুষের নানা খেলার কথা বলতে হয়। তবে বলতে হলে, অকপটে বেলো।

সেই আর একেবারের কথা, হ্রস্ব নীতে আশ্রয় পেয়েছিলাম, স্নেহময়ী অধ্যাপিকা দিদিটির। সমতল থেকে একটি চিঠি নিয়ে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দেবব্রত মুখার্জি শিল্পী তখন সেই বাড়িতে, ইজ্জলে ক্যানভাস খাটিয়ে, তাঁর নিজের চেহারা আর ছবির মতোই বলিষ্ঠ আঁচড় টেনে চলেছেন ভুলি দিয়ে। আশ্রয় তো না, পক্ষীশাবকের পক্ষে একটি কোমল নীড়। রাত্রে ছ’ ছুটো লেপ কবলের নিচে, গোটাটিনেক গরম জলের থলি। দেবুদার লাল পানির পাত্র যতো খালি হতো, ক্যানভাসের রঙ ততো ঝলকাতো। লাল পানির পাত্র এগিয়ে দিয়ে বলতেন, ‘হারামজাদা এটা খা, সব কিছুই আসল রূপ যদি দেখতে চাস।’

ওই রকম কথা, তার সঙ্গে চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দেওয়া। সেইখানে সরকারী দপ্তরের এক সাহেবের সঙ্গে চিন পরিচয় হতেই, তাঁর ভূক বেকে উঠেছিল। এত অবাক, যেন হালে পানি নেই। ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন জলা-পাহাড়ের এক নিরিবিচি চূড়ায়। তারপরে সেই অভাগী মেয়েটির কাহিনী। আমার নাম নাকি ওর মুখেই তাঁর শোনা। তারপরে ঘটনা যা বলেছিলেন, অতি নিকট আর দুঃখের। কলকাতার এক অভিজাত দম্পতির স্বেচ্ছাচারিতার বলি হয়েছিল সেই অভাগী পাহাড়ী মেয়েটি। যে অভিজাত পুরুষটি তার বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে, সন্তানের জনক হতে পারেনি, কয়েক মাসের

মধোই তার পিতৃহৃৎ ঘোষিত হয়েছিল পাহাড়ী মেয়েটির গর্ভে। একদিকে যখন পুষ্কবটির আত্মপরিচয়ের দর্পিত উপলব্ধি ঘটেছিল, অন্যদিকে তখন সমাজ ও সংসার। স্বামী-স্ত্রীর খেচ্ছাচারিতার ফলে দাম্পত্য জীবনের আখেরি ফয়সালটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাহাড়ী মেয়ের সন্তানের পিতৃহৃৎ ? তোবা তোবা। আভিজাত্য করার জন্য টাকা আছে কী করতে ? টাকা অগতির গতি না ? প্রাণ তো হাতের মুঠোয়। তবুও দারাদরি করা হলো, টাকাকে ভালোবাসার ভাবনা। দেড় দু' হাজারেই মিতেছিল।

কিন্তু সরকারী দপ্তরের সাহেবের কাছে আমার নামটা উচ্চারিত হয়েছিল কেন ? দপ্তরের সাহেব তাঁর কোর্টের পকেট থেকে লাল পানির বোতল বের করে গলায় কাঁচা ঢেলেছিলেন। লাল মুখ করে, অস্ত্র যাওয়া লাল হয়ে বলেছিলেন, অভাগী মেয়েটির অমূল্য দোষ দেখাতে গিয়ে অমূল্য এসেছিল তাঁর মনে। প্রাণ খুলে তা প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু বন্ধুত্ব হয়েছিল। তখন কথায় কথায় পাহাড়ী কণ্ঠ আমার কথা বলেছিল।

একটি সত্য কথা কবুল করবো ? অকপটে ? সাহেবের কথাগুলো শুনে বুকের দমের ঘরে বড় টান লেগেছিল। আকাশের দূরে সে তখন দুই ভাঁজে দুই রঙে তাকিয়েছিল, শাদা আর ফটক। কিন্তু সে যেন কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। কথা বলতে পারিনি। না, কষ্ট সাহেবের জন্য না। সাহেবের কাছে বলা, পার্বতীর কথা শুনে। নামে না, পর্বতকন্টার্থে পার্বতী। বলেছিল, 'সে চলে যাবার পরে আমার সবই যেন হারিয়ে গিয়েছিল। সে যখন আমার এই কথা শুনবে, বড় ঘৃণা করবে।

করেছিলাম নাকি ? সাহেব লাল পানি পান করে আরো অনেক কথা বলেছিলেন। বলতে বলতে কথাগুলো আবছা নীল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার ঘৃণা ? জলাপাহাড়ের নিরালা থেকে নেমে, সেই নিভৃত বাড়িটিতে গিয়েছিলাম। প্রথম দেখা একটি ছোট বোনের সঙ্গে, আগের তুলনায় একটু ডাগর। লাল গাল আর নাকের ডগা বলকানো দুটি পাহাড়ী চোখে অতল বিশ্বাস। এক মুহূর্তের বেশি দাঁড়য়নি। ছুটে চলে গিয়েছিল। তারপরেই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়ী মা। অভ্যর্থনা আগে, তারপরে বার্তা চোখের জলে, সমাজের নির্দেশ, অভাগীকে ঘর ছেড়ে যেতে হয়েছে। কোথায় ? বাজারের পিছনেই নিচের বস্তিতে। মারোয়াড়ির দোকান-ঘর ঝাড়পোছ করে সাজায়, আরো নানা রকম কাঁচকরমাল খাটে। নওকরি ঘাকে বলে।

খুঁজেছিলাম। দেখা পাইনি। অধ্যাপিকা দ্বিধিক সরকারী দপ্তরের

সাহেবই ঘটনাটি বলেছিলেন। দিদির কিশোরী কণ্ঠাটিও শুনেছিল, ওর কোঁতুহল হয়েছিল অগাধ। ক্যাভেটারে দোতলার খোলা ছাদের নিচে বসে ওর কোঁতুহল মিটিয়েছিলাম। ও গম্ভীর মুখে তাকিয়ে ছিল, হিমালয়ের সেই আকাশে মাথা তোলা তুর্কী মোরগটার দিকে, রঙ যার ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছিল। তারপরে হঠাৎ হুঁহাতে মুখ ঢেকে সবুজ স্বরে কেঁদে উঠেছিল। অবাক হয়েছিলাম। সান্দ্রনা দিতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম কিশোরীর সবুজ ডালে একটি লাল কুঁড়ি ধরেছে। যখন দূরের আকাশে চিরমৌন মহিমময় ধ্বজের দিকে তাকালাম, তাকে অনেক—অনেক দূরে মনে হয়েছিল।

সে আমার আকাজ্জ্বার গভীরে ডুবেছিল। অনেকবারেই সে আমাকে ঘর-ছাড়া করে ওপরে নিয়ে গিয়েছে। সেই এক জায়গাতেই। সেবারে, হোটেল থেকে বেরিয়ে জুবিলি স্ট্রানোটোরিয়ামের কটেজে যাচ্ছিলাম। নারায়ণদার (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) কটেজে, নিমন্ত্রণ আশা বউদির মাছ-ভাতের। রাস্তার আলো তখন জ্বলেছে। হাল্কা কুয়াশার নড়াচড়ায় কেমন একটা গড়িমসি ভাব। সবই দেখা যায়, আবার যায়ও না। গোটা দিনটাই প্রায় কুয়াশার কব্জায় ছিল। ভোরবেলা তাকে একবার দেখা গিয়েছিল, এক পলকের দেখা। তার গায়ে বিষণ্ণতার ছায়া ছিল।

সারাদিনে আর একবারো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সম্ভ্রা নেমেছিল, একেবারে অন্ধকার নিয়েই। তার ওপরে হাল্কা কুয়াশা রাস্তার আলোগুলোকে তেমন ফুটতে দেয়নি। একটি মুখের দিকে চোখ পড়তেই, ঢালু পথে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। যার মুখ দেখেছিলাম, সেও থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আন্তে আন্তে কাছাকাছি। প্রাণের জোরটা ওর বরাবরই বেশি তো। জনবহুল রাস্তায় অবলীলাক্রমে আমার একটা হাত চেপে ধরেছিল। মুখে এমন খুশির ছটা, কুয়াশা যেন উপে গিয়েছিল। একদমে কথা, 'তুমি? কবে এসেছো? কোথায় উঠেছো? আমাকে তোমার মনে আছে তো?'

সেই অভাগী পার্বতী। লোককে দোষ দিয়ে কী লাভ? দৃশ্যের আকর্ষণ কার নেই? মনে কোঁতুহল? এটাই তো সংসারের প্রতি অল্পরাগ। কে আর বৈরাগ্য সম্বল করে কোনো দিকে না তাকিয়ে চলেছে? কিন্তু সংসারের লোক বলেই, বাইরে এসেও আমার যে লজ্জা করে। হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই হয়েছিল, বলেছিলাম, 'চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

আমার বলার, আমি বলেছিলাম। ওর অবস্থা কি বুঝতে পেরেছিলাম? ওর ভিতরে কি হচ্ছিল?

অসম্ভব। পেয়েছি বললে মিথ্যা বলা হতো। ও হাত ছেড়েছিল স্পর্শ ছাড়েনি। ঢালু রাস্তার চলাটা স্বভাবতই কিছুটা দ্রুত ছিল। ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছিলাম ওর চেহারার শীর্ণতা। বিবর্ণতা সেই উজ্জল মুখের। অন্ধকার সেই ছাতিময়ী চোখের। যদিও সক্ষাৎমাত্র সবই ঝলকিয়ে উঠেছিল। শরীরের লাবণ্যে শ্রাণ্ডার দাগ। জামাকাপড়ে পরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও দীনতা। চলতে চলতে কথা খামায়নি একবারও, ‘তুমি তো আর নিশ্চয় পাহাড়ে আসোনি (অন্তত বার কয়েক উঠেছি) আমার একটা চিঠিরও জবাব দাওনি, (অতি সত্যি কথা) বোধ হয় পাওনি। পেলো নিশ্চয়ই জবাব দিতে। (আহ!) দিতে না? ঠিকানা তো আমি লিখে রেখেছিলাম, ওতে আমার ভুল হয়নি। আসলে ভাকের গোলমাল, আমি জানি। চিঠি পেলো নিশ্চয় জবাব দিতে, তোমাকে আমি জানি। (কী হলনা!) কিন্তু আমার সব কথা যদি জানতে, আর কখনো জবাব দিতে না, কখনো না।’ ওর স্বর খাদে নামছিল, নামতে নামতে হঠাৎ যেন বরফের ফাটলে ডুবে গিয়েছিল।

আমি বলতে পারিনি, ‘জানি।’ তাই গ্রানি আমার। ও গ্রানিমুক্ত হয়েছিল, হচ্ছিল। ও আমার হাত ছেড়েছিল, স্পর্শ ছাড়েনি। গায়ে গা ঠেকিয়ে চলেছিল। দু’পাশে দোকান পসার। কেনা বেচা চলছিল ঢালু রাস্তার দু’ধারে। রাস্তাটা সাপের মতো বাক নিয়ে, ডাকঘর পেরিয়ে, আবার বাঁয়ের ঢালুতে। অনেকে আমাদের তাকিয়ে দেখেছিল। সমতলের এক পুরুষ, পাহাড়ের এক মেয়ে। ও খুব তাড়াতাড়ি শাড়ির কোমরবন্ধনী থেকে রুমাল খুলে চোখ মুছে নিয়েছিল। গ্রানি আমার, গরীব আমার প্রাণ। তাই লোকলজ্জায় আমার নজর আনচান। ওর স্বর আবার জেগেছিল, ‘আমি আর সে বাড়িতে নেই, আমার মায়ের কাছে। আমি খারাপ হয়ে গেছি। তুমি হয় তো বুঝবে না, আমি কেমন করে খারাপ হয়ে গেলাম। কারণ আমি নিজেই তো বুঝতে পারিনি। (ওকে চূপ করতে বলতে ইচ্ছা করছিল, পারিনি) কিন্তু খারাপ খারাপই। আমি খারাপ হয়েছি একজন বাড়ালীর সঙ্গেই, আহ! একজন বাড়ালীর সঙ্গে!’ আবার ওর স্বর ডুবে গিয়েছিল।

রাস্তাটা তখন অধিকতর ঢালু। কেন যেন নির্জন ছিল। বোধ হয় দোকান পসার ছিল না। হাল্কা কুয়াশা, আর রাস্তার কমজোর আলো। ও আমার ডানা চেপে ধরেছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, কেন এই দুঃস্বপ্ন আকোশ, আহ!

‘একজন বাঙালীর সঙ্গে! ওর স্বর আবার তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠেছিল, ‘তার ছেলে আমি পেটে ধরেছি। কিন্তু সে তো আমারই ছেলে। ওর কোনো বাবা নেই। পঞ্চায়েত আমাকে এক ঘরে করে দিয়েছে। মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল। তুঁকি আমাকে ঘৃণা করছে, না? আমি জানি।’

ওর স্বর আমার ডানায় ডুবে গিয়েছিল। হাতের ভার আমার কটিতে। আমি কি ওকে ঘৃণা করেছিলাম! সেই তো আবার বলতে হয়, গরীব আমার প্রাণ। ভোলায় কথায়, যে জন প্রেমের ভাব জানে না/তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা? কেমন করে ঘৃণা করব ওকে। শাদা কালোর ধন্দে যে সব বাজে। শাদা নেই, কালো থাকে কেমন করে? ওকে আমি ঘৃণা করিনি। বলেও-ছিলাম, ‘না না, আমি তোমাকে ঘৃণা করছি না।’

ওর স্বর ডুবে যাচ্ছিল, কিন্তু তুলে তুলে বলছিল, ‘করছো না? হ্যা, কী কপাল আমার! করো না কেন, একটু করো।’

আমি যেন শুনছিলাম, ভালোবাসো না কেন, একটু বাসো। ট্রান্সিক পুলিশ পেরিয়ে, প্রায় সমতলে। আমরা তখন রেললাইনের ধারে। তারপরে রাস্তা অতি ঢালু। স্তানাটোরিয়ামের অধীন পরিচ্ছন্ন রাস্তা। নির্জনতা নিবিড়। হু’পাশে ঘন গাছের সারি। গাছের ওপর পাতা থেকে নিচের পাতায় জলের ফোটার টপ টপ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর ঝাঁঝের ডাক। ও বলছিল, ‘এখন আমাকে কেউ কেউ বিয়ে করতে চায়। যারা চায়, তারা খুঁটান। তাতেই বা কী? ভগবানের কোনো জ্ঞাত নেই। সে সকলেরই। কিন্তু আমি জানি, আমাকে যারা চায়, তারা কখনোই আমার ছেলেকে চাইবে না। ওকে আমি পেটে ধরেছি, কেমন করে ছাড়বো? মায়ের কাছে রেখে দেবো? মাসে মাসে টাকা দেবো? সবই সমান। ওকে কেউ চায় না। আমিও চাইনি, তবুও আমার কাছে এসেছে। আমি ওকে ফেলতে পারিনি। একটা দোকানে আমি কাজ করি। তুমি কেন আর পাহাড়ে এলে না? কেন এলে না?’ ওর ঘন নিশ্বাস আর রুদ্ধ স্বরে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

ঝরনার মতো সর্পিল আর ক্ষুণ্ণগামী ঢালু পথের হু’ধারে, নির্বাক গাছেরা যেন ওর জিজ্ঞাসায় উৎকর্ণ হয়েছিল। মিথ্যের শেষ নেই, ছলনারও। বলে-ছিলাম, ‘সময় পাইনি।’

নারায়ণদা আর আশা বউদির কুটির দেখা যাচ্ছিল। কুটিরের আলো জানালায়। গরীব প্রাণে সংকোচ জাগছিল। লোকলজ্জার ভয়, পরিচয়ের

শক। ও বলেছিল, ‘মনে থাকলে সময় পেতে। আমার যে দুর্ভাগ্য, একটা চিঠিও পাওনি। (আহ! কোথায় বাজে?) পেনে মনে পড়তো। (ধিক! ধিক!) মনে পড়লে সময় পেতে। দাঁড়ালে কেন?’

নারায়ণদায় কুটির সামনে এসে পড়েছিল। তিনি বা বউদি ব্যালকনিতে দাঁড়ালে আমাদের দেখতে পেতেন। হাত তুলে দেখিয়ে বলেছিলাম, ‘ওখানে আমি যাবো।’

ও তাকিয়ে দেখেছিল। আমি ঢালুতে ও আমার কিঞ্চিৎ ওপরে। ওর পীত পার্বতী চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমার চোখে যেন কিছু খুঁজেছিল। নিরাশা ওর চোখে। শীর্ণ মুখে হাসি ফুটেছিল। তবু অনায়াসে দু’হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। গ্রাসে নিয়েছিল ঠোট। ওর গায়ে ছিল সস্তা সাবানের গন্ধ। নিশ্বাসে ছিল দুঃখের খাওয়া পেয়াজের। উষ্ণ জিভ দিয়ে যেন খুঁজেছিল কোনো চেনা স্বাদ। ওর শিথিল শীর্ণ শরীরের নিবিড় স্পর্শ পাচ্ছিলাম। কতগুলো মুহূর্ত কেটেছিল জানি না। ও সহসা নিজেকে ছিন্ন করেছিল। আলিঙ্গন থেকে না। কী বিস্ময়! ও বলে উঠেছিল, ‘তোমার সেই বইটা কি ছাপা হয়ে গেছে, যেটা আমাদের সেই বাড়িতে বসে লিখতে? নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে, না?’ জবাব যেন ওর জানা, এমনি ভাবেই প্রশংসায় গিয়েছিল! ‘মা’র সঙ্গে একবার দেখা করো, আর আমার বোনের সঙ্গে, কেমন? বাজারের পেছনে অনেক নিচুতে আমি থাকি। না না, সেখানে তোমাকে আমি যেতে বলবো না। আমি তোমাকে খুঁজে নেবো ঠিক। যেখানেই উঠে থাকো। একটু—সেই দিনগুলো—’

ওর স্বরে ফুটেছিল উদ্বেলতা, ডুবতে ডুবতে থেমে গেলেও, শেষের কথা কয়টি যেন ডাক দেবার মতো। আমি এক পলক দেখে নিয়েছিলাম ব্যালকনির দিকে। গরীব আমার...। পর্বতের মেয়ের তপ্ত নিশ্বাসের ঝাপ্টা লেগেছিল আমার নাসারন্ধ্রে। আবার সেই গন্ধ, উষ্ণ জিভের দুর্বল সন্ধান। কিন্তু ওহে! সেই দিনগুলো কোথায়? বইটা ছাপা হয়ে গিয়েছিল? গাছেরা স্থির। ঝিঁঝিরা ডাকছিল। ওপর পাতার জলের ফোটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল নিচের পাতায়।

ও যেন চমকিয়ে উঠেছিল। ঝটিতি আর পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার এমন ভঙ্গি। ডুবন্ত স্বরে শুধু বলেছিল, ‘বেশি রাত হলে এ রাত্তায় একলা যেও না, কেউ যেন রেললাইন পার করে দিয়ে আসে।’ বলেই পিছন ফিরে, খাড়া চড়াইয়ের রাত্তায় এমন ভাবে ছুটে চলে গিয়েছিল, চমক তখন আমার মনে। আর ভয়।

গরীব আমার...। আমি উৎকণ্ঠিত চোখে, সামনে, পিছনে, আশেপাশে তাকিয়ে দেখেছিলাম।

কেউ কোথাও ছিল না। একটি খাত্তাঘেবী অথবা আশ্রয়হীন পশুও না। ব্যালকনি শূন্য। পথের নিচের বাকের মুখে স্তানাটোরিয়ামের অফিসের সামনের আলোর রেখা। উৎরাইয়ের চালুতে আমি একা। ঝিঁঝিরা তেমনি ডাকছিল। পাতার কুয়াশার ফোঁটা পাতার টপ টপ শব্দে বরঝিল আগের মতোই। খাড়াইয়ের পথটা শূন্য, বাকের মুখে গাছের আড়ালে আলো। স্তাণ্ডেলের পুরনো চামড়ার শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না।

সেই সে-প্রাঙ্গণের ধারে, যাকে তখন মনে করেছিলাম, স্বর্ণশিখরের প্রাঙ্গণ। পিছন কিরে নেমে, কুটিরের দিকে যেতে গিয়ে ঠেক। কিসে আক্রান্ত হয়েছিলাম? বুঝতে পারিনি তৎক্ষণাৎ কুটিরের না গিয়ে, আন্তে আন্তে আরো নিচের দিকে নেমে গিয়েছিলাম। আমার নাম কালকূট, আমি লেখক? জুবিলি স্তানাটোরিয়ামের আলোগুলো আচমকাই কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।...

খাওয়াটা ভালোই হয়েছিল। সমতলের তিন-চার রকমের মাছ। আশা বউদির হাতের রান্না। পাব্দা মাছের ঝালটা এখনো মনে আছে। নারায়ণদাই নেমে এসে চৌকিদারকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওপরের রেললাইন থেকে দূরে, নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসতে। নিজের থেকেই বলেছিলেন, ‘দার্জিলিং-এর পরিবেশটা আন্তে আন্তে কেমন খারাপ হয়ে উঠছে। আগে এ রকম টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেবার কথা শুনতাম না। আজকালই শুনছি, বিশেষ বিশেষ জায়গায় এমনটা ঘটছে।’...

আমার তখন মনে পড়ছিল আর একজনের কথা, ‘বেশি রাত হলে এ রাস্তায়...।’ রাত্রে হোটেলের শুয়ে স্বপ্ন দেখিনি। ‘একটু—সেই দিনগুলো—’ ডাক দেবার মতো সেই কথাগুলোর সঙ্গে মেলানো, সেই দিনগুলোর একটি ছবি। কাঞ্চনাভাময়ী পার্বতী, একটু উচু গালে রক্তাভা। পীতবর্ণ তার চোখ, কিন্তু একান্ত ছোট না। লাল জামা, নীল শাড়ি, নাকে একটি পাথর বসানো ছোট নাকচাবি। চোখের সঙ্গে নাকচাবিটির ঝিকিমিকির একটু মিল ছিল নাকি? ঘাড়ের দু’পাশে সাপিনী বেণী বন্ধচূড়ে দোলানো। পায়ে একজোড়া (দাম যা-ই হোক) লাল শেঁখীন স্নিগার। তপ্ত কাঞ্চন রঙ, একটি হাতে একরাশ লাল বেলোয়ারি চুড়ি।

ইংরেজি যে মাসের সেই রাত্রে, শীতটা একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল। তোরেই অবিস্তি স্বর্ণশিখর দর্শনের আশায় উদ্ভূত হয়ে কাঁচের জানালার মুখ

ঠেকিয়েছিলাম। চকিতের তরে একবার। একদিক রক্তিম, অপরংশে গাঢ় ধূসর। একজনকেই, বোধ হয় শীর্ষভূমকে। যেন মন্দিরের দরজা বন্ধের শেষ মুহূর্তে একবার চোখে চোখ।

সেই যে ওদের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দেখেছিলাম, আর তাই বারে বারেই ছুটে এসেছি, তারপর থেকে শিখরদের নাম পরিচয়গুলো জেনে নিয়েছিলাম। এখন তাই হলক করে বলতে পারি, জলপাইগুড়ি থেকে যাকে দেখেছিলাম, সে নির্খাৎ সোনার খাজাঞ্চি (খাজাঞ্চি?) খানা।

বারে বারে ছুটে এসে, কানে আমার কিকিৎ বাহার দিয়েছিল কী না। তারপর...সেই এক যে ছিল দেশ, তার নাম তিব্বত। পাঁচ-শিখরের চির-নিবাস সেইখানে। দেশের লোকেরা বলে, ‘কাং-ছেন-দজাং-গা।’ দক্ষিণের সম-তলের লোকেরা বলে, কাঞ্চনজংঘা। দেশের লোকের কাছে ওই শব্দগুলোর অর্থ হলো, ‘বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ।’ বলতে জানলে কী না হয়। বেলা যখন অন্ত যায়, শীর্ষভূমের লালের কপালে তখন সোনার ছটা লাগে। তাই সে হলো সোনার খাজাঞ্চিখানা। এই হলো এক, কেমন? তারপরে দুই, দক্ষিণের চূড়োটি সূর্যোদয়ের আগে ইস্তক ইম্পাত, যেমনি রোদের ঝলক লাগা, অমনি রূপোলী। তাই সে রূপোর খাজাঞ্চিখানা। এমনি করে, বাকিদের নাম হলো, রত্ন, শস্ত্র, আর অস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা। তারপরে আর কী চাই বলো? সোনা রূপো রত্ন শস্ত্র অস্ত্র। তো, সেই দেশের লোকেরা হলো, সেই পাঁচ চূড়োর বংশবদ প্রজ্ঞা। সেই কারণে পুর্বদিকের চূড়োটির নাম রেখেছে ‘পানদিম্।’ যাকে বলে, রাজমন্ত্রী।

মিথ্যে কলবো না, স্বর্ণশিখর কথাখানির আমদানী সেইখান থেকেই। কিন্তু পথ বদলের কথাটা যে মনে আসেনি। এলেও, ছুটে যাবার বেগে ঝাঁপ। একটা টিকি তো কখনো কুচ্ করে দিতে পারিনি। টিকি যে জীবন ধারণ! সেই রাধা কিষণ আর কী? সাধে কি আর কোনো কোনো ধামিককে ওই কথাটি শুনলে রেগে উঠতে দেখেছি?

তারপরেও তাই ছুটে ছুটে উঠে এসেছি এই প্রাক্কণেই। বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ-কে দেখতে। সেই রকমই দেখা। লাজুক না সে, চোরি চোরি আঁখ মিচোলি। তার মধ্যেই ঋতুর হের ফেরে কম বেশি। আর হিসাবে ধরতে পারি না, কোন্ একবার যেন প্রাক্কণে এসে হাত ধরলেন রূপোলী পর্দার নায়িকা। নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর রাজকীর পাশশালার ঘরে। অতি

বড় স্বন্দরী বলবো না লাগে ঢল ঢল। শালীনতায় সমালোচকদের মুখে তার চরণ। কৃতজ্ঞ ছিলাম তাঁর কাছে, বাংলা সাহিত্যের অন্তত গোটা দুই কাহিনী চিত্রে, তাঁর নায়িকা রূপিনী স্মিকায়। কিংবা সেই কোমল বিলাসী যুবকটি যে তার পাহাড়ের অভিজাত আশ্রয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি দুর্ভাগা বলতে পারি না কোনো মতেই। সৌভাগ্যবান বলতে গেলেও ঠেক লাগে। বাপ-ঠাকুরদার উপার্জনের বে-ওজনের ধন-সম্পদ। পাহাড়ের বাড়িটার চার ভাগের তিন ভাগই বন্ধ। দোতলার এক অংশে স্বয়ং বিবেকানন্দর বাস-কালের নানা স্মৃতিতে ভরা। আমি অতি তৃষ্ণার্ত চোখে দেখেছিলাম, কুলূপ আঁটা বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে। ওয়ে কয়েদগুলো, কেন রে তোরা কথা বলিস না?

না, ওরা আগ্রহ দিয়ে কথা বলে না। চোখে চোখে ধ্যান দেয়। কুলূপ আঁটা থাকলে, দীর্ঘশ্বাস শোনে। কিন্তু যুবকটিকে আমার মনে হয়েছিল, দুঃখও তার বিলাস। কে বা সেই নারী, কোন্ বা সেই সুরা, যাতে মন ভরে, সে তা জানে না। অথচ সন্ধান করে। হা! সন্ধান কি সব মেলে? তার ঘরে বেজে যেতো বাজনা। সুরার ফোয়ারা ডিনার টেবিলে। নর অঙ্গে নারীশোভা, জোড়া জোড়া, নাচের ছন্দে কী বাহার বা! সে তখন খাটের বিছানায় পাশ কیره শুয়ে থাকতো। নয়তো বাইরে গিয়ে দেখতো, গাড়ির এঞ্জিন অয়েল ঠিক আছে কী না।

সেই প্রাক্কণে কতো মুখের কতো চেনা। হারিয়ে যায়, কিন্তু একেবারে হারায় না। আবার ভেসে ভেসে ওঠে এক এক সময়। কোন্ কোন্ সময়ে তাদের দেখেছি, মনে করে রাখতে পারি না। মন-নজরের টানটা যে সব সময়ে অতৃদিকে থাকতো। সেই এক দূরের আকাশের বুকে। তবু সেই লেখক যাত্রটিকে আমার আরো অনেকের মতো ভালো লেগেছিল। সেই প্রাক্কণের ধারেই তিনি বরাবরের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একটা বই লিখে রাতারাতি নাম। কিন্তু লেখকের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক দলের কী প্রচণ্ড রাগ আর বিবেষ। অথচ সেই দলেরই খণ্ডিত কালের লোকসভার সদস্যকে দেখেছি, তাঁর পাহাড়ের ঘরে, প্রিয় অতিথিরূপে।

এই বৈপরীত্যের জিজ্ঞাসা, ছুরি হয়ে বেঁধা আমার বুকে। কেবল এই একটি ঘটনা না, সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই। সে-রক্তক্ষরণের কথা এখানে না, বারাস্তরে। লেখকের মুখে তখন অকাল অন্তিম ছায়া লেগেছিল। পদক্ষেপ ধীর, হাতে কম্পন। তাঁর দৃঢ়বদ্ধ রক্তরেখা চোঁটে অনেক দুঃস্বপ্ন কথা শুনেছি।

প্রাক্তনের বিকালে একদিন শুনেছিলাম অগ্র এক স্বর। ব্যাকুল না, উৎকণ্ঠিতও না। সে স্বর প্রার্থনার মতো, 'বাচতে বড় ইচ্ছা করছে, বড় ইচ্ছা করছে। ডেথ্, ইজ্, কলিং মৌ, স্টিল—সে আমাকে আসতে দিচ্ছে না।'

ওহে, এ আবার সাহিত্যের ভাষা না, এখনো কানে বাজছে। তারপরেই যখন আবার প্রাক্তনে গিয়েছিলাম, তার সিঁড়িতে পা দিতে কী বিধা। ঘণ্টার শব্দে তাঁর স্ত্রী দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ডেকে বসিয়েছিলেন ঘরে। সেই ঘর। তাঁকে যে আর আসতে দেওয়া হয়নি, সে-কথা আগেই শুনেছিলাম। 'সে আমাকে আসতে দিচ্ছে না।'...জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। কেন যে তখন সোনার খাজাঞ্চিখানা আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, আজো বুঝতে পারিনি। ঘরটি অতিমাত্রায় নিঃশব্দ বোধ হচ্ছিল। সেই সব শোফা-সেট, বইয়ের আলমারি, আর একদিকে খাবার টেবিল। গতায়ু সাহিত্যিকের স্ত্রী বসে ছিলেন কোণের একটি সোফায়। আমাদের কারোরই কথা বলার কোনো দরকার ছিল না।

সেই নৈঃশব্দের মধ্যে পিছনে সামান্য একটি শব্দে ফিরে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাহাদুর—নেপালী যুবকটি। লেখকের সঙ্গে ওকে আমি এই প্রাক্তনের বাইরে কলকাতায়ও দেখেছি, তখন ও বালক ছিল। কলকাতা থেকে এই প্রাক্তনে, প্রাক্তন থেকে কলকাতায়, ওকে অনেকবার দেখেছি। বুঝতে পারিনি, তবে ও ভাগরা জোয়ান হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একদিন কবে, নাক-চোখহীন একটি হাসিভরা মুখ করে ঘোষণা করেছিল, 'বাবু আমি বিয়ে করেছি।' বলতে বলতে কান্ধনবর্ণ মুখখানি লাল হয়ে উঠেছিল।

পিছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে, কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। পারিনি। ওর চোখ থেকে জল পড়ছিল। মনে পড়েছিল, প্রাক্তনের সেই ঘরটিতে বাহাদুর আমাদের কতো রকমের রান্না করে খাইয়েছে। কতো পানীয় পরিবেশন করেছে। লেখকের খুব আপত্তি ছিল ওর বিয়েতে। ওর পাহাড়ী বুকটা ছিল কমজোরি। ছেলের মতো দেখতেন। বলতেন, 'বিয়ে করলেই গুচ্ছের ছেলেমেয়ে হবে, তাদের পুষতে গিয়ে আরো হয়রান হয়ে শরীরটা খারাপ করবি। বয়সের ধর্ম আছে জানি। চুটিয়ে প্রেম কর না।'...কিন্তু লেখকের সেই কথাটিও আমি ভুলতে পারিনি। আকাশের বুকে পাঁচ খাজাঞ্চিখানাকে ঢেকে, মেঘেরা তখন নানা রঙে শূণ্যস্থান পূরণ করতে চেষ্টা করছিল। রক্তের আভাসটা ছিল বেশি। লেখকের মুখে অকাল অন্ত্যভার ছায়ার রেখাটি মাত্র দেখা

দিয়েছিল। কী প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন। একজন গর্ভবতী (স্পষ্ট) মহিলাকে ঘোড়ার পিঠে দেখে, আতঙ্কে উদ্বেগে প্রায় কৈপে উঠে বলেছিলেন, ‘লুক, হোয়াট এ ফুলিশ উয়োম্যান শী ইজ! পেট ভরা বাচ্চা, (এই রকমই বচন ভঙ্গি ছিল) দুলালী ঘোড়ায় চেপে বেড়াচ্ছে। স্বামীটিকে ধাক্কাড় মারা দরকার। হাউ হি ডেয়ার্স টু অ্যালাউ হার কর রাইডিং?’...তার-পরে অত্যন্ত মনস্ত হয়ে বলেছিলেন, ‘আছে হয়তো ঘরে একপাল।’

তাঁর ঘরে একটিও ছিল না। আমি বাহাদুরের চোখের জলে, বড় খাজাফিখানার সোনার ফোঁটা দেখেছিলাম। আমরা কেউ-ই কোনো কথা বলিনি। বাহাদুর অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিল। ও আমার সামনে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়েছিল।

এ প্রাক্কণের অনেক কথা। আজ আর সব কথা বনুতে মনে ভার চাপছে। কেন আমার এ সব কথা? আমি তো সেই তাঁর দর্শনপ্রার্থী, জলপাইগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথম যাকে দেখেছিলাম। তাকে দেখার কোঁতুলটা এমন এক আকাঙ্ক্ষা পরিণত হয়েছিল, আরব সাগরের জল যে লোনা, তাঁর বাখানি লিখতে উঠে গিয়েছিলাম সেই প্রাক্কণে। সমুদ্রের কথা পাহাড়ে বসে লেখা, সে হলো গিয়ে এক মন-গুণের কথা। সেবার আমার আশ্রয় জুবিলি স্থানাটোরিয়ামের তিনতলার ঘরে। এক পত্রিকার কর্তৃপক্ষের আমি অতিথি। কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিত্ব আশ্রয় নিয়েছিলেন অতীত। বরফ-বড়-খাজাফিখানা-পাঁচ তেমনই অতীত। তাঁর সময় তাঁর কম। কখন ঘণ্টা বেজে যেতো, টেরই পেতাম না এক একদিন। মাঝখান থেকে মন ভুলিয়েছিলেন, পশ্চিমী খানাঘরের বাঙালী স্টুয়ার্ড মহাশয়। গৃহিণী তাঁর পর্বতকন্ঠা। স্থানাটোরিয়ামের পিছনে তাঁর ছোট কুটির। কুটিরে মিষ্টি বউ। তাঁর চেয়ে বেশি মিষ্টি থুতু। প্রায়ই খানাঘরের খানার বদলে তাঁর নিভৃত কুটিরে নিমন্ত্রণ জুটতো। সে সময়ে ওরাও কিছু খুশির ভাগ দিয়েছিল। বরেন-সমরেশ্বর।

সেবারের কথাটা আরো একটু বেশি মনে পড়ে, কারণ পথ বদলের সূচনা সেবারেই। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। চলেছিলাম সমতল ছায়া ঘেরা নিকুঞ্জ পথে, নাম যে কারণে ম্যালু। হঠাৎ কানে এসেছিল, আমার নাম ধরে ডেকে ওঠার সন্ধান। ফিরে তাকিয়েছিলাম। প্রায় মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি বেশেবাসে পুরোপুরি সাহেব। মাথার সামনে অনেকখানি চওড়া জায়গা কেশ-হীন, হাতে ছাতা। তাঁর এক পাশে স্ত্রী এক মহিলা। মেদের বাছল্য নেই, প্রথম দর্শনে তরুণী বলেই মনে হয়েছিল। আর এক পাশে এক নবীন

কিশোরী, দুই বেণী দোলানো ঘাড়ে। ওই সেই কী বলে, বেল বাট-এর সঙ্গে বেন্ট আটা জামা। সকলের মুখেই মিটিমিটি হাসি, কোঁতুহলিত জিজ্ঞাসা।

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। মহাশয়টির মুখের হাসিতে কেমন দ্বিধা। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন?’

আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কয়েক পলক মাত্র। সহসা বহুদিনের ওপার থেকে একটি আঁত চেনা চোখ আর হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল আমার স্মৃতিতে। বলে উঠেছিলাম, ‘দত্ত? দত্ত না?’

তিনি পথের মধ্যেই আমাকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন, বলেছিলেন, ‘সত্যি, কী যে খুশি হলাম, আর কৃতজ্ঞ। কী করে আমাকে চিনলে?’

বলেছিলাম, ‘সত্যি, চেনার কিছুই আর রাখিনি। বয়সের থেকে বাড়িয়ে কেলেছে চোহারাটাকে। কথার ভাবভঙ্গি রীতিমতো রাশভারি। তোমাকে তুমি বলতেই ভয় করছে।’

দত্ত হা হা করে হেসে উঠেছিল। আবার তৎক্ষণাৎ থেমে বলেছিল, ‘বাট রিমেমবার, আমি কিন্তু কখনোই তোমার বন্ধু ছিলাম না, তোমার বয়সীও আমি নই। আমি তোমার মেজদার বয়সী, ওরই বন্ধু।’

বলেছিলাম, ‘কিন্তু মনে হয়, ছেলেবেলায় তোমাদের সঙ্গে আমাকেও খেলতে দিতে।’

সে হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিল, ‘সত্যি।’ বলেই সে মহিলা ও কিশোরীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘আমার স্ত্রী, আর কণ্ঠা। সব থেকে অবাক কাও কী জানো? আমার স্ত্রী আর কণ্ঠা তোমাকে চেনে—মানে, তুমিই যে সেই লেখক, তা জানে। বোধ হয় কেউ কখনো তোমাকে দেখিয়ে বলে থাকবে। আর এদের কাছেই শুনি, তুমি নাকি প্রায়ই এখানে আসো। এরা আমাকে বাড়িতে গিয়ে বলে, তোমার সেই বন্ধু লেখককে আবার দেখলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না? নাকি তোমাকে আর চিনতে পারেন না?’ দত্ত ওর স্ত্রীর লজ্জিত হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলেছিল, ‘আসলে ব্যাপারটা কী জানো? তোমার কথা শুনে আমি বখন বলি, ও আমার ছেলেবেলার চেনা, বন্ধুই বলতে পারো, এরা আমাকে বিশ্বাস করতো না।’

কণ্ঠা অমনি লজ্জায় ও সংকোচে, পলকে একবার আমাকে দেখে, পিতার কাঁধের কোটে মুখ চেপেছিল। বলে উঠেছিল, ‘আহু, বাবী!’

দত্তজান্না বলে উঠেছিলেন, ‘আহু, কী সব বাজে বাজে কথা বলছে।’

দত্ত বলেছিল, ‘বাজে কথা? তাহলে শোনো ভাই, বলি। এই যে এখন

তুমি থাকিলে, আমি সত্যিই তোমাকে চিনতে পারিনি। কী করে চিনবো ? তুমি তো চেহারায় এখনো যুগটি রয়েছো। তা, আমার গিন্নি হঠাৎ তোমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'ওই তো উনি যাচ্ছেন, সেই লেখক। তুমি যে বলো, তোমার ছেলেবেলার চেনা ? একবার ডাকো না দেখি।' আমি সত্যিই খুব বিপদে পড়ে গেলাম। তোমাকে চিনি চিনি মনে হলোও, তুমি যদি আমাকে চিনতে না পারো, বউ মেয়ের কাছে প্রেস্টিজ একেবারে পাণ্ডচার হয়ে যাবে ! তারপরে যা থাকে বরাত, এই ভেবে তোমাকে ডেকে বসলাম। ভাগ্যিস ডেকেছিলাম, আর তুমিও চিনতে পারলে।'।

পথচারীদের চমকিয়ে দিয়ে, আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। দস্ত তথাপি বারে বারে বলেছিল, 'না না, তোমাকে আমি ক্রেডিট না দিয়ে পারছি না। আমার ছেলেবেলার কেউ-ই আর আমাকে দেখলে এখন চিনতে পারে না। আমি একেবারে বুড়িয়ে গেছি।'।

আমি হুত্ৰী ও উজ্জল দস্তজায়ার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তা হঠাৎ এমন বুড়িয়ে গেলেই বা কেন ?'

দস্ত হতাশ হেসে বলেছিল, 'চাকরি, জীবন যাপন, সব মিলিয়েই বলতে পারো। তা ছাড়া আমি দেখতে কোনোকালে শ্রীকান্ত ছিলাম না।'।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখন কোথায় চললে ?'

দস্ত অবাক হয়ে বলেছিল, 'কোথায় আবার, বাড়ি ? এই তো অফিস থেকে ফিরছি। ওরা এসেছিল ম্যাল-এ বেড়াতে, এদের নিয়ে কিরছি।'।

আসল কথাটা কল্পনাতেই আসেনি। সে যে চাকরির স্বত্রে পাহাড়ে, ভাবিই নি। নিজেই আবার বলেছিল, 'আয়কর অফিসের চাকরি। তা প্রায় চার বছর এখানে আছি। প্রত্যেক বছরই তুনি, তুমি এখানে এসেছো।'।

জেনেছিলাম, দস্ত তখন পাহাড়ের আয়কর অফিসার। ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তখনই। কত্যাটি তো কিছুতেই ছাড়বে না, আঙ্কল্কে বাড়ি নিয়ে যাবেই। বুঝিয়ে-বুঝিয়ে পরের দিন সকালবেলা যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। গিয়েছিলামও। গিয়েই দেখেছিলাম সাজো সাজো রব। ছ'দিন বামেই দস্তকে যেতে হবে কালিম্পং। সেখানকারও আয়কর অফিসার সে। সেখানে তার ক্যাম্প বসবে। শ্রী কল্যারও (জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে বাড়িতে দেখেছিলাম।) যাবে, তবে তারা থাকবে আলাদা হোটেলে। অফিসারের কাজের ফাঁকে, পরিবারেরও একটু ভ্রমণ। অতএব, 'আঙ্কল, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে, কালিম্পং বেড়িয়ে আসবে।'।

কিন্তু আমার যে সেবার টিকি মে রাখাক্ষিণ ! আরব সাগর আমার সঙ্গে । পাহাড় থেকে তাকে নামিয়ে যেতে হবে তো । তা বললে কি চলে ? প্রায় তখনই হাত ধরে টানাটানি । দস্তর ছোট ভাইও তখন সেখানে, উদ্বেস্ত পাহাড় ভ্রমণ । সেও তার ভাইবন্ধের আর বউদি দাদার সঙ্গে দল পাকিয়ে কলে ছিল । এক সাড়া, ‘চলো চলো, কালিম্পং চলো ।’ দস্ত বলেছিল, ‘তাছাড়া তোমার মনের কথা শুনলাম, তুমি তো ভুল জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে । তোমাকে যেতে হবে তিস্তার ধার ধরে, পাহাড়ের বুকে তার উৎস সন্ধানে । তোমার পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা তো সেখানেই । কালিম্পং তোমার পথ চলার সরাইখানা, সেখানে তোমাকে যেতেই হবে । সেখান থেকে গ্যাংটক । পাঁচ-খাজাঞ্চিখানার অনেকখানি কাছে পৌঁছে যাবে । অন্তত দেখার জগু হা পিতোশ করে থাকতে হবে না । সারাটা দিন তারা তোমার চোখের সামনে জেগে থাকবে । তাছাড়া আরো কথা আছে ।’

আরো কথা ? তার কথা শুনতে শুনতে আমার ভানায় যে তখনই কীপন ধরেছিল ! দু’চোখ ভরা ব্যগ্র জিজ্ঞাসা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম ।

দস্ত বলেছিল, ‘তাছাড়া, দার্জিলিং থেকে কালিম্পং-এর রাস্তাটা যদি না দেখলে, তো দেখলেটা কী ? আমি যে আমি, কেবল লোকের আয়ের খাতায় শ্রেন চক্ষু পেতে বেধেছি, এমন কি নাকে পর্যন্ত গোপন টাকার গন্ধ শুঁকি, সেই আমি ইস্তক রাস্তাটা দেখলে কবি হয়ে উঠি । তার বেশি, গায়ক পর্যন্ত ।’

এমন রাস্তা ? তারপরে আর আপত্তি চলে কী করে ? বিশেষ করে, সেরাস্তা যদি আবার পাঁচ খাজাঞ্চিখানার দিকেই নিয়ে যায় । অতএব, কলম বাণ্ডরে ঘুরা মাঝি, পার করো তোর আরব সাগরের লোনা পানি । আরব সাগরের পাণ্ডুলিপি তখনকার মতো অসমাপ্তই রাখতে হয়েছিল । কর্তৃপক্ষের হাতে ভুলে দিয়ে বলেছিলাম, ‘নিচে নেমে গিয়ে সমাপ্তি টানবো । এখন আমার ডাক অগ্ন্যধানে ।’

দস্ত পরিবারের সঙ্গে, আমার বহুদিনের প্রাক্কণটি ছেড়ে বাবার আগে, মনটা বারে বারেই খচ্ খচ্ করেছিল । যদিও ঘুরে আবারো এই প্রাক্কণে, পরে এসেছি । কিন্তু সেবারের খচ্খচানিটা যেন কেমনভরো । এ প্রাক্কণের অনেক স্বতি, অনেক মুখ, বার্চ আর পপুলারের মতো, কচি কর্নি আর অর্কিডের মতো, পাথরের গোলাপ আর প্রজাপতির মতো আমার দৃষ্টি জুড়ে ছিল । তার অনেকটাই নানা সুখে দুঃখে ভরা । কিন্তু কাঁটার বেধা ব্যথার মতো অহুত্বটি কিসের ?

কালিম্পং-এর পথে, কোনো এক মনোরম জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। যেখানে একদিকে মৌন মহান উচ্চতার নিবিড় নীল সবুজ, আর একদিকের অতল গভীরে একটি সর্পিলা নদীর ধারে ধারে পথ উৎসর্গামী। কলকল কথায়, ঝরঝর হাসিতে সবাই ঝরনার মতো। আমি এক পাশে গভীর খাদের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রজ্ঞাপতি উড়ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, ‘তোমাকে আমি খুঁজে নেবো।’...যায় সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল স্তানাটোরিয়ামের নির্জন গভীর উৎরাইয়ে। সত্যি কি কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম? মিথ্যা কি এ তাই ভুল্লর নিজেকেও একটু চোট দেয় না? প্রাক্তনের ভ্রমণে বায়ে বায়ে সেই কথা মনে হয়েছে, আর জপ করেছি, ‘যেন খুঁজে না পায়। খুঁজে না পায়...গরীব।’ আমার...। নতুন পথের ঠিকানায় হঠাৎ কেনই বা যে কথাটা মনে পড়েছিল। তখন তো স্ব্থের কাল, প্রত্যাশার পথে চলেছিলাম। তবু মনে পড়েছিল। আর নারায়ণদাকে, ‘উপনিবেশ’-এর সেই ব্যালকনি। আমরা কেউ আর কারোর দেখা পাইনি।...

এমন না যে রাজার প্রসাদে গিয়ে উঠেছিলাম। কুইনস্ অব্ হিমালয়-এর হিসাবে। কালিম্পং সেই তুলনায় ঝলকায় কম। এক অর্থে যেন দরিদ্র। রাস্তা-ঘাটের প্রসার, চোখ ভোলানো পল্লবের বিস্তৃতি, কোনো কিছুই তেমন রানীর মতন না। সাজগোজ যাকে বলে। রানীর প্রাক্তনে পা দিয়েই যেমন চোখে ঝলক লেগেছিল, মন উঠেছিল ঝলমলিয়ে, কালিম্পং-এর অভ্যর্থনা সে রকম না। রাজার ছিল, ব্যস্ততাও ছিল। চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তার মোড়ে ঝকঝকে জুজুটি পোশাক পরা পথের নিশানা দেখানোর পুলিশ ছিল। তবু কোথায় সেই রমরমা? ম্যাল কোথায়, সেই অশ্বরাহিনীই বা কোথায়, থোকা থুঁ থেকে তাদের দাদা দিদি বাবা মায়েরাও যাদের পিঠে চেপে কতো না বন্ধ করতো সেখানে? সেই সব ইন্ডুল কলেজও নেই, ছাত্রছাত্রীরা যেখানে দল বেঁধে হৈঁচেক করে বেড়ায়। সেও তো এক রঙের মেলা বটে।

তবু কী যেন আছে। কলকল কলরব নেই। ঝকঝকে ঝলমল নেই। নেই তেমন চঞ্চল চপল গতি, হাসি উচ্চরবে। কিন্তু কোথায় যেন রয়েছে ছুটি চোখের অপলক দৃষ্টি। গভীর গভীর মুখ, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি। চূপচাপ শান্ত। পাথরের ফাটলে, স্তাওলা ধরা গায়ে নানা বর্ণের ফুল। মনে করিয়ে দেয় অজস্র তারা ছিটানো আকাশ। প্রকাণ্ড আর আকাশ বেঁধা বনস্পতির সারা গায়েই যেন অর্কিডের ছড়াছড়ি। ছোটোখাটো, নামে শহরটির দাওয়ায় এসে ডানদিকে ঘুরে গেলেই এমন একখানি রাস্তা, ঠিক যেন বাংলা-

দেশের কোনো সমতলে এসে পড়েছি। এমন কি রাজ্যটার দু'পাশে সমতলের কিছু কিছু চেনা বৃক্ষও রয়েছে। এমন না যে, কোথায় যেন একটা রহস্ত রয়েছে। বরং চূপচাপ শান্ত ভাবের মধ্যে, কোথাও রক্ত হাসির কৌতূকের ছটা লেগে রয়েছে নাকি ?

বৃক্ষতে পারি না। বৈবাগ্যের ছায়া লেগে রয়েছে নাকি কোথাও ? মন কেন বিবাগী হতে চায়। ছোটখাটোর মধ্যেই, কোথায় যেন অনেকগুলো পথের নিশানা রয়েছে। দূরাস্তের পথ, অচেনা দুর্গম আর বিস্ময়কর। যার শেষেই রয়েছে এক সুগভীর স্তব্ধতা, মুগ্ধ আনন্দের ব্যাপ্তি কোনো শব্দকেই যেন উচ্চারিত হতে দেবে না। মালুঘেরা সেই পাঁচ-চুড়োর মতো, রঙের খেলা তাদের মুখে। পশুরাও ভিন্ন চেহারার, যেন বাঁচবার তাগিদেই গা ভরে ঘন আর দীর্ঘ লোম গজিয়ে নিয়েছে।

এক বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফেলে আসা প্রাক্কণের থেকে এখানকার মালুঘের চেহারা ভাবভঙ্গি আলাদা। পাহাড়ের মালুঘের মধ্যেও যে কতো রকমের মুখ চোখ, তা বৃক্ষতে সময় লাগে না। দাগ কেটে তফাত বোঝানো মুশকিল। পুরুষের চুলের বিছনি আর দাড়ি, সেটা বেশবাসের বিষয়। রমণীদের পোশাকের বেলাতেও একই কথা। কিন্তু এই সব অমিলের সঙ্গে, আরো কিছু কিছু অমিল চোখে ঠেক লাগিয়ে যায়। গড়ন পিটন, লোমশ অলোমশ, চোখ চিবুক আর যাকে বলে কপোল। মনে মনে বলি গালের হুহু। রঙের ক্ষেত্রেও তাই। ছেড়ে আসা প্রাক্কণে নানা রঙের মিশেলটা চোখে পড়তো। এখানে চোখে না পড়ার মতো।

ইতিমধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল যথারীতি। আয়কর অফিসার সাহেবের ব্যবস্থা আলাদা। পরিবারের নিজস্ব ব্যবস্থা আলাদা। যা করতে হবে, সব আইন মোতাবেক। খেলার মাঠের কাছাকাছি একটি দোতলা বাড়ি পরিবারের জন্ত ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আয়কর অফিসারের ব্যবস্থা সরকারী। তিনি তাঁর ক্যাম্পে। তা বলে এমন কোনো আইন নেই, তিনি পদ্ম-কন্ঠা, ভ্রাতা-বন্ধুর সঙ্গে বাস করতে পারবেন না। তবে কী না, তিনি হলেন কাজের মানুষ। আমরা অকাজের। কিন্তু কাজের মালুঘের সেই কথাটিতে কোনো তুল ছিল না। কালিম্পং আসবার পথে সত্যি সত্যি তাঁকে আমি গান করতে দেখেছিলাম। কেমন গান, সে কথা আলাদা। সেই হলো আস্তর প্রকাশ। কথায় তুল থাক, আর স্বরে অমিল, তা-ও যে কতো সুন্দর হতে পারে, পথের প্রাণভোলানো রূপেই তার প্রমাণ মিলেছিল। তার ওপরে ছিল কবিতা আবৃত্তি।

হাততালি দিয়েছিল কন্নারা, বাবীর ভুল ধরিয়ে দিয়ে। বাবীর তাতে কিছুই এসে যায়নি। ভুলভাল যা-ই হোক, তিনি তো আর আমাদের শোনার জন্য ফুসে ওঠেননি। তিনি শোনাচ্ছিলেন তাঁর আত্মাকে। মদতদার হিমালয় পর্বত। দস্তআয়াকে কন্নারদের সঙ্গে আলাদা করা যায়নি। কপালে সিন্দুরবিন্দু নিয়েই তিনি বালিকা হয়ে উঠেছিলেন।

আসবার পথে, হু' একবার তিস্তাকে চোখে পড়েছিল। দূর থেকে। দার্জিলিং থেকে কালিম্পং তিস্তা সে পথের শরিক না। সমতল থেকে তার ঘরের পথ আলাদা। সমতলে সে প্রবাসিনী। নাকি অকূলের রণরঙ্গিনী? কী যে তার তত্ত্ব, কে-ই বা জানে। কী তার নাড়া, কাদের সঙ্গেই বা তার মোর্চা, অতপি কেউ নিরিখ দিতে পারলো না। কেবল একটা কথা মনে হলে মন ভারি হয়ে আসে। সেও এক পাহাড়ী মেয়ে—পার্বতী। দস্ত তাঁর নানান খুশির মধ্যে, দূর থেকে তিস্তাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওর সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। তোমার এতদিনের আশা, ওর সঙ্গেই বাঁধা। আমার গতি বাংলা মূলুক পর্বন্ত, কিংবা বলতে পারো ভারত। তাই কালিম্পং পর্বন্ত আমি মদত দিতে পারি। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়েই তোমার সেই পাঁচ-চুড়োর হুলুক সন্ধান আমার জানা হয়ে গেছে। তিস্তার ঠিকানা তাই তাদের ঠিকানা!'

কথার মতো কথায় যে শিহরণ লাগে, তা দস্তর কথাতেই টের পেয়েছিলাম। অনেক দিনের একটা না-জানা ঠিকানা তাঁর মুখে শুনে, মন নেচে উঠলো। সকলেরই নাচে। যাকে খুঁজে বেড়িয়ে মরি, তার ঠিকানা পাওয়া যে কী, সে যে খোঁজে, সে-ই জানে। অবাক লেগেছিল, অথচ ঠিকানাটা এমন কিছু যথ-দেওয়া ধন দৌলতের পথের মতো চোরা কোশলের না। প্রমাণ একটা পেয়ে-ছিলাম, প্রথম রাতটা কাটতেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, কাঁচের জানালায় চোখ রাখতে গিয়ে, চোখে হাত চাপা দিতে হলো। সত্যি সত্যি চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতোই। ফটিকের ওপর সূর্যছটা লাগলে, তার দিকে চোখ রাখা যায় না। সেই রকমই চোখে লেগেছিল। আকাশের গায়ে এমন বিরাট ধুল্ল উঠোনটা কিসের? মনে হলো যেন পাকাপোক্ত রাজমিস্তিরি, আকাশের কোলে মেপেজুপে এক উঠোন বানিয়েছ। শাদায় কিঞ্চিৎ তুঁতে মিশিয়ে, কণিক দিয়ে পথের মতন মেলেছে। আর তার বুকের ওপরেই তুলেছে বিরাট এক সাতমহল। তার ডাইনে বায়ে নিচে মহলের পর মহল। রূপালী লাল আর যেকন রঙের ছড়াছড়ি।

দস্ত পিছন থেকে বলে উঠলেন, 'দেখছো তো? ওই তোমার পাঁচ বাজাকি-

খানার কিছু কিষ্কিৎ। তুমি যাকে পাঁচ ধরে রেখেছো, তার যে আরো কতো পঞ্চাশ আছে, তার লেখাজোখা নেই। তবে হ্যাঁ, পাঁচই হলো আসল।’

জলপাইগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে, সেই প্রথম একজনকে দেখার কথা মনে পড়লো। অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছি, সন্দেহ নেই। আমার ভিতরের কোথায় যে ধরধরিয়ে কাঁপছিল, তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারার ইচ্ছেও ছিল না। কারণ আকাশের গায়ে দ্রুত একটা আবরণ যেন কেউ টেনে দিচ্ছিল।

দত্তজায়া হাত বাড়িয়ে ধুমায়িত চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, ‘একেবারে মজেছেন দেখছি, চক্ষে হারিয়েছেন? এখুনি রঙনা দেবেন নাকি?’

আবার সেই, টিকি মে রাধাকিষণ। মন টাটিয়ে ওঠে। একটি নিখাস ফেলে বললাম, ‘এ যাত্রায় নয়। নিচে থেকে ঘুরে আসতে হবে। এই হেমন্ত যাবে, সম্ভবত আগামী গ্রীষ্মে।’

দত্ত বললেন, ‘তবে মনে রেখো, তিস্তাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আর কেউ নয়। আর একজন পারে, তবে সে-পথের ঠিকানা আলাদা। রাস্তাটাও একটু বেকায়দার। তিনি আবার পুরুষ, নাম ব্রহ্মপুত্র।’

দত্তজায়া হেসে বললেন, ‘পুরুষের থেকে নারীই ভালো।’

দত্ত বললেন, ‘লেখকের পক্ষে। আমাদের শাস্ত্রে তারা বিবর্জিত।’

দত্তজায়া তাঁর চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, ‘কেবল মুখে। কাজে না।’

দত্ত হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘ওরে বাবা, সময় নেই, সময় নেই। এখুনি অফিসে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি গানের গরম জল দিতে বলা।’

দত্তজায়া হেসে, একবার আমার দিকে দেখে চলে গেলেন। দত্তর রণে ভক্তটা শিশুর মতো দিব্য স্তম্ভর।

কালিম্পং-এর পথে আর ঘরে, ভ্রমণে আর নানা গল্পে, কখনো বা তাস খেলে কাটলো। অকাজ নিঃসন্দেহে। কিন্তু অকাজের মধ্যে আনন্দের ছটা, আকাশের বুকে কয়েকবার করেই বলকিয়ে উঠতে দেখেছি। কিন্তু এখন দু’দিন ধরে দেখছি, অজনের দুরার থুলে গিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের তফাতটা বোধ হয় এখানে। হেমন্ত যতো শীতের কোলের ঢলে, আমরা ততোই আবরিত হতে থাকি। কিন্তু আকাশের তখন ঘোমটা খোলার সময়। যদিকেই তাকাই, সবথানেই দেখি রঙের খেলা। এমন কি, পাঁচ-চুড়োর আসল নকল চেনাই অনেক সময় মুশকিল হয়ে ওঠে।

এদিকে ঘন্টা বাজছে। দত্তর ক্যাম্প পাততাড়ি গোটাতে কবে কে জানে।

‘হু’সখাহের জায়গায় চার সপ্তাহও লাগতে পারে। তাঁর তো ছুটি কাটাবার সময় না। কাজের দিন। বস্ত্রীদের ইঞ্চুল কলেজ আছে বটে। থাকবেই তো। এমন ছুটি কাটাবার অবকাশই বা ছাড়তে চায় কে। অভাব প্রজাপতি মেলে দাঁও তোমার জানা। দস্তর অঙ্কের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তার লক্ষ্য আবার একটু অঙ্গ রকম। সে খুঁজে বেড়ায় তিক্ততের মানুষদের। তাদের কাছে থাকে পাথর আর সোনা। অনেক ক্ষেত্রেই তা নকল। তবু সন্ধান কী না হয়। মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

অবাক চোখেই দেখেছি, রাস্তার ধারে, ময়লা একখানি (ময়লা কী না, জানি না, আমার চোখে তাই) ইয়াকের চামড়ায়, লাল এক খণ্ড কাপড় বিছিয়ে সোনার আর পাথরের অলংকারের পসার নিয়ে বসে আছে, পাথর-মুখো তিক্ততা। পাথরমুখো বলছি বটে, আসলে তুষারমুখো। নানা সময়ে সেই সব মুখে, নানা রঙ খেলে। কিন্তু পথের ধারে, পাহাড়ী ছাগলের চামড়ায়, সোনা আর মূল্যবান পাথরের পসার? কেন, ছিনতাই তরুণেরা কি লোপ পেয়েছে নাকি? পাথরগুলো যদি বা ঝুটা হয়, সোনা যে তা নয়, পরখ করে দেখেছি। তবে তুষারমুখো মানুষগুলো ভারি কারবারি। হু’ পয়সা বেশি নেবে, আধ পয়সাটিও কম না। সে সাধারণ মানুষই হোক, আর সেই যে কী বলে, লামাই হোক। চীনাঁদের তাড়ায় এপারে এসেছে। কিন্তু অপের মালা গুনতে গুনতেও হিসাবের অঙ্ক একেবারে টায়ে টায়ে। তা না হলে, অনেক রেশমী বস্ত্র আর ধাতব বস্তুর দিকে নেকনজর আমাদেরো কম পড়েনি।

মন বসতে দিলে চলবে না, নিচে নামতে হবে। মনের এমনি আনচান ভাব। একা একা আনমনে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছি দস্তর অস্থায়ী অফিসে। সিঁড়ি বেয়ে ষষ্ঠবার মুখেই নারী পুরুষ স্বরসঙ্গতে এমন হাসির রেলা কানে এলো, আরকর অফিসকে মনে হলো, খুশদিলের দরিয়া উথল। ছত্রিশ গুণা ছিজের কথা জানি না, কিন্তু বাড়তি হিসাব পালাবার একটি ছিজও যেখানে-সেখানে নজর করা হয়, সেখানে আবার হাসি কিসের? চোরের কথা আলাদা। সাধুও যেখানে ঘণ্টা বাজাতে ভুলে যায়, মন্দিরটিকে এমনই ভয়, সেখানে এত খুশ দিলের দরবার করা বলিয়েছে।

সিঁড়ির ওপরে দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দস্তর বলে উঠলেন, ‘আরে তুমি? এসো এসো। এই একটু আগে তোমার কথাই হচ্ছিল!’

আমার কথা? কাদের সঙ্গে? দস্তর টেবিলের স্রুখে মুখোমুখি ধাতব দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের একজনের গারে জড়ানো ফিটকাট ফোঁজী পোশাক।

জলপাইও না আবার হলুদ না, কিন্তু ফোঁজী পশমী রঙ বেশ গাঢ়। নাভির নিচে, কটিতে চওড়া বেল্ট। কাঁধে কয় তরকা, কিসের চিহ্ন, সে সব বুঝতে পারছি না। কিন্তু পায়ের জুতো থেকে মাথার ছোট চুলের উল্টা টানেও শাল গাছের মতো লম্বা চওড়া চেহারার মানুষটি যে ফোঁজী, কোনো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহের মধ্যে যা নির্ধাৎ মনে হলো, উনি একজন অফিসার। গৌর-দাড়ি কামানো, একটু লাল মুখ। মোটা ভুরুর নিচে মুখের থেকে বেশি লাল গোখে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

অফিসারের পাশের চেয়ারে—কী বলবো? কিছুদিন আগে এক বিশিষ্ট কবির মুখে শুনেছিলাম, ‘পণ্ডের ভক্তিতে গম্ব লেখা আমার মোটেই ভালো লাগে না।’ সেই কবি আবার একজন অনামধ্য গম্ব লেখকও বটে। কিন্তু সত্যি বলছি, পাশের চেয়ারে মনে হলো, সব মিলিয়ে একরাশ ফুল, ফুলের মালা, নানা বর্ণে ছড়ানো। এই বর্ণনায় অন্তত একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট, পাশের আসনে যিনি, তিনি রমণী। মন খুঁত খুঁত করে। রমণী আবার মহিলা বা নারীর পরিচয়ের ভাবায়, অশালীন নয় তো?

কতো লোকে কতো কথা যে বলে এক এক সময় তার থৈ ভাল পাই না। খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে? বোধ হয় না। যখন যে-কথাটি মনে আসে, তারেই লাগে ভালো। পাশের চেয়ারে যিনি বসে ছিলেন, দেখলাম তিনি একজন রমণী। রমণীও নিঃসন্দেহে। শাড়িতে তিনি এক কথায় গোলাপবালা। কিন্তু রেশমী গোলাপে, এখনো অজস্র শিশিরবিন্দু। অন্তরায় কেন চিক চিক করে? কিন্তু রেশমী গোলাপ বড় উদাস। না হলে আঁচল কেন লুটায় আসনের নিচে মেঝেয়? রেশমী গোলাপ যদি উদাস, তবে ঢলঢল অঙ্গও উদাস। গোলাপের সঙ্গে মেশানো গোলাপি জামার চিহ্ন কেন খুঁজে পাই না? বড় সংক্ষিপ্ত। কেন, হেমস্তের কালিম্প্য-এ কি শীত নেই? বিদায় নিয়েছে? কখন, কেমন করে?

সে-কথা আমার জানবার না, বে-এখতিয়ার জিজ্ঞাসা। তবু আঁচলবিহীন বুক কি বড় বেশি উদাস না? কপালকুণ্ডলার কালীর রক্তচক্ষের কথা মনে পড়িয়ে দেয় কেন? চোখের দোষ। মানলাম, টলটলে মুখখানিতে সোনার রঙে এত আগুনের মত লাল আভা কেন? ভুরু থাকতেও ভুরু আঁকা, সেটি প্রসাধনের মাহাত্ম্য, এমন কি চোখের কাজলও। তবু চোখের কালো তারা দুটির সরোবর এমন লাল টকটকে কেন?

ঠোট দুটি যে কেবল গুঁঠরুণী দিয়ে রাঙানো, তা আরপে না। রঙেতেই

জানিয়ে দিচ্ছে, এ লাল, সেই লাল, তাহুলরাগ। কালো চুলের এমন দশা কেন? না হয় তা পিঠ বেয়ে নামেনি, এমন আলুখালু কেন? কপালের সামনের দিকে এলানো, কাঁধে ছড়ানো। যেন একরাশ কালো কেশের মাঝখানে টুকটুকে লাল একখানি মুখ। তবু এত কথা বলেও একটি সার কথা না বলে পারা যাচ্ছে না, রমণীর মুখ যেন একটি শিল্পর। কেন? রূপের এ সব ভিয়েন কে করে? মুখের সঙ্গে যেন অঙ্গের মিল নেই। অঙ্গের সঙ্গে ভঙ্গির। চলচল অঙ্গে ঢুলুঢুলু দৃষ্টি কি মানার! ঠোঁটের কোণে বিকচ হাসি? এত কেন কাঁপে নাসারন্ধ্র? তুফলতার বাঁকে জিজ্ঞাসার চিহ্নটা অবিস্তি পড়তে পারি।

ফৌজী অফিসার আর রমণী, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি। সম্পর্কের কথা তারপরে আর বলে দেবার দরকার হয় না। অহুমান প্রাথমিক হলেও বে-ওজর কী? কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার বিষয়ে কী কথা হচ্ছিল? দেখে তো মনে হয় আমরা দূর দূরের লোক। দূরলোকের মানুষ। আশেপাশের চেয়ারে আরো অনেকেই বসে আছেন। বাঙালী অবাঙালী চেনবার উপায় নেই। কিন্তু অসুবিধা নেই পাহাড়ী মানুষদের চিনতে। তাঁরাও আর করেন, অতএব আর-কর অফিসে তাঁরাও এসেছেন। অস্থায়ী ক্যাম্প হলে কী হবে। কেবানী পিয়ন বেয়াঁরাও আছে। দস্ত সাহেবের কথা এবং ডাক শুনে কেবল যে ফৌজী অফিসার এবং অফিসারজায়া আমার দিকে ফিরে তাকালেন তা না। সকলেই আমার দিকে তাকালেন।

প্রবেশ মুখেই চোখ চালিয়ে দেখে নিয়েছি, হাশুরসের কথা যা-ই হয়ে থাকুক, তার রঙ লেগেছে সমতল আর পাহাড়ী সব মানুষদেরই মুখেই। আয়-করের দপ্তরে আয়কর অফিসারের সামনেই যে এ রকম হাসি-উচ্ছল আড্ডা জমবার অবকাশ থাকতে পারে, এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, তার মানে কী? হাশু কোঁতকের লক্ষ্য আমি নাকি?

দস্ত আমাকে ডাকলেন, 'এসো। এসো।' অন্তর্দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'বাহাদুর, মেজর সাবকো সামনে এক কুরশী লাগাও।'

নিজের এলেমকে বাহাদুরি দিতে হয়। ফৌজী সাহেব যে ভেবেছিলেন, তাতে ভুল নেই। আমি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাহাদুর কুরশী এনে বসাবার আগেই দস্ত বললেন, 'তুমি এসে না পড়লে, হয়তো ডেকেই পাঠাতে হতো। অবিস্তি হোটলে গিয়ে তো দেখা হতোই। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মেজর ঘোষাল, আর—'

বাকীটা শোনাবার আগেই মেজর সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের ভঙ্গিতে তাঁর চওড়া শক্ত ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। অগত্যা আমাকেও দিতে হয়। করমর্দনই বটে। তিনি আমার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে খাটি কেতায় বললেন, ‘হ্যালো! হাউ ডুয়ডু? সত্যি সত্যি একটু আগে আপনার কথাই মিঃ দস্তর সঙ্গে হচ্ছিল। শুনে খুবই খুশি হলাম, আপনি গুর ফ্যামিলির সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছেন। ভাবলাম, তাহলে একজন গুণী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।’

খাটি কেতায় কথা শুরু করলেও মেজর ঘোষাল সাহেবের পরের বাক্য সবই খাটি বাংলা কেতায়। তিনি নিজেই আবার পার্শ্ববর্তিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে আবার ইংরেজিতে বললেন, ‘মীট মাই সিস্টার মিসেস মুখার্জি, মিষ্টি—আই মীন কুন্দনন্দিনী মুখার্জি।’

এই আমার এলেম, আর প্রথাসিদ্ধ অমুমান? দে দিক্কার! অমুমানের গলায় দড়ি। অমুমানের কর্তা-গিন্নী আসলে ভ্রাতা-ভগ্নী! কিন্তু আকেল গুডুম করা মুখ দেখিয়ে লাভ কী? এ ক্ষেত্রে মিসেস মুখার্জি কপালে দু’হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আমি প্রত্যাশিত করলাম। মহিলাদের উঠে দাঁড়ানোটা প্রথাসিদ্ধ না। তাঁর বিকচ হাসিটি এখন ঠোঁটের ফাঁকে, দাঁতের ঝিলিকে বিস্তৃত। বললেন, ‘কুন্দটা কাটা গেছে অনেক দিনই, এখন কেবল নন্দিনী। বন্ধন আপনি।’

বাহাদুর ইতিমধ্যে কুরশী দিয়েছে। আমি বললাম। মেজর ঘোষাল বললেন, ‘আপনার কথা একটু আগে দস্তসাহেব বলছিলেন, অতএব আপনার পরিচয়টা আর নতুন করে আমাদের জানান দরকার নেই। তবে আপনিই ভালো বলতে পারবেন, আমার বোনের নামের বিষয়ে। কুন্দনন্দিনী নাকি বন্ধিম যুগের আর কেবল নন্দিনী রবীন্দ্র যুগের, সেইজন্তাই কুন্দ কাটা গেছে।’

নাম না বলে, আপাতত আমি মিসেস মুখার্জি বলেই চালাই। তিনি বললেন, ‘বাজে কথা বলা না মেজরা, আমি মোটেও তা বলি না।’

মেজর ঘোষাল অবাক হবার ভাব করে বললেন, ‘তোদের কারোর মুখেই একস্প্রানেশটা শুনে থাকবো। আমি ওসব ভাবতে যাবো কখন?’

মিসেস মুখার্জি বললেন, ‘আসলে কুন্দনন্দিনী নামটা অনেক বড়, ডাকাডাকি করতে অসুবিধা, সেইজন্তাই কুন্দ বাদ। তাও আমি দিইনি, ইস্কুল-কলেজে আমার বন্ধুরাই নামটা ছোট করে দিয়েছে। আপনার কী মনে হয়?’

বলে তিনি তাঁর কিকিং রক্তিম চোখের তুলতুলু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

ইতিমধ্যে আমার ভ্রাণ, মস্তিষ্কে একটা জিজ্ঞাসা বিঁধিয়ে দিয়েছিল। মিসেসের দিকে তাকিয়েও আমার মনে তখন আন চিন্তা। আন চিন্তার ওপাশ থেকে চমক খেয়ে বললাম, ‘আমাকে বলছেন? আমি কী বলবো?’

দত্তসাহেব আর মেজর সাহেব হেসে বাজছেন। কিন্তু মিসেস মুখার্জির রক্তের আভা লাগা মুখ হঠাৎ আরো রক্তাক্ত হলো। শিশু মুখটি যেন লজ্জার আরক্ত হলো। কেন যেন বন্ধের খসে পড়া আঁচল একটু টানলেন। কিন্তু বাতাস না থাক, রেশমী আঁচলের মর্জি অল্প রকম। টানলেও সে টানে থাকে না। ভোঁলে তার স্থিতি নেই। বললেন, আপনার মতামতটা জানতে চাইছি। কুন্দনন্দিনী না নন্দিনী, কোন্টা আপনার ভালো লাগে?’

মেজর ঘোবাল বললেন, ‘হ্যাঁ সাহিত্যিকের মতামত পেয়ে যদি পালটে গেল মতটা হয়।’

মিসেস মুখার্জি বললেন, ‘হু’ একজন সাহিত্যিকের মতামত ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কিন্তু তাতে আমার পালটে গেল মতটা কখনো হয়নি।’

দত্তসাহেব বললেন, ‘তার আগে লেখককে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিতে চাই। তোমার মতে রবীন্দ্র যুগ কি এখনো আছে, না নেই। থাকলে মিসেস মুখার্জির নন্দিনী নাম ঠিক আছে। আর যুগটা যদি তোমাদের হয় তাহলে নামটা কী হওয়া উচিত। আরো হাঁটকাট না টেনে লম্বা করা!’

এ যে দেখছি কাঠগোড়ায় তোলা! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্দেহ হয়? আমি হাত ছোড় করে বললাম, ‘কলকাতার কচকচিটা এখানে না তোলাই ভালো। সেখানে যুগের লড়াই। কাগজে পত্রের সরাইখানায়। হাতাহাতি মারামারি হয় না বটে, কথার মারামারি থেকে সেটা ভালো। কেউ বলে রবীন্দ্র যুগ শেষ, কেউ বলে গত। কবিরী বলে রবীন্দ্রপ্রভাব গড়ে এখনো পুরোপুরি। গল্প লেখকরা বলে, পণ্ড রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ভদ্রলোক মারা গেছেন তিন দশকের ওপরে। তাঁকে নিয়ে এখনো যখন এত মাথাব্যথা, তখন একটু কেমন কেমন মনে হয় না?’

আমার জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতেই বোধ হয় সবাই হাসলেন। দত্তসাহেব বললেন, ‘তার মানে তুমি তাহলে স্বীকার করলে রবীন্দ্র যুগ এখনো আছে, তোমাদের ওপরেও তার প্রভাব আছে।’

আয়কর অফিসারের মতো কথাই বটে। একে বলে খাটি হিসাব কাঁড়িয়ে

নেওয়া। বললাম, ‘প্রভাব কতোটা আছে জানি না, যুগটাও বা কী তাও যথার্থ বুঝি না। কিন্তু মহাশয়ের অবদানটা এতই বিশাল, ছেড়ে কথা কইতে পারি না।’

মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, ‘অন্তত গানের ক্ষেত্রে তো বটেই।’

দত্ত সাহেব বললেন, ‘তাহলে মিসেস মুখার্জির নামটা ঠিকই আছে। মানে যুগোপযোগী।’

আর সেখানেই আমার ঠেক। ঠেক বলেই আমার নজর চলে গেল মিসেস মুখার্জির দিকে। কী করে জানবো, এলানো চূলে, ঘাড় কাত করে তিনি আমার দিকেই দৃষ্টিপাত করে আছেন। আমি তাকানো মাত্র প্রায় তার কোকিল (না কি ময়না?) স্বরে বললেন, ‘বলুন। আমি কিন্তু তর্কে যাইনি, আপনার কথা শোনবার অপেক্ষায় আছি।’

লজ্জা পেয়ে গেলাম। বললাম, ‘কী জানি কী মানে করবেন, কুন্দনন্দিনী নামটি আমার বেশি ভালো লাগে। ছাঁটতে যদি হয় তবে নন্দিনী নয় কেন?’

দত্ত সাহেব বললেন, ‘ওহ্ বাবা, তুমি তো দেখছি আরো পেছিয়ে আছো হে! সেই বঙ্কিম যুগে?’

আমার এই ভালো লাগার দ্বারা কি প্রমাণ হয়? হলেই বা কী করতে পারি। ভালো লাগে যে। মিসেস মুখার্জি বললেন, ‘তার মানে আপনি বলছেন নন্দিনীর থেকে কুন্দ ভালো? এটা কিন্তু কোনো সাহিত্যিক বলেননি। নন্দিনীভেই নাকি ধনি আছে।’

কথায় যেন ধরতাই পেলাম, বললাম, ‘তা যদি বলেন, ধনিমাহাত্ম্য কুন্দ-নন্দিনীভেও কিছু কম নেই। লম্বটা দীর্ঘ বটে, স্বরের মধ্যে একটা রাজকীয়তা আছে। তা ছাড়া—’ থমকে গেলাম। বচন একটু বেশির দিকে যাচ্ছে, এই সংকোচে।

মিসেস মুখার্জির ভুরুর বাঁকে ঔৎসুক্য! বললেন, ‘বলুন।’

আমি দত্ত আর মেজর সাহেবের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে একবার দেখে হেসে বললাম, ‘এটা নিতান্ত নিজের ইচ্ছের কথা। নন্দিনীর সংখ্যা এত বেশি, কুন্দ শুনলেই যেন শব্দে একটা মহিমা পাই। তবে সব মিলিয়ে কুন্দনন্দিনীই তো ভালো।’

দত্ত বলে উঠলেন, ‘মানে তুমি ছয়েতেই রইলে। কুন্দ আর নন্দিনী। ভালো।’

সবাই হেসে উঠলেন। মেজর ঘোষাল বললেন, ‘তবে শুকে আমরা মিষ্টি বলে ডাকি।’

মিসেস মুখার্জির ঘাড়ে ঝটকা লাগলো। ডান চোখ আর ভুরু প্রায় রেশমী নরম রুম্ম চুলের আড়ালে পড়ে গেল। ইংরেজিতে বললেন, ‘সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মিষ্টি (সুইট) যে আমি নয়, সেটা সবাই জানে।’ বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

দোহাই। তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা নাকি? তাঁকে আমি অল্প ঝাল, কিছুই বলতে পারবো না। তিনি তাঁর সারা অঙ্গে রক্ত, হাস্তে, লাস্তে, ভাবে, স্বরে, সুরে, প্রথম দর্শনে একান্তই মিষ্টি। তাঁর অমিষ্টত্ব যদি কোথাও থেকে থাকে, তার সন্ধান আমি জানি না। এমন মহিলার (রমণী বলো!) অমিষ্টত্বের সন্ধান আমার দরকারই বা কী? তিনি তাঁর সবটুকুতে মিষ্টি থাকুন, আমার তাই প্রার্থনা।

‘আপনার কাছে আমি তাহলে কুন্দনন্দিনীই থাকলাম।’ মিসেস মুখার্জি ঘাড়ে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ‘মিষ্টি ফিষ্টি বাজে নাম। তবে দেখলাম আপনার সঙ্গে মিলে গেল আমার ঠাকুরদার সঙ্গে। তিনি আমাকে বিশেষ বিশেষ সময়ে নাটুকে ঢঙে লগা করে ডাক দিতেন, অয়ি কুন্দনন্দিনী!’ বলে হেসে ঘাড় এলিয়ে দিলেন পিছনে, ঝাঁক রাখলেন ঝাঁয়ে, আমার দিকে।

মিষ্টির সঙ্গে ‘ফিষ্টি’ শব্দে বেশ একটি ঘরোয়া বাঙলার খেই পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি শেষটায় ঠাকুরদার সঙ্গে তুলনীয় হলাম? কী আমার ভাগ্য। কুন্দনন্দিনীর (এখন থেকে তিনি আমার কাছে কুন্দ অথবা কুন্দনন্দিনী) নাসারক্ত তেমন কম্পিত। কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি, কেবল তাম্বুল রঞ্জিত না, ওষ্ঠরঞ্জনীও দাগানো তাঁর ঠোঁটে। হাসিটি আমার ঠোঁটের কোণে টিপে রাখা। বললেন, ‘আর একজন আমাকে কুন্দনন্দিনী নামে ডাকতো। কলেজে যে ছেলেটির প্রেমে পড়েছিলাম।’

সাক্ষর জবান। এর পরে যা ভাবতে হয় ভাবো গিয়ে। কুন্দনন্দিনী একবার তাকালেন তাঁর অগ্রজের দিকে। অগ্রজ হেসে রাজা মাপের একটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, ‘হ্যাঁ, ছেলেটির যেন কী নাম? প্রণয়, হ্যাঁ তাই তো? নামটাই সেন্টিমেন্টে ভর্য। যদিও তোরা প্রেমটা করেছিলি চুটিয়ে, ঘোষালবাড়ির এক ইকানিতেই প্রেমের দফা একেবারে গয়া।’ বলে তিনি ফোঁজী স্বরে হা হা করে হেসে উঠলেন।

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘ও রকম করে বলো না। ঘোষালবাড়ির ইকানিতে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন ইকানিটা মিনি পুশির থেকেও নরম হয়ে গেছে। কলেজে পড়বার সময়ও যদি কিরে দাঁড়াতাম, ফঙ্গটা কী হতো, তা ভালোই

আনি।’ কথাগুলো বলতে বলতে, তাঁর হাসি উধাও, মুখে রক্তাক্তা বড় চড়া হয়ে উঠলো।

মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, ‘আরে মিষ্টি তুই সিরিয়স্ হয়ে যাচ্ছিস নাকি?’

কুন্দনন্দিনী তাঁর কাজল টানা চোখের পাতা কয়েক মুহূর্ত মুদ্রিত করে ঘাড় নাড়লেন তারপরে ঘেন দমকা নিশ্বাসের সঙ্গে হেসে উঠে বললেন, ‘না না, সিরিয়স্ হবো কেন?’

ইতিমধ্যে মেজর সাহেবের প্যাকেট থেকে আমি একটা সিগারেট নিয়েছি। তিনি প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলেন দত্ত সাহেবের দিকে। তিনিও একটি সিগারেট নিলেন। মেজর সাহেব ভগ্নীর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘নিবি নাকি?’

কেতা-মাসিক এটা আগেই করা উচিত ছিল। এ অভিজ্ঞতাটা আমার আগেই হয়েছে। বাদশাহী আমলের চিত্রে দেখা, বেগম সাহেবের মুখে গড়গড়ান নল। রক্তধরে ছোঁয়ানো নলটিকে অতঃপরে কোন্ পুরুষে হিংসা না করে পারে? নারীর ধূমপানে এখন আর আমার চোখের ফাঁদ বড় হয়ে ওঠে না। তবে অগ্রজের দান ভগ্নীকে, এই প্রথম দর্শন। এমনই অনায়াসে, ধমকাবার অবকাশও নেই। ইতিমধ্যেই আমার জ্ঞানের থেকে যা মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়েছিল, তা এখন জিজ্ঞাসার অতীত। কুন্দনন্দিনীর অঙ্গরাগের ফুলেল স্বাসের থেকেও সুরার গন্ধ চড়া। তার ঝিলঝিকমিক রক্তছটা চোখে মুখেও ফুটেছিল। ভ্রাতা ভগ্নী উভয়েরই। এখন দামী সিগারেটের তামাকের গন্ধে সঞ্চারিত নয়। মোহ। উভয়ের সুরা পানের আসরটা কোথায় বসেছিল, আমার অজ্ঞাত। এই অস্বাভাবিক আয়তনের ক্যাম্পে যে না, সম্ভব নেই। দত্তসাহেবকে একদিনে একবারো ও-পথে যেতে দেখিনি।

কুন্দনন্দিনী মাথা নেড়ে বললেন, ‘ভালো লাগছে না, তুমি নাও।’ বলে আমার দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে বললেন, ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? অবিশ্তি তার আগে বলে রাখি, আমি আপনার খান চার-পাঁচকের বেশি বই পড়িনি। নিন্দে স্তন্যে যদি লক্ষ্য না পান, তাহলে আপনার প্রথম বইয়ের নারীকা আমাদের ছাড়া, কোনো নারীকাই আমার পছন্দ হয়নি।’ বলে তিনি ময়না স্বরে কাঁপানো শিস্ দেবার মতো হাসলেন। তৎসঙ্গে অঙ্গ-রাগের ফুলেল স্বাস এবং সুরার বাসও ছাড়া। বললেন, ‘তবে বাহ বাঁক ঠিক আছে।’

বললাম, ‘যদি অন্তর দেন, তাহলে বলি, আমি নিজের ইচ্ছেয় কারোকে নাস্তিকা করিনি। চরিত্রেরা তাদের নিজের মতোই এসেছেন গিয়েছেন।’

‘যেমন এখন আমি কুন্দনন্দিনী।’ বলে তিনি হাসতে গিয়ে, ঠোঁটের ওপর কয়েকটি আঙুল রাখলেন।

দেখলাম, নখে তাঁর শাড়ি জামার মতো গোলাপি রঙ, অনাস্থিকার নীল পাথরের, লাল চক্ষু ড্রাগনমুখো সোনার একটি মস্ত আংটি। আবার বললেন, ‘এ সময়ের ঘটনা যদি আপনি লেখেন, নাস্তিকা হবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে?’

আমি তড়িঘড়ি বললাম, ‘একশো ভাগ।’

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, ‘এবার বলুন, আপনার এই কালকূট নামের কারণ কী? অবিশ্রি লেখার মধ্যে আপনি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু—’

‘কিন্তু এককিউজ যী মিষ্টি।’ মেজর ঘোষাল হাত তুলে বলে উঠলেন, ‘মিঃ দস্তর কাজের কথাটা ভুলে যাস্ নে। আমরা ঠাঁর অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি। লোকজনও অনেকে বসে আছেন। আর ডিসটার্ব করা উচিত নয়।’

দস্ত সাহেব বললেন বটে, ‘না না, কিন্তু ঢঙটা এতোই আলুগা বা অলিত, মেজর ঘোষালের কথাই সত্যি প্রমাণ করছে। আমি দস্ত সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অমায়িক হাসির মধ্যে একটা দন্দ। তিনি আশেপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। মেজর ঘোষাল আবার বললেন, ‘আমি মিলিটারি ম্যান, আড্ডা দিতে জানি, সময়ে তা ভাঙতেও জানি। আমি বলছি, মিঃ দস্তর অফিস এখন ছেড়ে যাওয়া উচিত, ঠাঁকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। আমরা বরং লেখক মশাইয়ের সঙ্গে বাইরে একটু গল্প করে নেবো। আমি তো অবিশ্রি আজই সন্ধ্যায় ফিরছি, আরো সময় পাবো।’ বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এক এক জনের উচ্চতা, সামনে দাঁড়াতে দেয় না। মেজর ঘোষালের উচ্চতা সেই রকম। মেহবর্জিত হাড়পুট ঝুঁ শরীর, নাভির নিচে মোটা বেন্ট জড়ানো। কুন্দনন্দিনীও উঠে দাঁড়ালেন, দস্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সরি, মিঃ দস্ত। কিন্তু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।’

দস্ত সাহেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এতে আবার ধন্যবাদের কী আছে। ওর মেজদাই আমার আসল বন্ধু, সেই তুলনায় ও আমার থেকে

ছোট। তবে এখন আর তা বলা যাবে না। ও যে কবে কেমন করে লেখক হয়ে গেল, আর এ রকম একটা নামে, তাই জানতে পারিনি। সে যাই হোক, মিসেস মুখার্জি, আপনি একেবারে নেমে যাবার সময়ে অফিসে দেখা করে গেলেন, একবার আমাদের আন্তনায় যাওয়া হলো না।’

কুন্দনন্দিনী রেশমী আঁচল তুলে বকে স্থাপিত করলেন। কিন্তু আঁচল বড় বেয়াদা, বুকের ডোলে ওর আঁড়ি। কুন্দনন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের নম্র বকে একটা অনন্য ঔকত্য আছে। রেশমী আঁচলটা মাতাল না তো? যেন খোয়ারি না কাটাতে পেরে, বারোবারেই লুটিয়ে পড়ে যেতে চায়। অতএব, তাঁকে ধরে রাখতে হয় আঁচল, সেই সঙ্গে হাতের মুঠোয় ছাপ-কাটা একটি রেশমী কুমাল। বললেন, ‘নিচে নামছি বলে ধরেই নিচ্ছেন কেন আর ওপরে উঠবো না?’

দত্ত সাহেব বললেন, ‘তখন হয়তো আমার কালিঙ্গ-এর ক্যাম্প উঠে যাবে। তাহলে দার্জিলিং-এ আসবেন। মিঃ মুখার্জি আপনার জন্ত শিলিগুড়িতে অপেক্ষা করছেন।’

‘তুল করলেন, আমার জন্ত না।’ কুন্দনন্দিনী বললেন আঁচল ধরা হাতটি বুকের ওপর ঠেকিয়ে, ‘তিনি তাঁর কাজের জন্ত এসেছিলেন নর্থ বেঙ্গলে, ট্রাংকলে সম্বন্ধীকে ডেকে বললেন, আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান। আমি কারোর ইচ্ছে মেনে চলতে পারি না। তবু দাদা বলছেন যেতে, তাই বাছি। মগর নতিজা ক্যায়া হোগী, ও ম্যায় নহি জানতি।’ বলে হেসে উঠলেন।

আবার সেই ফুলেল আর সুরার বাস। মেজর ঘোষাল দত্ত সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বিদায় নিলেন, বললেন, ‘কিরে এসে দেখা হবে, আরো ওপরে যাবার আগে। আপাতত বাইরে গিয়ে লেখক মশাইয়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টা আলাপ করে যাবো।’

কুন্দনন্দিনী ইংরেজিতে বললেন, ‘পৃথিবীতে বিশ্বয়ের বিষয় কমই আছে, এটা জানবেন। চলি, নমস্কার।’ কপালে হাত ঠেকাবার ভঙ্গি করে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

দত্ত সাহেব নমস্কারের জবাব দিয়ে আমাদের বললেন, ‘তুমি ঠুঁদের সঙ্গে গল্প কত, হোটেলের কিরে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো, বিকালে দেখা হবে।’

আমি ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গে অফিসের বাইরে এলাম। কুন্দনন্দিনী আর যা-ই হোন, তাঁর মধ্যম অগ্রজের উচ্চতার ধারে কাছে ওঠেননি। সেটাই যা রক্ষ। কিন্তু মেদ কি তাঁকে আক্রমণ করেছে? পৃথুলা তাঁকে কোনো রকমেই বলতে পারি না। তাঁর ঢলঢল লাবণ্যে, মেদের প্রথম খাবাটা বোধ হয় পড়েছে। মেদের

প্রথম খাবার সর্বনাশের ইঙ্গিত থাকে। সেটা দু'রকম। আপাতত আকর্ষণের তীব্রতায়। ভবিষ্যতে মেদের পূর্ণ জয়, যা রমণীয় সর্বনাশের শেষ ধাপ। বাইরে এসে মেজর বোবাল আমাং বললেন, 'আহ্ন, কোথাও একটু নির্জনে গিয়ে বসা থাক।'।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু আগের কথাবার্তায় মনে হলো, উভয়েই শিলিগুড়ির পথে নামতে চলেছেন। এখন নির্জনে গিয়ে বসাটা কী ইঙ্গিত করে, বুঝতে পারছি না। আমার বুঝে ওঠার আগেই, তিনি পথের ধারে পপলারের ছায়ায় দাঁড়ানো একটি ফোঁজী জীপ গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ ফোঁজী এক তরুণ সদারজী লাক দিয়ে নামলো জীপের ভিতর থেকে। দাঁড়ালো একেবারে কাঠের মূর্তির মতো। কেবল ঝকঝকে চোখের তারা দুটি ঘুরে গেল আমাদের ওপর দিয়ে।

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'মেজরা, এখানে এখন কোথায় আর বসবে? তার চেয়ে লেখককেই নিচে নিয়ে চলো না। গল্প করতে করতে ঘাওয়া যাবে। আসবার সময় তুমি যদি একলা কেরো, উনি সঙ্গে থাকবেন, বোরড হবে না।'।

মেজর সাহেব তুরু কুঁচকে এক লহমা ভেবে বললেন, 'এটা তো মন্দ বলিসনি তুই। তা ছাড়া লেখক তো আর অফিসের কাজ নিয়ে আসেননি, বেড়াতেই এসেছেন। একটা দিন না হয় নামা ওঠাতেই কাটলো। কী বলেন? চলুন, শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসবেন।'।

এমন কিছু একটা আকাশ থেকে পড়ার মতো কথা না। তবু বিশ্বয়ে ঠেক খেতে হয় বৈকি! আকস্মিকতা বলে একটা কথা আছে তো। বললাম, 'এখন শিলিগুড়ি নেমে, আবার ফিরে আসবো?'

'নয় কেন?' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আপত্তির কোনো কারণ দেখছি না তো। আপনার হোস্টকে ইনফরমেশান দিয়ে এলেই হয়। হোস্টেস্ নিচ্চয়ই আপত্তি করবেন না?'

দত্তজারা? কেনই বা আপত্তি করবেন। কিন্তু এ যেন কেমন, নিয়মকানূনের বিধিনিষেধ ভেঙে, ধলছাড়া ঘরছাড়ার মতো না? অবিশ্তি আমার ছুটে চলার বেগে যে একটা কম্পন অনুভব করছি না, তা বললে মিথ্যা হয়। কুন্দনন্দিনী আপত্তির কথা বললেন। আমি ভাবছি, ক্ষতি কী?

মেজর বোবাল বললেন, 'আমি দত্তসাহেবকে বলে আসছি।' বলেই তিনি আর কোনো কিছু খোনবার অপেক্ষা না করেই আবার খোলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ছুটে গেলেন।

কুন্দনন্দিনী হাসলেন, সেই স্ববাস ছড়িয়ে বললেন, ‘খুব বেকায়দায় পড়ে গেলেন, না ?’

বললাম, ‘এটাকে বেকায়দায় বলবো কেন ? হঠাৎ করে ঘটেছে বলেই, একটু যা হকচকিয়ে যাচ্ছি। বেড়াতে আমার ভালোই লাগে।’

‘একটুই যা অস্ববিধে, আমরা আপনার কাছে নতুন মাহুঘ।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘ভাববেন না, খুব বিরক্ত করবো না। তবে আমাদের ভালো লাগবে কিনা, সেটা আপনার রুচি আর মেজাজের ব্যাপার। কিন্তু আপনি তো লেখক। না হয় আমাদের মতো মাহুঘকেও ছুঁদণ্ড দেখবেন।’

সত্যি কথাটা অনায়াসেই বললাম, ‘লজ্জা দেবেন না। খারাপ লাগবার কোনো কারণ দেখছি না। আর যদি আপনার ভালো না লাগে সেটাও আমি টের পেতে দেবো না।’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘সেটা আপনার লেখাতেই দেখেছি। বেশ লাগসই মিথ্যা আর চাতুর্ঘ্য আপনি বেশ কাজে লাগাতে পারেন।’

আমার হেসে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। রাগ করবো ? কোনো কারণ নেই, আর সেই কথাটাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে, ভুরু নাড়িয়ে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘রাগ করলেন না তো ?’

বললাম, ‘একটুও না। বরং ভয় পাচ্ছি, আপনি আমাকে বেশি চিনে ফেলবেন কী না।’

কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হাসলেন, সেই সঙ্গে স্ববাস। বললেন, ‘এটা আপনার আর একটি চাতুর্ঘ্য।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু আমি জানি না, ছুঁদণ্ডের সাহচর্যে, আমাকে আপনার ভালো লাগবে কি না।’

‘বলে দেবো সেটা।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আমি আপনার মতো চাপাচাপি করতে পারবো না। যা মনে হবে, সব বলে দেবো। আর আমার মেজদা ? ও হয়তো আপনার ওপর দিয়ে যায়। এক এক সময় এমন গ্রানাইট পাথরের মতো মূখ করে রাখে, কিছুই বোকা যায় না। এমন কি হাসলেও বোকা যায় না, রাগলেও বোকা যায় না।’

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘সে তো আরো স্বাভাবিক। তা উনি কি কালিম্পং-এ পোস্টেড ?’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘না না, মেজদা আছে সিকিমে। আমরা গতকাল নেমে এসেছি এখানে। রাতটা কাটিয়ে আজ বাচ্ছি শিলিগুড়িতে। মিঃ দত্তর কালকূট (পঞ্চম) — ১৪

সঙ্গে মেজদার জানাশোনা আগেই। উনি ক্যাম্প করেছেন শুনে, মেজদা একবার দেখা করতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে মিঃ দস্তুর পরিচয় আজই প্রথম।’

মেজর ঘোষাল তাঁর ফৌজী পাহকার কঠিন আর দ্রুত শব্দে এগিয়ে এসে বললেন, ‘মঞ্জুর। তিনি টেলিফোন করে হোটেলের মিসেসকে জানিয়ে দিলেন।’

‘মেজদা, তুমি সত্যি লক্ষী ছেলে।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘কিন্তু তুমি আর একটু লক্ষী হও। তোমার ওই বাহকটিকে কালিম্পং-এই রেখে যাও, তুমি নিজেকে ড্রাইভ করে চলো। ওর সামনে আমি যেন কেমন ঠিক ইঞ্জি হতে পারি না।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘তোমার অল্পরোধ রাখতে পারি, কিন্তু তাহলে আর বেশিখাবো-টাবো না। রাস্তাটা তো স্টিক্‌।’

খাওয়ার কথা কেন আসছে, বুঝতে পারলাম না। কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আরে মেজর সাব, আপকো তো ম্যায় ধোড়া বহুত জানতি। আপনি এখন বাহনটিকে ছুটি দিয়ে বলুন, খাও পিও মন্ত্‌ রহো। আমিই বরং ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি।’

‘বাছে কথা বলিস না।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘যা দেবার তা আমিই দেবো। কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। ভিস্তা ব্রিজ খোলবার সময় হয়ে এলো।’ বলেই তিনি তরুণ সর্দারজীর কাছে গিয়ে কিছু বললেন। পকেট থেকে ব্যাগ বের করে টাকা দিলেন। আমাদের দিকে কিরে ডাকলেন, ‘চলে আসুন।’

কুন্দনন্দিনী ডাকলেন, ‘আসুন।’

মেজর ঘোষাল বাঁদিকের চালকের আসনে বসলেন। ডায়ী গিয়ে বসলেন অগ্রজের পাশে। অতএব আমাকে যেতে হয় পিছনে। কিন্তু কুন্দনন্দিনী জ্রুহুটি করে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ‘ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? সামনে আসুন। আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কি পিছনে বসাবো বলে? দেখলেন ড্রাইভারকে হটালাম, নিজেরা একসঙ্গে যাবো বলে? উঠে আসুন।’

লক্ষা এবং কুতজ্ঞতাবোধ দুটো একসঙ্গেই কাজ করলো। মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘আপনি তো মশায় আমাদের প্রায় ইনসান্ট্‌ করতে যাচ্ছিলেন।’

আমি ভিতরে উঠতে উঠতে বললাম, ‘সে সাহস আমার নেই। কিন্তু আমিই ধারে বসবো? আপনি যাকথানে?’

কুন্দনন্দিনী কিছুটা ধীরে হেলে বসে ছিলেন, আমাকে ঠিকমত বসতে

দেবার জন্ম। আশি উঠে বসবার পরে, তিনি সোজা হলেন। এখন আর ঘন সান্নিধ্যের স্পর্শ বাঁচানো গেল না। বরং রেশমী আঁচল তার বুকে আড়ি দিয়ে, এলিয়ে পড়লো আমারই কোলে। তিনি বললেন, ‘অভিধি সেবা করছি। শত হলেও বামুনের মেয়ে তো। আপনি বরং ইজি হয়ে বসুন। কাঠ হয়ে বসে থাকলে আমার খুব খারাপ লাগবে।’

একেবারে যে ছিলাম না, তা না। কিন্তু কতোটা ‘ইজি’ হওয়া যেতে পারে? সামনের আসনে তিনজন বসতে গেল, যতোখানি লাগালাগি ঠোকাঠুকি হওয়ার কথা, তাই হচ্ছে। যদিও, আমার আড়ষ্টতা এই মুহূর্তেই কাটবার না। অভিভূততার থেকে বললাম, ‘এখন যদি বা কাঠ হয়ে থাকি, গাড়ি চললে তা আর থাকতে পারবে না।’

মেজর ঘোষাল ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়বার মুহূর্তে বাইরে তাকালেন। তরুণ সর্দার ফৌজী সেলাম দিল। মেজর বাঁ হাত নেড়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘তার জন্ম অপেক্ষা না করে আপনি এখনই ইজি হয়ে যান। আর বেশি ডাইনে সরে যাবেন না।’ বলে তিনিই আর একটু ডাইনে এলেন।

কিন্তু আমার কোলের ওপর ছিঁচকে মাতাল আঁচলটার কী করা যায়? নিজের হাতে তো তুলে দিতে পারি না। কুন্দনন্দিনীর আমার ফাঁদটিও বুকের বা পিঠের দিকে অতি সংক্ৰিপ্ত। শীত যে তাঁর নেই বুঝতেই পারছি। সেটা সম্ভবত অনেকখানি দ্রব্যগুণবশত। কিন্তু আমার চোখে কেন যে এত ছায়া। তার বন্ধের ডোঁলে দৃষ্টিপাত মাত্র, মস্তিষ্কে যেন কী একটা বিঁধে যাচ্ছে। দৃষ্টি যায়ই বা কেন? কেন রে দৃষ্টি যাস? চোখ কেন পুরুষের? কেন রে চোখ পুরুষের? মা কেন জন্ম দিয়েছিল? কেন রে মা জন্ম দিলি? ধর্ম-পালন করতে। নটে গাছটি এখানেই মুড়নো ভালো। তবু মনে জিজ্ঞাসা, চোখে না হয় রক্তের আঁচ লাগে। লাগে গালেও। দ্রব্যগুণে কি বন্ধও রক্তিম হয়ে ওঠে? তাই তো দেখছি। বন্ধাত্তরের মাঝখানে অনেকখানি নিচে উপচে পড়ার মতো একটি শ্রোতস্থিনী যেন। বাম বন্ধের ডোঁলে ভিলটি কি মিটিমিটি হাসে নাকি?

না, হাস্য লাভ সব হারাতে বসেছি। নজর খাড়া রাখি না, নজর কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়। গাড়ি শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিরালায় এলে পড়লো। কুন্দনন্দিনী প্রায় আমার গায়ের ওপর দিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে নিচু হয়ে গিছন দিকে তাকালেন, বলে উঠলেন, ‘ওহ্, জীবন চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম ব্যাগটা বুঝি কালিস্পং-এই ফেলে এলাম।’

মেজর ঘোষাল বললেন, 'তোমার নিজের কাঁধের ব্যাগটা ভোঁটান হাউসেই কেলে এসেছিলি। সেটা আমি হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। তোমার আসল ব্যাগটা তো তুমি নিজের হাতেই তুলেছিলি।'

কুন্দনন্দিনী কিছু একটা নাড়াচাড়া করছেন। তাঁর দক্ষিণ বক্ষ আমাকে ছুঁয়ে, পিছনে কাঁচের বোতলের ঠুং ঠাং শুনতে পাচ্ছি। তাঁর রেশম-কোমল কপাল চুলের গোছা স্পর্শ করছে আমার কান আর চোয়ালের কাছে। অস্বস্তি বোধ করছি এই কারণে না। তিনি যদি এমন কষ্ট না করে, আমাকে সাহায্য করতে অহুমতি করতেন, ভালো হতো। স্বিধা করেও শেষ পর্যন্ত না বলে পারলাম না, 'আপনাকে কি আমি একটু সাহায্য করতে পারি?'

কুন্দনন্দিনীর স্বর শোনা গেল প্রায় আমার কানের কাছেই, 'পারতেন, কিন্তু ঠিক জিনিসটা চিনতে পারবেন না। আমি জল মেশানো বোতলটা খুঁজছি।' বলতে বলতে তিনি আবার সামনে ফিরে এলেন, বললেন, নতুনের মধ্যে হাতে একটি বোতল।

বোতলের অনেকখানিই রক্তিম পানীয় ভরা। পাশ ফিরে নিচু হওয়ার জগুই বোধ হয় তাঁর মুখ এখন অধিকতর লাল, কণ্ঠার নিচে বক্ষস্থলও। মাথা ঝাঁকিয়ে গালের চুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব জিনিসের সঙ্গে পরিচয়-টরিচয় আছে তো?'

অস্বীকার করলে মিথ্যা বলা হয়। বোতলের বস্তু যে রঙীন স্বরা, নেহাতই সর্ববত না, তা বুঝতে পেরেছি। ভ্রাতাভগ্নীর নিখাস-নির্গত ভ্রাণ থেকে আগেই তা অহমান করেছিলাম। ব্যর্থ হয়েছিলাম একটি বিষয়ে, উভয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। একেবারে ভেঙেই বললাম, 'মনে হচ্ছে রাম্।'

'হ্যাঁ, একেবারে সিকিমের খাটি কালো বেড়ালের রক্ত।' কুন্দনন্দিনী হেসে উঠে বললেন, 'তবে কিছু শাদা জল আর আধ বোতলটাক কোকস্ মেশানো আছে। শাদটা মুখরোচক হয়।'

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সিকিমের খাটি কালো বেড়ালের রক্ত নাকি? জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'সিকিমের খাটি কালো বেড়ালের রক্তটা কী?'

ভ্রাতাভগ্নী উভয়েই হেসে উঠলেন। মেজর ঘোষাল বললেন, 'সিকিমে—মানে, গ্যাংটকে কখনো যাননি বুঝি?'

বললাম, 'এখনো সৌভাগ্য হয়নি।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'তাহলে এখনই খানিকটা সৌভাগ্য লাভ করুন।'

এ হচ্ছে সিকিমের ব্ল্যাক ক্যাট রাম্। আমার মতে জ্যামাইকা বা কিউবান রামের থেকে কোনো অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং ভালো।’

এতটা অভিজ্ঞতা আমার নেই। জ্যামাইকা কিউবা তো অনেক দূরের কথা, ভারতের তিন এক্স-এর পরে সিকিমের কালো বেড়াল দর্শন এই প্রথম। বললাম, ‘তাই নাকি? আগে কখনো দেখিনি।’

‘তাহলে একেবারে একটু চেখেই দেখুন।’ কুন্দনন্দিনী আমার মুখের সামনে বোতলটা তুলে ধরলেন।

আমি হেসে বললাম, ‘প্রথমেই অরসিকে কিছু অর্পণ করবেন না। কিন্তু গাড়িতে যেতে যেতেই শুরু করবেন নাকি?’

কুন্দনন্দিনী ভুরু কঁচকে তাকালেন, তারপরে মুখ ফিরিয়ে অগ্রজের দিকে। মেজর একটা পুরো ইংরেজি ইউ অক্ষর পাক দিয়ে নামতে নামতেও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। তৎসহ খিলখিল সঙ্গত ভগ্নীর। মেজর বললেন, ‘মিষ্টি, তুই কি সবাইকে নিজেদের মতো ভাবিস?’

কুন্দনন্দিনী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘গাড়িতে যেতে বা ইটিতে ইটিতে বা আকাশে উড়তে উড়তে, এটার আবার সময় অসময়ই আছে নাকি?’ ইংরেজিতে বললেন, ‘তৃষ্ণা যেখানেই পাক, পানীয় থাকলে তা পান করবো না?’

এতখানি? তাহলে জিজ্ঞেস করা কনুয় হয়েছে। কিন্তু নিচে নামছেন তো স্বামী সন্দর্শনে, স্বামী-সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে। এ অবস্থায় এতটা তৃষ্ণা মেটানো আমার কাছে যেন তেমন তালে বাজছে না। কেই-বা বাজতে বলছে? বললাম, ‘তা ঠিক। যার যেমন।’

‘কেন, আপনার কি এ সব পানীয় নিতে হলেই গদীতে বসে, তাকিয়ার হেলান দিতে হয় নাকি?’

কুন্দনন্দিনী নাক কঁচকে একটু হাসি যেন টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। পরমুহুর্তেই ভুরু কঁপিয়ে বললেন, ‘তার সঙ্গে একটু গানবাজনা? স্বাইকেল?’

বিক্রপ না অপমান? নাকি নিতান্তই ঠাট্টা আর রঙ্গ? আমার শ্রেণী যাচিয়ে নিতে চাইছেন? নিজেই আবার দমকা নিশ্বাস ফেলে বললেন ‘অতিথিকে বিক্রপ করবো না। তবে আমার গানই শুনতে হবে। একটু যদি আয়েস করতে চান, আমার কাঁধ আছে।’ বলে তাঁর তান কাঁধ একটু উচু করলেন।

আমি একবার মেজর ঘোষালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তিনি ঠোট টিপে হাসছেন, দৃষ্টি সামনে। অতি ছন্নছাড়া সর্পিলা উৎসাহে বেয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন। পরিচয়টা সত্যি নতুন, সমস্ত সমস্ত। অগ্রজের সামনে ভয়ানক মুখের কপাট এমন হাট করে খোলে কেমন করে? বোধ হয় নিতান্ত মুখের কপাট বলেই। বুকের কপাটের কথা আলাদা। হাট করে খোলা বুকের কপাটের বচন বাচন সবই আলাদা। অতএব, বন্ধ নিশ্চয়ই। বললাম, ‘যতোটা ঠাহর করেছেন, ততোটা না। তবে গদীতে বসতে ভালোবাসি, তাকিয়া হেলান দিতেও। গান? পাগলের মতো স্তন্যভেদে ভালোবাসি। মাইকেল কয়টা কখনো ঘটে ওঠেনি।’

‘তবে একটা মিনি অ্যাণ্ড অটো মাইকেলই হোক।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘বস্তুটি আপনার কাছে নিষিদ্ধ নয় তো?’

বললাম, ‘নিষিদ্ধ তো বটেই।’

কুন্দনন্দিনী যেন প্রায় আঁতকে উঠে শব্দ করলেন, ‘অ্যা?’

হেসে বললাম, ‘হ্যাঁ, আর সেইজন্যই আকর্ষণও বোধ করি।’

কুন্দনন্দিনী আমার কথা বুঝে ওঠার আগেই মেজর ঘোষাল হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, ‘বিউটিফুল। যুদ্ধে কোথাও জয়লাভ করলে, শুধু এ কথার জন্যই আপনাকে আমি চক্কিশ ঘণ্টা বা খুশি তাই লুট করতে দিতাম।’

আহ, কোঁজী মেজাজের কী অভিরুচি, কমপ্রিমেন্ট আর কাকে বলে। তবে প্রকৃত কোঁজী কমপ্রিমেন্ট। কুন্দনন্দিনী আবার বোতলটা সামনে তুলে বললেন, ‘তাহলে সংঘম দেখাচ্ছেন কেন? নিন।’

বললাম, ‘আকর্ষণটাকে একটু নিয়মে আর সময়ে বাঁধতে চাই।’

‘কিন্তু আজ আপনার নিয়ম আর সময় সবই আমাদের হাতে।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘মানেন তো?’

‘মানি।’

‘তবে নিন।’

‘শুধু করুন। নিয়ম আর সময়ের লীমা যখন আপনাদের হাতে, এটাও আপনাদের হাতেই। শুধুটা আপনাদের।’

‘কিন্তু আমাদের আলাদা পাজ নেই।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘এক পাজে ঠোট ছোঁয়াতে পারবেন তো? কারণ বোতলে মুখ ঠেকিয়েই সবাইকে খেতে হবে। আল্লাহ করে গলায় ঢালার কোনো উপায় নেই, আমি তো পারি না।’

বলেই তিনি বোতলের সঙ্গে নিজের মুখটিও ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলেন আমার দিকে ।
 ষাড় ঈষৎ কাত করে, অতি ঘন নিখাসে অঙ্গরাগের ফুলেল আর হুয়ার গন্ধ
 ছড়িয়ে বললেন, ‘অবিশ্রি একটা গ্যারাণ্টি আপনাকে দিতে পারি, আমার কোনো
 ধারাপ অস্থখ নেই ।’ বলেই ময়না ঘরে খিলখিলিয়ে, মুখ হুইয়ে দিলেন প্রায়
 আমার কাঁধে ।

সেই কথাটি আবার আমার মনে পড়লো, গরীব আমার প্রাণ । এ
 গরীবির কথা বলতে পারিনি এক পর্বতকন্ডাকে । এখনো বলতে পারবো না
 এই সমতলের বধুকে । বুঝতে পারি তাঁর হৃদয় ধনী, তার সঙ্গে দ্রব্যগুণের
 লীলায় মাতোয়ারা । আমার গরীবি আড়ষ্ট হয়ে যায় । গরীব প্রাণটা পুরুষের
 কী না । কিন্তু আপাতত আমার ঠেক লেগেছে অগ্রত । একজন যদি জানান দেন,
 তাঁর কোনো ধারাপ ব্যাধি নেই, তাহলে আমাকেও ঘোষণা করতে হয়, আছে
 কি নেই ? অগ্রথায় তাঁর অভয়দানের মান যাবে না ? তা-ই বা আমি যেতে
 দিই কেমন করে ? এবার জিজ্ঞেস করি নিজেকে, ধারাপ অস্থখ কাকে বলে ?

মেজর বোহাল বললেন, ‘অ্যালকোহলের কাছে কোনো অস্থখের ব্যাপার
 নেই । কাটা ছেঁড়ায় এ জিনিস অ্যাস্টিসেপটিকের কাজ করে । বিষয়টি তয়ের
 না, টেক্টের—মানে, রুচির । রুচিতে যদি না আটকায়, তাহলে সব ঠিক আছে ।’
 বলে তিনি আমার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে হাসলেন ।

গাড়ি একেবেঁকে ক্রমেই নিম্নমুখী । পাহাড়ী চলনে, গাড়ি স্বভাবেই মাতাল ।
 সততই সে ডাইনে বাঁয়ে টালমাটাল করে । কুম্মনন্দিনীকে গাড়ির ঝাঁকুনিই
 সহজ আসনে বসিয়ে দিল । তথাপি আমাকে ঘোষণা করতে হলো, ‘অনেক
 রোগেই ভুগি, গ্যারাণ্টি দিতে ভরসা পাই না ।’

কুম্মনন্দিনী তাঁর মাথা একটু পিছনে হেলিয়ে জুঁকুটি চোখে আমার মুখের
 দিকে তাকালেন । তারপর ফিরলেন অগ্রজের দিকে । অগ্রজ ঠোট টিপে হেসে
 হুঁ হুঁ ষাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘লেখককে দোষ দিতে পারি না । তোমার
 কথার জবাবে এ ছাড়া গুরু আর কী বলার আছে ? এর থেকে যা বোঝবার,
 তা বুঝে নে ।’

কুম্মনন্দিনী আবার ফিরলেন আমার দিকে । এখন আর জুঁকুটি নেই, রক্তিম
 চোখের চুলচুলু দৃষ্টিতে কেমন একটু হাসির ফিরণ । বললেন, ‘একে বুঝি
 কথাশিল্পীর জবাব বলে ? আমার গ্যারাণ্টি দেওয়া তাহলে অগ্রায় হয়েছে ।
 এবার তাহলে মেজদার কথাটাই জিজ্ঞেস করি । রুচি হবে তো ?’

হেসে বললাম, ‘সেটা তো আমারো জিজ্ঞাসা ।’

মেজর ঘোষাল আবার শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, ‘ভাখ্ মিষ্ট, ধীর সঙ্গে তুই কথা চালাচ্ছিস, তিনি কোনো সাহেব কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার নন, কোনো কর্নেল, মেজর, ক্যাপটেনও নন, ধীর তোর কথার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। মিসেস নন্দিনী মুখার্জি এখানে ক্যাপটিভ।’

‘ক্যাপটিভ।’ কুন্দনন্দিনী একবার অগ্রজের দিকে ফিরতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ঘাড়ের এই দ্রুত ঝাঁকুনিতে রেশমী-নরম কালো চুলের ঝাপটা ঢেকে দিল মুখের একাংশ।

অপর্যাপ্ত যেন আমারই। কুন্দনন্দিনীর মতো রমণী আমার কাছে বন্দী হবেন কেমন করে? সমস্তার উদ্ভাবকই হেসে জবাব দিলেন, ‘অবিশ্রি ভাবার ক্ষেত্রে। তুই আমাদের অনেককে কথার ঘায়ে ঘায়েল করতে পারিস, তা বলে লেখককেও? অবিশ্রি ক্যাপটিভ না বলে পরাজয় বললেই ভালো হতো।’

কুন্দনন্দিনী হেসে বললেন, ‘একশোবার মেনে নিচ্ছি।’

এবার কলিজায় বাড়ি আমার। তাড়াতাড়ি বললাম, ‘না না, দয়া করে মেনে নেবেন না। মেজর ঘোষাল মোটেই ঠিক বলেননি। ওই যে উনি সব কাদের কথা বললেন, ‘জেনারেল ম্যানেজার কর্নেল মেজরদের কথা, আমি তাঁদের তুলনায় কোনো অংশে শক্ত নই, কথার ঘায়ে আমিও চিরদিনই ঘায়েল।’

‘মেনে নিলেন?’ কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে বলেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তেমনি তাঁর ময়না স্বরে হেসে উঠলেন। তাঁর পশ্চাৎ গ্রীবা থেকে চুলের গোছা পড়ে গেল। রক্তাভা তাঁর সেই অঙ্গেও এবং ঘামে চিকচিক করছে।

আমার বিশ্বয় সেটাই। এমনিতেই পশমী পোশাকে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। নভেম্বরের পাহাড়ী শীত আর যা-ই হোক, সমতলের তুল্য নয়। কুন্দনন্দিনীর অবিচ্ছিন্ন রেশমী পোশাকের সংক্ষিপ্ততাতে দ্রব্যগুণের যুক্তি ছিল। কিন্তু যেদ? তাঁকে স্বদেশিক একবারো মনে হয়নি। চোখেও পড়েনি।

ইতিমধ্যে মেজর ঘোষালও ভগ্নীর সঙ্গে হান্তে তাল মিলিয়েছেন। কুন্দনন্দিনী মাথা তুলে আবার সোজা হয়ে বসলেন। সঘন নিশ্বাসের মধ্যে হাসিকে ডুবিয়ে রেখে বললেন, ‘তাহলে আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দিই, আমার ঋতিতে আটকাবে না। এবার তাহলে শুরু করুন।’

বললাম, ‘আগেই বলেছি, আজ আমার নিয়ম আর সময়ের সীমা যখন আপনাদের হাতে, শুরুটা আপনারাই করুন।’

কুন্দনন্দিনী অগ্রজের দিকে বললেন, ‘মেজদা, আমাদের শুরু তো হয়েছে অনেক আগেই। লেখকের সঙ্গে গাড়ির এই সেশনে তুমি আগে মুখ দাও।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘কিন্তু তোকে আমি আগেই বলে নিয়েছি, গাড়ি চালাতে হলে আমি আর ড্রিংকস নেবো না। তুই বরং আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দে।’ বলে তিনি তাঁর ফোঁজী পশমের জামার বুক পকেট থেকে বাঁ হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে এগিয়ে দিলেন।

কাকেই বা শোনাবো দাদা ভগ্নীর এমন সহজ বচনাবচন। কেই-বা শুনেছে কবে? শুনে থাকলেও আমার কাছে নতুন। কুন্দনন্দিনী ডান হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিয়ে বোতলটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘জানি, এখন তোমার ড্রিংক করা ঠিক হবে না। আমি মরলেও লেখককে বেঘোরে মরতে দিতে পারি না পাহাড়ের খাদে।’ বলে তিনি জ্রুত মুখ ফিরিয়ে একবার আমাকে দেখে নিয়ে আবার অগ্রজকে বললেন, ‘তিস্তা আসতে এখনো একটু দেরি আছে। তোমাকে আর বলবো না একবারও। অন্তত লেখকের অনারে এক সিপ্।’

মেজর ঘোষাল ঘাড় কিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন। হেসে বোতলটি বাঁ হাতে নিলেন ভগ্নীর হাত থেকে। বললেন, ‘অনেক ড্রাইভার ড্রিংক না করেই পাহাড়ের খাদে হারিয়ে যায়, তিস্তায় ডুবে যেতেও দেখেছি চিরদিনের জন্ত। কোনোটাতেই তফাত কিছু হয় না, তবে সাবধানের মার নেই। মিথ্যা অহংকারটা ভালো না।’ বলে তিনি বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিলেন।

গাড়ি যদিও নেমে চলেছে অজগরের গা বেয়ে। মনে মনে ভাবি অন্তত কথার দরকার কী? আমার প্রাণ যে সত্যি বড় গরীব। কুন্দনন্দিনী একটি রাজা মাপের সিগারেট তাঁর রক্তিম ঠোঁটে চেপে ধরলেন। সিগারেটটা খরখর করে কাঁপছে কেন? গাড়ির ঝাঁকুনিতে না কি ঠোঁটের কম্পনে? বার কয়েকের চেষ্টায় যন্ত্রের ম্যাচ্বাতি জ্বললো কিন্তু হাতের আঙুলে এতো অস্থিরতা কিসের? সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। ভ্রাতা ভগ্নীতে দেওয়া নেওয়া হলো বোতল আর সিগারেট। কুন্দনন্দিনীর ডান হাতে বোতল বাঁ হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। বাঁ হাত বাড়িয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, ‘ধরুন একটু। বাঁ হাতে দিলাম। অ্যাণ্ড উইথ য়োর পারমিশন—।’ বলে বোতলের মুখে মুখ ঠেকিয়ে চুমুক দিলেন। চুমুক? তার অর্থ কি শোষণ? তাহলে বলি শোষণ করলেন। দীর্ঘ শোষণ। মাথা তাঁর পিছনে হেলানো। সংক্ষিপ্ত রেশমী জামা, বক্ষাস্তর অধর হলো, যেন বিস্তৃতি নীমা-মানতে চায় না। আমি যেন দেখলাম সূর্য তাঁর গলার ভিতর দিয়ে নেমে

বুকের দিকে বরষার স্রোতে নামছে। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত আছড়ে পড়ছে রক্ত, যার ছটা তাঁর কোমল স্বকে ঝলক দিচ্ছে।

‘মিষ্টি!’ মেজর ঘোষাল নিচু স্বরে ডাকলেন প্রায় ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে।

কুন্দনন্দিনী মুখ থেকে বোতল বিচ্ছিন্ন করে শব্দ করলেন, ‘উঁম?’ তারপরে চৌক গিলে বা হাতের পিঠ দিয়ে চৌটে আন্তে চাপ দিলেন। নাসারক্ত ক্ষীত বড় নিশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। এ লাল মুখকে কোন্ লালের সঙ্গে তুলনা করবো? বনের কুহুম দেখেছি, রক্তকুহুম। যেন আকাশে মেলে দেওয়া আঙনের শিখা। এ মুখ দেখে তা মনে হলো না, দেখছি অতি জলন্ত অঙ্গার। এখন তাঁর চোখ ময়নার মতো না, কোকিলের মতো লাল। কোকিলের চোখ কেন লাল? হায়, এ জিজ্ঞাসাটাও এখনই আমার মনে জাগলো। চৌট ফেটে কি রক্ত বেরোবে? তারুলের রাগরঞ্জন বা গুঁঠরঞ্জনী সবই যেন এখন ভুল মনে হচ্ছে। শ্বেদবিন্দু তাঁর গলায়। পান তো করলেন না, যেন স্থা খেলেন জয় কালী বলে। কিন্তু সত্যিই স্থা পান করলেন কী? তাহলে ক্ষীত কম্পিত নাসারক্ত কুঁচকে কুঁচকে উঠছে কেন? আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বোতলটি এগিয়ে দিলেন।

এখন আর কোন যুক্তি নেই, সেটা হবে ছলনা। নিয়ম সময় সবই যে দিয়েছি। অতএব তুলে নিই বোতল নিজের হাতে। তিনি কিছু না বলেই আমার হাত থেকে নিলেন সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। তাঁর হাত কাঁপছে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। পরিবেশ মগজ ধোলাই করে। আমি তাঁর দিকে চাত বাড়িয়ে বললাম, ‘লাইটারটা আমাকে দিন, ধরিয়ে দিচ্ছি।’

‘খুব ভালো লাগলো মশাই, আশা করিনি। দিন।’ কুন্দনন্দিনী আমার হাতে লাইটার দিয়ে চৌটে সিগারেট চেপে আমার দিকে ঝুঁকে এলেন। আবু গরীব প্রাণকে বলি চোখ টেনে রাখ্ রমণীর দীপ্ত কোমল রমণীয়তা থেকে। চোখের মাথা খাই, তবু কী অবাধ্য এই চোখ। সে কেবলই আমার গরীব হটায়। লাইটার শিখা জালিয়ে সিগারেটের অগ্নে ধরি। কুন্দনন্দিনী টান দেন। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে আমারই মুখে। তাঁর কোমল কেশেও। গতির ঝাপটায় উড়ে যায় ক্ষণপরেই। কিন্তু আশা করেননি আমি তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দেবো? আমি তো তাঁর হাতের কম্পন শৈথিল্য দেখেছি। তা ছাড়া পরিবেশ, পাতপাতীর প্রভাব বলে একটা কথা আছে। জীবনে আর কোনো রমণীকে

যে ইতিপূর্বে আর ধূমপানে সাহায্য করিনি, সেটি তো বলতে পারবো না।
কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করলো না।

কুন্দনন্দিনী সিগারেটটা ঠোট থেকে হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে
বললেন, ‘কী হলো, বোতল মুখে দিতে রুচিতে বাধছে?’

হেসে তাড়াতাড়ি বোতল মুখের কাছে তুলে নিয়ে বললাম, ‘না। আচ্ছা
কুন্দনন্দিনী দেবী—’

‘বলুন, দেবতা।’ বলেই ময়না স্বরে খিলখিলিয়ে উঠলেন। মাথা দিলেন
লুটিয়ে আমার দিকে, হাত দিয়ে আলতো করে চাপড় মারলেন আমার হাঁটুর
কাছে, যেখানে তাঁর আঁচল লুটিয়ে আছে।

এবার ঠেক্টা খেলাম বেশ লাগসই। মেজর ঘোষাল হেসে উঠলেন,
হাসলাম আমিও। কিন্তু আমার মুখের ভাবসাব যে মোটেই সুবিধার না, তাও
বুঝতে পারছি। আসলে ঘায়েল হয়েছি। এখন আমার ঘায়েল মাছবের
মুখ। ভালো কথায় কি বিভ্রান্ত বলে? চলতি তবে ভ্যাবাচাকা, না তো বোকা।

কুন্দনন্দিনী মাথা তুলে চোখের লাল সায়রে কালো মানিক জোড়া ঘুরিয়ে
বললেন, ‘কী বলবো বলুন? আমাকে দেবী বললে দেবতাই বলতে হয়
আমাকে।’

‘পারফেক্টলি রাইট মিষ্টি।’ অগ্রজ বাহবা দেন ভগ্নীকে এবং আমার
দিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, ‘কুন্দনন্দিনী নামটা আপনি পছন্দ
করেছেন। মিসেস মুখার্জির থেকেও নিশ্চয়ই বেশি পছন্দ করেছেন।’

অসত্য না। এখন আমি না জেনে বিব করেছি পান। কুন্দনন্দিনীকে নাম
ধরে ডাকতে হবে নাকি?

বললাম, ‘তা করেছি, কিন্তু একজন মহিলাকে—’

‘তুমি বা তুই তোকারি করবেন না তা বলে।’ কুন্দনন্দিনী বললেন,
‘নামেতেই আপনি করুন না।’

কৌজী দাদার বোন হলেনও কথাটি ঠিক কইতে জানেন। বললাম, ‘হ্যাঁ
অস্তুত দেবতা শুনে কানে কালা হওয়ার থেকে সেটা অনেক ভালো।’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘এবার বলুন কী বলছিলেন। তাড়াতাড়ি বলুন,
আমার আসল কথাটা এখনো মিঃ দস্তুর ওধান থেকেই থমকে রয়েছে।’

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কুন্দনন্দিনী যেন প্রায় কাঁধে কাঁধে
ধাক্কা দেবার ভঙ্গি করে বললেন, ‘বলুন বলুন, আগে আপনার কথাটা
শুনে নিই।’

বললাম, ‘রাগ করবেন না যেন, জিজ্ঞেস করতে বাচ্ছিলাম এত খাচ্ছেন কেন? সকাল থেকেই?’

কুন্দনন্দিনী আবার জুহুটি করে আমার দিকে দেখে অগ্রজের দিকে ফিরলেন। মেজর সাহেব হাসলেন। কুন্দনন্দিনী আবার আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘এত তাড়াতাড়ি কোনো মহিলাকে এ সব কথা জিজ্ঞেস করতে আছে? আপনি এত বড় একটা লেখক, এটা জানেন না?’

তাড়াতাড়ি হাতে বোতল ধরে হাত জোড়ের ভঙ্গি করে বলি, ‘আর যে-কথাতেই ধায়ের কফন, বড় লেখক বলে আমাকে প্রাণে মারবেন না।’

‘ও কথা বললে আপনি মরেন নাকি?’ কুন্দনন্দিনীর ভুরু লতিয়ে উঠলো।

বললাম, ‘অস্তুত এ বিষয়ে এখনো মিথ্যে বলতে পারি না। তবে আমার জিজ্ঞাসাটা যদি আপনাকে দুঃখিত করে থাকে মার্জনা চাইছি। আমি সে রকম কিছু ভেবে বলিনি।’

কুন্দনন্দিনী আবার আমার হাঁটুর ওপরে তাঁরই অলিত রেশমী গোলাপি আঁচলে আস্তে চাপড় মেরে বললেন, ‘তা জানি। কোনো কোনো বিষয়ে আপনি এখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। কিন্তু মুখের ভাবটি খুব পারেন।’ বলে হাসিতে নিশ্বাসে মিলিয়ে একটি শব্দ করে আবার বললেন, ‘আমিও কিছু না ভেবেই বলছি, আমার ড্রিং করতে ভালো লাগে। এখন আমার শখের প্রাণ গড়ের মাঠ। দাদার অতিথি, নীতের পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন আমার সময়ও নেই, নিয়মও নেই। যতোকণ ভালো লাগছে ততোকণই খেয়ে যাচ্ছি। শুনে কি খুশি হলেন?’

হবো না আবার! জিজ্ঞেস করেই ক্যাসাদে পড়েছি এখন ছেড়ে দে মা কৈদে বাঁচি অবস্থা। বললাম, ‘বুঝেছি। ছুটির মেজাজে আছেন।’

‘ছুটির মেজাজ?’ কুন্দনন্দিনী যেন অগ্রমনস্ক হয়ে পড়লেন, চোখ অভিমানায় ঢুলে উঠলো। হাত উলটিয়ে ভঙ্গি করে বললেন, ‘তা হবে, ছুটির মেজাজই বলতে পারেন। নয় তো পালিয়ে বেড়াবার মেজাজ।’ বলেই কিক করে হেসে উঠলেন।

আমি মেজর ঘোষালের দিকে দেখলাম। গভীর নন, কিন্তু হাসি নেই তাঁর মুখে। দৃষ্টি সামনের দিকে। সহসাই যেন গাড়ি নেমে এসেছে উৎরাইয়ের ঘন ঘনের নিবিড় ছায়ায়। এতক্ষণের প্রায় অনেকটা পথই ছায়াহীন গাড়া পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমেছে। এখন সামনে আরো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। পিছনেও গাড়ির ঘন ঘন নির্ঘোষ আর শব্দের সংকেত।

‘দেখি দিন ওটা।’ কুন্দনন্দিনী ঝটিতি অতি নিবিড় সান্নিধ্যে আমার দিকে খুঁকে পড়ে বোতলের গলা চেপে ধরে বললেন, ‘আপনি হাঁ করুন, আমি আলগা করে আপনার গলায় চেলে দেবার চেষ্টা করছি। এটাতে মুখ লাগাতে আপনার বাধছে।’

ফুলেল স্বাস, স্রবর গন্ধ, নিশ্বাসে স্পর্শ করলো আমার চিবুক আর গলা। অগ্ন স্পর্শের কথা কী বলবো? আগুনের স্পর্শ? কিন্তু পুণ্যের ছোয়া যে বোধ করি না। শরীর জুড়ে কুষ্ঠা জাগে। তথাপি হায়, গরীব আমার প্রাণ। মহাপ্রাণের কোন্ সীমায় ঝংকৃত হয়। কিন্তু তাকে ভুল বুঝতে দিতে চাই না। তাড়াতাড়ি মুখের কাছে বোতল তুলে বললাম, ‘আমার রুচিকে সন্দেহ করবেন না। সংসারে যাদের আস্তাকুড়ের মানুষ বলা হয়, আমি সেখানকার লোক। অনেক মুখেই আমার মুখ ছোঁয়ানো।’ বলেই আমি বোতলের মুখ নিজের মুখে ঠেকিয়ে পান করলাম।

খাঁটি পানীয়র মাত্রা যতোটা কম ভেবেছিলাম, আদৌ তা না। গলা থেকে সোজা অস্ত্রে গিয়ে তা জ্বানান দিল। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর মুখে এক বিষণ্ণ বিষয়ের আলোছায়া। তাঁর আরক্ত চোখেও। বললেন, ‘ওই কথাটা আমাকে লিখে দেবেন। অনেকের মুখে আমার মুখ ছোঁয়ানো। আস্তাকুড়ের পরিচয়ে আমার দরকার নেই। দিন।’ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে বোতল নিলেন। বাঁ হাতে জ্বলছে সিগারেট। হঠাৎ সেইটি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

এখন এ সব বিষয়ে অবাক না হওয়া ভালো। কারণ অবাক হবার কিছু নেই। সিগারেটটা আমাকে ধরতে দিলেন, না কি ধূমপানের নির্দেশ? জিজ্ঞাসাটা জিজ্ঞাসাই থাক। কথা কইলে কথা বাড়ে। লক্ষণের ফল ধরে থাক। কুন্দনন্দিনী বোতল তুলে ঠোঁটে ঠেকিয়ে মাথা হেলিয়ে চুমুক দিলেন।

কিন্তু একটি জিজ্ঞাসা মনে দেগে রইলো। আস্তাকুড়ের পরিচয় জানতে তাঁর অরুচি কেন? ঘৃণা? নাকি মানে লাগে? তাহলে যে আবার আমার মনে চাকু কু বোধে। জ্বালা করে। যদিও তা বলতে ঠেক লাগে।

কুন্দনন্দিনী ঠোঁট থেকে বোতল আলাদা করে একটা নিশ্বাস কেললেন। শিরায় ফেরা রক্তের আর ঘোষ কী? চোখের তারা থেকে দর্বাঞ্জে ঝলক না দিয়ে তার উপায় কী? স্রবর আর এক নাম লাল পানি কি এমনি এমনি হয়েছে। কিন্তু নিশ্বাস কেলেই তিনি যেন আমার আঁতের জ্বালা টের পেয়ে জুড়িয়ে দিলেন। চোখ বুজে বললেন, ‘আস্তাকুড়টা আপনার থেকে

আমি কম চিনি না। আমিও লেখানকার মানুষ। আপনার থেকে বেশি।’ বলে চোখ খুলে আমার দিকে লাল চুলচুলু চোখে তাকিয়ে হাসলেন।

ভুল দেখলাম নাকি? একে কি হাসি বলে? মনে ভোঁ হয় না। কান্না? উহ। তবে কি ঘৃণা না বিষে? ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু এ হাসি সে-হাসি না। কুন্দনন্দিনী যে কারণে অল্প নামে মিষ্টি, বা বলা ভালো তাঁর চোখের কোণে ধুক ঠোটে কৌতুক ঝরানো রঙ্গের হাসি। হাসিটির পিছনেই যেন কী এক উষ্ণ তারল্যের টলটলানি। কথাটি বলেই তিনি আবার বোতল ঠোটে মিলিয়ে চুমুক দিলেন। তাঁর ঠোঁট আগ্রাসে হুঁচালো, স্বভাবতই গালে টোল খেয়েছে। মেজর ঘোষাল একবার ফিরে গভীরে দেখলেন, তারপরে আমার দিকে। আবার সামনের দিকে মুখ করে একটু নড়েচড়ে বসলেন। প্রতিজ্ঞিরাটা উদ্বেগের বুঝতে পারি। কোঁজী কেতার যদিও তা মুখের চেহারায় অপ্রকাশ্য।

কুন্দনন্দিনী বোতল নামালেন। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট মুছলেন। এখন আর তাঁর গুঁঠরঙ্গনীতে খেয়ান নেই। হাতের পিঠে ঠোঁটের রঙ লেগে গেল। একেবারে সরাসরি আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনার আস্তাকুড়ের চেহারাটা কেমন জানি না। আমারটা দুর্গন্ধে ভরা। কিন্তু এটা কী বলুন তো। এটা কি আপনাকে আমি পাঁচ আঙুল দিয়ে ভোগের কলার মতো ধরে রাখতে বলেছি?’ বলেই হেসে উঠলেন। হাসলো তাঁর গোটা শরীর। সিগারেটটা নিজের বাঁ হাতে নিয়ে বোতল দিলেন আমার কোলের কাছে বাড়িয়ে। আমি সেটা ধরলাম। তিনি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন ‘সিগারেট যখন, তখন তা পুড়বেই। কিন্তু কিছু মৌজ তো লুটে নিতে হবে।’

কথাটা যেন কেমন শ্রবণ থেকে গভীরে গিয়ে বাজে। পুড়তেই যার সৃষ্টি, সে পুড়বেই। কিন্তু তার থেকে কিছু স্বত্ব তো তুলে নিতে হবে। এও কি চর্চাপদের সন্ধ্যাভাষা নাকি? শুনতে শোনার এক রকম, বাজে অল্প অর্থে! সিগারেটটি আবার আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘নেহাতই সিগারেট, মহাদেবের প্রসাদ নেই।’ বলে হেলে উঠে আবার বললেন, ‘একটা টান দি। অনেক মুখেই তো আপনার মুখ ছোঁয়ানো।’

আমার নিজের কথা দিয়ে বেড়াঝাল বাঁধা। অতএব, সিগারেট নিয়ে রঙ লাগা ফিলটার টিপ-এ ঠোঁট চেপে টান দিলাম। তাকালাম মেজর ঘোষালের দিকে। তিনি তাকালেন না, কিন্তু তাঁর ঠোঁটে টেপা হাসি। কুন্দনন্দিনী আবার ডান দিকে ঝুঁকে আসনের পিছনে ডান হাত বাড়ালেন, বললেন, ‘আমার পানের ঠোঙাটা আছে তো? আর আমার ব্যাগ?’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘সবাই আছে, কিন্তু তুই কি নিতে পারবি? এখন তো দেখছি সোজা হয়ে বসতে পারছিস না, অর্ধেকের বেশি শরীর চাপিয়ে দিইয়েছিস লেখক বেচারীর ষাড়ে।’

‘সত্যি নাকি?’ কুন্দনন্দিনী আমার দিকে মুখ তুলতে গিয়ে তাঁর এলো-মেলো কালো রেশমী মাথা দিয়ে আমারই গালে ঠোকা দিলেন।

মাথার আর দোষ কী। সে যে কখন কোন্ দিকে টলে মাথার মালকাইনের এখন আর তা জানবার উপায় নেই। মেজর ঘোষালের কথা শুনে আড়ষ্ট হলাম আমিই। তাড়াতাড়ি বললাম, ‘আপনার কোনো অসুবিধা করবেন না।’

‘আপনার অসুবিধা হলেও।’ কুন্দনন্দিনী মুখ একটু সরিয়ে বললেন। চোখ নামিয়ে নিজের বক্ষোপরি নজর করলেন। যে অবিচ্ছেচ্ছ সংলগ্নতাকে মেপে নিলেন। তারপরে নাক কুঁচকে এমন ভঙ্গি করলেন বিষয়টি অতি অকিঞ্চিৎকর। বললেন, ‘কী আসে যায়? আপনি তো মশাই কালকূট।’ বলেই আবার আসনের পিছন দিকে কাত হয়ে হেলে পড়লেন।

কী অর্থ এ কথার? কালকূট বলে কি চিরকালের পুরুষটাকে কোথাও থুয়ে এসেছি নাকি? নাকি তিনি আমার অসুবিধার বোকা বহনের কথা বলছেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসাতে নেই। শুনতে পেলাম, ‘পেয়েছি।’

কুন্দনন্দিনী সোজা হয়ে বসলেন। দেখলাম রূপায় পাখর বাঁধানো ড্রাগন-মুখো একটি ছোট তুলতুলে ছোট ব্যাগ তাঁর হাতে। সঙ্গে একটি ভেজা ভেজা পাতার ঠোঙা। ব্যাগটি রাখলেন ডান দিকে। সেটা আসন স্পর্শ করলো না। ছ’জনের কোমরের মাঝখানে ঠেকে রইলো। পাতার ঠোঙা খুলে বের করলেন টাটকা পানের খিলি। একটি খিলি আমার দিকে তুলে বললেন, ‘চলবে?’

বললাম, ‘চলবে।’ সিগারেটের শেষ অংশ ফেলে দিয়ে পানের খিলিটি নেবার জন্ত হাত বাড়ালাম।

কুন্দনন্দিনী হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘দেবো? নাকি ঠোঙা থেকে তুলে নেবেন?’

নব রহস্য। দেখছি তাঁর কোকিল চোখে কোঁতুকের চটা। কিন্তু কথার অর্থ কি? বললাম, ‘আপনার যেমন ইচ্ছা।’

কুন্দনন্দিনী ষাড়ে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ‘হাতেই দিই। যদিও বলে পানের খিলি হাতে করে স্বামী হাতে ছাড়া পরপুরুষের হাতে দিতে নেই। নিন।’ হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাহলে কেমন করে নিই? এ ক্ষেত্রে আমার পরিচয় তো পরপুরুষই। স্বামীর অধিকারে ভাগ বসাবো কোন্ সাহসে? নিয়ম নীতি বলেও একটা কথা আছে তো। একবার যখন কানে শুনেছি। বললাম, ‘তাহলে ঠোঁড়া থেকেই নিতে দিন। কিন্তু রহস্যটা জানা নেই।’

কুন্দনন্দিনী ময়নাষুরে হেসে তাকালেন অগ্রজের দিকে। অগ্রজ হেসে একবার দেখলেন আমার দিকে। মুখ ফিরিয়ে বললেন, ‘আপনার দেশ কোথায় ছিল? ইস্টবেঙ্গেলে?’

অধুনা যার নাম বাংলাদেশ। ডিসেম্বরের হিসাবে ধরলে, এই নভেম্বরে পুরোপুরি বারো মাস, বাংলাদেশ-এর জন্ম। বললাম, ‘ঢাকা।’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘সে জ্ঞাতই। ষাঙালয়া এ রহস্য জানে, না এসব হলো আমাদের ঘট-রহস্য।’ বলে আবার হেসে বললেন, ‘পানটা আগে নিন। ভয় নেই মশাই, আপনাকে আমার স্বামী করবো না।’ বলেই আবার খিলখিলিয়ে উঠলেন। হাত তুলে আনলেন প্রায় মুখের কাছে।

আমি পানের খিলি তাঁর হাত থেকে নিলাম। তিনি বললেন, ‘খুলে খান।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন, এর ভেতরে কি আছে?’

কুন্দনন্দিনীর আরক্ত চোখে মুখে এবং সারা শরীরেই যেন একটা রুদ্ধ হাসি ধমধমিয়ে রয়েছে। বললেন, ‘ভেতরে যা থাকে তা-ই আছে। লবঙ্গের কুলুপ কাটিটা খুলে নিয়ে খান।’

এই কথা! কিন্তু এই কথাই কী? এও তো শোনাচ্ছে যেন সন্ধ্যার ভাষায় মতো আবছা। আমার বঠেঙ্গির সজাগ হয়ে উঠছে। লবঙ্গের কুলুপ কাটি! স্বামীর অধিকার। সবই যেন কেমন কেমন না? কিন্তু আমি না পাঁচ খাজাঞ্চি-খানার প্রেমিক? ঘরেতে আমার মন নেই। পাহাড়ের সেই খাজাঞ্চিখানার ভাকে আমি চড়াই উৎরাই ভাঙছি। কে আমাকে মাথার দিকি দিয়েছে পথ চলাতে এত দায় ঠেক মানতে? আমি লবঙ্গটি খুলে নিয়ে পানের খিলি মুখে দিলাম।

কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ হেসে উঠে নিজের কোলের ওপরেই ঝুঁকে পড়লেন। বিভ্রান্তি আমার। অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। মেজর ঘোষাল বললেন, ‘কী পাগলের মতো হাসছিল? লেখক একজন গ্রোম আপ রসিক মাস্তব। নতুন করে তো আর পাকাতে পারবি না।’ বলে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ‘পানের খিলির আঁকারটা একটা প্রতীক।’

আমার সজাগ বর্ষেক্ষিত্রের মূলে, অতি লজ্জার কাঁটা বিঁধে গেল। এই রকম একটি অহুমানই করেছিলাম। এখন মুখের তাহুল চিবোতে পর্বস্ত লজ্জা। কিন্তু আর উপায় নেই, একবার যখন মুখে নিয়েছি। কুন্দনন্দিনী আন্তে আন্তে তাঁর ঝুঁকিয়ে রাখা মাথা তুললেন। চূলে তাঁর অতি রক্তাক্ত মুখ প্রায় সবখানিই ঢাকা। ফাঁকে ফাঁকে ঢুলুঢুলু চোখ উঁকি দিচ্ছে। তিনি এবার নিজে একখানি পানের খিলি মুখে দিলেন। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। কিন্তু ঝংকার বলে একটা কথা আছে। ইংরেজিতে কি তাকে ভাইব্রেশন বলে? প্রতীকের ঝংকারটা এত সহজে মস্তিষ্ক থেকে যাবার না। একেবারে অজানা নেই, এই সব প্রতীক আকার ইঙ্গিতের বিষয়গুলো। জাহ্ন থেকে মন্ত্রতন্ত্রে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অনেক প্রতীক আকার ইঙ্গিত। কিন্তু এটা যেমন নিত্যকার ঘরোয়া তেমনি খোলাখুলি। বনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয়ে এ পরিহাস অনেকখানি জমতে পারতো।

‘এই যে কালকূট মশাই, আপনার কি এ বস্তু চলবে?’ কুন্দনন্দিনী ভেকে জিজ্ঞেস করলেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, তাঁর ডাগনমুখো ব্যাগ থেকে বের করেছেন জর্দার কোঁটো। গছটা তাঁর অঙ্গরাগের ফুলেল থেকে কিছু কম না। কিন্তু আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গন্ধে না, বস্তুটির ধক সামলাতে পারি না। বললাম, ‘ওটা পারি না, বুকে আটকে যায়।’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘সে কি, কালকূটের বুকে আবার কিছু আটকান্ন নাকি?’ বলে তিনি নিজেই চিমটি দিয়ে জর্দা নিয়ে মুখে দিলেন।

বললাম, ‘রপ্ত করতে পারিনি। আপনার দেখছি অনেক কিছুই চলে। কিন্তু মেজর ঘোষাল পান খেলেন না?’

মেজর ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমি পানই খেতে পারি না।’

‘আর আমার কথা যদি বলেন, প্রায় সব নেশাই করতে পারি।’ কুন্দনন্দিনী তাঁর ব্যাগ বন্ধ করলেন, ‘আপনি কোকেনটা এখনো টেস্ট করিনি, আর চণ্ড চরস। আর বাকি কিছু রাখিনি।’

অতঃপর আর কোনো কথা চলে না। কুন্দনন্দিনী তাঁর ব্যাগ আর পানের ঠোঙা আবার ডান দিকে কাত হয়ে পিছনে রাখলেন। কিন্তু পুরোপুরি সোজা হলেন না, বললেন, ‘যে কথাটা সেই দত্ত সাহেবের ঘর থেকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করা হয়নি, সেটাই করি। লিখতে গেলে সবাই দেখি ভালো ভালো ছদ্মনাম রাখেন। আপনার এই নামের মানেটা কী?’ কুন্দনন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। তাঁর চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, রাজ্যের ঘুম নেমে

আসছে। অনেকটা জোর করেই তাকিয়ে আছেন। কিন্তু এ যে আর এক ঠেক! বললাম, ‘ওই নামটাই হঠাৎ মনে এসেছিল।’

‘ও তো এড়িয়ে যাওয়া কথা।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘হঠাৎ কিছু হয় বলে, বিশ্বাস করি না। এ তো আর চোর ধরা বা জলে পড়া না। মনের কথা বলুন।’ তিনি তাঁর আধবোজা স্থির চোখ রাখলেন আমার চোখে।

বললাম, ‘নিজেকে আমার যা মনে হয়েছিল, তেমন একটা নামই নিয়েছি।’

‘আর তা কালকূট।’ কুন্দনন্দিনীর একটা নিশ্বাস পড়লো, সেই সঙ্গে হাসি, বললেন, ‘বেশ। প্রাণঘাতিনী বিষ। আপনি তো আবার ঘাতক।’ বলে তিনি আবার একটু হাসলেন। তাঁর মাথা এলিয়ে পড়লো অনেকখানি ডাইনে আমার কাঁধের কাছে, কিন্তু ঢুলুঢুলু দৃষ্টিটা অগ্র দিকে। বললেন, ‘আমার একটা এ রকম নাম দিতে পারেন? লেখবার জ্ঞান না, পরিচয় দেবার জ্ঞান।’ বলেও যেন জবাবের প্রত্যাশা তাঁর নেই। আবার বললেন, ‘নিচে নামতে নামতেই যদি কিছু মনে আসে বলবেন।’

আমি মেজর ঘোষালের দিকে তাকালাম। তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, ‘আমাদের ভাগাটা ভালো, তিস্তা ব্রিজ ডাউনে এখনো খোলা আছে। ভেবেছিলাম খোলা পাবো না, দেরি হয়ে গেছে!’ বলে তিনি ঘন ঘন কয়েকবার হর্ন বাজালেন।

যেন কোন সংকেত পাঠালেন। হঠাৎ আমার হাতের ওপর হাত পড়তেই অবাক চোখে তাকালাম। না, আমার হাতের সন্ধান করছেন না কেউ। কুন্দনন্দিনী আমার হাতে ধরা বোতলটা টেনে নিতে নিতে, প্রায় ঘুম জড়ানো স্বরে বললেন, ‘আপনি তো কেবল ফাঁকি দিচ্ছেন, আমিই আর একটু নিই।’

মেজর ঘোষাল ভরী দিকে চকিতে একবার তাকালেন। গাড়ি এখন তিস্তা নদীর সেতুর ওপর দিয়ে চলেছে। কুন্দনন্দিনী বোতল ঠোঁটে চেপে চুমুক দিলেন। মেজর ঘোষাল ডাকলেন, ‘মিষ্টি।’ পাহাড়ের কোলরাহিনী রূপে তিস্তাকে আমার ওই প্রথম দেখা। কিন্তু দেখার মতো করে দেখতে পারছি না। কুন্দনন্দিনীর হাত বোতলহৃদ নেমে এলো আমার কোলের ওপরে। তাঁর হাতের শৈথিল্য প্রমাণ করছে, বোতল ধারণে অক্ষম। আমি বোতলটা হাত দিয়ে ধরলাম। তাঁর হাত এলিয়ে পড়লো আমার কোলের ওপর। মাথা গড়িয়ে পড়লো কাঁধের পাশে। আমি তাকালাম মেজর ঘোষালের দিকে। তিনিও বারেক তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, ‘ধাকতে দিন, না হলে আবার

খেতে চাইবে। একটু ঘুমিয়ে নিলে, নিচে গিয়ে স্থূভাবে কথা বলতে পারবে। আপনার একটু অস্থবিধা হবে।’

অস্থবিধা? আমার গরীব প্রাণের কথা আর ভাবতে পারছি কই। সেবা আমার দ্বারা হয় না। কিন্তু অস্থকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। এ রমণী আমার দত্ত পরিচিতা। কিছুই তাঁর জানি না। তবু তাঁর এই সকল রমণীয়তার মধ্যে, কোথায় যেন বেহুঁর বাজছে। আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, দিল্লির রঞ্জিতা রিজ্‌ভির কথা। আর একজন বোম্বাইগামী রেলগাড়ির কামরায়, জেসমিন নামে এক মহিলা। দৈবক্রমে তাঁরা দু’জনেই মূলগিয়। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি সিঁচি মেয়ে, ধর্মান্তরিতা ছিল। দু’জনের কেউ আজ বেঁচে নেই। জেসমিন আত্মহত্যা করেছিলেন সেই রেলগাড়ির নিচে। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি ওর সকল জালা নিয়ে বোম্বের আরব সাগরের জলে।

‘আপনি বরং বোতলটা আমার হাতে দিন, আমি রেখে দিচ্ছি।’ মেজর ঘোষাল বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাত বাড়ালেন, ‘আপনি একটু ভালো ভাবে বসতে পারবেন।’

মিথ্যা না। আমি বোতলটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

পাহাড়ের ধার বহে, তিস্তার ঢল নেমে চলেছে নিচে। আমরা নামছি তিস্তার কূল ধরে। শব্দ তার নিরন্তর। জীপের ডানদিকে বসে, কিছুটা চক্ষে হারাচ্ছি। তিস্তা চলেছে বায়ে। উংরাইয়ের পথ যতোটা স্পর্শ না তার থেকে বেশি বিপজ্জনক ধসের পিছল আর অনিশ্চয়তা। সময়টা বর্ষার না, হেমন্তের। সেটা একটা ভরসা। তথাপি দেখতে দেখতে যাচ্ছি, প্রায় জায়গাতেই পথ সারানোর কাজ করছে নারী পুরুষ শ্রমিকরা। হেমন্তের তিস্তায় তেমন নীল বলক নেই। যুক্তিকার রঙ দু’রঙ ঢলের স্রোতে।

কুন্দনন্দিনীর মাথা এখন আমার কাঁধে জুস্ত। দক্ষিণ শরীরের অধিকাংশ আমার ওপরেই। মেজর ঘোষাল বললেন, ‘দত্ত সাহেবের মুখে আপনার কাঞ্চন-জংঘার মোহের কথা শুনছিলাম।’

মোহ। শব্দটা ছাঁকা নির্ধারের মতো মনে হলো। কাঞ্চনজংঘার মোহ। আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তিনি আবার বললেন, ‘তবে দত্তসাহেব আপনাকে ঠিক পথই বাতলেছেন। আপনি এতদিন ভুল ঠিকানায় ঘুরছিলেন। কাঞ্চনজংঘা হলো সিকিমের আপন দেশ। পূর্ব সীমান্ত।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘সিকিমের? আমার ধারণা ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা তিব্বতে।’

মেজর ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন, ‘না। তবে তিব্বতের দক্ষিণ অংশে কাঞ্চনজঙ্ঘার সীমানা। সিকিমের পূর্বে হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা। তবে সিকিমীদের উচ্চারণটা একটু আলাদা। ওরা বলে খান-চেন-জো-ঙা।’

আমার জ্ঞানে যে আবার একটু রোশনাই লেগেছে। আমি সেই স্বর্ণ-শিখরের তিব্বতীদের বয়স-বড়-পাঁচ-খাজাঞ্চিখানার কথা তাঁকে বললাম। মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘আপনার কথাও ঠিক। তিব্বতীদের সঙ্গে সিকিমের মানুষের অনেক বিষয়ে অনেক মিল। ধর্মের বিষয়ে তো কোনো কথাই নেই। ছুই দেশই ধর্মে বৌদ্ধ। তিব্বতে যেমন দলাই লামাকে মনে করা হয় গড কিং বা লিভিং গড, ছোগিয়ালও তাই। অর্থের দিক থেকে তিনিও দলাই লামার মতোই জীবিত ঈশ্বর। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে তিব্বতীদের যে বিশ্বাসের কথা বললেন, প্রায় একই বিশ্বাস সিকিমের মানুষদেরও। কাঞ্চনজঙ্ঘা তাদের কাছেও রক্ষাকর্তা ভগবান—প্রোটেকটিং ডেইটি।’

এবার বুঝি জ্ঞানের রোশনাইয়ে খাম্ভি কোথায়। বললাম, ‘আমার এ সব একেবারেই জানা নেই, অথচ উত্তরের তিব্বত থেকে সিকিম আমার অনেক কাছে।’

‘আপনার সীমানার মধ্যে।’ মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘আসল কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশ। তবে একদিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দুই দেশেরই। একজনের পূর্ব আর একজনের দক্ষিণ সীমান্ত। তিব্বত আর সিকিমের রয়েল ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে-ধাও বটেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ঈশ্বরও সম্পর্কে দুই দেশের সমান বিশ্বাস। আপনি ব্রিটিশ মাউন্টেনিয়ার চার্লস এভানস্-এর কথা নিশ্চয় শুনেছেন?’

চার্লস এভানস্? এ ব্যাপারে আমি অজ্ঞ পাড়ার্গেয়ে। হিলারি আর তেনজিং-এর নামটা কেমন করে মনে রেখেছি সেটাও তাজ্জব। নিজেই পুছ করার বিষয়। কোঁতুহলিত জিজ্ঞাসায় কবুল করলাম, ‘না তো। তিনি কি কোনো পর্বত জয় করেছেন নাকি?’

‘হ্যাঁ, আপনার জানা পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা।’ মেজর ঘোষাল বললেন।

আমি অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি মুখ না কিয়িয়ে চোখের কোণে আমাকে একবার দেখলেন, বললেন, ‘খবরের কাগজে তো বেরিয়েছিল। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি হবে। আমি অবিশ্টি তখন এখানে আসিনি।

দেবদাহনে শিকানবিশী করছি। কিন্তু কাগজে একটা ডিসশিউটের খবর বেরিয়েছিল। এখন যিনি সিকিমের রাজা, নামগিয়েল ডখন রাজকুমার। তাঁর একটা প্রতিবাদ কাগজে বেরিয়েছিল, চার্লস এভানস্ নাকি তাঁর কথা রাখেননি, তিনি নাকি কাকনজংখার উচ্চতম চূড়ায় উঠেছিলেন। কিন্তু রাজ-পরিবারের সঙ্গে এভানস্-এর শর্ত ছিল সেই পবিত্র চূড়া তিনি কখনোই স্পর্শ করবেন না, অপবিত্র করবেন না।’

আমার কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা মাতাছাড়া হ'লো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এভানস্ সাহেব তা করেছিলেন নাকি?’

সেটা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব নয় কী? মেজর ঘোষাল হেসে উঠে বললেন, ‘এখানে আসার পরে শুনেছি এভানস্ সাহেব নাকি নামগিয়েলকে কিছু কটো দেখিয়েছিলেন, যার কোনোটার মধ্যেই সেই পবিত্র চূড়া দেখা যায়নি।’

আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিন্তু সাহেব যে সব কটোই নামগিয়েলকে দেখিয়েছিলেন তার প্রমাণ কি?’

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘একই জিজ্ঞাসা তো আমরাও। সম্ভবত নামগিয়েলেরও সেই সন্দেহ ছিল। কারণ, শুনেছি এভানস্-এর কৈফিয়তে তিনি খুশি হতে পারেননি। কিন্তু আর করবারই বা কী ছিল? বুঝতেই পারছেন একজনের কাছে যা আবিষ্কার আর বিজ্ঞান চর্চা, আর একজনের কাছে তা স্বয়ং ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি। নামগিয়েল হয়তো মনে মনে ঈশ্বরকে ভেকেছিলেন।’

যা অজানা মন টানে সে। যা অচেনা তাকে চিনতেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞানচর্চাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ধ্যানের মহিমাকেই কি করা যায়? তবু মনে পড়ে যায়, কোথায় যেন পড়েছিলাম। কোন্ এক পর্বতারোহীকে নাকি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন তিনি অমুক পর্বত চূড়ায় উঠতে গিয়েছিলেন? তাঁর জবাব, ‘কারণ গুটা এখানে আছে।’ আছে, অথচ তার স্বরূপ দেখলাম না, এ কৌতূহল দুনিবার। তবু বিশ্বাস?

মেজর ঘোষাল আবার বললেন, ‘সিকিমের দেশের লোকদের একটা বড় উৎসব তুষার পূজা।’

তুষার পূজা! এমন পূজার কথা আর কখনো শুনিনি। ভারতের তীর্থ আছে তুষারের প্রাক্ণে, কেদারবদরী। তুষার দেবতা অমরনাথ। কিন্তু তিনিও নামধারী একজন দেবতা। তাকে তুষার পূজা কখনোই বলা যায় না। বললাম, ‘তুষার পূজার কথা কখনো শুনিনি!’

‘ওয়ারিশিপ্ অব্ স্নো রেজ।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘সিকিমীদের বড় উৎসব, নাচের উৎসব হয় প্রাসাদের মন্দিরের উঠানে। আসলে সেই স্নো রেজের আড়ালে বিনি আছেন, সিকিমীরা তাঁকে বলে তুষার সিংহ।’

আমার যেন একটা মুহূর্ত ভয়ের অহুতুড়ি হলো, বললাম, ‘তুষার সিংহ?’

‘হ্যাঁ। স্নো লায়ন। সিকিমীদের এটাও একটা বিশ্বাস। কাঞ্চনজংঘা তাদের ধনদাতা, সৌভাগ্যদাতা, তাদের মোক্ষদাতা। আর তা চিরকাল সজাগ লক্ষ্য রাখছেন তুষার সিংহ, তাঁর পান্না সবুজ কেশর ফুলিয়ে।’

‘পান্না সবুজ কেশর?’ আমার জিজ্ঞাসা ছিটকে এলো বিলান্ত প্রাণ থেকে।

মেজর ঘোষাল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘সিকিমীদের তাই বিশ্বাস। বোধ হয় সর্বোচ্চ চূড়ার এক পাশে তুষারের রঙ পান্না সবুজই দেখায়। সব সময় দেখায় বলে আমার মনে হয় না। শূর্যের আলোর নিশ্চয় তার রঙ বদলায়। কিন্তু সিকিমের মানুষের কাছে সেই তুষার সিংহের কেশরের রঙ পন্নার মত সবুজ। সেই হিসাবে বলতে পারেন সিকিম হলো তুষার সিংহের দেশ।’

আহু! তাই কি বলে জ্ঞানের রোশনাই। আমার জ্ঞানেতে রোশনাই লাগছে কী না জানি না। টান লাগছে আমার প্রাণ-ধনুকের ছিলায়। মন-ভীর ছুটে যেতে চায় সেই তুষার সিংহের পদতলে। আমি আমার বয়স ভুলে যাই। জিজ্ঞেস করি, ‘গেছেন নাকি কখনো?’

‘কোথায়?’ মেজর ঘোষাল অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, ‘সেই তুষার সিংহের কাছাকাছি?’

‘মাথা খারাপ নাকি আপনার মশাই?’ মেজর সাহেব অবাক হেসে বললেন, ‘প্রথমত ওখানে যাওয়াটাই তো একটা চ্যালেঞ্জ। তুষার সিংহের কাছে যাবো কী? শুনলেন না এন্ডানস্-কে নিয়েই কী ঝামেলা হয়ে গেছিলো। তারপরে তুষার সিংহের কামড় কি আমি সহ্য করতে পারবো নাকি? কেশর ফুলিয়ে এমন হিম দাঁতের কামড় বসাবে, তাতেই অক্স পেয়ে যাবো।’

এবার হেসে বেজে উঠলাম আমিই। আমার জ্ঞানেতে রোশনাইয়ের কী ছিри! নিজের মনের সাথে ভেবে বললাম, সেই দূরধিগম্য উচ্চতায় যেন ইচ্ছা করলেই ওঠা যায়। মেজর ঘোষাল আবার বললেন, ‘তারপরের বিপদ চুম্বি উপত্যকা। চীনাদের বন্দুকের একটি গুলি এসে বুকে বিধলেই হলো। ভাগনের নিখাসের আগুনের এক হালকাতেই জ্ঞান খতম।’

জ্ঞানেতে আমার কী রোশনাই। ইতিহাস রাজনীতি আর ভৌগোলিক

ভাবনা আসে। চুম্বি উপত্যকা! জায়গাটার নাম শোনা শোনা লাগছে। বললাম, ‘জায়গাটার নাম বোধ হয় খবরের কাগজে পড়েছি।’

‘পড়েছেন বৈকি।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘চুম্বি ছিল সিকিমের সীমান্ত। চীনারা ছিনিয়ে নিয়ে তা এখন তিব্বতের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য, চুম্বি কখনোই তিব্বতের অংশ ছিল না। আর চুম্বি উপত্যকার অধিবাসীরাও নিজেদের ইচ্ছায় কখনো তিব্বতের অংশ হতে চাননি।’

এই একটি ব্যাপার আমার মাথার দিকি। উহাতে আমি নাই, নাম যার রাজনীতি। যদিও জানি, আমার চাওয়া না-চাওয়াতে সে নেই। আমাকে চাইয়ে ছাড়ে আমার দৈনন্দিন জীবনে। আমি ছাড়লেও, সে আমাকে ছাড়বে না। রাজনীতিতে নীতি কথাটা আছে, সে নীতির অর্থ আমি বুঝি না। কী-ই বা কারকিত্ সেই নীতির। পরাক্রম বোধ হয় তার একটা নীতি। না হলে চুম্বি উপত্যকা কেন তিব্বতে চলে যায়? বললাম, ‘চুম্বি উপত্যকা কি দেখা যায়?’

‘সীমান্তে গেলেই দেখা যায়।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘তবে এতদূর থেকে, কিছুই বোঝা যায় না। দূরবীন চোখে লাগিয়ে আন্দাজ করা যায়। চীনা সশস্ত্র সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। শুনেছি উপত্যকাটি মনোরম। এক সময়ে সিকিমের সীমান্তের হেড কোয়ার্টার ছিল। কর্তাব্যক্তিরা গ্রীষ্মকালে সেখানে কিছুদিন কাটাতে যেতেন।

নেপাল দই মারে, এমনিতে কথাটার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। এরকম কথা শুনে, অর্থটা যেন কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু আমার চোখেই সামনে ভাসতে লাগলো পান্না সবুজ রঙের কেশর ফোলানো তুবার সিংহ, যে সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছে সিকিমের আত্মাকে। মেজর ঘোষাল আমার মন পাগল করলেন। আমার সেই চিরদিনের ঘর ছাড়ার মন। কবে একটু সেই তুবার সিংহের কাছে যেতে পারবো, কে জানে। পাবার আগেই আমার মন চলে যায় সেখানে। যায় অচেনা পথ খুঁজতে খুঁজতে।

সেভক সেতুর কাছে নেমে, ভিস্তার ঢল নেমে গিয়েছে বাদিকে। মুহূর্তেই তার বুকের পাটার সমুদ্রের বিস্তার। স্পষ্ট চোখে পড়ে, পূর্ব-দক্ষিণের সুদীর্ঘ ধাঁকে বিশাল বনভূমির ভাঙন। দূর থেকেও দেখা যায় বিশাল মহীকহের ককালরা পড়ে আছে।

মেজর ঘোবালের জীপের গতি বেড়েছে। সেতক করোনেশন সেতু, ভিক্টোর ওপর দিয়ে যানবাহন, মাহুব চলাচলের সুদৃঢ় পথ। আরো নেমে এসে সমতলে, রেল সেতু। মেজর ঘোবাল হমকা নিশ্বাস কেলে বললেন, ‘বাক, ক্রসিং লেভেল গেটটাও খোলা আছে। ভিক্টোর সেই কোলানো ব্রিজ, আর এই ক্রসিং লেভেল, প্রায়ই দাঁড় করিয়ে দেয় অবশ্য সেই সঙ্গে পাহাড়ী পথের গাড়ির কনভয়ও সময়ে সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে দেয়। আপনার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে?’ বলে তিনি নিজেই কবজির বড়ি দেখে বললেন, ‘বেলা আড়াইটা বাজে।’

তাও তো বটে। খিদেয় কথাটা এতক্ষণ মনে পড়েনি। কথাটা শোনা মাত্র মহাপ্রাণীটি যেন শরীরের ভিতর নড়েচড়ে উঠলেন। কিন্তু আমাকে ভদ্রতা করে কিছুই বলতে হলো না। মেজর সাহেব নিজেই বললেন, ‘তবে আর বেশি দেরি হবে না, এবার ঝড়ের বেগে পৌঁছুবো।’

ঝড়ের বেগেই চললেন। একবার মুখ ফিরিয়ে চোখের পলকে দেখে নিলেন ভগ্নীকে। মহাশয় সেই যে নয়ন মুদ্রায়ে, তারপরে আর চোখ খোলেননি। কেবল তাঁর অবস্থানের ভঙ্গি কিছু বদলিয়েছে। সেটা অনিবার্য। পাহাড়ের একটানা উৎরাইয়ে, অনেক দূরত্ব সর্পিলাত ছিল। অস্তিম বক্রতা থেকে, মেয়েদের মাথার চুলের কাঁটার মতো নানাবিধ বাক, বাকচোরা পথ। অতএব কুন্দনন্দিনী গাড়িয়ে গিয়েছেন আরো খানিকটা নিচে। তাঁর স্নিগ্ধ খোলা চরণযুগল এলিয়ে পড়ে আছে যন্ত্র দেওয়ালের গায়ে। ডান হাত আমার কোলের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ডাইনের নিচে। মাথা আমার বাম বক্ষে গ্রস্ত। তাঁর কেশরাশি পাহাড়ে যতো উড়েছে, এখন তার থেকে বেশি উড়ছে। আমার নিজের মুখ সামলানো দায়। আর অঙ্গ থেকে কেশ, সকল ফুলেল গন্ধ আমার ভ্রাণের ভিতর দিয়ে, ভ্রাণ নামক ইন্দ্রিয়টিকে অবশ করে রেখেছে।

‘এবার শুকে তুলে দেওয়া দরকার, আমাদের পৌঁছুতে আর দেরি নেই।’ মেজর ঘোবাল বললেন, এবং আর একবার ভগ্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে একটি দ্বিধা আর স্নেহ কি যুগপৎ ফুটলো। তিনি বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে, ডান হাত দিয়ে ভগ্নীর এলানো বাঁ হাত ধরে টেনে ডাকলেন, ‘মিষ্টি, এই মিষ্টি, উঠে পড়, শিলিগুড়ি এসে গেছে।’

কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন না। তাঁর কাঁধে একটা বাক লাগানো। মেজর ঘোবাল জোরে হাত টেনে, কুন্দনন্দিনীকে প্রায় সোজা করে দিলেন।

হৃদয় কি ঠা দিকে থাকে ? তাহলে এতক্ষণ আমার সেই অঙ্গটি অবশ হয়ে ছিল। হঠাৎ মুক্তি পেয়ে সাড় ফিরে এলো। কুন্দনন্দিনী মাথা নাড়িয়ে ঝাঁকালেন। ভুরু কঁচকে অর্ধ নেত্র তাকালেন। ধীরে ধীরে পূর্ণ নেত্রের উন্মীলন। আগে তবু কোকিলের চোখ বলেছিলাম ? এখন প্রকৃত রক্তচন্দ্র। সহসা তাকিয়ে থাকতে পারলেন না, আলোর ঝলক তাঁর দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিল। কিন্তু চোখ বুজেই সোজা হয়ে বসলেন, চরণ যুগল টেনে আনলেন। তারপরে আবার তাকালেন সামনের রাস্তার দিকে। তাঁর সত্ত্ব ঘুমভাঙা রক্তাভ চোখে যেন একটি অন্তরমনস্কতা। বোধ হয় গম্ভীরও হয়ে উঠছেন আস্তে আস্তে। রক্ত রহস্যের কোনো ঝলক নেই। এ মানুষ সেই মানুষটি আর নেই।

ঝড়ের গতিতে জীপ শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে প্রবেশ করলো। মেজর ঘোষাল কয়েকবারই ভয়ীর দিকে তাকালেন। কুন্দনন্দিনী ছ'পাশের কোনো দিকেই তাকালেন না। ডানদিকে নিচে চোখ নামিয়ে দেখলেন। তাঁর স্থলিত রেশমী আঁচল তুলে নিলেন আমার কোল থেকে। বুকের কাছে টেনে, আমার ফাঁকে গুঁজে দিলেন। ছ'হাতে, মুখের ছ'পাশ থেকে চুল টেনে টেনে সরিয়ে দিলেন পিছনে। তারপরে খুব সহজ ভাবে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'পেছন থেকে আমার ব্যাগটা একটু দেবেন ?'

একে বলে সাড়। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে ঝুঁকে পড়াটা এখন তাঁর নিজের কাছেই হয়তো অস্বস্তিকর ঠেকছে। তা ঠেকুক, কিন্তু সেই হাসি কোথায় ? রক্ত রহস্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে, আমিই যে আড়ষ্ট বোধ করছি। পিছন থেকে তাঁর ড্রাগনমুখো কারুকার্য করা ব্যাগটা তুলে দিলাম। তিনি ব্যাগের মুখ খুলে ভিতর থেকে বের করলেন বিরাট মাপের চোখের ঢাকনা। সানন্মাস যার নাম। চোখে পরার পর মনে হলো, মুখে মখোশ এঁটে নিলেন। রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে যদিও তাঁর চোখ দুটি আবছা দৃশ্যমান, চোখের রঙ বোঝবার কোন উপায় নেই। তারপরে বের করলেন, ছোট একটি রঙীন কার্ডে রবারের স্তোত্রের আটকানো ছোটতর শিশি। ক্ষুদ্রতম ছিপিটি খুলতেই, মহার্ঘ ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। রঙীন কার্ডের গায়ে বিদেশের এক শোখীন শহরের নাম লেখা। আতরের শিশির মতো দেখাচ্ছে। আঙুলে নিয়ে নিয়ে নিজের গলায় কানের পিঠে নানা স্থানে স্পর্শ করলেন। গম্ভটী দস্ত সাহেবের কালিম্পং-এর অস্থায়ী অফিস ঘর থেকেই পেয়েছি। এখন আমার পোশাকেও মাখানো।

কুন্দনন্দিনী শিশিটি ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে গিয়ে, আমার দিকে তাকালেন।

মুখোশ পরা চোখে ঈষৎ হাসি যেন শুকনো ফুলের মতো দেখালো। ময়না-
স্বর মোটা শোনালো। ‘একটু লাগাবেন নাকি? অবিশ্ত্রি আপনার নিষাসে
রাম-এর গন্ধ তেমন নেই নিশ্চয়।’

ফুলেল গন্ধের একটা প্রয়োজন কি সেই জন্ত? একটু ব্যস্তভাবেই বললাম,
‘না না, আমার দরকার হবে না।’

কুন্দনন্দিনী আর দ্বিতীয়বার অহরোধ করলেন না। শিশির কার্ড ব্যাগের
মধ্যে রেখে, মুখ বন্ধ করলেন। শহরের এক প্রান্তে, মহানন্দার সেতু পেরিয়ে,
নিম্নবিবলি ঢালুতে কতকগুলো বাড়ি। তারই একটি বাড়ির খোলা গেট দিয়ে
দুকে, পাথরের কুচি ছড়ানো উঠানে, জীপ দাঁড়ালো। বাড়ির সামনে ঢাকা
বারান্দায় ঝকঝকে কয়েকটা বেতের শোকা। সামনেই ঘরের কাঁচের দরজা
খোলা, কিন্তু মোটা পর্দা ঢাকা। বাড়িটা দোতলা। উঠানের এক পাশে, একটি
মোটরগাড়ি। মেজর ঘোষাল আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘নামা যাক।’
বলে তিনিই আগে নামলেন।

আমি না নামলে কুন্দনন্দিনী নামতে পারবেন না। নেমেই দেখলাম, ঘরের
পর্দা সরিয়ে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। প্রথম দর্শনে মনে হলো, তিনি এক-
জন টেনিস খেলোয়াড় হবেন বা। যেন খেলা ছেড়ে এলেন। অন্তত পোশাক
দেখে তাই মনে হচ্ছে। সাদা শর্ট আর সাদা তোয়ালের মতো মোটা কলার
তোলা গোল্ডি তাঁর অঙ্গে। পায়ে রবারের স্নাওল। অনতিদীর্ঘ শক্ত পেন্সি-
শরীর। মাথার চুল ছোট, স্বল্পও বটে, সামনের দিকে টেনে দেওয়া। তথাপি
কপালের সামনে অনেকটাই চওড়া। ডান হাতের মোটা কব্জিতে ষড়ি।
মুখটি হাড়পুষ্ট চওড়া, খাঁজ ভাঁজ বেশ আছে। গৌফ-দাড়ি নেই। ছোট
চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মোটা ভুরু। মুখে কিঞ্চিৎ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন। তার
মধ্যেই একবার আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখে নিলেন। মেজর ঘোষালের
দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনাদের ঘেরি হচ্ছিল দেখে, এইমাত্র ভাবছিলাম
কালিম্পাং-এ একটা ট্রাংককল করবো কী না।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘খুব ঘেরি হয়নি তো? তুমি খেয়ে নিয়েছ?’

মহাশয় বললেন, ‘না না, খেয়ে নেবো কী, আমি আপনাদের জন্তই অপেক্ষা
করছিলাম, আহ্নন। এসো।’ বলে তিনি কুন্দনন্দিনীর দিকে তাকালেন।

মেজর ঘোষাল আমাকে দেখিয়ে বললেন, ‘তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে
দিই।’ বলে তিনি আমার নাম পরিচয় দিলেন, এবং মহাশয়ের পরিচয় করিয়ে
দিলেন, ‘এ হচ্ছে আমার ভগ্নিপতি—মানে, মিষ্টির বর বয়েন মুখার্জি, গ্রেট

জেনারেল ম্যানেজার অব এ গ্রেট ইণ্ডো-করেন কোম্পানি।’ এবং নিজে বোধ হয় গ্রেট করেই হাসলেন।

বরেন মুখার্জি—অর্থাৎ মিঃ মুখার্জি হাসলেন। আমার নমস্কারের জবাবে তিনি পুরোপুরি বিলিতি কেতায় ‘হ্যালো’ করলেন। হাইফাই গোছের হাউডুয়োডু, এবং ‘প্রিজ কাম্ ইন্।’ বলে বারান্দায় উঠতে উঠতে কুন্দনন্দিনীর কোমরে হাত স্পর্শ করলেন।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘শোনো বরেন, এক মুহূর্ত বসতে পারবো না, পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। তার ওপরে লেখককে ধরে এনেছি। গুঁরও একই অবস্থা।’

কুন্দনন্দিনী পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মিঃ মুখার্জি হেসে বললেন, ‘খাবার রেডি, আপনাতা বসলেই হয়। তার আগে এক আখ বোতল ঠাণ্ডা বীয়র ?’

‘রক্ষা করো বাবা, ও সব আর নেই।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘আমাকে আবার লেখককে নিয়ে এখুনি পাহাড়ে উঠতে হবে।’

মিঃ মুখার্জি পর্দা তুলে ধরলেন। আমি মেজর ঘোষালের পিছনে পিছনে চুকলাম। রীতিমতো হোটেলের বৃহৎ লাউঞ্জের মতো সাজানো ঘর। রিসেপশন কাউন্টার অবিশিষ্ট নেই। মুখার্জি বললেন, ‘একেরারে ওপরে চলুন।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘মিষ্টির স্ম্যটকেশ-টুটকেশ সব জীপে রয়েছে।’

‘সব তুলে আনা হবে। ভাববেন না।’ মুখার্জি বললেন।

কুন্দনন্দিনীকে দেখতে পেলাম না। ওপরে এসেও না। বরের ঘরে এসেই বউটি ডুব দিয়েছেন। এই না হলে আর বর বউ! দোতলার মস্ত ড্রয়িংরুম, পাশেই বিরাট ডাইনিং রুম। একে খাবার ঘর বললে, ঘরের অমর্যাদা করা হয়। সামনেই দোতলার ব্যালকনি। ড্রয়িংরুমের গায়েই, দুটি দরজা দেখে বোকা যাচ্ছে, ভেতরে শোবার বা থাকবার ঘর রয়েছে। মেজর ঘোষাল বললেন, ‘এ বাড়িটা হচ্ছে বরেনদের কোম্পানির গেস্ট হাউস। সব রাজকীয় ব্যাপার। শোবার ঘর দুটোই এয়ার কন্ডিশন। অবিশিষ্ট এই নভেম্বরে আরামটা ভোগ করা যাবে না। আমাদের সময়ও নেই শুয়ে বিশ্রাম করবার।’

‘একটু বিশ্রাম করে যেতে দোষ কী?’ মুখার্জি বললেন।

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘অসম্ভব। পাহাড়ের পথে আমি বেশি রাত করতে চাই না। এ ভদ্রলোককে পৌঁছাতে হবে গুঁর হোস্টের কাছে। তোমাদের কলকাতায় কেয়া কবে? টিকেট বুক করা হয়েছে?’

মুখার্জি বললেন, ‘নিশ্চয়ই। আজকের দাঞ্জিলিং মেলেই আমরা যাবো।’

গতকালই যেতে পারতাম, আপনার বোনের জন্ত একদিন থাকতে হলো। আমার নর্থ-বেঙ্গলের কাজ গত পরন্তই শেষ হয়েছে। আপনারা বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি বেয়ারাকে খাবার দিতে বলছি।’

মুখার্জি তাইনিংক্রমের শেষ দরজার অদৃষ্ট হলেন। মেজর ঘোষাল আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘একটু বসে তারপরে বাথরুমে যাবেন নাকি?’

বললাম, ‘বসে তো ছিলাম এতক্ষণ। আপনার পরিশ্রম হয়েছে, একটু বিশ্রাম দরকার।’

‘আমরা মশায় ফৌজী মাহুয, এত সহজে কাবু হই না।’ মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘তাহলে হাত মুখ ধুয়ে আগে ডান হাতের কাজটা সেরে নেওয়া যাক। আপনি আগে বাথরুম ঘুরে আসুন।’

আমি এক পায়ে খাড়া। মেজর ঘোষাল আমাকে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। নিঃসন্দেহে রাজকীয় ব্যবস্থা। আয়নার নিম্নে দর্শন করে বুঝতে পারলাম, অগোছালো উলকোখুসকো হয়েছি। ষতোটা সম্ভব গোছালো হয়ে নিলাম। নতুন মোড়কে মোড়া সাবান, পাট ভাঙা তোয়ালে রয়েছে। সময় থাকলে এমন গোসলখানায় গোসলটাও করে নেওয়া যেতো। সে সময় নেই। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে কারোকেই দেখতে পেলাম না। দুজন ভৃত্যশ্রেণীর লোককে দেখলাম, খানাবরের টেবিলে খানা সাজাচ্ছে। রান্নার গন্ধটা মহাপ্রাণীকে ব্যাকুল করে তুললো। আয়োজনটা রাজকীয় বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। মেজর ঘোষাল সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখেই বোকা যাচ্ছে, তিনি বাথরুমের কাজ সেরে এসেছেন। মুখার্জিও বেরিয়ে এলেন। কিন্তু কারোর মুখেই হাসিখুশির ভাব নেই। একজন চিন্তিত, আর একজন গম্ভীর। চিন্তিত মেজর ঘোষাল আমাকে ডেকে বললেন, ‘আসুন, বসে পড়া যাক। মিষ্টি, আয় একসঙ্গে খেয়ে নিই।’

তার গলা চড়িয়ে ডাক শেষ হবার আগেই, কুন্দনন্দিনী ভিতর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পোশাক বদলাননি, কিন্তু মুখের প্রসাধন ধোয়া মোছা। রেশমী কোমল কেশ, গুছিয়ে আঁচড়ানো। চেহারাটা যেন কেমন বদলিয়ে গিয়েছে। আবার সেই একই কথা, এ মাহুযে সেই মাহুযটি ঠিক ঠিক নেই। তিনি বেরিয়ে আমার দিকে ফিরে, ঈর্ষ্য হেসে বললেন, ‘আসুন।’

মেজর ঘোষাল খাবার টেবিলে বসতে বসতে বললেন, ‘লেখক এখন তোর অতিথি, ভালো করে খাওয়া।’

কুন্দনন্দিনী ছাড়া আমরা সবাই বসলাম। আমিই তাঁকে বললাম, ‘বসুন।’
কুন্দনন্দিনীর সেই ময়না স্বর নেই, বললেন, ‘হ্যাঁ বসছি। আপনাদের
একটু দ্বিগ্নে নিই।’

মুখার্জি বললেন, ‘তুমি বসো না, ওরাই দেবে। তুমি বলে দাও।’

কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব দিলেন না। পরিবেশন শুরু করলেন, আমাকে
প্রথম দিয়ে। ভাত, ডাল, ভাজা, মাছ এবং মাংস দুই-ই বর্তমান। রান্নাও
উপাদেয়। আয়োজনও কম না। আমাদের অর্ধেক খাবার পথে কুন্দনন্দিনী
বসলেন। কিন্তু কোথায় যেন ঠেক লাগছে। একটা ধর্মের মতো। সেই হাসি
পরিহাস নেই। সকলেই অতি স্বল্পবাক হয়ে গিয়েছেন। তালটা কাটলো
কোথায়? নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে। কুন্দনন্দিনীর আহ্বারে তেমন গা নেই
যেন। অল্প খাওয়া নিয়ে নাড়াচড়া করছেন মাত্র।

এ অবস্থাতেই খাওয়ার পর্ব শেষ হলো। মেজর ঘোষাল ঘোষণা করলেন,
‘আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। শোকাতেই একটু গাড়িয়ে
নেওয়া যাক।’

মিঃ মুখার্জি এবং কুন্দনন্দিনী—অর্থাৎ বর বধু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ
করলেন। আমরা ধূমপান করলাম। মেজর ঘোষাল সিগারেট ধরিয়ে বললেন,
‘সিকিমে কবে আসছেন বলুন। আমি থাকতে থাকতেই আসুন। আপনাকে
ঘুরিয়ে দেখাবো।’

তৎক্ষণাৎ আমার ডানায় কাঁপন জাগলো। লোভীর মতো তাঁর দিকে
তাকলাম। পরমুহুর্তেই হতাশ হয়ে বললাম, ‘যতো নীলগিরি পারি। তুষার
সিংহের দেশের কথা বলে আপনি আমাকে পাগল করেছেন।’

‘সত্যি?’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘এটা একটা কম ক্ষমতা নয়, একজন
লেখক লোককে পাগল করতে পারা।’

কেমন করে বলি, পাগল আমি হয়েই আছি। সেই পাগলকে তিনি সাঁকো
নাড়া দিতে বলেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, এই তিন্তা নদী কোথা থেকে আসছে?’

‘উত্তর সিকিম থেকে।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘বলতে গেলে তুষার
সিংহের পায়ের নিচে থেকেই। আপনি যদি কখনো আসেন, আমি চেষ্টা
করবো আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে।’

আমি প্রায় ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেমন করে যাবো?’

মেজর ঘোষাল হেসে উঠে বললেন, ‘গাড়িতেই যাবেন। অবিশ্টি এটা ঠিক,

যে কোনো গাড়ি সে পথে উঠতে পারবে না। জোংগা গাড়িতেই যেতে হবে, আর সেটা আর্মির হাতেই আছে। তা ছাড়া আরো কিছু ঝামেলা আছে। উত্তর সিকিমে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীদেরও। গ্যাংটকের অধিবাসীদের উত্তর সিকিমে যেতে হলে বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। অনুমতি দেওয়াই হয় না প্রায়।’

আমি হতাশ বিন্ময়ে বললাম, ‘নিজ ভূমে পরবাসী? সেই নিষিদ্ধ দেশে তাহলে আমি যাবো কেমন করে?’

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘গ্যাংটকে ভারতীয় পলিটিকাল অফিসারের একটি ছাড়পত্র পেতে হবে আপনাকে। সেটা ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি তো আর রাজনীতি করতে যাচ্ছেন না, বেড়াতে যাবেন। আর নর্থ সিকিমে সাধারণের যাওয়া নিষেধ, তার কারণটা সামরিক। যেমন সিকিমের নাথুলা পাস। সিকিমের পূর্ব সীমান্ত। উত্তর সিকিমে যতোই যাবেন, ততোই আপনি আর এক সীমান্তের কাছাকাছি। সীমান্ত রক্ষার সিকিউরিটির জঙ্কই সাধারণের যাতায়াত নিষেধ। তা বলে মনে করবেন না, উত্তর সিকিমে লোকজন নেই।’ বলে তিনি হেসে উঠলেন, ‘সেখানকার অধিবাসীরা সেখানেই থাকে। পঞ্চাট অবিশ্রি খুবই দুর্গম। মনে হবে তুষার ঢাকা পাহাড়ের বেড়াঙ্কালের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।’

‘আমি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আর ভিস্তাও সেখানে আছে?’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘নিশ্চয়ই। একটি স্ত্রীতোর মতো ধারা অনেক নিচে দেখতে পাবেন।’

আহু, আমার মন পাগল হইল রে! তুষার সিংহের পায়ের তলান্ন, স্ত্রীতোর মতো ভিস্তা। সমতলে যে এলোেকশী রণরঙ্গিনী। বন জনপদ ডুবানি ভাসানি। শুনেছি, হস্তীযুধকে আছড়ে তলিয়ে নিয়ে যায়। কোন্‌খানে সে আপন ঘরে শান্ত থাকে? তুষার সিংহের পায়ের নিচে?

কুন্দনন্দিনী বেরিয়ে এলেন ঘরের দরজা খুলে। হাতে তাঁর ড্রাগনমুখো ব্যাগ। মুখে এখন আবার রক্তের ছটা কেন? মেজর ঘোষাল ঘড়ি দেখে বললেন, ‘মিষ্টি, এবার আমরা যাবো।’

‘আমিও তোমার সঙ্গে কিরে যাবো।’ কুন্দনন্দিনী বললেন শান্ত গভীর স্বরে।

মেজর ঘোষাল জুতুটি অবাক চোখে ভগ্নীর মুখের নিকে তাকালেন। মুখাঙ্গি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন,

‘আপনার বোন, আপনার সঙ্গেই ব্যাক করছে। ট্রেনের টিকেট ছিঁড়ে বাথ-রুমের কমোডের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।’

মেজর ঘোষাল তীব্র অস্বস্তিতে বলে উঠলেন, ‘আহু মিষ্টি কী ছেলে-মাসুখি যে তোরা করিস্।’

কুন্দনন্দিনীর মুখের রক্তের ছটা চড়া হলো। বললেন, ‘একে যে ছেলে-মাসুখি বলে, তা আমি জানি না। তাহলে অনেক কথা বলতে হয়, যা আমি এখন বলতে চাই না। ও যদি তোমাকে কিছু বলতে চায় বলুক।’ বলেই তিনি সিঁড়ির দিকে হেঁটেই চলে গেলেন।

তিস্তা ছোটো নাকি বেগে? কেঁপে যাই যে! মেজর ঘোষাল বিভ্রান্ত বিশ্বাসে মুখার্জির মুখের দিকে তাকালেন। মুখার্জি বললেন, ‘আমার কিছু বলবার নেই। ও না যেতে চাইলে, ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি না, আপনি তা ভালোই জানেন। ওর যখন ইচ্ছা হবে, তখন কলকাতায় ফিরবে। অবিশ্তি আপনার অস্ববিধে হবে।’

‘সেটা কোনো কথাই না।’ মেজর ঘোষাল রীতিমত উন্মার স্বরে বললেন, ‘আমার অস্ববিধের কথা না ভেবে, নিজেদের ভবিষ্যতের কথাটা ভাবো। ভুলে যেও না, তোমাদের একটি সম্ভান আছে, তারো ভবিষ্যৎ আছে।’

মুখার্জি যেন একটু বিব্রত হলেন। আমার দিকে একবার দেখে বললেন, ‘আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো।’

মেজর ঘোষালও একবার আমাকে চকিতে দেখে নিয়ে বললেন, ‘জানি না, কী আর তোমাদের বলার আছে। আমাকে বলবার কিছুই নেই, যা বলাবলি, তা তোমাদেরই করতে হবে। আহুন।’ বলে আমাকে ডেকে তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

আমার নিজেকে বিভ্রান্ত বললেও ঠিক বলা হয় না। এমন কি অবাক অপ্রস্তুতও না। অতিক্রম্য একটি প্রাণীর মতো নিজেকে মনে হচ্ছে, যাকে বোধ হয় উল্লুক বলে। কী দুর্বিপাক! এ সব ঘটনার মধ্যে নিজের এই উপস্থিতিকে নিজেরই দিকার দিতে ইচ্ছা করছে। কোনো কথা না বলে, মেজর ঘোষালকে অতুসরণ করলাম। উপায়হীন, আমাকে তো কালিম্পং ফিরে যেতেই হবে।

নিচে এসে দেখলাম, কুন্দনন্দিনী জীপের মধ্যে তাঁর আসনে বসে আছেন। চোখে ইতিমধ্যে পরে নিয়েছেন সেই মুখোশের মতো মস্ত হুঁলি। মুখার্জিও আমাদের সঙ্গে নিচে এলেন। আমি তাঁর দিকে ফিরে কোনো রকমে কপালে

হাত ঠেকালার। তিনি ঈষৎ মাথা বাঁকালেন। মেজর ঘোবাল কোনো কথা না বলেই চালকের আসনে বসে আমাদের ডেকে বললেন, ‘আসুন, উঠে পড়ুন।’

তা ছাড়া উপায় বা কী? উঠে বসলাম। মেজর ঘোবাল গাড়ির এঞ্জিন চালু করে, হাত তুলে মুখাঙ্গুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘চলি।’ বলেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বীতিমত বেগেই গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। গাড়ি উচু রাস্তায় উঠে, মহানন্দা সেতু পার হয়ে শহরে ঢুকলো। তারপরে ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটলো। আমার অস্বস্তি ক্রমাগত বাড়ছে। এসেছিলাম এক বকম ভাবে, যেন ভিস্তার চলার কলকলানিতে। অনেক হাসি ঠাট্টার মধ্যে হয়তো কোনো একটু অস্ত্র সুর বেজে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সময় গিয়েছে। সে সুরকে এখন আর বেহুঁর মনে হচ্ছে না। সুরেরই এক অস্ত্র। বরং নিচে নেমে, কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কারণে মনে যে কিঞ্চিৎ ছায়া ঘনায়নি, এমন মিথ্যা বলবো না। মাহুঁষ তো। ওইখানে নিজেকে কদাপি অতিক্রম করতে পারিনি। সাময়িক হলেও, অনায়াস মেলামেশায় একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিচ্ছেদে মনে ছায়া ঘনাবে, সেটা বাস্তব। সেই বিচ্ছেদের মধ্যেই ছিল একটি আনন্দ, যা অস্ত্রের স্মৃতি হয়ে থাকবার কথা। এ বিপরীত ঘটনায়, প্রাণের ঘরে হাওয়া বন্ধ। গুমোটে গুমুসে মরি। অস্বস্তিতে মন ভরে উঠছে। এঁদের সঙ্গে নিজের উপস্থিতিটা বায়ে বায়ে কাঁটার মতো বিঁধছে।

স্বাভাবিক। স্বামী-স্ত্রী এবং অগ্রজ, ঘটনা তাঁদের মধ্যে। ঘরোয়া ব্যাপার। আমি তার মাঝখানে বাইরের মাহুঁষ, মূর্তিমান আপদ। একটি অচলায়তন বাধা। অগ্রজ আর ভগ্নীর মধ্যে কোনো লেনা দেনা নেই। বাইরের লোকের সামনে ঘরের কথা কে বা মুখ ফুটে বলতে যায়? একটু আধটু যা হয়ে গিয়েছে, যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, অমন হয়েই থাকে। পথ চলতে অনেক অচেনা দম্পতীকেই কিছু কিঞ্চিৎ বিবাদ খুনসুটি করতে দেখা যায়। তার চেহারা আলাদা। এখানে একজন সামনে তাকিয়ে, গভীর মুখে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন। আর একজন মুখোশ পরা মুখ নিয়ে, কাঁঠ পুতলিকার মতো বলে আছেন। ভাবাই যায় না। তাঁর শাড়ি ওড়ে, চুল ওড়ে, কিন্তু কী লাভান্ত! পুরনো ছবিটাকে অবিখ্যাস্ত মনে হয়। ইচ্ছা করে, গাড়ি থেকে কাঁপিয়ে নানি।

‘আমি বোধ হয় তিতুর কাছে দাঙ্গলিং-এ চলে গেলেই পারতাম।’
কুন্দনন্দিনী এতক্ষণে একটি কথা বললেন।

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘খাখুঁ মিষ্টি, বিরক্ত করিস্ না, কেন মিছিমিছি একজন লেখকের সামনে বকুনি খেয়ে মরবি? তিতুর কাছে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, না?’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘সমাধানের কথা বলছি না।’

‘জানি, আমার খারাপ লাগার জন্তু বলছিস।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘কিন্তু তিতুর কাছে গেলে, আরো খারাপ হবে। ছেলেমানুষ বেচারি, তোকে হঠাৎ ওর কাছে গিয়ে উঠতে দেখলে, মনে মনে ভয় পাবে। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে, অগ্নি জায়গা থেকে চারদিকে ট্রাংকল করতে আরম্ভ করবে। কেন বাজে কথা বলছিস?’

কুন্দনন্দিনী ঝাঁকিয়ে ফিরে বললো, ‘কিন্তু তুমি মুখটা ওরকম করে থাকলে আমার খারাপ লাগে না?’

‘না, তোরা যা খুশি তাই করবি, আর তাই দেখে আমাকে দাঁত বের করে হাসতে হবে।’ যাকে বলে খেকিয়ে ওঠার স্বরে কথাটি বলেই, মেজর ঘোষাল আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলেন।

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘মেজরা, তুমি তো সেই লেখকের সামনেই আমাকে দাঁত খিচিয়ে বকুনি দিচ্ছ!’

‘বেশ করছি, দিচ্ছি।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘এর পরে আরো কিছু করতে পারি। ভুলে যাসনে, তুই আমার থেকে আট বছরের ছোট।’

‘মারবে?’ কুন্দনন্দিনী তাঁর চোখ থেকে মুখোশের মতো ঠুলিটা খুলে ফেললেন।

মেজর ঘোষাল শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, ‘হ্যাঁ মারবো।’ বলে বাঁ দিকের বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বাঁ হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘লেখককে একটা সিগারেট দে, আমাকে একটা ধরিয়ে দে। মাঝখান থেকে এ ভদ্রলোকের কী অবস্থা বল দেখি? এ ভাবে কেউ নতুন চেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে পারে?’

প্রাণের কথা বললেন। তবে যে মনে করতাম, কোঁকী মানুষরা মনের ধার ধারে না? তারা বোঝে শুধু মুকুবিগ্রহ, পান থেকে চূণ খসার ঝুটি পর্বত মানতে চায় না। সব কিছুর ওপরে নিয়ম নিগড় শৃঙ্খলা। আমি বিভ্রত হলে বললাম, ‘ঠিক তা না, তবে আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাদের অস্থবিধা ঘটচ্ছি।’

‘কী রকম ?’ কুন্দনন্দিনী ঘাড়ের ঝটকা দিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন, ‘আপনি আবার কী অসুবিধা ঘটাবেন ? আমাদের যা ঘটবার, তা তো ঘটলোই।’

আমি ইতস্তত করে বললাম, ‘তা ঘটলো, তারপরও তো কিছু থেকে যায়। আমি না থাকলে, আপনারা হয় তো একটু সহজ হতে পারতেন।’

‘আপনার কি মনে হচ্ছে, আমরা অসহজ হয়ে রয়েছি ?’ কুন্দনন্দিনী চোখের কোণে তাকিয়ে বললেন।

এমনি করে বললে, জবাব দেওয়া কঠিন। ঠিক এ মুহূর্তে তাঁদের আর অসহজ বলতে পারবো না। অগ্রজ নিজেই ভগ্নীকে আবার সিগারেট ধরিয়ে দিতে বলছেন। ধমক বকুনিও দিচ্ছেন, এবং হাসছেন। আমি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললাম, ‘আমার অবস্থাটা একটু ইয়ে—মানে—।’

‘বুঝেছি মশায়, বুঝেছি।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আপনার সামনে যা ঘটে গেছে, সেজ্ঞা মাফ চাইছি, হলো তো ?’

একেই বলে গানের উত্তোর চাপান, চিতেন দান। উল্টি গঙ্গা বহে ! তাড়াতাড়ি বললাম, ‘না না, মাফ চাইবেন কেন ? সেটা আরও অসুবিধাজনক।’

কুন্দনন্দিনী মুহূর্তে ঝংকারে ঈষৎ হেসে বললেন, ‘তবে নিন, এখন একটা সিগারেট ধরান।’

আমি তাঁর হাতের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিলাম। তিনি আমার হাতে লাইটারটা ধরিয়ে দিয়ে, নিজেও একটা সিগারেট, রঙহীন ঠোঁটে চেপে ধরলেন। অতএব লাইটার জ্বালিয়ে আগুন দেবার কাজটা আমাকেই করতে হলো। কুন্দনন্দিনী সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘আপনার সামনে যদি সহজ না থাকতাম, তাহলে আপনাকে কিছু বুঝতেই দিতাম না, যা ঘটবার তা ঘটে যেতো আড়ালেই। বুঝতে পারছেন, আমি কলকাতায় ফিরবো বলেই নেমে এসেছিলাম, তা না হলে মেজদাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতাম না।’

‘দয়া করে আমার কষ্টের কথা পরে ভাবিস।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘কিন্তু সিগারেটটা তোর না, আমার জন্তু ধরাতে বলেছি।’

কুন্দনন্দিনী চমকে ফিরলেন অগ্রজের দিকে, বললেন, ‘ও মা, সত্যিই তো! আমি দিব্যি টেনে যাচ্ছি।’ জলন্ত সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন।

মেজর ঘোষাল সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপেই বললেন, ‘তা তো যাবিই। যতো রাজ্যের বাজে কাজগুলো সব রপ্ত করেছিস।’

কুন্দনন্দিনী ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তা অবিশ্টি ঠিক। মেজদা, কাজের কাজ তো আমার দ্বারা কিছুই হলো না।’

মেজর ঘোষাল জুঁকুটি চোখে ভয়ী প্রীতি একবার দৃষ্টিপাত করলেন। বলে উঠলেন, ‘মিষ্টি, ও রকম করে কথা বলিস না। তাহলে আমি গাড়ি-ফাড়ি চালাতে পারবো না।’

যদি ঠিক দেখে থাকি, তবে কাজলবিহীন চোখ দুটি যেন ছলছলানো। কুন্দনন্দিনী অগ্রজের হাঁটুর কাছে হাত রাখলেন। মেজর ঘোষাল স্টিয়ারিং থেকে ডান হাত নামিয়ে ভয়ী হাতের ওপর মুহূ চাপ দিলেন। বললেন, ‘সবই বুঝি মিষ্টি। কিন্তু কষ্ট তো হয়। কষ্ট হয় বলেই বলি।’

‘জানি মেজদা।’ কুন্দনন্দিনী বললেন।

মেজর ঘোষাল হুঁহাতে স্টিয়ারিং ধরে বললেন, ‘তোকে আমি দোষ দিই না। বয়েনের দায়িত্ব কী, তা আমি বুঝি। ওকে তা পালন করতেই হবে। জেদাজেদি করলে চলবে না। তা না হলে, একটা কোনো কাইনাল ভিসিশানে আসতেই হবে। মিনির কথা ভুলে তো চলবে না।’

কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব দিলেন না, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আবার আমার প্রাণের হাওয়ায় ঠেক। আমি এখন না নিজের ঘরেতে। না থাকতে চাই পরের ঘরে। আমি এখন পথের। কিন্তু থাকতে পারছি না যে। এখন আমি অন্ধ আকাশ তলে। তার বোদের কিরণ, মেঘের ছায়া, বর্ষার জলকে আমি এড়াবো কেমন করে? অতএব আমিও সামনের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করি।

মেজর ঘোষালের গাড়ির গতি বেশ কম না। প্রায় দেখতে দেখতেই চলে এলাম তিস্তার কাছে। কুলনাশিনী এখন আমার ডাইনে। বেলা এখন ঢলের দিকে। হেমন্তে জলোচ্ছ্বাস না থাকলেও, বালুচরের বিস্তার দেখে প্রাবন অনুমান করা যায়। বালুচরের দিগন্ত বিস্তৃত শাদার মাঝে, দুই তিন নীল স্রোতধারা! রৌদ্রকিরণে সব চিক চিক করছে। তিস্তার দেখা পেলেই, পাহাড়ের দেখা। সামনেই অরণ্য ঘন নীল পাহাড়। দূরন্ত বেগে গাড়ি পাহাড়ের চড়াই ধরলো। তিস্তা আমার ডাইনে। যতোকণ দিনের আলো থাকবে, ততোকণই সে আমার সঙ্গে সঙ্গে। সেই বুলন্ত সেতু পার না হওয়া পর্যন্ত। কোথা থেকে আসছো তুমি? কোথায় তোমার জন্মভূমি? তুমি সিংহের পায়ের তলায়। কবে তোমার সেই আতুড় ঘরখানি দেখতে পাবো? পাবো কি কখনো?

‘মনে হচ্ছে, মনটাকে আর ফেরাতে পারছেন না।’ কুন্দনন্দিনী বললেন। তাঁর ময়নাখরে শীত ঋতুর গ্লানতা।

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকেই।

এটা আবার উল্টো গাওনা। তাঁদের ভ্রাতা ভগ্নীর মাঝখানে মন কেরাই কেমন করে? তার চেয়ে এই তো আমার ভালো। ভিস্তার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে বাই। জলের ধারায় তাকিয়ে মনে হয়, কী গভীর রহস্য তার শ্রোতে। কতো কী কথা যেন বলে চলেছে। যার বচন বৈয়াকরণ কিছুই জানা নেই। বিব্রত হেসে বললাম, ‘আপনার কথাই শুনছিলাম।’

‘আর সেই কথা থেকেই বারে বারে সরে যেতে চাইছেন।’ কুন্দনন্দিনী বললেন।

সেটাই কি স্বাভাবিক না? অধিকারের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, অস্বস্তি তো যাবার না। পরের কথায় কেন বা কান দেবো? সে কথা বলা যায় না।

কুন্দনন্দিনী আবার বললেন, ‘কিন্তু আপনি তো মশাই আস্তাকুড় ঘাঁটা মাছুষ। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনার কী যায় আসে?’

কিছুই না। যেখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই, করার নেই কিছু, সে ক্ষেত্রে আমার যায় আসে না কিছুই। কিন্তু চিরদিনই চেয়েছি, আমার চলার পথ যেন পা টেনে না ধরে। মনকে না করে পিছনমুখী। কোনো দ্বায়ে না বদ্ধ করে। আমি পেরিয়ে এসেছি অনেক আস্তাকুড়? তাতেই বা কী? এক্ষেত্রে সে কথাই বা কেন? বললাম, ‘আস্তাকুড়ের কথা কেন বলছেন?’

‘কারণ, আস্তাকুড়ের ঘটনা বলে।’ কুন্দনন্দিনী বললেন।

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘মিষ্টি, কেন ভদ্রলোকের মন খারাপ করছি? অন্য কথা বল।’

‘বলবো তো।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘উনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে বলি কেমন করে?’

দূরে কোথায়? তিনি তো বসে আছেন, প্রায় আমার গা ছুঁয়েই। হেসে বললাম, ‘দূরে নেই, কাছেই আছি।’

‘সত্যি?’ কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে, আমার দিকে তাকালেন এবং অর্পাণ্ডে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বললেন, ‘কেমন করে বুঝি বলুন তো? আপনার যে-কটা লেখা পড়েছি, সেখানে যেমন আপনাকে বোঝা যায়, সেই রকম বুঝবো।’ তাঁর কাজলবিহীন চোখে এবার ঝিলিক হানলো। রঙহীন ঠোটে হাসি।

সে আবার কেমন বোঝা তা তো জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘সেটা কেমন বলুন তো?’

কুন্দনন্দিনীর চোখের পাতা নির্বিড় হলো, কালো ভারায় ছটা। বললেন,

‘মেয়েরা ছলনা করলে, তাদের একটা ইতর বিশেষণ দেওয়া হয়, অবিভি
খুবই গ্রাম্য। আপনাকে তো আমি তা বলতে পারবো না।’

কী সেই ইতর গ্রাম্য বিশেষণ? বাঙালী পুরুষকে এত ভাবতে হয় না।
বিশেষণটা নিরুচ্চারিত থেকেই আমার কান ঝাঁজিয়ে দিল। আমি কিছু না
বলে মুখ টিপে হাসলাম।

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘ভয় নেই, বলবো না। তবে আপনার ছলনার অস্ত নেই।
রাগের মুখে দ্বিবি হাসতে পারেন। মধ্য কথা বলতে পারেন অনায়াসে।’

হায় কালকূট কী তোমার চরিত্রের ব্যাখ্যা! আমি ছলনাকারী, আমি
মিথ্যুক। তবু তো সেই গ্রাম্য বিশেষণটি উচ্চারণ করেননি। তাহলে একে-
বারে বোলকলায় পূর্ণ হয়ে যেতো। কুন্দনন্দিনী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে
উঠলেন। তাঁর শরীর এলিয়ে হেলে পড়লো আসনের পিছনে। বললেন, ‘এখন
যদি নিজের মুখটা একেবারে দেখতেন কালকূট মশাই, নিজেই অবাক হতেন।’

‘বলিস তো রিয়ার ভিউ ফাইণ্ডারটা ঠর দিকে ঘুরিয়ে দিই।’ মেজর
ঘোবাল হেসে বলে উঠলেন।

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘তা দিতে হবে না, উনি নিজেই ভালো জানেন,
সত্যি কথাগুলো শুনে, তাঁর মুখের চেহারা কী দাঁড়িয়েছে।’

আমি বিব্রত ভাবে বললাম, ‘হ্যাঁ, নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছে।’

‘মাই গড!’ কুন্দনন্দিনী যেন প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠেই, আরো জোরে
খিলখিলিয়ে উঠলেন। হাসিটি এখন ঋতুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, যথার্থ ময়না-
স্বরে। অনায়াসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ‘সেটাও জানেন, আপনাকে
বোকা বোকা লাগছে। গুরু, পায়ের ধুলো দিন, এমন চতুরালি কমই দেখেছি।’

এবার গোনো বচন কাহারে কর। ‘সখী ভাবনা কাহারে বলে, যাতনা
কাহারে বলে।’ কিন্তু কুন্দনন্দিনী কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে যে ভাবে নিচের
দিকে ঝুঁকলেন, আঁতকে উঠলাম। প্রায় তাঁর হাত ধরতে উদ্ভত হয়ে বললাম,
‘দোহাই, এমন কাজটি করবেন না।’

এবার ভ্রাতা ভগ্নী রীতিমত স্রব বেঁধে সমবেত হেসে উঠলেন। ভিস্তার
খলখল হাসিও তাতে ডুবে গেল। হাসি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, কুন্দনন্দিনী
বললেন, ‘তাহলে আর কখনো ও রকম কথা বলবেন না, দূরে নেই, কাছেই
আছি। আপনি আরো কারোর কাছেই নেই, সেটা ঘরেই বলুন, আর বাইরেই
বলুন। লিখি না বলে, আমরা কি কিছুই বুঝি না?’

বললাম, ‘তা না হলে আর লেখা কেন?’

‘জানি জানি, আপনি খুব মন যুগিয়ে কথা বলতে পারেন।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আসলে সব বুটা।’ বলে আমার মুখের কাছে হাত ভুলে আঙুল নাড়িয়ে দিলেন, বললেন, ‘মনে মনে ভাবেন, কেউ কিছুই বোঝে না, সবাইকে দিব্যি মন ভুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।’

কাতর হেসে বললাম, ‘এতটা বলবেন না।’

‘তাহলে একটু শুভুন।’ কুন্দনন্দিনী হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

কিন্তু আর কোথায় যাবো? আছি তো তাঁর মুখের বন্দুক-নলের মুখেই। উনি তো কল টিপেই যাচ্ছেন। তবু একটু ঝুঁকে বললাম, ‘বলুন।’

কুন্দনন্দিনী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘মেয়েদের আপনি পোশাকী সম্মান দেখাতে চান, দেখান। ওসব নিয়ে যারা ভুলে থাকতে চায়, থাকুক। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। লেখক হলেও আপনি পুরুষ। আর পুরুষদের আমরাই ভালো চিনি।’

সত্যি মিথ্যা যাচাই করতে যাবো না। কিন্তু এ কথার অর্থ কী? আমার পুরুষত্বের কোন্ দিকটাকে তিনি চিনলেন?

‘ঠিক কথা না।’ মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, ‘অনেক মেয়েকেও দেখেছি পুরুষের কুহকে পড়তে।’

কুন্দনন্দিনী অগ্রজের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তা দেখবে না কেন। সেটা হলো ডিকারেট, বিশেষ ক্ষেত্রে। মেয়েরা তখন অন্ধ হয়ে যায়। ও রকম পুরুষরাও অনেক মেয়ের কুহকে পড়ে। আমি মেয়েদের প্রবৃত্তির কথা বলছি। পুরুষকে চেনাটা মেয়েদের ইনস্টিংক্ট।’

বললাম, ‘আমি যানলাম আপনার কথা। কিন্তু আমাকে কী চিনলেন, একটু বলুন।’

কুন্দনন্দিনী কালো চোখে ছাতি ফুটিয়ে বললেন, ‘অমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন কেন? আপনি বা, ঠিক তাই চিনেছি। বলেই তো দিয়েছি আপনি আর্দ্র কারোর কাছের মানুষ নন। আরো বলব? আপনি এখন ভাবছেন, ছেড়ে দে যা কেঁদে বাঁচি।’

এবার আমিই হাসিতে চড়া আওয়াজ দিলাম। না দিয়েই বা কী উপায়? তবু বললাম, ‘বিশ্বাস করুন, এতটা অসহনীয় আমার মনে হয়নি যে আপনাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করবে।’

‘ধাক, আপনি আর কুহকী হয়ে উঠবেন না।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আপনার অনেক কুহক জানা আছে, আমি জানি।’

‘আমি এক মত।’ মেজর ঘোষাল বলে, আমার দিকে একবার দেখলেন।

মেজর ঘোষাল অল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন। জ্বাভা ভগ্নীতে বেশ মিল আছে।

কুন্দনন্দিনী। বললেন, ‘হয়েছে অনেক। এবার পেছন থেকে পানের ঠোঙাটা দিন তো।’

পেছনে হাত বাড়িয়ে, বড় খোলা ব্যাগের ভিতর থেকে পানের ঠোঙা এগিয়ে দিলাম। কুন্দনন্দিনী সেটি নিয়ে বললেন, ‘বোতলটা কোথায়?’

‘ওটি তুমি এখন পাবে না।’ মেজর ঘোষাল বললেন।

কুন্দনন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। একটি পানের খিলি দেখিয়ে বললেন, ‘চলবে?’

বললাম, ‘ইচ্ছে নেই, তেমন অভ্যাস নেই।’

তিনি নিজেই একটি পান মুখে দিলেন। ভিস্তার ওপারে ঝুলন্ত সেতুর দেখা পাওয়া গেল। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া নেমে এসেছে। গাড়ির বাতি জ্বলছে এখন। পাহাড়ের আশেপাশে উচুতে নিচুতেও আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। গাড়ি আরো উচুতে উঠছে। এখন তার গর্জন বেশি।

পরের দিন সকাল আটটায় যখন আমার মেজর ঘোষালের ফোজী জীপে বসলাম, তখন নিজেই অবাক লাগলো। তার সঙ্গে কিছুটা বিধাও। এমন করে হঠাৎ একেবারে বিপরীত কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কী না, এখনো মনে জেগে রয়েছে সেই জিজ্ঞাসাটা। দন্তসাহেব সপরিবারে দাঁড়িয়ে ছিলেন জীপের পাশে। বিদায় দেবার জন্ত।

দন্তজায়া বললেন, ‘এক ব্যাক্স পৃথক কল হয়ে গেল।’

মাঝের সঙ্গে কন্ঠারও তাল দিল। একজন বললো, ‘সত্যি, এটা ঠিক হচ্ছে না। আকল মেজরই যতো গোলমাল করলেন।’

দন্ত তাঁর কন্ঠাদের দিকে ক্রি়ে হেসে ধমক দিলেন, ‘আরে, তোরা এ সব কী বলছিস। বেড়ার এমন একটা স্বযোগ পেলে কি ছাড়তে আছে। আমি নেহাত সরকারের চাকরিতে এখানে এসেছি। তা না হলে আমিও পাড়ি জমাতাম। নিন মেজর ঘোষাল, আপনারা যাত্রা করুন। বেলা দুটো তিনটের মধ্যে আপনারা পৌঁছতে পারলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বলতে হবে।’ বলে আমার

দিকে ফিরে বললেন, ‘একেবারে ভুলে যেও না হে। কলকাতায় ফিরে একটু যোগাযোগ রেখো।’

মেজর ঘোষাল গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলেন। একবার পিছন ফিরে দেখলেন, কোঁজী ভরুণ সর্দারজী ড্রাইভারটি উঠেছে কী না। গাড়ি ছাড়বার আগে, দত্ত পরিবারের উদ্দেশ্যে আর একবার হাত তুলে বিদায় নিলেন। তাঁর ডান পাশ থেকে কুন্দনন্দিনীও দু’হাত তুলে নমস্কার করলেন। গাড়ি গ্যাংটকের রাস্তায় এগিয়ে চললো। খুড়ি, আমার ভুল বলা হলো, তুবার সিংহের দেশে। রাজধানীর নাম গ্যাংটক। গতকাল রাতে মেজর ঘোষাল বলেছিলেন, আমাদের উচ্চারণের গ্যাংটক, সিকিম অধিবাসীদের মুখে গ্যাংতো।

আমার ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস্ত যাত্রাপর্বটো ছিন্ন হয়েছে গতকাল রাত্রি দশটায়। মেজর ঘোষাল আমাকে দত্ত সাহেবের হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন তখন প্রায় আটটা। মেজর সাহেবের ব্যবস্থা কিছু থাকলেও, দত্ত সাহেব আর তাঁর ভগ্নীকে তাঁর ওখানেই খেয়ে যেতে বলেছিলেন, দত্তজায়াও জোর দিয়েছিলেন। সেই খাবার আসরেই সিকিমের কথা উঠেছিল। কুন্দনন্দিনী আমাকে বলেছিলেন, এতই যখন আপনার সে-দেশ দেখার ইচ্ছে, তবে আর দেরি কেন? আমাদের সঙ্গে কালই চলুন না।’

মেজর ঘোষাল তাল দিয়েছিলেন, ‘ভ্রমস্ত নীভ্রম। আজই আপনাকে বলে-ছিলাম, আমি থাকতে আপনি সিকিমে এলে আমি খুশি হবো। কয়েকদিন তো কালিম্পাং-এ কাটবেই। তার সঙ্গে না হয় আরো কয়েকটা দিন বাড়িয়ে নতুন জায়গা বেড়িয়ে আসবেন।’

কাকে যে কী বলেছিলেন। আদেখুলেকে কলা দেখাচ্ছিলেন। পাগলকে বলছিলেন সীকো নাড়া দিতে। তুবার সিংহের পায়ের তলায় তিস্তার সেই জন্ম-স্থান। শুনেই তো মন পাগল হয়েছিল! কিন্তু সেই যে আমার টিকিমে রাধা-কিষণ? কলকাতায় না ফেরবার অস্বিধের কথা ভুলেছিলাম। আমাকে অবাধ করে দিয়ে দত্ত বলেছিলেন, ‘আরে রাখো তো তোমার কলকাতা। দরকার হলে, ট্রাংকলে জানিয়ে দিও, কিয়তে দু-একদিন দেরি হবে। লেখা পাঠাতে হবে? পাঠিয়ে দিও শিলিগুড়িতে, চলে যাবে এয়ার লাইনস্-এর প্যাকেটে, নয় তো এয়ার ক্যারিং-এর। মেজর ঘোষালের সঙ্গে গেলে তোমার অনেক সুবিধা। সেটা কেবল আরামে থাকার কথা বলছি না। যেসব জায়গায় যেতে তোমার নানা বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হবে, সেসব উনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।’

‘মানন্দে।’ মেজর ঘোষাল বলেছিলেন, ‘আমি তো এ স্বযোগটাই চাইছিলাম।’

মন করে আমার খাজনা খাজনা, কে করবে আমার হারি ভজনা। আমি লকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দস্তজারী বলেছিলেন, ‘তাহলে বেরিয়েই পড়ুন।’

কুন্দনন্দিনী বলে উঠেছিল, ‘বাস, হোস্টেলের অহুমতি পেয়ে গেছেন। এবার তাওয়া গরম থাকতে থাকতে রুটি সৈকে ফেলুন। আমাদের সঙ্গে কাল সকালেই আপনি যাচ্ছেন।’

তাঁর ভাবায় আর কথায় সবাই হেসে উঠেছিলেন। আর একবার সাধিলেই খাইব, আমার সে অবস্থা না। এখন না সাধিতেই খাইতে রাজি। তবু কেমন ঠেক লেগে যাচ্ছিল। মেজর ঘোষাল বলেছিলেন, ‘আপনাকে নিয়ে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠতে পারবো না, কিন্তু নিয়ে যাবো পাহাড়ের গভীরে।’

আর থাকতে পারিনি, আমার পাখায় লেগেছিল দুঃস্বপ্ন কল্পনা। চলো মন তুষার সিংহের দেশে। বলেছিলাম, ‘চলুন।’

‘কথা খসেছে।’ কুন্দনন্দিনী বলে উঠেছিলেন, ‘এবার তাহলে মিঃ আর মিসেস দস্তর অহুমতি নিয়ে একটু পান করা যাক।’

অহুমতি পাওয়া গিয়েছিল। দস্ত কিঞ্চিৎ সঙ্গদানও করেছিলেন। মেজর ঘোষাল ঘোষণা করেছিলেন, ‘মিষ্টি, মনে রাখিস স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল আটটার আমাদের বেরোতেই হবে।’

কুন্দনন্দিনী আবার চুমুকে চুমুকে রাঙা হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, ‘দেখে নিও।’

এই সেই যাত্রা। মেজর ঘোষাল পোশাক বদলাননি। গতকালের পোশাকই আজ তাঁর অঙ্গে। আমরা তাই। ঠাণ্ডার সঙ্গে ধূতির পান্না চলে না। পাতলুনের ওপরে গলাবন্ধ উলের সোয়েটার। কিন্তু কুন্দনন্দিনী রমণী। রমণীয়তা তাঁর ধর্ম। স্নান করে তিনি লাল জামার ওপরে লাল পাড় গররের শাড়ি পরেছেন। চিকন কালো কেশ বলতে পারবো না। রেশমী কোমল কেশের মাঝখানে সামান্য একটি রেখার সিঁদুর পরেছেন, কপালে একটি সজোড়িত সূঁধের মতো লাল ফোঁটা। চোখে ঠোঁটে যথার্থ রঙ বোলাতে ভোজেননি। নানা অঙ্গরাগের ফুলে স্ববাসও ছড়াচ্ছেন। গায়ে না রেখে, কোলের ওপর ফেলে রেখেছেন লাল টকটকে পশমী শাল, ভালো রেশমী সূতোর কাজ করা। তবু গতকালের সঙ্গে কোথায় যেন একটা তফাত ঘটে গিয়েছে।

তফাতটা যে কোথায়, তাও জানি। যতো যা-ই বলি না কেন, লাল পাড় শাড়ি আর কপালের লাল টিপের প্রতি বাঙালী যাত্রেরই কি একটি মূহুর্ত আছে? আমারও যে আছে, তার সন্দেহ কী? এখন দেখলে কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, এ রমণী হুয়া পানে যেমন মন্ত, তাঁর ধূমপানের ধূমও তেমন। তবু তো বলতে পারবো না, এটি তাঁর ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশ ধারণের দরকারই বা কী? তিনি তো কোনো কিছুই অস্তরাল রাখেননি।

আমি সঙ্গে আছি বলেই তরুণ সর্দার ডাইতারকে পিছনে বসানো হয়েছে। অকথায় সামনে তিনজনের জায়গা হতো না। এ কথাও আগেই হয়েছিল। কুন্দনন্দিনী কেন শিলিগুড়ি থেকে ফিরে এসেছেন, দত্ত পরিবারে সে বিশ্রিত প্রায়ও উঠেছিল। মেজর ঘোষাল কেবল বলেছিলেন, ‘যে যার মজিতে চলছে।’

অতঃপর কেউ আর কোনো কোঁতুহল প্রকাশ করেননি।

‘মেজদা, লেখককে প্রায় লুট করে নিয়ে আসা হলো, তাই না?’ কুন্দনন্দিনী হেসে তাকালেন আমার দিকে।

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘মাঝে মাঝে এ রকম লুট না করলে আমাদেরই বা চলে কী করে। চিরকালটা কি দেশের সীমান্ত পাহারা দিয়েই কাটবে? মাঝে মধ্যে তাই এ রকম লুটপাটও করতে হবে।’

কুন্দনন্দিনী হাততালি দিয়ে ইংরেজিতে বলে উঠলেন, ‘খুব ভালো বলেছে মেজদা। তোমার সঙ্গে থেকে লুটের ভাগ আমিও কিছু পেলাম।’

এমন করেই যদি বলতে হয়, তাহলে লুট না বলে হরণ করা বলাই ভালো। কিন্তু আমাকে ঐ লুট করা হয়েছে। নিজেই যে লুট হতে চেয়েছি। একবার যখন চেয়েছি তখন তো আমার সেই গান, ‘ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে বাবি কে আমারে।’... একবার যখন পিছনটাকে ছাড়তে পেরেছি, এখন কেবল সামনে। এখন মেজর ঘোষাল, কুন্দনন্দিনী মুখোপাধ্যায় কেবল নিমিত্ত মাত্র। এখন মন চলো তুষার সিংহের দেশে। বললাম, ‘লুট হতে এত আনন্দ কাল রাত্রেও তা বুঝতে পারিনি।’

‘ও মেজদা, শোনো।’ কুন্দনন্দিনী তাঁর হুই চোখের তারা আর মধ্য নয়ন সিন্দুরের টিপ কাঁপিয়ে বললেন।

আমি বললাম, ‘এখন আমাকে যা-ই বলুন, এ যাত্রায় এমন লুট হতেই সাধ।’

‘চমৎকার মশাই!’ কুন্দনন্দিনী একরাশ ফুলেল গন্ধ ছড়িয়ে, তাঁর মুখ আমার দিকে ঝুঁকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, ‘কাল যাত্রা তো মনে হচ্ছিল একটা বাচ্চা মেয়েকে জোর করে শব্দরবাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

মেজর ঘোষালের সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম। বললাম, ‘এতটা বলবেন না। আসলে পেছনের টানটা ছাড়ানো বড় কঠিন।’

‘লেখকদের আবার পেছন টান কিসের?’ কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হেসে বললাম, ‘বোধ হয় লেখক বলেই বিশেষ করে। স্বাধীনতা কথাটার যথার্থ অর্থ তো আজ পর্যন্ত বুঝলাম না।’

কুন্দনন্দিনী যেন অবাক হলেন, ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর মুখে একটি ছায়া নেমে এলো, বললেন, ‘আপনিও এ কথা বলছেন।’

‘সকলেই এ কথাই বলবেন মিষ্টি।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘শর্তহীন স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।’

কুন্দনন্দিনী চুলের ঝাপটা দিয়ে ঘাড় কিরিয়ে অগ্রজের দিকে তাকালেন। মেজর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘দেখিস বাপু, তোকে কিন্তু আমি কিছু বলিনি। তুই যেন তা ভেবে আমার ওপর আবার রেগে যাস নে।’

কুন্দনন্দিনী সামনের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসলেন, বললেন, ‘ও সব স্বাধীনতার কথা জানি না। কিন্তু আমি আর জীবনে কোনো শর্তই মানতে রাজী নই। কার শর্ত, কে মানে?’

মেজর ঘোষাল কোনো জবাব দিলেন না। আমি আবার অস্বস্তি বোধ করলাম। গতকাল শিলিগুড়ি থেকে ফেরার কথা আমার মনে পড়লো। বা আমি সঠিক জানি না, সে বিষয়ে মন্তব্য অহুচিত। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কোনো কোনো আচরণে আর কথায় মনে হচ্ছে কোথায় যেন তাঁর বুকের একটা তার অতি বন্ধনে টান হয়ে আছে। সেখানে স্পর্শ লাগলেই বেজে উঠছে তীব্র ঝংকারে। এই মুহূর্তে তাঁকে আমার কেমন যুগপৎ বিদ্রোহিনী এবং অপরিণত বালিকার মতো লাগছে। তবু এ আবহাওয়াটা ভালো না।

আমরা যে খুব একটা উঁচু চড়াইয়ের সপিল পথে চলেছি তা বলা যায় না। কালিঙ্গ থেকে অনেকটাই যেন সমতলের ওপর দিয়ে চলেছি। সামান্য চড়াই উৎরাই। দুরন্ত ঝাঁক অবিচ্ছিন্ন আছে। চড়াই টের পাওয়া গেল কিছু দূর আসার পরে, ভাইনের খাদের দিকে তাকিয়ে। সবুজ আর নীল থেকে রৌদ্রের রঙ আলাদা করা যাচ্ছে না। সর্বত্রই চোখে পড়ছে কিছু না কিছু সবুজ চাব। সবুজ ধানের খেত চিনতে বাঙালী চোখের কোথাও ভুল হয় না। অনেক নিচে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে নীল ভিত্তাকে দেখতে পাচ্ছি। এখনই

যেন তাকে আর চেনা যাচ্ছে না, সমতলের সেই সর্বনাশিকে। আমাদের খতর হিসাবে এখন এমনিতেই হেমন্ত।

সমতলের সর্বনাশী একলা তিস্তা না, আরো অনেক। তারা কেউ কেউ সর্বনাশীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সর্বনেশে। এখন তারা সকলেই সমতলের রূপে বিভোর শান্ত অলস আর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। এখন এই হিমালয়ের কোলে সবুজ অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে তিস্তা নীলে ঝলক দিচ্ছে। অধিবাসী নারী পুরুষ শিশু বারো পথের দু'ধারে দেখা দেয়, তাদের সেই একই পাহাড়ী রূপ। কোথাও আলাদা করতে পারি না। আর এই পাহাড়ী পথের ধারে ধারে কি বারো মাসই কাজ হয়? শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় কেবল না, আসবার সময় অন্ধকারে আলো জেলেও শ্রমিক মেয়ে পুরুষদের কাজ করতে দেখেছি। এখন এই সকালে গ্যাংটকের পথেও সেই রকম দেখছি। কিছু অন্তর অন্তরই পথের কাজ চলছে।

মেজর ঘোষালের কাছে শুনেছি এর নাম মেনটেনেস। পাহাড়ের জনপদ সর্বত্র দুর্গম না, কিন্তু প্রাতি মূহুর্তে তাকে হুমকি করে রাখার কাজ চলছে। সমতলের আলস্ত এখানে টেকে না। নিশ্চল পাহাড় প্রকৃত নিশ্চল না। আর একটু মন ভুবে যদি কবুল করতে হয় তবে বলি, পথের কাজে ব্যস্ত স্বাস্থ্যবতী পাহাড়ী বালারা বারোবারেই চোখ টেনে নিয়ে যায়। হয়তো আমাদের মতো শত শত যাত্রী ওরা রোজ দেখে। তবু ওদের ছোট ছোট কালো মানিক চোখে এত কৌতূহলের ছটা কেন? কেন বা রাঙা গালে চকিতে ঝিলিক দিয়ে যায় হাসি?

‘মিষ্টি, এটা ঠিক হচ্ছে না।’ মেজর ঘোষাল সামনে দৃষ্টি রেখে বললেন, ‘লেখককে নিয়ে এলি, লুটের মালটাকে ভোগ কর।’ তিনি হাসলেন।

কুন্দনন্দিনী চমকিয়ে উঠে ইংরেজিতে বললেন, ‘দুঃখিত।’ তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে বসতে গিয়ে লালপাড় আঁচলখানি দিলেন নিচে গড়িয়ে। গাড়ি বাঁদিকে চুলের কাঁটার বাঁক নিতে গিয়ে বাতাসের ঠাণ্ডা কাপ্টায় এলোমেলো করে দিল তাঁর চুল। তিনি শব্দ করলেন, ‘আহু!’ তারপরে মুখ থেকে রেশমী চুলের গোছা সরিয়ে, বললেন, ‘একটা কথাই খালি জিজ্ঞেস করবো, আপনিও কি শর্তবাদী?’

আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনিও কি তা নন?’

‘না।’

‘তাহলে দিন না আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে!’

কুন্দনন্দিনী ধাক্কা খাবার মতোই চমকিয়ে উঠে বললেন, ‘কেন ?’

মেজর ঘোষাল হা হা করে হেসে উঠে বললেন, ‘ওয়েল সেড, ওয়েল সেড ।’

কুন্দনন্দিনী ভুরু কঁচকে অবাক চোখে একবার অগ্রজকে, আর একবার আমাকে দেখলেন, বললেন, ‘তার মানে কী ?’

‘তার মানে হলো, স্বাধীনতা শর্তসাপেক্ষ ।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘তুই কি ইচ্ছা করলেই লেখককে ধাক্কা দিয়ে কেলে দিতে পারিস ? নাকি যা ইচ্ছে তা বলতে পারিস ?’

কুন্দনন্দিনীর মুখে অবাক অপরিণীম হলো, বললেন, ‘কিন্তু আমি তা করতে যাবো কেন ?’

‘তোর স্বাধীনতা ! পাগলেরও তো স্বাধীনতা আছে ।’ মেজর ঘোষাল বললেন ।

কুন্দনন্দিনী রীতিমতো ঠোট ফুলিয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, ‘তার মানে আমি পাগল ?’

আমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললাম, ‘দোহাই, আমি তা বলিনি । আসলে আমি একটা তুলনা দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম, আপনিও শর্ত মেনে চলেন । আপনি পরের ক্ষতি করে কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটাতে পারেন ?’

‘না ।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘কিন্তু নিজের ক্ষতি করবার স্বাধীনতা আমার নিশ্চয়ই আছে ? আমার নিজের জীবন নিয়ে আমি নিশ্চয়ই যা খুশি করতে পারি ?’

মেজর ঘোষাল একবার আমার দিকে দেখলেন । আমি বললাম, ‘না, আপনি তা-ও পারেন না । তাতেও হয়তো কারোর ক্ষতি হতে পারে ।’

‘কারোর ক্ষতি হবার নেই ।’ কুন্দনন্দিনী বললেন ।

আমি চূপ করে যাবো ভেবেও পারলাম না, বললাম, ‘কারো না হোক, তাহলে আপনার নিজেরই । আপনি যদি অস্তিত্ববাদী হন, তাহলেও । আমার অন্ডায় হলে মাফ করবেন, আপনার এই শর্ত মানতে না চাওয়া বোধ হয় কোনো গভীর যন্ত্রণা থেকেই । দ্ব্যস্ত অস্বীকার করতে পারেন না বলেই আপনার যন্ত্রণা । আসলে আমি মাহুঘের ইটারনিটিতে বিশ্বাসী ।’

কুন্দনন্দিনী খেন রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী সেই মাহুঘের ইটারনিটি ?’

বললাম, ‘দুঃখকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কি ? মাহুঘের মন আর হৃদয় আছে, মনোবোধের সুখ দুঃখের সে ভাগীদার । তাকে তার মধ্য দিয়েই চলতে হয়, তাই না কি ?’

কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি হেসে বললাম, ‘এ রকম বলতে আমার খুব লজ্জা করে। আসলে অনেক দুঃখ হতাশার মধ্যেও সেই গানের কলিটার কথাই মনে হয়, ‘এমন মানব জমিন রইলো পতিত/আবাদ করলে ফলতো সোনা।’...’

কুন্দনন্দিনীর চোখের কাজল কি একটু বেশি চিকচিক করে উঠলো? তিনি মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালেন।

মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, ‘বড় ভালো লাগলো ভাই আপনার কথা।’

তিনি আমার দিকে তাকালেন না। আমি বললাম, ‘আমার কথা কিন্তু নয়।’

‘তাও জানি। পরের কথাই বা নিজের করতে পারি কই? মাহুদ আসলে বোধ হয় সবাই এক।’

আমি তাঁর কথার কোনো জবাব দিলাম না। কুন্দনন্দিনী তাঁর হাতের পিঠ দিয়ে চোখে আলতো করে ছোয়ালেন। আমি বললাম, ‘তবে মিসেস মুখার্জি—’

‘কী? মিসেস মুখার্জি?’ কুন্দনন্দিনী ঝটিতি আমার দিকে ফিরলেন। তাঁর ভ্রুটি চোখ ঝেঁপে লাল। বললেন, ‘চুক্তি অমান্য করছেন কেন?’

বললাম, ‘দুঃখিত। কুন্দনন্দিনী।’

‘কিন্তু কী বলছিলেন যেন?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, ‘আপনার প্রসন্ন মুখটি দেখতে ভালো লাগে।’

কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকালেন। চোখের তারায় ঝিলিক। বললেন, ‘সত্যি?’

আমি চমকিয়েই উঠলাম। কুন্দনন্দিনী হেসে বললেন, ‘তাহলে তাই হবে। আমার প্রসন্ন মুখ কেউ তো দেখতে চায় না।’

‘বাজে কথা একটুও না।’ মেজর ঘোষাল বেশ রাশভাঙ্গি গলায় বলে চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বাঁ হাতে অগ্রজের ডানায় চাঁটি মেয়ে বললেন, ‘ইস, খুব শাসন হচ্ছে। কালো বেড়ালটা বের করো না।’

‘নো কালো বেড়াল, রংপোর আগে কিছু নয়।’ মেজর ঘোষাল গভীর স্বরেই বললেন।

কুন্দনন্দিনী অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘রংপোতে গিয়ে কিনতে হবে নাকি? কিন্তু একটা আস্ত কালো বেড়াল যে ব্যাগের মধ্যে ছিল!’

‘সে আছে, তবে আস্ত নেই।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘তুলে বেগ না, গত রাতে মিঃ দত্তর ওখানে নতুন কালো বেড়ালের মুখ খোলা হয়েছিল। তোমার পান ঠোঙা ভরতি করে নিয়েছি, এখন ওই দিয়েই চালাও।’

মেজর ঘোষালের কথা বলার ভঙ্গি এখন রীতিমত রাশভারী কোজী সাহেবের। কালো বেড়াল হলো সিকিমের সেই সুখ্যাত লাল পানি, ব্ল্যাক ক্যাট বার নাম।

কুন্দনন্দিনী ঠোট ফুলিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘তালো হবে না মেজদা বলে দিচ্ছি। খুব শাসন হচ্ছে, না?’

মেজর ঘোষাল কটমট করে একবার তাকালেন। আমার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নাচালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘প্রসন্ন মুখ রাখো।’

কুন্দনন্দিনী এবার সত্যিই অগ্রজের কাঁধে আবার একটি মুহূ চাপড় মারলেন। যেন দোতারার তারে আঘাত লাগলো, ঝংকারে বেজে উঠলো। মেজর ঘোষাল হেসে উঠলেন। দেখে শাস্তি, মনটাও শরীফ লাগে। ভ্রাতা-ভগ্নীর খুনহুটি আর কপট শাসনে আসরটি জমজমাট। মেজর বললেন, ‘না মিষ্টি, এখন ভাই ড্রিংক করিস না। সাংগ্রিলার দেশেই তো ঘাচ্চিস, এখন একটু গল্প কর।’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘ঠিক আছে, তবে পানই খাই। নেশা ছাড়া থাকতে পারবো না।’

কী কথা! কইতে জানলে হয়, কথা বোল ধারায় বয়। নেশা ছাড়া থাকতে পারেন না। এ কি কেবল অব্যাজাত নেশা আর নেশাখোরদেরই কথা? না কি তাবত মানুষই কিছু নেশা করেন? নেশা কি কেবল খেয়ে পিয়েই হয়, না কি আরো নানাভাবে, কীর্তি কর্মে ও মনে মনে? কুন্দনন্দিনী আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘দিন তো একটু পেছন থেকে পানের ঠোঙাটা। কিছু মনে করছেন না তো?’

বললাম, ‘করছি।’

‘করছেন? কী করছেন?’

‘মনে মনে আপনাদের জয়গান করছি।’

মেজর ঘোষাল হেসে উঠলেন। কুন্দনন্দিনী হস্ করে একটি নিশ্বাস কেলে বললেন, ‘তবু রক্ষে। লেখকদের কথা খটা মুশকিল।’

আমি পানের ঠোঙা পিছনে হাত বাড়িয়ে তুলে এনে দিলাম। কিন্তু পানের ঝিলির সেই প্রতীকের কথা মনে করে ভিতরে ভিতরে লজ্জার আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

‘সামনে রংপো, এই ত্রিভুজটার ওপারে।’ মেজর ঘোষাল ঘোষণা করলেন।

রংপো একটি বাজার। তারপরে সিংতাম নামে একটি বাজার অঞ্চলও পেরিয়ে গেলাম। সর্বত্রই শীতের তর্রি-ভরকারির ছড়াছড়ি। সর্বত্রই ভারতীয় আর সিকিমী সশস্ত্র পুলিশের চৌকি। মেজর ঘোষাল বললেন, ‘সিংতাম থেকে তিস্তার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। তিস্তা এখান থেকে সরে গেছে পশ্চিম দিকে।’

সর্বনাশ! চির বিচ্ছেদ নাকি? আমি যে সর্বনাশীর আত্মতুচ্ছের দেখবো বলে ছুটেছি। হতাশ বিন্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘গ্যাংটকে গিয়ে দেখতে পাবো না?’

‘না স্তার, গংতোর বেশ খানিকটা পশ্চিম উত্তর দিকে তিস্তা নেমে আসছে।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘তিস্তা সিংতাম থেকে গেছে দিকছুর দিকে। অবিস্ত্রি গংতোর পাহাড় ভেঙে কিছুটা গেলেই তিস্তার গর্জন আপনি শুনতে পাবেন। নিচে নেমে গেলে দেখতেও পাবেন, সেটা পরিভ্রম আর সময়সাপেক্ষ। তিস্তাকে কাছে থেকে আবার দেখা যাবে উত্তর সিকিমে। কী ব্যাপার, হতাশ হয়ে গেলেন নাকি?’

বললাম, ‘কিছুটা তো বটেই।’

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘হতাশ হবেন না, তিস্তাকে আপনি পাবেন। মনে রাখবেন, তিস্তা আপনার সঙ্গেই আছে, একটু দূরে দূরে এই যা। আর এখন থেকে, আপনার বাঁদিকে, মানে আমার দিকের জানলায় একটু নজর রাখবেন। আপনার সেই পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা প্রায়ই আপনাকে দেখা দেবে। আমরা এখন উচুতে উঠছি। এর পরে গংতো যতো এগিয়ে আসবে, আমরা ততোই নিচে নামবো।’

বাঁদিকে পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা, কথাটা যেন স্নাইচের ছিদ্রে প্রাগ পব্বিয়ে দেবার মতো। আমার ভিতরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হতে লাগলো। মেজর ঘোষাল আবার বললেন, ‘আপনি নাথুলা পাদের নাম শুনেছেন?’

‘শুনেছি।’

‘যে রংপো আমরা পেছনে ফেলে এলাম, সেখান থেকে নাথুলা যাবার একটা রাস্তা গেছে। পূর্বদিকের সেই রাস্তা সাধারণের জন্য না, একমাত্র

মিলিটারি যেতে পারে। রংপো থেকে রংলি, তারপরে কুলুপ থেকে নাখুলা, সিকিমের একটা সীমান্ত। ওই পথেই ভূটান যাওয়া যেতো আগে, এখন চীনাগের বন্ধক বেয়নেট পথ আটকে রেখেছে। জহরলাল নেহরু যখন শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে এসেছিলেন—পঞ্চাশ দশকে, তখন তিনি গ্যাংটক থেকে ঘোড়া আর ইয়াকের পিঠে চেপে, ওই পথ দিয়েই ভূটান গিয়েছিলেন। তখনো রাজ-নৈতিক আবহাওয়া এখনকার মতো তিক্ত হয়ে ওঠেনি।’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুনেছি ভূটান যাবার অত্র রাস্তাও আছে, তরাইয়ের হাসিমায়া অকল দিয়ে, মোটরগাড়ির রাস্তা।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘সে তো আছেই, কিন্তু জহরলাল নেহরুর কথা কুলে যাবেন না। অমন নায়েকোচিত রোমাটিক প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষ বোধ হয় আর কখনো পাবে না। ভারতে পারেন, ওই বয়সে তেরো হাজার কিটেরও ওপর, বরফের ওপর দিয়ে দিবি তিনি মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে ইয়াকের পিঠে চেপে পাড়ি দিয়েছিলেন! আমাদেরই মনে হয়, অক্সিজেনের অভাব বোধ করছি। কিংডম অব ড্রাগনও খুব অবাক হয়েছিল।’

‘কিংডম অব ড্রাগনটা কী?’

‘ভূটানকে তাই বলা হয়। কিংডম অব ড্রাগন। আর সে রাজ্যের অধিবাসীদের বলা হয় ড্রুপ্কা। সেই হিসাবে সিকিম রাজকে বলা যায় কিংডম অব ডেন্জং। ডেন্জং মানে হলো, ভ্যালি অব রাইস—মানে সিকিম। আপনি এখন থেকেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সিকিম সত্যি ভ্যালি অব রাইস।’

মিথ্যা না, ইতিমধ্যেই আমার চোখে তা পড়েছে। ধানের চাষ সর্বত্র, গভীর সবুজ আর নিবিড়। আমার জানেতে রোশনাই লাগছে। মেজর ঘোষাল নিতান্ত ফৌজী আদমী নন, তাঁর ভাঙারে ইতিহাস আর সংস্কৃতির মজুদও আছে। ফৌজী মানুষদের কাছে এ সব আমরা আশা করি না। আমি বললাম, ‘এখন তো আর সিকিমে কিংডম অব ডেন্জং-এর রাজত্ব নেই, জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় নিজেদের ক্ষমতা লাভ করেছে।’

‘হ্যাঁ, ওটা হলো রাজনীতির বিষয়। আপনি কি খুব ইন্টারেস্টেড?’

‘একেবারেই না। আপনি কি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গোলমালের সম্বন্ধ ছিলেন?’

‘নিশ্চয়ই। যে-কোনো দুর্ঘটনাকে যোধ করার জন্য আমাদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সিকিমের সপ্তমবার্ষিকী পরিকল্পনার ভারত বহু টাকা ব্যয়

করেছে, এখনো করছে। সীমান্তের প্রশ্ন আছে। আমরা আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না।’

‘আচ্ছা মেজর ঘোষাল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?’

‘নিশ্চয়। একটা কেন, একশোটা করুন।’

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই নতুন পরিবর্তনে (বর্তমান সময় সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবার আগের ঘটনা।) সিকিমের অধিবাসীরা কী বলেন?’

মেজর ঘোষাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। দেখছি, কুন্দনন্দিনীও আমার মতোই কৌতূহলী প্রোতা হয়ে উঠেছেন। সম্ভবত অগ্রজের সঙ্গে এ সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আগে কোনো আলোচনা হয়নি। মেজর বললেন, ‘দেখুন, এই সিকিম বলুন, আর ভূটানই বলুন, দুটো পাহাড়ী রাজ্যের শুটাই তিব্বতের সাহসী অভিযাত্রী। সেভেনটিনথ্ সেঞ্চুরির কোনো সময় কিছু আগে পরে তিব্বতের কোনো কোনো বীর এসে এখানে তাদের রাজত্ব স্থাপন করেছিল। আমরা যাদের ভোটিয়া বলি, তারা কিন্তু কেউ ভূটানের অধিবাসী নয়। তিব্বত থেকে যারা সিকিমে বা ভূটানে বা ভারতেও এসে থেকেছে, তাদেরই ভোটিয়া বলা হয়। সিকিম হলো লেপচা আর ভোটিয়াদের দেশ, ওদের মিশ্রিত কালচারই হলো এখানকার কালচার। এদের সঙ্গে বিয়ে-শাদী চলে। কিন্তু যে নেপালীরা আজ সিকিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এরা সকলেই এসেছে বাইরে থেকে। এরাও এখন এই সয়েলেরই সম্ভান। এখানে চাষবাস কাজ ব্যবসারে তাদের অবদান কোনো অংশেই কম না। তারাও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী তো করবেই। রাজ্যশাসন যদি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিবাদও ইনএভিটেবল। বটেছেও তাই।’

চমৎকার ব্যাখ্যা। আমি প্রায় মুগ্ধ চোখেই মেজর ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কথা বলছেন, সামনের পথের দিকে তাকিয়ে। যতোই এগিয়ে চলেছি, রাস্তার দুস্তর সর্পিলাতা বাড়ছে। মেজর ঘোষাল চালক হিসাবেও সতর্ক, দ্রুতগামী, কিন্তু কথাও সমানেই বলে চলেছেন। আমি তাঁর চোখে মুখে একটি অগ্রমনস্ক তন্নয়তা লক্ষ্য করছি। তিনি আবার বললেন, ‘এই পাহাড়ী রাজ্যের ইতিহাস সত্যি রোমাটিক। রূপকথার মতো আমি ভালোবাসি।’

এই একটি কথাতেই যেন সব বলা হয়ে গেল, ‘আমি ভালোবাসি।’ তাঁর মুখের তন্নয়তার আসলে সেই ভালোবাসা। আর ভালোবাসাই কি শেষ কথা?

বোধ হয়। ভালোবাসা মানব জমিনকে পতিত থাকতে দেয় না। ওরে মন, কৃষিকাজ জানো গিয়ে।

‘যেজ্ঞদা, আমাকে তো তুমি কোনোদিন এ সব কথা বলোনি।’ কুন্দনন্দিনীর স্বরে আবদারের অভিযোগ।

মেজর হেসে বললেন, ‘তুই কি কোনোদিন স্তনতে চেয়েছিলি? বেশ, এবার থেকে তোকে এ দেশের অনেক কথা বলবো।’

সত্যিই তো, রংপো ছাড়িয়ে, সিংতাঙ্গও ত্যাগ করে এসেছি অনেকক্ষণ। এখন রীতিমত হরমু চড়াই ভাঙছি। কিন্তু কুন্দনন্দিনী তাঁর কালো বেড়ালের কথা ভুলে গিয়েছেন। মন থাকে সেই মনের ভিতরে। নতুন কথায় মন টেনে নিয়ে গিয়েছে, লাল পানির কথা আর মনে নেই। যদিও তাবুল রঞ্জিত তাঁর ঠোঁট আর ফুলের জরদার রস কিছু কিকিং চোখে এবং গালে ছটা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠা, উর্বর কণ্ঠ এখন লাল না, বিপ্রহরের রোদের মতো রঙ। লাল জামায় দীপ্তিটা চড়া। শাড়ির আঁচল? সে বুকের খোয়ানি কাটাতে নিচেই এলানো।

আমি হঠাৎ বাদিকে তাকিয়ে শিতর মতো চিংকার করে উঠলাম, ‘ওটা কী, ওই যে?’

কুন্দনন্দিনীও বুকে পড়লেন বায়ে। মেজর ঘোবাল গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, ‘আপনি মশাই আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছেন। ওই তো আপনার পাঁচ-খাজাখিখানা।’

আহ, বরফ-বড়-পাঁচ-খাজাখিখানা। আমি যেন অতি নিকটে দেখতে পাচ্ছি, স্থবিস্তৃত এক তুবার শাদা উঠোন। তার ওপরে বিচিত্র রূপ করেকটি শূঁক, ধূসর আর সবুজ তাদের রঙ। কারোর শীর্ষই তীক্ষ্ণ না, যেন উঁচু বাড়ির মতো। স্পষ্টই তাদের ছায়া পড়েছে শাদা উঠোনের ওপর। আমি ওই উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, কল্পনা মাত্র একটা শিহরণ অল্পভব করলাম। এমন রূপে এঁকে আমি আর কোথাও থেকে দেখিনি। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে, জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তার দাঁড়িয়ে সেই একটি শীর্ষকে দেখা। এখন যে তার আপন মহিমায়, আবরণহীন বিশাল। চোখ ফেরাতে পারলাম না।

‘ওইখানেই সে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। পান্না সবুজ কেশর কোলানো তুবার সিংহ।’ মেজর ঘোবাল বললেন।

কোথায়? কোথায় সেই তুবার সিংহ। আমি অপলক অহুসঙ্কিত চোখে

তাকিয়ে রইলাম। আমি ভুলে গেলাম সহযাত্রীদের। গাড়ি চলেছে, খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দীপ্ত এক তুষার সিংহ। প্রকৃতই তার পান্না রঙের কেশর কোলানো। ছুটি গাঢ় নীল গোলক চক্ষু। দৃষ্টি এদিকেই।

আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে একটি ডেউ খেলানো কালো পর্দা ভেসে উঠলো। পর্দা উড়ছে। তার ফাঁক দিয়ে ভেসে উঠলো ছুটি কালো উজ্জল তারা, রক্তিম ছুটি ঠোঁট। সিংহের পদতলে সর্বনাশীর চোখ নাকি? ঠোঁট ছুটি কাঁপলো। কিসকিন্স স্বর শুনতে পেলাম, ‘ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন নাকি?’

মুখ পিছনে নিয়ে গেলাম। কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জা পেলাম না। বললাম, ‘বলতে পারেন। আমি যেন একটা মহামুভবতার ছোয়া পাচ্ছি।’

‘আমাকে একটু দিন না।’ কুন্দনন্দিনী তেমনি কিসকিন্স করে বললেন।

বললাম, ‘বা আমার নয়, তা কেমন করে দেবো বলুন?’

কুন্দনন্দিনী অনায়াসে তাঁর একটি রৌদ্র রঙ হাত আমার বুক রাখলেন, বললেন, ‘ঠিক। কিন্তু আমি যে কৃত্রিমকাজ জানি না।’ তাঁর চোখের কাজল আবার চিক চিক করে উঠলো। জিঞ্জেস করলেন, ‘কী সেই মহামুভবতা, আমাকে একটু বলুন।’

আমার ভিতরে দ্বিধা আর সন্দেহ জাগলো, কিন্তু আবেগের আধিক্যটাই বেশি। বললাম, ‘তুষার চূড়ার এই বিরাটত্ব আর তার মহিমা আমার কাছে এক অপার রহস্যের মতো মনে হয়। ঈশ্বরের অশ্রুভূতি কী, আমি জানি না। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওই বিশালত্বের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে চাই। অথচ কেমন করে, তা জানি না। খুব আনন্দ পাচ্ছি, তবু কোথায় যেন একটা-একটা কী বাজে। আসলে, আমি বোধ হয় ওই পাহাড়কে কেবল পাহাড় ভাবতে পারি না, আরো কিছু। হয়তো কল্পনা, কিন্তু মনকে খুয়ে দেয়।’

‘মনের কী খুয়ে দেয়?’ কুন্দনন্দিনীর স্বর রুদ্ধ শোনালো।

বললাম, ‘নিশ্চয়ই মানি।’

‘মানি? কিসের মানি?’

‘কপটতা, ফাঁকি, তুচ্ছতা। এক কথায় বোধ হয়, ভিতরের অঙ্ককার।’

‘আপনার?’ কুন্দনন্দিনীর রুদ্ধ স্বরে বিস্ময়, ‘আপনার ভেতরে অঙ্ককার?’

আমি বললাম, ‘প্ৰলীভূত হয়ে আছে।’

কন্দনন্দিনীর চোখের কাজল জলে ভাসছে। বললেন, ‘আহু তাহলে আমি কী বলবো! এ সব কি মনের কুণি কাজ!’

‘মেটক-ছার্প, মেটক-ছার্প!’ মেজর ঘোষাল খুশির স্বরে বলে উঠলেন।

কন্দনন্দিনী আমার বুক থেকে হাত নামিয়ে নিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তার মানে কী?’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘রোদের বৃকে বৃষ্টি নামলে, আপনারা তাকে কী বলেন?’

আমি বললাম, ‘আমরা ভাবি শেয়ালের বিয়ে হচ্ছে।’

‘সিকিমে আলাদা কথা বলে।’ মেজর ঘোষাল বললেন, ‘কথাটা যদিও তির্যক, সিকিমীরাও তা-ই বলে। রোদের বৃকে যদি বৃষ্টি হয় আর আপনি তখন যদি সিকিমে প্রবেশ করেন তাকে বলে শুভ প্রবেশ। আপনি স্বাধীন হবেন। আমরা সিকিমের রাজধানীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।’

অবাক হয়ে বললাম, ‘কিন্তু রোদ আছে, বৃষ্টি তো নেই?’

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘আকাশে নেই, চোখে তো আছে। সেও বৃষ্টিই!’ বলে চোখের কোণে ভগ্নীর দিকে দেখলেন।

কন্দনন্দিনীর তৎক্ষণাৎ তার মুখ অগ্রজের কাঁধের কাছে গুঁজে দিয়ে রুদ্ধ স্বরে বললেন, ‘মেজদা!’

মেজর ঘোষাল বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে, ডান হাতে ভগ্নীর মাথায় হাত দিলেন। আমার চোখটাও যেন ঝাপসা হয়ে উঠলো।

‘সেদিন আমার বলেছিলে আমার সময় হয় নাই হয় নাই।’ আজ কী আর সেই কথাটি বলতে পারবে? কদাচ নহে। এখন আমার সময় নাই রে নাই। ব্যবস্থা সব পাকাপোক্ত। আইনের বেড়া জাল ছিদ্র করা গিয়েছে, এবার রঙনা। যাত্রা উত্তর সিকিম।

ইতিমধ্যে গ্যাংটকে কেটেছে তিন দিন। মেজর ঘোষালের পরিবারটি একটি স্বর্গ বিশেষ। ফোঁজী কর্তার গিন্নী যে এমন নিরস্ত্রমান শাস্ত আর একান্ত গৃহস্থ বধূরূপে প্রবাস যাপন করছেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বারো মাসে তাঁর তেরো পার্বণ। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা এবং সারাদিন উপবাস। ধান দুর্বার সংগ্রহ তো আছে বটেই। উলুধুনিও বাদ নেই। ননদের সিঁধা স্বর্গ হবার না পরিয়ে ছাড়েন না। এমন কি পায়ে আলতাও। মেজর সাহেব দেখি

মুখ টিপে হাসেন আর গৃহিণীর দিকে দ্রিষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখেন। আর ছেলেমেয়ে দুটিকে তো আমি পাহাড়ী ভেবেছিলাম। অমন তুলতুলে রাঙা গাল আর ঠোট, কালো মানিক চোখ, মাথা ভারতি চুল। ওদের গায়ে না মাথলে প্রাণ খা খা করে। ননদ কুন্দনন্দিনীর ভারি অস্ববিধে। লাল পানিতে চুমুক দিলেই বউদির শাসন শুরু হয়ে যায়। মাজা ছাড়াবার উপায় নেই। বেশ চিট্‌।

ইতিমধ্যে যাতনা যাহারে কর, লোক পরিচয়। তবে নিছক যাতনা বলবো না, অনেককেই ভালো লেগেছে। স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ায় বাঙালী ম্যানেজার এবং তাঁর পরিবার। বাঙালী একজন সাংবাদিকের ছোট নিবিড় সংসার। মনে একটা ধন্দ আর ঠেক লেগেছিল একদিন সকালে।

গ্যাংটকের বাজার এলাকা থেকে মেজর ঘোষালের ফোজী আবাস কিছু দূরে। গাড়ি আছে, অতএব যাতায়াতে অস্ববিধা নেই। বোজই দু'বেলা বাজার আর দোকানপাট এলাকায় গিয়েছি। মাড়োয়াড়ি নেই কোথায়? সোনাতাঁদির দোকান থেকে কাপড় ফটো মায় তরিতরকারি মুদীখানা, সব কিছুতেই তারা আছে। তিব্বতী মুসলমানের সাক্ষাৎ এখানেই পেলাম। তার আগে কলকাতায় পেয়েছি, দুটি ছাত্রী তরুণী, নার্গিস আর হাসিনা। মেজর ঘোষাল একদিন সকালে সেই তিব্বতী মুসলমান ভদ্রলোকের হোটেল প্রান্তরাশ খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। মোঁ মোঁ আর গরম চা। মোঁ মোঁ একটি উপাদেয় তিব্বতী খাদ্য। বলা যায় মাংসের পুর দেওয়া পিঠে। গন্ধ আর স্বাদ আমার কাছে চীনা চীনা। খাত্তর যোগাযোগ তো এদেশে ওদেশে আছেই।

মেজর ঘোষাল, আমি আর কুন্দনন্দিনী গিয়েছিলাম। মুসলমান ভদ্রলোক লম্বা সেলাম ঠুকলেন মেজরকে। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন আমায়। শুনেই ভদ্রলোক আমাকে ধ বানিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমার দুই মেয়ে কলকাতায় পড়াশোনা করছে। নার্গিস আর হাসিনা।'

বোঝ এবার, কোথাকার জল কোথায়। আমি সানন্দে ঘোষণা করলাম, তাঁর কন্ঠ্যবয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওতেই হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ গিন্নী এসে দ্রুত ভাষায় অনেক কিছু বলে গেলেন। তার মধ্যে আমি উদ্ধার করতে পারলাম, এঁদের ছয়টি কন্ঠ্য, পুত্র নেই। নার্গিস আর হাসিনা কলকাতায় শর্টহাও থেকে সেক্রেটারিশিপ্‌ সব কিছু রপ্ত করছে। এবার আরো দুই মেয়ে যাবে।

সবই ভালো। কিন্তু অজ্ঞ এক টেবিল থেকে অনেকক্ষণ ধরেই দুজন

আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন। তাদের মধ্যে একজন খাটি পাহাড়ী। কো
ব' বক্কু সিকিমদের জাতীয় পোশাক, সেই গাউন পরা সে নয়। খাটি
বিলিতি পোশাক, মাথার টুপিটা অবিশিষ্ট পাহাড়ী। তার পাশে একজন বয়স্ক
ভদ্রলোক। গৌক দাড়ি কামানো স্টেড বুটেড স্বকমকে চোহারা। মাথায়
কাপ। সমতলের লোক নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর চোখ একটা বিভীষিকার সৃষ্টি
করেছে। চশমার আড়ালে বা চোখটি অতিকায়, ডান চোখটি স্বাভাবিক, তাও
কাঁচটা কিঞ্চিৎ ঘষা। বিভীষিকা মনে হতো না, তিনি যদি না বারে বারেই
আমার দিকে তাকিয়ে দেখতেন।

কুন্দনন্দিনী তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'সিকিমে আসবার আগেই
সিকিমের নাগিস হাসিনাকে শেয়েছিলেন?'

পাওয়া বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলাম, 'নিতান্তই ঘটনা-
চক্রে আলাপ।'

'সেই ঘটনাচক্রে সোঁর্গটাই শোনবার ইচ্ছা রইলো।' কুন্দনন্দিনী একটু
চোখের পাতা কাঁপিয়ে বলেছিলেন, 'মেয়েদের একটা ব্যাপার আছে জানেন
তো? নিজেদের নিয়ে বড় সজাগ। এখন আপনি কোন্ নাগিস হাসিনার
চিন্তায় মশগুল থাকবেন সেটা আমার মোটেই সহ হবে না।'

বলেছিলাম, 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি এখন একজনকে নিয়েই
মশগুল আছি।'

কুন্দনন্দিনী ষাড় একটু হেলিয়ে চোখের পাতা নিবিড় করে বলেছিলেন,
'আমার এত সৌভাগ্য?'

আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করতে উত্তত হতেই আমাকে হাত তুলে নিরস্ত
করে বলেছিলেন, 'জানি জানি, আপনি আমাকে নিয়ে মশগুল নন। বলেই
একটু স্থখ পেতে চেয়েছিলাম। আপনি এখন তুবার সিংহ নিয়ে মশগুল
আছেন, এই তো?'

'এবং এক সর্বনামীকে নিয়ে।' আমি ঠোট টিপে হেসে বলেছিলাম।

কুন্দনন্দিনী জ্রুটি অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন,
'সর্বনামী সে কে?'

বলেছিলাম, 'ভিত্তা।'

'ওহু, তাই বলুন।' কুন্দনন্দিনী নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'ভবীৎ তন্ত্র
ধরিয়ে দিয়েছিলেন।'

আমি না বলে পারিনি, 'অবিশিষ্ট আর একজনকেও মাঝে মাঝে আমার

সর্বনাশী মনে হয়েছে। তবে তাঁর মধ্যে আমি আত্মসংহারের ছায়া দেখেছি, আমি ভয় পেরেছি।’

কুন্দনন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অশ্রুমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, ‘আত্মসংহার? কিন্তু তার আত্মনাশ অনেক আগেই হয়ে গেছে।’

আমি বলেছিলাম, ‘যিনি নিজেকে বলেন, তাঁর আত্মনাশ হয়ে গেছে, সেখানে একটু সন্দেহ থেকে যায়। যার আত্মনাশ হয়ে যায়, সে কি তা জানতে পারে?’

কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, ‘পারে বই কি। আত্মা যদি আমার ইহকাল আর পরকাল হয়, তবে ও দুটোই আমি খেয়ে বসে আছি।’

তাঁর কথার মধ্যে বিজ্রপের কথাখাত ছিল, কিন্তু যন্ত্রণার জ্বালাটুকু একেবারে অধরা থাকেনি।

বলেছিলাম, ‘কোনো কোনো মতে, আত্মা অবিনাশী। তার কোনো ক্ষয় নেই।’

‘যুরে ফিরে সেই আপনার ইটারনিটি।’ কুন্দনন্দিনী হেসে উঠে বলেছিলেন, ‘তারপরে নিশ্চয়ই বলবেন, এমন মানব জমিন রইল পতিত।’

বলেছিলাম ‘ওগুলো ঠিক বলবার কথা না, কিছু কিছু বিশ্বাসের কথা। আর মানব জমিনের কথা যেটা, সেটা তো খেদের কথা। কেন যেন মনে হয়, ওটা আপনারও আছে।’

‘নেই নেই নেই।’ কুন্দনন্দিনী মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলেন, ‘আমার যদি খেদ থাকতো, তাহলে আপনার মতো আমিও ভাবতাম। কেন খেদ, কিসের খেদ? আমি জানি না। আপনাদের ওই সব আত্ম-টাত্মা যদি অবিনাশীও হয়, তাহলে আমার সেই আত্মার মেরামতির আর কোনো উপায় নেই। অক্ষয় হলেও, সেটা এখন তাল তোবড়া পচা একটা জিনিস।’ কথাগুলো বলতে বলতে কুন্দনন্দিনীর সকালের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাঁর নাসারক্ত কাঁপছিল। চোখে যন্ত্রণার আভাস।

আমি দেখছিলাম, হোটেল ‘সবুজ আবাস’-এর ডাইনিং হলের আবহাওয়া পালটে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্ত বলেছিলাম, ‘সেই আত্মাটিকে সন্ধান করে দেখবো। আপাতত আপনি ওই ভদ্রলোককে দেখুন, উনি কেন আমার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছেন। ঠুকে চেনেন?’

কুন্দনন্দিনী সেই ছ’রকম চোখ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তখন নিজের টেবিল থেকে মেজর বোবালকে দু-একটা কথা বলছিলেন।

মেজর ঘোষাল অনেকের সঙ্গেই দু-একটা কথা বলি দিচ্ছিলেন। কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, 'বোধ হয় চিনি, মেজর সঙ্গ পরিচয় আছে। উনি সি বি আই-এর লোক।'

সি বি আই! সর্বনাশ। সেই জন্তই কি তাঁর একটি চোখ অতিকায় আর একটি তুলনায় স্বাভাৱিক ছোট আর ঝাপসা? কিন্তু উনি আমার দিকে এমন ঘন ঘন তাকিয়ে দেখছিলেন কেন? এই কথা ভাববার মূহুর্তেই পাহাড়ী যুবকটি তার মাথার টুপি খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমার চোখের ওপর থেকে যেন একটা পর্দা ঝটিতি সরে গিয়েছিল। এ কি, এ যে অত্যন্ত চেনা মুখ? টুপির জন্ত চেনা যাচ্ছিল না। সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলাম, 'টোম্বে! তুমি এখানে?'

টোম্বে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল। আমার হাত ধরেছিল। পুরো কেতায় মাথা ঝুঁকিয়ে মেজর আর কুন্দনন্দিনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেছিল, 'দেখছিলাম চিনতে পারো কী না। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে এলে?'

এই টোম্বে'র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আগের বছর শিলিগুড়িতে। আমার এক বন্ধু বাদলরাজ সিন্হা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দুজনেই এক সময়ে সিকিমে নতুন রাস্তা তৈরির সাময়িক কন্ট্রাক্টর ছিল। টোম্বে আমাকে প্রথম তার দেশে বেড়াতে আসতে বলেছিল। সে একজন লেপ্‌চা। সে বলেছিল, 'তুমি আমাকে চিনতে পারোনি, আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম দর্শনেই চিনেছিলাম।'

বলা বাহুল্য, কথাবার্তা ইংরেজিতেই চলছিল। আমি বলেছিলাম, 'তোমার মাথার টুপির জন্ত চিনতে পারিনি।'

টোম্বে বলেছিল, 'তুমি তাহলে উত্তর সিকিম' যাচ্ছে?'

'তুমি কী করে জানলে?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

টোম্বে হেসে ওর টেবিলের দিকে ইশারা করে বলেছিল, 'মি: বহুর কাছে শুনেছিলাম। উনি একজন সি বি আই অফিসার, এখানে একটা তদন্ত এসেছেন। এসো না একবার আমাদের টেবিলে, উনি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।'

আমার সঙ্গে? সি বি আই অফিসার? কেন? বাধে ছুঁলে তো আঠারো ঘা মারবে। এঁরা ছুঁলে কতো বা? আমি মেজর ঘোষালের দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন, ‘ধান না, শুনে আশ্বন কী বলছেন? তবে আপনার নর্থ সিকিমে যাবার ব্যাপারটা উনি বোধ হয় পলেটিকাল অফিসারের অফিসে শুনে থাকবেন।’

তবু তো সেই কিছু থেকেই যাচ্ছিল। কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, ‘সে রকম কিছু হলে আপনাকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে আসবো।’

আমি টোম্বের সঙ্গে তার টেবিলে গিয়েছিলাম। মিঃ বহু, সি বি আই অফিসার মাথা থেকে টুপি খুলতেই একটি সূচিক্তর টাক বেরিয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন, ‘বহু। আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম বোধ হয়।’

কিছুমাত্র না, বরং আতঙ্কিত করেছেন। তাড়াতাড়ি যা বলবার বলুন। আমি বসে বলেছিলাম, ‘না না, বিরক্ত কিসের?’

‘একজন স্ত্রীর মহিলার পাশ থেকে তুলে নিয়ে এলাম।’ মিঃ বহু হেসে বলেছিলেন, ‘আপনাকে কিছু আমি চিনি।’

চেনেন। কোন্ স্ত্রী? রক্ষা করো হে তুষার সিংহ। জয় কান-ছেন-জোং-গা! বলেছিলাম, ‘তাই নাকি? কী ভাবে বলুন তো?’

‘আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আপনার মফস্বল শহরের থানার অফিসারের মাধ্যমে।’ মিঃ বহু বলেছিলেন। তারপর তিনি আমার আসল ঠিকানা মফস্বল শহরের নামটিও বলেছিলেন।

থানার অফিসারের মাধ্যমে? ব্যাপারটা ঘোরাগোরা হয়ে উঠেছিল। কিছু স্ত্রীটা কী? মিঃ বহু বলেছিলেন, ‘আপনারা লেখক মাহুদ, খুবই ব্যস্ত, তাই মনে করতে পারছেন না। আমি আপনাদের থানায় মাস ছয়েক ছিলাম। আপনাকে অনেকবারই দেখেছি। গতকাল শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ করা যাক।’

আলাপ! শুধু আলাপই তো? সেটাই রক্ষে। আসলে মিঃ বহু মাহুদটি বিশেষ সদাশয় ভদ্র। আলাপ করে বুঝেছিলাম। রসিকও বটে। বিপত্নীক। কল্পার বিয়ে দিয়েছেন। একটিমাত্র ছেলে কলেজে পড়ছে। আর এক কন্যা বিবাহযোগ্য। নিতান্ত ঘরোয়া কথাবার্তা বলেছিলেন। জানাতে ভালেননি, মেজর ঘোষালের উত্তোপ না হলে নিষিদ্ধ উত্তর সিকিমে আমার যাওয়া হতো না।

আরো একটি জায়গার কথা না বললে, উত্তর সিকিমের কথা বলা যাবে না। তা হলো ভারতীয় সামরিক ব্যারাক স্বত্তিক। স্বত্তিকের অফিসারস্ মেস-এ গিয়েছিলাম মেজর ঘোষালের সঙ্গে। আলাপ হয়েছিল অনেকের

সঙ্গে। ক্যাপটেন বাহু একজন উজ্জ্বল যুবক, অবিবাহিত। অফিসারস্ মেস্-এর তিনিই তত্ত্বাবধায়ক। থাকেনও মেস্-এর পাশেই একটি ঘরে। আসলে তিনি স্বস্তিক সামরিক বাহিনীরই একজন ক্যাপটেন।

স্বস্তিক মেস্টি একটি পাহাড়ের চূড়ায়। ওঠবার আর নামবার সময় ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এমন খাড়া আর ঝাড়া আর সরু মৃত্যুবীক পাহাড় চূড়ায় আগে কখনো উঠিনি। ওঠবার আগে মেজর খোবাল জোড়ার ডাইভারের মুখ শুঁকে দেখে নিতেন, মত্তপান করেছে কী না। নেমে এসে ডাইভারকে আস্ত একটি মদের পাইট পুরস্কার দিতেন।

কুন্দনন্দিনীকে দেখেছিলাম, তিনি স্বস্তিকের অফিসারস্ মেসের ক্লাব ক্রমে মহারাণী। যুবক অফিসারদের চোখের মণি। মধুপায়ী ভ্রমরের মতো সকলেরই তাঁর চায়পাশে গুঞ্জন করতো। তিনিও যথাযথ ভূমিকা পালন করতেন। ক্লাবে খাওয়া-ই মিলুক, পানীয় যেন ভিস্তার স্রোতকেও হার মানায়। কুন্দনন্দিনীর হাত থেকে পানপাত্র নামতে দেখিনি। মহিলা আরো ছিলেন, সকলেই ফোজী গিন্নী। কম বেশি পানীয় সকলেরই চলে। দিগন্তে ছড়িয়ে যাওয়া স্টিরিও রেকর্ড প্রেয়ারের বাজনার সঙ্গে নৃত্যের আসর যোজাই জমতো সন্ধ্যার পরে। কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। তাঁরই ক্লাস্তি ছিল না। তিনি নৃত্যপটিন্দীও বটেন। যাহার নাম পাশ্চাত্যের নৃত্য-কলা। তিনি আমাকে রেহাই দিতে চাননি। কিন্তু ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। যেটুকু বা আয়ত্তে ছিল, প্রকাশ করবার মতো সাহস ছিল না। উপভোগ করেছি।

কুন্দনন্দিনী আমাকে বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করে নিজেকে এদের কাছে বিলিয়ে দিই, কিন্তু কী আছে আমার বিলিয়ে দেবার? কিছু নেই।'

তবু দেখছি এক অর্ধে তিনি বিলিয়েছেন। বাজনার ঝংকার, সুরার ফোয়ারা, উদ্‌দাম নাচ, স্বস্তিকের সেই পাহাড় শীর্ষে যেন এক আদিম রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আদিমতা প্রচণ্ড হয়ে উঠতো সকলের রক্তে রক্তে। গাঢ় আলিঙ্গনের নিবিড় ঘনত্বে, চুষন একটি সামান্ত হিল্লোল মাত্র। কুন্দনন্দিনী ক্লাব ঘরের কাঁচের দরজা জানালা বনবনিয়ে তুলতেন হাসির কল-ঝোলে। আমার মনে হতো, ভিস্তার চল নামার গর্জন শুনেতে পাচ্ছি। তাঁর আরক্ত চোখের দৃষ্টি থাকতো চক্কল অস্থির। মাঝে মাঝে আমাকে অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন, 'লেখক, মৃত্যুর রূপ কেমন আপনি জানেন?' অথবা, 'আপনি কিছুই জানেন না। আপনার লেখায় মৃত্যুতে কেবল শোক। স্বপ্নের কথা

নেই।’ কখনো বা, ‘কী আপনার সেই ইটারনিটি? মাদ্রাসাতা আমলের মানব জমিনের পতিত উদ্ধার? আহুন আমার সঙ্গে কৃষিকাজ করবেন। আপনি তো মশাই আমল কৃষিকাজই জানেন না।’...যখন সেখান থেকে মেজরের কোয়াটারে নেমে আসা হতো, তখন তিনি সম্পূর্ণ অট্টোভ, স্থলিত তাঁর বসন, অকরাগে স্থায়ী গ্রানি। মেজর ঘোষাল আর তাঁর স্ত্রী ধরাধরি করে শুইয়ে দিতেন। খাওয়ানো যেতো না। মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, ‘যাবো না যাবো না, কখনো না।’ কাদতেও দেখেছি। কাদতে কাদতে নিজের আঁচলে চুশন করতেন। কাকে সেই চুশন, কার উদ্দেশ্যে? নিজের গায়ের আঁচল টেনে সেই চুশন কি নিজের সন্তানকে, যে আছে সর্বক্ষণ তাঁর অবচেতন জুড়ে।

মেজর ঘোষালের কাছে ইতিমধ্যে যেটুকু শুনেছিলাম, তা হলো এক পুরনো কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে আপস্টার্ট, সেই সমাজের একটি অনিবার্য করণ সমাচার। শ্রীযুক্ত মুখার্জির ভূঁইকোড় আত্মপ্রকাশের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃসহ ভূমিকা। কুন্দনন্দিনী প্রথমে যা খেলা বলে খেলেছিলেন, খেলতে খেলতেই একদিন তা তাঁর গলার ফাঁস হয়ে উঠেছিল। সেটা অহু-ভূতির বিষয়। কারণ, কোনো কোনো খেলা যে গলার ফাঁস, এ অহুভূতিটা অনেকের চিতার শেষ শয্যায় শুয়েও ঘটে না। আমার নিজেরই কি সম্যক ঘটে? নিজের প্রতি তেমন ভরসা নেই। যে আচরণই করি, যা-ই বলি, নিজের ভিতরের পতিত জমির নিঃফল বিড়ম্বনার আভাস মাঝে মাঝে পাই। সেই তুলনায় কুন্দনন্দিনীর অহুভূতি অনেক বেশি খাঁটি। তীব্রতার জ্বালাও, অতএব অনেক প্রখর। তাঁর আচরণগুলো, এই প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি। যে বয়স্করা পাগলকে ঢিল ছোঁড়ে, তারা কুন্দনন্দিনীকে দুর্নীতির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। সমালোচকরা কোনোদিনই তাদের চোখের পিচুটি দেখতে পায় না।

কিন্তু থাক এ সব বিশ্লেষণ। আমি মেজর ঘোষালের কথা থেকে কুন্দনন্দিনীকে যেটুকু বুঝেছি, তা হলো, সেই মর্যাদিক অহুভূতি সত্ত্বেও তিনি অনেকখানি নিচে গড়িয়ে নেমে এসেছিলেন। এখন একদিকে যেমন বিদ্রোহ, অন্য দিকে তেমনি প্রচণ্ড প্রাণের মুখে, ভয়ংকর আবর্ত। শ্রীযুক্ত মুখার্জি তাঁর নিজের অধিকারকে আর প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না, কুন্দনন্দিনীর দরজা বন্ধ। মাঝে একটি সেতু—একটি শিশু। কুন্দনন্দিনীর মাতৃস্বপ্নও কঠিন জটিলতার আবর্তে অহুহ।

মেজর ঘোষাল আমাকে বলেছেন, ‘আমাদের পাঁচ ভাইয়ের ও একটি মাত্র বোন। দার্জিলিং-এ ও যার কাছে যেতে চেয়েছিল, সে আমাদের ছোট ভাই।

গোলমাল কোথায় জানেন ? বরেন (মিঃ মুখার্জি) একদিকে নির্বিচারে নিজের উন্নতি সাধন করে গেছে, অন্য দিকে মিস্টিকে ছাড়া ওর আর কেউ নেই ।’

মেজর গিন্নীর ঘোরতর প্রতিবাদ, ‘এ সব মিথ্যা । বরেনের ওটা একটা ধোঁকা । আসলে ঠাকুরঝিকে তার চাই-ই চাই । কিন্তু এ ভাবে আর ঠাকুরঝির জীবন নষ্ট করতে দেওয়া যায় না ।’

আমি কোনো মন্তব্যই করতে পারিনি । করা সম্ভবও ছিল না । কুন্দনন্দিনীর আস্তাকুড়ের কথা আমার মনে হয়েছিল । তাঁকে যেন আমি কিঞ্চিৎ চিনতে পেরেছিলাম ।

হুয়ারে দাঁড়িয়ে গাড়ি, নাম জোড়া জীপ । যাত্রীর তালিকায় কর্নেল সিপ্পি, লীমতী সিপ্পি । কর্নেল এসেছেন শিলিগুড়ি থেকে, উদ্দেশ্য বেড়ানো । সুযোগটা ছাড়লেন না । ড্রাইভার ছাড়া আমরা তিনজন । কর্নেল এবং তাঁর স্ত্রীকে সামনের আসন ছেড়ে দেওয়া হলো । কর্নেলের চেহারায় রোগা আর কিছুটা যেন রক্তশূণ্য । দৃষ্টি অস্বাভাবিক । মিসেস সিপ্পি তাঁর বিপরীত । ঋদ্ধ আর স্বাস্থ্যবতী মহিলা । রূপ আর স্বাস্থ্য দুই-ই কিছুটা উগ্র । নাকছাবির বদলে পরেছেন নথ, এটাই হালের চাল । কিন্তু প্রথম থেকেই কুন্দনন্দিনী প্রতি তাঁর দৃষ্টিতে বিরাগ । কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বেশি বাক্য বিনিময়েও যেন অকচিৎ ।

কেন ? দেবাঃ ন জানন্তি, আমি তো কোন্ ছার । সঙ্গে খাদ্যও কিছু উঠলো, সবই শুকনো । জীবন্ত কেবল গোটাকয়েক মুরগী । কেন, খাণ্ড-বর্জিত দেশে চলেছি নাকি ? মেজরের মুখে শুনেছি কোথাও প্রায় বাজার নেই । স্থানীয় অধিবাসীদের কাছেও কিছু পাওয়া যাবে না । সংগ্রহ রাখতেই হয় । আর পানীয় ? বোতলের সংখ্যা আমি গুণিনি । তবে বেশ কিছু কালো বেড়াল আর সবুজ হলুদ সিংহের বোতল উঠেছে । ত্র্যাণ্ডি পানিও বাদ যায়নি । আর কিছু শুধু । যাত্রার কথা ছিল সকাল সাতটায় । বাজলো আটটা । জোড়া জীপের হর্স পাওয়ার অনেক বেশি শুনেছি । আমার প্রাণের গতির থেকেও বেশি কী ? বোধ হয় না । আমি যে আর বইতে নারি । মেজর গিন্নীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করলেই তো আর হয় না । কুন্দনন্দিনী এখনো ফুটে উঠতে পারেননি । মেজর ঘোষালকে কয়েকবার ডাকাডাকি করতে হলো । ভাতবধুও কয়েকবার তাড়া দিলেন ।

বিলম্ব মাত্র দশ মিনিট। কুন্দনন্দিনী ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন। নীল-সুনীল গাছে হলুদ রাঙা কুন্দনন্দিনী। মাথার চুলকে শালন করার জন্তই বোধ হয় একটি নীল রেশমী রুমাল জড়িয়ে বেঁধেছেন। হাতে রাখা আঁচল লুটোজে। একটি ব্যাগও আছে বেশ বড়সড়ই। কী আছে ব্যাগে? ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে শতাব্দিক পানের খিলি, সেটা আগেই দেখেছি। আর এমন চোখ ধাঁধানো সাজ কিসের? যাচ্ছি তো দূরের উচু পাহাড়ে। সেখানে কার প্রাণে দাগা দেবার দরকার আছে? বেরিয়ে এসে বললেন, ‘মেজ বউদি, সেই পিংকি?’

বউদি তাড়াতাড়ি বাগানে নেমে গিয়ে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ কুড়ি তুলে এনে দিলেন। কুন্দনন্দিনী সেটি নিয়ে বললেন, ‘যাই।’

‘যাই নয়, এসো।’ বউদি বললেন, ‘একটা কি দুটো রাত তো, একটু ভালো হয়ে থেকো।’

কুন্দনন্দিনী তার কোনো জবাব না দিয়ে খোলা গেটের নিচে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। মেজর ঘোবাল গাড়ির ওপর থেকেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘ধর, দেখিস মাথা ঠোকে না ঘেন।’ বলে ভদ্রীকে তুলে নিলেন।

কুন্দনন্দিনী একবার সামনের দিকে দেখে বললেন, ‘আমরা ওখানটা পেলাম না?’

মেজর চোখ ইশারা করে বললেন, ‘আমাদের ব্যাপারটা বুঝিস তো। ওটা ঘেনে চলতে হয়। আমাদের আলর আমরা এখানেই জমিয়ে তুলবো। কী বলেন?’ বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, ‘নিশ্চয়।’ মনে মনে বললাম, ওগো তোমরা অরায় চলো, অরায় চলো।

কুন্দনন্দিনী চালকের আসনের পিছনেই আমার পাশে বসলেন। কর্নেল সিপ্পি মুখ ফিরিয়ে হেসে মুখ চোখে দেখলেন, ইংরেজিতে বললেন, ‘তা হলে আপনি আসতে পারলেন?’

কুন্দনন্দিনী হাসলেন। মিসেস সিপ্পিও ভদ্রতা করে একটু হাসলেন এবং কুন্দনন্দিনীর সাজখানি দেখে নিলেন অপাঙ্গে। ভদ্রতার দরকার আছে। শত হলেও মেজরের বাড়িতে এক টেবিলেই সবাইকে প্রাতঃরাশ খেতে হয়েছে। মেজর জীব দিকে একবার হাত নেড়ে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘রোশেনলাল, স্টার্ট।’

জোড়া গর্জন করে উঠলো। চলতে আরম্ভ করলো। কুন্দনন্দিনী বললেন, “দেখি, একটু এদিকে ফিরুন।”

আমাকেই বললেন। ঠুঁর দিকে ফিরে তাকালাম। ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘কোট গায়ে দেননি কেন? আজও সেই গলাবন্ধ সোয়েটার পরে বেরোলেন? ফুলটা গুঁজবো কোথায়?’

গোলাপ কুঁড়িটির কী রঙ? ফ্যাকাশে লাল না বলে গোলাপী বলাই বোধ হয় সম্ভব। ইংরেজিতে পিংক। কুন্দনন্দিনী আদর করে বলেছিলেন, পিংকি। তখন বুঝতে পারিনি, তিনি গোলাপ কুঁড়িটির কথা বলছেন। আর মেজর ঘোষালের পিংকিরা এক ঘণ্টা আগেই ইস্থলে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই পিংকি কি আমার জন্ম? মোটা গোছের সোয়েটার পরবার পরামর্শ আমাকে মেজর ঘোষালই দিয়েছিলেন। উনি নিজে চাপিয়েছেন এক ফোঁজী ধোকড়া জামা। উলের ওপর ওয়াটারপ্রুফ রবারের পলেক্সারায় সবুজ থাকি নানান রঙ। বলেছেন, দরকার হলে পরে আমাকেও ওরকম একটি দেবেন। কুন্দনন্দিনীকে বললাম, ‘আমাকে আবার এ সব কেন?’

‘অতিথির বিশেষ অভ্যর্থনা। আপনার স্বাস্থ্য আর মন যেন চিরদিন এমন পিংক থাকে।’ বলে তিনি আমার মোটা পশমী আবরণে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে, কুঁড়িটি গুঁজে দিলেন বাহিকের বুকে।

আমি মেজর ঘোষালের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। গোলাপি থাকবে আমার মন আর স্বাস্থ্য? কালকূটের? তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো। মিলেস সিপুপি একবার তাকিয়ে দেখে, ঠোট টিপে হাসলেন। ঝলক তাঁর নাকের নখে। ইচ্ছা করলো অভ্যর্থনার কথাটা ঠুঁকেই পাল্টে দিই। কিন্তু কথা বাড়াবো না। একটাই অবাধ লাগছে, দুই রমণীই পশমী পোশাক পরেননি। মেজর ঘোষাল বাইরের দিকে তাকিয়ে এক একটা জায়গার নাম বলছিলেন, মনে করে রাখা সম্ভব না। প্রত্যেকটি নামের মধ্যে এত বেশি অহুসার আর ঙ্-জাতীয় শব্দ, মনে হলো প্রায় চীন দেশের ওপর দিয়ে চলেছি। অবিশ্তি আগেই শোনা আছে এই ডেংজুঝাঙ প্রতিষ্ঠাতা একজন তিব্বতী ছিলেন। চীন আর কতো দূর। কেবল দেখতে পাচ্ছি না তিস্তাকে। পথ একটানা চড়াই উঠছে না, মাঝে মাঝে উৎরাই। কোনো গ্রামই চোখে পড়ছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঢালু ধানখেতের পাশের দু-একটি কুটির।

সিকিম যে প্রকৃত স্বথ, ধন আর যোদ্ধাতা খাজাঞ্চিখানার দেশ, গ্যাংটকে তা সারাদিন চোখ ভরে দেখেছি। সবটুকু না, যতোখানি পেয়েছিলাম কালিম্পং

থেকে আসবার পথে। গ্যাংটকে সারা দিন বেধেছি তার ছুটি চূড়া। তুষার ধবলে, নানা বেলায় নানা রঙের খেলা। কেন জানি না, উচ্চতম চূড়াটিকে কেবলই আমার মনে হয়েছে সদাজাগ্রত সতর্ক চক্ষু তুষার সিংহ। তাঁর একদিকে কতকগুলো খাঁজ কাটা। সেই কি তাঁর কেশর ?

পিছনে বসে মনটা যে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ না হচ্ছে, তা বলতে পারি না। যা দেখছি সবই পিছনের দৃশ্য। সামনের দৃশ্য দেখার অহুতুতি আর এক রকম। অস্বস্ত সেই সিংহের মূর্তি কিছুটা দেখতে পেতাম। এখন মনে হচ্ছে কেবল চড়াই উঠছি। চড়াইয়ের সঙ্গে চুলের-কাঁটা বাক ছাড়াও স্বগোল নখের পাকও কম নেই। জোড়ার এঞ্জিনের গর্জন যেন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মেজর ঘোষাল এক সময়ে ঘোষণা করলেন, ‘আমরা এখন বেশ উঁচুতে, এ জায়গার নাম মোরানগাং। এবান থেকে উংরাই নেমে আমরা তিস্তার কাছাকাছি যাবো। আর একটা কথা মনে রাখবেন, এটা হলো সিকিমের মহারানীর খাসমহল।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘রানীর খাসমহল মানে কী ? এটা কি রাজ্যের রাজত্ব না ?’

‘সেই হিসাবে সিকিম এখন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত দেশ।’ মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, ‘তবে আসলে এটা রানীর খাসমহল। প্রায় গোটা উত্তর সিকিম। রানীরাও এখানে যৌতুক পান, এ রাজত্বটি তাঁর বিয়ের যৌতুক। ছোগিয়াল নামগিয়েলের রানী তিব্বতের রয়েল ফ্যামিলির মেয়ে। রয়েল ফ্যামিলি দলতে বোঝায়, কোনো দলাইলামার পরিবারের মেয়ে। কারণ তাঁরাই লিভিং গড বা গড কিং।’

কুন্দনন্দিনী আমার হাঁটুর কাছে আঙুল দিয়ে ঝেং খোঁচা দিয়ে বললেন, ‘ব্যাপারটা যদি বুঝে থাকেন তবে এখন থেকেই সেবা শুরু করুন। আমাকে এক খিলি পান দিন।’

কিন্তু বোঝবার ব্যাপারটা কী ? মেজর ঘোষাল বড় একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ থেকে জলে ভেজানো কাপড়ের পুঁটলি বের করলেন। কাপড়ের মোড়কের ভিতরে রীতিমত সবুজ পল্লপাতার মোড়ক হুতো দিয়ে বাঁধা। হুতো খোলার পরে, মনোরম পানের খিলি। মেজর আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমার বিস্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ‘নি, পান দিন। বুঝলেন না, এটা রানীর খাসমহল। অতএব রানীর জাতের সেবা করুন।’

একে বলে রহস্য। কী বা পানের তরিবৎ। সেবায় তো লাগতেই চাই। শিংকির অভ্যর্থনার জবাব চাই না? একটি পানের খিলি হাতে ভুলে নিতেই কুন্দনন্দিনী বলে উঠলেন, 'দয়া করে লবঙ্গটি খুলে দিন।'

নেহাত আমার রঙ কালো, অলুখায় লালিয়ে যেতাম। তবে আমিও রানীর সেবকের মতোই, বাঁ হাতে ডান হাত ধরে লবঙ্গটি খুলে নিয়ে পানের খিলিটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কুন্দনন্দিনী বললেন, 'জয় হোক।' বলেই হেসে উঠলেন, পান নিলেন। তারপরে যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ও কি, আমার লবঙ্গ আমাকে দিন, ওটিতে আমারই একমাত্র অধিকার।'

আমি আর একবার প্রাণের ভিতরে বেগুনী হলাম। লবঙ্গটি বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে। তিনি সেটি নিয়ে মুঠোয় করে রাখলেন। মেজর ঘোষাল 'মিষ্টি' বলে ডেকে, পানের খিলি দেখিয়ে সামনের আসনের দিকে ইশারা করে দেখালেন। কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে বললেন, 'কর্নেল সিপ্পি, মিসেস সিপ্পি, আপনাদের কি পান চলবে?'

সিদ্ধি দম্পতী উভয়েই মোলায়েম করে ধন্যবাদ জানিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি কর্নেল একবারো সিগারেট খাননি। মেজর ঘোষাল অফার করেছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন, ধূমপান করেন না। এমন কৌজী অফিসার কম দেখা যায়। কুন্দনন্দিনী তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে জরদার কোঁটো বের করে, এক চিমটি মুখে দিলেন। গাড়ি ইতিমধ্যে নিচের দিকেই একেবেকে নামতে আরম্ভ করেছে।

কর্নেল পিছন ফিরে ইংরেজিতে জিজ্ঞাস করলেন, 'এখানে কি কোথাও নামা থাকে?'

মেজর বললেন, 'নিশ্চয়ই। এ জায়গার নাম সান্গম্। রোশেনলাল, জেব্বা ঠারনা।'

গাড়ি দাঁড়ালো বাদিক ঘেঁষে। প্রথম স্রুযোগেই নামলাম। পথ চলে গিয়েছে পূব-উত্তরে। পশ্চিম-উত্তরে তাকিয়ে আমি চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। চোখ কেব্রাতে পারলাম না। মনে হলো আকাশের বৃকে আ মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সব পবিত্র চূড়া। সামনের রঙ নীল, উত্তর পাশে শাদা। সামনে বিশাল তুষার প্রাক্ষণ, যেন ঠাকুরদালানের উঠোন। এ আর এক নতুন রূপ। জগৎশ্রুতি কে, জানি না। তাঁকে জিজ্ঞাস করতে ইচ্ছা করে, এমন বাসনা যদি দ্বিগ্নেছিলে তবে জুঁথানি পাখা কেন আমাকে দাওনি? সেই গানের মতো বলতে ইচ্ছা করে, পাখি যদি হইতাম সখী, উড়ালে বাইতাম নাগর কে লে।

কিন্তু আমার সামনে যিনি বা ঠাণ্ডা, তাঁরা কেউ আমার সখী নন। তাঁরা আমার অহুতবের স্বথ, হৃদয়ের সম্পদ, প্রাণের মোক্ষ। কেন বাথা বাজে প্রাণে, তবু হাসিতে ভরে উঠছে মন। আমার দু'হাত উঠে এলো বৃকের কাছে। নত আমার প্রাণ। কে যেন ভিতর থেকে নমস্কার করেছে বায়ংবার। একে যদি তোমরা আত্মসম্মোহন বলতে চাও, বলো। আমি শৃঙ্গারী ন। আমি প্রতিমা দর্শন করছি। এ রূপের আর এক নাম অনির্বচনীয়।

‘শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?’ আমার পাশ থেকে মেজর বলে উঠলেন।

আমি চমকিয়ে তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ শব্দ পেলাম, যেন দূর সমুদ্রের কলরোল ভেসে আসছে। কিসের শব্দ, কোথা থেকে আসে? মেজর হাত দিয়ে দেখালেন, ‘ওই দেখুন তিস্তা।’

তাঁর হাতের লক্ষ্যে তাকিয়ে দেখি, বহু নিচে একটি ক্ষীণ রেখা পূর্ব ঠাঁকের আড়ালে চলে গিয়েছে। সিংতামের পরে, এই আমার প্রথম দেখা। গভীর নিচে তো বটেই, দূরত্ব নিশ্চয় কয়েক মাইল। কিন্তু শব্দ বাজছে যেন আমার শ্রবণের অতি নিকটে। মেজর বললেন, ‘তিস্তা আমাদের সঙ্গেই আছে, দূরে দূরে। যতো এগিয়ে যাবো, সে আমাদের কাছে আসবে।’

যতো এগিয়ে যাবো, ততোই তাঁর আতুড়ঘরের দিকে। এখনই দেখে মনে হচ্ছে, তুবার সিংহের পদতলে সে বইছে। কুন্দনন্দিনী আমার এক পাশে এসে দাঁড়ালেন। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এমন মুগ্ধ চোখে কী দেখছেন?’

বললাম, ‘বলে বোঝাতে পারবো না।’

‘লেখক হয়ে?’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আপনাদের তো কথাশিল্পী বলে।’

আমি বললাম, ‘কথাও কোনো কোনো সময় হারায়, কথার যেখানে শেষ।’

‘তা ঠিক।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আমার দিকে কেউ এমন করে শুকালে তাকে আর কিছু বলতে হতো না। কথা তখন শেষ।’ বলে তিনি একটু হাসলেন।

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকালেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। তাঁর মুখে কি রক্তের ঝলক লাগলো? তিনি আবার চোখ ফিরিয়ে আমার বৃকের শিংকিটি দেখলেন, হাত বাড়িয়ে ফুলটি আর একটু ভিতরে গুঁজে দিলেন। তাঁর ভাবার আবছায়ার মধ্যে প্রকৃত কথাটি পড়তে আমার অস্বীকা হয়নি। মুগ্ধকে তিনি বর দিতেন হয় তো, বা কথা নয়। কথার অধিক রমণীয় সকল রমণীয়তা। তাঁর রমণীয়তা শরীরের ভাণ্ডে

নানাভাবে পরিত্রিত। সম্ভবত সকল পুরুষেরই আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঘিরে আছে। কিন্তু গরীব আমার প্রাণ। আমি অস্ত্র স্থায় ফিরি।

কর্নেল ডাকলেন, 'এবার চলা থাক।'।

আমরা সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমি পিছনের একেবারে ধারে গিয়ে মাথার ওপরে লোহার বড ধরে ঝুঁকে পড়ে সেই বিশাল ঠাকুরদালানের প্রাক্কণকে দেখতে লাগলাম। যার অকোশখোলা দালানে বিগ্রহরা দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে।

'আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখবো নাকি?' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'বড় ভয় লাগছে। পড়ে যান যদি?'

বললাম, 'পড়বো না।'

কিন্তু একটা বড় আর মুতাব্বাক নিতেই ঠাকুরদালান হারিয়ে গেল। চোখের সামনে নিবিড় বন পাহাড়। কুন্দনন্দিনী বড় ব্যাগ খুলে তার ভিতর থেকে বের করলেন ঝকঝকে কালো বেড়ালের লাল বোতল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনই?'

'হাত পা এলিয়ে আসছে।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'গেলাসগুলো আর জলের বোতল বের করে দাও।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলো। আমরা পেছন থেকে চমকে সামনের দিকে তাকালাম। দেখলাম, কর্নেল সিপ্পি গাড়ির বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। পিছন থেকে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে আছেন মিসেস। কর্নেলের সমস্ত শরীরে ঢেউ দিল, গলায় বিকৃত শব্দ। তিনি বমি করছেন। মেজর তৎক্ষণাৎ নেমে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে স্যার।'

কর্নেল বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেজরের হাত ধরে নিচে নামলেন। মিসেস সিপ্পিও নেমে গেলেন। কুন্দনন্দিনী নিচু স্বরে বললেন, 'মন্দ বড় তেজী। কর্নেল মানুষ এত অল্পেতেই কাবু?'

বললাম, 'পাহাড়ী পথে চালাটা বোধ হয় সহ হয় না।'

'সেটা আমার আপনার বলা চলে, একজন কর্নেলের কি বলা চলে?'

'কোনো কারণে হয়তো পেটের গেলমাল ছিল, তার জগুও হতে পারে।'

'তবু নেহাত যুক্তিসঙ্গে না, এই যা।' বলে তিনি হেসে উঠতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিলেন।

বললাম, 'আমি অসুস্থ হলে যেন এ স্বকম হাসবেন না।'

‘কোলে শুইছে রেখে সেবা করবো।’ কুন্দনন্দিনী বললেন; ‘আপনি আমাদের অতিথি, তার আবার কালকূট।’

তা বলে কোলে করে? বিজ্ঞপ নাকি? গরীবকে এত হেনস্থা কেন? বললাম, ‘এতটা দাবী নেই।’

‘আপনার’ কথা কে বলছে। আমি আমার দাবীর কথা বলছি।’ বলেই তিনি বোতলের ছিপি খুলে গলায় ঢাললেন।

আমি চমকিয়ে উঠলাম। কালো বেড়ালের কাঁচা রক্ত। জল বা অল্প কিছু না মিশিয়েই? কখনই বা ছিপিটি খুললেন। বাইরে তখন কর্নেল শব্দে বমন করে চলেছেন। আমাদের একবার নামা উচিত। বললাম, ‘একেবারে এ ভাবে খাচ্ছেন?’

‘সত্যিকারের স্বাদটা পাওয়া যায়।’ কুন্দনন্দিনী কয়েকবার চোক গিলে বললেন, ‘কোথা দিয়ে কেমন করে নামছে, সেটাও টের পাওয়া যায়। গলায় আর বুকে যে জ্বালাটা লাগে, সেটা একটা বাড়তি স্বাদ। চেষ্টা করে দেখুন না।’ বলে বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জ্বালা হলো বাড়তি স্বাদ। তাঁর জীবন বৃত্তান্তের সামান্য দু-একটি কথা আমার মনে পড়লো। এ ক’দিনের অবসরে মেজর ঘোষালের কাছ থেকে যা শুনেছি। কেমন করে অস্বীকার করবো আপাতদৃষ্টিতে যে রমণীকে দেখছি রঙ্গিনী, সত্যিকারের ক্লাবে প্রায় শৈরিনী, বেশভূষা অঙ্গুরাণে আর প্রসাধনে বিলাসিনী, হাস্তে লাস্তে মদিরেক্ষণা, তার জন্ত আমার প্রাণে কোথায় যেন একটা মমতাবোধ জেগে উঠেছে। শৈরিনীর কি কোনো অশুশোচনার জ্বালা থাকে? কুন্দনন্দিনীর জ্বালাও আমি অনুভব করেছি, তাঁর কোনো কোনো কথায়, মন্ত ঘোরের ভাষায়।

আমি তাঁর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বললাম, ‘পথ চলার জন্ত বেশ কিছু জলের বোতল আনা হয়েছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিচে থেকে এসে আপনাকে নিজের হাতে গলাসে ঢেলে দেবো।’

‘রানীর সেবা করবেন?’ কুন্দনন্দিনী হেসে উঠে বললেন, ‘কিন্তু নিচে যাবেন কেন?’

বললাম, ‘যাওয়া দরকার, নইলে একটু দৃষ্টিকটু দেখায়।’

‘হুড়ক্সা-লিপ্পির চোখে?’ কুন্দনন্দিনী ভুরু লতিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, ‘আর্মো না। আমরা সহযাত্রী তো।’ বলে আমি বোতলটা ব্যাগের

মধ্যে রাখলাম। নামতে উঠতে হতেই শুনে পেলাম, ‘ভাইনীর হাতে ছেলে
সঁপে দিয়ে গেলেন? বোস্তল-রেখে যাচ্ছেন?’

গাড়ির পিছন দিয়ে নেমে বললাম, জননীকেই দিয়ে গেলাম। ছেলে তো
একটা নেই, আরো আছে।’ বলে আমি হেসে এগিয়ে গেলাম।

কর্নেল রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে, মাথা নামিয়ে তখনো
বসি করছেন। মিসেস সিপ্পি তাঁকে ধরে আছেন। মেজরের মুখ বিমর্ষ,
বললেন, ‘ব্যাপারটা সুবিধার বুঝি না। এর পরে আরো উঁচুতে উঠতে হবে,
কর্নেল সামলাতে পারলে হয়।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন, ঠিক কি ব্রিটিশ ট্রাবল হচ্ছে?’

‘না, মাথা ঝুলে রয়েছে।’ মেজর বললেন, ‘কিন্তু ঠিক রক্তচাপের অবস্থা
তো আমার জানা নেই। তা ছাড়া গাড়ি চললেই ঠিক ভিটিং-টেন্ডেন্সি হবে।
এর জন্য আমি ওষুধ নিয়ে এসেছি। এখন তা দেবো। কিন্তু কারবার হাইটে
ঠিক বোধ হয় যাওয়া হবে না।’

কর্নেলকে ধরে মিসেস একদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এক জায়গায়
পাথরের কাটল দিয়ে জলের ধারা গড়াচ্ছে। সেখানে জল দিয়ে কর্নেল মুখ
ধুলেন, মাথায় ঝড়ে গলায় দিলেন। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, ‘স্বাঃ, আপনি
কি আরো এগোতে চান?’

‘চাই মেজর বোম্বাল, যতোটা পারা যায়।’ কর্নেল বললেন, ‘তবে আমি
পেছনে শুয়ে যেতে পারলে ভালো হয়।’

মেজর বললেন, ‘নিশ্চয়ই। আমার বোন-আর অতিথি সামনে বসবেন,
আপনি আসুন। আপনাকে আমি সাময়িক রিলিফের জন্য ওষুধ দিচ্ছি। এখান
থেকে আরো কিছুটা গেলে মাংগান বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে একটা
ডিসপেনসারি আছে।’

মিসেস সিপ্পি শুকনো গলায় বললেন, ‘অন্তত সেই পর্যন্ত যাওয়া যাক।’

মেজরের নির্দেশ মতো, আমি আর কুন্দনন্দিনী-সামনের আসনে গেলাম।
মেজর আগেই বলে দিলেন, কুন্দনন্দিনী যেন ধারের দিকে না বসেন। কুন্দ-
নন্দিনী সে নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু বোস্তল গেলাসের ডাক্তি-ব্যাগটি
সামনে নিয়ে এলেন। কর্নেল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। গাড়ি-আবার
ছাড়লো।

মাংগানে আমাদের দাঁড়াতে হয়নি। কর্নেল ঘুমোচ্ছিলেন। লিফটিক নামে
এক জায়গায় মেজর গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। গাড়ির কাঁটা ধরে বললেন,

‘নাড়ে এগারোটা। এখানে একটা বাংলা আছে, রান্না করবার লোকজনও আছে। ছপুয়ের খাওয়াটা এখানেই শেষ করে নেওয়া বাক। বেলা ছুটো নাগাদ আবার বেরুনো যাবে।’

কর্নেল এখন জেগেছেন। বললেন, ‘তাই করো মেজর। কিন্তু আমি শুনেছি, সিংঘিকের বাংলা নাকি ভূত বাংলা।’ বলে হাসলেন, ‘তোমার কাছে অজ্ঞ আছে তো।’

মেজর তাঁর ধোকড়া জামার বুকের বোতাম খুলে দেখালেন। তাঁর জামার মধ্যে কাঁধের বেটের সঙ্গে ঝোলানো দ্রিভলবার। আর তানদিকের কোমরে গোঁজা একটি খাপে ঢাকা ছুরি। আমিও অবাক কম হলাম না। মেজর ঘোবাল যে খাটি ফৌজী লোক তা যেন এখন আরো বেশি করে বুঝলাম। তিনি প্রস্তুত হয়েই পথে বেরিয়েছেন।

কর্নেল হাসলেন মাথা ঝাঁকিয়ে। মেজরের নির্দেশ মতো ডাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে দিল ভাইনের একটি খাড়া উঁচু সরু বাঁকে। কুন্দনন্দিনী আমার কথা শোনেননি। অবিশ্রিত স্বয়ং মেজর সাহেবও বোনকে কিছুটা সজ দিয়েছেন। কিন্তু গেলাসে জল মিশিয়ে। কুন্দনন্দিনী কালো বেড়ালের রক্ত কাঁচাই পান করেছেন। তাঁর আর সেই সোনাল্লাড়া রোঁজ রঙ নেই, লালে ঝলক দিচ্ছেন। এখনো গারে পশমী কিছু চাপাননি। আমি দু-একবার প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলেন, ‘আপনার লেখার সময় কলম ধরে রাখলে কেমন লাগে?’

বলেছিলাম, ‘অসহ্য।’

‘তবে আর আমাকে বাধা দেবেন না।’ কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, ‘আমায় নিজেকে খুঁজে পেতে দিন।’

এ কি ‘স্বধা খাই জয় কালী বলে।’ স্বরায় নিজেকে খুঁজে পাওয়াটা কেমন আমি জানি না। তক্ত রামপ্রসাদ হয়তো জানতেন। আমি অসহায় হয়ে তাঁর বোতল মুখে ঠেকিয়ে পান করা দেখতে দেখতে এলাম। উনি আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছেন, ‘রাগ করছেন?’

বলেছি, ‘না, ভয় পাচ্ছি।’

কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হেসেছেন। মুখে বোতল ঢালতে গিয়ে, রাম-এর লাল পানি গড়িয়ে পড়েছে রেশমী নীলে। আঁচল খসা বুকে, বুক থেকে বন্ধান্তরে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা। তার সঙ্গে প্রায়ই সমানেই পানের খিলি, অবদানসহ। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে মেজরের দিকে তাকিয়েছি। মেজর যুদ্ধ ঘাঙ ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি লক্ষ্য রাখছেন। আমিও বাদ যাইনি।

মেজর নিয়েই আমাকে জল গেলান দিয়ে সাহায্য করেছেন। লাল পানি ঢেলেছেন কুন্দনন্দিনী।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটি বাংলোর চত্বরে। ভূত আছে কী না জানি না, কিন্তু দেখলেই মনে হয় ভূত বাংলা। ছ'জন বেয়ারা গোছের পাহাড়ী লোক এসে দাঁড়ালো। সেলাম করলো। মেজর ঘোষাল কর্নেল আর মিসেসকে নিয়ে নামলেন। আমাদের নামতে বললেন। পাহাড়ী লোক দুটো ছুটোছুটি করে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার কয়েকটা পেতে দিল। আমি নামতে উত্তত হতেই সোয়েটারের কাঁধে টান পড়লো। কিরে তাকলাম। কুন্দনন্দিনীর কোকিল চোখ তুলতুলু। ঠোঁটে ফিকে হাসি। স্বর নামিয়ে বললেন, 'এত ভাড়া কিসের মশাই? হুভুপ্রা সিপ্‌টির জন্ত নাকি?'

হেসে বললাম, 'না। ওটা মাথায় রাখবেন না।'

'আমার হাত ধরুন।'

আমি তাঁর হাত ধরে নামলাম। দুটো কুকুর কোথা থেকে ছুটে এসে লাজ নাড়তে লাগলো। আমাকে অবাক আর নির্ভয় করে দিয়ে কুন্দনন্দিনী সহজ ভাবেই হেঁটে বারান্দায় উঠলেন। কিন্তু বারান্দায় বসলেন না, খোলা দরজা দিয়ে বাংলোর ভিতরে ঢুক গেলেন।

আমি শুনতে পাচ্ছি সেই দূর সমুদ্রের কলরোল। কিন্তু ভিত্তা কোথায়? আমার হৃদয়ে বিরাট উঁচু পাহাড়, যার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ পাহাড় ধাপের পর ধাপে উঁচুতে ওঠেনি, যেন শৃঙ্গগুলো গায়ে গায়ে পাশ কিয়ে রয়েছে। উঁচু দিকে তার ঢেউ না, পাশে পাশে ঢেউয়ের সারি। তার প্রতিটি খাঁজে খাঁজে তুষার শাদা নালি নিচের দিকে নেমেছে। পশ্চিমে তুষারের ঢেউ আকাশে মিশেছে। তুষার শৃঙ্গমালা উত্তরে। কিন্তু সিংহের সেই রূপ দেখছি না। চারদিকে পাহাড়, বরফ। জমাট তুষারের নালাগুলো ঘোড়ে চিকচিক করছে। মনে হলো আমি পাহাড়ের কোলে বন্দী। কোথাও মুক্তির পথ নেই। কিন্তু শব্দ কিসের? এই ভয়ংকর স্তব্ধতার মধ্যে দূর কলরোলের শব্দ কি সমতলের সর্বনাশী? দেখতে পাই না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেজর ঘোষাল, এই যে শব্দটা আসছে—'

'ভিত্তার।' আমার কথা শেবের আগেই তিনি জবাব দিলেন, 'চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, এখান থেকে কয়েক হাজার ফুট নিচে। শব্দটা আসছে উত্তরের বাতাসে, নিচে থেকে না। উত্তর দিকে যে স্রোত দেখতে পাচ্ছেন, স্রোত লান তার পিছনে আছে। আমরা কিছু নিচে আছি বলে, সে ঢাকা পড়ে

গেছে।’ বলতে বলতে তিনি সাংগ্রিলার বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গেলাসে জল মিশিয়ে মিসেস সিপ্পিকে দিলেন।

পাহাড়ের এমন গভীরে আমি আর কোথাও বাইনি। হিমালয়ের অভ্যন্তরে স্বদীর্ঘ ব্রহ্ম বিস্তীর্ণ কান্দীয়ে গিয়েছি। কান্দীরের সোনেমার্গ বা গুলমার্গ হয়তো নয়ন ভোলানো মনোহর। কিন্তু হিমালয়ের এই স্বদূর গভীরে এই মহিমার বিশালত্বে কোথায় যেন একটা জুকুটি-ভয়াল ছায়া রয়েছে। নিজেকে ভীষণ একাকী মনে হচ্ছে। আমার পিছনেও একটি কল-কল জলের ধারার শব্দ। বাঁদিকেই একটি ছোট ঝরনা গড়িয়ে যাচ্ছে। যার ওপর দিয়ে দু’ খণ্ড কাঠ পাতা। নালার ওপারে যাবার জন্ত। আমার পিছনেও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে কিছু গাছপালার ভিড়।

মেজর ডাকলেন, ‘আসুন। উঠে আসুন।’

আমি ওপরে গেলাম। মিসেস সিপ্পি গেলাস তুলে আমাকে যাকে বলে ‘উইশ্’ তাই করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার গেলাস কোথায়? মিসেস মুখার্জি ভিতরে নিয়ে গেলেন নাকি?’

মেজর বললেন, ‘না, ঠিক গেলাস গাড়িতেই আছে, আমি নিয়ে আসছি।’ বলেই তিনি গাড়ির দিকে নেমে গেলেন।

‘আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, ‘আমিই আনছি।’

‘বসুন বসুন। আমাকে খাবার-দাবারগুলোও নামাতে হবে।’ বলে তিনি চিংকার করে ডাকলেন, ‘বয়, ইধর আও।’

তৎক্ষণাৎ দু’জনে ছুটে গেল। কর্নেল আমাকে বললেন, ‘অত্যন্ত দুঃখিত, আমার জন্ত আপনাদের হয়তো অসুবিধা হলো।’

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘কিছুমাত্র না।’

‘আমার শরীরটা কিছুদিন ভালো নেই।’ কর্নেল বললেন, ‘তা না হলে এরকম হয় না। আর আমি খালি হাতে বসে আছি, আমার স্ত্রী পান করছেন।’ বলে মিসেসের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

সুভদ্রাও হাসলেন। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর পানপাত্র শূন্য। জয় হে তুষার সিংহ। কেউ কারোর থেকে কম যান না। এখন আবার নিজেই হইন্ডি ঢেলে নিচ্ছেন। মিঠে সরবত নাকি? তাঁর নাকের নখে ঝলক দিচ্ছে। মেজর এলেন খাবার-দাবার গরম করতে পাঠিয়ে, আমার গেলাস নিয়ে। আমার আর তাঁর গেলাসে নতুন কালো বেড়ালের ছিপি খুলে লাল পানি ঢালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘একটা খোলা বোতল তো ছিল?’

মেজর বললেন, ‘ওটা বোধ হয় মিষ্টি ভেতরে নিম্নে গেছে। আপনি বরং দয়া করে একটু দেখুন, ও কী করছে।’

টার ইন্সটিটুট বড় স্পষ্ট।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। কিন্তু ঘরের ভিতরে একজন মহিলা দেখতে যাই কেমন করে? বদনা হাতে গলা খাঁকারি দিতে দিতে? সুভদ্রা সিপ্পি আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছিলেন। ইনিও দেখছি রঙের ছোয়া পেয়েছেন। দৃষ্টিটা বড় বিঁধছে। আমি গেলাম নিয়ে ভিতরে গেলাম। প্রথম ঘরটাই বেশ বড় ডাইনিং আর ড্রয়িংরুম। শোকা সেট পাতা একদিকে। আর একদিকে লম্বা খাবার টেবিল ঘিরে কতগুলো চেয়ার। দেওয়ালের নানান জায়গায় ফটল, আলকাতারার পোছড়া টানা। আসবাবপত্রগুলোতে যেন অনেক কালের জীর্ণতার ছাপ। সব থেকেও যেন ফাঁকা ফাঁকা। ভিতর ঘরের দিকে যাবার দরজা আধ ভেজানো। আমি নিচু স্বরে ডাকলাম, ‘কুম্মনন্দিনী কি ভেতরে আছেন?’

কোনো সাড়া পেলাম না। দরজা একটু ঠেলে ফাঁক করে ভিতরে ঊকি দিলাম। খাটের বিছানায় বসে আছেন কুম্মনন্দিনী। শূণ্য বোতলটা বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখে চমকে উঠলাম। খতম! কুম্মনন্দিনী আমার দিকে কিরে হাতের ইশারায় ডাকলেন। কাছে গেলাম। তিনি তাঁর পাশেই জায়গা দেখিয়ে ইশারায় বসতে বললেন। রহস্যটা কী? আমি বসলাম। তিনি বাথরুমের দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘ভূত।’

ভূত! আমার আত্মিকালের শিশু প্রাণটা চমকে উঠলো। ভূত বাংলাতে লতি ভূত? তাকালাম। দরজা আধ ভেজানো, একটু যেন কাঁপছে। তারপরে যেন ভিতরে থেকে কেউ আস্তে আস্তে খুলে দিল। ভিতরে জলের ফোটার টপ্ টপ্ শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় বাতাসের ব্যাপার। কিন্তু দরজাটা আবার আস্তে আস্তে বন্ধ হতে লাগলো। ঠিক যেন কেউ ভিতর থেকে পাল্লা দুটো ঠেলে দিচ্ছে। দিতে দিতে প্রায় পুরোটাই সশব্দে বন্ধ হলো। আমি কুম্মনন্দিনীর দিকে অশ্রুতি নিয়ে তাকালাম। তিনি ঠোটে আঙুল রেখে ইশারা করলেন। হঠাৎ ক্যাচ্ করে শব্দ হলো। দরজা আবার খুলতে লাগলো।

কুম্মনন্দিনী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, ‘ভূতটা সামনে আসতে চাইছে না, খুবই লাজুক বোধ হয়। দেখি একটু।’ বলে তিনি খাট থেকে উঠে দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকলেন। বললেন, ‘চমৎকার। স্নান করতে ইচ্ছা করছে।’ বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

সত্যি জ্ঞান করবেন নাকি? এই ঠাণ্ডায়? ভিতরে জলের শব্দ হলো। তারপরেই সহসা উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি। আমি স্বস্তি বোধ করলাম না। কিন্তু কিছু করবারও নেই। হাসি থামছে না, বরং বেপরোয়া হয়ে উঠছে। হঠাৎ মনে হলো ঘরের পিছনে কোনো গাছের ডাল মট করে ভেঙে পড়লো। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। মেজবকে কী ভেবে পাঠাবো? ভাবতে ভাবতেই আমি কুম্ভনন্দিনীর গলার স্বর শুনতে পেলাম, ‘হু আর যু? তুম কোন্ হায়?’

জবাবে একটি গোড়ানো মোটা পুরুষের গলা শুনতে পেলাম, ‘যার এক বর্ষও বুঝতে পারলাম না।’

অবিশ্বাস্ত বলে মনে হচ্ছে। আমি ভূবার সিংহের পদতলে বাচ্ছি, সর্ব-নাশীর ঘরের খোঁজে। কিন্তু আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কুম্ভনন্দিনী আবার হেসে উঠলেন। এবার তার সঙ্গে পুরুষের জেমা জড়ানো হাসি, এবং দুর্বোধ্য ভাষায় কোনো কথা। আমি বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে ডেকে উঠলাম ‘কুম্ভনন্দিনী, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?’

জবাবে তাঁর হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। শুনতে পেলাম তাঁর স্বর, ‘ভাগো, জলদি ভাগো।’

জবাবে পুরুষ গলায় কিছু শুনতে পেলাম। আমি স্বর চড়িয়ে ডাকলাম, ‘কুম্ভনন্দিনী! মিসেস যুবার্জি।’

দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কুম্ভনন্দিনীর আঁচল মেকের লুটাচ্ছে। উল্টো দিকের খোলা জানলা দেখিয়ে বললেন, ‘ওই দেখুন ভূত।’

আমি দেখলাম এবং ভূতই। জানলার বাইরে একটি রেখাবহুল রক্তাভ মুখ। মাথার ধূসর চুলে বেগী বাঁধা। নরুণচেরা চোখ। পাতলা এক ছোড়া গোক আর খুতনিতে একগোছা দাড়ি ঝুলে পড়েছে। গলায় একরাশ নানা রঙের পাখরের মালা। গায়ে ছেঁড়া ময়লা বকু। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে তু?’

‘জানি না।’ কুম্ভনন্দিনী হাসতে হাসতে বললেন, ‘দরজা বন্ধ করে দেখি জানলাটা খোলা। উকি দিতেই একে দেখতে পেলাম। খালি বলছে, লেপচা লেপচা। আর তল্লি করে দেখাচ্ছে, বোতলে চুমুক দেওয়া।’ বলে খিলখিল করে হাসতে লাগলেন।

আমি লোকটার দিকে তাকাতেই সে আমার হাতের গেলানটা দেখিয়ে অনেকগুলো হলুদ দাঁত বের করে হাসলো। পানীয় চাইছে। কিছু বললো। নিজের ভাষা ছাড়া কিছুই জানে না বোধ হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ এলো কোথা থেকে?’

‘কে জানে ? আঁহা, দিন বেচারিকে একটু।’ বলেই কুন্দনন্দিনী গেলাসটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললেন, ‘হাঁ করো বাবা, গলায় ঢেলে দিচ্ছি। তোমার ও মুখে গেলাস ছোঁয়াতে দিতে পারবো না।’

লোকটা যেন সবই বুঝলো, তৎক্ষণাৎ মাথা পিছনে করে হাঁ করলো। কুন্দনন্দিনী গেলাসের পানীয় ঢাললেন। লোকটা একটুও না থেমে, ঢক ঢক করে গেলাসটি শূন্য করলো। একটা ঢেঁকুর তুলে মাথা ঘুলিয়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করলো। ডান হাত তুলে উঁচুতে দেখিয়ে বললো, ‘মনাস্টি-মনাস্টি। রিম্পোসে, রিম্পোসে।’

কিছুই বোঝা গেল না। কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘এবার এসো বাবা লেপ্‌চা।’ বলে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমার কৌতূহল তখনো মেটেনি। জিজ্ঞেস করলাম, ‘দরজা খোলা বন্ধটা ও করছিল নাকি ?’

কুন্দনন্দিনী পাগলের মতো হেসে উঠে আমার কাঁধে একটা চাপড় মারলেন, বললেন, ‘দূর মশাই। ওটা হাওয়ার ব্যাপার। জানলাটা খোলা ছিল যে! ওদিক থেকে বাতাস, এদিক থেকে বাতাস, দুইয়ের চাপে এই কাণ্ড। মাতাল হননি তো ?’

বাতাসের কথাটা তো আমিও আগে ভেবেছিলাম। কিন্তু খোলা জানলার বাতাসের কথা কী করে জানবো। আমার অবস্থা তো মাতালের থেকেও বেশি। অন্তর্ধ্ব্য এমন সহজ কথাটা মাথায় আসেনি কেন ? আর কে আমাকে মাতাল বলছেন ? কুন্দনন্দিনী মুখোশাধায়। এই কি তাঁর নিজেই খুঁজে পাওয়া ? তিনি বললেন, ‘চলুন আপনার গেলাসটা ভরতি করে দিই।’

বললাম, ‘আমার আর দরকার নেই। আপনিও তো দেখছি বোতলটা শেষ করেছেন। আর নেবেন না।’

‘কেন ?’ প্রায় কথা তোলার মতোই কুন্দনন্দিনী ঘাড়ের বাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে আমার দিকে তাকালেন, ‘কেন নেবো না, বলতে পারেন ?’ তাঁর রক্ত চোখের দৃষ্টি কঠিন, আরক্ত ঠোঁট দুটো শক্ত।

আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম। একটা শংকিত লজ্জাও বোধ করলাম। কুন্দনন্দিনী আবার বললেন, ‘আপনার সেই ইটারনিটি, মন তুমি কৃষিকাজ জানো না ? জানি না, জানি না, আমি ও সব জানি না। কোথায় আবাদ করলে কী সোনা ফলতো, ওসব রাবিশ কথাবার্তা আমি জানি না, মানি না।’ বলেই তিনি ওজরী দিয়ে আমার বৃকে খোঁচা দিয়ে ঠোঁট বাকিয়ে বলে

উঠলেন, 'তুমি মশাই কালকূট, আমাকে আস্তাকুড়ের কথা শুনিয়েছিলে। কী আস্তাকুড় তুমি দেখেছো? আস্তাকুড়। আমি তোমাকে আমার সব জামা কাপড় খুলে দেখাতে পারি, একটা প্রকাণ্ড আস্তাকুড়। তুমি আমার ভালো করার চেষ্টা করো না। কিছু চাপ তো আস্তাকুড় ঘেঁটে নিতে পারো।' বলেই ঘাড়ে আবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঝটিতি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো এক মুহূর্তেই কুম্ভনন্দিনী আমার কাছে অচেনা হয়ে গেলেন। ক'দিন ধরে ঝাঁকে দেখে ভেবেছিলাম চিনতে পারছি, আমার সে ভুল ভেঙে গেল। তিনি কি মাতাল হয়ে গিয়েছেন? মনে হচ্ছে না। যার বায়ুর বিষয়ে এত বাস্তব আর সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে, তিনি মাতাল হননি। তিনি কি আমার প্রতি বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হলেন? অসম্ভব না। হয়তো অসম্মান চর্চা করেছি। মেজর ঘোষালের কথাগুলো আস্তে আস্তে আমার মনে পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে, 'আমি আর আত্মসংহার কী করবো, আত্মনাশই হয়ে গেছে।'.....

আমি দরজা দিয়ে ড্রয়িংরুমে গেলাম। দেখলাম কর্নেল সিপ্পি একটি বড় শোফায় অধেশোয়া হয়ে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেজর ঘোষাল কোথায় গেলেন?'

কর্নেল আমার দিকে যেন একটু জিজ্ঞাসু কৌতূহলিত চোখে তাকালেন, বললেন, 'মেজর আর মিসেস সিপ্পি আশেপাশেই ঘুরছেন। মিসেস মুখার্জিকে দেখলাম, বাইরে বেরিয়ে গেলেন।'

আমি বারান্দার এসে দাঁড়লাম। কারোকেই দেখতে পেলাম না। বারান্দায় ব্যাগ পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে বোতলগুলো দেখা যাচ্ছে। আমি বারান্দা থেকে নিচে নামলাম। মেজর বা সূভদ্রা সিপ্পির গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি না। কুম্ভনন্দিনীই বা কোথায় গেলেন। আমি নিচের পথের দিকে তাকালাম। পাশেই একটি কুটির, বাংলোর চৌকিদারের ঘর বোধ হয়। সেই দূর সমুদ্রের কলরোল শুনেছি। আর তুবার শৃঙ্গরাজি নানা রঙে খেলছে। কিন্তু মনে অস্বস্তি বোধ করছি। কুম্ভনন্দিনীর কাছে কমা চাপওয়া উচিত। সকলেই কি নিচের রাস্তায় নেমে গেলেন?

সহসা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সেই জানলার মূর্তি। ময়লা বকু গায়ে লেপ্‌চা। সে আমাকে পিছনের পাহাড়ের দিকে হাত তুলে দেখালো,

হাত নেড়ে ভক্তি করলো। আমি কোঁতুহলিত হয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ও পথে কেউ গেছে?’

সে আমার একটা হাত ধরে টানলো। ঠাণ্ডা কনকনে হাত। নালার ওপরে হাত দিয়ে দেখিয়ে সে তার নিজের ভাষায় কিছু বললো এবং ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার পিছনের পাহাড়ের দিকে দেখালো। দেখিয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। আমি প্রতিরোধ করলাম। সে আবার ঘরের দিকে দেখিয়ে ওপরের দিকে দেখালো। আহ, ভাষা কি দুর্ভাষা। ও কি কুন্দনন্দিনীর কথা বলছে? আমি ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে অস্বস্তি করলাম। সাবধানে নানা পার হয়ে কাঁচা কাদা মাটি আর পাথর ছড়ানো সড় রাস্তা দিয়ে উঁচুতে উঠতে লাগলাম। কিন্তু আমার জুতো পিছলে যাচ্ছে। লেপ্‌চা আমার হাত ধরে টেনে তুলতে সাহায্য করলো। আমি ধামতে আরম্ভ করলাম। ক্রমাগতই সে আমাকে উঁচুতে নিয়ে চলেছে। হুঁপাশে পাহাড়ী জঙ্গলী ঝোপ।

আমি ফিরে যাবো কী না ভেবে দাঁড়াতেই ডানদিকের উঁচুতে কয়েকটি পবিত্র ধ্বজা দেখতে পেলাম। লেপ্‌চা আমাকে সেদিকে হাত দিয়ে পথে যাওয়ার ইশারা করলো। হঠাৎ কয়েকটা ছোট ছোট লাফ দিল মাথা নিচু করে, আবার উঁচুতে হাত দেখালো। কী তার মানে? ওপরে কেউ ছুটে গিয়েছে? আমি আবার লেপ্‌চাকে অস্বস্তি করলাম। উঁচুতে উঠে এবার আমার চোখে পড়লো একটি প্যাগোডার মতো মঠ। বৌদ্ধ মঠ নিঃসন্দেহে। মনে পড়লো লেপ্‌চার কথা, ‘মনাস্টি মনাস্টি’ সে মনাস্টি বলতে চেয়েছিল।

আমি মঠের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বন্ধ মঠ, লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। মঠের গড়ন অনেকটা তরাই অঞ্চলের কাঠের বাড়ির মতো। কাঠের থামের ওপর, উঁচু কাঠের মেঝে। নিচে ফাঁকা।

লেপ্‌চা আমাকে আরো উঁচুতে হাত তুলে দেখালো। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম টিনের চাল দেখা যাচ্ছে। লেপ্‌চা ঘাড় ঝাঁকিয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো ওপরে। আমার ভিতরে এখন ঘামের শ্রোত বইছে। উঠতে উঠতে একটি সমভল জমিতে এসে পড়লাম। সামনেই একটি বাড়ি মঠের মতোই গঠন। ওপরের কাঠের বারান্দায় তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে অবাধ কোঁতুহলে দেখছে। একটি কাঠের সিঁড়ি রয়েছে ওপরে ওঠবার। লেপ্‌চা আমাকে সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে টেনে নিয়ে গেল।

বাচ্চা কয়টি কল্কল করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। ঘরের প্রায় মাঝখানে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তার পাশেই একটি উনোন জ্বলছে। তার ওপরে হাড়িতে কিছু ফুটছে। একটি পাহাড়ী মেয়ে সেই আগুনের সামনে বসে রয়েছে। হলুদ রঙা তার শরীর। বুকের ওপর কোনো আবরণ নেই। কোলে একটি শিশু, তার কচি হাত মেয়েটির অনতিশিথিল বুকে খেলা করছে। বয়সী পাহাড়ী কোনো সন্দেহ নেই। তাকে ঘিরে বসে আছে দু'জন পাহাড়ী পুরুষ, বাদে মাথায় বড় বড় চুল, পরনে বকু, গলায় পাথরের মালা। তারা সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ঘরের আর একপাশে এক কোণে একটি কালো পত্তর চামড়ার ওপরে বসে আছে একজন উজ্জল পাহাড়ী পুরুষ। তারও মাথার চুল বড়। জোড়াসন করে বসে আছে। সামনে চওড়া একটি বাঁশের চোঙা, ভিতরে ঢোকানো একটি কঞ্চির নল। কিন্তু আমার বিষয় সেখানে না। মানুষটির অদূরেই কালো লোমশ চামড়ার ওপর বসে আছেন কুন্দনন্দিনী। তাঁর সামনেও একটি বাঁশের চোঙা, ভিতরে ঢোকানো একটি কঞ্চির নল। তিনি আমাকে দেখে অবাক হলেন না, হেসে বললেন, 'বসে পড়ুন, একটু তুম্বা খান।'

মনে পড়ে গেল এই বাঁশের চোঙায় তুম্বা পানীয় থাকে, কঞ্চির নল দিয়ে টেনে চুমুক দিতে হয়। ক্ষুদ্র সরষের মতো শস্তজাতীয় বস্তু ঢুকিয়ে তার মধ্যে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়। গ্যাংটকে দেখেছি। খাতা এবং নেশার পানীয় উভয় বস্তুই এতে আছে। এদেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে অনেক গরীব শুধু এই খেয়েই নাকি একটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে।

লেপ্‌চার ইশারা আর সংকেতের কথা বুঝতে পারলাম। সে আমাকে কুন্দনন্দিনীর কথাই বলছিল। উজ্জল পুরুষটির কাঁধের ওপর চাদরের মতো রয়েছে একটি চামড়া। বাকি গা খালি। সে আমাকে বললো, 'সিট ডাউন, সিট ডাউন, ওয়াস্ট তুম্বা ?'

পুরুষটির ইংরেজি শুনে অবাক হলাম। কুন্দনন্দিনী ইংরেজিতে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে এক পাত্র তুম্বা দিন।' আমাকে বললেন, 'আমুন, বহুন। উনি হচ্ছেন একজন প্রেসাস জুয়েল, মানে লামা। তিব্বতী লামা। আর ওই পুরুষ দু'জন তাঁর ভাই। আরো এক ভাই আছে। তিন ভাইয়ের একটাই বউ। আমি তো শুনেই মুগ্ধ। পুরোপুরি দ্রোণদী।'

উজ্জল পুরুষটি মুখ ফিরিয়ে কিছু বললেন। একটি বছর আটকের মধ্যে

ঘরের বাইরে গেল। পাশেও একটি ঘর আছে। সেখান থেকে এক পাত্র তুম্বা এনে কুন্দনন্দিনীর পাশে বসিয়ে দিল। অবাক লাগছে, কুন্দনন্দিনী এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। আমি জুতো খুলতে উত্তত হতেই উজ্জল পুরুষ ভাঙা আর ভুল ইংরেজিতে বললেন, ‘কোনো দরকার নেই, বসে পড়ো।’

কুন্দনন্দিনীর চোখ লাল, টকটকে লাল। মাথায় রুমাল নেই। আঁচল বুকের জামায় গাঁজা। আমি তাঁর আসনের একপাশে গিয়ে বসলাম। তিনি উজ্জল পুরুষটিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিছু মনে করবেন না। আপনার তিন ভাই তাদের এক বউকে নিয়ে ঝগড়া করে না?’

প্রেসাস জুরেল কুন্দনন্দিনীর কথা যথার্থ বুঝতে পারলেন, তাঁর নরুণ চেহারা জিজ্ঞাস্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। কুন্দনন্দিনী তাঁর প্রশ্নটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে আবার উচ্চারণ করলেন। তাঁর নিজের মতো ইংরেজিতে লামা মাথা নেড়ে হেসে বললেন, ‘কেন ঝগড়া করবে? তারা তাদের এক বউকে নিয়েই স্থখী। অণ্ড একটি বউ এলে, যা কিছু সম্পত্তি আছে ভাগাভাগি হয়ে যেতে পারে। তাই তো হয়। তিব্বতে এ নিয়মটা আছে। ভাইয়েরা এককাট্টা হয়ে থাকতে চায়। একটার বেশি বউ হলে তা হয় না।’

কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘এই সব ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের বাবাও কি তিনজন?’

‘নিশ্চয়ই।’ উজ্জল পুরুষ বললেন।

কুন্দনন্দিনী জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার ভাইয়ের বউটি এ ব্যাপারকে কী চোখে দেখেন?’

‘খুবই স্বাভাবিক চোখে দেখেন। সে তার স্বামীদের সঙ্গে ঠিক মতো বোঝাপড়া করে নেয়।’

কুন্দনন্দিনী তিব্বতী বধূটির দিকে তাকিয়ে বাঙলার বললেন, ‘ওগো তোমার লীচরণে কোটি প্রণাম, তুমি ভগবতী।’

আমার চোখের সামনে ভাসছিল, পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানের ছবি। কোনো কোনো পণ্ডিতের সন্দেহ পঞ্চপাণ্ডব ভারতে এসেছিলেন তিব্বত থেকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ফিরে গিয়েছিলেন সেখানেই। স্বর্গের দুর্গম পথে, যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলেই পথে দেহত্যাগ করেছিলেন। জানি না তার সত্যাসত্য। কিন্তু তিন ভাইয়ের এক স্ত্রীর এই স্থখী পরিবার যেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি কি এখন সেই দুর্গম পথেই

রয়েছি? মহাভারতের আমলে বোধ হয় এ রকম রাস্তা আর জোড়া জীপ ছিল না।

‘কী হলো মশাই, তুম্বা টাছন।’ কুম্ভনন্দিনী বাংলায় বললেন, ‘বউটির ইতিমধ্যেই পাঁচটি সন্তান হয়েছে। দেখেছেন, শরীরটা একটুও টসকায়নি, আশ্চর্য! আর কী হাসিখুশি। আহা, আমার যদি এমন হতো।’ বলে তিনি উঠে আগুনের সামনে বধুটির পাশে গিয়ে বসলেন।

তিব্বতী রমণীকে দেখে, আমিও পাঁচ সন্তানের জননী ভাবতে পারিনি। কিন্তু কুম্ভনন্দিনীর ভাষা লজ্জা দিল, আবার রমণীর দিকে তাকাতে গিয়ে সংকোচ বোধ করলাম। উজ্জ্বল পুরুষটি ছাড়া কেউ কারোর ভাষা বোঝে না। লেপ্‌চা লোকটি ঘরের বাইরে দরজার কাছে গুটিহুটি বসে আছে। সেই বছর আটকের মেয়েটি আর এক পাড় তুম্বা এনে কুম্ভনন্দিনীর পাশে বসিয়ে দিল। তিনি নিচু হয়ে নলে চুমুক দিলেন, আর বধুটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিব্বতী বধুও হাসলো। তারপর দুই রমণী চোখে চোখে কী কথা বললেন কে জানে, দু’জনেই খিলখিল করে হাসতে লাগলেন।

আমি লামার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি প্রেসাস্ জুয়েল?’

লামা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে উচ্চারণ করলেন, ‘রিম্পোসে।’

শব্দটা লেপচার মুখে আগেই শুনেছিলাম। কথাটার মানে কি তাই? জিজ্ঞেস করলাম। লামা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কি তিব্বত থেকে এসেছেন?’

লামা মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত তুলে বললেন, ‘ইয়েস, চায়না চায়না—।’

এর বেশি তাঁর ভাষায় যোগালো না। অহুমান করলাম, চীনা অধিকারের সময় তিনি দলাই লামার দলের সঙ্গে চলে এসেছেন। আবার বললেন, ‘নাকিয়েত্রেস্তাং—পোতালা।’ কিছুই বুঝলাম না। পোতালা নিশ্চয়ই পোটালা প্যালেস্। ইতিমধ্যে কুম্ভনন্দিনী তিব্বতী রমণীর সঙ্গে হেসেই চলেছেন।

আমি ডাকলাম, ‘কুম্ভনন্দিনী।’

‘না মশাই, আমি আমার নতুন নাম রেখেছি কালকৃটি।’

আমি বিব্রল হেসে বললাম, ‘কালকৃটি নাম হয় না।’

‘গ্রামারে হয় না, আমার হয়।’

‘বেশ, তবে তাই। আমি বলছিলাম, মেজর খুব ভাবছেন, চলুন ফেরা যাক।’

‘আপনাকে কে বললো, আমি এখানে এসেছি?’

‘লেপচা। ওর কাছে আমি কুতজ।’

কুন্দনন্দিনী আমার দিকে ক্রি়ে তাকালেন। আমি বললাম, ‘আপনাকে আমি না বুঝে বিরক্ত করেছি, মাফ করবেন।’

‘বিরক্ত? কমা?’ কুন্দনন্দিনী জ্রুটি বিন্মরে বললেন, তারপরে ম্খ ফিরিয়ে বারেবারে মাথা নাচাতে লাগলেন।

আমি মেজর ঘোবালের কথাই ভাবছিলাম। এ পরিবেশটি আমারো ভালো লেগেছে। কিন্তু সময় নেই।

আমি আবার তাকলাম, ‘কুন্দনন্দিনী।’

কুন্দনন্দিনী বধূটির গায়ে একবার হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসলেন ঘাড় কাত করে। বলে উঠলেন, ‘কী নির্মল! সব কিছুই মাহুঘের মনে, যেখানে তার সমাজ সংস্কারে মন ভরে আছে।’ বলে তিনি উজ্জল পুরুষকে ইংরেজিতে বললেন, ‘আপনার আতিথেরতার জন্ত ধন্তবাদ, বিদায়।’ বলে আমার দিকে তাকিয়েই তুম্বার পাড়ের দিকে অবাচ চোখে দেখলেন, বললেন, ‘ও কি, একটাও চুমক দেননি? আপনি তো ওদের অসম্মান করছেন।’

আমি তাড়াতাড়ি ম্খ নামিয়ে তুম্বার নলে চুমক দিলাম। ঈষৎ অন্ন, অনেকটা আমাদের আমানি পাস্তার জলের মতো স্বাদ। গন্ধটা ভিন্ন। উজ্জল পুরুষটি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই পুরুষটি কি আপনার স্বামী?’

তুম্বার রস আমার গলায় ঠেকে গেল। কুন্দনন্দিনী হেসে উঠলেন, বললেন, ‘দেখুন প্রেসাস জুয়েল, আমার কোনো স্বামীই নেই। তবে বিয়ে একটা আমার হয়েছে।’ বলে তিনি দরজার দিকে প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন।

আমিও উঠে দাঁড়লাম। উজ্জল পুরুষটির হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিলাম। ছোট ছেলেমেয়েরা পুস্তলিকাব্যং আমাদের দেখছিল। ঘরের বাইরে পা দিয়ে দেখলাম, কুন্দনন্দিনী সিঁড়ির মুখে থাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, মাথা ঝুঁকে পড়েছে, বললেন, ‘আমাকে একটু ধরবেন? আমি পা ঠিক রেখে চলতে পারছি না।’

‘নিশ্চয়ই।’ বলে আমি একটি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

তিনি আমার হাত ধরলেন না, তান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। বাঁ হাত দিয়ে নিজেই পিছন থেকে আমার বাঁ হাত টেনে তাঁর কটির পাশ দিয়ে মুঠি পাকিয়ে ধরলেন। সিঁড়িতে পা বাড়ালেন। পতন ঘটলে

উভয়েরই ঘটবে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পিছন ফিরে তাকালাম। তিব্বতী দ্রোণী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আবরণহীন বুকে তার শিশু সন্তানটি। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

‘আসলে তো আমার ওপরেই আপনার বিরক্ত হবার কথা।’ কুন্দনন্দিনী বললেন, ‘আমি হঠাৎ কতকগুলো কথা বলে ফেলে লজ্জার পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমারই ক্ষমা চাইবার কথা, আপনার নয়।’

আমরা নেমে এলাম মঠের কাছে। কুন্দনন্দিনীর শরীরের সকল ভার প্রায় আমার ওপরে। আমি ঘামছি। বললাম, ‘আমি আর কখনো আপনাকে ড্রিং করতে বারণ করবো না।’

বলা মাত্রই কুন্দনন্দিনী আমার গলা থেকে হাত নামিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেলেন। তাঁর চোখে আবার সেই কঠিন দৃষ্টি, ঠোট ঝিকিয়ে বলে উঠলেন, ‘এই বুঝি আপনার আসল কথা? কেন এই মিথ্যা? আমি জানি আমি মদ খেলেও আপনার কিছু যায় আসে না, না খেলেও না। আপনি আমাকে দয়া করে এই ভদ্রলোকী নিরপেক্ষ হৃদয়হীনতা দেখাবেন না।’ বলে তিনি নিজেই টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন।

মনে হলো কোথায় একটা সজোরে আঘাত লাগলো আমার ভিতরে। নিরপেক্ষ হৃদয়হীনতা! আমার জীবনে এমন একটি কথা এই নতুন। হিমালয়ের গভীরতর অভ্যন্তরে এ কথা যেন এক সমসাময়িক কালের সকল মহত্বের পালিশে চাবুকের মতো বাজলো। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিজেই কুন্দনন্দিনীর হাত টেনে ধরলাম। কুন্দনন্দিনী প্রায় চোখ বুজে হাসলেন, মাথা নেড়ে বললেন, ‘কালকূট, আপনি কালকূট, আপনি তো আমার কিছুই জানেন না। আপনাকে আমি কী করে বোঝাবো।’

জানি, কিছু কিঞ্চিৎ কিছু তা বলতে পারবো না। তার বিশদ কিছু আমি তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই না। তিনি নিজেই আলগা ভাবে একটি হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন, ‘আপনার সেই ইটরনিটি, মন তুমি কৃষিকাজ জানো না। আপনার প্রাণে কি পতিত জমির উপর কোনো কৃপা হয় না? কৃষিকাজে একটু ভালবাসা নেই বুঝি? খালি উপদেশ? এই কোরো না, সেই কোরো না। কেন?’

বলেই কুন্দনন্দিনী দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর কোকিল চোখের তারা আমার চোখের প্রতি। নাগরক্কর কাঁপছে।

আমি নিখাসে তাঁর স্বপ্ন আর জ্বলন্ত স্বপ্ন পাচ্ছি। তিনি কিসকিস

করে আবার বললেন, ‘কেন, কেন?’ তাঁর রক্তিম চোখের কোণে জলের ফোঁটা টলটলিয়ে উঠলো। তিনি হুঁ হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, উত্তত কান্নাকেই যেন আমার দুই ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলেন।

আমার চোখের সামনে তুমার শৃঙ্গ, আকাশের গায়ে এখন নীল সবুজ খেলছে। কোথাও বা তার হালকা লালেন স্পর্শ। মাঝে মাঝে বুড়ির ফোঁটা গায়ে পড়ছে। আমার ঠোঁটের কবে চুঁইয়ে ঢুকলো লবণাক্ত স্বাদ। তপ্ত কোমল ঠোঁট আমার জিভের প্রতিটি স্পর্শে অস্বভব করছি একটা আকৃতি আর যন্ত্রণা। বিধা আমাকে গ্রাস করেনি। বাধাই আমাকে ব্যকুল করলো। এই যদি মহাপ্রস্থানের পথ হয়, তবে পিছনে রইলো আমার ইঙ্গপ্রস্থ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামী মরদান। আমি কুন্দনন্দিনীকে হুঁ হাতে আলিঙ্গন করলাম।

সিংঘিক থেকে আমাদের যাত্রাটা অন্তত হয়নি, কিন্তু দিনের আলো থাকতে গন্তব্যে পৌঁছতে পারলাম না। টুং নামক জায়গায় প্রথম আর এক সেতু পেলাম। ঝুলন্ত সেতু আমাদের ভিত্তার অপর পারে নিয়ে গেল। স্বগভীর নিচে ভিত্তা তোড়ে নামছে না, অনেকটা স্বরনার মতো ধাপ ভেঙে ভেঙে নামছে। এ রূপটি নতুন। আমরা টুং সেতু হেঁটে পার হয়েছি। মনে হয়েছে শূন্তের ওপর দিয়ে ঢেউ খেতে খেতে চলেছি। সেতুর দুই পারে বেয়নেট ঝলকানো রাইফেল হাতে ভারতীয় জওয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে। টুং অতিক্রম করে, তালিপাইক নামক জায়গায় আমাদের দীর্ঘ সময়ের গন্ত থামতে হলো। ওপর থেকে এগিয়ে এসেছে শতাধিক গাধা আর অশ্বতর বাহিনীর ক্যারাতান। ওপরের দিকে এগিয়ে উঠেছে সুদীর্ঘ এক ‘শক্তিমান’ ট্রাক কনভয়। আমাদের জোড়াকে অতএব, কনভয়ের পিছনে এক পাশে ঠাই নিতে হলো।

মেজর ঘোষালকে নামতেই হলো। সুনলাম, এ পথে এ রকম প্রায়ই হয়। গাধা আর অশ্বতর ক্যারাতান পাহাড়ীদের। অনেকগুলো পরিবার একদিকে নেমে আসছে। ভারতীয় জওয়ান বাহিনী চলেছে উত্তরের আরো অভ্যন্তরে। পথ এতই সরু, উত্তর দলের পক্ষে পাশাপাশি যাওয়া আসা অসম্ভব। সর্ব-নাশের গভীর খাদ পাতালে নেমে গিয়েছে। ‘শক্তিমান’ ট্রাক কনভয় নিশ্চল। চেঁচা চললো, পশুগুলোকে একটি একটি করে সম্ভর্পে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে নিয়ে যাবার। প্রত্যেকটি পশুর পিঠেই মালের বোঝা।

চেঁচা যখন সার্বিক হলো, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে গাড়ির

হেডলাইট আলানো নিষেধ। সীমান্তের ওপরে সদাসতর্ক চোখ এঁদিকে লক্ষ্য রাখছে। মাঝে মাঝে টর্চলাইট জেলে বেধে নিতে হচ্ছে। কলে আমাদের গতি পেল অনেক কমে। অন্ধকারে গুনতে পাচ্ছি কেবল সর্বনাশীর প্রবল শব্দ। টুং-এর পরে সে সর্বদাই আমাদের পাশে, পাশে। সামান্য একটু কসকালেই ভয় গর্ভে।

অন্ধকারে আর একবার আমাদের জোড়া একটি ঝুলন্ত সেতু পার হলো। মেজর ঘোষাল ঘোষণা করলেন, 'এসে গিয়েছি। রাস্তার বাঁদিকেই বাংলা।'।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ জায়গার কী নাম?'

'সুন্থান। অনেকে উনথংও বলে।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'রোশেনলাল, গাড়ি জেরা খাড়া করো জী, টর্চ চমককে ধেখ্ লেঙ্গে বাংলাকে নিশানা।'।

গাড়ি দাঁড়ালো। মেজর পেছন দিয়ে নেমে জোনাকির মতো টিপ্ টিপ্ করে টর্চলাইট জ্বাললেন।

আমি বলে উঠলাম, 'ওই তো একটা বাড়ি, ওটাই কী?'

টর্চের আলো এক মুহূর্তের জন্য সেই বাড়ির ওপর পড়লো। মেজর ঘোষাল রোশেনলালকে বললেন, 'মেরা পিছা কর, ধীরে সে।'।

বাংলার চত্বরে গাড়ি দাঁড়াতেই দু-তিনজন লোক এগিয়ে এলো। ঘরের ভিতর হারিকেনের আলো জেলে দিল। আমার কোলের ওপরেই কুন্দনন্দিনী অঘোরে গুমোচ্ছিলেন। তাঁকে জাপিয়ে তুলে নামলাম। হুংসহ শীত, দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছে। আর পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে। তিস্তা এখানে কোথায় দেখতে পাচ্ছি না, শব্দ বাজছে যেন বিশাল এক জলপ্রপাতের।

মেজর ঘোষাল বললেন, 'আজ আর কিছু দেখতে পাবেন না, কাল সকালে দেখবেন। আজ এখন খেয়েই শুয়ে পড়া। যতোকণ রান্না না হয় ততোকণ একটু গা গরম করতে হবে।'।

ব্যবস্থাও হলো। শোবার ঘর মাত্র একটি, খাটে দু'জন শোয়া যায়। ড্রয়িং রুমটা অবিশিষ্ট বড়, শোফাসেটও আছে। স্থির হলো কুন্দনন্দিনী আর মিসেস সিগুপি খাটে শোবেন। আমরা সবাই কঞ্চল মুড়ি দিয়ে শোকার ওপরে। কর্নেলের অবস্থা মোটেই ভালো না। তিনি তারপরেও অনেকবার বমি করেছেন।

২২ একটি মাত্র টিম্টিমে হারিকেনের আলো ঘরের মধ্যে একটি লালচে আভাস ছড়িয়ে আছে। ফান্সের প্লেসের আঙনের শিখা ঘরের দেওয়ালে এবং আমাদের গায়ে ঝাঁপছে। আমাদের অতিকার ছায়াগুলোর আকৃতি কিভ। কিছু

হারিকেনের আলো থেকে আঁগুনের আলোই বেশি। মেজর ঘোষালের গা গরম করা কেবল আঁগুনে না, বোতলের তরল আঁগুনেও বটে। আমার কাছেও এখন আর কালো বেড়ালকে নিতান্ত নেশার দ্রব্য মনে হলো না। ক্লাস্তি আর শীত, দুয়ের জুড়ই দরকার।

আমরা ড্রয়িংরুমে আঁগুন ঘিরে বসলেও, কর্নেল সমস্ত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিয়ে, শোবার ঘরের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। শোবার ঘরেও ফায়ার প্রেস ছিল, আঁগুন দেওয়া হয়েছিল সেখানেও। কর্নেল সাহেবকে বলার কিছু নেই। চোখের কোল বসে, তাঁর মুখের চেহারা অবর্ণনীয়। মিসেস সিপ্পি গ্যাংগ্রিলায় চুমুক দিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হাসলেন, বললেন, ‘কর্নেল তো আগেই বিছামা নিয়ে নিলেন।’

মেজর ঘোষাল বললেন, ‘আপনিও ও ঘরেই শোবেন। আমরা তিনজন এ ঘরে ব্যবস্থা করে নেবো।’

মিসেস সিপ্পি কুন্দনন্দিনীর দিকে তাকালেন। কুন্দনন্দিনী শোকার পিঠে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজেছিলেন। আমি তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর পানের মাত্রা এখন কম। তিনি ক্লাস্ত, না কালো বেড়ালের ধাবাগ্রস্ত, বুঝতে পারছি না। অথবা সূখ্য কাতর? এখন বরং মিসেস সিপ্পি তাঁর পানের মাত্রা বাড়িয়েছেন। কুন্দনন্দিনীর দিক থেকে তিনি আমার দিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি, নাকের অলংকার চিক্‌চিক্‌ করছে। তারপরে মেজরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা তিনজন কেমন করে এ ঘরে শোবেন?’

মেজর বললেন, ‘একটা রাজের তো ব্যাপার। কেটে ঘাবে।’

মিসেস সিপ্পি বললেন, ‘নিশ্চয়ই। আমার তো খুব খুঁজি লাগছে। কর্নেলই সব মাটি করলেন।’ বলে হেসে উঠলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে কি এই বাংলা ছাড়া, আর কোনো বসতি নেই?’

মেজর বললেন, ‘আছে। তিব্বতী রিকিউজিদের একটা মনালি আছে, আর সামান্য কয়েক ঘরের বাস। এখানকার মনালিতে দশ বারো বছরের বালক লামাও আছে। ভগবান বুদ্ধের কাছে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে।’

মেজর মিসেস সিপ্পির জুড়ই ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। মিসেস সিপ্পি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা যখন বড় হবে, তখন কি বিয়ে করতে পারবে?’

মেজর বললেন, ‘সম্ভবত না। তবে এই সব মঠে সম্ভবত একটা সাধারণ ব্যাপার। তেমন গোপনীয়তা নেই।’

মিসেস সিপ্পি হেসে উঠে খাস ভাষায় বলে উঠলেন, ‘লণ্ডোবাসী?’

মেজর বললেন, ‘একেবারেই না। আমাদের সভ্যতায় সেটা যেমন সেজে-গুজে ব্যবসার বিষয়, এখানে সে রকম মোটেই না। এর জন্ত কেউ তাদের দাড়ি কাষায় না, গালে রঙ মাখে না, আর তা নিয়ে কোনো রকম খারাপ আলোচনাও হয় না। কেউ তার জন্ত লজ্জিতও না।’

এই সময়ে কুন্দনন্দিনী হঠাৎ মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি এখন শুতে চাই।’

দেখলাম, তাঁর চোখ আরক্ত, মুখে ও কথার স্বরে বিরক্তি ও অসন্তোষ। আমাকেই কথাটা বলার জন্ত অবাধ হলো। মেজর তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, ‘আমি এখন দেখে আসছি, খাবার হলো কী না।’ বলে তিনি বন্ধ দরজা খুলে বাইরে গেলেন।

কুন্দনন্দিনীর মুখ একপাশে এলিয়ে পড়লো, কিন্তু চোখের কোণে তিনি আমার দিকে জ্রুটি চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করে, মুখ ফেরাবার আগেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি মহাভারত পড়েছ?’

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক, আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। তিনি আবার বলে উঠলেন, ‘তোমার কোনো ধর্মবোধ নেই, যতোই তোমার ইটারনিটির মন থাকুক।’ বলেই তিনি সোফার পিঠে মুখ গুঁজে দিলেন।

আমি বিভ্রান্ত চোখ তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে, মিসেস সিপ্পির দিকে তাকলাম। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি কী বুঝেছেন, জানি না, তেমনই ঠোঁটের কোণে হাসলেন। আর এই মুহূর্তেই হারিকেনটা দপ্-দপ্-করে নিভে গেল। আঙুনের শিখাও এখন কম। ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা অঙ্কুর নেমে এলো। মেজর ঘোবালাও এই সময়েই বলতে বলতে চুকলেন, ‘খাবার রেডি। কী হলো? হারিকেনটা নিভে গেল?’

বলে তিনি নিজেই ডাইনিং টেবলের ওপরে রাখা হারিকেন ধরে ঝাঁকুনি দিলেন, বললেন, ‘হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, তাই, তেল শেষ।’

আমি বললাম, ‘তেল ভরতে হবে।’

‘কেরোসিন তেল কোথায় মশাই?’ মেজর বললেন, ‘কেরোসিন এ সব অঞ্চলে দোনার চেয়ে দামী। কেউ ব্যবহার করতে পারে না। ইয়াকের চর্বিল তেল ছাড়া, কেউ বাতি জ্বালে না। মন্দিরেই হোক, আর ঘরেই হোক। এবার

আমাদেরও সেই চব্বার প্রদীপ জ্বালাতে হবে।' তিনি আবার দরজার কাছে গিয়ে, পাল্লা খুলে চিংকার করে কিছু বললেন। একটু পরেই চব্বার প্রদীপ এসে গেল, যার গন্ধ আলাদা। খাবারও এসে গেল। গরম ভাত আর মুরগীর মাংস। মাংস রান্না না বলে, এক রকম সিদ্ধ বলা যায়। কিন্তু কুন্দনন্দিনীকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তিনি কখন চেয়ে নিয়ে, লম্বা শোফার ওপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মিথ্যা বলবো না, কুন্দনন্দিনীর জ্ঞান, ক্ষুধার ঋণ আমি পূর্ণ ভোগ করতে পারলাম না। বারেবারেই মনে পড়তে লাগলো, 'তোমার কোনো ধর্মবোধ নেই।' কথাটা হেসে বললে, আমার কিছু মনে হতো না। কিন্তু তিনি অনেকটা থিকারের স্বরে গম্ভীর ভাবে কথাটা বলেছেন।

খাবার পরে, ডাইনিং টেবল পরিষ্কার করে, তার ওপরে মেজর কবল মুড়ি দিলেন। মিসেস সিপ্পি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। আমি ছোটো শোফা জোড়া লাগিয়ে, কবলের মধ্যে নিজেকে কেন্দ্রের মতো পাকিয়ে ফেললাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন অন্ধকার। আগুন নিভে গিয়েছে। ছোটো কবল ও সোয়েটার গায়ে থাকা সবেও শীত বোধ করছি। কিন্তু আমি পা নামাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। মনে হলো পায়ের কাছেই কেউ কবল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমি নিচু হয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই আমার হাতে রুক্ষ নরম চুলের গোছা ঠেকলো। কুন্দনন্দিনী! কার্পেট পাতা আছে বটে, তা বলে এই মেঝেয়? আমি তাঁকে ঠেলে আস্তে ডাকলাম, 'কুন্দনন্দিনী!'

কুন্দনন্দিনী একটি হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুর কাছে চেপে ধরলেন, এবং পরিপূর্ণ জাগ্রত স্বরে বললেন, 'নন্দিনী তো নয়, কুল বলেছ তুমি আমাকে।'

'কিন্তু এটা ঠিক হয়নি। শোফায় ওঠা উচিত।'

'এই বেশ আছি। তুমি বরং আমার কাছে এসো।'

আমি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি জেগেছিলেন?'

তিনি বললেন, 'ঘুম আসছে না।'

তার ধর্মবোধের কথা আমার আবার মনে পড়লো।

আমি অন্ধকার ঘরে ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকালাম। মেজরের ঘুমন্ত নিশাস শোনা যাচ্ছে। আমি শোফা থেকে নামলাম। কুন্দনন্দিনীর কবলস্থ শরীর দু'হাতে টেনে তুলে বললাম, 'ওঠো।'

ও জোর করলো না। আমি প্রায় 'আন্দাজেই' লখা শোকার নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দিলাম। ভালো করে ঢেকে দিয়ে বললাম, 'ঘুমোও।'

ও আমার হাত টেনে ধরলো। অনেকটা সরে গিয়ে আমাকে টেনে বললো। আমি কি এখন তুষার সিংহের পদতলে? সর্বনাশীর আত্মতুষ্টির আর কতো দূর? কুন্দনন্দিনী আমার গায়ের ওপর কবল তুলে দিল। আমি তার শুণ্ড নিখাসের মধ্যে নিচু স্বরে শুনতে পেলাম, 'ঘুমোও। আমাকে ঘুমোতে দাও।'

সর্বনাশীর প্রপাত ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

আবার বখন আমার ঘুম ভাঙলো, কাঁচের জানলার পর্দার ঝঞ্ঝ ঝঞ্ঝ দিনের আবছা আলো দেখতে পেলাম। আমি সন্তর্পণে কুন্দনন্দিনীর কবল থেকে বেরিয়ে এলাম। মোজা পরাই ছিল। জুতো পায়ে দিলাম। সকলেই ঘুমোচ্ছেন। আমি নিশ্চয় পা টিপে টিপে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো একটি বৌদ্ধ মঠ আর পবিত্র ধ্বজা। আকাশটা যেন শাদা মেঘে আচ্ছন্ন।

বারান্দা থেকে নেমে রাস্তার ওপরে গেলাম। কোথাও একটি জনমানুষ চোখে পড়ছে না। আমাকে টানছে সেই প্রবল জলপ্রপাতের শব্দ। আমি আন্তে আন্তে নিচের দিকে নেমে গেলাম। বাঁদিকে একটা লাল ক্রশ চিহ্ন দেওয়া কুটির চোখে পড়ল। বোধ হয় ডিনপেন্সারি। আরো নিচে নেমে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়লো। সবই বন্ধ। তার পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা নেমে গিয়েছে। শব্দটা কি এদিকেই? নেমে গেলাম, আর তৎক্ষণাৎ আমার চোখের সামনে দূরের আকাশ জেগে উঠলো। আবার সেই বিশাল ঠাকুরদালানের নিচে তুষারের বিশাল উঠোন। এবার অতি নিকটে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। পশ্চিমের পাহাড়ের কোলে বিশাল এক শাদা আর নীল জলের শ্রোত, গভীর নিচে ঝরে পড়েছে। বিশাল এক জলপ্রপাত। কোনো জলপ্রপাতের কথা তো শুনিনি।

আমি আবার সেই তুষারের শৃঙ্খের দিকে তাকালাম, বিশাল মাথা উচু বিগ্রহ সকল। তাদের সর্বাঙ্গ এখন ধূসর। কিন্তু দেখতে দেখতেই একপাশে লালের আভা পড়লো। দ্রুত বড় বদলাতে লাগলো। সহসা আমার বৃকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো। আমার চোখের সামনে বিশাল এক সিংহমূর্তি।

পান্না সবুজ কেশর ফোলানো। সামনের দুই পায়ের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের দুই পায়ের ওপর শরীরের ভার। বুকের তলে হৃগভীর নীল। পিঙ্গল দুই চোখে এদিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি বৌদ্ধ নই। সেই অর্থে হিন্দুই কী? জানি না। আমার দুই করজোড় আপনিই কপালে উঠে গেল। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। আমার ভিতর থেকে যেন কেউ আর্তস্বরে বলে উঠলো, ‘কমা করো, আমাকে কমা করো।’ কুন্দনন্দিনীর মুখ একবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

‘কখন এলেন?’ মেজর ঘোষাল আমার পাশ থেকে বলে উঠলেন।

আমি চমকিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, ‘আমাদের চারদিকেই এখন তুবারগিরি।’

বললাম, ‘আমি তুবার সিংহকে দেখতে পাচ্ছি।’

মেজর অবাক চোখে তাকালেন, বললেন, ‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ওই যে জলপ্রপাত দেখছেন, ওই হলো তিস্তা। তিস্তা ওখান থেকেই প্রথম নিচে নেমেছে। যতোই ওপরে যাবেন, কেবল তুবার আর বরফ। তিস্তা আছে সেইখানে কিন্তু আসল অবতরণিকা এটাই।’

এই তাহলে সেই জায়গা, যেখান থেকে সে সমতলে রণে যাত্রা করেছে। এই তার আতুড়ঘর। সমস্ত তুষারাবৃত পাহাড়ই তার জন্মভূমি। বহু দিনের সাধ। রাজ্যাধিকানা দেখবো। স্বপ্ন সম্পদ মোক্ষ দর্শন এবং লাভ।

তুবার সিংহ রৌদ্রের স্পর্শে আরো যেন প্রকাণ্ড হয়ে উঠছেন। চোখ ফেরাতে পারছি না। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো কুন্দনন্দিনী। সারা গায়ে একটা কবল জড়ানো। আলুথালু চুল। পায়ে জুতো। পাগলিনী, নাকি সর্বনাশী?

হঠাৎ ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে উঠলো, তার সঙ্গে শব্দের গভীর নাদের মতো বিলম্বিত শব্দ। মনে হলো, বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে। কুন্দনন্দিনী আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি তুবার সিংহের দিকে তাকালাম। মনে হলো, তাঁর মুখ লাল আর নীলে মেশানো। পান্না-কেশর উড়ছে। সর্বনাশীর রঙও মুহূর্তে বদলিয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। শিঙার গভীর ধ্বনিতে ভাক শোনা যাচ্ছে। চলো, আপন পতিত জমিনের আবাহে। মানবদের ভাক পড়েছে। ‘ওহে, গরীব আমার প্রাণ!’



তার ডাক শুনেছি অনেক দিন। এমন না যে, সে ডাক আমার শ্রবণ চমকে দিয়ে, চকিত করে তুলেছে। আমার নিত্য দিনের নানা কাজের মধ্যে নানানখানা অকাজের শিথিল আলস্তের মুহূর্তগুলোতে, তার ডাক বেজেছে। শুনেছি। উৎকর্ণ হইনি। শুনেছি। চকিত হয়ে উঠিনি। অনেক শব্দের মধ্যে, সেই ডাকের ধ্বনি, তার আপন স্বরে সুরে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। চেনা দেয়নি। অচিন স্বরে ডাক দিয়েছে। তবু দিয়েছে বারে বারে। আর আমি ছিলাম যেন স্বপ্নের ঘোরে। সে ডাক দিয়ে যায়, আমি শুনে বাই। বলতে গেলে, এমন বলতে হয়, কে যে কাকে ডাকছে, সে চেতন ছিল না।

আবার তাও বলি, দেখেছি তার হাতছানিও। অথচ তাকে চোখে দেখিনি। নিজের মধ্যে কী রহস্য বৃষ্টি না। হেসে বলতে ইচ্ছা করে, পাগল নাকি হে! না কি মাতালের প্রলাপ! বাঁশি শুনেছি, তাকে চোখে দেখা যায়নি, এমন মস্ত-বিশোর কথার তবু মানে বোঝা যায়। ডাক শুনেছি অচিন স্বরে, কিন্তু কে যে কাকে ডাকছে, জানতে পারলে না। ডাক বেজে কিরেছে তার আপন মনে। তোমাকে চকিত করেনি। তারপরে দেখেছি তার হাতছানি; অথচ তাকে চোখে দেখিনি। একি পোড়া চক্ষুর ধন্দ। তাই প্রলাপে বাজো।

কথাটা আসলে তা না। কিন্তু আসলে তা-ই।

লগ্ন বলে একটা কথা আছে। আছে, কি নেই? কেউ বলতে পারবে না, নেই। সব কিছুই, একটা সময় আছে। কিলিয়ে কি আর কাঁঠাল পাকাতে পার? তার শক্ত জ্ঞান নরম করতে পার। কিন্তু রস পাবে না, মিঠা তো বহুত দূর। রস টসটস ফলটি কারোর মুখের কথায়, জাহ্নকরের ভোজবাজীতে রসালো হয় না। কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল। তারপরেও সেই ছোট্ট কচি কাঁচা ফলটি দিনে দিনে বাড়ে, রস টেনে টসটসে রসালো হয়। যা হয়, তা সময়ে হয়। বলব না যে, সব স্বপ্নের নিয়মে বাঁধা। ওটা মাহুঘের তৈরি কথা। জীবনের সঙ্গে, যন্ত্রের কোনো কথা নেই। কিন্তু এমন আমাদের

জীবনের ছক, যে যন্ত্র আমরা বানালাম, সে কিনা আমাদের যান্ত্রিক করে তুলল। প্রকৃতি যন্ত্র না। মানুষও যন্ত্র না। ঋতুর আবর্তে, প্রকৃতিকে মনে হয় বটে, সে বৃষ্টি একটা ধারা-বাঁধা নিয়মে চলছে। বুদ্ধিতে শান দেওয়া মানুষের বড় দেমাক। তাই প্রকৃতিকেও তারা বন্দিনী বলতে চায়। যেমন কি না বলে, ‘প্রকৃতিকে জয় করবে মানুষ।’ শিশুর আবোল-তাবোল বলে কানে বাজে। ইচ্ছা করে, স্বকুমার রায় মশাইকে ভেকে বলি, ওগো মশাই, এসব বিজ্ঞানীদের কচকচি নিয়ে, স্বর্গ থেকে নতুন একটা আবোল-তাবোল লিখে পাঠান। বলে দিন এসব মতলববাজদের, অকারণ মানুষকে যেন গোঁয়ার করে না তোলে। মানুষ তার নিজের ক্ষমতার ওপর যেন আত্মবান থাকে, ভৌতিক শক্তির বলে লাফালাফি না করে। প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। চাঁদের বুকে জুজুপায়ে হাঁটলেও না। প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে লেনা-দেনা ছাড়া, সম্পর্ক অচল। প্রকৃতির রসদ দিয়েই, প্রকৃতিকে তিলে তিলে আবিষ্কার করা যায়। আবিষ্কার, জয় না।

কিন্তু এসব বিতর্কের শ্রোতে আমি কেন। তর্কের কি শেষ আছে। ও বড় কুট-কচালে বিষয়। আমি না হব তর্কতীর্থ, তর্ক-চূড়ামণি। ওসব থাকুক গিয়ে স্ত্রায়শাস্ত্রের কচকচিতে। বলে দাও, বিশ্বাসে বস্তু মেলে, তর্কে না। তবে কি না, নিজেকে তো আর সব সময় দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। সকলের সঙ্গে থেকে, সকলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কচকচি না করতে পারলে, নিজেকে দশের এক বলে চেনা যায় না। তখন মেজাজ চাড়া দিয়ে ওঠে বৈকি। কেন মিছামিছি মানুষকে রাবণ বানানো। তার চেয়ে বৃষ্টিয়ে স্নিগ্ধে বেলো, প্রকৃতির মুণ্ড ধরে টানাটানি করা যায় না। মানুষ প্রকৃতির থেকে বড় না। প্রকৃতিরও এমন কোনো জেদ নেই, নিজেকে সে মানুষের থেকে বড় বলে প্রমাণ করার জন্ত উঠে-পড়ে লেগেছে। সে চলেছে তার আপন চালে। মানুষ তার আপনাতে। লেনা-দেনা ছুঁজনাতে।

তা থাক গিয়ে সে কথা। কথা তো ছিল, লয় নিয়ে। সময় বলে কথা। সময় না হলে, কিছু হয় না। তার মধ্যে একটু যোগ ছিল, সময় হওয়াটা যান্ত্রিক না। একটা নিয়ম আছে বটে। তাও বলি, বিষয় ও কারণে, নিয়ম তার আপন চালেই চলে। সবখানে সে একটা ছকে চলে না।

এত কথাই বা কী দরকার। কথা ছিল ডাকের। কথা ছিল হাতছানির। তার ডাক শুনেছি, অথচ চিনতে পারিনি, চকিত হইনি। দেখেছি তার হাতছানি, তবু কিনা, তাকে দেখতে পাইনি। এখন বল, তুমি বজ্রবানী বৌদ্ধ

না, বাউলও না। তুমি তোমার তত্ত্বকথা গুচ ভাবায় ভালো না। তোমার কথা লোকে শোনে একরকম, অথচ তুমি বল অস্ত্র কথা। পণ্ডিতে বলেছেন একে বলে সঙ্ঘা ভাষা। সঙ্ঘার আবার ভাষা কী? কী আবার। সঙ্ঘা তো সঙ্ঘাই। দিন না, রাত্রিও না। দিনের ভাষা দিনের মতো স্বচ্ছ। রাত্রে মতো অন্ধকার। আর সঙ্ঘার ভাষা সঙ্ঘার মতো। পুরো আলো নেই। পূর্ণ অন্ধকারও নেই। ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট। দেখা যায়, তবু দেখা যায় না। চেনা যায়, তবু চেনা যায় না। ছায়ার মতো একটি মাহুঘ চলে যায়, কিন্তু তাকে চেনা যায় না। চর্যাপদ আর বাউল গানও সেই রকম। তুমি শুনছ গান, মাহুঘের ছায়া দেখার মতো। গায়ক বলেছে তার তত্ত্ব, যা তোমার ধরা ছোয়ার বাইরে। বোঝার পণ্ডিত তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারেন, 'ইহার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। বলিতে গেলে বড় অশ্লীল হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।'...

একজনের তত্ত্বকথা, আর একজনের কাছে অশ্লীল। তা হলেই বুঝেছে, মাহুঘ কত বিপন্নীত রীতিতে চলে। তবে এই বিষয়ে দুয়ারে কাটা। মুখে আমার কলূপ, এ তর্কে যাব না।

তবে আমার কথা গুচ ভাষা না। যাকে বলে সঙ্ঘা ভাষা। আমার ভাষা দিনের ভাষা। দিনের আলোর মতন স্বচ্ছ। ডাক শুনেছি, তবু যে শ্রবণ চমকে চকিত হইনি, হাতছানি দেখেছি, তবু যে তাকে দেখতে পাইনি, তার কারণ তো আর কিছু না, তার কারণ, সময় হয়নি। সেই লয়টি আসেনি। ঠিক ঘণ্টাটি বাজেনি। তাই যে ডাক আমি শুনেছি, সে ডাক আমার, নানা কাজ অকাজের মাঝে রোজ ফিরেছে। বলতে পার, ঘুমের বোরে ডাক শোনার মতো। শুনেছি, স্বপ্ন চিনতে পারিনি। কথা বুঝতে পারিনি। হাতছানিটাও সেই রকমের। হঠাৎ কোনো এক দুপুরের উত্তলা বাতাসে, সহসা পাখির ডাকে, অথবা এক জলাশয়ের ধারে বিশাল মহীকূলের ছায়ায়, আমি যেন কার হাতছানি দেখতে পেয়েছি। অথচ কার হাতছানি, তা দেখতে পাইনি।

পাওয়া যায় না। '....আমার সময় হয় নাই? ফিরে ফিরে গেলে চলে তাই।'...আর এখন দেখ, আমার শ্রবণ চকিত, ডাক তার স্পষ্ট। ডাক শুনতে পাচ্ছি এই কান্ডনের পাতা ঝরার শব্দে। ফুল যখন ডালে ডালে। মৌমাছিয়া গুঞ্জে। ডাক শোনা যাচ্ছে, দূর নীল পাহাড় থেকে, সবুজ বনের গভীর থেকে। হাতছানি স্পষ্ট, এই তো তার রূপের ছায়া ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে, যে মৃত্তিকা বড় ফেরাল, বন্ধুর

হল। সোনালি বালি আর পাথরের কুল ভাসিয়ে, এক দিকের নদী বেখানে নাম নিল স্ববর্ণরেখা। আর একদিকের নদী কলকলিয়ে বলল, 'আমি কোয়েল।' পাহাড়ের বুক থেকে নেমে, পাথর ভাসিয়ে চলি গভীর অরণ্যে। শুধু কোয়েল না। কুলকুল ঝরঝর করে কেবল পাক খেয়ে নামে আর নামে, বনের ছায়ার, যেন লুকোচুরি খেলে পাহাড় বনের সঙ্গে, নাম তার কোয়েল। হাতছানির আরো স্পষ্ট রূপ যদি দেখতে চাও, তবে দেখো না, সেইসব বনবালাদের। যারা হাসে নাচে, গানে কাজে বাজে। সঙ্গে বনের মানবকুল। রূপ আর শব্দ, হাতছানি আর ডাক, সব সেখান থেকে। ভূগোলের হিসাব যদি চাও, তা হলে চেয়ে দেখো, বাংলার ভূপ্রকৃতির দক্ষিণ-পশ্চিমে। উত্তরের টানও থাকবে। নাম কি স্থানের? ছোটনাগপুর? পাশ ঘেঁষে, উড়িষ্যা প্রদেশের গায়ে ঢলে পড়া? তবে তাই। চলো, ডাক এসেছে সেই নীলপাহাড় থেকে, সবুজ বন থেকে, ইম্পাতরঙ নদী-নিঝর থেকে, নানারঙ ফুল পাখি পতঙ্গ প্রজাপতির কাছ থেকে।

সময় হয়েছে, তাই চকিত মন, বিবাকী খুশির ঘরছাড়া ডানায় বেগ পেয়েছে। চল ঝাই বনে। কেবল এইটুকু বললেই কি হয়। এ ঘরছাড়া বনের ডাক কি, বনভোজনের ডাক। না, এমন করে ভাবতে ইচ্ছা করে না। ভোজন একরকম বলতে পার। সব স্বাদ আনন্দন কেবল মুখে না। জিত দিয়ে চেখে, রস তারিয়ে, একেবারে জঠরে! এক কথায় ভোজন বললে, তাই বোঝায়। কিন্তু এমন ভোজনও তো ঘটে, যখন জঠরজালা জ্বলে না। জিত খুল স্বাদের কথা ভুলে যায়। অথচ প্রাণভরা ক্ষুধা। বড় ক্ষুধা, ক্ষুধার হাহাকার। তখনো কিন্তু প্রাণভরে কথাটা সেই, 'ঝাই ঝাই'। কী খেলে প্রাণ ভরে, সেই আহাবের ভাবনা।

এবার বনের ডাক সেই প্রাণ ভরানোর ভোজনের ডাক। বনভোজন নয়। বনভোজন। কথাটা এল কোথা থেকে? কথাটা তৈরি করেছে মাহুত, উৎসবের আনন্দটাও মাহুতের ভোগের। চডুইভাতি কথাটা যেন কানের কাছে ঝংকার দিচ্ছে। বনভোজনের সঙ্গে চডুইভাতির কোথায় একটা মিল আছে। চডুইভাতিও বনভোজন। চডুইদের বনভোজন। কত দিন কত মাঠের পথ ধরে যেতে গিয়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সেই যে নীল আকাশের বৃকের ওপর, পশ্চিমের ছটা লাগা লম্বা সোনালী দাগের গা ঘেঁষে, হঠাৎ একটা ঝলকের মতো তাদের দেখতে পেয়েছি বলা যায় না, দেখতে না দেখতেই, যেন মল্লবলে ছিটিয়ে, শতে না হাজারে, কে জানে, স্তূপকাপ

ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেখানে খানিক বন, খানিক মাঠ। তখন ভাকাডাকি নেই। অল্প সময় যেমন ম্লল কঁমকঁমানো বাজনার মতো কঁমকঁমিয়ে বাজে। এমন কি চক্ষেও দেখতে পাবে না। কেন না, তখন ভোজন হচ্ছে। চড়ুইদের চড়ুইভাতি করেক পলক পড়েছে কি না পড়েছে, তারপরেই আবার দেখ, মাঠ বন ছাপিয়ে, আকাশে ঝিলিক হেনে, উধাও হল কোথায়।

এই চড়ুইভাতির ভোজন দেখে কি মানুষ বলল, চল আমরা বনভোজনে বাই। চড়ুই হয়ে, চড়ুইভাতি করি গিয়ে। দেওয়াল ঘেরা মাথা ঢাকা ঘরের মধ্যে, স্থায়ী আখাতে আগুন দিয়ে, অল্প-বাঞ্ছন পাক তো বোজই আছে। গোছগাছ পোছপোছ করে, নেটোপেটো হয়ে ভোজন তো দুই বেলা। একদিন কেন পাখি হই না? বনে যখন পাতা ঝরে, মাঠ যখন ফসলের দায়মুক্ত, উত্তরায়ণের রৌদ্রতাপে রক্তে যখন হৃথের উত্তাপ, আকাশ নীল হল আরো, আর কনকনিরে বাতাস আসে হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে, তখন পাখি হয়ে চল যাই বনে। কুটোকাটি পাতা ঝারি, যা-পাই, তা-ই জালি। সংগ্রহের কোনো তরিকত নেই, ঘর বাজার থেকে যা জুটেছে, তাই নিয়ে এসেছি। জল আছে ওই দেখ, তুমি পাখি হয়েছ, বনের পাখিরাও এসেছে। পিছনে পিছনে গাঁয়ের পাহারাদাররাও এসে দিবি লাজ নাড়াচ্ছে। গোড়া থেকেই নিজেদের মধ্যে রেবারেবি। পাত চাটাচাটিতে ব্যজ করো না। কামড়া-কামড়ি হয়ে যাবে কিন্তু।

প্রকৃতির ধন, প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে চায়। তাই পাখি হয়ে বনভোজন। তা যদি বলি, তবে মেলা কাকে বলে? সেও তো বনভোজনের আর এক রূপ। আজকের জগাখিচুড়ি বে-রঙা মেলাগুলোর কথা বলছি না। সেই যাকে বলত, ‘পল্লী বাংলার মেলা’ তার কথা বলছি। তার সঙ্গেও কি বনভোজনের কোনো যোগ ছিল? অল্প কথাও মনে থাকে। হেমন্তে শীতে বসন্তে, সেই সব মেলা, অল্প পত্ত শিল্পসামগ্রীর লেনাদেনার হাটও বটে। উপলক্ষ প্রায় ক্ষেত্রেই ধর্মীয়। হয়তো শরণোৎসব, দ্বারকোৎসব, অথবা কোনো পার্বন বা তিথি উৎসব। কিন্তু ঘরে বসে না, বাইরে, বনে আর মাঠে। এখন না হয়, মেলার ডাক শুনলে, অল্পব্যঞ্জনওয়ালারা তাদের হাতা হাড়ি খোস্তা বেড়ি নিয়ে ছুটে আসে। তাঁবু খাটায়, না তো চালা বাঁধে, গায়ে একটা লিখন লটকে দেয়, ‘অমুক হিন্দু হোটেল’ অথবা ‘জয় মোরশেদ হোটেলখানা’। কিন্তু মেলার আড্ডিকালে এই সব শহরে পাচক রত্নইওয়ালাদের কান্নবার ছিল না।

মেলা এখন বনভোজনের আসর। যেমন কী না, উপলক্ষ করে এলে, গুল

জয়দেবের মেলায়, দু'দিন রইলে থাকলে ঘুরলে বেড়ালে, কেনাকাটা করলে কাস্টেটা হাতুড়িটা খুনিপাতাটা জলসৈঁচাটা, মায় দরকার পড়লে চেকি ধুওয়া জানলার পান্না, কিন্তু তার মধ্যে অজয়ের বালিচরে কাঠ পাত্তা জালিয়ে রাবো খেলে, মন মস্তরের গান শুনলে, সেটা কিছু কম না। বনভোজনটা আরো বড় কথা। বনভোজনের মানত করতে হয় যে। কেমন? না, ঠাকুর আসছে বছর যদি তোমার রূপা হয়, তবে তোমার খানে এসে বসত করব দিন সাত, তোমার সেবা করব, বেঁধে বেড়ে খাব। মানতে ঘাট রাখব না ঠাকুর, সাকুল্যে হাঁটা পথে আর মোটরবাসে তিন কুড়ি বারো মাইল রাস্তা, তোমার রাস্তা, তোমার নাম করে হেঁটে আসব।

কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সত্যি কঠিন কী? নিজের চোখে দেখেছি যে। সারা গায়ে মাথায় পায়ে ধূলা মেখে, মানভের স্বাক্ষরী এল মেলার খানে। ক্লাস্তি আছে, ক্লেশ কোথায় হে। এসে যে পৌছনো গেল তাইতে প্রাণ ভরা। তারপরে দেখ, ধূলা ধুয়ে নিয়ে, গাছতলা ঝাঁট পাট দিয়ে নিকিয়ে, কলাপাতায় কেমন ফালা ফালা করে ঝুটিতে বেগুন কেটে সাজিয়েছে। শাকপাতা কুচিয়ে জড়ো করেছে। মাটি খুঁড়ে, ঢালা সাজানো চুলায়, হাড়িতে বগবগ করে ডালে চালে কথা কয়। নাকে একবার বাস নিয়ে দেখ। মহাপ্রাণী উদ্ভীষ্ট হবে। তার মধ্যেই বা শুনতে পাবে, পাশে বসে কে যেন কোন দূরে চলে গিয়েছে, স্থব করে বলছে, 'ও পাখি, কখন এলি, ভোজন করলি, আমার ভজন হল না....' অল্প দিকে বা কার ভেজা চুল পিঠে এলিয়ে পড়েছে, অথবা বৃকের আঁচল কাজের বাগে বেসামাল, তার মধ্যেই ধরতাই, 'তারপরেতে তিনি যখন পুকুরের জল থেকে ডুব দিয়ে উঠলেন, ওম্মা! কোথায় সেই গায়ের ঘা পাঁচড়া। কোথায় বা সেই বোজা চোখ। দিবা দুটি বড় বড় চোখ, কালো কুচকুচে তাষা, চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে সেই অ-বোলা মাহুঘ চিরজন্মো যে বোবা, সে ডাক দিয়ে উঠল, "জয় গুরু।" শুনে সকলের গায়ে যেমন কাঁটা দেয়, তেমনি আনন্দে ভেসে যায়। সেই থেকে....'

গাছতলার রাস্তা, গান, গুরুর জীবনকথা—একে বলে বনভোজন। যে উপলক্ষে, যে নামেই বল, আসলে তো ঘর ছেড়ে প্রকৃতির কাছে যাওয়া। প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একটু থাক। চড়ুইয়ের কাছেই শিখে থাক, আর যার কাছ থেকেই পেয়ে থাক। আজকাল বনভোজনের নয়া নাম কী? ফিস্টি! বিজ্ঞপ করে যে হাসব, তাও পারি না। গা জলে যায়? তাও না। লজ্জা করে। যে সমাজে বাস করি, সে সমাজে আত্মগোপন করে থাক। যার না। মনে

মনে থাকতে হয়। মনে মনেই থাকি। কিস্টি যাজ্ঞার ছবিটা দেখেছ? নাচন-কৌশনে কোনো ব্যঙ্গ দেখি না। একটু গান বাজনা গাল গল্প জমবে না, তা হয় না। শোকযাজ্ঞায় তো বেরোয়নি কেউ। কিন্তু মাজা রাখবি তো রে ভাই। একটা অচিন মেয়েকে জীবনে কোনো দিন হাসাতে পারলি না, আওয়াজ দিয়ে খেউড় করলি। জীবনে কোনো দিন জানতে পারলি না, সংসারে সকলেরই দু-কূল ভরা হাসি আছে রাশি রাশি। বাজাতে না জানলে তা বাজে না। কিন্তু বাজতেই চায়। তুই না শিখলি বাজাতে, না পারলি বাজাতে, নিজের অপমানবোধটা গেল মরে, আর হাসির বদলে কেবল ধিক্কার, কথাকাটা অবিভি একতরফা না। নিজেকে সম্পর্কে দাবি যাদের ‘শ্রীময়ী’ কথাকাটা তাদের কাছেও। এর মধ্যে জাল-জটিল কিছু নেই। তোমার খুশি খেয়ালের ঐশিখ্যাটিকে মৃদুগর করে, পরের মাথায় মারা কেন। নিজের মধ্যে নিজেরা থাক। কিন্তু নামেই যে গলদ লাগে। কিস্টি! শুনলেই যে ধ্বনি আর চিত্রটি মনে আসে, বড় ভয় ধরানো।

কিন্তু ব্যাপার কি। নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, আমার ব্যাপার কী? বলেছিলাম ধান ভানতে, গাইছি শিবের গীত। কথা ছিল, চল যাই বনে। বনভোজনে না, তবে এক রকমের ভোজনে। তার থেকে সাতকাণ্ড রামায়ণ। সে কথা থাক গিয়ে, এই বনের ডাকটা কেমন? বলব না, বনবাসের ডাক। আমাদের রক্তে যে বনবাস অন্তর কথা বলে। বনবাস হুংখের, শান্তির, নির্বাসনের, পলায়নের। বনে যাব, কিন্তু বনবাসে না। তপস্তায় যাব নাকি? মানুষ দেখছি, নিজেকেও লজ্জা দিতে ছাড়ে না। সংসারের কুলে কুলে ঘাটে বাটে বন্দরে ভেসে বেড়াচ্ছি, কখনো হাল ছাড়িনি, লগি ছাড়িনি। নিজের সব কিছু নিয়ে বিকিয়ে বেড়াচ্ছি। সবাইকে ডেকে ডেকে বলছি, এনেছি পুরা, নাও হে। সর্বাংশে, যাকে বলে একেবারে কোটির মতো বাঁচতে চেয়েছি। আমি যাব তপস্তায়? এ জীবনের কোথাও তার একটুও ছাড়া নেই। যদি কোনো দিন কোনো এক অজানা মুহূর্তে সহসা দীর্ঘশ্বাস পড়ে থাকে, সে কথাও জানি না। নিজেরই অগোচরে, হয়তো কখনো কোনো এক অজানার ধ্যানে বসতে চেয়েছি। গভীর তপস্তায় মগ্ন হতে চেয়েছি। সে অজানা কে, কী তার রূপ, কেন বা তার তবে ধ্যান তপস্তা, সে সব কিছুই জানি না। মনের মধ্যে সে আপনি জেগেছে, আমার সকল ক্ষুদ্রতার তাড়নায়, আবার আপনি কখন হারিয়ে গিয়েছে। দূর প্রাক্কানের বিদ্যাক্রমকের মতো মন হঠাৎ কেন চমকেছে, আর দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, জানতে পারিনি।

না, বনে বাব, তপস্শায় না। কিন্তু মন যে বলে তপস্শায়ই ধান হল বন। অতএব চল, বনের তীর্থক্ষেত্রে। তবু মনটা যে খুঁতখুঁত করে। বন বললেই হৃন্দরবনের কথা মনে পড়ে যায়। সে এক চোখ জুড়ানো, লবণাক্ত জলবাশির ঢেউ-লাঙ্গিত বন-কূল। চোখে আগ্নেয় মায়া লেগে যায়। অথচ শিরদাঁড়ার কাছে কেমন একটা কাঁপন লেগে থাকে। প্রাণ ভোলানো সৌন্দর্যের সঙ্গ, মৃত্যু ফেরে পায়ে পায়ে, তার নাম হৃন্দরবন। তোমাকে কেউ বলে দেবে না। বুঝিয়ে দেবে না। পারাপারহীন রায়মঙ্গলের কূলে, বেলাশেষে যখন নৌকার ছইয়ের ওপর বসে থাকবে, আর দূরে সেই বিশাল অজগরের মতো নদীর বুকে আঁকেবাকে যে ঢলছিল, সে আন্তে আন্তে শত শত বালিশাঁসের রূপ ধরে আকাশে উড়বে, হারিয়ে যাবে বনাঞ্চলের ছায়ায়, তখন জলে স্থলে সর্বত্র রূপের অধিক, আরো কিছু তোমার মনের মধ্যে শিরশির করে উঠবে। অথচ কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কী যেন আছে, সেই লবণাক্ত গভীর জলের স্রোতে, আকাশের গাভীরে, রহস্যঘন বনে। কেন যেন মনে হবে, বনের বহু দূরান্ত ভূমি, ফাঁকা, যতদূরে চোখ যায়, চিকচিক করছে। কিন্তু ছায়ানিবিড়, মাথা ঢাকা বনের জটা স্বর্ষকেই মাথা কুটে তপস্শা করতে হয় সেখানে হাজিরা দেবার জন্ত।

কিন্তু এসব কূটকচালে কথা থাক। বন না বলতে চাও, অরণ্য বল। তাও যদি না বলতে চাও, জঙ্গল বল। ডাক যখন পেয়েছ, হাতছানি যখন ঘর ছাড়ার ডানায় বেগ দিয়েছে, স্বরায় চল। সত্যি বলতে কি, যা দেখি, তারই কি নাম দেওয়া যায়? নাম ভুলে তো, শেষ পর্বত যা থাকে, তা একটা ছবি, কিছু শব্দ। নামের কথা তখন কে বা মনে রাখে।

একটা ভৌগোলিক পরিচয় আগেই দিয়েছি। জায়গার নিশানা থাকে বলে। পথের ঠিকানাও বাতলে দিতে পারি। রেলগাড়িতে চেপে গেলে, চলে যাও সেই লৌহনগরী পার হয়ে, যার নাম টাটানগর। আর যদি পায়ে চলা পথ ধরো, ধরতে পার, জানে কুলাবে না। তখন যেমন তেমন হাওয়াগাড়িত দরকার হবে। তা সে হাওয়ার চাপ বা দিয়েই বানিয়ে নাও, কয়লা কিংবা তেল। মেদিনীপুর জেলাটি পার হতে হবে। সমুদ্রের ধার দিয়ে না, বিপরীতে, যেখানে মাটি তার কালো রঙ ছাড়িয়ে ক্রমে লাল—লাল—একেবারে সিঁহুরেও যেতে পার, আর সমুদ্রের ঢেউ তখন স্ফুটতে। রাঙা মাটির তবু, হলতে হলতে কখন যেন সে নীল হয়ে যায়, সবুজ হয়ে ওঠে। মিলেমিশে লাল আর কৃষ্ণনীল—তার মাঝখানেই হঠাৎ দেখলে সোনার কূলের ছটা লাগছে চোখে, রূপোলী কলসিনী বাজে খিলখিলিয়ে।

ধর ছাড়া বিবাহী হয়ে বেরোইনি। কোলাবুলি নিয়ে তাই, রেলগাড়িতেই ঘোড় দিয়েছি। পথের কষ্ট সহবে না। গায়ে গতরে একটু নগর চালের অভ্যাস আছে কি না। সন্ন্যাসের বনবাসযাত্রা তাই সম্ভব না। তবে যে আমাকে ভাক দিয়েছে, আমি যে কেবল তার খুশি বলমলে হাসিটি দেখেছি তা না। তার গভীরের একটা কল্পনার ছবি, কেমন যেন গভীর আর নম্র আর উদাস করে তুলতে চেয়েছে। তা না হলে, হঠাৎ একটা ইন্টিশনের নাম পড়ে, মনটা এমন বিষম নির্বাক হয়ে গেল কেন। এই ‘ঘাটগীলা’ ইন্টিশনে কী মায়া লেগে আছে? ফলকে অম্ল নাম ভাসে কেন আমার চোখে। মাথা নত হয়ে আসে। মনে মনে বলি, ঘাই তোমারই ধ্যানাসনের সন্ধান। তীব্র বিষের নিজের কি কোনো জ্বালাবোধ আছে? আমি কালকূট। হলাহল গভীর। আর কিছু না, তীর্থক্ষেত্রের ঝাপাতার নিবিড় ছায়ায়, অমৃতের একটু বাতাস যদি ছুঁয়ে যায়।

‘শালাগোর ষত বাটপাড়ি আর জুয়াচুরি।’

আশেপাশে কথাবার্তা অনেকক্ষণ ধরেই শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাষাও ভিন্নতর, বহুবিধ। কিন্তু এমন নিপাট ক্লেভ আর দুঃখ মেশানো, কেমন যেন একটু শোয়িয়া টানের কথা শুনিনি। কিংবা শুনেছি, কানে বাজেনি। রাত পোহাবার পর থেকে, ধলভূমগড়ের প্রকৃতি সেই যে চোখ টেনে নিয়ে গিয়েছে, তাকে আর এই রেলগাড়ির খুপরিতে কিরিয়ে আনতে পারিনি। এত মুখতা কেন। চোখের তারায় তো অনেক দিনের দাগ, তবু এত অবাক চিকচিক কেন। সংসারে এত বিশ্বাস ছড়ানো, আর ধলভূমগড়ের প্রকৃতি এমন করে মজিয়ে দিলে চলে! বিজ্ঞ বিবেচকরা হাসবে যে। শিশু তো না।

তা না। মদ খেয়েছি যে। খেলেই যে মাতাল হই। কী করব, খেয়ে মাতাল হই না, হৃদয়ের এমন জোর কখনো কোনো দিন হয়নি। ধলভূমগড়ের প্রকৃতি যদি দৃষ্টি চুঁইয়ে রস দেয়, আমি কি করব। কিন্তু এবার আর মুখ না কিরিয়ে পারলাম না। কিরিয়ে দেখলাম, হা পোড়াকপাল। সত্যি দুঃখেরই কথা। ক্লেভ হবারই কথা। প্রায় বাটের কাছে বয়স মহাশয়ের। মাথা জোড়া টাক, পাতলা ধূসর পাড় তিন দিক ঘিরে আছে। গায়ে একটি আধ-ময়লা জামা, তার বোতামগুলো সবই খোলা। বুকেব কেশ আর ধূসর নেই। শুভ্র। তার মাঝখান দিয়ে, নিত্য তৈলমর্দনের সাক্ষী পৈতাটি দর্শনীয়। মোটা ধুতিটি তুলেছেন অনেকখানি, তাতেই সাব্যস্ত, কেন না, স্বস্তি। পদযুগল পাছুকাযুক্ত।

কিন্তু বর্ণনাটা সব না। বর্ণনা এখন মুখের। দু-একদিনের আকাটা পৌক

কাড়ি, গোলগাল ভাবের মুখে কপালে কিছু ভাঁজ, নাকটি সব দিক দিয়েই বিশিষ্ট, যেমন খাড়াই, তেমনি ক্ষীত। দাঁত সব আছে কী না, টের পাচ্ছি না, তবে পানের ছোপ লাগানো দুটি দাঁতে একটি পোড়া বিড়ি কামড়ে ধরা আছে। হাতে কাঠিবিহীন শূন্য দেশলাই, পায়ের কাছে নিদেন এক ডঙ্কনের বেশি কাঠি পড়ে আছে। আমি মুখ ঝেঁয়াতেই চোখাচোখি। বিরক্ত ভ্রুকৃষ্টির সঙ্গে সত্যিকারের স্ফোভ। দাঁতে বিড়ি কামড়ে রেখেই, পায়ের দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘শালার কাণ্ড দেখেছেন, এতগুলানের মধ্যে একটাও জ্বলল না!’

সত্যি, এর থেকে আক্ষেপের কিছু থাকতে পারে না। নেশা গেল তলিয়ে, আগুন জ্বলল না। এতে কুশকাটা নিমূল করতে ইচ্ছা কার না করে। চাণক্যের দোষ কী। মহাশয় শূন্য দেশলাইটা আমার চোখের সামনে তুলে দেখিয়ে আবার বললেন, ‘আ্যা, বর্ষা বাদলার দিন না, শুকনো খটখটে, কালরাত্রে কিনেছি। চারটে বিড়ি জ্বালাতে পেরেছি কী না সন্দেহ। আ্যা, শালাগোর ব্যবসা দেখেছেন, আ্যা? এই করেই বাঙালীর ব্যবসা ভাবে। এত ফাঁকি দিলে হয়?’

‘আমি সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করি, ‘বাঙালী কোম্পানীর দেশলাই নাকি এটা?’

ভদ্রলোকের এক কথা, ‘তা না হলে এরকম হয়? দেন, দেন তো আপনার ম্যাচটা, আগে বিড়িটা ধরাই।’

অবিশ্বাস। আগে দুটো টান হোক। দেশলাই বের করে দিয়েও, মনটা মানল না। মহাশয়ের হাতের দেশলাইটি বাংলাদেশের তৈরিই না। সে কথা বলে, স্ফোভের বোকা বাড়াতে চাই না। উনিও তো স্পষ্টতই বাঙালী। আমাদের সকলেরই যে বাঙালীর কপাল। কিন্তু কপাল খারাপ আমার ম্যাচেরও। সে যে কেবল ঝিলিক মারে, ফুচুক করে, বিড়ি জ্বলে না। যত জ্বলে না, তত জেদ বাড়ে, স্ফোভ বাড়ে, আধখানা বিড়ি ভিজে মুখের মধ্যে চলে বাবার ষোগাড়।

এ সময়েই কাঁচা গলায় ঝাঁঝের স্বর বাজে, ‘আরে ধুতোরি, তোমার ওই বিড়িটা ফ্যালো দিকি নি, ওটার আর কোনো পদার্থ নেই। নতুন একটা ধরাও না।’

তাকিয়ে দেখি, আঠারো কুড়ির জোয়ান। সূচ্যগ্র কৃষ্ণ গৌর, একমাথা কৃষ্ণ চুল, মোটাসোটা, শার্ট-ট্রাউজার পরনে। এই ঝাঁঝের পরেই, কী স্বর বাজা উচিত, বোঝবার আগেই থিলথিল হাসি, জোয়ানের পাশ থেকে। রোগা রোগা ভামলী, ওই বোকাবোকার সীমারেই হবে। চূলে বাসি বিহুনি, ঝামাডু ছুরে শাড়ি, হাতে বুঝি কয়েক পাছা চুড়ি, হবে হয়তো কানের লতিতে কিছু

চিকচিক করছে। গ্রামীণ ভাবটাই বেশি, কালো তুলা, ভাগর চোখ, হাসিটি খুশিতে টলটলানো। তার ওপরে যদি কিছু কিঞ্চিৎ লজ্জার ছটা লেগে থাকে, থাকতে পারে। বলল, 'বাবার যা কাণ্ড, সেই তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি, ঘুনসি পোড়ানো বিড়িটা ধরাবার জন্ত, দশ গুণা কাটি পুড়িয়ে নষ্ট করলে।'

এতক্ষণে বোধহয় মহাশয়ের একটু মনে হল, কথাটার মধ্যে কোথাও একটু সত্যি আছে। সবটাই ম্যাচের দোষ না। সেই ভেবেই পোড়া বিড়িটা ধ্বংসনমুক্ত করে, চোখের সামনে এনে দেখলেন। পোড়া ছাই, আঙুল খুঁটিয়ে ফেললেন। কিন্তু মুখের ভাব প্রসন্ন হল না। বললেন, 'না, সোলেমানের দোকান থেকে আর বিড়ি কিনব না। ব্যাটা দিনে দিনে বিড়ির সাইজ ছোট করছে। তা না হলে, দু-টানও তো দিই নি। এর মধ্যেই ঘুনসিতক পুড়ে গেছে।'

ঘুনসি, তাও আবার বিড়ির। শিশুদের কোমরে যা থাকে, স্ত্রীতোর বন্ধনী। বিড়িরও তেমনি ঘুনসি। মহাশয় এবার পোড়া বিড়িটি, চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। বুকপকেট থেকে একটি ভাঙা বাঙিল বের করে, বিড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিপলেন। কানের কাছে শুকনো তামাকের আওয়াজ নিলেন। তারপরে দাঁতে চেপে ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, যখন একটু আরাম বোধ করলেন, তখন বললেন, 'একটা পান দাও গো।'

আশেপাশে আরো অনেক লোক। দু-পাশের বেষ্টির মাঝখানে, লটবহর নিয়ে অনেকেই বসে গিয়েছে। দেখলেই বোকা যায়, এই বনদেশের নরনারী। পাড়ি বিভিন্ন অঞ্চলে। লটবহরের মধ্যে, বাক্সো-প্যাটারি বলে কিছু নেই। অধিকাংশই বোচকা-বুঁচকি, পোটলা-পুঁটলি। কি সামগ্রী চলেছে, কে জানে। কেবল এইটুকু দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর সরলতম নিষ্পাপ নরনারী, স্বাস্থ্যে যাদের কৃষ্ণ সূর্যের ছটা, অরূপ যৌবন প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। সভ্যতার যা সুন্দর, সেই লজ্জা এখানে পাপ।

মহাশয়ের পায়ের কাছে বসে, একটি বনবালা কিশোরী দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিগুলো জড়ো করছে। কেন, তা কে জানে। ইতিমধ্যে পান এল কন্ডার হাত দিয়ে। কন্ডার পাশেই, পকাশোধের সধবাকে দেখলেই বোকা যায়, তিনি এখনো ঘোমটা টানা, সহবতে চলা প্রায় বৌটি। হাতের শাঁখা লোহা আর বিবর্ণ চুড়ি, আটপোরে ধরনের শাড়ি, পানের কোঁটা, সব কিছুই বলে দেয়, পরিবারটিও একটি আটপোরে বাঙালী পরিবার। পুত্র-কন্যা-পত্নী নিয়ে কোথাও যাত্রা করেছেন। তবে শুরু থেকে যে যাত্রা করেননি, সেটা মনে আছে। হাওড়ায়

এ পরিবারকে দেখতে পাইনি। মনে হয়, ইম্পাতনগরী থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। শুরুর যাত্রী, যাদের দু-চার মুখের ছবি দেখেছিলাম, তাঁরা অনেকেই নেই। কে কখন কার গন্তব্যে নেমে গিয়েছে। গাড়িখানি তেমন রাজকীয় না। রাত্রে দিকে যদি বা কিছু দোঁড় ছিল, দিনের বেলা দেখছি, দোঁড় অনেক কম। কোনো ইন্টিনের মায়া সে ছাড়তে পারছে না।

না পারুক। ক্রমে প্রকৃতি নয়ন-ভোলানো হচ্ছে। বনের নিবিড়তা বাড়ছে। সব থেকে যে অবাক করছে, তা হল রঙ। এত বর্ণ, কোনো বনে কি আর দেখেছি! নাম জানি না গাছের, নাম জানি না ফুলের। ক্ষতি নেই। কিন্তু এ মৃত্তিকার রসের ধারায় এ কি জাদু, যেন রঙের ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছে।

‘কী, কী, কী চাই কী?’

মোট। স্বরের ঝাঁজালো কাশালো ধমক শুনে, তাকিয়ে দেখতে হল। মহাশয়ের বিরক্ত দৃষ্টি তাঁর পায়ের কাছে। সেখানে একটি কিশোরী বনবালিকে দেখতে পেয়েছিলাম, পোড়া কাঠি সংগ্রহ করছে। এখন দেখছি, তার পাশে এক জোয়ান বনবাসী। একটি নিষ্পাপ কিন্তু সজ্জিত হাসি তার মুখে। হাতে ধরা—ওটা কী? বিড়ি? লম্বায় নিদেন ছ’ইঞ্চি, মোটা ততোধিক না যে, চুরুট বলব। কাছাকাছি। মহাশয়ের দিকে চেয়ে, হাসিটা একটু কক্ষণ করে বলল, ‘দে না।’

মহাশয় ধমক দিয়ে বললেন, ‘নেই দেগা। তোর ওই ফিকা ধরিয়েগা, আমার বিড়ি নিবে যারগা। ভদ্রলোকের আর কত কাঠি আমি নষ্ট করব। নেন এই নেন তো মশায় আপনার ম্যাচ।’

দেশলাইটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমারই দেশলাই যখন, নিভেই হল। কিন্তু বনবাসীটির অপরাধ কী। মহাশয়ের কাছে আগুন চেয়েছে? মহাশয়ের ভয়, তাঁর বিড়ির আগুন নিভে যাবে, তাই আগুন দেবেন না। ভুল নেশার দায়টা তো বুঝতে হয়। দেখছি, বনবাসীর হাসি-হাসি, একটু বা কক্ষণ, একেবারে আরণ্যক চোখের দৃষ্টি একবার আমাকে ছোঁয়, আর একবার মহাশয়কে। মহাশয় নিবিকার, তাঁর বিড়ির আগুন এখন ঘুন্সির দিকে নেমে চলেছে। তার মানে নেশার স্বপ্নটান বাড়ছে। অগত্যা বনবাসীকে আমিই দেশলাইটি বাড়িয়ে দিই। সে আর কতক্ষণ পরের মুখের ধোঁয়া দেখে চোঁক গিলবে।

কিন্তু এ আবার কী। বনবাসী যে ঘাড় নাড়ে। দেশলাই নিভে চায়

না। আগ বাড়িয়ে উপকার করতে গেলাম। বিমূখ করে দিচ্ছে? বাংলাতেই জিজ্ঞেস করি, ‘চাই না?’

বনবাসীর হাসিটি আরো নিবিড় হল, কারণ হাসিতে চোখ দুটো কোথায় যেন ঢেকে গেল। ঘাড় নাড়িয়ে দিল কেবল। মহাশয় বাঁঝালো কাশালো স্বরে সংবাদ দিলেন, ‘আরে মশাই, ও ম্যাচ নিয়ে কী করবে? ফিকা ধরাতে পারবে নাকি? কামের মধ্যে আকাম করবে, কুড়িটা কাঠি নষ্ট করবে!’

কারণ? মহাশয় না হয়, ঘুনসি পোড়া ভেজা বিড়ির মাখায় কয়েক গুণা কাঠি পুড়িয়েছেন। বনবাসীরও সেই দশা হবে কেন? অবিশ্তি নতুন একটা নাম শোনা গেল। বনবাসীর বিড়ি, বিড়ি না, ফিকা। হয়তো স্থানীয় বা বনবাসীরা তাই বলে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাই নাকি?’

মহাশয় বললেন, ‘তবে? দিয়ে দেখেন না। দেখতিছেন না, ব্যাটা নিজেই ম্যাচ নিতে চায় না! ম্যাচ জালিয়ে বিড়ি ধরাতে শিখেছে নাকি?’

বলে, অতি দয়াপরবশ হয়ে, তাঁর বিড়িটি এবার বনবাসীকে এগিয়ে দিলেন, ‘নে, জলদি ধরা, নিবিয়ে মাত দেগা, মাত্র দেগা!’

ভাষার কথা আর বলব না। অনেকক্ষণ ধরেই শুনে আসছি। মহাশয়ের বাক্যের ছবছ উদ্ধৃতি দিইনি। তবে কথার উচ্চারণ টান-টোন সবই যে যত্নে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি তাঁর হিন্দী বাতও শুনছি, আর ভাবছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। যাকে বলেছেন, সে ঠিক অসুধাবন করতে পারছে তো?

পারছে নিশ্চয়ই। তা না হলে আর বাক্য-বিনিময় ঘটছে কী করে। একথাও ঠিক, মহাশয় অভিজ্ঞ, এ অঞ্চল ও অধিবাসীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে। আমি ভেবে যতই অবাক হই, একটা লোক দেশলাই জালিয়ে বিড়ি ধরাতে অক্ষম, ঘটনাটা ঘটছে যে চোখের সামনেই। আমার দেশলাই ফেরত এল, ওদিকে বিড়ির আগুনে ফিকার মুখে ধোঁয়া উড়তে শুরু করেছে। মহাশয়ের দৃষ্টি সাবধানী এবং তীক্ষ্ণ, লক্ষ্য বিড়ির আগুনের দিকে। নিভে গেলে মারবেন, বলেই দিয়েছেন। কিন্তু বনদেবতারই দয়া, বিড়ি নিভলো না, ফিকাও ধরল। মহাশয় বিড়িটি নিয়ে, টানের বদলে, বার কয়েক চুষলেন। কেন না, ঘুনসিতে আগুন লেগেছে। মুখ থেকে তুলে এনে, বিড়িটার প্রতি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে, মুখ ফেরাবার অবকাশ পেলাম না, আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘সব ব্যাটা জুয়াচোর, বোঝলেন, তাবত বিড়িওয়াল। দু-টান দিতে না দিতেই খতম, এ খেয়ে কখনো সুখ হয়!’

অত্যন্ত অনিচ্ছায় দণ্ড বিড়ি ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। এ বিষয়ে মন্তব্য করার ভাষা আমার জানা নেই। সব বিড়িওয়ালা জুয়াচোর কী না, তাদের সেই ব্যবসায়িক সততা অসততা বিষয়েও সম্যক জ্ঞান নেই। কিন্তু সংসারে কি আরো বহুতর বিড়িওয়ালা নেই? মহাশয়ের মনের মতো দীর্ঘ বিড়ি কি কোথাও তৈরি হয় না?

এবার কথা আসে জোয়ানের কাছ থেকে, ‘সোলেমানের বিড়ি নাও কেন? নাগাইয়ের বিড়ি এনে দিলে তোমার পছন্দ হয় না।’

বিড়ি-প্রসঙ্গ দেখছি ছোটখাটো ব্যাপার না। পুত্রও পিতাকে পথ বাতলায়। মহাশয় মুখখানি বিকৃত করে বললেন, ‘ছাই। নাগাইটা একেবারে গলাকাটা হারামজাদা! কেবল পাতার সাইজ বাড়ায়, ভেতরে, এক কণা স্থা থাকে না। এক টানেই ভুস্। ওগুলোন আবার বিড়ি নাকি?’

পুত্র দেখছি তারপরেও বলে, ‘তুমিই ওকথা বল, নাগাইয়ের বিড়ি সবাই ভালোবাসে।’

তার মানে কি, পুত্র স্বয়ং নাগাই-বিড়ি-রসিক নাকি! তা না হলে এমন বাদামুবাদ কেন? পুত্রের মুখের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। স্থচাগ্র গৌফ আছে বটে, করসা ফরসা মুখখানি মোটেই চোয়াড়ে শক্ত না। চোখ দুটি ভাগর, কোমলতার আভাসও আছে। কথাবার্তার সময় দেখছি, ভাইবোনের মধ্যে একটু চোখাচোখি হয়। তার মধ্যেই কেমন যেন একটু দুষ্টামির ঝিলিক খেলে যায়। পিতৃদেবকে রাগাবার তাল নাকি? সাহস আছে বলতে হবে। ওরকম একখানি টাক এবং নাসিকা দেখলে, আমার পিতৃদেবের সামনে বোধহয় কঁচো হয়ে থাকতাম।

মহাশয় ঠোঁট ঝাঁকিয়ে, পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, ‘খো কেলায়া তোব নাগাই, চোর চোর সব ব্যাটা চোর।’ বলে পকেট থেকে সেই বাঙালিটি বের করলেন। আবার সোলেমান! আসলে সোলেমানেই আছেন, সোলেমানের ছোট ছুঁচোবাজিতেই তাঁর মৌতাত। তা না হলে, এত ঘন ঘন টান পড়ত না। যারে দেখতে নারি, তার চলন ঝাঁক, সে কথা আলাদা। উঠতে বসতে যাকে গালমন্দ করি, অথচ তাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না, সে ভাবের ভাব আলাদা। সোলেমানের বিড়ি সেই ভাবের ভাবী। সে জানে, মৌতাতের বাঙালিটি ছোট না করলে তার আদর কমে যাবে।

মহাশয় বাঙালিটি বের করে, হাতে রাখলেন। কথা বললেন অন্তরিক্তে ফিরে, ‘ধুকী একটু পান দে।’

সেই বোড়ানী বা অষ্টাদশী। সে কিরল তার মায়ের দিকে। মা-টি অমনি পানের ভিবে খুলে, ছোট একটি খিলি বের করে দিলেন মেয়ের হাতে। যেন তৈরি হয়েই ছিলেন, কর্তার মুখ খোলার অপেক্ষা। কিন্তু খুঁকী একেবারে নির্ভাজ না। পানটি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘কত পান খাবে? খালি পান আর বিড়ি, বিড়ি আর পান। হু-চক্ষে দেখতে পারি না।’

মহাশয়ের মুখের কোথাও টোল খেল না। রাগ তো নয়ই, অন্তদিকে মুখ করে, পানটি চিবোতে লাগলেন। কেমন একটি শব্দ করলেন, ‘হুম্!’

খুঁকীও অমনি আওয়াজ দিল, ‘হুম্!’

বলে একবার দাদা, আর একবার মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি। হাসির ঝিলিক। কিন্তু কন্টার শাসন সেখানেই শেষ হল না, আবার বলল, ‘আর সেই বাড়ি গিয়ে, ভাত খেয়ে পান খাবে।’

গিন্নী তখন সব গালে পান পুরতে যাচ্ছেন। কন্টার সঙ্গে সঙ্গে ধমক, ‘এই হল, যেই বাবা পান মুখে দিল, অমনি মায়েরও গলা শুকিয়ে গেল।’

এবার চোখাচোখি কর্তা গিন্নীর সঙ্গে। হু’জনের মুখেই পান। কিন্তু চোখে ঠোটে যে হাসিটি বিনিময় হয়ে গেল, তার ব্যাখ্যা আমার বচনে নেই। এ কি কন্টার প্রতি স্নেহ, না কন্টার শাসনে প্রোঁট ছেলে-মেয়ে দুটি প্রেমিক হয়ে উঠলেন, ধরতে পারলাম না। মনটা কেমন খুশিতে ভরে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে, নিজের হাসিটা আড়াল করতে হল। তবু কেন যেন একটা অনিবার্য আকর্ষণ, খুঁকীর দিকে একবার ফিরে দেখতে ইচ্ছা করল। আর তা-ই দেখতে গিয়ে, কেমন যেন ঠেক খেয়ে গেলাম। তাই বোন, হু’জনেই, আমার দিকে তাকিয়ে। গলা নামিয়ে কী যেন বলাবলি করছিল। চোখাচোখি হতেই চূপ। এক মুখে একটু লজ্জার ছটা, আর এক মুখে ঈর্ষ্য অপ্রস্তুত ভাব। আমিও ঝটিতি মুখ ফেরালাম। অস্বস্তি লাগল যেন গোটা শরীর জুড়ে। এদের মধ্যে আমি আবার কখন প্রবেশ করলাম। প্রবেশ ঘটবার কারণই বা কী। আমি তো কেবল শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। ওই বয়সটাকে কেমন যেন একটু ভয় লাগে। ওরা যে কখন কী ভাবে, কেন হাসে, সব সময়ে বোঝা যায় না। আর একজনের প্রাণান্ত।

মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গাড়ি চলেছে যেন নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে বনবালী মেয়ে পুরুষদের দেখতে পাচ্ছি। বনের গভীরে তারা চলেছে, কোথাও বা দল বেঁধে কী সব কাজে যেন ব্যস্ত। থেকে থেকে বনের ছায়ায়, হঠাৎ যেন কী চিকচিক করে উঠছে। নদী নাকি?

ঋতু ধাবমান গাড়ির সঙ্গে, নজর বেঁধে রাখতে পারি না। মনে হয় চোখের
তারা হারিয়ে যায়। ছবিটা আঁকা হয়ে থাকে মনের কোণে।

‘দেন, ম্যাচটা দেন।’

কথাটা কানে গেল। কিরতে যাব। সেই মুহূর্তেই, খলখলানো, খিলখিলানি
হাসিটা কানে বাজল। ফিরে দেখি, ভাই আর বোন দু’জনেই গায়ে ধাক্কাধাক্কি
করে হাসছে। দু’জনের বলকানো চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। অস্বস্তি ছিল,
লজ্জা পাব কী না, বুঝে ওঠবার আগেই, পিতৃদেবের ধমক শোনা গেল, ‘আরে,
এত ছা ছা করার কী হল, অ্যা? ব্যাপার কী?’

ভাই বোনের হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হল। দৃষ্টি সেই আমার দিকেই।
ভাই হঠাৎ বোনের দিকে ফিরে বলল, ‘ঠিক বলেছিলাম কী না।’

বোন ঘাড় নেড়ে আপত্তি দিল, ‘ইস, তুই বলবি কেন, আমিই তো বললাম,
বাবার মজাটা এবার চ্যাপ।’

মহাশয় অবাক হল না, কিন্তু জিজ্ঞেস করেন, ‘কেন, আমি আবার কী মজা
করলাম?’

খুকীর জবাব, ‘তুমি ভুল্ললোকের কাছ থেকে দেশলাই চাইবে, ঠিক
জানতাম।’

মহাশয় বললেন, ‘এই কথা।’

আমার মনেও তাই, এই কথা! এই কথার জন্তু, ভাই বোনের এত
হাসাহাসি? বেশ বোঝা যাচ্ছে, একটু আগে, এ নিয়েই দু’জনের মধ্যে কথা
হচ্ছিল। আর দেশলাইটি সেই থেকে আমার হাতেই রয়েছে, পকেটে পোরা
হয়নি। আমি হেসে দেশলাইটি মহাশয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। উনি
ততক্ষণে সোলেমানের বিড়ি একটি দাঁতে কামড়ে ধরেছেন। দেশলাইটি
নিয়ে বললেন ‘এতে আবার মজা কী করলাম বলেন তো। আমার
নাই, আপনায় আছে, একটা ম্যাচ, ক’টা কাঠি নিয়ে কথা, অ্যা?
কী বলেন?’

বলতে হয় ‘নিশ্চয়ই।’

তথাপি কত্যা নাছোড়বান্দী। বলে, ‘তুমি.উনপকাশটা বিড়ি খাবে, আর
ওনার ম্যাচবাস্তি জ্বালাবে?’

বলতে বলতে একবার আমার সঙ্গেও চোখাচোখি। খুশির সঙ্গে একটু
লাজুকতা। কিন্তু বিড়ির সংখ্যাটা উনপকাশ উচ্চারিত হল কেন? সংখ্যার
গুরুত্ব বোঝাবার জন্তু বুঝি?

মহাশয় বললেন, ‘মনোহরপুর আসুক, ম্যাচ একটা কিনব। নেন, আপনি একটা বিড়ি খান।’

এতকণে মহাশয় আমাকে প্রকৃত বিপদে কেললেন। তাড়াতাড়ি বললাম, ‘না না, আপনি খান। আমার আছে।’

তা বললে মহাশয় স্তনবেন কেন। আমার যে-হাত আমি পকেটে ঢুকিয়েছিলাম, উনি সেই হাত, ওর ধাবাসদৃশ মুঠি দিয়ে চেপে ধরে বললেন, ‘তা জানি আপনার আছে। ম্যাচ পকেটে আছে, আর মাল নাই, তা কখনো হয় ? তবু আমার একখান নেন।’

সোলেমানের বিড়ি একখানি বাড়িয়ে ধরলেন মুখের কাছে। আবার বললেন, ‘মেয়ের কথা বোঝলেন না ? আপনার এতগুলোন কাঠি নষ্ট করলাম, তবু আপনাকে একটা বিড়ি দিলাম না। তা বটে, সব কি আর মনে থাকে। আর আমরা হলাম মশায় জংলী মাল্লু, ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলমিশ গুঠাবসায় হে কম্মো হয়ে গেছে। নেন, ধরেন। দেখতে ছোট, কামে বড় কামেয়াব, সোলেমানের বিড়ির কথা বলছি।’

অগত্যা। এমন কোনো মধুসূদন দেখি না, যিনি আমাকে জ্ঞান করতে পারেন। ওদিকে মায়ে ঝিয়ে পোয়ে ভারি দিলদরিয়া। নিজেদের মধ্যে নজর হানাহানি, হাসি টেপাটিপি। কখনো বা ত্যারছা নজর হানে আমার দিকে। মহাশয় এত সব দেখেন শোনেন না। নিজে একটি বিড়ি কামড়ে ধরে, দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়ে, আগে আমার দিকে ঝুঁকে এলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিলেন, ‘আ কচুপোড়া খেলে যা। সব শালা জুয়াচোর।’

কাঠিটি নিভে গিয়েছে। জুয়াচোরকে চিনতে আর এখন কারোর বাকি নেই। অহুন্নয় করে বললাম, ‘আমাকে দেবেন, একটু চেষ্টা করে দেখি ?’

‘দেখেন দেখেন। আরে মশাই, আজ তক হাজারটা কোম্পানির ম্যাচ জালিয়ে দেখেছি। কাঠির ভগে বারুদের বড় দেখলে বলে দিতে পারি, কোনটা জলবে, কোনটা জলবে না। নেন, আপনারটা আপনিই দেখেন।’

কোন্ দেবতাকে যে ডাকব। গুরুর নাম স্মরণ করি, বারুদে বারুদ ঘষি, জয় গুরু। কোটি দণ্ডবত্, মান রেখেছ। মহাশয় আগে, পরে আমি। হুঁজনের মুখের সামনে খেঁয়ার কুণ্ডলী। কলসী থেকে জল গড়ানো বগবগে হাসিটা যার বাজল, সে হল পারের কাছে বসা বনবাসী। তার সঙ্গে হয় মিললো বনবাসিনীর কলকলানি। ওদিক থেকে পুজের বচন, ‘দেখলে বাবা ? তুমি পার না, সে... সে কথা বলবে না, কোম্পানিকে খালি জোচ্চোর বলবে।’

মহাশয়ের গলায়, ‘হুঁ’ কিন্তু গাল চূপসে টান চলেছে। কিন্তু আমি কী বিপদে পড়লাম। তীরে এসে আমার তরী ডুবেছে। হালে পানি নেই, আমার বিড়ি নিভে গিয়েছে। যত টানি ধোঁয়া নেই। থাকবে কেমন করে। অভ্যাস বলে একটা কথা আছে তো। অথচ বুঝতে পারছি, বিড়ি দেশলাইয়ের এই অকিকিংকর নাটক এখন অসামান্যের পর্যায়ে এসে পড়েছে। দর্শক বিস্তর। আশেপাশে বিপরীতে। কিন্তু দায়ভাগীরাই বোঝে। পাতায় মোড়া তামাক টানা অভ্যাস নেই। তা সে যেকোনো সোলেমানেরই হাতের বানানো হোক। কলে বানানো কাগজে মোড়া, দেখতে স্তন্যে চটকদার, যাকে বলে সিগারেট—কারা যেন এটাকে আবার ‘সিগ্রেট’ও বলে, সেইটি টানা অভ্যাস। আগুনের একটি ঝলক ঝিলিকেই কেবল মাত। তারপরে শেষ অবধি চলে যাও, আগুন তোমার ভাই। কিন্তু এই পাতামোড়াকে নিয়ে যে মোটেই সুবিধা করতে পারছি না। সে কথা বলিও তো বিপদ।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে যায়, ভাগর কালো তারার ঝিলিকের দিকে। খুকীর আঁচল উঠেছে মুখের ওপর। রোগা রোগা, হিলহিলে কচি ভাঁটার মতো শরীরটি বাতাসে না, হাসিতেই কাঁপছে। নজর আমার বিড়ি টানার দুর্গতির প্রতি। ভাইয়ের কল্লুয়ের ধাক্কা লাগল শরীরে, ধমক শোনা গেল, ‘ধ্যাৎ পাছী!’

তাতে শরীরের কাঁপন বাড়ল ব্যাতিরেকে কমল না। মুখটা ফিরল অন্ধ্রদিকে। মহাশয়ের মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, ‘অ, ভূস হয়ে গেছে বুদ্ধি? নেন নেন, আমারটা থেকে নেন, ওটা তো মোটে ধরেই নাই।’

বিনীত হয়ে বললাম, ‘না না থাক, আমি অগ্র একটা খাচ্ছি।’

মহাশয় একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ‘অগ্রটা খাবেন কী মশায়, এটার তো মুখও ধরে নাই। নেন নেন, আমারটা থেকে ধরিয়ে নেন।’

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললাম, ‘আমি এটার থেকে একটা খাই। আপনারটা বরং—’

মহাশয়ের মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাঁর বিশাল মুখের অভিব্যক্তিতে, এটা হাসি, না বিক্রম, না বিরক্তি বা ধিকার, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল ঠোঁট উলটে বললেন, ‘সিগারেট। হুঁস! ওতে কি আর নেশা হয় মশায়, ওসব ছোড়ারা ফোঁকে বাবুগিরির জন্তে।’

বলে, আমার হাতে মুখ-পোড়া বিড়িটার দিকে একবার তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে দেখলেন। নিজের বিড়িতে টান দিলেন। জানি, আমার হাতে

সোলেমানের একটি অথও বিড়ির চূর্দশা দেখে তাঁর মর্মমূলের কোথায় বিদ্ধ হয়েছে। তা না হলে এক কথায় ছোঁড়ানোর বাবুগিরি বলতে পারতেন না। এখন একমাত্র নেশার দেবতাই জানেন, এই ধূমপান আমার বাবুগিরির জন্তু কী না। সঙ্কচিত হয়েই সিগারেটটা ধরলাম। তাই বোনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। আমার হাতে তখনো বিড়িটা। ফেলে দিতে কেমন যেন হাতটা কাঁঠ হয়ে যাচ্ছে।

‘মারব হারামজাদাকে এক ধাপ্পড়। তখন থেকে পা ঘষে ঘষে আর রাখলে না!’

আবার কী হল। কী আবার, বনবাসীর ফিকা নিভে গেছে। আবার তার আগুন চাই। তা, মাঝে আর হারামজাদাই বল, ফিকাওয়ালার মুখ ভরা হাসি। এবার মনে হল, চোখ দুটি একটু বেশি লাল। পাশে কিশোরী বনবাসিনীটি খিলখিল করে হাসল। সেই সঙ্গে, প্রকৃতির রূপ যেন একদিকে আচাকা বৃকেও হেসে দুলে গেল। মহাশয় চিৎকার করে বললেন, ‘নাই দেগা বজ্জাত!’

চিৎকারটা শুনে বনবাসীর চোখ দুটো এবার পিটপিট করে উঠল। মহাশয় হঠাৎ এমন এক ভাষায় কথা বললেন, জীবনে কোনোদিন যা শুনিনি। জবাবে বনবাসী বলল, ‘সাম্‌টা!’

মহাশয়ের আবার সেই ভাষাতেই, দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসা। বনবাসীর জবাব, ‘মনির বাবু!’

মহাশয় মুখটা ভয়ঙ্কর করলেন, অনেকটা নিজের মনেই বললেন, ‘মাতাল কমনেকার। সবগুলোই হাঁড়িয়া খেয়ে মরেছে, সারা রাত নাচ-গান করে ফেরা হচ্ছে, আর খালি আগুন দাও।’ ওদিকে ঠিকাদার বাবু জঙ্গলে গিয়ে বসে আছে। বদ্‌বুনো!’

বলে তার পোড়া বিড়িটা বাড়িয়ে দিলেন। মনে হল, তাঁর সঙ্গে বনবাসীর কিছু কথা হল, যার ভিতর দিয়ে দু’জনের জানাজানি টের পাওয়া যায়। মহাশয় আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘দেন, বিড়িটা দেন।’

প্রায় কেম্বোর মতো কুঁকড়ে বললাম, ‘কী করবেন?’

‘দেন না মহাশয়, একটা আস্ত বিড়ি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। ওর একটা গতি করতে হবে তো।’

কী গতি হতে পারে জানি না। তবে এ বড় শুলভ বিড়ি না। অভ্যস্ত সঙ্কোচে বিড়িটা দিলাম। তিনি সেটা নিয়ে পায়ের কাছে, ভাগুরী বনমালাকে দিয়ে বললেন, ‘খা।’

ভাগরী চোখের পাতা কঁকড়ে, মাথা ঝাঁকালো, নেবে না। মহাশয় বললেন, ‘তবে মবুগা যা।’

বলে হাত তোলবার অবসর পেলেন না, ভাগরী বিড়িটা টেনে নিল। তার-পরে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে, ঘাড় দোলালো। ব্যাপার কিছু বুঝে ওঠার আগেই, মহাশয় মারতে উত্তত হয়ে হাত তুলে হাঁক দিলেন, ‘তবে বে মৃণালী, তোর নোলা ছিঁড়ব আমি আজ।’

যেমনি বলা, ভাগরী অমনি মেঝেতে মুখ চেপে, পিঠ কঁকড়ে কী কলকল হাসি। সেই সঙ্গে মা পোয়ের থেকে ঝিয়ের হাসি চড়া। আর ব্যাপার কিছু না বুঝে, আমি ধ, যেন চিলে আমার খাবার ঠোঙা নিয়ে ছন্দ করে আকাশে। আমি একটু ধন্দভরে মহাশয়ের দিকে তাকাই। তখন আমার আশপাশের হাসির বহরটা ছড়িয়ে গিয়েছে। মহাশয় তখন বাজছেন, ‘মোটো মা রাঁধে না, তার আবার তপ্ত আর পাস্ত। উনি বাবুর সিগারেট খাবেন, অ্যা! খেতে জোটে না, শুতে রাঙা পাটি। চালাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে মারব তোকে আমি।’

ব্যাপার বোঝা গেল। কিন্তু যাকে বলা, তার কষ্টিপাথর কাটা খোলা পিঠ তখনো কাঁপছে। আর একজন কিকা টানতে টানতেও হেসে বাঁচছে না। হাসিটা তেমন সংক্রামিত হচ্ছে না, মাড়োয়ারী বলে যাদের সন্দেহ হচ্ছে বা ঠেট বিহারী বা মধ্যবিত্ত ওড়িয়াদের প্রতি। এর মধ্যেই একটু দূর থেকে কার গলা যেন শোনা গেল, ‘অ গান্ধুলি খুড়া, ওরা সব মাতাল।’

মহাশয় কোনো দিকে না তাকিয়ে, উপুড় শরীর চুল এলানো ভাগরীর দিকে চোখ রেখেই বললেন, ‘তা আর জানি না স্থখেন, তুমি আমাকে বোঝাবে?’

আমার মনটা কেমন মনের মধ্যে ডুব থায়। ডুব খেয়ে খেয়ে, অবাক মানে, আর জিজ্ঞেস করে, গোটা কামরাটার চেহারা বড় মজার। হঠাৎ স্তনলে মনে হয়, বাংলাদেশের গ্রামের পথে, মাঠের ধারে কথা স্তনছি। অথচ আমার দু-পাশে, ক্রমে বন গভীর-গভীরতর হয়। এই বন সম্পর্কেই শোনা, বিশাল গাছের ডাল জড়িয়ে, অজগর মাথা রাখে আর এক বনস্পতির শিরে। নিচে দিয়ে রেলগাড়ি চলে যায় কঝকঝ কঝকঝ। অথবা প্রকাণ্ড একটা লতার মতোই, চলন্ত রেলগাড়ির জানলার সামনে অজগরের মাথা আর শরীর দোলে। আর এক দিকে অবাক হস্তী নির্বিকার চেয়ে থাকে বাষ্পীয় শকটের দিকে।

আমি এখন সেই বনের গভীরে ঢুকি। শকটের ঘাস্তিক শব্দ কখন থেকেই চিনতে ভুলে গিয়েছি। আর বনবাসী বনবাসিনী পায়ের কাছে বসে এই যুদ্ধ করে। এতদিনের বনপাগলা অরণ্যপ্রেমিকদের রচনার সঙ্গে এ চেহারাগুলো

ঠিক মেলাতে পারছি না কেন। সেই যে কবে পালার্মো-এর অরণ্যবৃত্তান্ত মুক্ হয়ে পাঠ করেছিলাম, এই যে সেদিনও বইহার বনঝারি লবটুলিয়ার অরণ্য-কাহিনীর প্রেমে পড়েছিলাম, তার সঙ্গে, এ পরিবেশ চরিত্রের মিল পাই না যেন। এর রূপ রঙ যেন আলাদা। যদিও, এখনো বনে বাইনি, চলন্ত গাড়ি থেকে দেখছি মাত্র। তবু এ যেন কেমন কেমন লাগে না? অথচ বুঝতে পারি না, এই পাহাড়িয়া বনের রাজ্যে, এই গাঙ্গুলি খুড়াটি কে, স্থথেনই কে, এঁরা করেনই বা কী। দেখে শুনে মনে হয়, এই বনে, বনবাসী এবং এঁরা, সকলেই সকলের জ্ঞানপটুচান। এঁরা যাচ্ছেনই বা কোথায়?

তৃতীয় শ্রেণীর দীর্ঘ ডাকবা। হাওড়া থেকে যাদের দেখেছিলাম, সবাইকে মনে করে রেখেছি, এমন কথা বলি না। কিন্তু এই গাঙ্গুলি খুড়া সপরিবারে, এবং ভিড়ের মধ্যে স্থথেন যে মাঝ রাস্তা থেকে উঠেছেন, সন্দেহ নেই।

‘যাবেন তো রাউরকেল্লা?’

মহাশয়ের—খুড়ি, এখন আর মহাশয় বলা চলে না, গাঙ্গুলি মহাশয়ের দিকে ফিরে দেখে বুঝলাম, প্রশ্ন আমাকেই। রাউরকেল্লা? ‘কেল্লা’ বলে তো নিজেই একবার হাত্তাস্পদ হয়েছিলাম। কেন না, কেল্লা না, কেলা। কেলা মানে কী? আমরা বাঙালীরা তো ‘জনতা হিন্দী’র মাধ্যমে কেলাকে কদলী বলেই জানি—যার নাম কলা। এক্ষেত্রে কেলা মানে নিশ্চয়ই ভিন্ন। ওড়িশী ভাষায় ‘এর যদি কোনো মানে থেকে থাকে, আমার জানা নেই। কিন্তু গাঙ্গুলিমশাই এতটা লাবান্ত করেন কেন, আমি রাউরকেলাতেই যাব। বললাম, ‘না তো!’

গাঙ্গুলিমশাই যেন ভারি তাক্ধব, ‘তবে কোথায় যাবেন? আরো দূরে নাকি?’

বললাম, ‘না, আরো এদিকে।’

‘আর আমি তখন থেকে ভাবছি, এ নিশ্চয় রাউরকেলার চাকুরে। বিস্তর লোক তো এখন রাউরকেলার কারখানায় কাজ করতে যায়। তা, আরো ইদিকে মানে কোথায়? সবই তো জঙ্গল। মনোহরপুরে যাবেন বুঝি?’

গাঙ্গুলিমশাই হয়তো তাঁর নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাতেই, টিল হোড়েন। এখনো কোনোটাই লাগল না। রাউরকেলায় আমি চাকরি করতে যাব না। মনোহরপুর নামটি সুন্দর, মনোহরণ কতখানি করে জানি না। ধেখিনি তো। কিন্তু সেখানেও আমার গন্তব্য না। বললাম, ‘না, আমি যাব জরাইকেলা।’

‘জেরাইকেলা!’

গাঙ্গুলিমশাই এতক্ষণে বসেছিলেন এক ভাবেই। এবার হঠাৎ সমগ্র শরীর

নিম্নে, আমার দিকে ফিরতে গিয়ে, ধাক্কা মারলেন খামাকেই। পতন ঘটত, জানালা ধরে না কেলে। তখন অল্প দিক থেকেও আওয়াজ উঠেছে, ‘জরাইকেলা ? জরাইকেলা কোথায় ?’

গাজুলিমশাই এতক্ষণে আমাকে হাতে জড়িয়ে ধরে ফেলেছেন, ‘আ হা হা লাগেনি তো ?’

‘বাবা যে কী করে !’ কল্লার কোপকটাক্ষের সঙ্গে, শাসনের স্বর।

খুকী তো খুকীই। চোখাচোখি হল, কিন্তু লজ্জার থেকে এখন বাবায় প্রতি বিরক্তিতাই যেন বেশি। লাগা বলতে যা বোঝায় সেরকম একটু লেগেছে বৈকি। গাজুলিমশায়ের শরীর, আমার থেকে, সর্বাংশেই দ্বিগুণ তো বটেই, তিন গুণ কী না, সেটা বিচার্য। লম্বায় যদি বা তেমনটা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি, অগ্ন্যস্ত্র দিকে আমার হার অনেক দিক থেকে বেশি। কিন্তু ঢৌক গিলে হেসে বলতেই হয়, ‘না, লাগেনি।’

সে কথা শোনবার জন্য গাজুলিমশাই তেমন ব্যস্ত ছিলেন বলে মনে হল না। জিজ্ঞেস করলেন, ‘জেরাইকেলার কোথায় যাচ্ছেন ? আত্মীয়স্বজন আছে নাকি কেউ ?’

এরকম উদ্দীপ্ত প্রশ্নের সামনে চূপ করে থাকা মুশকিল। তা ছাড়া, প্রশ্নটা গাজুলিমশাইয়ের মুখে ফুটেছে, তাঁর গোটা পরিবারের চোখেও যে। অগ্ন্যস্ত্র দিক থেকে আরো দু-একজনেরও যে সে প্রশ্ন এবং উৎকর্ষ ভ্রবণ রয়েছে, তা বুঝতে পারছি। অতুমান, এরাও বোধহয় জেরাইকেলার লোক। যদিও জেরাইকেলা না, ‘জেরাইকেলা’। বললাম, ‘আত্মীয়স্বজন না, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি।’

গাজুলিমশাইয়ের মুখের গভীর ভাঁজ গভীরতর হল। দৃষ্টিতে অল্পসঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণতা। জিজ্ঞেস করলেন, ‘কারবারী বন্ধু ?’

তাঁ হলেই তো বিপদ। কেন না আমি তো কারবারী অকারবারী ভেবে যাচ্ছি না। আমার যোগাযোগটাও কারবারের না, কারবারীর দ্বারা না। বরং বলা যায়, যোগাযোগের মাঝখানে যিনি আছেন, তিনি কাব্যলব্ধীর বেদীর সামনে, রসিক আসনে উপবিষ্ট। মুজিত চক্ষে সৃষ্টির ধ্যান। এমন এক বন্ধুর সহযোগিতায়, বনভ্রমণের যোগাযোগ। ধীর গৃহে গমন হচ্ছে, তিনি কারবারী হতে পারেন। পারেন বা বলি কেন তিনি কারবারী। কথার মোড় বোরাবার জন্য বললাম, ‘কারবারের বিষয় আমি কিছু জানি না। বেড়াতে যাচ্ছি।’

গাজুলিমশাই হা হা করে হাসলেন। এমন হাসি তাঁকেই মানায়, কেন না; হাসিটিও যেন ঝাঁঝালো এবং কাশালো। সেই সঙ্গে তাঁর বড় বড় চোখ আরক্ত হল। চাপড় মারলেন আমার হাঁটুতে। বললেন, ‘সে আর জানি না! সাহেব সিং যখন প্রথম এসেছিল, বলেছিল তার মা নাকি স্বপ্ন দেখেছে, কোয়েল নদীর বালির চরে, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে নাকি শিবলিঙ্গ পড়ে আছে। উনি সেটি উদ্ধার করতে এসেছেন। তা বাবা মহেশ্বরের নাম নিয়ে বলতে হয়, কোয়েলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বিস্তর পাথর আর কী বলে শুক্লোদয়ে—অ্যা, সেই কী হে স্থথেন, কী বলে?’

কোন দিক থেকে যেন জবাব এল, ‘বোল্ডার।’

‘বোল্ডার, ই্যা, বড় বড় পাথরের চাংড়া। দেখলে মনে হয় পোকাও পোকাও মোষ সব পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে বসে আছে। কোয়েলের জলে আর চরে, সে যে দিকেই যাও, বিস্তর পাথর পড়ে আছে। সাহেব সিং কোথাও তাঁর মায়ের স্বপ্নে দেখা সেই শিবলিঙ্গ খুঁজে পেলেন না। একমাস ধরে ঘোরাক্ষেপা করলেন, একটা পাতার ঘরও করলেন, তারপরে একটা মূর্তীদোকান খুললেন। তারপরে দু-বার চাইবাসা ঘুরে এলেন...তা যাক গে সে সব পুরনো কাহ্নুদি ঘেঁটে আর কী লাভ। সাহেব সিং-এর এখন মস্ত মোকাম, চারখানা লরি। সব থেকে বড় বনের ঠিকাদার, বড় বড় ছুটো দোকান...তা সে যাক গে ওসব পুরনো কথা, পঁচিশ বছর হয়ে গেল। তারপরে আবার ঘরের বগলে এখন রাউরকেল্লা, তার বগলে বাঙামুণ্ডার রূপ খুলছে, সাহেব সিং-এর এখন ...তা সে যাক গে যাক, ওসব কথা দিয়ে কী হবে।’

এতগুলো ‘যাক গে যাক’ দিয়ে প্রায় একটা গোটা কাহিনীর সমস্ত সংকেত শেষ করে গাজুলিমশাই আবার হা হা করে হাসলেন কিন্তু আমার মনটা নানান-ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। গাজুলিমশাই—জানি না, তিনি কে, কী করেন, কোথায় থাকেন, আমাকে এসব শোনাচ্ছেন কেন? জবাব অবিস্ত্রি তিনিই দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, একটু ভিন্ বচনে, ‘আপনি যদি কারবার করতে এসে থাকেন তাতেও আমাদের কিছু বলবার নেই। বেড়াবার জায়গা অনেক আছে, পুরী আছে, বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা, আরো সব কত কত জায়গা আছে। আর আপনি বেড়াতে এসেছেন এই জঙ্গলে? আপনার বন্ধুটি কে?’

অতঃপর গাজুলিমশাইয়ের কথার জবাব দেওয়া উচিত কি না, স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা আমার মনে মনে। মনটা কেমন বিকল্প হয়ে উঠেছে। সোলেমানের বিড়ি, দেশলাই কোম্পানীর জুয়াচুরি এবং তাঁর বিভিন্ন আসক্তি, সব মিলিয়ে

মাহুটটিকে খারাপ লাগছিল না। বিশেষ পথ-চলতি একটি মাহুট, কিছুক্ষণের দেখা করেকটি কথা, তার মধ্যে একটি পারিবারিক ছবির আবছা ছায়া, সমগ্র জীবনের করেকটি মুহূর্ত, অনেক কোটির মতো, বা হয়তো, এই কামরাধ বাইরে গেলে আমরা সবাই ভুলে যাব। স্নেহ আমার খারাপ লাগে না, বিশেষ করে, তা যদি হয় উপযুক্ত পরিবেশে ও কথার পৃষ্ঠে। কিন্তু অবিবাস আর সন্দেহটা, কেমন যেন অস্থির মতো। গাজুলিমশাইয়ের এই ব্যাধির কারণ কী, জানি না। মহাশয় আমার প্রতি নির্দয় কেন?

তবে একা গাজুলিমশাইকেই দোষ দিই কেন? স্থখেন না দুখেন, সে রকম আরো করেকজনের ভাব-সাব তো সেই রকমই দেখলাম। এদিকে চূপ করে আছি দেখে, গাজুলিমশাইয়ের দৃষ্টি বরং উৎসুক হয়েছে, মুখ কিরিয়ে নেননি। হঠাৎ হাঁক দিলেন, ‘স্থখেন, তোমার ম্যাচটা দাও।’

জবাব এল, ‘ম্যাচ তো নাই গাজুলি খুঁড়া।’

আমার মুখ অগ্র দিকে ফেরানো ছিল। গাজুলিমশায়ে মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। উনি কি আমার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন? অসম্ভব? সে রকম কোনো আচরণ তো তাঁর সঙ্গে করিনি। তবে আমাকে এভাবে বঞ্চিত করার কারণ কী? এখনো তো আমার ‘ম্যাচবাস্তি’তে কিছু কাটি আছে। তিনি যদি সব শেষ করেন, কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করব না। মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল। বলতে ইচ্ছা করে, মন, তুমি মন কলা খাও গিয়ে। গাজুলিমশাই কী বলেছেন না বলেছেন, এত তোমার গায়ে মাথার কী দরকার। কোন্ বেলাত থেকে এলে হে, কেউ মুখ বাড়িয়ে রকমারি কথা বলেই ভদ্রলোকের মান চলে যায়? ভুলে গেলাম নাকি, কার ডাকে এসেছি। কার নিমন্ত্রণে? গাজুলিমশাইয়ের কথাতেই, তার রেশ কেটে যায়? মন বিচলিত? এ মন তো না-বুঝ। গাজুলিমশাইয়ের ধরতাই তো এখনো পাইনি। তবে?

তাড়াতাড়ি দেশলাইটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘এই তো আমার কাছে রয়েছে, এটা নিন।’

গাজুলিমশাই উদাসভাবে দেশলাইটি নিলেন। মা-ঝি-পো, সকলের সঙ্গেই একবার চোখাচোখি হল। পো তখন কী একটা ছায়াছবির বইয়ে মনোনিবেশ করেছে, তবু একবার চোখ তুলে দেখল। মা পান মুখে দিতে দিতে, ঘোমটার ফাঁক থেকে একবার দেখলেন। ঝি-এর ঠোটে গুটা কী? হাসি? বোড়ান্ট না, দেখছি চতুর্দশী বা তারো চব্বিশ ঘণ্টা কম জন্মোদনী। আসলে শাড়ি পরেছে, আর গাজুলিমশাইয়ের মতো শিতাকে ধরকে শাসন করে, আর থিলথিল করে

হাসে, সব মিলিয়ে বয়সটা ধরতে দেয়নি। রোগা বটে, স্বাস্থ্যের, ঔজ্জ্বল্য কিছু কম নেই। ওর চোখের তারায় যেন কেমন ছটামি চিকচিক করছে। একবার দেখছে ওর বাবাকে, আর একবার আমাকে। ও কি ওর মন্তব্য চোখের অভিমানে ছোট্টোকে দেখে মজা পাচ্ছে নাকি? অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশাইকে। কেন না, আমার নিজেরও সেইরকম মনে হচ্ছে। না-ই বা আমাকে চিনলেন, আমার ওপর অভিমান করতে বাধা কী।

‘সব জুয়াচোর।’

বটেই তো, কারণ কাঠি জ্বলছে, নিভছে, বিড়িতে আগুন লাগছে না। তারপরেই হঠাৎ খুকীর প্রশ্ন, ‘জরাইকেলায় কাদের বাড়ি যাবেন আপনি?’

মুখ ফিরিয়ে দেখি, খুকীর কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা আমাকেই। পিতার কৌতূহল চুঁইয়ে ঢুকেছে কন্ঠাতে। মনে হল, সেটা যে কেবল নিজের কৌতূহল মেটানো, তা না। পিতার মনকেও একটু সহজ স্বচ্ছন্দ করা। হতে পারেন পিতাটি বয়স্ক কিন্তু ছেলে যে বড় মেজাজী। এখন মাকেই তাই দায়িত্ব নিতে হয়। বলতে যে চাইনি, তাও না। গোপন করার তো কিছুই নেই। মহাশয় যে আমাকে সেই কোন সিংজী না পণ্ডিতজী না বাবুজীর সঙ্গে তুলনা করে অকারণ অবিস্থানে একটু বিধ্বংস করেছিলেন। বললাম, ‘গোপালচন্দ্র ঘোষের বাড়ি।’

কন্ঠার চোখের কালো তারায় অমনি ঝিলিক, মুখে হাসির ছটা, তার সঙ্গে অবাক খুশির ঝলক। বলে উঠল, ‘ওমা গোপালদাদাদের বাড়ি?’

ওদিকে মায়ের চোখেও তখন অবাক কৌতূহলের দৃষ্টি, ঘোমটার ফাঁক থেকে বারেক ছুঁয়ে গেল আমাকে। জোয়ান ছেলেও কী যেন বলতে গেল, তার আগেই গাঙ্গুলিমশাই, শুধু যে অবাক, তা না। যেন কী মুশকিলেই পড়েছেন, এমনভাবে বললেন, ‘আখো দিকিনি, যাবেন গোপালদেবের বাড়ি তা সে কথাটা বলতে এত দিকদারি?’

সেই আবার আমার ওপরেই দোষারোপ। বললাম, ‘দিকদারি তো কিছু করিনি। আপনি যে শোনার আগেই কি সব বলেছিলেন, তাতে একটু ঘাবড়ে গেছলাম।’

‘ঘাবড়ে গেছিলেন? কেন কেন, আমি আবার কী বললাম আপনাকে?’

এত তাড়াতাড়ি বিস্ময়? আমার বেড়াতে আসার প্রতি তাঁর কটাক্ষ, বলতে গেলে কেমন যেন একটা কটু সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছিল, কথাগুলো এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? এমন কি সিংজীর সঙ্গে উদাহরণ পরিস্ত বাহ

যায়নি, যে কী না বেড়াতে আসার নাম করে, জরাইকেলার রাজ্যপাট বিছিরে বসেছেন।

কিন্তু আমাকে কিছু বলতে হল না। এবার শিতার মুখের সামনে জোয়ান দিলে পুঞ্জতুল্য ঝাড়, ‘বলনি? উনি এসেছেন গোপালদাদের বাড়ি বেড়াতে, তুমি শুনিয়ে দিলে সিংবাবুজীর কথা।’

গাঙ্গুলিমশাইয়ের হাতের বিড়ি জ্বলেনি, কারণ জুয়াচোরের দেশলাই জ্বলেনি। শিশুটির মুখ দেখে এখন। যেন ধমক খেয়ে ছেলে বড় মুবড়ে পড়েছেন। কিছু বা বিরত অপ্রস্তুত ভাব। কিছু বলবেন ভেবে, মুখ খুলতে গেলেন। তার মধোই কত্যা দিল মুখঝামটা, ‘বাবার যত আর আনতে কুড়। কাকে কী বলতে হয়, তার কোনো হাথা মাথা নেই।’

বলে কত্যা মুখ ফিরিয়ে চোখের নজরে সাক্ষী মানতে গেল গর্তধারিণীকে। অমনি মায়ের গ্রীবাঘ ঝাঁকি, নাকছাবিতে কাঁপন। ফোস করলেন, ‘বরাবর এমনি।’

শিশুটির অবস্থা এবার একেবারে কাহিল। শাদা শাদা ক’দিনের আকাটা গৌফদাড়ি মুখখানি কী অসহায়। এতগুলো অভিভাবক-অভিভাবিকার শাসনে, কী যেন বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। ষা উগরেছিলেন, এখন তা চোঁক গিলে গলস্থ করতে হচ্ছে আর তার একমাত্র পন্থা হচ্ছে হাসি। হেঁ হেঁ করে হেসে উঠলেন। বললেন, ‘আমি কি মন্দ ভেবে কিছু বলেছি নাকি? তা বলিনি। মিছা কথাও তো বলিনি। এই আপনাকেই বলি—’ বলে আমার দিকে ফিরলেন, ‘অই গোপালকেই জিজ্ঞেস করবেন, কত সব ভাল মাহুষ সেজে আসে, বলে, এই একটু বেড়াতে দেখতে শুনতে এলাম। তারপরেই দেখলেন, কোথা থেকে কী হয়ে গেল, সে লোক রাতারাতি ঠিকাদার বনে গেছে। তবে আপনাকে আমি সে কথা বলিনি। মিছামিছি আপনাকে কেন তা বলতে যাব।’

বাহু গাঙ্গুলিমশাই, চমৎকার। আপনি কেন মিছামিছি আমাকে ওসব বলতে যাবেন। তবে মন বলে কথা। মনে সেরকম একটা চিন্তা এসে পড়েছিল, তাই বলেছিলেন। তবু আমি বললাম, ‘কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন, আমি সত্যি সত্যি বেড়াতে এসেছি। বন দেখতে এসেছি, বন বেড়াতে এসেছি।’

গাঙ্গুলিমশাই একেবারে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার হাঁটুর ওপর। বললেন, ‘আরে ছি ছি ছি, আমি কি আপনাকে অবিশ্বাস করছি? কিন্তু দেখেন তো, শালার ম্যাচ তো জ্বালাতে পারছি না। আপনি একটু দেখেন।’

শালায় ম্যাচ ? নিশ্চয়ই আমাকে বলেননি ? ম্যাচের প্রতি বা কোম্পানির প্রতি নিশ্চয়ই। আমি নিজেও একটি সিগারেট ঠোটে চেপে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালাম। আগে দিলাম সোলেমানের বিড়ির মুখে আগুন, তারপরে নিজেরটাতে। গাজুলিমশাই এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আরামের শব্দ করলেন, ‘আহ! আপনার হাতে দেখি কাঠি কথা কর। আর আমার বেলায় ফুচ্ ফুচ্।’

হাসি দমন করা গেল না। চোখাচোখি হয়ে গেল পুত্র কন্যা মাতার সঙ্গে। সকলের মুখেই হাসি। তবে খুকী আর কাঁচা জোয়ানের মুখে কেবল হাসি না। একটা জিজ্ঞাসু কৌতূহলের ঝিলিক। মনে হয়, জিজ্ঞাসা রয়েছে ঠোঁটের পাতে, খসতে একটু দ্বিধা। নয়া মামুষ কী না। ইতিমধ্যে এসে পড়ল মনোহরপুর। ইন্টিশনের ভিড়ভাট্টা মন্দ না। চা পান বিড়ি-ওয়ালাদের দোঁড়াদোঁড়ির সঙ্গে বনবাসীদের ছুটোছুটিই বেশি। তার মধ্যেই বাঙালী ওড়িয়া বিহারী ঝাড়োয়ারীদের চলাফেরা, ওঠানামা। ইন্টিশনটি তেমন ছোটখাটো না। বনের সীমা একটু সরে গিয়েছে। গাজুলিমশাই ছেলেকে আগে নির্দেশ দিলেন, ‘একটা ম্যাচবাস্তি কেন তো শিবু। আর যদি তোরা চা খাস তো থা।,

বলে তার কৌচকানো মোটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে কিছু খুচর, পয়সা বের করে দিলেন। বিড়িতে টান চলেছে সমানে। শিবুর পক্ষে উলটো দিকের জানলায় ভিড় কাটিয়ে যাওয়াই মুশকিল। একদিকে যেমন দরজায় ঠেলাঠেলি, অন্যদিকে তেমনি বসবার আসন, মেঝে আর বাংক, কোথাও তিলধারণের ঠাই নেই। তবে শিবু জোয়ান এলেমদার। ঠিক পৌঁছে গেল জানলায়। ফেরিওয়ালাকে ডেকে আগে কিনল দেশলাই। তারপরে ফিরে চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কে কে চা খাবে?’

গাজুলিমশাই আগে আওয়াজ দিলেন, ‘আমার জন্ত এক ভাঁড় নিস।’

খুকী বলল, ‘আমার জন্তও নিস দাদা।’

‘আর মা?’ শিবুর উচ্চকণ্ঠ জিজ্ঞাসা।

মা মেয়ের দিকে চেয়ে অসম্মতিতে মাথা নাড়লেন। খুকী জবাব দিল, ‘না।’

তারপরেই গুনতে পেলাম, ‘আপনি চা খাবেন?’

খুকী জিজ্ঞেস করেছে আমাকে। সুরে স্বরে কোথাও নাগরিকতার ঠাঁট পাবে না। অনেকটা গ্রাম্য ঘরোয়া অন্তরঙ্গতায় বাজল। সহজ তো বটেই, একেবারে সোজাসুজি। এদিকে আমার জবাবের আগেই গাজুলিমশাই একেবারে সোজাসুজি তার শিবুকেই হেঁকে নির্দেশ দিলেন, ‘ওরে শিবু, ওনার জন্তেও এক ভাঁড় নিস।’

বলে তাঁর খুকীর দিকে ফিরে বললেন, ‘খাবেন না কেন? জরাইফেলার ভিড়তে এখনো তো কিছু সময় বাকি। তাছাড়া উনি হলেন গোপালের অতিথি।’

ইতিমধ্যে শিবুর ঝাঁজালো গলা বেজে উঠেছে, ‘এই তিপু, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চায়ের ভিড়গুলা নিবি তো। আমি কি সব একসঙ্গে নেব নাকি?’

খুকী অমনি উঠে দাঁড়াল। বাবার খুকী, দাদার কাছে তিপু। পুরো নামের ভাড়াচোরা ডাক যে কী দাঁড়ায়। সে এক পরম রহস্য। অনসূয়া ‘অনু’ হয়, অমিয়া ‘অমি’, মৃন্ময়ী ‘মিহু’ হয় ভবানী ‘ভবি’। অতএব তিপুর পুরোটা কল্পনা করা সহজ না। যাকে বলে ‘রিসার্চ’ তার এখন সময় না। দেখছি, তিপুর পক্ষে হাত বাড়িয়ে, ভাঁড় নেওয়া বড় কঠিন। তা হলে আরো একখানি পুরো হাত জোড়া লাগাতে হয়। ওদিক থেকে শিবুর হাত, এদিক থেকে তিপুর হাত, মাঝখানের ফাঁকটা কে ভরাট করবে? করল একজন। একটি বনবাসিনী মেয়ে। কিছু বলতে হল না, সে নিজের থেকেই হাত বাড়িয়ে, তিপুর হাতে ভাঁড় বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বনবাসীর এত হাসির কী হল? যেন কী একটা মজার ব্যাপারই ঘটেছে। কৌতূহল হয়। জানতে ইচ্ছা করে। এত সহজে কি তা মেটে?

তিপু আমাকে আর গাজুলিমশাইকে চায়ের ভাঁড় দিল। তারপরে নিজেরটা নিল। শিবু তখন খাঁটি বাংলায় বনবাসিনীকে জিজ্ঞেস করছে, ‘তুই চা খাবি?’

যুবতী বনবাসিনীটি আঁচল টেনে মুখে চাপতে গিয়ে, তার বক্ষস্থল উদ্বাস করে তুলল। কেবল যে লজ্জা পেয়েছে, তা-ই না, যেন বড় অভক্তিতে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘না না, ইটা। দীখুলোগ খা।’

বলে, মুখে আঁচল চেপেই কি হাসি। এতক্ষণে যেন বনবাসিনীর হাসির হৃদিস একটা পাওয়া গেল। চা মানে পানীয়, তার জন্তু আবার এত ব্যস্ততা, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। তার জন্তুই এত হাসাহাসি। পাহাড় জঙ্গলের অধিবাসীদের তুমি যদি অধিবাসী বলতে পারো, মুণ্ডা বা ওরাওঁ, তা হলে সমতলের গ্রাম আর শহরবাসীদের ওরা দীখু বলবে। আর দীখুদের চা খাওয়ার এমন মাতামাতি দেখলে, কোন বনবাসীর না হাসি পাবে? এরকমটাই মনে হয়।

ইতিমধ্যে আমার কানে বাংলা কথোপকথন বাজছিল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, জগৎকে আমি বলে দিইচি, সে কাল তিন গ্যালন মবিল নিয়ে যাবে। গাড়ি বসাতে বারণ করে দিইচি। মোহনবাবুর কাছে বড়জামা হয়ে বাহাদার যাবে।’

গাঙ্গুলিমশাই হাঁক দিলেন, ‘কার সঙ্গে কথা কও স্বরীন ?’

জবাব এল, ‘সন্তোষের সঙ্গে ।’

গাঙ্গুলিমশাই আবার হাঁকলেন, ‘তবে সন্তোষকে বলে দাও, জগৎ যেন দু-টাঁকার দোস্তাপাতা কাল নিয়ে যায় । তোমার খুড়িমার মনে ছিল না, আমারও না, টাটা থেকে আনা হয়নি ।’

এবার জবাব এল অন্য গলায়, ‘আচ্ছা গাঙ্গুলিখুড়ো পাঠিয়ে দেব । টাকাটা জগতের হাতে দিয়ে দেবেন ।’

গাঙ্গুলিমশাই হাঁকলেন, ‘আরে ই্যা ই্যা, সন্তোষ, তোমার টাকা মার যাবে না ।’

অন্যদিকে, বোধহয় স্বরীন আর সন্তোষের গলায় হাসি বাজল । কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, বাংলাদেশেরই কোনো জায়গায় রয়েছি । অথচ জানি, বিহার ছাড়ো-ছাড়ো উড়িষ্কার দরজায় প্রায় ছায়া পড়েছে । যদিও কী না, এ উড়িষ্কা সমুদ্রতীরের বিপরীত, বন-পাহাড়ের সীমানা । এদিকে খণ্টা বাজল, এজিনের সিটি বাজল, গাড়ি ছুঁলে উঠে, অজগরের মতো নড়লো । গাঙ্গুলিমশাই এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, ‘শিবুটা আবার গেল কই, ম্যাচটা যে ওর কাছে ।’

মহাশয়ের হাতে ইতিমধ্যেই আবার নতুন বিড়ি উঠেছে । আঙুলে টিপন টিপন চলেছে, কানে তামাকের আওয়াজ শোনা হচ্ছে । বিড়ি ছাড়া বোধহয় এক মুহূর্ত চলে না । আবার বললেন, ‘খুকী, তোর মাকে একটু পান দিতে বল ।’

চায়ের পরে পান-বিড়ি সহযোগে মৌতাত । কিন্তু সত্যি, শিবু গেল কোথায় ? গোটা কামরায় তাকে দেখি না । অন্য দিকে গৃহিণী কথার আগে প্রস্তুত, বলার অপেক্ষা । কন্ঠার হাত দিয়ে পান বাড়িয়ে দিলেন । গাঙ্গুলিমশাই আবার ব্যস্ত হলেন, ‘শিবুটা কোথায় গেল ?’

তিপু-ই জবাব দিল, ‘কোথায় আবার যাবে, আছে গাড়ির মধ্যেই ।’

‘ম্যাচটা যে ওর কাছে রয়েছে ।’

আমি আমারটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘এটাই নিন ।’

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, ‘ও আমার হাশ্বে জলবে না । তা হলে আপনিই জালেন ।’

অগত্যা । তাঁর বিড়ির মুখে আগুন জালিয়ে দিলাম । তখন চোখে পড়ল, শিবু বেরোচ্ছে বাথরুমের দরজা খুলে, আর সমস্ত দরজা খোলা বাথরুমের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগলিয়ে । এবার বুঝে সন্ধান, শিবু গিয়েছিল কোথা । সম্ভবত মিশিরের বিড়ির গতি করতে গিয়েছিল । পিতার সামনে স্বাধীনতা না

হয় নেই, তা বলে নেশা তো মানে না। বিষয়টা জানত বোধহয় তিপু, সেই কারণেই ওর জবাব ছিল নিকরোগ শাস্ত। শিবু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে, আগে বাবার হাতে দিল ম্যাচ। গাঙ্গুলিমশাই ম্যাচটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেখলেন। মুখে ফুটল হতাশা আর বিরক্তি। বললেন, ‘বাজে। যত জুয়াচুরি ব্যাপার।’

তারপরে বিড়িতে টান দিয়ে, একটু যেন সাব্যস্ত হলেন। আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার নামটা বলেন তো শুনি।’

জিজ্ঞাসার ভঙ্গিটা এমন যেন, তার ওপরেই নির্ভর করছে, আমার সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্য করবেন। কিন্তু আমাকে সহবতেই টলতে হয়, নামটা বলি। গাঙ্গুলিমশাইয়ের ভুরু কৌচকালো, ঠোঁট ধহুকাহুতি ও বিস্মৃত হল। যেন মনে মনে কিছু হাতড়ে ফিরে মাথা নেড়ে বললেন, ‘নাহ্, এ নাম তো কখনো গোপালের কাছে শুনিনি।’

সেটা নিশ্চয়ই আমার অপরাধ না। না শোনবারও অনেক কারণ। গোপাল আমার বন্ধুর ছোটভাই। বন্ধু যেমন কলকাতাবাসী, তেমনি তার ভাই জরাইকেলায় পৈতৃক ব্যবসায়ে রত এবং বসবাসকারী। কিন্তু শিবুর চোখে কেমন যেন একটা ঝিলিক সেই সঙ্গে তিপুর ভুরুও একটু কেঁপে গেল। ভাই বোনে চোখাচোখি হল। শিবু বলল, ‘নিতুর মুখে নামটা শুনেছি যেন।’

আমার মনে পড়ল, নিতু অর্থাৎ নিতাই, গোপালের ছোটভাই। সে-ও জরাইকেলায় থাকে। মাঝে মাঝে কলকাতায় যায়। গাঙ্গুলিমশাই ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন, ‘উহ্, আমি তো কোনোদিন এ নাম শুনিনি! আপনি কি গোপালদের আত্মীয়-টাত্মীয় হন?’

বললাম, ‘না। আমি গোপালের দাদা বলরামের বন্ধু। সেই সুবাদেই বেড়াতে আসা।’

গাঙ্গুলিমশাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘তাই বলেন, আপনি হলেন গে আমাদের বলরামের বন্ধু। বলরাম তো আবার যেন কী—সেই কী বলে লেখক না কবি?’

শিবু বলল, ‘নাট্যকার।’

গাঙ্গুলিমশাই বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, পালা লেখে।’

আমি বললাম, ‘নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সবই বলতে পারেন।’

‘বুঝেছি বুঝেছি, বলরাম বেশ এলমদার ছেলে। কথাবার্তাও খুব ভাল, শাস্ত ধীর স্থির, ওই ছেলেই ঘোষ বংশের নাম রাখবে।’

ফুট কাটল তিপু, ‘আহা আর গোপালদা নিতুদা বুঝি ভাল না ?’

গাজুলিমশাই বললেন, ‘তা কি বলছি ? গোপালও খুব ভাল কাজের ছেলে । তবে নিতুটা একটু অন্তরকম, বড় চঞ্চল আর দাপুটে ।’

তার কারণ বোধহয়, নিতুর বয়সটা অনেক কম । এখনো তার কোনো দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে চাপেনি । গাজুলিমশাই আবার বলেন, ‘ছেলেগুলান ভাল সবাই, তবে বলরামের মতন এলেমদার সবাই না । তুনি কলকাতায় তার খুব নাম-ডাক ।’

মিথ্যা না, আমার চাককলাশিল্পী বন্ধুর প্রতিভা আজ স্বীকৃত । বললাম, ‘ঠিকই শুনেছেন ।’

গাজুলিমশাই যেন ভারী অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন, বললেন, ‘দেখেন তো ! আরে মশাই বলবেন তো, আপনি আমাদের বলরামের বন্ধু । তা আপনার নিবাস কোথায়, কলকাতাতেই ?’

বললাম, ‘এক অর্থে তাই ধরতে পারেন । কলকাতার বাসাড়ে, বাসিন্দা অল্প আরগার ।’

‘করেন কী ?’

তবেই তো বিপদ ! তবে ভেমন বোধহয় না । কারণ, বলরাম যখন এলেমদার, আমি একেবারে বরবাদ হয়ে যাব না । বললাম, ‘একটু লিখি টিখি ।’

শিবু সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিল, ‘সেইজন্তই তো বলছিলাম, নামটা কেমন শোনা শোনা । আমি নিতুর মুখে আপনার নাম শুনেছি ।’

তিপুও গুর দাঁদার কথায় ভাল দিল, ‘আমিও শুনেছি । বইও পড়েছি ।’

থাক, এসব কথা থাক, ওতে বড় ব্যজ । অন্তত আমার মনটা বাজে না ।

গাজুলিমশাই বললেন, ‘লেখেন টেখেন বুঝলাম, আর কী করেন ? আমাদের বলরাম তো সরকারী চাকরি করে । লিখে তো আর টাকা আসে না ।’

এই তো বরবাদের লক্ষণ । এই আশঙ্কাটাই করেছিলাম । অতি কীণস্বরে কবুল করতে হয়, ‘আজ্ঞে আর কিছুই করি না ।’

গাজুলিমশাইয়ের ঠোঁট আবার ধুকাকুড়ি ও বিড়ত হল, ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘হু’, বড় কঠিন কর্ম । কেবল সরস্বতী ঠাকরণ হলে তো হবে না, ওনার বোনটিকেও চাই । লক্ষ্মী সরস্বতী একসঙ্গে না দিলে চলবে কেন । ঘাক, ভগবান করুন, তা-ই যেন হয় আপনার । কিন্তু আহুহা, বলবেন তো, আপনি বলরামের বন্ধু, লেখেন টেখেন । আমার ছেলে মেয়েরা ইন্তক আপনার নাম জানে, বই পড়েছে । এখন বুঝলাম, কেন আপনি বনে বেড়াতে এসেছেন ।’

আমি গাজুলিমশাইয়ের দিকে জিজ্ঞাস্য কৌতূহলে তাকাই। গাজুলিমশাই বললেন, ‘বিভূতিবাবুও ওই জন্তেই আসতেন, ঘুরতেন বেড়াতেন।’

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘কোন বিভূতিবাবু?’

গাজুলিমশাইও যেন অবাক হয়ে বললেন, ‘কোন বিভূতিবাবু আবার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বই লিখতেন যিনি।’

এবার শোন কথা। গাজুলিমশাই যেন আমার চোখের সামনে, টার্কি-মুরগীর মতো রঙ বদলিয়ে চলেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছেন?’

‘দেখেছি? এই শোন দিকিনি ছেলেটার কথা।’

বলে তাকালেন তাঁর গোটা পরিবারের দিকে। আমিও তাকালাম সেদিকে। দেখি, মায়ে পোয়ে কিয়ে, সবাই মিটিমিটি হাসে। গৃহিণী ঘোমটাটা একটু টানবার চেষ্টা করেন। আর এদিকে গাজুলিমশাই তখন আমার প্রতি মোহান্ত ছেড়ে যাচ্ছেন, ‘বলে, বিভূতিবাবুকে দেখব না? জরাইকেলার আমার বাড়িতে এসেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন, দাওয়ার বসে কত গল্প বলেছেন, তারপরে আর দেখাদেখির কী আছে। তা ছাড়া উনি তো আবার যশোরের লোক ছিলেন, আমরাও তো যশোরের লোক।’

সে সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল, তাঁর বাচনভঙ্গি আর উচ্চারণে। এতক্ষণ তা হলে আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম। বনসাহিত্যের সৃষ্টিরাজ্যে যিনি রাজা, সেই রাজা গাজুলিমশাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন, পরিচয় ছিল, খাওয়া-দাওয়া গালগল্প করেছেন একসঙ্গে দাওয়ার বসে। গাজুলিমশাইয়ের পায়ের ধূলা নেবার অন্ত যে আমার শিরদাঁড়া নত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেও যে আবার থিয়েটারের মতো চমক লাগানো ব্যাপার হবে। নিজেরই তাতে লজ্জা করবে। আমি একবার তাঁর সমগ্র পরিবারের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, ‘আপনাদের পরম সৌভাগ্য।’

‘হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। ঝাড়ুল্যমশাই মাছুষটিও যে বড় ভাল প্রাণখোলা-স্ববির মতো মাছুষ। আমাদের বাড়ির পেছনে, উঁচু টিলাটার দিকে তাকিয়ে কী যে দেখতে পেতেন, কে জানে। তন্নয় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত যেন, সেই টিলার ওপরে কোনো দেবতাকে দেখতে পেয়েছেন।’

এই হলেন গাজুলিমশাই। বাজেন আটপৌরে ভাষায়, আমার কোথায় যেন তরঙ্গ তুলে দেন। আমার কল্পনায় যেন সত্যি এক স্ববির ছবিই ভেসে

ওঠে। সেই রাজাকে আমি কোনোদিন চোখে দেখতে পাইনি। সেই কথাটাই বললাম, ‘তাকে আমি কখনো দেখতে পাইনি।’

‘আমরা দেখেছি। জরাইকেলার অনেক লোকই দেখেছে। গোটা সারেঙা বনটা যে আতিপাতি করে দেখেছেন। অমন বন-পাগল মানুষ দেখিনি! কী বলব বাবা আপনাকে, মায়ের দেহ দেখেছেন তো ছেলে কোলে করে, তার গোটা শরীর আতিপাতি করে দেখে, কোথায় একটা তিল, কোথায় একটা জুড়ল, কোথায় একটা ফুসকড়ি, দেখতে দেখতে মায়ের দেহে না, কেমন যেন ওনাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, বিতৃতিবাবুর কাছে বন ছিল সেই-রকমের। সব একেবারে হাত দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।’

গায়ে যেন কাঁটা দেয়। মনে মনে বলি আর বলবেন না গাঙ্গুলিমশাই। এই গায়ে কাঁটা দেওয়া অন্তরকম, অহুভূতির এক বেদনানন্দের লহরী। কিন্তু অবাক মানি গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা শুনে। তাঁর ভাষাও যে ছাপিয়ে রাখবার মতো। বন ভালবাসার এমন তুলনা আর কখনো শুনিনি। এখন আমার মনে একটি সুখ, একটি সান্ত্বনা, আমিও চলেছি সেই জরাইকেলায়। আমিও যাব সেই গভীর সারেঙা বনের পথে পথে, ছায়ায় ছায়ায়, বর্ণার ধারে, পাহাড়ি নদীর কূলে কূলে। কিন্তু গাঙ্গুলিমশাইয়ের বাড়িটি যে তীর্থক্ষেত্র। সেখানেও তো একবার যেতে হবে। আহ্বানের অপেক্ষা রাখতে হবে নাকি? তার থেকে নিজেই যেচে বলি, ‘জরাইকেলায় গিয়ে, আপনার বাড়িতে একদিন যাব।’

‘আমার বাড়িতে?’

গাঙ্গুলিমশাইয়ের মস্ত মুখে এমন ভ্রুকুটি দেখা দিল, মনটা লজ্জা আর ভীকু হতাশায় ভরে গেল। কিন্তু ততক্ষণে শিবু তিপু খলখল খিলখিল করে বেজে উঠেছিল। গাঙ্গুলিমশাই বললেন, ‘আপনি যাচ্ছেন গোপালদেব বাড়িতে আর আমার বাড়িতে যাবেন, সেটা আবার বলে কয়ে?’

তিপু এবার নিজের থেকে বেজে উঠল, ‘আমি গিয়ে যোজ্ঞ আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব।’

কিশোরীটির কথায়, খুশিতে মনটা টলটলিয়ে উঠল। তার আগেই, কৃতজ্ঞতায়, গাঙ্গুলিমশাইয়ের পায়ে মনে মনে আর একবার লুটিয়ে পড়েছি।

গাঙ্গুলিমশাই আবার বললেন, ‘কেবল কি আমার বাড়িতে আসবেন? গোপাল আপনাকে একলা নিয়ে মজা লুটবে, তা আমরা দিই কখনো? আপনাকে আসতে হবে, থাকতে হবে, খেতে হবে। দাঁওয়ান বসে গল্পগুজবও করতে হবে।’

আর কী চাও হে। বর যা পাবার, তা সবই পেয়ে গেলে। এখন গাজুলিমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে কেবল ভাবছি, মানুষ চেনা কত দায়। বোঝা তো বহুত দূর। দিয়ারশাইয়ের কোম্পানিগুলো সব জুয়াচোর, বিড়িতে তামাক কম, কেবল এই কথাটাই ধীর মুখে শুনে এসেছি, এমন কি একবার আমাকে দংশনেও উদ্বৃত্ত হয়েছিলেন, এই কী না সেই মানুষ! বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ হৃদয়ে রেখে বসে আছেন।

গাজুলিমশাই আবার বললেন, ‘আর আমার বাড়িতে তো আপনাকে যেতেই হবে।’ জরাইকেলার আসল জায়গায় যাবার পথ তো আমার বাড়ির পাশ দিয়েই।’

সেই আসল জায়গাটা কী। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোথায় বলুন তো?’

‘কেন কোয়েলের ধারে যখন যাবেন? কোয়েল নদী না দেখলে, জরাইকেলার আর কী দেখবেন? আর কখনো এসেছেন এদিকে?’

‘না।’

‘তবে? এই গাড়ি থেকেই কোয়েল নদী দেখতে পাবেন, দাঁড়ান গাড়ি আর একটু আগিয়ে যাক। ওটা তো কেবল নদী না। নদীর পাড় তো সোনার।’

প্রায় খতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘সোনার?’

‘হ্যাঁ, সোনার চর। জানেন না বুঝি? কত সোনারখোঁচার, সোনা খুঁচিয়ে ফিরছে।’

যত শুনি, অবাক মানি তত। সই সঙ্গে মনে মনে বড় কৌতূহল আর ব্যগ্রতা। সোজাভাবেই বললাম, ‘ঠিক বুঝতে পারলাম না। সোনার চর মানে?’

‘সোনার চর মানে, সোনার চর। দাঁড়ান, একটা বিড়ি ধরাই।’

এই তো হয় মুশকিল। তবে এবার আর আমি জ্বালানো নেভানো আর জুয়াচোরদের প্রতি গালাগাল শুনেতে রাজী না। নিজেই তাড়াতাড়ি দেশলাই জালিয়ে ধরে বললাম, ‘নিম্ন ধরান।’

গাজুলিমশাই নির্বিকার মুখেই বিড়ি ধরিয়ে বললেন, ‘কোয়েল নদীর ধারে ধারে, কোয়েল নদীর জলে, সোনা আছে বুঝলেন তো? সত্যিকারের সোনা বালিতে মেশানো থাকে। কোয়েলের চরের রঙ দেখবেন সোনালী। তার মানে হল গে, কোয়েল তো আসছে পাহাড় থেকে। সেই পাহাড়ের কোথাও আছে সোনার খনি। ছিল বলেই জানতাম, এখন আছে কী না, জানি না। তবে সোনারখোঁচার এখনো সোনা খুঁচিয়ে বেড়ায়। পায়ও।’

জিজ্ঞেস করি, 'সোনাখোঁচা কী ?'

গাজুলিমশাই হাসলেন হেঁ হেঁ করে। বললেন, 'কাদাখোঁচার মতন। পাখি কেন কাদা খোঁচার বলেন তো ?'

প্রায় বুদ্ধিমান ছাত্রের মতো হেসে বলি, 'খাবার জন্তে।'

'কী খাবার জন্তে ?'

রীতিমতো মাস্টারমশাইয়ের মতো প্রশ্ন। আমার চোখ পড়ে যায় তিপুর্ দিকে। ওর ঝিলিকহানা চোখ দেখছিল আমাকে। বোকা ছাত্রকে চুরিয়ে জবাব বলে দেবার মতো, কী যেন একটা ইশারা করতে চাইল। কিন্তু তার দরকার ছিল না। জবাবটা আমার জানা ছিল। কাদাখোঁচা পাখি কাদা খুঁটিয়ে পোকা খোঁজে। কাদার পোকা। বললাম, 'পোকা খাবার জন্তে।'

গাজুলিমশাই খুশি হয়ে বললেন, 'এই হল গে কথ। সোনা খোঁচার। বালি খোঁচার সোনার জন্তে।'

তথাপি আমার জবাব মিলছে কোথায়। সোনাখোঁচা নামে কি কোনো পাখি আছে ? বললাম, 'সোনাখোঁচা নামে কোনো পাখির নাম কখনো শুনিনি।'

গাজুলিমশাই তাঁর বিশালবপু শরীরখানিস্থ প্রায় আমার দিকে ফিরে তাকালেন। অল্প দিকে হাসির ঝংকারটা তিপুর্ গলাতেই বেজে উঠল জোরে। কিন্তু গাজুলিমশাইয়ের চোখে ভ্রুকুটি বিস্ময়। বললেন, 'এই এক দেখি, আপনাদের লেখক মানুষদের যা প্রশ্ন চায় তাই ভেবে বলে থাকেন। আপনারা সব বানিয়ে তাবেন, নিজের মনের মতন। বিভূতিবাবুকেও দেখেছি। আর আমাদের বলরামের তো কথাই নাই। সে তো কোয়েলের চরে দাঁড়িয়ে কী যে সব মাথামুণ্ড বলতে থাকে, আমি ছাই বুঝি না।'

তিপু বলে উঠল, 'কী আবার বলবে, বলরামদা কবিতা বলে।'

গাজুলিমশাই বললেন, 'এই শোন, নদীর চরে দাঁড়িয়ে কবিতা বানাতে শুরু করে দেয়, অথচ তার হিন্দুবিদগর্ভ বোকা যাবে না। আপনিও তেমনি, বলে দিলেন, সোনাখোঁচা পাখির নাম কোনোদিন শোনেন নাই। আরে আমি কি বলেছি, সোনাখোঁচা পাখির নাম ?'

কিশোরী তিপু আবার খিলখিলিয়ে বেজে উঠল। সেই সঙ্গে শিবু আর তার মা-ও আছে। আমিই একটু যেন বিরত আর বোকা হয়ে বাই। জিজ্ঞেস করি, 'তবে সোনাখোঁচা কী ?'

'সোনাখোঁচা মানুষ।'

গাঙ্গুলিমশাই জবাব দিলেন, ‘সারা সোনা খোঁচার, তারাই সোনাখোঁচা।’

এমন সরলভাবে বুদ্ধিরে বলে দিলেন, তারপরে আর বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু নিজের বুদ্ধিকেই বা খাটো করে দেখব কেমন করে। সোনাখোঁচার পরে কাদাখোঁচার নামটা তিনি তুলেছিলেন। আর সোনাখোঁচা নামটাই এমন, শুনলেই কেমন পাখি পাখি মনে হয়। তার চেয়েও অবাক লাগে, যে মানুষেরা শিল্পী বা কবি আখ্যায় ভূষিত হয়নি, তাদের মুখ দিয়ে এমন একটি আশ্চর্য নাম! আসলে কথাসিল্পী সবাই, তার ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে সকলের মুখে মুখে। যার কানে বাজে, বাজবার মতো করে, সে তখন হয়ে ওঠে চিহ্নিত রূপকার হয়ে। শ্রবণের থেকে মহৎ কী আছে। রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটা মানে পড়ে যায়, ‘আমাকে যদি শ্রুতি আর দৃষ্টি, দুটোর কোনো একটা হারাবার হত, আমি দৃষ্টি হারাতে রাজী হতাম, শ্রুতি নয়।’ ইচ্ছা করে, তালে তাল দিয়ে, আমিও এমনি করে বলি। বিশ্বচরাচরের যে মহাসঙ্গীত নিরন্তর বেজে চলেছে, শ্রুতি না থাকলে, তার কোনো রহস্যই ধরা যায় না। পতঙ্গের পাখা ঝাপটা থেকে শুরু করে, সবই যে শব্দে বাজে।

‘অই অই অই দেখেন কোয়েল নদী।’

গাঙ্গুলিমশাই হাত তুলে দেখালেন। আমি ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনিবিড় বনের ফাঁকে, দূরে নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একেবেঁকে চলেছে ইম্পাতরঙ কোয়েল। পাহাড়ী নদীর সীর্ণতা তার নেই। গভীরতা টের পাই না। চওড়ায় অনেকখানি, রৌদ্রচ্ছটায় চিকচিক করছে। মাঝে মাঝে বিশাল বনহস্তী যেন জলের বুকে পিঠ ভাসিয়ে রয়েছে, এমনি পাখর। আরো দূরান্তরে ঘন আর নিবিড় লম্বা লম্বা ঘাস। হঠাৎ মনে হয় বুদ্ধি কাশবন।

কিন্তু চোখের তৃষ্ণা মেটে না, হঠাৎ কোয়েল হারিয়ে যায় বাকের মুখে। সহসা বন হয়ে ওঠে নিবিড়। রেললাইন মোড় নিয়ে চলে যায় আর একদিকে। মন আনচান করে। চোখের সামনে ভেসে থাকে কেবল, চওড়া আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ একটি ইম্পাত-চিকচিক ছবি।

‘মাছ বড় মিষ্টি।’

কথা এল একেবারে ভিন্ন জগৎ থেকে। শব্দে বাজল যেন রমনার আশ্বাদ। গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে ফিরে তাকাই। নিভে যাওয়া পোড়া বিড়ি আঙুলে ধরে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছেন, ‘কোয়েলের মাছের কথা বলছি। রাধব-বোয়াল আর রুই-কাতলা মেলে না। ছোট ছোট মাছ, যেমন মিষ্টি তেমনি স্বাদ। আঁহা, ভেল-ঝাল যা হয়!...

গাজুলিমশাই সত্যি সত্যি চৌক গিললেন। আর আমি, যে কী না কোয়েলের ছবির ঋণে ছিলাম, আমারও মনে হল যেন, মাছের ঝালের খাদ পেলাম। এর নাম মাছব। সে যে কখন কোথা থেকে কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তিপু দেখছি, ওর কিশোরী চোখ দুটি মেলে মিটিমিটি হাসছে। বলে উঠল, ‘আপনাকে খাওয়াব।’

চমৎকার! লক্ষ্মী মেয়ে। এতক্ষণে তিপুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি কথা, জিন্সেস করলাম, ‘সত্যি তো?’

তিপু চোখের তারা ঘুরিয়ে বলল, ‘আমি বুঝি মিথ্যা বলছি? দেখবেন খাওয়াই কী না।’

আমি একবার ওর মায়ের দিকে দেখি। ঘোমটার ফাঁক থেকে তিনি কন্ডার দিকেই দেখছেন। গাজুলিমশাই পোড়া বিড়ি কাগড়ে ধরে বললেন, ‘আমাদের খুকী খুব ভাল মাছের ঝাল রাঁধতে পারে।’

খুকী সঙ্গে সঙ্গে চৌকি ঝাঁকিয়ে বলল, ‘ভাল না ছাই।’

বলেই আমার দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি, তিপু নিজের হাতে মাছের ঝোল রান্না করে খাওয়াবে। ভেবেছিলাম, সে খাওয়াবে, রাঁধবেন নিশ্চয় ওর মা। ওর গুণের কথাটা শুনে, খুশি হয়ে উঠলাম। বললাম, ‘ভাল না ছাই, সেটা আমি খেয়ে বলব।’

তিপু আরো একটু লজ্জা পেয়ে, চোখের পাতা নামাল। আবার তাকাল। গাজুলিমশাই সার্থকভাবে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরালেন। বললেন, ‘মেয়ের আমার রান্না খুব ভাল। কেবল হুনের হাতটা একটু খরো।’

তিপু অমনি সোহাগী অভিমানে ঝামটা দিল, ‘দেখছ তো মা।’

মা কিছু বলার আগে, বাবা আবার বললেন, ‘তবে তাতে কিছু যায় আসে না। একমুঠো ভাত বেশি মেখে নিলেই ছুন খরো কেটে যায়।’

তিপু এবার আর মাকে না, একেবারে বাবাকেই, টুকটুকে লাল জিভটি দেখিয়ে ভেংচে দিল, ‘অ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।’

গাজুলিমশাই আমার দিকে তাকিয়ে একখানি হাসি দিলেন। গুটিকয় লাল ছোপ ধরা দাঁত, আর বুড়ো চোখের পাতা পিটপিট। আমার হাসিটা বেজে উঠতে চাইল জোরে। তিপুর চৌক ফুলে উঠতে পারে, ভয়ে সামলে নিতে হল। এবার বুঝি স্বজন, বাপ বেটির আতাতটি কেমন।

এমন সময় শিবু ঘোষণা করল, ‘জরাইকেলা আসছে।’

সঙ্গে সঙ্গে গাজুলিমশাই ব্যস্ত। উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করে বললেন, ‘এল?’

শিবু প্রায় ধমকের স্বরে বলল, ‘তুমি ব্যস্ত হয়ে না তো। তুমি মাকে আর তিপুকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে থাকো। মালপত্র আমি এগিয়ে নিচ্ছি।’

গাজুলিমশাই বললেন, ‘তুই একলা পারবি কেন। একটা ট্রাংক দুটো বড় বাক্স বোঁচকা।’

‘হচ্ছে হচ্ছে। তিপু তুই তোর ব্যাগটা নে।’

তিপু বলল, ‘নিয়েছি।’

পায়ের কাছে যে বনবাসীটি বসেছিল হাতে ফিকা নিয়ে, সে এবার উঠে দাঁড়াল। শিবু অনায়াসে তাকে বলল, ‘ধর তো ভাই ট্রাংকটা, দরজার কাছে নিয়ে যা।’ ট্রাংকটা ছিল আসনের নিচে। বনবাসীটি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, ‘হোয় হোয়, তুই যা।’

অবাক হয়ে দেখি বনবাসিনীটিও গাজুলিমশাইদের বোঁচকা ধরে টানাটানি করছে। যেন, এ আবার বলাবলির কী আছে। তোরা হেথায় নামবি, মালগুলো নামিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা। দেওয়া হচ্ছে, তোরা আগে নাম তো। গাজুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোরা কোথায় যাবি?’

বনবাসীটি বলল, ‘বাগামুণ্ডা।’

গাজুলিমশাই বললেন, ‘তাই বল। তোদের তো এখন সকলেরই বাগামুণ্ডার টান।’

কথাটার অর্থ বুঝলাম না, বাগামুণ্ডার টান কেন। রেল কোম্পানির বইয়ে দেখেছি, বাগামুণ্ডা হল, রাউরকেলার আগের ইন্টিশন। রাউরকেলা উড়িষ্যার ইম্পাত-নগরী। গাজুলিমশাইয়ের হঠাৎ থেয়াল হল, আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার মালপত্র কোথায়?’

বাংকের দিকে দেখিয়ে বললাম, ‘একটা স্যুটকেস ছাড়া আর কিছু নেই। স্টেশনে কুলি পাওয়া যাবে না?’

গাজুলিমশাই বললেন, ‘এখানে ওসব পাওয়া যায় না।’

আমি নিজের হাতে স্যুটকেসটা নামাবার জন্য হাত বাড়ালাম। শিবু বলে উঠল, ‘আপনি যান না, আমি সব নামিয়ে দিচ্ছি। যান যান, আপনি যান।’

গাজুলিমশাইও আমাকে ডাকলেন, ‘আসেন যাই।’

তথাপি একটু দ্বিধা থেকে যায়। যদিও তাতে কোনো লাভ নেই মনে হচ্ছে। অতএব গাজুলিমশাইয়ের পিছনে পিছনে চলি। আমার পিছনে তিপু,

তার পিছনে যা। গাড়ির গতি অতি মন্দ, প্রায় থামে থামে। আর গাজুলিমশাই হেঁকে চলেছেন, ‘এই, ওয়ে সর একটু। ইস, ঘাখো কোথায় সব মাল-পতর রেখেছে। এক চিমটি আরগা রাখেনি। অ সুন্নীন—!’

দরজার কাছ থেকে জবাব আসে, ‘আসেন।’

গাড়ি থামবার আগে বাঁকুনি খেল। তিপু আমার পিঠের জামা শক্ত করে চেপে ধরল। আমি পিছন ফিরে ওকে দেখলাম। হাসছে, কিন্তু লজ্জা পায়নি। বলল, ‘পড়ে যাচ্ছিলাম।’

বললাম, ‘ধরে থাকো।’

পিছন দিক থেকেও চাপ। নারবার বাজী কেবল আমরা না। বাজী আছে, তা ছাড়া আছে মালপত্র নিয়ে এগিয়ে আসার চাপ। সকলের সঙ্গে সকলের শরীর পিষ্ট। যাকে বলে দলা পাকানো, প্রায় তেমনি করে নেমে এলাম সবাই। ওঠবার বাজীদের ভিড়ও কম নেই দরজার কাছে। প্ল্যাটফরমে নামতে না নামতেই শুনলাম, ‘কী রে তিপু, তোরাও এলি আজ?’

পাশ ফিরে দেখি নিতাই, অর্থাৎ নিতু, বলরামের ছোটভাই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল, ‘আপনার জন্মই আমি এসেছি। মেজদা গেছে জঙ্গলে।’

মেজদা অর্থে গোপাল। জঙ্গলে বাস, জঙ্গলেই কাজ। কত দূরে গিয়েছে, কে জানে। নিতু আসাতে স্বস্তি বোধ করছি।

তিপু বলল, ‘নিতুদা, তুমি না এলে, ওঁকে আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতাম।’

নিতু হেসে বলল, ‘তাই নাকি? তুই ওঁকে চিনিস?’

তিপু বললে, ‘হ্যাঁ, রেলগাড়িতে চেনা হয়ে গেল।’

বলে তিপু একবার আমার দিকে চেয়ে হাসল। নিতু টেচিয়ে উঠল, ‘শিবুও এসেছিল?’

তার গলায় খুশির ঝঙ্কার। শিবুও সেই ভাবেই জবাব দিল, ‘হ্যাঁরে।’

বলে শিবু তখন সেই বনবাসীটিকে কিছু পয়সা দেবার চেষ্টায় আছে। আর বনবাসীটি হাতের কাপটা দিয়ে বারে বারে বলছে, ‘বা যা, ঘরকে যা।’

শিবু বনবাসিনীটিকে পয়সা দিতে গিয়ে একই জবাব পেল, এবং সেই সঙ্গে ছ’জনের কী হাসি। গাজুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘হ্যাঁরে নিতু, তোদের খবর সব ভাল তো? ডাখ্ তোদের অতিথিকে তো আমরাই নিয়ে এলাম। শুনলাম বলরামের দৌল।’

বহিঃ জবাবের কোনো প্রত্যাশাই তাঁর নেই। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শিবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হ্যাঁতে শিবু, এসব মালপতর নিয়ে এখন বাড়ি যাবি কেমন করে?’

শিবু বলল, ‘দেখছি। তুমি মা আর তিপুকে নিয়ে ইটা দাও না। আমি কারোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।’

গাজুলিমশাই আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘চলি বাবা, আমরা থাকি রেল-লাইনের ওপায়ে। নিতুরা থাকে এ পারে।’ বলে হাত দিয়ে ছ-দিকে দেখিয়ে নিতুকে বললেন, ‘অরে নিতু, এনাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসিস। গোপাল কোথায়?’

নিতু জবাব দিল, ‘মেজদা ছোট নাগরায় গেছে।’

গাজুলিমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘জেমা আছে তো বাড়িতে?’

‘হ্যাঁ, ও না থাকলে রান্নাবান্না করবে কে?’

‘যাক, মেয়েটা আছে বলে তোরা বেঁচে গেলি। গোপালটাকে এবার বিয়েটিয়ে করতে বল।’

নিতু হাসল, বলল, ‘সে তো আপনারা বলবেন।’

এদিকে গাজুলিগিন্নী নিচু স্বরে কী যেন বললেন তিপুকে। তিপু বলল, ‘বাবা চলো, অনেক বেলা হয়েছে, এখন গিয়ে রান্নাবান্না করতে হবে।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ চল।’

গাজুলিমশাই প্র্যাটফরমের ওপর দিয়ে ইটাতে আরও করলেন। গিন্নী পিছনে পিছনে। তিপু আমাকে বলল, ‘আমাদের বাড়ি আসছেন তো?’

বললাম, ‘নিশ্চয়ই।’

‘আজ বিকালেই আসুন না। নিতুদা নিয়ে আসবে।’

নিতুর চোখে ছুঁছুঁহাসির ঝিলিক। বলল, ‘তিপু যে খুব ভাব জমিয়ে কেলেহিস। এক গাড়িতে এলি, আবার আজ বিকালেই দেখা চাই?’

তিপু হঠাৎ লজ্জা পেয়ে, কথার কোনো জবাব না দিয়ে, হাত বাড়িয়ে নিতুর ফর্সা ঘাড়ের কাছে চিমটি কেটে দিল। নিতু লাফিয়ে উঠে বলল, ‘উহ, ওরে বাবুসী, মাংস তুলে নিয়েছিল।’

তিপু বলল, ‘বেশ করেছে। কেন বললে?’

নিতুকে সেই রকমের ছেলে বলা যায়, যাকে আমরা বলি মুখ ফাঁজিল। বাক্যেতে যে যন্ত্রণা দেয় না, কিন্তু হাসির মধুর সঙ্গে একটু কাল মিশিয়ে দেয়, যার স্বাদটা আলাদা। অন্তরিকে ওর মনটা শাদা যাকে বলে অকৃত্রিম, আর

একদিকে বুদ্ধির ধারটা বেশ শানানো। তিপুৱ চিমটিটা সে সহজে নিল না, বলল, ‘তা এখন শাড়ি পরেছিস, চোখ খুলে গেছে।’

তিপু তৎক্ষণাৎ আবার হাত বাড়াল। কিন্তু নিতু এবার সাবধান ছিল। ঝটিতি কাত হয়ে সরে গেল। তিপু কপট রাগে বলল, ‘আচ্ছা, আর কখনো বুকি পাব না! দেখছেন তো, কেমন পেছনে লাগছে?’

বলে আমাকে সাক্ষী মানলো। সারা রাত্রি গাড়িতে থাকার পরে, মাটিতে নেমে, আর এই বনপাহাড়ের দেশে প্রথম ফাস্কনের রোদে দাঁড়িয়ে, এমনভেই আমার ভাল লাগছিল। তার সঙ্গে, সকলের কথাবার্তা, আশে-পাশে বনবাসী ও বাসিনীদের, কারো কোতুহলিত দৃষ্টিপাত, কারোর বা উদাস হয়ে চলে যাওয়া, এবং তার সঙ্গে নিতু তিপুৱ এই খুনসুটি, কেমন একটা খুশির হাওয়ায় ছুলিয়ে দিচ্ছে। নিতুকে আমার খুব ভালোই জানা আছে। এই ‘পিছনে লাগার ব্যাপারটা ওর বেশ আয়ত্তে আছে। বললাম, ‘নিতু এখন থাক না, ছেড়ে দাও।’

নিতু বলল, ‘আমি কি আর সাথে বলছি। আপনার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখুন না। যেন জোড় বাঁধা কলাবোঁটি এল। তা বিকেলে কেন, এখনই সঙ্গে নিয়ে যা না।’

তিপু এবার পা দাপিয়ে, প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠল, ‘ও মা গো, উহু!’

নিতুর এটা একটু বাড়াবাড়ি, যদিও সত্যি আমি আর ওদের সম্পর্কের বিষয়ে কতটুকুই বা জানি। তবু বললাম, ‘কি হচ্ছে নিতু!’

নিতু বলল, ‘আচ্ছা, আর বলব না। তা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাকাবাবু ও কাকীমার সঙ্গে চলে গেলি না কেন?’

তিপু ঝাম্টা দিয়ে বলল, ‘আমার ইচ্ছা।’

নিতু ঠোট টিপে হাসল, আড়চোখে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। এদিকে শিবু সুরীন নামক লোকটির সঙ্গে কী যে বকবক করে চলেছে, সে-ই জানে। লক্ষ্যণীয়, সুরীন যার নাম, রোগা লম্বা কালো শরু চেহারার লোকটি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এদিকে তিপু গরগর করছে, ‘দাঁড়াও না, তোমাকে আমি দেখাব।’

জবাবে নিতুর সেই হাসি। এবার সুরীন বলল, ‘আর কোনো ব্যাটা বেটিকেই এখন পাওয়া যাবে না। চল, হাতে হাতে নিজেরাই নিয়ে যাই।’

শিবু বলল, ‘তাই যেতে হবে দেখছি। চেনাশোনা কাউকে তো দেখছি না।’

নিভু বলল, 'ভেকে আনব কাউকে? নাকার কাছে অনেকে বসেছিল দেখেছি।'

সুইন বলল, 'হ্যাঁ, এখন যাবি নাকায়, লোক ভেকে নিয়ে আসবি সেখান থেকে। নে চল, যাওয়া যাক।'

এমন সময়ে দূর থেকে শোনা গেল, 'আ গিয়া রে শিবু, হম আ গিয়া।'

শিবু একেবারে দিল্লী ভাষায় বাজল, 'ওই দেখ শালা, গোমা আসছে।'

তাকিয়ে দেখি, দূর থেকে খালি গারে হাফ-প্যান্ট পরা একটি জোয়ান ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে আসতে শিবু জিজ্ঞেস করল, 'কে বলল তোকে?'

গোমা যার নাম, তার মুখটাই বোধহয় হাসির অভিব্যক্তি দিয়ে তৈরি। বলল, 'তোমার বাপ।'

যেন একেবারে খাঁটি বাংলায় কথা বলল। তারপরে আবার বলল, 'সি সাবকা মোকাম কা সামনে বৈঠ্ রহা, বাবুকো দেখা, বাবু জুকুম দিয়া, দৌড়কে আয়া।'

শিবু বলল, 'বেশ করেছে চাঁদ, এখন মালগুলো নে।'

গোমা বলল, 'দে।'

সুইন আর শিবু গোমার মাথায় ট্রান্সক আর দুটো বেশ বড় বড় চটের খলি তুলে দিল। সে বিনাবাক্যে প্রায় দৌড় দিল। সুইন লোকটি আমার নামনে এসে দাঁড়াল। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স হবে। হঠাৎ হেসে হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। আমি একটু অবাক ব্যস্তভাবে নমস্কার ফিরিয়ে দিলাম। সুইন বলল, 'আমাদের জরাইকেলায় বেড়াতে এসেছেন আপনি, খুব আনন্দের কথা। পরে আবার দেখা হবে। এখন চলি।'

কেবল বলতে পারলাম, 'আচ্ছা, পরে দেখা হবে।'

শিবু ডাকল, 'তিপু আয়।'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'যাচ্ছি। এবার আপনি ঢুকবেন উড়িষ্যায়, আমরা বিহারেই থেকে যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি?'

নিভু জবাব দিল, 'হ্যাঁ। এই প্র্যাটফরম থেকে নেমে গেলেই আমরা উড়িষ্যা ঢুকে যাচ্ছি। স্টেশনটা বিহারের মধ্যে।'

বললাম, 'একেবারে সীমান্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি বল।'

নিভু প্র্যাটফরমের বাইরে একটা ছোট খাদের ওপর গাছের গুঁড়ি পাতা সাকো দেখিয়ে বলল, 'ওপারটা উড়িষ্যা।'

বলে 'নিতু আমার হুটকেসটা তুলে নিল। আমি বললাম, 'আমাকেই দাও না।'

যেন একেবারে অলৌকিক কথা বলেছি, এমনভাবে নিতু বলল, 'মাথা ধাওয়া।'

শিবু পা বাড়াতে উত্তত হয়ে বলল, 'তিপু আস।'

তিপু আমার দিকেই তাকিয়েছিল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

নিতু আবার একটু চিমটি কাটল, 'তিপু তো আমাদের বাড়িতেও যেতে পারিস।'

তিপু স্পষ্ট করেই জবাব দিল, 'পারিই তো। মা এখন একলা রান্না করবে, তা না হলে যেতাম। তোমাকে বলতে হত না।'

নিতু চলতে উত্তত হয়ে বলল, 'উরে শাক্ষাশ্।'

আমি এবার তিপুকে বলি, 'চলি।'

তিপু বলল, 'বিকেলে আসছেন, কোয়েলের পাড়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

শিবু তখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তিপু পিছন ফিরে দৌড় দিল। পিঠের ওপর বিহ্বানটা ছিলে। যেন এই বনাঞ্চলেরই একটি কিশোরী বনবাসিনী। সরল নিষ্পাপ স্নিগ্ধ, অথচ কোথায় যেন একটি লাজে লাজানো ভাব আছে। আমি মুখ ফিরিয়ে, নিতুর সঙ্গ ধরলাম।

এতক্ষণ নানান কথার মধ্যেও, আমার শ্রবণ বায়ে বায়ে চর্কিত হচ্ছিল। এখন স্পষ্টই শুনে পেলাম, ঝাঁঝের ডাক। যদিও আশে পাশে ঘন বন নেই। হুরকি কেলা ইঁট বাধানো এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা। আশে পাশে দু'একটা দোকান। আঞ্চলিক নরনারীয়া চলাফেরা করছে। আশে পাশে ঝোপ-ঝাড় দেখে মনে হচ্ছে, অধিকাংশই বনগাঁদা আর বনশিউলি। কেবল যে ঝাঁঝের ডাক শুনাচ্ছি, তা না। কোনো কোনো পাখিও কোথায় যেন ডাকছে। মনে হয় টুনটুন আর বুলবুলি, একজনের একটু ভীষ, আর একজনের একটু স্নিগ্ধ শব্দ বাজছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামা পর্যন্ত একটা বিলাসিত ঘস্ ঘস্ একটানা শব্দ শুনে পাচ্ছি। অথচ শব্দটা যান্ত্রিক বলে মনে হচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'নিতু, এই শব্দটা কিসের?'

নিতু উৎকর্ষ হয়ে শব্দটা শুনে বলল, ওহু, 'ওই ঘস্ ঘস্ শব্দটা? কল্যাণের কল্যাণ চালাচ্ছে। লম্বা বড় কল্যাণ—বড় বড় শালের গুঁড়ি চেঁচাই হচ্ছে। পরে আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাব।'

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি তখন বলছিলে নাকা থেকে লোক তৈরি নিয়ে আসবে। সে জায়গাটা কোথায়?’

নিভু হেসে বলল, ‘ওহু, নাকা মানে ঠিক কোনো জায়গার নাম না। রিভার্স কন্স্টেট দুকতে হলে যে সব গোট আছে, তাকে নাকা বলে। এই দেশী কথা। এরা বলে নাকা চেক। গাড়ি লরী দুকতে হলে, ওই সব গোট দিয়ে চুকতে হয়। তার জন্ত আলাদা পারমিশন লাগে।’

এরকম ব্যাপার আমার জানা ছিল না। এতকাল জানতাম, বন অরণ্য প্রকৃতির রাজ্য সেখানে সকলের অব্যাহত দ্বার। সেখানেও যে এত বিধিনিষেধ আছে, আগে জানিনি। নিভুর বয়স বছর কুড়ি, কিন্তু এখানে ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত। কারণ এই অরণ্যদেশে ঠিকাদার এবং লরীর ব্যবসাটা ওদের দুই পুরুষের। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন অসুবিধা লাগে কেন?’

নিভু খানিকটা অবাক স্বরে বলল, ‘বাহু, তা না হলে, যে খুশি গাছ কেটে চুরি করে নিয়ে চলে যাবে না?’

খুব স্বাভাবিক কথা। তা না হলে আর সংরক্ষিত বন বলা হয়েছে কেন। সরকারের সংরক্ষণের স্বার্থই বা থাকে কোথায়। নিজেই আমার বেকুর্ বলে মনে হয়। ইতিমধ্যেই আমরা উড়িয়ায় পা দিয়েছি। আশে পাশে বিচ্ছিন্ন দু’একটা মাটির ঘর দেখা যায়। গৃহস্থের দেখা পাওয়া যায় না। বাতাসে যে কেবল শালকাঠের গুঁড়ির গন্ধ, তা না। একেবারে নতুন একটা অচেনা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। গভীর বন নয়, এ গন্ধও তার নয়। কিন্তু কেমন একটা পাচমিশেলি গন্ধ, যাকে বনজ বলাই উচিত।

হঠাৎ বনশিউলির ঝোপের কাছ থেকে, একটি লোক এগিয়ে এল টলতে টলতে। এসেই নিভুর হাত থেকে আমার স্মার্টফোনটা টেনে নেবার চেষ্টা করে বলল, ‘আই বাবা, বোডা হামকো থা লেগারে লিভু বাবু, বাকসোটা হামকো দে, লে যায়েগা।’

নিভু ঝাঁজিয়ে বলল, ‘ভাগু, ব্যাটা মাতাল হয়ে আছিল, কলে-টেলে দ্বিবি।’

লোকটির খালি গা। উলঙ্গই বলা যেতে পারত। কিন্তু কানি বলতে যা বোঝায়, তাই দিয়ে সে তার লজ্জা রক্ষা করেছে মাত্র। একমাথা পাকানো পাকানো ধূসর চুল, ঝাড়ের কাছে জট বাঁধবার উপক্রম করেছে। দুই কানের ফুটোয়, প্রায় এক অ মোটা গাছের ডাল পোরা, বোধহয় ওটা কর্ণভূষণ। গলায় কালো স্বতোর সঙ্গে, ছোটখাটো একটি গাছের ডালই বেন বাঁধা রয়েছে। জানি না এটি কঠোর অথবা কোনো মন্ত্রপুত বাহুলি। চোখের বর্ষ টকটকে লাল,

তার দুটো হৃদয় দেখাচ্ছে। বয়সে প্রোট হলও, গা হাত পা পেটানো শক্ত। তার গোটা গা থেকেই বোধহয়, পানীয়র গন্ধ বেরোচ্ছে, যা মোটেই স্বথকর না। বলল, ‘কা বোলতা রে তু লিতুবাবু। হাম মংলা না? হামারা হাত সে বাক্সা গির যায়েগা?’

বাংলা কথার জবাব দিব্যি হিন্দীতে দিয়ে চলেছে। তার মনে, বাংলা কথা বুঝতে পারে, বলতে পারে না। নিতুর হাত থেকে একরকম ছিনিয়েই নিয়ে নিল স্মার্টকেসটা। তারপরে আমার দিকে কিরে, নিচু হয়ে কপালে হাত ঠেকাল। বলল, ‘সালাম বাবু। কলকাতা সে আতা?’

জবাব দিল নিতু, ‘ই্যা।’

লোকটি টাল খেয়ে একবার রাস্তার ধারে চলে গেল। আবার সোজা হয়ে বলল, ‘উতো হামকো দেখকে মালুম হো গিয়া, কলকাতাকা বাবু। উসলিয়ে তো হাম বাক্সা ভেরা হাত সে লিয়া রে লিতুবাবু।’

নিতু আমার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, ‘তা আর জানি না, তুই মংলা মুণ্ডা, মতলব ছাড়া চলিস না। কিন্তু একটা পয়সাও পাব না।’

মংলা মুণ্ডা আমার দিকে চেয়ে হাসল। তার হৃদয় দাঁত দেখা গেল। চোখ দুটো যে কোথায় গেল, বোকা গেল না, কেবল আলপিনের মতো দুটো সফ ঝিলিক দেখা গেল। একটু জড়ানো স্বরে বলল, ‘আহ লিতুবাবু। বাবুকা পকেট মে লাখো পয়সা হায়। তু কাহে দেগা, বাবু হামকো দেগা।’

নিতু বলল, ‘ই্যা, বাবু তোকে পয়সা দেবে, তুই গিয়ে আরো ইন্ডিয়া গিলে মরবি। ওসব হবে না।’

মংলা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, সোজা এল আমার পায়ে ধরতে। সামলাতে না পেরে, মাথা ঠুকল আমার হাঁটুতে। বলল, ‘আম্‌রি খোজা কা নাম লেকে বোলতা, আর হাণ্ডিয়া না পিয়েগা, মোইরি।’

নিতু ধমকে উঠল, ‘এই ব্যাটা, ওঠ।’

আমিও একটু বেকায়দায়। মাতাল দাঁতালকে ভয় পায় না, এমন লোক কম আছে। তাদের আক্রমণের চেহারা বিবিধ। অনেক সময় তার প্রেম-পীরিতও এক রকমের আক্রমণ, তার ধকল সহিতে প্রাণ যায়। মংলা আমার পায়ের কাছ থেকে উঠল, স্মার্টকেসটা হাতছাড়া করেনি। কিন্তু তার ‘মোইরি’ কথাটা কী? নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম। নিতু হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘বলতে চাইছে ‘মাইরি’। ব্যাটাকে এত করে শেখাবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বলতে পারে না।’

মংলা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, ঘাড় হুলিয়ে বলল, ‘মোইরি।’

অর্থাৎ দিবি গলে বলছে, সত্যি পারে না। যদিও এমন কিছু কঠিন উচ্চারণের ব্যাপার না, কিন্তু সামান্যই তো অনেক সময় অসামান্য হয়ে ওঠে। তা না হলে আম রাম হয় রাত হয় আত, সে তো খাস বাঙালীর উচ্চারণ। আর একজন মুণ্ডা মাইরিকে মোইরি বলতে পারে না! ও-কার আ-কারের তফাত বৈ তো না। তবু বাংলা দিবি তো গালছে।

প্রথম ফাল্গুনের বাতাসে এখানে শীতের ছোঁয়া লেগে আছে। এই দুপুরেও তা টের পাওয়া যায়। নিরিবিলা পথের আশে পাশে কী গাছ জানি না। কল ঝুলছে তার ডালে ডালে। পাতা প্রায় শূন্য, সব ঝরে গিয়েছে। ফুলের একটা মিষ্টি তীব্র গন্ধ। মৌমাছিরা ছেকে ধরে আছে। নিতুকেই জিজ্ঞেস করি, ‘এগুলো কী গাছ? কী কল?’

নিতু বলল, ‘কেঁহু গাছ, ফলের নামও কেঁহু। খুব মিষ্টি। আমাদের বাড়ির আশে পাশে অনেক আছে, খাওয়ার আপনাকে। বেশি খেলে পেট খারাপ হয়।’

নিতুর বলার ভঙ্গিতে হাসি পায়। যেন মিষ্টি ফলের জন্য বেশি লোভ না করি, তার আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছে। বললাম, ‘কলগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে, অনেকটা আমাদের গাব কলের মতো।’

নিতু বলল, ‘অনেকটা। তবে গাবের থেকে এর বিচি ছোট, বেশি মিঠে আর রসালো। অনেকটা সবেদার মতো। এ সময়ে এখানকার গরীব লোকেরা এক একদিন শুধু কেঁহু খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেলে।’

মংলা একটু জড়ানো স্বরে আওয়াজ দিল, ‘হাম ভী কেন্দু খাতা। হাম খাতা, চিড়িয়া খাতা, লিলেকো খাতা, মেরং খাতা, উরি খাতা...।’

নিতু এবার ধমকে উঠল, ‘এই, এই মংলা, থাম ব্যাটা। মাতাল বকতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না।’

মংলা একবার আমার দিকে তাকিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। যার মানে কন্যা যায়, মাতাল সে একেবারেই না। কিন্তু হাম আর চিড়িয়া অর্থাৎ পাখি বোকা গেল। বাকীগুলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ও কাদের কথা বলছিল, তুমি জানো নাকি?’

নিতু বলল, ‘জানি। লিলেকো হল মৌমাছি, মেরং মানে ছাগল, উরি মানে গরু।’

মংলা হিসেবে ভুল করেনি। মিষ্টি পাকা কেঁহু কল, মাছ পাখি মৌমাছি

গরু ছাগল সবাই খায়। একলা সে খায় না। তার থেকে অন্তত এইটুকু অহুমান করা যায়, এই সংরক্ষিত বনের গাছের ওপর মাছের অধিকার না থাক, কলের ওপর আছে। কে জানে, ঋতুতে ঋতুতে বনে কত গাছে কত ফল ফলে। মাছকে কত সে দান করে, কোনো পালনের প্রত্যাশা না করে, মাছকে পেট ভরে খাওয়ায়।

নিতু ভাকল, ‘এসে পড়েছি। এদিকে আসুন।’

সে ডান দিকে কিরল। একটা মাটির ঘরের পাশ দিয়ে, গাছের ডাল দিয়ে বানানো গেট। বাধা ছাড়া নেই, ঠেলতেই ঝুলে গেল। ছোট একটি মাটির ঘর দেখে, একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ঘর পেরিয়ে হু’পাশের খোলা জমিতে যেন কিসের চাবু হয়েছে। ছোট ছোট সবুজ চারা মাথা তুলে আছে। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। বেধা গেল, গৃহনীয়মান্য ঢুকেছি। কিছুটা গিয়ে, অনেকখানি কষ্টির বেড়ার বেটনি। সেখানেও একটি আগল। আগল ঠেলে ভিতরে ঢুকলেই, গাছের ছায়ায় ঘেরা একটি মস্ত বড় উঠোন। উঁচু বারান্দাওয়ালা বাংলা ধরনের বাড়িটি নিম্নম। আশেপাশের বন তেমন গভীর না। ‘তবু মনে হয় সেই, ‘কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে, দেখা যায় যে ঘরখানি সেখায় বঁধু থাকে গো’ অনেকটা সেই রকম। যেন বনের মধ্যে নিবিবিলা বাড়িটি আপনাকে মিশিয়ে রেখেছে।

উঠোনের আর একদিকে, মাথায় টালি একটি মাটির ঘর। সেখানে ছ্যাক ছ্যাক শব্দটা স্পষ্টতই রান্নার। মংলা সোজা এগিয়ে গিয়ে, বারান্দার ওপরে তুলে দিল আমার স্ন্যটকেস। আর আমাদের সাড়া পেয়েই বোধহয়, একটি ঘেষে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে, মাটির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, চোখ ছুটি নামিয়ে নিল। মুখে ফুটল একটু বা লাঞ্জে লাঞ্জনো হাসি। বয়স অহুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ। নীল পাড় শালা জমির শাড়ি পরার ধরনটি, পুরোপুরি আটপোরে বাঙালী। গায়ে একটি জামাও আছে। হু’হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথার চুলে এলোথোপা জড়ানো। কালো মেয়েটিকে হঠাৎ দেখলে বনবাসিনী বলে মনে হয় না। অথচ তার মুখে এ অঞ্চলের বনবাসিনীর ছাপ স্পষ্ট। যে কথাটা বলতে আমার বাধে, তা হল ‘আদিবাসী।’ শব্দটার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেন, কোনোটাই আমার তেমন মনঃপূত না। ‘আদিবাসী’ বললেই, কেমন যেন দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, আজকের সমগ্র ভারতের সঙ্গে যেনানো ব্যর্থ না। ভারতবাসী থেকে আলাদা করে রাখার মতো শোনায়। তাতে বিবেচ

সরকারের কতখানি স্বার্থ ছিল জানি না। আজকের ভারতের কোনো স্বার্থ থাকতে পারে না, থাকে উচিত না।

নিতু বলে উঠল, ‘কী রে জেমা, এমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এই তো সেই দাদাবাবু, কলকাতা থেকে যার আসার কথা ছিল।’

জেমা নামটাই যেন মেয়েটির বনবাসিনী পরিচয়কে স্পষ্ট করে দিল। মনে পড়ে গেল, ইন্সটিশনে গাজুলিমশাই জেমার নাম বলেছিলেন। নিতুর কথা শুনে জেমার কী করার আছে বুঝি না। সে আর একবার আমার দিকে তাকাল। সলজ্জ হাসিটি আর একটু স্পষ্ট হল। তারপরে পরিষ্কার বাংলায় বলল, ‘দাদাবাবুকে নিয়ে ঘরে যাও।’

ঠিক যেন একটি বাঙালী মেয়ে কথা বলছে। নিতু বলল, ‘তা নিয়ে যাচ্ছি। দাদাবাবুর জন্ত ভাল করে রান্না করেছিল তো?’

জেমা লজ্জায় ঘাড় ফিরিয়ে হাসল, শোনা গেল, ‘আমি কি ভাল রান্না জানি?’

বাংলা কথায় একটু জড়তা নেই। শুনে অবাক লাগে। এমন বাংলা শিখল কেমন করে। সে কোঁতুহল এই মুহূর্তেই প্রকাশ করে লাভ নেই। এবার নিজেই বললাম, ‘সেটা খেয়ে দেখব।’

জেমা আমার দিকে একবার তাকাল। ওর চোখের কালো তারায় ঝিলিক। মুখটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে রাখল। বোঝা গেল, জবাব দেবার হয়তো কিছু আছে, কিন্তু লজ্জার বাধাটা কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত, তা সম্ভব না।

এ সময়েই মংলা তার নিজের ভাবায়, জেমাকে কিছু বলে উঠল। জেমা হেসে সেই ভাবাতেই জবাব দিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, একেবারে অন্ধকারে। নিতু বলে উঠল, ‘ব্যাটা তোকে মেরে তাড়াবে। জেমা তোর জন্ত এখন ভাত নিয়ে বসে আছে? যা, ভাগ্, এই নিয়ে যা।’

বলে নিতু ওর নিজের পকেটে হাত দিল। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, ‘নিতু, ওটা তুমি না, আমি। ও আমার স্কাটকেন্স এনেছে।’

মংলা আমার কাছে এসে, দু-হাত কপালে ঠেকাল। আমি শুকে একটি টাকা দিলাম। দান-খয়রাতি বা উদারতার জন্ত না, ভাল লাগার একটা মন টলানো ব্যাপার। নিতু বলে উঠল, ‘করলেন কী, একটা টাকা দিয়ে দিলেন? ও তো আজ সারাদিন হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকবে।’

মংলা তাড়াতাড়ি বলল, ‘না না, চাউলি কিনে গা। স্বাস্থ্য পাকায় গা, খারোগা।’

নিতু বলল, 'হ্যাঁ ঘরে নেই বোঁ, তুই চাল কিনে ভাত রাঁধবি।'

জেমা এবার হাসির শব্দে বাজল। বলল, 'ওর বোঁ তো পালিয়ে গেছে।'

মংলা হাসল না, কিন্তু টলে পড়তে গিয়ে সামলে নিল। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হামারা বোঁ কাম করনে গিয়ে।'

নিতু জিজ্ঞেস করল, 'ক' বছর গেছে?'

মংলা ছুটো খাবড়া কালো আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'তুই সাল।'

নিতু আর জেমা একসঙ্গে হেসে উঠল। জেমা বলল, 'তুই সাল ধরে কাজ করতে গেছে, কবে আসবে?'

মংলার রক্তাভ চোখের ধূসর তারা কেমন যেন অশ্রুমনস্ক অবাক আর স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে ঝাঁকড়াচুলো মাখমা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আয়ে গা, এক রোজ চলা আয়ে গা। লেড়কা-লেড়কি কো জে গিয়া না? সব কো লেকে এক রোজ চলা আয়ে গা।'

নিতু আর জেমা এবার তেমন হেসে বেজে উঠল না। নিতু বলল, 'আসবে, তুই চিতায় উঠলে। যা, এখন যা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' বলে সে আবার আমার পায়ের কাছে টলে পড়ল।

আমি বললাম, 'ধাক ধাক।'

কিন্তু এবার সে মানতে রাজী না। পা ছুঁয়ে হাত কপালে ঠেকিয়ে, প্রায় টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। মংলা হাসির আলোয় কেমন যেন একটু ছায়া ঘনিয়ে দিয়ে গেল। হয়তো সে নিজেও জানে, তার বোঁ-ছেলেমেয়েরা আর কোনো দিনই ফিরবে না। তাদের কথা মনে হলে এখনো সে হঠাৎ অশ্রুমনস্ক হয়ে যায়, অবাকও হয় বোধহয়। কী ভাবে সে-ই জানে। হয়তো অনেক কথা মনে পড়ে যায়। তবু একটা আশা আপনা থেকেই বেজে ওঠে, 'আসবে আসবে, একদিন সবাইকে নিয়ে বোঁ ফিরে আসবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর বোঁ বুঝি চলে গেছে?'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ। আর একজনের সঙ্গে চলে গেছে। ওদের ওসব লেগেই আছে।'

নিতুর গলায় তাক্কিলোর স্বর। আমার চোখে চোখ পড়ে যায় জেমার। জেমা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু নিতু যেমন করে বলল, তাই-ই কী? ওদের এমন ছাড়াছাড়ি লেগেই থাকে? যদি থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, জীবনে কোথাও বিড়ম্বনার একটা গভীরমূল শিকড় ছড়িয়ে আছে।

নিতু জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবেন তো একটু?'

বেলা অনেক হয়েছে। তবু চা-তে অকচি নেই। বিশেষ করে, এখনো চান করা দাড়ি কামানো ইত্যাদি বাকি আছে। বলতে গেলে প্রাতঃকৃত্যাদি সবই বাকি। বললাম, ‘অসুবিধা না থাকলে—’

আমার কথার মাঝখানে নিতু বেরকম হেসে উঠল, ঠিক ভেমনি করেই জেমাও হেসে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। নিতু বলল, ‘চলুন ঘরে যাই।’

নিতু নিজেই এবার আমার স্মার্টকেসটা ঘরের মধ্যে তুলল। গৃহস্থালি ভেমনি একটা উজ্জল ঝলমলে কিছু না। শহরে ছাপ প্রায় নেই। প্রথম ঘরটায় একটা সাবেকি খাট, পুরনো কাঠের আলমারি, একটা বিবর্ণ টেবিল আর চেয়ার। নিতু আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে খাটিয়ার ওপরে বিছানা পাতা। একপাশে একটা টেবিল আর চেয়ার। দেওয়ালে ঝোলানো আয়না। বলল, ‘আপনি এ ঘরে থাকবেন।’

পিছন দিকের একটি বন্ধ দরজা দেখিয়ে বলল, ‘ওই দরজাটা খুললেই, ডান দিকে চানের ঘরের দরজা, কিন্তু পায়খানাটাই মুশকিল।’

‘কেন?’

‘যেতে হবে অনেক দূর।’

‘মাঠে নাকি?’

নিতু হেসে উঠল, বলল, ‘ঠিক মাঠ না। গাছপালা-ঘেরা একটা জায়গা আছে।’

সেখানকার ব্যবস্থাও প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায়, কোনো না কোনো জলাশয়ের ধারে, উঁচু খুঁটি পুঁতে, তার ওপরে খুপরি ঘর। সিঁড়ি বলতে আধ ফুট চওড়া একটি তক্তা। ভারসাম্য হারিয়ে যাতে পপাত ধরণীতল না হতে হয়, সে জন্য একটি বাঁশ রেলিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাও সব ক্ষেত্রে না। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতোই তরতরিয়ে ওঠে সবাই। অভ্যাসের ব্যাপার। তাছাড়া, কী যেন বলে একটা, বেগ পেলে বাঘের ভয় থাকে না। কে আর তখন বাঁশের কথা ভাবে।

তবে কেবল পূর্ববঙ্গের কথাই বা বলি কেন। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলেও একই ব্যবস্থা দেখেছি। বিশেষ করে বাদার ভেড়ি বাঁধ অঞ্চলে। কিন্তু সেটাকে তো তবু একটা ব্যবস্থা বলে। রুঢ় অঞ্চলে তো দেখেছি, তা অনেক গ্রামে নেই। বীরভূম বাঁকুড়ার অনেক সম্পন্ন গ্রামে, বস্তুর চিহ্নও দেখিনি। গ্রামের বাইরে, মাঠে, কোনো পুকুরধারে সকলের টান, ভাগাভাগি কেবল স্ত্রী পুরুষে। একটা যদি উত্তরে, আর একটা দক্ষিণে।

কিন্তু এ চিন্তা আপাতত মুকুব। নিতুর বর্ণনায় বা পেলাম, আমার কোনো অসুবিধা নেই। পূর্ববঙ্গ বা রুট, কোনোটাই আমার বাধ নেই। আমি মোটেই বিপদগ্রস্ত বোধ করছি না।

নিতু দরজা খুলে দিল। সামনে চণ্ডা, মাথা-ঢাকা বারান্দা। এটাকে যদি সামনের দিক বলা যায়, তা হলে পিছন দিকের সঙ্গে কোনো মিল নেই। এখানকার ছবিটি সম্পূর্ণ আলাদা। সামনে অনেকখানি নিবিড় সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। কঙ্কিবাঁশের বেড়া নেই, শাল বরগার শক্ত ঘেরাও। এমন কি একটা বড় গেটও আছে। পুরনো হলেও বোঝা যায়, এককালে গেটটি বেশ ভাল ছিল। সবুজ ঘাসের মাঠটিও। গেটের দিকে ডাকালে দেখা যায়, সামনে একটা রাস্তা, বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে বোধহয় উত্তর-পশ্চিমে। এখন একেবারেই দিক ঠিক করতে পারছি না। আর একটা মেঠো লাল মাটির পথ চড়াই-উৎরাইয়ে চলে গিয়েছে সামনের দিকে। তার ডু'পাশে অনিবিড় বড় বড় গাছ। বাঁ দিকেও সেই রকম। কিন্তু ডান দিকটা নিবিড় বন, শাল বরগার বেড়া ডিঙিয়ে। এত নিবিড়, মনে হয়, ওখানে ঢুকলে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সূর্যের আলো ঢোকে না। সেগুন শাল চিনতে পারছি। শাল-গাছে ফুল ফুটেছে। অজুনের শক্ত স্তম্ভ শরীর চিনতেও ভুল হয় না। বাকি গাছগুলোকে চিনতে পারছি না। একটা গাছ দেখছি, তার পুরোটাই হাঙ্গা বেগুনি। বেগুনি রঙটা পাতার না ফুলের বুকেতে পারছি না। কিন্তু এতদূর থেকেও মৌমাছদের ভিড় দেখতে পাচ্ছি। তাই সন্দেহ হল, সবই ফুল। নিতুকে গাছটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। নিতু বলল, 'গাছটার নাম জানি না। কিন্তু পাতা না, সবই ফুল।'

সেই হালকা বেগুনি রঙ ফুলের ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে, চোখ ফেরাতে ভুলে যাই। মনে হল, সেই ফুলের রঙের ছটা, অল্প গাছেও লেগে গিয়েছে।

নিতু বলল, এরকম অনেক দেখতে পাবেন। নীল বেগুনি হলুদ লাল, গোটা গাছ কেবল ফুলে ভরা, পাতা একটাও নেই।'

চোখের তৃষ্ণা যেন আকর্ষণ হয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

'জঙ্গলের মধ্যে। এ তো কিছুই না। আসল জঙ্গলের চেহারাও আলাদা।'

ডান দিকের বন দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বনটাও তো বেশ গভীর মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওদিকে খানিকটা অংশ, রেললাইন বরাবর জঙ্গল একটু ভাঙ্গি। ওদিকে সামটা নালা আছে।'

‘সামটা নালা কী ?’

‘একটা ছোট নদী । পাহাড় থেকে নেমে, কোয়েলের দিকে চলে গেছে ।’

‘দেখতে যাওয়া যায় ?’

নিতু যেন শিশুর কথা শুনে হাসল, বলল, ‘তা যাবে না কেন । ও বেলাই যেতে পারি । জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে । আমরা তো ছেলেবেলায় শুনেছি, আগে জরাইকেলা রেললাইন দিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে, গাছের ডালে অজগর ঝুলতে দেখা যেত । হাতির দল দাঁড়িয়ে থাকত রেললাইনের ধারে ।’

বনপিয়াসী মন এবার যেন একটু থমকে গেল । অজগর এবং হাতি ? তুলেই যাই, বন শুধু বন না, সেখানে বন্যপ্রাণীরাও আছে । আর সেই সব প্রাণীরা কলকাতার চিড়িয়াখানার বাধা বা পোষা না । মানুষ সম্পর্কে তাদের প্রীতিটা বোধহয় তেমন না । বন্যহস্তী কি পয়সা ফেলে দিলে, খুশি হয়ে ও’ড় দিয়ে তুলে নেয় ? নিয়ে তার পালক মাছতের হাতে তুলে দেয় ? বোধহয় না । পয়সা বস্তুটা তার কাছে অচেনা, নিশ্চয়ই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের চোখে দেখবে । আর অজগরের তো কোনো কথাই নেই । ভাবতে গেলেই যেন শিরদাঁড়ার কাছে কাঁপন ধরে যায় ।

নিতু জিজ্ঞেস করল, ‘ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ?’

একটু ঠেক খাওয়া ভাবে বললাম, ‘বনে এসে আর ওদের মুখোমুখি হওয়ার তেমন সাধ নেই ।’

নিতু হেসে উঠল, ‘ভয় পাবেন না । আমি তো আজ অবধি একটাও জংলা হাতি দেখতে পাইনি । অজগর বলতে যা বোঝায় তাও না । তবে বড় সাপ দেখেছি ।’

নিতুর কথায় একটু আশঙ্ক হাওয়া গেল, তখন কিছু রঙ-বেরঙের প্রজাপতি আমার দৃষ্টি টেনে নিয়ে গিয়েছে । দেখতে দেখতেই হঠাৎ বেশ বড় একটি হলুদ-বুক নীল-পাখা পাখি, নির্ভয়ে উড়ে এসে বসল সবুজ মাঠের উঠোনে । বাসন্তী রঙ চঞ্চু, ঘাসে ডুবিয়ে, কী যেন খেতে লাগল । আর শুনছি নিরন্তর ঝিঁঝির ডাক । সেই সঙ্গে নানা পাখির আচমকা শিস দিয়ে ওঠা । আর ঠিক এই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়ে গেল, বারান্দার নিচেই ঘাসের ওপর দিয়ে একটি সাপ কিলবিল করে চলে যাচ্ছে । আমি চমকে উঠে বললাম, ‘সাপ !’

নিতু বলল, ‘ও কিছু না । এগুলো কামড়ায় না, বিষও নেই । সারাদিনই চলা-ফেরা করে ।’

বলে সে নেমে গেল মাঠে। সাপটা যাচ্ছিল মন্থরে। নিতুর তাড়া খেয়ে পালাল তরতরিয়ে। কিন্তু আমার শরীরটা আড়ষ্ট, শিরদাঁড়াটা শক্ত হয়ে উঠেছে। নিতু বনে থেকে বজ্রতা পেয়েছে। আমি তা পাইনি। ঋষি পুরুষও নই যে, বজ্রগ্রাণী সম্পর্কে নির্বিকার থাকি। মুড়তা-বোধের স্বর যেন ক্ষণে ক্ষণেই কেটে যেতে চায়। মনে হয়, এই বন যেন আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার বনশিয়ালী মনকে একটু খুঁচিয়ে স্থপ পাচ্ছে। আমি নিতুকে ডেকে বললাম, ‘দরকার কী, উঠে এস না।’

নিতু উঠে এল। আমার পিছনেই স্তন্যে পেলাম, ‘দাদাবাবু, চা নিন।’

পিছন ফিরে দেখি, জেমা ধুমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে চা নিলাম। এককাপ চা দেখে নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি খাবে না?’

নিতু বলল, ‘না, আমি এমনিতেই চায়ের ভক্ত না।’

সেই জন্তুই জেমা চা নিয়ে আসেনি। জেমা ঘরের ভিতর থেকে, আমার কাছে একটা মোড়া বসিয়ে দিয়ে গেল। কিছু বলল না। বলার দরকার নেই বলেই। ও যে বেশ গোছানো কাজের মেয়ে, তা যেন ওকে দেখলেই বোঝা যায়। নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ও তো বোধহয় এদেশেরই মেয়ে?’

নিতু বলল, ‘হ্যাঁ, জেমা ওরাও মেয়ে?’

‘এমন সুন্দর বাংলা শিখল কেমন করে?’

‘ওর জন্ম তো আমাদের এ বাড়িতেই। আমার বাবা যখন প্রথম এখানে ঠিকাদারি করতে আসেন, তখন জেমার বাবা-মা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। চোকবার সময় সামনে যে ঘরটা দেখলেন, সেই ঘরেই থাকত। আমাদের ভাই-বোনেরা কারোয় কারোর জন্ম তো এখানেই হয়েছে। জেমা ছেলেবেলা থেকে আমাদের সঙ্গেই মিশেছে, কথা বলেছে। বৌদি অনেকবার এখানে এসে থেকেছেন। জেমা আমাদের কলকাতার বাড়িতেও অনেকবার গেছে, থেকেছে। ওর সবই আমাদের মতো হয়ে গেছে। কথাবার্তা চালচলন। এমন কি আমাদের সব রান্নাও ও জানে। এখানকার সংসার তো জেমা-ই চালায়।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওর বাবা-মা কোথায়?’

‘মারা গেছে।’

‘ভাই বোন নেই?’

‘আছে। যে যার নিজদের কাজের জায়গায় থাকে।’

ভারপরেই স্বাভাবিকভাবে মনে একটা প্রশ্ন আসে। ওরাও সম্প্রদায়ের এক

বড় যুবতী মেয়ে। এখনো কি জেমার বিষয়ে ঘর সংসার ছেলেপিলে হয়নি ? জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওর কি বিষয়ে হয়নি ?’

নিতু বলল, ‘হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি ?’

মনে কোতুহল থাকলেও আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। কোন্ কথার সীমা কোথায় লঙ্ঘিত হয়, কে জানে। তথাপি জেমার মতো স্ত্রী, কর্মনিপুণা বনবালা সংসার-জীবনে প্রাতিষ্ঠিত হতে পারেনি, এ চিন্তাটা মন ভার করে দেয়। কিন্তু নিতু নিজেই আবার বলতে থাকে, ‘ওর স্বামীটা এমনিতে খারাপ না। দেখতে তনতে ভাল ছিল। হাঁড়িয়া পচুই ওরা সবাই খেয়ে থাকে, দুধের শিশুটিও বাদ যায় না। জেমার স্বামী একটু বেশি নেশা করত, জেমার সেটা ভাল লাগত না, ও তো আবার একটু অল্প খাঁচে বড় হয়েছে। তার জন্ম বগড়া লাগত প্রায়ই। তাতেও কিছু যেত-আসত না। জেমার স্বামী খুঁটান হয়ে গেল। অনেক মিশনারিয়া আছে তো, আদিবাসীদের খুঁটান করতে চায়। জেমা কিছুতেই খুঁটান হতে চায়নি। তা নিয়ে অনেক বগড়া বিবাদ অশান্তি হয়েছে। তখন ওরা আমাদের বাড়িতে থাকত না। গুয়ার খনিতে কাজ করত ওর স্বামী, কুলির কাজ। আমার বাবা তখনো বেঁচেছিলেন। আজ থেকে প্রায় দশ-এগারো বছর আগের কথা বলছি, একদিন জেমা আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাবার কাছে এসে কান্নাকাটি করল, সব ঘটনা বলল। বাবার একটাই ভয় ছিল, অশান্তির ভয়, জেমার স্বামী এসে যদি কোনোরকম হুজুত-হাঙ্গামা করে। তবু জেমাকে থাকতে দিলেন, বললেন, ‘কাজকর্ম করবি, থাকবি, তোর যতদিন ইচ্ছা। তোর বাবা-মা এ বাড়িতেই মরেছে, তোমের জন্মও আমাদের ভিটাতেই। আমি না থাকি, আমার ছেলেরা তোকে রাখবে। আর যদি কখনো কারোকে আবার বিষয়ে করিস, তখন নতুন সংসারে চলে যাস।’

নিতুর কথার সঙ্গে সঙ্গে, ওর বাবার ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাঁকে আমি বোধহয় একবার মাত্র কলকাতার বাড়িতে দেখেছি। তাঁর হৃদয়বত্তা এবং বিবেচনাবোধ আমাকে মুগ্ধ করল। জিজ্ঞেস করলাম, সেই থেকে জেমা তোমাদের বাড়িতে আছে ?’

‘সেই থেকে। ও তো প্রায় মেজদার বয়সী, একটু ছোট হতে পারে। আমাদের বোনেরই মতো।’

সেটা ওদের কথাবার্তা শুনেও খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘জেমার কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি ?’

‘না।’

একটু ধেমো নিতু আবার বলল, ‘বিয়ে হয়তো হতে পারত আর একটা। এখনো হতে পারে, যদি জেমা রাজী হয়। কিন্তু ও কিছুতেই রাজী না।’

অবাক হয়ে বললাম, ‘তাই নাকি? কে বিয়ে করতে চায়?’

নিতু বলল, ‘অনেক ছেলে। অনেকে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এখনো অনেকে চায়। বেশ ভাল পণ দিয়েই ওকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু জেমা কিছুতেই করবে না।’

কৌতূহলিত হয়ে বললাম, ‘পণ মানে?’

নিতু হেসে বলল, ‘ওদের সিস্টেম হল, মেয়েকেই পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়। এমন কি এখানকার গঞ্জুর ছেলে পর্যন্ত ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে, রাজী হয়নি।’

‘গঞ্জুরা কী?’

‘অনেকটা খাজনা আদায়কারীর মতো বলা যায়। আবার অস্ত্র দিক থেকে, সেই লোকটাই হয় ওদের পঞ্চায়েতের নেতা। ওদের সমাজে খুবই গণ্যমান্ত লোক। গঞ্জু নিজে এসে সাধাসাধি করেছে। মেজদাকে বলেছে। মেজদাও বলেছে। জেমা রাজী তো নয় বটেই, মেজদা বলেছিল বলে কান্নাকাটি শুরু করেছিল।’

একটু অবাকই লাগে। একটি গুরাও যুবতী ছাড়া কিছু না। স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী। স্বাভাবিকভাবেই তার বিয়ের ইচ্ছা থাকতে পারে। সম্ভান-সম্ভতির আকাজক্ষা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এমন করে বেকে বসার কারণ কী? গুরাও বালাটির মনে কী স্বর গুঞ্জে? শুনি প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কোথাও জেমা পাখি ধরা পড়ছে না? অথচ দেখে শুনে তো মনে হয়, এখনো চোখ থেকে রঙের ছটা যায়নি। ব্রীড়া আর লজ্জা মেশানো অভিব্যক্তিতে, এ মেয়ের প্রেমিকা হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তবে পিরীতি ধন বলে কথা। সে নাকি আবার ফুলের মতো। কখন যে ফোটে, কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় ছুটলেও, চোখে দেখা যায় না। সে আপন ভায়ে আর গন্ধে আত্মহারা হয়ে থাকে। জেমার কী হয়েছে, কে জানে।

নিতু ওর স্বভাবচতুর হাসি হেসে বলল, ‘এখন আপনারা বলতে পারেন, জেমার মন কী চায়।’

‘কেন?’

‘আপনারা তো মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন।’

হেসে বলি, 'সে-রকম ঝামু কারবারী আর হতে পারলাম কোথায়। তোমার দাদা বললাম কী বলে ?'

নিতু বলল, 'দাদার ধারণা, জেমা মনে প্রাণে বাঙালী হয়ে গেছে, ও আর কোনো আদিবাসীর ঘরে যেতে চায় না।'

জিজ্ঞেস করি, 'তেমন বাঙালী ছেলে নেই, যে জেমাকে বিয়ে করতে পারে ?'

নিতু যেন একটু ভাবল। তারপরে বলল, 'তেমন আর কোথায় ? এমন বাঙালী অবিভি আছে, যে জেমাকে নিয়ে মজা-টজা লুটতে চায়। বিয়ে করবার সাহস কারোর আছে বলে তো মনে হয় না। তবে—'

কিন্তু একটু গমকে গেল, ঠোট টিপল। আমি নিতুর মুখের দিকে তাকালাম। টেপা ঠোটের কোণে একটু হাসি ঠেকিয়ে রেখেছে। চোখেতে হাসি চিকচিক। আস্তে আস্তে মুখ খুলল নিতু, 'জেমার বোধহয় বাঙালীই পছন্দ।'

নিতু যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে, অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। একটা কী বলতে গিয়ে বলল না। আমিও রেহাই দিলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, 'সেরকম বাঙালীর খোজ কি জেমা পেয়েছে ?'

নিতু নিঃশব্দে হেসে উঠল। বলল, 'বোধহয়।'

'এখানকারই বাঙালী ?'

'হ্যাঁ। আপনি তাকে দেখেছেন।'

প্রায় ৫ হয়ে যাবার মতো কথা। জরায়িকেলার মাটিতে পা দিয়েছি কতক্ষণ ? ক'জন মানুষকেই বা দেখলাম। এর মধ্যেই জেমার ফাঁদপাতা পুরুষটিকে দেখেছি আমি। মনের তলা হাতড়ে, গাঙ্গুলিপরিবার ছাড়া কারোই কথা মনে করতেই পারছি না। তার মধ্যে শিবুকে চিন্তা করতে পারি না। শ্রীমান নিতুকেও না। কেন না, ও তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে, জেমা ওদের বোন। বললাম, 'পরিষ্কার কর বাপু, একেবারেই মনে করতে পারছি না।'

নিতু হেসে বলল, 'কেন, সুরোনদাকে দেখলেন না ?'

লোকটির চেহারা মনে পড়ে গেল, সেই সঙ্গেই, হঠাৎ নমস্কার করে বিদায় নেবার ছবিটাও ভেসে উঠল। অবাধ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'উনি কি এখনো অবিবাহিত নাকি ?'

নিতুটা সত্যি কান্নিল, বলল, 'না সেই আপনারা কী যেন বলেন ভাল কথা—বিপত্নীক। সুরীনের বোঁ মারা গেছে বছর খানেক হল। দুটি পুত্রজাও আছে।'

‘কী করে জানা গেল, সুরীনবাবুকে জেমার পছন্দ ?’

‘জেমার দিক থেকে এখনো সেরকম স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে সুরীনদা মুখ ফুটে বলেই কলেছেন।’

‘কাকে ?’

‘জেমাকে বলেছেন, মেজদাকেও বলেছেন।’

‘জেমা কী বলে ?’

‘ঠিক করে কিছুই বলে না। তবে সুরীনদা এলে, জেমা একটু কেমন যেন হয়ে যায়। সকলের সামনে সুরীনদার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। আড়াল হলেই ছ’জনে কথা বলে। সুরীনদা জরাইকেলায় থাকলে, রোজই একবার আমাদের বাড়িতে আসে। যখনই আহুক, জেমা তাড়াতাড়ি চা করে দেয়। ইদানীং দুপুরে সব কাজকর্ম মিটিয়ে, খেয়ে দেয়ে, জেমা রোজ একবার বাড়ি থেকে বেরোয়। রেললাইন পেরিয়ে ওপারে যায়। সবাই জানে, সুরীনদার বাড়িতে যায়। সুরীনদা বাড়িতে না থাকলে ছেলে দুটিকে একটু দেখেত্তেনে আসে। তাতেই মনে হয়, জেমারও বোধহয় ইচ্ছা সুরীনদাকে বিয়ে করে।’

সুরীন নামক সেই ব্যক্তিটির মুখ আবার আমার মনে পড়ল। তেমন ভাল করে চেয়ে দেখা হয়নি। এখনো মুখটা অস্পষ্ট। এইটুকু খালি মনে হয়, খুবই সাধারণ চোখ মুখ। কপালে আর রগের কাছে, কিছু চুলে পাক ধরেছে। অনেকটা, একটি গ্রামীণ পরিশ্রমী মানুষের মতো। মানুষটি সম্পর্কে কৌতুহল জেগে উঠল। জিজ্ঞাস করলাম, ‘উনি করেন কী ?’

‘মোটর মেকানিক। চাকরি করেন না, তবে অনেক ঠিকাদারেরই তো লরী আছে। তার জন্ত মেকানিকের দরকার হয়। আগে কাজ করতেন জামসেদপুরে। সেখান থেকে প্রায় এখানে আসতেন লরী সারাতো। তারপরে এক সময়ে কী খেয়াল হয়েছিল, বরাবরের জন্ত এখানেই চলে এসেছেন। ছোটখাটো একটা মাটির বাড়িও করেছেন। রেলের ওপারে শিবুদের বাড়ির দিকে। আসল জরাইকেলাটা ওদিকেই। আমাদের এদিকটাকে সামুটা বলা যায়। শুনেছি সুরীনদার সঙ্গে তার ভাইয়ের বগড়া-বিবাদ হয়েছিল। তার জন্তই এখানে চলে এসেছিলেন। এমনিতে রোজগার তো খারাপ না। এসব জায়গায় মোটর মেকানিকরা শহর ছেড়ে আসতে চায় না। সুরীনকে তাই মনোহরপুরেও যেতে হয়। সবাই ডাকাডাকি করে। তারপরে হঠাৎ বোঁ মরে গেল। তাও অসুখ করে না, কী কল নাকি খেয়েছিল। তার বিবিক্রিয়াতেই মারা গেছে। টাইবালান্ন নিয়ে বাওয়া হয়েছিল। বাচানো যায়নি।’

নিতু চুপ করল। আর আমার মনে হল, একটা গোটা জীবনের অধ্যায় যেন শুরু। কোঁতুহল দমন করতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ‘জেমা আজও নিশ্চয় স্বরীনবাবুর বাড়ি বাবে?’

নিতু বলল, ‘তা বলা যায় না। আজ আপনি এসেছেন তো। তবে স্বরীনদাই আসবেন। বিকেলটা হোক না।’

নিতুর বলার ভঙ্গিতে আমার হাসি পেয়ে গেল। আর মনে পড়ে গেল, স্বরীনের শেষ কথা, ‘আবার দেখা হবে।’ কী ভেবে বলেছিল, কে জানে। এ বাড়িতে আসবেন, সে কথাটা অগ্রিম জানিয়ে রাখার জ্ঞাত নাকি?

এ সময়েই পিছন থেকে জেমার গলা শোনা গেল, ‘নিতু দাদাবাবুকে নাইতে যেতে বল। রান্না তো হয়ে গেছে। তুমিও চান করে নাও এবার।’

জেমার স্বরে নির্দেশের স্বর। আমি পিছন ফিরে একবার জেমাকে দেখলাম। সেই সলজ্জ হাসি-হাসি ভাবটি এখনো আছে। মুখ নামিয়ে চলে গেল। নিতু লাফ দিয়ে উঠল, ‘হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়েছে উঠুন।’

তার পরেই একবার জেমার চলে যাওয়ার পথের দিকে দেখে নিয়ে বলল, ‘আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে কী না কে জানে।’

নিতুকে বেশ শঙ্কিত দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ‘শুনতে পেলে কী হবে?’

নিতু চোখ গোল করে বলল, ‘ওরে বাবা, আমাকে গালি দিয়ে ছুত ভাগিয়ে দেবে। ভীষণ ক্ষাপা মেয়ে, বাগলে যন্ধে নেই, মা-কালী।’

নিতুর কথার ধরনে হাসি দমন করা সম্ভব না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘গোপাল আসবে কখন?’

নিতু বলল, ‘যেজদার আসতে আসতে সচ্যোবাজি হবে যাবে। আপানার সব সাক্ষন, আমি চানটা সেয়ে নিই।’

নিতু চলে গেল অগ্ন ঘরে। জেমাকে বেশ ভয় পায় দেখছি। অথবা, এটা ভয় নয়, প্রীতি এবং প্রজ্ঞা। ওরাও মেয়েটিকে যে ও প্রজ্ঞা করে, বোনের মতো ভালবাসে, সেটা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে আমার মধ্যেও একই অহুত্ব যেন চুঁইয়ে ঢুকেছে। মাহুব মাহুব করলাম এত, তবু মাহুব বোঝা কী দায়। শেষ কোথায় আছে? নেই বোধহয়। তাই এই বনের ডাকে ছুটে এসেও, মাহুব প্রকৃতির রূপে মন তুলে যায়। আবেগ? হতে পারে, কিন্তু মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। কাকে যে প্রশ্ন করি, জানি না।

ঘুম আসেনি। রাতের গাড়ি আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতে পারেনি। চিরদিন অপরের ঘুমন্ত নিশ্বাস আর নাসিকাস্রব নিশেই, রাতের গাড়ি আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তবু এই বনদুয়ারের নিদ্রাঘ হুপুর, আমার চোখে ঘুম এনে দেয়নি। নিয়ত ঝিল্লিস্বর আচমকা পাখির ডাক, বনের গন্ধ, আমার সমগ্র অহুত্বতিকে এক নতুন জগতের প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যদিও বিশ্বাসের ব্যাঘাত হয়নি। আমার শরীরে কোনো আলস্য নেই, মানি নেই। খাটিয়ার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিচ্ছেই যেন তাজা হয়ে গিয়েছি।

আর মনে পড়ছে বারে বারেই, জেমার খেতে দেবার কথা। নাগরিকতার অনেক ঝলক ঝিলিক তো দেখছি। তাতে আত্মার অহংটা বেশ রমরমিয়ে ওঠে বটে। অনির্বচনীয় স্বধারসের একটা তৃপ্তি বলে কথা আছে, সেটা মেলে না। তার মানে হল, চিন্তে অনেক বিপরীতের খেলা। যদিও লোকেরা মনে করে, স্বরবর্ণের ‘এ’ আর ‘ও’ চিরদিনই ভিন্ন, একের মধ্যে দুইকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে কথা থাক গিয়ে। গাছের ছায়ায় ঢাকা পিছনের উঠানের ওপারে, মাটির ঘরের মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে খেয়ে যে কেবল তৃপ্তি পেয়েছি, তা না। সমস্তটাই যেন একটা স্বন্দর অহুষ্ঠানের মতো বোধ হয়েছিল। মাটির মেঝে নিকিয়ে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাতের পাতে নিমপাতা ভাজা দিয়ে গুরু করে, পোস্তচচ্চড়ি, ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন। রুইমাছের ঝোল আর তেঁতুলের অম্বল, অনন্ত স্বাদের সেই খাণ্ড পরিবেশন করেছিল কে? একটি বনবাসিনী ওয়াওঁ মেয়ে। চর্চাপদের কবিতায় যেন কী পড়েছিলাম? কলাপাতায় স্বরঝরে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছ, বেড়ে দিয়ে যে আমাকে খাওয়ায়, সে-ই পুণ্যবতী। চল্লিশ বছর বয়সের, খোঁচা খোঁচা গোঁপ-দাড়ি ভরা, নিরীহ গ্রামীণ মুখ, স্রীর মোটর মেকানিকের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

তার প্রথম স্ত্রীকে দেখিনি। কিন্তু লোকটি যে পুণ্যবান, তাতে সন্দেহ নেই।

ঘুম আসেনি, চোখ বুজে শুয়েছিলাম। কিছুক্ষণ থেকেই, দূর থেকে কাদের অশ্লষ্ট কথার স্বর শুনেতে পাচ্ছিলাম। শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। উঠে পড়ে টেবিলে রাখা ঘড়ি দেখলাম। চারটে বাজে। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এই বনাঞ্চলে প্রথম কাস্তনের রোদ মায়ায়, কিন্তু যেন হেলে পড়ার ইচ্ছা তার নেই। তথাপি খাটিয়ায় গা পাততে আর ইচ্ছা করল না। ছ’ঘরের মাকুথানের দরজাটা খোলা। উকি দিয়ে দেখলাম, নিতু নেই। আমার অন্ত পাশেও ঘর আছে, তার দরজা বন্ধ।

বারান্দার বেয়িয়ে এলাম। একটানা কিছুক্ষণ ডাক যেন নৈশকোয়রই একটা ধ্বনি। কোথাও একটা লোক নেই। অস্পষ্ট কথা শুনে তখনো স্তন্যে পাচ্ছি। আমি ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বারান্দাটা বাক নিয়েছে ডাইনে। গোটা বাড়িটার চারদিকেই বারান্দা। ইটের চওড়া দেওয়াল আর মাথায় টালি, যাকে বলা যায় বাংলোবাড়ি। এদিকটায় ওবেলা আসিনি। দেখছি কিছু ধামা চূপড়ি, দুটো পুরনো লরীর টায়ার, জং-খরা কিছু যন্ত্রপাতি একপাশে এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ খিলখিল হাসির সঙ্গে একটু চমকে উঠলাম। চোখ গেল উঠোনের দিকে। রান্নাঘরটা এখান থেকে দেখা যায়। হাসিটা থামবার পরে, আবার অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা গেল। মনে হল, রান্নাঘর থেকে হাসি আর কথা ভেসে আসছে। সম্ভবত নিতু আর জেমা। ভাবনাটা পুরো করবার আগেই, আমার পিছনেই নিতুর গলা শোনা গেল, ‘ঘুম ভেঙে গেছে আপনার?’

অবাক হয়ে ফিরে বললাম, ‘ঘুম আর কী, জেগেই ছিলাম। ঘুম এল না।’

নিতু বলল, ‘রাত্রি জেগে এসেছেন।’

‘কিন্তু খারাপ লাগছে না।’

‘তাহলে জেমাকে চা করতে বলি।’

বললাম, ‘আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় রান্নাঘরে জেমার সঙ্গে কথা বলছ।’

নিতু ঠোঁট টিপে হেসে বলল, ‘আমি না। স্বরীনদা এসেছে, জেমার সঙ্গে কথা বলছে।’

বলে সেখান থেকে গলা তুলে বলল, ‘জেমা, চা করবি নাকি?’

জেমারও উচ্চস্রবে জিজ্ঞাসা ভেসে এল, ‘করব। দাদাবাবু উঠেছেন?’

নিতু বলল, ‘হ্যাঁ।’

আমরা দু’জনেই বারান্দার সামনের দিকে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কি বেরিয়েছিলে?’

নিতু বলল, ‘হ্যাঁ, আমি একটু মোহনবাবুর বাড়ি গেছিলাম। উনি এখানকার জঙ্গলের একজন ঠিকাদার। বাড়ালীদর মধ্যে, এখন ঠুর অবস্থা মোটামুটি ভাল। ঠুর সঙ্গেই মেজদা জঙ্গলে গেছে। রাতে আসবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।’

মনে ভাবি, ঠিকাদার মাহুকের কি আমাকে ভাল লাগবে? নিতু আবার বলল, ‘আপনার জঙ্গলে যাবার ব্যবস্থা মোহনবাবুই ঠিক করেছেন।’

‘তাই নাকি ?’

‘হ্যাঁ, ওঁর নানান ব্যবস্থা আছে। কোথায় কোথায় আপনি থাকবেন, সেসব উনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।’

উপকারী ব্যক্তি, নিঃসন্দেহে। মেজাজটাও খুশ হল। আমার বনে যাবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি। নিতু আবার বলল, ‘চা খেয়ে বেরোবেন তো ?’

বললাম, ‘নিশ্চয়ই।’

‘তা হলে আগে তিপুদের বাড়ি যেতে হবে।’

নিতু ভোলেনি দেখছি। জিজ্ঞেস করলাম, ‘যেতেই হবে ?’

নিতু সহজভাবেই বলল, ‘হ্যাঁ, তা না হলে পাগলি ক্লেপে যাবে। আপনাকে তো কিছু বলবে না। আমাকে নিয়ে পড়বে। ভাববে, আমিই আপনাকে যেতে দিইনি। চা হতে হতে আপনি তা হলে তৈরি হয়ে নিন।’

তৈরি হওয়ার মধ্যে, চোখে-মুখে জল দিয়ে জামাকাপড় পরে নিলাম। নিতুও পোশাক বদলে নিল। জেমার চা আসবার আগেই, ঘরের দরজায় গলা-খাঁকারির শব্দ পেলাম, তারপরে, ‘নমস্কার।’

তাকিয়ে দেখি স্বরীনবাবু। ও-বেলা ছিল বিদায়ের নমস্কার, এ-বেলা বোধহয় আবার দেখার নমস্কার। দেখছি, এখন তেলতেলে মুখটি বেশ শাফ-স্বরত, গৌর-দাড়ি কামানো। মাথার চুলও তেল-চুকচুকে। মোটা ধুতির ওপরে সাধারণ জামা, পায়ে স্নাওল। বললাম, ‘নমস্কার, আসুন।’

নিরীহ মুখে বিনীত নম্র হাসি। চলা-ফেরার ভক্তিটিও সেইরকম। ঠিক যেন যন্ত্র-ঘাঁটা লোক না। ঘরে ঢুকে বলল, ‘বেরোচ্ছেন নাকি ?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, কোয়েল নদীর ধারে যাব।’

স্বরীন বলল, ‘ঘুরে আসেন। আমরাও ওদিকেই কাছাকাছি থাকি। তবে কোয়েল দেখতে ভাল লাগে ভোরবেলা, প্রথম রোদটা যখন ওঠে। তখন নদী আর চর, সবই যেন সোনার মতন চিকচিক করে।’

কথাগুলো মোটেই মোটর মেকানিকের মতো শোনানোচ্ছে না। এ তো দেখছি প্রকৃতি-বসিক। এ সময়েই জেমা এল ছ’হাতে ছ’কাপ চা নিয়ে। এখন ওর খোলা চুল। নীলডোরাকালাপাড় শাড়ি। চায়ের কাপ আগে ছিল আমাকে, তারপরে স্বরীনকে। কোনো কথা না বলে চলে গেল। যেন স্বরীনের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই।

স্বরীন চায়ের কাপ নিয়ে আবার নিজের কথায় ফিরে এল। বলল, ‘কোয়েলে চান করবেন, ভাল লাগবে। ভারি ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল।’

নিতু ঢুকল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘চা খাবে না?’

‘না, আমার ভাল লাগে না।’

আসলে ও চা খায় না। আমি তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শূন্য করে নামিয়ে দিলাম। স্বরীন নিতুকে বলল, ‘কোয়েলের ধারে যাচ্ছিল?’

‘নিয়ে, একবার শিবুদের বাড়িও যেতে হবে।’

স্বরীন বলল, ‘হ্যাঁ, ওনারে গাড়িতেই দেখেছি গাজুলিখুড়ার সঙ্গে কথা বলতে।’

আমরা বেরোবার উত্তোগ করলাম, নিতু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি এখন আছ তো?’

স্বরীন বলল, ‘ধানিকক্ষণ আছি। তারপরে একবার সাহেবের কাছে যাব, ডেকে পাঠিয়েছে বেন কী জন্ত।’

‘কে, উইলিয়ম?’

‘হ্যাঁ। কেন, তোর কোনো দরকার ছিল?’

নিতু বলল, ‘দরকার মানে, সোলেমান আজ পাঠা কাটবে কী না, খোজ নিতে পারলে হত। একটু মাংস আনতাম তা হলে।’

স্বরীন বলল, ‘আচ্ছা সে আমি দেখব’খন। কাটলে আমিই দিয়ে যাব। আধসেরটাক তো?’

‘হ্যাঁ।’

আমরা পিছনের দিক দিয়ে বেরোলাম। স্বরীন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠোন পর্যন্ত এসে বলল, ‘সোলেমান পাঠা না কাটলে একবার মাংসদেব পাড়ায় চুকে দেখে আসব, কেউ বনমোরগ বা ডাক শিকার করতে গিয়েছে নাকি। উনি আবার পাখির মাংস খান তো?’

‘উনি’ মানে আমি। নিতু আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। আমি হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। ভোগের ব্যাপারে নিজেকে সর্বভুক করে রেখেছি। তবে মুরগী খেলেও, ডাকপাখির স্বাদ জানা নেই। নিতুর পিছনে চলতে চলতে, ডাকপাখি ধরার ভঙ্গিটা মনে পড়ল। শোনা কথা। এখানকার অধিবাসীরা বোধহয় তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করে। আমি শুনেছি ফাঁদের কথা। প্রেমের ফাঁদ ডাকপাখি যে ধরে, তার থাকে একটি পোষা মেয়ে-ডাকপাখি। খাঁচা খোলা রাখলেও সে পালিয়ে যায় না। যেখানে ডাকপাখিদের আনাগোনা, তেমনি একটি নিরিবিচি ছায়ায়, মেয়ে-ডাকপাখিটিকে খোলা খাঁচায় রেখে দেয়। আর সে ডাকতে থাকে। তার ডাক শুনেই,

পুরুষ-ডাকপাখি অস্থির হয়। সে-ও ভাকে। প্রেমের ডাকাডাকি। ডাক-পাখিকে খুব সাবধানী পাখি বলা হয়। একটু সন্দেহ হলে, সে আর ধারে-কাছে নেই। কিন্তু মেয়ে-ডাকপাখি যখন খাঁচার একপাশে বসে কেবল ডাকতে থাকে, তখন সজাগ সাবধানী পুরুষটি আর স্থির থাকতে পারে না। তখন তার প্রকৃতিগত সাবধানতা কোথায় হারিয়ে যায়। তার থেকেও বড় প্রকৃতির টানে সে খাঁচায় গিয়ে ঢোকে। ফাঁদওয়ালার খাঁচার এমন কায়দা, ঢোকা মাত্রই খাঁচার মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর বটাপটি করলেও নিস্তার নেই। সে শুধন বন্দী।

মেয়ে-ডাকপাখিটার কথা ভেবে অবাক লাগে। মানুষের হাতের ক্রীড়নক হয়ে নিজের প্রেমিকদের এমন সর্বনাশ সে কেমন ক'রে করে? কিন্তু তা-ই করে কি? বোধহয় জেনে-শুনে করে না। সে-ও হয়তো ডাকবার জন্তই ভাকে, সঙ্গী পাবার আশায়। পায়ও, কিন্তু পেয়েও পাওয়া হয় না। যে প্রেমিককে সে ডেকে নিয়ে আসে, সে প্রেমিককে মানুষ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। একদিক থেকে দেখতে গেলে, তার হাহাকার চিরদিনের। দিনের পর দিন সে প্রেমিককে ডেকে আনে, অথচ তাকে পায় না। মানুষের হাতে সে শুধু শিকার ধরার ফাঁদ।

কিন্তু হঠাৎ আমাকে খামতে হল। ডাকপাখির ফাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে নিতুর সঙ্গে কোথা দিয়ে কতখানি এসেছি, খেয়াল করিনি। সহসা আমার সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে আগুনের শিখা দেখে, থমকে দাঁড়ালাম। সে আগুনের শিখার অগ্নিঝলক কেবল যে আমার গায়ে লাগল, তা না। যেন আমার প্রতি রোমকূপের ভিতর দিয়ে মিশিয়ে গেল রক্তে রক্তে। আমার সমস্ত অহুভূতির মধ্যে একটা দাবানলের গোপন উল্লাস। অথবা অস্ত্র কিছু, যেন অগ্নিস্থায় হাতাল হয়ে গেলাম। এমন করে আগুন জ্বালাল কে। শিখা বার ছড়িয়ে গিয়েছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে।

নিতুর স্বর আমার কানের কাছে বাজল, 'কুহুম গাছ।'

কুহুম গাছ! হয়তো তা-ই। জীবনে কখনো দেখা ছিল না। অনেক গাছের অনেক ফুলের, অনেক বলক দেখেছি, কিন্তু এমন আগুনের শিখার সমারোহ দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কি ফুল, না পাতা?'

নিচু বলল, 'সবই পাতা। নতুন পাতা।'

আহ, আমার কথা, তুমি বড় দরিদ্র। এই কুহুমের অগ্নিশিখার বর্ণনা দিই, তেমন কথা আমার ভাণ্ডারে নেই। দরিদ্রতম আমি, না হলে রঙ তুলি পট

নিয়ে বসে যেতাম, ধরে রাখতাম এই অগ্নিশিখাকে, এই মুহূর্তে কার যেন একটা ছবির কথা চোখের সামনে, অশ্রুভাষে ভেসে ভেসে উঠল। শস্তুর মাঠে, স্বর্ধালোকে, পাকা ফসলের অগ্নিশিখা।

নিতুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ও হেসে উঠল। বলল, 'একেবারে ভুলে গেলেন যে!'

বললাম, 'ভুলে যায়নি, ভুলিয়ে দিল।'

বলতে ইচ্ছা করল, 'কেপিয়ে দিল।' মনে মনে ভাবলাম, লাল রঙ দেখলে যে শিং বাগানো পশুটি মস্ত হয়ে তেড়ে আসে, সে পশু কুসুম গাছের সামনে এসে দাঁড়ালে কী করবে? আঘাতে আঘাতে ম্লস্ক উপড়ে ফেলবে নাকি? ভুল দেখিনি। এখনো পড়ন্ত বেলার রোদের ছটা আছে। কেবল আমার নিজের গায়ে না, নিতুর গায়ে, ওর করসা মুখেও কুসুমের রক্তিম ঝলক লেগেছে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রচ্ছটায়, কুসুমের ঝলকে করসা মুখের রূপ কেমন দেখাবে? লজ্জাকর? মনে হয়, লজ্জা ভুলে বাওয়া, আত্মহারা বাসনা আগুনে দীপ্ত।

নিতু বলে উঠল, 'তবে বেশি দিনের জন্তু না। ফাস্তন শেষ হতে না হতেই, সব পাতা সবুজ হয়ে যাবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি 'সবুজ?'

'পুরোপুরি, আর সব গাছের পাতার মতোই।'

নিতুর মুখের হাসিতে যেন একটা রহস্যমাখা। যেন ও আমাকে হতাশ করে দিতে চাইল। কিন্তু হতাশ হলাম না। সবুজকে ভালবাসি প্রাণদাতার মতোই। এই আগুন একদিন সবুজ হবে তখন তার অগ্র রূপ। এখন যে তার অগ্নিঝলকে আমাকে মাতাল করে দিচ্ছে, এ রূপকেও অস্বীকার করবে কে? রূপ থেকে রূপান্তর, নিরন্তরতার মধ্যে সত্য তো সেইখানে। নিরন্তরতা একমুখী না ভিন্ন ভিন্ন দিকে তার গতি।

কুসুম গাছটি একাকী নেই, আশেপাশে অজুন শাল, আরো সব নাম-না-জানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে, আরো কিছু কিছু আগুনের শিখা উকি মারছে। এসে পর্যন্ত এমন একটা ছবি চোখে পড়েনি তারপরে ডান দিকে তাকাতো, একটু দূরে চোখে পড়ল, ককিবাশের বেড়ার বেটনী। পরিষ্কার উঠোন। উঁচু মাটির দাওয়ার ওপরে কাঠের ফ্রেমে টিনের দেওয়াল, টিনের চালাবাড়ি। বাড়িটার পিছন দিকে একটা পাহাড়ী টিলা উঠেছে আকাশমুখী হয়ে। টিলার মাথার ওপরে কয়েকটা গাছ।

রেললাইন পেরিয়ে, কখন কতটা এসেছি খেয়াল করিনি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখছি দেখে, নিতু বলল, ‘তিপুদের বাড়ি।’

সেই বাড়ি। আরণ্যকের রচয়িতা যে বাড়িতে বেয়েছেন, দেয়েছেন, দাঁওয়ার বসে গল্প করেছেন। গান্ধীমশাইয়ের গৃহ। নিতু বলল, ‘কারোর লাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। চলুন একটু এগিয়ে-দেখি।’

বললাম, ‘ধাক না। চল আমরা কোয়েলের ধারে ঘুরে আসি। ওঁরা হয়তো ঘুমোচ্ছেন। রাত জাগা গেছে তো।’

নিতুর মুখে, কপট হলেও শঙ্কার ছায়া। বলল, ‘ওয়ে বাবা, তিপুকে না জানিয়ে, আপনাকে নিয়ে আমি কোয়েলের ধারে চলে গেলে রক্ষে থাকবে না। রাস্তাসী আমার চুল টেনে ছিঁড়ে দেবে।’

স্নেহ ক্রীতি কেমন স্নেহে বাজে, বচনেই বোকা যায়। তথাপি মনটা খুঁত-খুঁত করে। চূপচাপ বাড়ি। মনে হয় সবাই ঘুমোচ্ছেন। নিতু আগল তেলে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে ডাকল, ‘আস্থন।’

অগত্যা। পিছন পিছন উঠোনে পা দিলাম। তুলসীমঞ্চটা চোখে পড়ল, মাটির মঞ্চ। এমন সময়েই ঘর শোনা গেল, ‘নিতু না কিরে?’

ঘরের স্থান লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখে পড়ল, উঠোনের একপাশে আর একটি চালাঘর। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরের দরজা খোলা। নিতু আমার থেকে এগিয়ে রয়েছে। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ই্যা কাকীমা। শিবু ওরা সব ঘুমোচ্ছে নাকি?’

গান্ধীমশাই নিশ্চয়ই। আমাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমিও না। জবাব দিলেন, ‘ই্যা, এইবার সব উঠবে। সেই বুকেই আমি চায়ের জল বসিয়েছি। তোম কাকাবাবু উঠে পড়েছে।’

ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, ‘কে যে?’

গান্ধীমশাইয়ের গলা। নিতু বলল, ‘আমরা—আমি নিতু।’

নিতুর কথা শেষ হল না। দাঁওয়ার অস্থানিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিপু। ডান হাতে ওর চিকনি, বাঁ হাতের মুঠোয় চুলের প্রান্তের গোছা। মুখে ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক খুশির হাসি। চোখে ঝিলিক। দেখলেই বোকা যায়, ও সন্তুষ্ট ভেঙে উঠে আসেনি। আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘এসেছেন? আস্থন, ঘরে আস্থন।’

নিতু খানিকটা ধমকের স্নেহে, বিকৃত মুখে বাজল, ‘আজ্ঞে না, এখন আর ঘরে গিয়ে পসবার সময় নেই, আমরা এখন কোয়েলের ধারে যাচ্ছি।’

তিপুও পিছিয়ে যাবার পাজী না, চুলে চিকনি ঢালাতে ঢালাতেই ‘ওঁকে নিয়ে আমি যাব, তুমি না, সেইরকমই কথা আছে। দেখতে পাচ্ছ, তৈরি হচ্ছেলাম। আর একটু দেরি হলে, আমি নিজেই চলে যেতাম তোমাদের বাড়ি।

বলতে বলতে তিপুও সলজ্জ হাসির দৃষ্টি একবার আমার মুখের ওপর ছুঁয়ে গেল। নিতু বলল, ‘ওরে তিপু, তোর দশা দেখে যে ভয় লাগছে। দাদাকে আঁচলে বাধবি নাকি?’

তিপু অনায়াসে ঘাড় ছলিয়ে, জিভ ভেংচে দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল, ‘ওঁকে নিয়ে একটু বস নিতুদা, চা খেয়ে যাওয়া হবে।’

গাজুলিমশাই বেরিয়ে এলেন। দোণ্ডাজ ধুতি, কচ্ছবিহীন করে পরা। খালি গায়ের পৈপতা। মুখে একটি আধপোড়া বিড়ি ঠিক আছে। আমাকে বললেন, ‘আসেন।’

তিপু আবার ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, হাতে কাঠির মাহুর নিয়ে। সামনের দিকের দাওয়ায় সেটি বিছিয়ে দিয়ে আবার ভিতরে চলে গেল। কোনো আপত্তি যে টিকবে না, তা বোঝা-ই যাচ্ছে। অতএব দাওয়ায় উঠে, মাহুর গিয়ে বসতেই হল। গাজুলিমশাইও বসলেন। নিতু চলে গেল ঘরের ভিতরে। সামনের দিকে তাকিয়ে সেই কুহুমের অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে অস্ত্রান্ত গাছপালা। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল বিকৃতিবাবু কি দাওয়ায় এখানটিতে বসতেন? পারলাম না, ভেবে নিলাম, এই দাওয়ারই এখানে ওখানে বসতেন। তবে আমরা এখন যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পাহাড়ী টিলাটি দেখা যাচ্ছে না। সেটা বাড়ির পিছন দিকে।

গাজুলিমশাই বললেন, ‘এবার আর কিছু করা হয় নাই। তা না হলে লাউ-সীম প্রতিবছরই হয়। চালকুমড়োর মাচাও থাকে। এবার টাটায় বড়ছেলের কাছে অনেকদিন কাটিয়ে এলাম। ঘর-দোর এভাবে থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। একটা মূণ্ডা ছেলে ওর বোঁ নিয়ে থাকে বটে রান্নাঘরটা। কিন্তু ঘর দরজা তো বন্ধ থাকে। বাইরের উঠোন দাওয়া যা একটু কাঁটপাট লেপাওঁপোঁছা হয়।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার বড়ছেলে বুঝি টাটায় কাজ করে?’

‘কাজ না, ব্যবসা করে। একটা ছোটখাট দোকান আছে, মূদী দোকান, তার সঙ্গে জালানি কাঠ। শিবুটাকে কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। পড়াশোনা আর হবে না।’

বলতে বলতে দুটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলল, নিভল, বিড়ি ধরল না, তবে কোম্পানিকে ‘জুয়াচোর’ বললেন না, কারণ এখন গৃহস্থ তাঁর সংসারের ভাবনায়

আছেন। গাঙ্গুলি-গৃহিণী ঘোমটা মাথায়, মুখখানি প্রায় অর্ধেক ঢেকে, ভিশ ছাড়া, দু-কাপ ধূমায়িত চায়ের কাপ বসিয়ে দ্বিগুণে গেলেন আমাদের সামনে। ওদিকে ঘরে ভিপু নিতুর কথা হাসি ঝগড়া, একসঙ্গেই বাজছে।

গাঙ্গুলিমশাই অনেকটা নিজের মনেই বললেন, ‘মাথায় একসময়ে চেপেছিল, জঙ্গলের ইজারা নেব। নিয়েও ছিলাম। কিন্তু সব কাজ সবারে দিয়ে হয় না। একটা পয়সা কোনোদিন মুনাকা করতে পারলাম না, লোকসান দিয়ে মরেছি।’

সর্বাংশে এমন লোকসান কেন। বললাম, ‘তাই নাকি?’

গাঙ্গুলিমশাই শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ। চোর না হলে, এসব ইজারাদারি চলে না।’

ভিন অগতের ব্যাপার। আমার জ্ঞান-গম্বির বাইরে। তবু অবাক লাগে বৈকি। জিজ্ঞেস করি, ‘চোর?’

গাঙ্গুলিমশাই আরো ওপরে গেলেন, বললেন, ‘চোর না, ডাকাত না হলে হয় না। ডাকাতি করতে পারলে, ইজারাদারি চলে। কর্তাদের ঘুষ খাওয়ান, আর বেআইনি চুরি করে গাছ কাটেন। যায় যাবে, সরকারের যাবে, আপনি নিজের কোলটি ভরেন। সংপথে ইজারাদারি চলে না। লোকসান দিয়ে মরতে হবে।’

জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই, তিনি কেন সংপথে থাকলেন? কিন্তু এ কথা কি জিজ্ঞেস করা যায়? গাঙ্গুলিমশাইয়ের মূখটি এখন অস্বাভাবিক আর বিমর্ষ। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, ‘তবে অনেক বড় বড় ইজারাদারকেই তো আজ পর্যন্ত দেখলাম, শেষটা কারোই ভাল না। সেটা যে ঘুষ দিয়ে চুরির জগু, তা না।’

গাঙ্গুলিমশাই চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘মহাপাতকের কাজ তো। প্রাণীহত্যার দায় যাবে কোথায়? বনের ইজারাদারদের বংশ কখনো স্থায়ী হয় না।’

প্রাণীহত্যার দায়? জিজ্ঞাস্য অবাক চোখে গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে তাকলাম। গাঙ্গুলিমশাই তাঁর ঈষদারক্ত বড় বড় চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘গাছ তো প্রাণী। আপনি খাট আলমারি নিয়ে ভোগ করেন, সেটা আলাদা। কিন্তু যে তারে মেরে খায়, তার অভিশাপ লাগবেই। খুন হওয়ার কষ্ট সকলের সমান।’

মুহূর্তের মধ্যেই যেন সমস্ত বনভূমি আমার চোখে নতুন রূপে জেগে উঠল। গাছেরও প্রাণ আছে, এমন কথা জানা ছিল। কিন্তু সেই প্রাণের মর্ম জানা

ছিল না। সে যে নিহত হয়, কষ্ট পায়, অভিশাপ দেয়, এমন করে কথাটা কোনোদিন মনেও আসেনি। কিন্তু সত্যি কি গাছের অভিশাপ মাহুকের লাগে? এমন কথাও কোনোদিন শুনিনি। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এমন অভিশপ্ত মাহুকে আপনি সত্যি দেখেছেন?’

গাজুলিমশাই একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘দেখেছি বৈকি বাবা। এই এই জরায়িকেগাতেই দেখেছি, আপনাকে দেখাব। মনোহরপুরে দেখেছি। এখন আর তাদের কিছুই নেই। বংশগুলোই যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। কম করি আর বেশি করি, পাপ তো আমিও করেছি। তাই মনে হলেই মধুসূদনকে ডাকি, ত্রাণ করো হে, ত্রাণ করো।’

একটা বিস্ময় এবং কষ্টে, গাজুলিমশাইয়ের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। তাঁর অন্তরমনস্ক মুখ, চোখে আর্দ্র দৃষ্টি। কিছুক্ষণ কারোরই কোনো কথা নেই।

তারপরেই হঠাৎ নিতু হাসতে হাসতে দৌড়ে উঠানে ছুটে আসে। পিছনে পিছনে তাড়া করে এল তিপু। বেরিয়ে এল শিবুও। গাজুলিমশাই কন্ঠার দিকে তাকিয়ে, একটু বা রুটস্বরে বলেন, ‘আহ, কী করিস সব সময়ে!’

তিপু বলল, ‘দেখ না বাবা, নিতুদাটা খালি আমার পিছনে লাগে।’

গাজুলিমশাই বললেন, ‘লাগালাগি তো তাদের লেগেই আছে।’

দেখলাম তিপু বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। বিহুনি বাঁধা হয়ে গিয়েছে। আর কিছু ওর প্রসাধন নেই। আমার দিকে চেয়ে ডাকল, ‘চলুন বেরিয়ে পড়ি।’

গাজুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় যাস?’

‘নদীর ধারে।’

গাজুলিমশাই আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘তবে আর দেরি করবেন না, ঘুরে আসেন।’

নিতু আর শিবুই আগে আগে হাঁটা দেয়। তিপু আমার সঙ্গে সঙ্গে। আগল পেরোবার আগেই, গাজুলিমশাই আওয়াজ দেন, ‘অঙ্ককার হবার আগেই ফিরে আসিস।’

তিপু সে কথার কোনো জবাব দিল না। লাল মাটির পথ ধরে চলতে থাকে। বাঁ দিকে শালবন, তেমন বড় না, ঘনও না। মাঝে মাঝে ঝাড়ালো পলাশ। যে গাছ চিনতে পারি না, তিপুকে জিজ্ঞেস করি, ‘ওটা কী গাছ, তুমি কি চেনো?’

তিপু লক্ষ্য করে বলে, ‘এখানকার লোকেরা বলে পানজান।’

পানজান। আমার নিজেরও নতুন শোনা। আরো কয়েকটি গাছ দেখিয়ে তিপু আমাকে নাম বলল, ‘এটা হল ধ, এটা করম। আর এই যে, এটা নিশ্চয়ই আপনি চেনেন?’

গাছটা পথের ধারেই। তার ফুল না ফল ফুটেছে জানি না, সাধা রঙ। গন্ধে মাতোয়ারা এত তীব্র যেন নিশ্বাস আটকে যায়। তীব্র মদির ও মধুর। মৌমাছিতে হেঁকে ধরে আছে। চিনি চিনি মনে হল, কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি না। তিপু বলে উঠল, ‘মহয়া তো!’

মহয়া মহয়া! এমন নামটিও মনে পড়ে না, আরে ভোলা মন যে আমার। যেখানেই দেখে থাকি, এ যে মহয়া, তাতে কোনো সন্দ্বন্দ নেই। গাছের তলা বিছিয়ে ফল পড়ে আছে। তিপু ছুটে গিয়ে, ঘাসের ওপর থেকে কয়েকটি তুলে এনে দিল আমার হাতে। বলল, ‘খেয়ে দেখুন মিষ্টি লাগবে।’

নাম ঘর মহয়া, সে কখনও মিষ্টি না লেগে পারে। মুখে তুলে জিভ দিয়ে স্বাদ নিয়ে, দাঁতে কাটি। ঠিক মিষ্টি লাগল কি? না যেন। তার সঙ্গে কোথায় যেন কসুটে স্বাদের স্পর্শ আছে, ঘাকে বলা যায় একটু বা তিক্ত। মধুর স্বাদও একেবারে মিষ্টি? হু পা এগিয়েই দেখি, একটি গরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তার নাকের ফুটো দিয়ে রক্ত ঝরছে। ব্যাপার কী? তিপুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘গরুটাকে কি জোঁকে ধরেছে?’

‘জোঁক?’ তিপু অবাক হয়ে গরুটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘না, অনেক মহয়া খেয়ে মরেছে। এখন নড়তে-চড়তে পারছে না, চোখ দুটো কেমন টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। নেশা হয়ে গেছে, নাক দিয়ে তাই রক্ত পড়ছে।’

গরুর নেশা? তাও মহয়া খেয়ে! সবই নতুন, জীবনেও এমন দৃশ্য দেখা ছিল না। একটু শঙ্কিত হয়ে বললাম, ‘তা হলে আমরা তো খাওয়া উচিত না, স্বাতাল হয়ে যাব।’

তিপু খিলখিলিয়ে বাজল একেবারে কিশোরী শরীরের সর্বাক্ষে। বলল, ‘ধূ-র এই ক’টা ফুল খেলে আবার নেশা হয় নাকি? আর মানুষ বেশি খেতে পারে না। মহয়া চোলাই করে মদ হয়, এখানকার মেয়ে-পুরুষ সবাই খায়। ঘরেই বানায় তো।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ, ওরা বলে লড়গা। ওই ফল ওরা তুলিয়ে ঘরে তুলে রেখে দেয়। পরে তরকারি রেঁধে খায়। আবার গুঁড়ো করে ছাতুর মতন খায়।’

বাহু, তিপু অনেক খবর জানে। মজা দিয়ে মদ তৈরি হয়, এমন সংবাদ আমারও জানা ছিল, স্থানীয় বনবাসীরা তাকে সড়গা বলে, তা জানতাম না। আর খাণ্ড-ব্যঞ্জনের কথা তো মোটেই না। জিজ্ঞেস করি, 'তোমরা খাও না?'

তিপুর টুকটুকো চৌকির কোণে বাক, একটু যেন অভ্যস্তিত বলা, 'বাহু, ও আবার খাওয়া যায় নাকি!'

নিতু শিবু যে কোথায় চলে গিয়েছে দেখতেই পাই না। তারা বোধহয় এতক্ষণে কোয়েলের কূলে পৌঁছেছে। হঠাৎ জানদিকের ছোট পাহাড়ী টিলার দিকে চেয়ে দেখি, কয়েকটা পাথর যেন গাঁথে রাখা হয়েছে। চৌকো মতো লম্বা, দেখলেই বোঝা যায়, মাহুঘের নিজের হাতে কাটা, এবং গাঁথা। আশে-পাশে কয়েকটা গাছপালা, ঝিঁঝি ডাকা নিরুন্ম। তিপুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই পাথরগুলো কী?'

তিপু একবার তাকিয়েই, একেবারে আমার গায়ে লেপটে এল। চোখের দৃষ্টিতে ভয়, একটু যেন শিউরেই উঠল। ভয় পাওয়া স্বরেই বলল, 'ঠিক ওদিকেতেই আপনার চোখ গেল?'

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, ওখানে কী?'

তিপু আর সেদিকে ফিরেও তাকাল না। এক হাত দিয়ে ও তখন আমার জামার হাতা চেপেই ধরেছে। বলল, 'নিজেই তাকিয়ে দেখুন না।'

অবাক! দেখছি তো, কতগুলো লম্বা লম্বা, হাত দুয়েক চওড়া পাথর গাঁথে রেখেছে। দু-একটা একটু বা হেলে পড়েছে। একটু তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ-ই মনে হল, দাঁড়িয়ে থাকা পাথরগুলো, আর তাদের পড়ন্ত রোদের লম্বা ছায়ায়, কেমন যেন একটা অলৌকিক মাহাত্ম্য রয়েছে। ওখানকার বাতাসটাও যেন ঠিক আমাদের গায়ে লাগা বাতাসের মতো না। তিপু ভয় লাগা অভিব্যক্তিই যেন আমাকে আরো বিশেষ করে বলে দিল, ওই টিলার শূন্যতা কেবল শূন্যতাই না। চোখে দেখা যায় না অথচ আছে, এমন কিছু সেখানে বিরাজ করছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি শ্মশান?'

আমার জামার হাতা ধরা, তিপু মৃষ্টি আর একটু শক্ত হল। বলল, 'ওয়া পোড়ায় না, মাটিতে চাপা দিয়ে পাথর গাঁথে দেয়।'

আন্দাজটা একেবারে ভুল করিনি। সমাধিক্ষেত্র। কিন্তু যাদের সমাধিক্ষেত্র, তারা কি খুঁটান বা মুসলমান? তাদের সমাধির কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি খুঁটানদের গোরস্থান?'

তিপু বলল, ‘তা জানি না। ওরাওঁরা মারা গেলে, ওইভাবে রাখে। একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন না।’

তিপু আমাকে প্রায় টেনে নিয়েই চলেছে, পারলে ছুট দেয়। আমি পাল্লা দেবার চেষ্টা করে বলি, ‘তোমার বুঝি ওসব দেখলে খুব ভয় লাগে?’

তিপু বলল, ‘কার না লাগে? সকলেরই লাগে। আপনার লাগে না বুঝি? একলা থাকলে দেখতেন।’

তাও তো বটে। আমার সঙ্গে তিপু রয়েছে, আমার আবার ভয় কী। এমন সঙ্গিনী, বুকে যার হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আবার একটু বনের চেহারা বদলাচ্ছে। বড় বড় গাছের ছায়া আমাদের গ্রাস করছে, তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক একটা বড় বড় পাথরের চাঁই, অধিকাংশই কালো তাদের রঙ, কিছুতাকৃতি বিরাট বিরাট পত্তর মতো। বাদিকে তেমনি ছোট ছোট শাল এবং এবং ঝাড়ালো পলাশের বন। কিন্তু লাল কঁকরমাটির রাস্তাটা যেন ক্রমেই নিচের দিকে ঢালুতে নামছে। বললাম, ‘একলা ডাকলেও, আমার ভয় লাগত না, কারণ আমি তো কিছু জানি না, ও পাথরগুলো কিসের। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আর ভাবতাম। তা ছাড়া, আমার একটা অল্প বিশ্বাস আছে।’

তিপু তখন আমার জামার হাতা মুঠিমুক্ত করেছে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কী বিশ্বাস?’

আমি মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, ‘তুনেছি যাদের মন ভাল, মানে ভাল মানুষদের ওরা কোনো ক্ষতি করে না।’

তিপু আমার মুখ থেকে চোখ সরাল না কিন্তু হঠাৎ কিছু বলল না। আমি আবার বললাম, ‘ওরা মানে, তুমি যাদের কথা বলছ, আমি তাদের কথাই বলছি।’

তিপু জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু ভাল মানুষ মানে?’

আমি একটু বিব্রত হলেও তাড়াতাড়ি সে-ভাব সামলে নেবার চেষ্টা করে বললাম, ‘ভাল মানুষ—ভাল মানুষ মানে, যাদের মনে কোনো পাপ নেই।’

তিপু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চূপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, ‘এমন মানুষ বুঝি আছে, যাদের মনে পাপ নেই?’

কিশোরী তিপুর মুখের দিকে ঝটিতি ঘাড় কিরিয়ে তাকালাম। না, কোনো জটিলতা দেখতে পাই না। কিশোরীর সারল্য সেই মুখে। কিন্তু ওর কথা যেন বিশ্বের এক চির প্রশ্নের মতো বেজে উঠল, যা অনেকটা কশাঘাতের মতো। অথবা একটা গভীর বোধ থেকে জন্ম নেওয়া একটি কথা। কিন্তু তিপুর বরদী

একটি কিশোরী মেয়ে এমন কথা বলে কী করে ? আমি আমার মনের অবস্থা ওকে বুঝতে দিতে চাই না। জিজ্ঞেস করি, ‘সব মানুষের মনেই বুঝি পাপ আছে ?’

তিপু সহজভাবে বলল, ‘আছে।’

যেন ওর এ বিশ্বাস টলানো যায় না ! আমি আমার জিজ্ঞাসাটা বিদ্ধ করলাম ওর দিকেই, যদিও সেটা নিজের কাছেই কেমন যেন নিষ্ঠুর বোধ হচ্ছিল, ‘তোমার মনেও কি পাপ আছে ?’

তিপুর মুখ একটু গম্ভীর হল। ঘাড় কাত করে শুধু শব্দ করল, ‘হুঁ।’

তিপু, একটি চৌদ্ধ-পনেরো বছরের মেয়ে, সত্যি কি ওর মনে পাপবোধের অবকাশ আছে ? জানি না। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মনকেই বোধহয় আমি পুরোপুরি জানি না। তারপরেও আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত না। কিন্তু আমার তীব্র কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা দমন করতে পারলাম না, ‘কী পাপ বল তো ?’

তিপু মুখ নামিয়ে চলছিল। প্রশ্ন শুনে, আমার চোখের দিকে তাকাল : বলল, ‘তা জানি না।’

বললাম, ‘তার মানে নেই।’

তিপু জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘আছে।’

‘কী ?’

তিপু বলল, ‘হিংসে বুঝি পাপ না ?’

হিংসা পাপ, সব ক্ষেত্রে কী না জানি না। শিশু তার নবজাত ভাই বা বোনকে হিংসা করে। সে হিংসা পাপ না। কিন্তু এ সব কুট চিন্তায় না গিয়ে বলি, ‘যদি হয় ?’

তিপু বলল, ‘তা হলে তো আমার গাপ আছে। আমার মধ্যে হিংসে আছে।’

এটা একটা উদ্‌াহরণ মাত্র। তিপুর পাপবোধের মধ্যে কতগুলো বিশ্বাস আছে। ওর অভিজ্ঞতাও এই বলে, সব মানুষের মনেই পাপ আছে। বা ভেবেই হোক, যে চিন্তা থেকেই হোক, পৃথিবীর এত বড় সত্য কথাকে মেনে নেব না, এতখানি সাহস আমার নেই। বনের ডাকে ঘরছাড়া এক উল্লাসে ছুটে এসেছি, যদি বা সেখানে বিবাকী মনে আপনভোলা সুর বেজে থাকে, বনের ছায়ায় চলতে চলতে, নিজের মনে ডুব দিয়ে দেখি, তিপু ধর্মে বেজেছে। হয়তো না-জেনে। তিপু সত্যে বেজেছে। আমাকে তা-ই স্বীকার করতে হল, ‘ঠিক বলেছ। সকলের মধ্যেই পাপ আছে।’

তিপু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। বলল, ‘হঁ, আমাকে ঠাট্টা করছেন।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘কেন?’

তিপু বলল, ‘তা বলে আমি বলিনি, আপনার মধ্যেও পাপ আছে।’

তিপুই এ মনও স্পষ্ট। তাই না হেসে পারি না। সব মাস্তবের মধ্যেও আমাকে মিশিয়ে ফেলতে চায় না। সেটা যে সত্যি ভেবে আমাকে আলাদা করে রাখতে চায়, তা না। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়, পাছে হুখ পাই।

কিন্তু ওর এ কথাটার জবাব দেবার অবকাশ পেলাম না। ঢালু পথের বাঁক ফিরতেই, সোনালী চর আমার চোখের সামনে জেগে উঠল। চওড়া চরের অনেকখানি দূরে, সেই ইম্পাডনীর নদী। যত এগিয়ে যাই, ততই মনে হয়, এ নদী কলকলালে শ্রোতবিনী না, যাকে দেখলে একটি চঞ্চল কিশোরীর কথা মনে পড়ে যায়। নদীর ওপারে, ডান দিক ঘেঁষে উঁচু নীল পাহাড়ের মাথা জেগে উঠেছে। তার ছায়া পড়েছে কোয়েলের জলে। আরো দূরে, গভীর বন এবং পাহাড়, যার ভিতর থেকে কোয়েল নেমে আসছে, একটা বাঁকের মুখ থেকে। আকাশ এত বড়, উদার, সব মিলিয়ে, কেমন একটা গভীর গাভীর রয়েছে। যে গাভীরে ক্ষুধা নেই, ধ্যানের মহিমা বিরাজ করছে। চরের এখানে ওখানে, হঠাৎ কিছু বড় বড় পাথরের চাঁই জড়াজড়ি করে আছে আদিগন্ত সোনালী চরের মাঝখানে, এখন তাদের তেমন বিশাল মনে হচ্ছে না। যদিও তাদের অবয়ব হস্তীতুল্য।

গুধু চরে না, জলেও বড় বড় পাথরের চাঁড়া, পাহাড় থেকে ধসের সঙ্গে একদা নেমে এসে ঠেকে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে, হঠাৎ মনে হয়, হাতি বা মহিষেরা জলে গা ডুবিয়ে রয়েছে। জলের শ্রোত তাদের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে, কলকল রোলে বাজছে।

তিপু আর আমি জলের দিকে এগিয়ে চলেছি। নদীর ওপারে যাদের লম্বা লম্বা ঘাস বলে এক সময়ে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি স্পষ্টতই তা কাশের বন। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞেস করি, ‘ওপারে ওগুলো কি কাশবন?’

তিপু বলল, ‘হ্যাঁ।’

অবাক লাগে। আমি বাঙালী, আমি জানি, শরৎকালে কাশবনে ফুল হয়। এই বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তে, কোয়েলের তীরে দেখছি, ফাস্তনে কাশের বনে ফুল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘হেঁটে পার হওয়া যায়?’

তিপু ঘাড় নেড়ে বলল, 'না। মাঝামাঝি পর্বত বাওয়া যায়। তারপরে জল বেশি। সেই জায়গাটা পার হতে পারলে, আবার হাঁটু-জল।'

'পার হয়েছ কোনো দিন?'

'অনেকবার। আপনি যেদিন চান করতে আসবেন, সেদিন আপনাকে নিয়ে ওপারে যাব।'

তিপু ধরেই নিয়েছে, কোয়েলে আমি চান করব। তিপু আবার জিজ্ঞেস করল, 'সাঁতার জানেন তো?'

ওকে বলতে পারি না, জলের পোকা ছিলাম, হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাঁতার শেখা হয়েছিল। বললাম, 'জানি।'

তিপু কোয়েলের জলের মতোই কলকলিয়ে উঠল, 'আহ, খুব ভাল হবে। মাঝখানে ওই পাথরগুলোর ওপর বসে থাকতে খুব মজা লাগে।'

বলে ও নদীর দূর বুকে আঙুল তুলে দেখাল। কোয়েলের রূপে এত মৃদু ছিলাম, লক্ষ্য করিনি, প্রায় একটা উল্লস আধ-বুড়া আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অকারণেই তার মুখে একটা অনির্বচনীয় হাসি। হাতে তার ময়লা ত্রাকড়ার একটা পুঁটলি। ওবেলার মাতাল মংলার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এ লোকটি মাতাল না। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, সে কপালে একটা হাত ঠেকাল, একটু বা মাথাও নোয়াল। আমিও কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দিয়ে, তিপু দিকে জিজ্ঞাসা চোখে তাকালাম। তিপু বলল, 'সোনাখোঁচা।'

এই সেই সোনাখোঁচা আজ সকালেই গাঙ্গুলিমশাই যাদের কথা বলছিলেন। তিপু আবার বলল, 'ওর হাতের পুঁটলিতে বালি আছে, সেই বালিতে সোনা আছে। ওরা জানে, নদীর জলের ধারে ধারে কোথায় বালিতে সোনা আছে। সেখানে ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বালি তোলে।'

সত্যি, আমি আমার এমন দেশটির তুলনা খুঁজে পাই না। প্রকৃতির জলের ধারায় মাহুঘ সোনা খুঁচিয়ে বেড়ায়, যে সোনা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে দাপাদাপি, মারামারি, কাড়াকাড়ি। তবু কেমন যেন সন্দেহ লাগে, এতবড় বালির পুঁটলিটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কত সোনা এতে আছে?'

তিপু বলল, 'কত আর, দু পাই তিন পাই হতে পারে। বড়জোর এক আনা।'

মাজ। অথচ দেখে মনে হচ্ছে, নিধেন দু'সের আড়াই সের বালি আছে। তিপু নিজেই আবার বলল, 'ও তো সেই সকাল থেকে খোঁচাচ্ছে, এখন কিরছে। শব্দ গিয়ে বিক্রি করবে।'

অবাক হয়ে বলি, ‘বল কী, সেই সকাল থেকে ? আর এতটা বালিতে, আমি তো ভেবেছিলাম, অনেকখানি সোনা আছে।’

তিপু বলল, ‘তা হলে তো এ বুড়ো বড়লোক হয়ে যেত।’

তিপু ষা-ই বলছিল, লোকটা ওর কথার সঙ্গে ঘাড় দোলাচ্ছিল, আর আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। বুড়োর সব দাঁত নেই। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোথায় বিক্রি করবে ?’

তিপু বলল, ‘এখানে হু’জন মাড়োয়ারী আছে যারা এই বালি কেনে। তাদের লোক আছে, যারা এই বালি ঝেড়ে সোনা বের করে নেবে। কিন্তু এ বুড়ো কত পাবে বলুন তো ?’

‘সোনার দামটুকু পাবে।’

তিপু স্পষ্ট ওর বুদ্ধাজুঁঠ তুলে দেখিয়ে বলল, ‘কাঁচকলা। আট আনা কি এক টাকা।’

বুড়ো ঘাড় হুলিয়ে, সায় দিয়ে বলল, ‘ইয় ইয়, আঠানা এক টাকা।’

সকাল থেকে এই শেষবেলা পর্যন্ত, সারা দিনের আয়। বঞ্চনা আর কাকে বলে। স্বভাবতঃই মনে প্রসন্ন জাগে, ‘বুড়ো হুপুরে খেল কী ?’

তিপু বলল, ‘কিছুই না। এখন পয়সা পাবে, তারপরে যা হয় থাকবে।’

বলে, তিপু বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, ‘মাণ্ডি খাবি, না ডিয়েং খাবি ?’

বুড়ো গলগল করে হেসে বলল, ‘মাণ্ডি মাণ্ডি।’

তিপু ঠোট উলটে, চোখ পাকিয়ে বলল, ‘মিথুক। তোদের চিনি না ? যা পাবি, তাই দিয়ে হাঁড়িয়া গিলে মরবি।’

তিপু এতও জানে ! বুড়ো তবু বায়ে বায়ে বলতে লাগল, ‘না না মাণ্ডি মাণ্ডি।’

বলে আর আমার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকায়। তারপরে স্পষ্টতঃই হাত পাতে। এতক্ষণে বোঝা গেল, সোনামাখোঁচা আমার কাছে কিছু প্রার্থী। তিপু ধমক দিয়ে বলল, ‘না, এক পয়সাও পাবি না।’

ধমক খেয়ে বুড়ো আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। হাসিটা কিন্তু ফোগলা মুখে আছে। আমি পকেট থেকে কয়েকটি খুচরা পয়সা তুলে দিলাম। সোনামাখোঁচা বায়ে বায়ে ঝুঁকে কপালে হাত, ঠেকালো। তারপরে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করল। কোথা থেকে দেখি, একটা কুকুর ছুটে দৌড়তে দৌড়তে এল, বুড়োর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আর বুড়ো তার সঙ্গে কী সব কথা বলতে বলতে চলল।

তিপুও দেখছিল, ওর মুখে একটু অনমনস্কতার ছাপ। তারপরে বলল, ‘এ সোনাতোটা বুড়োটার কেউ নেই, ওই কুকুরটা ছাড়া।’

জিজ্ঞেস করি, ‘তুমি চোনো বুঝি?’

তিপু বলল, ‘নাম জানি না, চিনি। ও রোজ সোনা খোঁচাতে আসে। থাকে উইলিয়াম সাহেবের করাড-কারখানার পাশে একটা ভাঙা ঘরে।’

তিপু সব জানে। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, ‘মাণ্ডি মানে ভাত, ডিয়েং মানে কী?’

‘হাড়িয়া।’

দেখছি, একা তিপুই আমাকে বনের সব কিছু চিনিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে। হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, নিতু আর তোমার দাদা কোথায় গেল বল তো।’

তিপু অনায়াসে বলল, ‘কোথাও বসে বিড়ি খাচ্ছে বোধহয়।’

তিপু তাও জানে। আবার বলল, ‘চলুন, স্নাঙেল খুলে রেখে একটু হেঁটে আসি।’

উত্তম প্রস্তাব। বললাম, ‘চল।’

পায়ের স্নাঙেল খুলে রেখে ছুঁজনেই জলে নেমে গেলাম। অচ্ছ জল, নিচের কাকর বালি সবই দেখা যায়, কিন্তু শ্রোত বেশ প্রবল। প্রথমে পায়ের পাতা ডুবল, তারপরে আরো খানিকটা। ডুবতে ডুবতে আমার যখন হাঁটু, তিপু তখন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বলল, ‘আমি আর যেতে পারব না।’

দেখলাম ওর মুখে হতাশা আর লজ্জার হাসি। ইতিমধ্যেই প্রায় ওর হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠেছে। আমি ওর কাছে পিছিয়ে গেলাম। তিপু বলল, ‘আহ, কী ভালো হত যদি এখন চান করতে পারতাম!’

বললাম, ‘অসুবিধে কী?’

তিপু ভুরু কুঁচকে বলল, ‘বা রে, এ সময়ে চুল ভেজাবো? মা বকবে।’

তাও তো বটে। কিন্তু শ্রোতের ধাক্কা, কেবল যে আমিই টলমল, তা না।

তিপুও। জিজ্ঞেস করলাম, ‘পড়ে যাবে না তো?’

তিপু জবাব দেবার থেকে, আমার ডানা আঁকড়ে ধরাটাই সহজ মনে করল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি বুঝি ফিরে গিয়ে, এসব লিখবেন?’

অবাক হয়ে বললাম, ‘কেন বল তো?’

তিপু বলল, ‘আপনি তো লেখক।’

সত্যিই তো। এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। বললাম, ‘লিখতেও পারি।’

তিপু ঠোট নাড়লো, কিন্তু কিছু বলল না। ঠোট টিপে হাসল। লজ্জার ছটা ওর মুখে। মাথার ওপরে উদার নীল আকাশ, একটু বা রক্তের ছোয়া লেগে গিয়েছে। নীল পাহাড়, বর্ণাঢ্য বন, কোয়েলের শ্রোত বহে যায়। জলে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী লজ্জারূপ মুখে হাসছে। তারপরে জিজ্ঞেস করল, ‘আমার—আমাদের কথাও লিখবেন?’

বললাম, ‘নিশ্চয়ই।’

‘কী লিখবেন?’

আমি একটু ভাবলাম। তারপরে বললাম, ‘লিখব, তিপু না থাকলে আমার বন দেখাটা সার্থক হত না।’

‘ইস্।’ বলেই তিপু অনায়াসে আমার ডানাতেই ওর মুখটা চেপে ধরল। ওর মাথা থেকে নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছি। পুষ্ট আর দীর্ঘ বিহুনিটি পিঠের ওপর এলানো। কিশোরীমূলভ লজ্জা আছে। যুবতীমূলভ নিষিদ্ধবোধ এখনো জাগেনি। সে জন্তেই এমন সহজ আর অনায়াস। তার সঙ্গে আছে বোধহয়, এই প্রকৃতির ছোয়া। বললাম, ‘আমি কিন্তু এসব নিয়ে, মোটেই মিথ্যা বলি না।’

তিপু মুখ চেপে রেখেই বলল, ‘তা বলে, ও কথা লিখবেন কেন? আমি আবার কী করলাম?’

‘তুমি আমাকে কত গাছ চিনিয়ে দিলে, কত কী বুঝিয়ে দিলে, কোয়েলের ধারে বেড়াতে নিয়ে এলে।’

তিপু এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখে-মুখে লজ্জার ছটা গাঢ়তর। তবু চোখের দৃষ্টি যেন একটু সন্দ্বিগ্ন, আমার কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে চাইছে। তারপরে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ও তো সবাই পারে।’

বললাম, ‘তবু সবাই তো আমার কাছে আসেনি।’

তিপু আবার আমার দিকে দেখল। তারপরে বলল, ‘আমার খুব ভাল লেগেছে।’

বলে, চোখ নামিয়ে নিল। ঠোটের লজ্জিত হাসিটি উজ্জ্বল। কোয়েলের জল বহে যায় কলকল করে। আমি ওকে কোন প্রশ্ন করি না, বলি, ‘আমারো।’

তিপু চোখ চিকচিক করে উঠল। তারপরেই ঠোট উল্টে দিল, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। আমার ডানা ধরে টেনে বলল, ‘চলুন পাড়ে উঠি।’

হু'জনেই, কাপড় বাঁচিয়ে সন্তর্পণে চরে উঠে আসি। যোধ আর নেই। চরে ছায়া বনিয়ে এসেছে। বন একটু বেশি নিবিড় হয়েছে। চরে এসে তিপু আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'চলুন, ওই দিকে যাই। ওদিক দিগ্বে একটা রাস্তা আছে, জয়াইকেলার দোকানপাটের সামনে গিয়ে উঠেছে।'

'চল।'

আমাদের কাছাকাছিই ছিল, বিশাল উঁচু পাথরের চাংড়া। যেন তুঁড় গুটিয়ে একাধিক হাতি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনা-সামনি হতেই প্রচণ্ড এক হাঁক। ঝপ করে যেন কেউ লাফিয়ে পড়ল তিপু একেবারে বাড়ির কাছে। তিপুও সঙ্গে সঙ্গে আতর্জন করে, হু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। নিতুর অট্টহাসি তখন কোয়েলের ছায়াঘন আকাশ কাঁপিয়ে বাজছে। শিবু পাথরের ধারে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছে।

আমার শরীর থেকে, তিপু ছিটকে লাফিয়ে পড়ল নিতুর দিকে, টেঁচিয়ে বলল, 'গুণ্ডা দস্তি, দেখাচ্ছি আজ তোমাকে।'

নিতু দিল দৌড়। তিপু করল ভাড়া। কে যে কম, তা বুঝতে পারছি না। তবে নিতু যে চালাক তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ও যখন বুঝতে পারল, সোজাঝুজি দৌড়লে, তিপু ওকে ধরে কেলতে পারে, তখন গতি করল সর্পিল। ছুটল সাপের মতো এঁকে-বঁেকে। তিপুও ছাড়বার পাত্রী না। কিন্তু অবাক লাগে, ওর ছোটবার দ্রুতগতি দেখে। দমও কম নেই। শিবু বলল, 'ছুটোই সমান। বললাম নিতুকে, ওরকম করিস না। কথা শুনল না। আজ ওর পিঠে কয়েক ঘা পড়বেই।'

আমাবো তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমেই তিপু আর নিতু আমাদের চোখের সামনে থেকে এত দূরে চলে যাচ্ছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকটা বোধহয় সমীচীন না। বললাম, 'আমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব?'

শিবু বলল, 'না, চলুন আমরা ওদের পিছু যাই। এক জায়গায় ওরা থামবেই।'

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যাহূব একদিকে যেমন নিরন্তর ও অমর, আবার অন্যদিকে সে মরণশীল এবং স্তব্ধ। এমনি করে না বলে, বরং বলা ভাল, যে-কোনো ঘটনারই ইতি আছে। আপাতত, এখন পর্যন্ত নিতু তিপুর পালানো এবং তাড়া দেওয়া দেখে মনে হচ্ছে ওরা বুঝি আর থামবেই না। এক সময়ে ওরা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। যে-পথ দিগ্বে কোয়েলের ধারে এসেছিলাম, সে পথ ফেলে এসেছি পিছনে। এখন অন্য দিকে

চলেছি। বালুচরের ধারে ধারে বন তেমন নিবিড় না। দিকের ক্ষেত্রে, অসুমান করতে পারি, ডান দিক ঢুকলেই, জমাইকেলার জনবসতি পেয়ে যাব।

কথাটা মনে এল এই কারণে, কোয়েলের তীরে একটু একলা থাকতে ইচ্ছে করছে, চরের বুকে একটা পাথরের ওপরে। ধ্যান করব না, সে মন পেয়েছি আর কবে। তবু, এই যে ছায়া ঘনিয়ে আসা চর, ওপারের পাহাড়ের মাথায় আকাশে লেগেছে রক্তাভা, এবং ক্রমে বন নিবিড়তর। কোয়েলের কলকল ধ্বনি, দূরে গাছে পাখিদের কলরব, আর একেবারে নির্জন বালুবেলা। এখানে চুপ করে একটু বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। ধ্যান না, জপ না, যে কথাটা হতে চায় না নানা কাজের মধ্যে, সেই কথাটা সেরে নিতাম। নিজের সঙ্গে দু-কথা। কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে যে মূনি-ঋষিদের কথা, যারা তপস্তা করেছেন এমনি নিবিড় বনের ছায়ায়, সে-রকম তপস্তা আমার কিছু নেই। যে-জীবনটা কাটাই, বারো মাস যা নিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সে-ই সব সত্য না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে, এই বনের হাতায়, অসীম আকাশের তলায়, একবার নিজেকেই দেখতে ইচ্ছা করে। যে-আমি আমাকে ছেড়ে উদাস হয়ে বেড়ায়।

শিবুকে বললাম, ‘আমি না হয় একটু পরে যাব। তুমি চলে যাও।’

শিবু অবাক হয়ে বলল, ‘এখানে? একলা? না না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখানে এখন একলা থাকা উচিত না। তাছাড়া আপনি নতুন মানুষ। আমরাই কখনো থাকি না।’

শিবুর আপত্তি বেশ দৃঢ়। সংশয় আমার মনেও আছে। ওর পাশে পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি, ‘ভয়ের কিছু আছে নাকি?’

শিবু বলল, ‘অনেক কিছুই থাকতে পারে। ধরুন অন্ধকার হয়ে গেলে, হয়তো একপাল হাতি এসে হাজির হল।’

‘হয় নাকি?’

‘দেখিনি, শুনি মাঝে মাঝে। লোকজনের সামনে অবিষ্টি হাতিরা বিশেষ আসতে চায় না। ওপারের বন থেকে হাতিরা মাঝে-মধ্যে কোয়েলের জলে আসে। তা ছাড়া সাপ-খোপ, কত কী থাকতে পারে। সব থেকে ভাল ভোরবেলা।’

সাপ-খোপ শুনলেই, শিরদাঁড়ার কাছে কেমন যেন একটু নাড়া খেয়ে যায়। শিবুর সঙ্গে বেশ থানিকটা হেঁটে এসে, কতগুলো বস্ত্র ঝোপঝাড়ের দিকে, ডান দিকে মোড় নিতেই, দৃষ্ট অপরূপ। নিতু হু হাত-পা ছড়িয়ে, বালির ওপরে

চিত হয়ে পড়ে আছে। গর চোখ বোজা। আর একটু দূরেই, তিপু, বালির ওপরে বসে হাঁপাচ্ছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু মুখে হাসি। আমাদের দেখে, পড়ে থাকা আঁচলটা তুলে নিল বৃকে। দ্রুত নিশ্বাসে সর্বাঙ্গ ফুলছে। নিতুর অবস্থাও তা-ই। যদিও সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। চুল এলেমেলো। ঠোঁটের কোণে হাসিটি ঠিক আছে।

আমি তিপুকে বললাম, ‘একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছ ?’

তিপু বলল, ‘আচ্ছা করে চুল টেনে দিয়েছি।’

বেচারী নিতু। বললাম, ‘গুণ্ডাটাকে তা হলে হারিয়ে দিলে ?’

তিপু বলল, ‘যাবে কোথায় ?’

নিতু অমনি উঠে বসল, তিপুর দিকে ক্রিয়ে বলল, ‘এই ঝাংখ, মিথো কথা বলবি না। তুই আমাকে ধরতে পারিসনি, আমি নিজের থেকেই গুয়ে পড়েছিলাম। তারপরে তুই এসে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলি।’

তিপু ঠোঁট ঝাঁকিয়ে বলল, ‘গুয়ে পড়েছিলে কেন মশাই ? যখন দেখলে তিপু কিছুতেই দমছে না, নিজেরো দম ফুরিয়ে গেছে, তখনই গুয়ে পড়েছিলে।’

নিতু এবার অবাক হয়ে বলল, ‘সত্যি, তোর বৃকের খাঁচায় কত দম ধরে রে রাব্বুসী !’

আমি হাসি দমন করতে পারলাম না। তিপু বলল, ‘তবেই বৃকে দেখ।’

সত্যি, তিপুর কিশোরী টলটলে শরীরে এত শক্তি আসে কোথা থেকে। দেখলে তো মনে হয়, কোমল একহারা উজ্জল শ্রামলী একটি মেয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, এবার যেন তিপুর একটু লজ্জার অবকাশ হল। হেসে চোখ নামাল, এবং গর বৃকের আঁচলটিকে আর একটু সহবত করতে চাইল।

নিতু উঠে দাঁড়াল, গায়ের বালি ঝাড়ল, বলল, ‘চলুন যাই।’

আমরা অনিবিড় গাছপালা, ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থর মাটির ঘরের পাশ দিয়ে, রেললাইনের ধারে চলে এলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার প্রায় নেমেছে। লন্ড হারিকেন তো জ্বলছেই, কয়েকটি দোকানে হাজারের আলোও জ্বলছে। পুরোপুরি একটি বাজার বলা যাবে না, তবে নানা দোকানপাটে, এ জায়গাটা বেশ জমজমাট। মুদ্রাদোকান, সজী আর চায়ের দোকান। মিষ্টির দোকানে লাড্ডু আর জিলিপি, নিমকি আর সিঙাড়া রয়েছে। পান-বিড়ির দোকান তো আছেই। আর জটলা আছে প্রায় সব দোকানেই। রাস্তার ধারে চটের ওপরে বিছিয়ে বসেছে তামাক-তামাকপাতাওয়ালা। কাপড়ের দোকানও আছে দুটি। একটি একটু বড়, আর একটি ছোটখাটো। বনবাসী ছাড়াও আছে নানা

রকমের লোক। থাকাই স্বাভাবিক। এখানে বনবিভাগের সামটা ব্রেকের একটা অফিস আছে। একটা চেক-গেট আছে, যেখান দিয়ে এসে ঢোকে নানা প্রান্তের গাড়ি, চলে যায় প্রধানত উড়িয়ার দিকে দিকে অভ্যন্তরে। করাতকলও কয়েকটি আছে। ঠিকানার ইজারাদার আছে অনেক। বনজ সম্পদই প্রধানত সবকিছুর মূল এখানে। বনকে ঘিরেই এখানে সব মাহুঘের যা কিছু লেনা-দেনা।

এমন একটি ছোটখাটো দোকানপাটওয়ালা জায়গায় দাঁড়িয়েও, বেশ বুঝতে পারি, বনের মধ্যেই কোথাও রয়েছে। হাজারকো হারিকেন লক্ষ, কেনা-বেচা, কোনো কিছুই বনকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। নিতু জিজ্ঞেস করল, ‘তিপু জিলিপি খাবি নাকি?’

‘তুমি খাও।’

তিপুর হুঁসে ওঠা জবাব। নিতুর হাসি। যারা নিতাস্তাই বনবাসী, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বোধহয় সারল্যের মধ্যে একটি নিরন্তর বিশ্ব আর জিজ্ঞাসা থাকে। তা না হলে, ওদের মেয়ে-পুরুষ সকলের দৃষ্টির অভিব্যক্তিটা কী। অথবা নিতাস্তই অপরিচয়ের কোঁতুল, আর সেটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ বোল-সতেরো বছরের একটি বনবাসিনী মেয়ের আঁচল ধরে টেনে দিল তিপু। বলে উঠল, ‘এই বিশো, কোথায় যাচ্ছিল রে?’

বিশো নামে বনবালা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর তিপুর দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় হাসল। তারপর আমাদের দিকে দেখল। নিতু বলল, ‘বিশো যে খুব সেক্ষেত্রে? তোর বিয়ে হয়েছে নাকি?’

বিশো এবার খিলখিল করে হাসল, বলল, ‘ভাগ।’

বিশোর গায়ে কোনো জামা নেই। রংটি কিন্তু নিকষ কালো বলা যাবে না। অটুটগঠন শরীরখানিকে বেড়ে দিয়ে আছে মোটা হাতে-বোনা ছোট একটি শাড়ি। এমন শাড়ি কোথায় তৈরি হয়, আমি জানি না। হাতে দুটো কাঠের বাল। মাথায় থোপা, কিন্তু বাংলা থোপা বলা যায় না, বেন চুলের গোছা শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধা। তাতে কতগুলো লাল ফুল গোঁজা। তিপু আবার ওর ফুলে হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘মধুফুল, না রে?’

বিশো হেসে বলল, ‘হঁ ইচা ফুল। লিবি?’

তিপু বলল, ‘না, থোপা থেকে নেব না।’

ইচা ফুল! এমন নাম কখনো শোনা ছিল না। বিশো এবার ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইচা ফুলটা কী?’

তিপু বলল, ‘ওরা ওই ফুলকে ইচা বলে।’

আর আমি বাঙাল, আমার মনে পড়ে গেল চিংড়িমাছের কথা। চিংড়িকে পূর্ববঙ্গে ইঁচা মাছ বলে।

এমন আর তুকাং কী। মালুঘের কাছে দুটো বস্তাই প্রায় সমান আদরগীয়া। ফুল আর মংশ। অবিজ্ঞি আমার কোনো পশ্চিমবঙ্গীয় বন্ধু শুনলে বলত, ‘বাঙাল কি আর গাছে ফলে।’ আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘মেয়েটি যে শাড়ি পরেছিল ওগুলো কিসের কাপড়?’

তিপুই জবাব দিল, ‘ওগুলোকে বলে কিচ্চি। ওদের তাঁতীরা নিজেরা বোনে, ওরাই শুধু পরে।’

এমন সময় মেয়েলী সফ গলায়, দুর্বোধ্য ভাষায় সমবেত গান শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, জনা চারেক বনবাসিনী যুবতী, হাত দিয়ে পরস্পরের কোমর জড়াজড়ি করে, গান গাইতে গাইতে চলেছে। হাসছে, গান গাইছে, আর বেশ দ্রুত গতিতে, খানিকটা তালে তালে চলেছে। কিছুটা বা হেলে হলে, টলে টলে। কোনো দিকে তাদের জ্রক্ষেপ নেই। এমন কি স্থতনী বনবাসিনীর আঁচল-খসা উদাস বক্ষ নিয়েও কোনো চিন্তা নেই।

তারা চলে যাবার পরে, আমার দৃষ্টি-বিনিময় হল নিতুর সঙ্গে। তারপরে তিপু। তিপু বলল, ‘সব কটা হাঁড়িয়া গিলে মরেছে।’

জিজ্ঞেস করি, ‘কী করে কুঝলে?’

‘দেখলেই বুঝতে পারি, গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। সারাদিন কাজের পর, এখন নেশা করে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে।’

তিপু সব জানে। নিতু বলল, ‘এখন কোথায়?’

জিজ্ঞেস করি, ‘এখানে কোথায় যাবার আছে?’

নিতু হাসল, বলল, ‘তা বলতে গেলে, কোথাও না। রাত্রে কোথাও যাবার জায়গা নেই। যতক্ষণ কেনা-বেচা, ততক্ষণ এখানে একটু লোকজন থাকে। আর একটু বাদেই সব নিঃশব্দ হয়ে যাবে।’

এই কথার মাঝখানেই সুরীন এসে পড়ল। তার মুখ থেকেই জানা গেল, মোহনবাবু আর গোপাল জঙ্গল থেকে ফিরে এসেছে। সোলেমান ছাগল কাটেনি। দুটো বনমোরগ পাওয়া গিয়েছে। সে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

নিতু জিজ্ঞেস করল, ‘তা হলে কি এখন বাড়ি যাবেন?’

সুরীন বলে উঠল, ‘এখন বাড়ি যাবি কেন? গোপাল সারা দিন পরে এখন চান-টান করবে। একবার বোধহয় সিংজীর বাড়িতেও যাবে। ওঁকে নিয়ে উইলাম লাহেবের বাড়ি যা না।’

নিতু বলে উঠল, ‘ঠিক বলেছ স্বরীনদা। তুমি না হলে এসব কারোর মাথায় আসে? তুমিও যাবে?’

স্বরীন বলল, ‘না, আমাকে একবার বাড়ির দিকে যেতে হবে।’

শিবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘তা হলে তুমি তিপুকে নিয়ে যাও, ওকে বাড়িতে ছেড়ে দিও।’

তিপুও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে ঝটকা দিল। বলল, ‘না, আমি এখন বাড়ি যাব না। আমিও সাহেবের বাড়ি যাব।’

শিবু এক কথাতেই চূপ। নিতু গম্ভীরভাবে বলল, ‘বড় অবাধ্য হয়েছিল খুকি। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।’

বলেই তিপুর হাতের সীমার বাইরে সরে গিয়ে, আমাকে ডাকল, ‘আসুন।’

শিবু বলল, ‘নিতু, তোরা যা, আমি পরে আসব।’

নিতু বলল, ‘ঠিক আছে।’

রেললাইন পেরিয়ে অগা পারে যেতেই, ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। পা বাডাতে সাহস পাচ্ছি না। কেবল মনে হচ্ছে, আশেপাশে, কী ঘেন কুপীকৃত হয়ে আছে। মনে হয়, বড় বড় গাছের গুঁড়ি। গন্ধতেও তাই মালুম দেয়। নিতু বলল, ‘একটা ভুল হয়েছে। টর্চলাইটটা নিয়ে বেরনো উচিত ছিল।’

তিপু দিল খোঁচা, ‘ওসব কাজের কথা মনে থাকবে কেন? তিপুর পিছনে খুব লাগতে পারো।’

বলেই, হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, ‘আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন, কিছু হবে না।’

নিতু বলল, ‘হ্যাঁ, তোর তো আবার অন্ধকারে চোখ জ্বলে।’

তিপু বলল, ‘জ্বলেই তো। দেখ না, কী রকম নিয়ে যাচ্ছি।’

মনে মনে হাসি। ওরা দুটিতে কাছাকাছি থাকলে পরস্পরের সঙ্গে, না লেগে পারে না দেখছি। এক কেউ-ই কম যায় না। তবে স্বীকার করতেই হবে, তিপু আমার হাত ধরে, আমার শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ধীরে ধীরে সযত্নে নিয়ে চলেছে। ও এতই অনায়াস, আমার কোনো সংকোচের অবকাশ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘নিতু, এই উইলিয়ম সাহেবটি কে? তার কাছে নিয়ে যাচ্ছ কেন?’

আমি নিতুকে প্রায় দেখতে না পেলেও অন্ধকারে ওর গলার স্বর শোনা

গেল, 'এই সাহেবের জীবনটা খুব অদ্ভুত। খাস বিলেতি সাহেব, এক সময়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিরাট অফিসার ছিলেন। প্রিফেক্ট না কী বলে, আমি ঠিক জানি না, উনি তাই ছিলেন। ঠর মেমসাহেব অ'বিস্তি বাবোমাসই জামসেদপুরে থাকতেন, ফরেস্ট বাংলাতে কখনো থাকতেন না। তিনিও খাস মেমসাহেব। কিন্তু সাহেব যেন কেমন করে মুণ্ডা হয়ে গেল।'।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুণ্ডা হয়ে গেল?'

তিতু বলল, 'হ্যাঁ। অদ্ভুত সাহেব, মুণ্ডাদের সঙ্গে খুব মিশত, তাদের ভাষা শিখেছিল, ডাদের সঙ্গে বসে বসে মদ খেত, নাচত, গান করত। মুণ্ডা মেয়েদের সঙ্গে প্রেমও করত। এখন তো অ'বিস্তি ওর মুণ্ডা বোঁ-ই আছে, ডাকে নিয়েই সংসার করে।

আমি আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর মেমসাহেব?'

'মেমসাহেব কবে বিলেত চলে গেছে। শুনেছি, মেমসাহেবের সঙ্গে খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়। মেমসাহেব নাকি গভর্নমেন্টের কাছে উইলিয়মের নামে অনেক কিছু নালিশ করে, ফলে সাহেবের চাকরি চলে যায়। সাহেব নাকি তার জন্ত কিছুই বলেনি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে জরাইকেলায় একটা করাতকল নিয়ে বসেছে। প্রথম মুণ্ডা-বোঁ মরে গেছে, তার কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে। আবার একটা বিয়ে করেছে। তবে সাহেব এখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে।'।

শুনে একটু কৌতূহল হল। খাস বিলিতি সাহেব, কিন্তু বনবাসী হয়ে গেল, মুণ্ডানী নিয়ে সংসার জীবন যাপন করেছে। অবাক হবার মতো ঘটনা। তিপু বলল, 'এখনকার বোয়ের নাম হুনি।'।

তিপু সেটাও জানে। আবার বলল, 'সাহেবের থেকে অনেক ছোট।'।

তিপুর এটা অভিযোগ কী না, বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সাহেব একটা বুড়ো-বোঁ খুঁজে পেল না?'

তিপু ওর বিশ্বাস মতোই বলল, 'বারে, বিয়ে করার জন্ত কেউ আবার বুড়ো কনে খোঁজে নাকি?'

তাওতো বটে। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? কালের ঘটার সঙ্গে, মন বদলায় কী না, জানি না। তবে চেনা মহলের মধ্যেও তো অনেককে বুড়ি কনের পাণিপ্রার্থী হতে দেখেছি। সে কথা তিপুকে শুনিয়ে লাভ নেই। ডান দিকে একটা বাক নিতেই, অন্ধকারকে যেন করাত দিয়ে চিরে একটা উজ্জ্বল আলোর বলক দেখা গেল। তারপরেই দেখা গেল, হাজাক জলছে। একটা টালি-ছাওয়া বারান্দায়। সেখানে চেয়ারে একজন আসীন। দূর থেকে মনে হয় ইনিই বোধহয় সাহেব।

কাছাকাছি কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে। উঠোনে ছড়ানো বড় বড় লম্বা তক্তা। বাঁ পাশে মস্ত একটা টিনের ছাউনি, তার দেওয়াল বলে তেমন কিছু নেই। অনেক বড় উঠোন ঘিরে শালকাঠের বেড়া। বড় একটা গেট খোলাই রয়েছে। আলো বলতে হাজারকটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এই নিরঙ্ক অঙ্ককার ঝাঁঝ-ডাকা বনের জগতে, এই আলোই সহস্র শক্তির বিজলীবাতি। আশেপাশে কয়েকটি বড় গাছ রয়েছে। উঠোনে পা দিয়েই মনে হল মাটি নেই। সবটাই তক্তা পাতা, এবং সেই তক্তার নিচে যেন কিছু রয়েছে, তক্তায় পা দিয়ে একটু যেন গদীর অহুত্বুতি হয়। সম্ভবত তারি গাড়ি ঢোকবার জন্য এই ব্যবস্থা। কাঠের গুঁড়ির গন্ধ।

আমরা বারান্দার কাছাকাছি হবার আগেই, তিপু বলল, 'সাহেব বসে আছে।'

অহুমান করেছিলাম। সাহেবকে ঘিরে যারা আছে, তাদের দু'জন বনবাসী ছাড়া, একজন শাট-প্যান্ট পরে আছে, কালো সাহেব। সাহেব বুদ্ধ নিঃসন্দেহে, মাথার চুল ধবধবে সাদা। ভুরুজোড়াও যেন আমার চোখে পাংশুটে লাগছে। গৌফ-দাড়ি কামানো মুখে বিস্তর ভাঁজ। গায়ে শার্ট, বুক খোলা। নিচেটা দেখতে পাচ্ছি না। কটা চক্ষু তুলে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। নিতুকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যা রে নিতু, ক্যায়্যা খবর?'

নিতুও দেখলাম, বাজারি হিন্দীতেই জবাব দিল, 'এমনি এলাম। আপনি কি এখন কাজ কাজ করছেন?'

সাহেবের সামনে টেবিলের ওপরে একটি খাতা খোলা রয়েছে। বললেন, 'এমন কিছু না। আয়। মেয়েটাকে যেন চিনি মনে হচ্ছে?'

সাহেবের চোখে এখনো ছানি পড়েনি। চশমাও তার চোখে নেই। তবে তাঁর নজর যে কিছু কিঞ্চিৎ কালের দখলে গিয়েছে, তা বোঝা যায়। তিপুর দিকে তাকিয়ে তিনি, তাঁর ঘষা কাঁচের মতো ধূসর চোখের নজরকে উজ্জল করার চেষ্টা করছিলেন।

তিপু হাসছিল, বলল, 'হাম তিপু।'

সাহেব ঘাড় ছলিয়ে বললেন, 'আহু আহু, গাঙোলিকা বেটি! আও আও।'

নিতু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আর ইনি আমাদের একজন দাদা, কলকাতা থেকে এসেছেন।'

বুড়ো উইলিয়মের হাসিটি জানিয়ে দেয়, তাঁর দাঁত বাঁধানো। ডেকে বললেন, 'আও বাবু, আও, বয়ঠো।'

তারপরে অগ্রদিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, ‘সু—নি।’

আমরা সিঁড়ি দিয়ে সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দায় উঠলাম। অগ্রদ্বারাও আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। টেবিলের কাছাকাছি, আরো কয়েকটা চেয়ার ছিল। কিন্তু আমাকে বসতে বলল। বারান্দার লাগোয়া ঘর। সেখানে স্থায়িকেন্দ্র আলো জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে। তিপু সোজা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। কাছাকাছি দেখে মনে হল, এই বনের রোদ বাতাস, সাহেবের বিলিতি রঙকে অনেকটা নিজের মতো করে মেজে-ঘষে নিয়েছে। রঙ এখন তামাটে। সাহেব তখন আবার লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হল। শুনে মনে হচ্ছে, সারা দিনের হিসাবপত্র হচ্ছে।

তিপু আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে মনে হল, ওর বয়সীই একটি মেয়ে যেন, কিংবা একটু বেশি। রঙ তার কালো, টলটলে স্বাস্থ্য, কালো মুখখানি মিষ্টি। চোখে-মুখে হাসি। কোলে তার একটি দুধে-আলতায় মেশানো মাস ছয়েকের শিশু, কালো-গোয়ার এমন গলাগলি বড় একটা দেখা যায় না। তিপু বলল, ‘এই হল সুনি, আর এই ওর ছেলে।’

অপূর্ব! স্বভাবতঃই সুনি শ্রমজীবিনী নয়, সেজন্তু তার গায়ে একটি জামা আছে, শাড়িটিও পরিচ্ছন্ন। একটু চকচকে ঝকঝকে। চুলের বাঁধনটা ঘোড়ার ল্যাজের মতো। তার হাসি আর অভিব্যক্তিতে যেমন একটু লজ্জা আছে, তেমনি গোরা পুত্র-গর্বও আছে। তিপু ছেলেটিকে নিজের কোলে নিয়ে বলল, ‘দে, তোর ছেলেটাকে দে দেখি।’

হাত বাড়িয়ে, ছেলে কোলে নিল। সুনি নায়ী মুণ্ডানী ছেলের দিকে দেখল, তারপরে তিপুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। তিপু বলল, ‘এর মধ্যে তোর ছেলে হয়ে গেল? তুই তো আমার থেকে বেশি বড় নোসু।’

সুনি হাসল, কারণ মনে হল, ও শুধু হাসতেই জানে। হাসিটি মিষ্টিও তেমনি। তিপু যে বলেছিল, সুনি সাহেবের থেকে অনেক ছোট, তা বটে। সাহেবের নাতনী হলে হয়তো মানানসই হত। তা বললে কী হয়। বুড়ো শিবু বলে তো একটা কথা আছে, না কী? সুনির কোলজোড়া এমন গোরা ছেলেটি তো তা-ই মনে করিয়ে দেয়। তাকে দেখে তো সুখী ঘরনী বলেই মনে হচ্ছে।

সাহেবের কাছ থেকে লোকজনেরা চলে গেল। সাহেব এবার আমাদের দিকে ফিরে বসলেন। তিপুর কোলে ছেলেকে দেখে সাহেবের মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, ‘কী রে মেয়েটা, আমার ছেলে কেমন দেখছিল?’

তিপু বলল, ‘খুব সুন্দর।’

সাহেব কেসো গলায় হা হা করে হাসলেন। স্নানিকে একবার দেখলেন, তারপরে একটি বিড়ি ধরালেন। এমনটিও দেখতে হল, সাহেব কৌকেন বিড়ি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার চলবে বাবু?’

সাবেক সাহেবদের মতো সঘোষন, ‘বাবু’। বললাম, ‘দিন।’

বিড়ি ধরালাম। সাহেব বললেন, ‘তোমাকে কী দিতে পারি বাবু, একটু মদগম্ পান করবে?’

অবাক হয়ে একবার নিতুর দিকে তাকিয়ে, সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, ‘সেটা কী বস্তু?’

সাহেব বললেন, ‘মহুয়ার মদ। বাঙামুণ্ডার আগের স্টেশন বিলবার কারখানায় ডিসটিল করা, ভালই লাগবে।’

বলে তিনি স্নানির দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললেন। স্নানি তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে চলে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি বোতল, তিন চারটি কাঁচের গেলাস নিয়ে। কিন্তু আমি তখন ফাঁপরে। নিতুর দিকে ঘন ঘন নজর মেলি। ওর মুখে সেই মজা লাগা খুশির হাসি। সাহেব তখন বোতল খুলছে। ছিপির মুখে গালা লাগানো। বোতলের গায়ে একটি কাগজের লেবেলও মাঝা আছে। পানীয়র রঙ একেবারে সাদা না, কিন্তু সোনালীও না, তার মাঝামাঝি হালকা। নামে মদগম্ বটে। তবে ওতে যে গম্ নেই, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিনীতভাবে বললাম, ‘ওটা আমাকে আর দেবেন না, ঠিক সহিবে না।’

সাহেব হেসে বললেন, ‘সহিবে-সহিবে, এ খুব কড়া জিনিস না। তোমাদের জুইস্টি রাম-এর থেকে নরম। জল মেশাবার দরকার হয় না।’

বলে সাহেব দেবি পর পর গেলাসে খানিকটা করে ঢালছেন। প্রথমে তিপুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘পান করবি?’

তিপু জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘ওম্, না না।’

বলতে গিয়ে ওর নাক কুঁচকে গেল। সাহেব স্নানির দিকে একটি গেলাস বাড়িয়ে দিলেন। স্নানি গেলাসটি নিয়ে তিপুর দিকে কিরে, হিন্দিতেই বলল, ‘একটু পিয়ে দেখ না।’

তিপু বলল, ‘তুই খা।’

স্নানি বলল, ‘আমি তো রোজ খাই।’

সাহেব তখন আমার দিকে একটি গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘নাও বাবু। নিতু পান করবি নাকি?’

‘নিভু বলল, ‘দাদা মারবে।’

সাহেব বীধানো দাঁতে হাসলেন, ‘হ্যাঁ, গোপালটা তো আবার একদম সাধু, বিড়িও টানে না। আচ্ছা বাবু, চালাও। সারাদিন কাজের পরে, এ ছাড়া আর কী আমাদের আছে।’

বলে তিনি গেলাস তুললেন, নামিয়ে ঠোট স্পর্শ করলেন। আমি আর একবার নিরুপায় চোখে নিতুর দিকে দেখলাম। ওর মুখে সেই হাসি। স্থনিও ওদিকে গেলাসে চুমুক দিয়েছে। তিপু হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, ‘একটু চেখেই দেখুন না। খারাপ লাগলে খাবেন না।’

তিপুও উৎসাহ দেয়। মুখের কাছে গেলাস তুলে, গন্ধটা মোটেই মহয়ার মতো মিষ্টি মনে হল না। মুখে ছোয়াবার পরে, জিভ থেকে ভিতর পর্যন্ত, গলা দিয়ে যেন জ্বলন্ত কিছু নেমে গেল। মুখ ভরে গেল লালায়। বারে বারে ঢোক গিলছি দেখে সাহেব বললেন, ‘প্রথমটা একটু ওরকম লাগবে। দু-চার চুমুকের পরে আর তা হবে না।’

রক্ষা করুন হে বুড়শিব উইলিয়ম, আপনার মতো আমার এত ধক নেই। অবশিষ্টটুকু শেষ করতে পারলে ভাগ্য মানব। পরে দ্রব্যগুণের ক্রিয়া কি হবে কে জানে।

সাহেব আমাকে কলকাতার হালচালের কথা একটু জিজ্ঞেস করলেন। এক সময়ে নিজে প্রায়ই কলকাতা যেতেন, সে কথা বললেন। তারপর কথায় কথায় জানা গেল, ডিজেল চালিত এই করাতকলের মেশিন উনি ভাড়া নিয়েছেন একটা কোম্পানী থেকে। মেশিন কেনবার মতো পয়সা তাঁর নেই। কোম্পানীর ভাড়া মিটিয়ে কোনোরকমে চলে যায়। স্বভাবতঃই তাঁর অতীত জীবন বিষয়ে, আমার অনেক কৌতূহল থাকলেও, কিছুটা সঙ্কোচ ও ভদ্রতাবশত জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। কিন্তু তাঁর কথা থেকে এইটুকু বুঝতে পারলাম, তাঁর অর্থ বিত্ত বলতে কিছুই নেই, এই টালির বাড়ি আর জমিটুকু ছাড়া। মেশিন কোম্পানীকে যখন তাদের ভাড়া ঠিক মতো দিতে পারবেন না, তারা মেশিন তুলে নিয়ে যাবে। তখন—সাহেবের নিজের ভাষায়, ‘আই উইল বী এ গোল্ড ডিগার অন দ্য কোয়েল ব্যাংক।’

তখন তিনি কোয়েলের চরে সোনাখাঁচা হয়ে যাবেন। শুনে যেন, এই নতুন দেখা, খাস বিলেতি সাহেবটির জ্ঞান আমার মন টনটনিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে কথায় কথায়, কয়েক পাত্র মদ্যম্ তিনি পান করেছেন। তাঁর সঙ্গে পান্না দিয়ে, তাঁর বালিকা-গৃহিণী, স্থনি উইলিয়ম। এক সময়ে, তিনি শিশুটিকে নিজের

কোলে নিলেন। শিঙাটি তাঁর বৃদ্ধ মুখের ওপর, ছোট নরম খাবা দ্বিগে ঝায়ছে। তিনি হাসছেন, আর মুণ্ডা ভাষায়, আদর করে কী যেন বলছেন। স্থনিকে দেখলাম, সে তখন সাহেবের চেয়ারের পাশে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ছেলের মুখের দিকে দেখছে। মদগমের বসে চকচকে চোখে-মুখে তার প্রেম আর স্নেহের হাসি সৃষ্টি করেছে অনির্বচনীয়তা। সংসারের এমন দুর্লভ দৃশ্যের সামনে বসে, সব ভুলে গেলাম। মনে হল, বনে এসেছি, বন তার যা দেবার, যেন এই মুহূর্তেই সব উজাড় করে চলে দিল।

সহসাই আমার পিঠের কাছে স্পর্শ, পিছন কিরে দেখলাম, তিপু। তিপু ষাড় নেড়ে, ঠঠবার ইশারা করল। নিতুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারও সেই ইচ্ছা। আর উইলিয়ম দম্পতি, নিজেদের নিয়ে এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছে যে, এখানে অভ্যাগতদের ভুলে যাবার কোনো প্রস্নই ওঠে না। যদিও আমরা অভ্যাগত না, নিতাস্তই অনাহৃত। আমরা উঠে যখন বিদায় চাইলাম সাহেব অনায়াসে বললেন, ‘আচ্ছা বাবু, ইচ্ছা হলে আবার এস। তোমাকে আমি মদগম পান করাব।’

যদিও তাঁর দেওয়া সবটা আমি শেষ করতে পারিনি। বিদায় নেবার সময়, স্থনি তিপুর পিঠে আলতো করে একটা ঘূষি মারল। তিপুও ছাড়ল না, পিঠে মেরে বল, ‘মাতাল।’

অঙ্ককারে বেরিয়ে এলে, তিপু নিজের থেকেই আমার একটি হাত ধরল। বনের স্তরুতায় কেবল ঝিঁঝির ডাক। কিন্তু আমরা কেউ-ই কোনো কথা বলতে পারছি না কেন। নিতু আর তিপুর মতো ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে। ওরা তো চুপ করে থাকতে শেখেনি। তবু ওদের মুখেও কথা নেই। বোঝা গেল, যা স্পর্শ করে, তা সবাইকেই করে। মন এবং প্রাণের কোনো ব্যস নেই।

আমরা যখন স্টেশনের কাছে এলাম, গায়ে এসে পড়ল টর্চের আলো। ইতিমধ্যে ওপারের দোকানপাট কিছু কিছু যেন বন্ধ হয়েছে। আলো কম দেখা যাচ্ছে। গলা শোনা গেল, ‘আমি আবার এখন যাচ্ছিলাম সাহেবের বাড়ি। শিবুর মুখে শুনলাম, তোরা সেখানে গেছিস?’

অনেকদিন পরে হলেও, মনে হল, গোপালের গলা। মনে হওয়াটা ভুল না। টর্চের আলো ফেলে, সে আমাদের সামনে এসে পড়ল। টর্চের আলোর

বলয়ে যেটুকু দেখতে পেলাম, গোপালের সব সময়ের স্বভাবগম্ভীর মুখে যেন একটু হাসি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

বললাম, 'কিছুমাত্র না। বেশ কাটছে।'

গোপাল বলল, 'মোহনবাবু বলে, এখানকার এক ইজারাদার ভদ্রলোক, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য, সিংজীর বাড়িতে বসে আছেন। সিংজীও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

তিপু তখনো আমার হাত ছাড়েনি। বলল, 'যান এবার আপনি বড়দেহ দলে চলে যান।'

গোপালকে ঠিক গম্ভীর বলা যায় না, যেন সর্বদাই চিন্তিত ও বিরক্ত। তিপুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায় টো টো করে ঘুরছিলি?'

তিপু বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

গোপাল বলল, 'যা নিতু, তিপুকে পৌঁছে দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা।'

নিতু বলল, 'তা ছাড়া আর উপায় কী।'

গোপাল আমাকে ডাকল, 'আসুন। তোরাও আমার সঙ্গে সিংজীর বাড়ি অবধি আয়, তারপরে টর্নাইটটা নিয়ে যা। আমি মোহনবাবুর সঙ্গে ফিরব।'

তিপু আমার হাত ছাড়ল না। রেললাইন পেরিয়ে, সিংজীর পাকা মোকামের গেটের কাছে এসে হাত ছাড়ল। বলল, 'কাল সকালে আপনাকে গিয়ে আমি নিয়ে আসব।'

নিতু ধমকের স্বরে বলল, 'হয়েছে, এখন আসুন।'

তিপু ওকে জিভ ভেঙে দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে হাসল। ওরা টর্নাইট নিয়ে চলে গেল। আমি গোপালের সঙ্গে সিংজীর বাড়িতে ঢুকলাম। বারান্দা দিয়ে যে ঘরে উপস্থিত হলাম, সেটা বোধহয় বৈঠকখানা। দেখলাম, নিচু বড় চৌকিতে কবাস পাতা। সাদা চাদরের ওপর, ছোট তাকিয়া। ঘরে ছায়া জ্বলছে। একজন আধশোয়া অবস্থায়, গড়গড়া টানছেন। তাঁকে দেখলেই কেন যেন অবাঙালী বলে মনে হয়। মাথায় কাঁচাপাকা ছোট ছোট চুল। খুসর গৌফজোড়াটি বেশ বড় আর খাড়া। তামাটে শক্ত মুখ, মোটা নাক, ছোট ছোট চোখে ভীক দৃষ্টি।

তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন এক ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। ধূতি-পাঞ্জাবি পরা, পাট করে চুল আঁচড়ানো মাস্‌কটির ফরসা মুখে অস্বাভাবিক হাসি। গোপালের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই, হুঁজনে ফিরে ডাকলেন। গোপাল

পরিত্যক্ত করিয়ে দিল। সিংজী তাঁর গড়গড়ায় নল রেখে, বাংলাতেই বললেন, ‘আহ্নন, আহ্নন, গোপালের কাছে আপনার কথা শুনছিলাম। বহ্নন।’

আর একজন মোহনবাবু। তিনি ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ‘আহ্নন, উঠে এসে বহ্নন।’

আপ্যায়ন ধারাপ না। সিংজীকে বড় বেশি ভার ভারিঙ্কি লাগছে। মাহুস হিসাবেও যেন কোথায় একটা দূরত্ব বোধ করছি, যেটা মোহনবাবুকে মনেই হচ্ছে না। উঠে বসলাম। সিংজী নিজে একটি তাকিয়া আমার দিকে ঠেলে বললেন, ‘আপনার গড়গড়া চলবে? আলাদা নল আছে।’

আমি হাতজোড় করে বললাম, ‘আজ্ঞে না, ওটা চলে না।’

সিংজী বললেন, ‘আপনারা শহরের লোক, সিগারেট খান। তবে পথে চলতে, আমি বিড়ি খাই।’

বলেই হাঁক দিয়ে ডাকলেন, ‘বেচন এ বেচন।’

গোপালও ইতিমধ্যে বসেছিল। ভিতর দিকে যাবার দরজা দিয়ে, একটি নিরীহ মাঝবয়সী লোক এল। সিংজী বললেন, ‘কা হো, দেখতেই ছায় মেহমান আয়া। বোতল গেলাস উলাস পানী উনি লে আও।’

লোকটি ‘জী’ বলে তখুনি বেরিয়ে গেল। গোপাল দেখলাম অল্প দিকে তাকিয়ে, যেন খানিকটা উদ্বিগ্নভাবে, চোখ পিটপিট করছে। মোহনবাবুর মুখে মোহন হাসিটি লেগে আছে, একটু যেন সলজ্জ। বোঝা গেল, সিংজীর সামনে সকলেই একটু, অমায়িক কৃতজ্ঞ চূপচাপ। সিংজীর আচরণও বেশ রাজকীয়। বললেন, ‘জঙ্গলের কোথায় কোথায় যাবেন বলুন।’

আমি হেসে বললাম, ‘আমার তো কিছুই জানা নেই।’

মোহনবাবু বললেন, ‘আমি একটা মোটামুটি ছকে রেখেছি।’

সিংজী বললেন, ‘তোমার ছকটা বাতাও শুনি।’

মোহনবাবু বললেন, ‘রিমিভি পারোডি মাকরাঙা ডোমলাই দিয়ে—’

সিংজী হাতের নল কেলে দিয়ে, বলে উঠলেন, ‘আরে ছোড় মোহনবাবু, ওসব তো জঙ্গলে ঢোকবার রাস্তা। তুমি একটা আস্তানা কোথাও করেছ? তোমার কাজ এখন কোথায় হচ্ছে?’

মোহনবাবু বললেন, ‘খলকোবাদ ব্রকে পরন্ত থেকে কাজ শুরু হবে। সেখানে ঘর বানাতে বলেছি।’

‘বহোত আচ্ছা, ওখান থেকে তিরিলপোষ্টা ঘুরিয়ে আনা যাবে। গুয়া-রেকের ঘাটকুড়ি, করমপদা, কদলীবাদ আমার হাতে ছেড়ে দাও। ছোট নাগরিক-

একবার নিয়ে যেতে হবে। লাটুয়া, আম্বিয়া; লেনা নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। গুয়া রেজে আমার কাজ চলছে। ছোট নাগর্য্যতে ওখানেই ঠেকে এখন নিয়ে যাব। সেখানে আমি বাবুজীর থাকবার ব্যবস্থা করব। রাত্রে ওখানে থাকাই ভাল, ভয়ের কিছু নেই। রেঞ্জারকে বলে, কনস্টে ডিপার্টমেন্টের একটা কোনো মাটির ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করব। সেখান থেকে, তোমার কাছে থলকোবাদ যাবে, কী বল ?’

মোহনবাবু বললেন, ‘সে তো ভালোই হয়।’

সিংজী গোপালের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী গোপাল তোমার কি ইচ্ছা ? তোমার দাদার দোস্ত আছেন।’

গোপাল বললেন, ‘অপনি যা ব্যবস্থা করবেন, তা-ই হবে। দাদার কোনো অসুবিধা না হলেই হল।’

সিংজী বললেন, ‘কোনো অসুবিধা হবে না। আমার ছোটো লরি কাজ করছে। তোমার একটা মোহনবাবুর কাজ করছে। রেঞ্জার সাহেব না হয়, ডি. এফ. ও-র সঙ্গে, জীপে কখনো কখনো বাবুজীকে ভিড়িয়ে দেব।’

মোহনবাবু বললেন, ‘সে তো খুব ভাল হয়।’

সিংজী বললেন, ‘আর থাওয়া ? আমার কাছে সব ব্যবস্থা আছে। তোমার কাছেও থাকবে। ব্যস্, মিটে গেল।’

এবার আমি একটু বলবার সুযোগ পেলাম। বললাম, ‘খুব বেশি জায়গায় ছোটোছুটি করার দরকার কী। বনের ভিতরে কোথাও কয়েকদিন কাটিয়ে এলেই হল।’

সিংজী বললেন, ‘সেই কথাই হচ্ছে। কিন্তু এক জায়গায় থাকলে তো হবে না। জঙ্গলেরও তো অনেক রকমারি আছে। যতটা হয় দেখে নেবেন। দেখতে হবে, বিপদ-আপদ কিছু না ঘটে। বাঘের ভয় নেই, হাতির উৎপাত কোথাও কোথাও আছে। সে সব জায়গায় না গেলেই হবে। তা হলে পরন্তু সবেরে আমরা বেরিয়ে পড়ছি।’

মোহনবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘বহোত আচ্ছা। আর গোপাল তুমি ? তুমি তো যাবে না ?’

‘না। আমার আর জঙ্গলে যাবার কী দরকার। আমি এখানকার কাজকর্ম দেখব।’

সিংজী গড়গড়ার নলে টান দিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমার মতো ছোকরার আর আমাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। কী বল মোহনবাবু ?’

মোহনবাবু হাসলেন। গোপালও হাসবার চেষ্টা করল। সেটা হাসি কী না, আমি বুঝলাম না। ইতিমধ্যে, বেচন নামক লোকটি একটি বড় পিতলের রেকাবিতে বোতল গেলাস আর জলের জাগ এনে, সিংজীর সামনে বসিয়ে দিল। দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। এই বনের রাজঘরে দেখছি, একেবারে স্কটল্যান্ডের খাটি পানীয়র বোতল। শহরে পানরসিকরা দেখলে নিশ্চয় খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠত। সিংজীর ব্যাপার দেখছি, সত্যি রাজকীয়। উইলিয়মের মঙ্গলের বোতলটির কথা আমার মনে পড়ে গেল। সিংজী বললেন, 'সেদিন রাউরকেলা গেছলাম। সেখান থেকে দু-বোতল পেয়ে গেলাম। এক সাহেব ক্লাব থেকে বন্দোবস্ত করে দিল। নাও মোহনবাবু, বোতলের মুখটা তুমিই খোল।'

মোহনবাবু অতি সলজ্জ হেসে বোতলটি তুলে নিলেন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দাদার জন্ত আজ আমাদের ভাগ্যও খুলে গেল।'

ভাবছিলাম, বনের ইজারাদার সিংজীর সঙ্গে, রাউরকেলার সাহেব আর ক্লাবের কী সম্পর্ক? তবে সব কথার জবাব কখনো পাওয়া যায় না। সিংজীর অন্তঃশ্রোতের গতি যে কত দিকে, তা আমার জানা সম্ভব না। কিন্তু তিনটি দেখে একটু অবশিষ্ট লাগছে। এর আগেই কিঞ্চিৎ মঙ্গলের স্বাদ নিতে হয়েছে। এখন আবার এই বিলাতি পানীয়! নিঃসন্দেহে গোপাল পানরসিক না, কেন না, বোতলের দিকে সে চেয়ে আছে, যেন কোনো রক্তাক্ত আহত প্রাণীকে দেখছে। একটা ভয়, একটা আতঙ্ক এবং উদ্বেগ। মোহনবাবুর তিনটি গেলাসে পানীয় ঢাললেন, জল মেশালেন। সিংজী নিজের হাতে আমার দিকে একটি গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আম্বন।'

আমি সংকোচে হাসলাম, কিছু বলতে গেলাম, সিংজী তার আগেই বলে উঠলেন, 'আরে ভাই, কম সে কম আমার ইজ্জতটা তো রাখুন, গেলাসটা নিন।'

এর পরে আর না নিয়ে উপায় থাকে না। বললাম, 'আমাকে না দিলেই পারতেন।'

সিংজী বললেন, 'ওটুকুতে কিছু হবে না, রাজে ভাল ঘুম হবে। নাও মোহনবাবু। জয় গুরু, জয় বনমাতা, জয় আন্দ্রি বোডো।'

বলে গেলাসে চুমুক দিলেন। মোহনবাবুও চুমুক দিতে দিতে, সিংজীর মতোই উচ্চারণ করলেন। গোপালের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। অগত্যা, আমরা, 'জয় বনমাতা।'...

তারপরের কথাবার্তা সিংজী আর মোহনবাবুতেই বেশির ভাগ। কথায় কথায় বোঝা গেল, মোহনবাবুর জী এখানেই আছেন, এবং তিনি মজ্ঞপানের

প্রতি বিরূপ। যদিও মোহনবাবু তা মানেন না। সলজ্জ হাসি থেকে মোহনবাবু ক্রমে বেশ উচ্চস্বরে বাজতে লাগলেন। সিংজী ক্রমেই গভীর হতে লাগলেন, পানের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। এক সময়ে গোড়ানো স্বরে বললেন, 'সীমা বলছিল, কয়েকদিন থলকোবাদের বাংলায় এসে থাকবে। সেই জার্মান সাহেবের সঙ্গে।'।

বলে একটু যেন হাসবার চেষ্টা করলেন। তারপরে পাত্র শূন্য করে তাকিয়ান্ন এলিয়ে পড়তে পড়তে বললেন, 'ছেলেটা বোধহয় বাঁচবে না। টাটার ডাক্তার সেইরকমই বলছে।'।

বলতে বলতে তিনি তাকিয়ান্ন মাথা পেতে দিলেন। আমি গোপালের দিকে তাকাতে, ও বলল, 'মোহনবাবু, এবার চলুন, সিংজী ঘুমিয়ে পড়েছেন।'।

মোহনবাবুও তাঁর পাত্র শূন্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন।'।

বেচন এসে দাঁড়াল। আমরা তিনজনেই বেরিয়ে এলাম। মোহনবাবুর হাতে টর্চ। তিনি বেশ শক্তই আছেন, একটুও টলছেন না। বাইরে কোথাও একটি আলো নেই। স্টেশনেও না। কি'ন্সির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। একেই বোধহয় বন্ধ নিয়ন্ত্রণতা বলে।

মোহনবাবু আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, 'সীমা কে জানেন তো?'

বললাম, 'না তো।'।

'সীমা হল, ওড়িয়া-বাঙালী মিকসড একটি মেয়ে। ভাল নাচ-গান জানে। সিংজী ওকে কটক থেকে এনে, রাউরকেলায় রেখেছিলেন। প্রেমিকাই বলুন, আর কংকোবাইন বলুন, যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু রাউরকেলায় আনার পরে, মেয়েটিকে ভাল লেগে গেল এক জার্মান সাহেবের। সিংজীর আবার স্টীলের ব্যবসাও আছে তো। সীমা এখন সেই সাহেবের কন্যারেই আছে। সিংজী ছিনিয়ে নিতেও পারেন না, মেয়েটাকে ভুলতেও পারেন না।'...

মোহনবাবুর একটানা কথা শুনলেই বোকা যায়, বিলাতি পানীয়র নেশা তাঁকেও টেনে নিয়ে গিয়েছে, সীমা-সিংজীর বিচ্ছেদের নাটকে। একটু থেমে চলতে চলতে আবার নিজেই বললেন, 'পাবার জন্য মানুষ সবকিছু হারাতে চায় না। কিন্তু জগৎটা বিলকূল গিত অ্যাও টেকে চলছে।'।

আমি ভিজ্জেন করলাম, 'সিংজী কার ছেলের কথা বলছিলেন?'

'ওঁর ছেলের কথা। ছেলেটা পোলিওতে ভুগছে, একমাত্র ছেলে। ক্যামিলির সবাই এখন টাটার আছে।'।

গাজুলিমশাইয়ের বিকালের কথা আমার মনে পড়ে গেল। গোপালদেব বাড়ির কাছে এসে, মোহনবাবু টর্চ জালিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ দেখালেন। উনি আরো এগিয়ে যাবেন। গোপাল বলল, ‘স্বাপনি চলে যান, আমরা যেতে পারব।’

তবু মোহনবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন, বললেন, ‘ঠিক আছে, যান, আমি যাচ্ছি।’

টর্চের আলোয়, ভিতরের চাষ জমিটুকু পার হতে হতেই, মোহনবাবুর টর্চের আলো সরে গেল। অন্তরিক থেকে জেমা হারিকেন হাতে এগিয়ে এল। সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে ওর মুখ দেখতে পেলাম। না, ওর চোখে ঘুম জড়ানো নেই। এতক্ষণ এই ঝাঁঝ-ডাকা নিঝুম বাড়িতে ও কী করছিল? রান্নার পাট নিশ্চয়ই অনেক আগেই মিটে গিয়েছে। স্ত্রী একবার বিকেলে এসেছিল। আবার একবার নিশ্চয় বনমোরগ দিতে এসেছিল।

ওরাওঁ মেয়ে জেমা, বিপদীক বাড়ালী মোকানিক স্ত্রীন, কী কথা বলে?

গোপাল কোনো কথা না বলে, হাত থেকে হারিকেনটা নিল। বলল, ‘তুই খাবারটা বেড়ে ক্যাল, আমরা আসছি। নিতু খেয়েছে?’

জেমা বলল, ‘খেয়ে শুয়ে পড়েছে।’

গোপাল আমাকে ডাকল, ‘আমুন, জামাকাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।’

গোপালের পিছনে পিছনে গেলাম। দেখলাম নিতু ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে গিয়ে গোপাল একটা কমিয়ে রাখা হারিকেনের শিষ উস্কে দিল। দিয়ে চলে গেল। জামাকাপড় বদলে, হাতে-মুখে জল দিয়ে রান্নাঘরে খেতে গেলাম। সেখানে লম্ফ জলছিল। জেমা গরম ধুমান্নিত ভাত আর বনমোরগের মাংসের বাটি পরিবেশন করল।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, ‘খাসুনি তো?’

জেমা বলল, ‘খাব।’

খেতে খেতে গোপালের সঙ্গে সামান্য ছুঁচোর কথা হল। কলকাতার কথা না। একানকার মন্দা ব্যবসা, দলাদলি, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি বিষয়ে, যে-বিষ ভারতের সর্বত্র বিষধরেয়া ছড়িয়ে রেখেছে। তারই মধ্যে সিংজীর কথা উঠল। গোপাল চুপ করে গেল। পাশাপাশি ঘরে শুতে যাবার আগে গোপাল বলল, ‘আমার বাবা এক সময়ে একানকার বনের নাম-করা ইজারাদার ছিলেন। এখন আর কিছুই নেই।’

ওর ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। স্বল্পবাক গোপাল হঠাৎ কাথাটা বলল

কেন? সিংজীর কথা মনে করে? গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল আবার।

রাত পোহাতে পরের দিন বনের গভীরে যাবার আয়োজনটাই বড়। অবিশি আমার তেমন কিছু করার ছিল না। কিন্তু মোহনবাবু এসে নিতুকে ডেকে নিয়ে গেলেন। প্রায় দু-সপ্তাহের জন্ত যাত্রা। চাল আটা ভাল তেল মসলা স্তন, যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের কার্খোপলক্ষেই যাত্রা। তার মধ্যে আমি একজন বাড়তি লোক, বনদর্শনে এসেছি। একবার নাকি বনের গভীরে ঢুকে গেলে, তথাকথিত সভ্যজগতের আর কোনো চিহ্ন নেই। অবিশি সঙ্গে গাড়ি থাকলে সবই করা যায়। কিন্তু তাতেও পঁচিশ-তিরিশ মাইল বন পেরোতে হবে। কেবল তো বন না। হাজার দু-হাজার ফুট গুঠো, আবার নামো। রাস্তাও শহরের মতো ময়ূণ না। অতএব যতটা সম্ভব তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল। সিংজী মহাশয়ের কথা আলাদা। ওঁর বিস্তর লোক, বিরাট ব্যাপার। তিনি শয্যায় শুয়ে থাকলেও কাজ হবে ঠিক। মোহনবাবুর তা না। তাই সকাল থেকেই সবাই বাইরে বাইরে ব্যস্ত।

আমিও গোটা দিনটি বসে রইলাম না। জেমার হাতে সকালবেলার জল-খাবার শেষ না হতেই, তিপু এসে উপস্থিত। ওর তো সকলের সঙ্গে সমান ভাব। জেমার সঙ্গেও তাই। দু'জনের মধ্যে খুব খানিকক্ষণ কথা হল। সবাই জরায়িকলা আর টাটার কথা, নিজেদের জানাশোনা মানুষদের কথা। তিপু আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে জেমা হঠাৎ চোখে ঝিলিক হেনে বলল, 'তিপু ক'মাসে যেন অনেক বড় হয়ে গেছিস।'

তিপুর জবাব, 'শহরে থাকলে বোধহয় তাই হয়।'

যাবার আগে তিপু জানাতে ভুলল না, আজ দুপুরে আমার আহার ওদের গৃহে।

তারপরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, তিপু আগে আমাকে নিয়ে গেল সামটা নালার ধারে। বনের গভীর ছায়ায় মাঝে মাঝে শীত শীত করছিল। রোদ নরম আর মিষ্টি। তিপু আমাকে অনেক গাছ চিনি দিয়ে দিল। সামটা নালার ধারে গিয়ে আমার মনে হল, বন্যপশুদের জলপানের জায়গা। কল্কল্ বয়ে চলা নানা, এক এক জায়গায় কাঁচের মতো স্থির। তিপু জানাল, স্থির মানেই, জল সেখানে গহীন। মিথ্যা বলব না, আমার যেন এক এক সময় গা ছম্ছমিয়ে

উঠছিল। অথচ তিপুৰ মোটে ভয় নেই, যে তিপু গতকাল বিকালে সমাধি-স্থানের পাথর দেখে শিউরে উঠছিল। তিপুৰ মুখেই জানা গেল, চার-পাঁচ বছর আগে, সাম্টা নালার জলে একটি মেয়ে চান করতে এসেছিল। তাকে অজগরে গিলে খেয়ে ফেলেছিল। এবার আমি তিপুৰ ডানাটা আঁকড়ে ধরব কী না বুঝতে পারছি না।

তিপু আমাকে ফুল চেনাল, তারপরে একটা গাছের কাছে আমি ধমকে দাঁড়ালাম। খোকা খোকা সাদা ফুল ফুটে আছে। গন্ধটা অনেকটা কামিনী ফুলের মতো। কিন্তু তা কামিনী না। তিপু বলল, ‘এখন তো গন্ধ মরে গেছে। গন্ধ ছড়ায় রাজে। এর নাম রাজারানী ফুল।’

‘তাই নাকি! এরকম নাম তো কখনো শুনিনি।’

‘তা জানি না। এখানকার লোকেরা বলে, আমরা বলি। মেয়েরা এ ফুল মাথায় পরে।’

কথাটা শোনার পরে, তিপুৰ বাসি খোঁপাটার দিকে আমার চোখ পড়ল। গতকাল সন্ধ্যার সেই লাল মধুফুল খোঁপায় গৌজা বনবালার কথাও মনে পড়ে গেল, যার ফুল তিপু ছুঁয়েছিল। আমি কয়েক গুচ্ছ রাজারানী ছিঁড়ে নিয়ে বললাম, ‘এসো, তোমার খোঁপায় পরিয়ে দিই।’

তিপুৰ মুখে লাল ছটা লেগে গেল। আমার গায়ের কাছে এসে পিছন ফিরে ঘাড়টা একটু নিচু করে দাঁড়াল। আমি ফুল গুঁজে দিলাম ওর খোঁপায়। সেই মুহূর্তেই হাসির নিক্ষেপে, ফিরে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকটি বনবালা, একটু দূরে গাছতলা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে, আর হাসছে। মাথায় ওদের আমার অজানা এক ধরনের ঘাসের বোঝা।

তিপু আমার দিকে ফিরে তাকাল। এখনো লাজে লাজানো ছটা ওর মুখে। হঠাৎ শুনি বনমালা কয়টি সরু গলার সমবেতভাবে গান গাইতে শুরু করেছে। যে গানের ভাষা আমি কিছুই বুঝি না। তিপু হঠাৎ নিচু হয়ে, একটা পাথর তুলে নিয়ে মেয়ে ক’টির দিকে তেড়ে গেল। ওরা হাসতে হাসতে দৌড়ে পালাল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ব্যাপার কী?’

ও ঠোট ফুলিয়ে বলল, ‘দেখুন না, যা তা বলছে।’

‘কী বলছে?’

‘সে কথা আমি বলতে পারব না।’

বলার দরকার আছে কি? ভাষা বুঝি না ঠিকই। ওদের গান হাসি, খোঁপায় ফুল গৌজা, কিশোরী তিপুৰ কোপ, এ সবই তো, অথবা থেকে ধরার-

মধ্যেই আছে। কিন্তু আমি তো আমি-ই। আমার মন খুশিতে টলটলানো। এই বনের সংসারে, আমি এক নবজাতক। তিপু আমার খাজী। আমি তো জানি, ওর চোখে-মুখে এই যে লজ্জার ছটা, সেটা প্রকৃতির আপন ধর্মের রঙ ফেরানো। ওর হৃদয়ের অকলুষ স্পর্শ আমাকে সতেজ করেছে। বললাম, ‘ওরা বলুক ওদের যা খুশি।’

তিপু সে কথা বোধহয় আমার থেকে বেশি বোঝে। ও আমার হাত ধরে এক জায়গায় সামটা নালা পার হল। জলের নিচে পিছল পাথর, সাবধানে পার হতে হল। তারপরে বনের ভিতর কোথা দিয়ে, তিপু আমাকে নিয়ে চলে এল একেবারে কোয়েলের ধারে। কোয়েলের ওদিকটায় একটু ভিড়। অনেকে চান করছে। মেয়েরাই বেশি। কেউ কেউ একটু গভীর জলে, বাংলাদেশের আটান জালের মতো জাল দিয়ে মাছ ধরছে। নদীর ওপারেই একটা গ্রাম। গায়ে গায়ে কতকগুলো মাটির ঘর।

তিপু বলল, ‘চান করবেন তো?’

বললাম, ‘চানের সরঞ্জাম কিছু যে নিয়ে আসিনি।’

‘সরঞ্জাম আবার কী। আপনার চান করার জগা আমি একটা কাপড় নিয়ে আসছি বাড়ি থেকে। আপনি এখানেই থাকুন, ফেরন?’

‘বেশ।’

তিপু তৎক্ষণাৎ ছুটল চরের ওপর দিয়ে। ভয় লাগে, পায়ে শাড়ি জড়িয়ে না হুমড়ি খেয়ে পড়ে। স্নান আর মাছ ধরা দেখতে দেখতে, এক ধারের নিরিবিলিতে দেখলাম, এক সোনাখাঁচা সোনা খোঁচাচ্ছে। তারপরে এক সময় তিপু এসে পড়ল কাপড়-গামছা নিয়ে। প্রায় একটা বোঝা। ওর নিজের শাড়ি-জামাও ছিল। জলে নামার পরে প্রথমটা বরফগলা জলের মতো ঠাণ্ডা মনে হল। তারপরে সমস্ত শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কোয়েলের শ্রোতের উজানে তিপুর সঙ্গে চলে গেলাম জলের বুকে পাথরের গায়ে। কখন এক সময়ে, কিছু বনবাসিনী জলে গা ভিজিয়ে চলে এল আমাদের কাছে। তিপুর সঙ্গে তারা অনেক কথা বলল, আর বারে বারে আমার দিকে চেয়ে দেখল। বোধহয় পরিচয় নেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ উদ্ভয় হল নিতু আর শিবুর। ঝাঁপাই জোড়া, জল ছোঁড়া ছুঁড়ি খেলা কাকে বলে তখন বোঝা গেল।

কোকিলের মতো চোখ লাল করে যখন তিপুদের বাড়ি এলাম, গাঙ্গুলি-মশাই তখন গায়ে তৈলমর্দন করছেন। তিপু ছুটল বাসায়। ওর দেখা পাওয়া গেল একেবারে খাবার সময়। সবাইকে পরিবেশন করল ও নিজে।

কোয়েলের ছোট মাছের ঝালটা ওর নিজের হাতের রান্না। চান করে আসার পরে ওটা ছিল ওর সব থেকে বড় কাজ। বিদায় সেই সন্ধ্যার প্রাকালে। তিপু বলল, ‘কাল বনে যাচ্ছেন। আমরা কিন্তু পথ চেয়ে বসে থাকব। ফেব্রুয়ার সময় জরাইকেলা হয়ে যাবেন।’

তিপু সেই রাজারানী ফুল রেখে দিয়েছিল। বিকেলে চুল বেঁধে আবার পরেছিল। জরাইকেলা দিয়ে কিরব কী না জানি না। তবু বলেছিলাম, ‘দেখা হবে।’

তিপুর চোখে খুশি, তথাপি সংশয়। আর কী ছিল, জানি না।

যাত্রা লরিতে। সকালবেলাই। মোহনবাবু আমাকে বললেন, চালকের পাশে বসতে। মন মানল না। বললাম, ‘মালপত্র তো নেই, পিছনে বসি। সব দেখতে পাব।’

তখন মোহনবাবুও আমার সঙ্গী হলেন। আমাদের আর এক সঙ্গী সুরোন। সে গিয়ে ভিতরে, চালকের পাশে বসল। নিতুর যাবার ইচ্ছা ছিল। গোপালের অল্পমতি মিলল না। কাজ আছে। গোপাল বলল, দু-একদিন অন্তর অন্তর গাড়ি আসবে। দরকার হলে আমি যাব।’

মোহনবাবুর সঙ্গে ওর ইজারার কিছু অংশ আছে। সামটা নাকা অর্থাৎ চেক-গেটে কয়েক মিনিট দাঁড়াতে হল। কাজকর্ম সব আইনমারফিক। যেমন ইচ্ছা বনে ঢোকা যায় না। একলা তো আমাদের লরি না। পর পর লাইন দিয়ে আরো কয়েকটি দাঁড়িয়ে আছে। আরপর যখন ছাড়া পেল, গর্জন তুলে ছুটল সব। মাইল দুয়েকের মধ্যে, ঘন বসতি চোখে পড়ে। বনও তেমন নিবিড় না।

তারপরে এক সময়ে, যেন আহত পশুর আর্তনাদের শব্দ তুলে, লরি উঠতে আরম্ভ করে পাহাড়ের ওপরে। গতি হয়ে পড়ে লুপ্ত। পথ বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। বন ক্রমে নিবিড়তর। পর পর কয়েকটা গাড়ি চলছিল। এক সময়ে দেখলাম, যে যার পথে কোথায় কখন বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে। আমরা চলেছি একা।

মোহনবাবু বললেন, ‘নোয়াডিহির পাহাড়ী জঙ্গলে আমরা উঠছি।’

অন্ধকার যেন আমাদের গ্রাস করল। মাথার ওপরে প্রথম ফান্সনের রোদ। কিন্তু ঠাণ্ডার স্পর্শ তাতে। গভীর বনের অন্ধকারে, বাতাস নেই, ঠাণ্ডা বেশি। লরির গর্জন একটু আগেও, বিরল বনপাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল, এখন

আর তা নেই। বন তাকে গ্রাস করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘সব সময়েই যেন একটা কলকল শব্দ পাচ্ছি, এটা কিসের শব্দ?’

মোহনবাবু বললেন, ‘কোয়েনার শব্দ। কোয়েনাও নদী বলতে পারেন। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে। আমরা কোয়েনার ধার দিয়ে দিয়ে চলেছি। সারাটা পথই চলব।’

হঠাৎ কক্কক্ ডাক আর পাথার ঝাপটা শুনে চমকে উঠলাম। আর মনে হল, আমরা পেরিয়ে যাবার আগেই, এক পাশ থেকে আর এক পাশে কী যেন একটা ছিটকে চলে গেল। মোহনবাবু হেসে বললেন, ‘বনমোরগ।’

অপার কোতুহলে বনের গভীরে তাকাই। নিখুঁত, আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই, আবার তেমনি শব্দ। অনেকবারই শুনেছি হল, একবার দু-বার দেখতেও পেলাম। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, বনমোরগ এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে, শূন্যে উড়ে বাঁপিয়ে পড়ছে। জরায়ুকেলায় দু-একটি কুহুম গাছ দেখে, রক্ত মাতাল হয়েছিল। এখন এই বনের গভীরে, কোথাও কোথাও কেবল রক্তকুহুম। মনে হয় জগৎ সংসার সব লাল হয়ে গিয়েছে। বর্ণের হিসাব তো সাতটাই জানি। কিন্তু বড় বড় গাছে একটি পাতা নেই কেবল নানা রঙের ফুলে ভরা। মাটির রঙও যে এত বিচিত্র, বিচিত্রতর হয়, দেখা ছিল না। লাল, নীল, হলুদ, কালো, সাদা, পাহাড়ের গায়ে এক এক জায়গায় এক এক রঙ।

মোহনবাবু বললেন, ‘মাহুষ এই রঙ নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছে, যদি শহরের ইমারতে লাগানো যায়। কিন্তু কার্যকরী হয়নি।’

জিজ্ঞেস করি, ‘কেন?’

‘তা জানি না। নানারকম কেমিক্যাল মিশিয়েও, কাজে লাগানো যায়নি।’

গাড়ি পাহাড় থেকে ক্রমে নিচে নেমে চলছে। কিন্তু সামনেই আবার নতুন পাহাড়ের চড়াই। কয়েকবারই কোয়েনাকে দেখতে পেয়েছি। কখনো কাছাকাছি, কখনো হাজার ফুট নিচে। এমন স্বজু বিশাল শাল আর এত নিবিড়, কখনো দেখিনি। সেগুন কম, কিন্তু সেই মহীকহের চেহারা দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রকৃত বনস্পতি।

এক জায়গায়, পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি জায়গা টকটকে লাল, অথচ যেন আগ্নার মতো মসৃণ। বৃষ্টি মুখ দেখা যাবে। মাহুষের কাজ ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে কী করা হয়েছে?’

মোহনবাবু বললেন, ‘হাতিয়া গা ঘষেছে। ওদের গা চুলকায় তো।’

দেখুন, মাঝে মাঝে বড় বড় ফুটো আছে। ওদের দাঁতাল হাতি দাঁত ফুটিয়েছে। দাঁত শুলোয় তো মাঝে মাঝে।’

কেমন যেন স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, ‘ওই জায়গায় একটু হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে।’

মোহনবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, ‘দেখবেন?’

তারপরেই গলা তুলে বললেন, ‘গাড়িটা থামাও তো একবার।’

গাড়ি থামল। মোহনবাবু বললেন, ‘নেমে আসুন।’

তিনিও নামলেন আমার সঙ্গে। সুরীনও। সে বলল, ‘এখানে নামলেন? হাতিদের জায়গা।’

বলে সে আশেপাশে তাকাল। মোহনবাবু বললেন, ‘উনি একটু ওখানটা হাত দিয়ে দেখবেন। গণেশের নাম করে দেখা যাক।’

আমরা একটু এগিয়ে এসেছিলাম। পেছিয়ে গিয়ে, সেই রক্তাক্ত মাংসের মতো ময়ূণ পাহাড়ের গায়ে হাত দিলাম। পাথর না, মাটি, কিন্তু যেন শহরের মোজাইকের মতো চকচকে। সত্যি ঝাপসা প্রতিবিম্বও দেখা যায়। ধনগোপাল মুখার্জির যুগপতির কথা মনে পড়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল, প্রাগৈতিহাসিক বিশাল দেহ সেই প্রাণীদের কথা। গা-টা যে একটু ছনছন করছে, তা না। তবু মনে হল বনের বাসিন্দাদের যেন একটু ছুঁতে পেলাম।

আমার সঙ্গে মোহনবাবুও হাত বুলিয়ে দেখলেন, বললেন, ‘এ কথাটা আমার কখনো মনে হয়নি। আপনাদের লেখক মানুষের মন তো আমাদের না। আমরা কেবল গাছের দিকে চেয়ে দেখি। গোপালের দাদা বলরাম বলে, ‘আমরা হলাম ষাতক।’

মোহনবাবু হেসে বললেন, ‘আসুন, আর না। কারোর গা চুলকোতে ইচ্ছা হলে, আগে এসে শুঁড়ে তুলে আমাদেরই আছড়ে মারবে।’

প্রাণের দায় বড় দায়। এখনে কিঁকির ডাকও যেন কম। একটা গভীর স্তব্ধতা। হয়তো যারা এখানে গা ঘষে, তারা কোথাও থেকে আমাদের দেখছে। আমরা গিয়ে আবার লরিতে উঠলাম। এবার সুরীনও আমাদের সঙ্গে বাইরে এসে বসল। নিচে নামতে নামতে, আমরা খানিকটা সমতলে নেমে এলাম। দু-পাশে ঘন ঝোপ, লম্বা লম্বা ঘাস, তার পাশে পাশে গভীর বনের ছায়া। মোহনবাবু হঠাৎ বললেন, ‘সুরীন, ওরা কারা যাচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে, শুক্রম বাটা রয়েছে।’

মোহনবাবুর দৃষ্টি অহুসরণ করে দেখলাম, হাতে তীর-ধনুক নিয়ে, খালি-পা

একটি যুবক। পরনে একটি নেংটি। বনবাসী শিকারী। সঙ্গে ছুটি বালা। লেখবার সময় নাকি কল্পনায় আমরা অনেক কিছু দেখি। কিন্তু আমার মনে হল, বনবালাদের বয়স যা-ই হোক, মন্দিরের পাথরের নারীমূর্তির কথাই তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে। স্ত্রী বললে উঠল, ‘হ্যাঁ, শুক্রমই তো, আপনার কুলি।’

মোহনবাবু বললেন, ‘গাড়ি থামাতে বল তো। সন্দের রেজা দুটোও তো আমারই কাজ করছে না?’

‘হ্যাঁ, শুক্রমের বোঁ আর শালী।’

‘দেখেছেন, এদেলবায় ওদের ঘর বানাবার কথা। কাল থেকে গাছ কাটা শুরু, হারামজাদা বোঁ নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে?’

বলেই হাঁক দিলেন, ‘এই, এই শুক্রম!’

বনবাসী শিকারী আর সঙ্গিনীদ্বয় দূর থেকে ফিরে তাকাল। লরির দিকে ওদের যেন খেয়ালই ছিল না। ডাক শুনে এদিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে যেন কি বলাবলি করল। তিনজনেই এগিয়ে এল লরির দিকে। কাছে আসতেই মোহনবাবু ধমক দিয়ে বললেন, ‘ওঠ শিগগির।’ তারপরে হিন্দিতে বললেন, ‘আপনা কাম ছোড়কে ইধার উধার ঘুমতা?’

ওরা একটি কথাও বলল না। মুখে কোনো অভিব্যক্তি আছে বলে মনে হল না। তিন জনেই উঠে এল। আমরা গাড়ির সামনের দিকের কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। মাঝখানে ছিল দুটো টায়ার। ওরা তিন জনে সেই টায়ারের মাঝখানে গিয়ে বসল। গাড়ি ছাড়ার পরে কারণটা বোঝা গেল। গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে, আমাদের তবু একটু ঠেক লাগানো ছিল। ওরা এক হাতে টায়ার ধরে না রাখলে, টাল সামলানো দায়। তিন জনে বসল থানিকটা গায়ে গায়ে। এক যুবতী বনবাসিনীর ময়লা কাপড়ের কৌচড়ে, কি রয়েছে, টাটকা রক্ত দেখা যাচ্ছে। যুবকটি রোগা রোগা, শক্ত কালো চেহারা। তীর-ধনুক রেখে দিল। একটি বনবালা, যার কৌচড়ে রক্তাক্ত বস্ত্র, তার বুকের কাপড় অনেকখানি উদাস। কোণারকের শিল্পীরা কি এই সব চোখে দেখেছিল? অল্প বালাটির বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তার চোখ দুটি ডাগর। উদ্ধত শরীর যেন সামান্য একটু কাপড়ের আবরণে ভয় ধরানো বিদ্রোহে কাঁপছে।

এতক্ষণ ওরা নির্বিকার ছিল। তারপরে নিজেরা চোখাচোখি করে নিঃশব্দে হাসল। দু-একবার আমাদের দিকে দেখল। স্ত্রী বলল, ‘বড়টি শুক্রমের বোঁ।’

কিয়ে জিজ্ঞাস করল, ‘এই শুক্রম, তোর বহু কা নাম কীয়ে?’

শুক্রম একগাল হেসে বলল, ‘সোমারি না?’

বলার ভক্তিটা অদ্ভুত। বোয়ের নাম সোমারি। স্বরীন আবার জিজ্ঞেস করলো, উঠো তো তেরা বহকা বহিন। উস্কো নাম ক্যায়া ?’

শুকুম তেমনি হেসে বলল, ‘স্বরসতিয়া তো।’

কথার স্বরই অল্পরকম। অর্থাৎ শ্রালিকার নাম স্বরসতিয়া। এ কি ঠিক বনবাসিনীর নাম? নাকি সমতলের হিন্দুদের কাছ থেকে পাওয়া। স্বরসতিয়া কি সরস্বতীর অপ্রভংশ? জানি না স্বরীন আবার জিজ্ঞেস করল, ‘এই সোমারি, তেরা কাপড় মে ক্যায়া হায়?’

সোমারি হাসতে হাসতে নিরন্তরে কাপড়ের কৌচড় থেকে একটি গাঢ় লাল আর পিঙ্গল বর্ণের মৃত পাখি বের করে দেখাল। স্বরীন বলল, ‘বনমোরগ। তবে আর কি, আজ তো তাদের খুব খ্যাটন।’

ওরা কি বুঝল কে জানে। তিনজনেই হাসল। শুকুম অন্যায়সে সোমারির কৌচড়ে নিজেই নিহত বনমোরগটি ভরে দিতে দিতে গুর পীন বক্ষে হাত রাখল, নিতান্ত টাল সামলাবার জ্ঞ। আমার চোখের পাতা কঁপে যায়। কিন্তু যাদের দেখে যায়, তারা একান্তই উদাস, তারপরে শুকুম বুক থেকে হাত নামিয়ে, সোমারির কোমর জড়িয়ে ধরে বসল। সোমারি তার একটি পা ঢুকিয়ে দিল শুকুমের উরুর নিচে দিয়ে। ইতিমধ্যে দেখেছি স্বরসতিয়ার ঠোটে হাসি নাকের পাটা কাপছে। গাড়ির ঝাঁকানিতেই বোধহয় তার পাখর-উদ্ধত বুকের একাংশ রোঁদ্র মাখে। হঠাৎ সে সোমারির দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল। পরশু বিকালে জবাইকেলার দোকানপাটের সামনে কয়েকটি মেয়ের, গতকাল সামটা নাকার পরে মেয়েদের সমবেত গানের মতো একটাই স্বর। এর স্বরলিপি কী হতে পারে জানি না। যেন এক একটা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, একই পর্দায় টানা স্বরের গান। মনে হয়, মাহুঘ না, বনেরই গান শুনছি। বনের সঙ্গে মিলে যায়।

স্বরসতিয়া গেয়ে উঠতেই, সোমারি, হাসল। আমার দিকে চেয়ে দেখল। স্বরীনও হাসল মোহনবাবুর দিকে চেয়ে। মোহনবাবু ভুরু কঁচকে আছে। তবু হাসিটি সামলে রাখতে পারছেন না।

স্বরসতিয়া আবার এক কলি গান করল। আড়চোখে আমাদের দিকে দেখল। স্বরীন ছুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে উঠল। ছুই বোন খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর ছু’জনেই আবার গুনগুন করে নিজেদের ভাষায় গেয়ে উঠল।

স্বরীন হেসেও ধমকে উঠল, ‘এত্না লালচ কাহে রে? বাবু হমলোগকা মেহমান, জঙ্গল ঘুমনে আয়া।’

এবার কোঁতুহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘ব্যাপারটা কী?’

সুন্নী বলল, ‘এই যে আপনি খাচ্ছেন, আর আপনার হাতে সিগারেটের টিন রয়েছে, এই সব বলাবলি করছে।’

‘গান গেয়ে?’

‘হ্যাঁ, সুন্নীতিয়া প্রথমে গান গেয়ে বলল, অচেনা নতুন এক ইজারাধার দেখছি। তার ধূমপানের গছটি বড় মিঠে। তারপরে আবার গাইল, বাবু হাতের টিনে মনে হয় অনেক সিগারেট আছে, বাবু বেশ খানখানি। তারপরে ছুই বোনে একদিকে গেয়ে বলল, এমন মিঠা গছের সিগারেট, বাবু কি আমাদের দিতে পারে না? একলা খাওয়াতে কোনো সুখই নাই।’

আমি অধাক যত, খুশি তত। বলে উঠলাম, ‘চমৎকার! একথাগুলো ওরা গান গেয়ে বলল?’

সুন্নী বলল, ‘হ্যাঁ। ওরা ওরকমই।’

বিশেষ করে, ‘একলা খাওয়াতে কোনো সুখই নেই’ কথাটি যেন নিম্নেই আমার অতুহলিত এক নতুন দরজা খুলে দিল। সেই সঙ্গে আমার বোধেরও। এই হল বনতন্ত। একলা কোনো কিছুতেই সুখ নেই। আমি তাড়াতাড়ি আমার সিগারেটের কোঁটার ঢাকনা খুলে, আগে সুন্নীতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘নাও।’

সুন্নীতির উক্ত শরীরেও যেন এবার লজ্জার ঢল নামল। মোহনবাবু প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, ‘আরে না না, ওদের এত দামী সিগারেট কেন দিচ্ছেন। ওসবের মর্যাদা ওরা বোঝে না।’

ওদের মর্যাদাবোধের বিষয় আমার জানার দরকার নেই। আমার মিঠা সিগারেট আমি ওদের না দিয়ে আর একলা খেতে পারব না। বললাম, ‘নিক, এমন করে বলছে।’

তা ছাড়া যা-ই বল, চোখ যে ভুলেছে। মন ভুলেছে। এমন করে বলতে জানে কে? চাইতে জানে কারা? এমন ধরনটি তো আর কোথাও দেখিনি, ‘একলা খাওয়াতে কোনো সুখ নেই।’ সুন্নীতিয়া সিগারেট নিতে দ্বিধাবোধ করছে দেখে বললাম, ‘নাও।’

বোধহয় ধূলোবালি ঘেঁটেছে, ময়লা হাত বাড়িয়ে সিগারেট কোঁটা থেকে টেনে তুলল। কিন্তু একটি না, পর পর তিনটি সিগারেট টেনে তুলল। ঠিকই করেছে। ও কি একলা খাবে নাকি? তাহলে আর গানের মর্যাদা থাকল কোথায়? সোমারিকে একটি দিল, তুরমকে আর একটি। আমি বেশলাই

এগিয়ে দিলাম। গাঙ্গুলিমশাইয়ের মতো, ‘জুরাচোর’ বলবার দরকার নেই, কিন্তু এই খোলা চলন্ত গরিতে বসে, দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়ে সিগারেট ধরানো, সকলের কাজ না। স্বরসত্তিয়ারও না। পর পর কয়েকটি কাঠি নষ্ট হল।

স্বরীন বলে উঠল, ‘আ লো পোড়াকপালী, দেশলাইটাও ধরতে শিখিসনি, সিগারেট খাওয়ায় শখ!’

জেমা ওরাওঁনী যে একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। তাই স্বরীনের চোখে স্বরসত্তিয়া পোড়াকপালী। মোহনবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, ‘এই, এই, কেয়া করতা রে?’

আমি স্বরসত্তিয়ার হাত থেকে দেশলাইটি নিয়ে বাতাসের হাত থেকে শিখা বাঁচিয়ে মুখের সামনে ধরলাম। এবার জ্বালাতে সমর্থ হল। কিন্তু সিগারেটের প্রায় অর্ধেকাংশ ঠোঁটের লালায় ভিজে গিয়েছে। মুখের মধ্যে বেশ খানিকটা পুরে না দিলে যে, ধরাই হয় না। কয়েক টান দিয়ে সোমারির দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল। ওরা কর্তা-গিন্নীতে সিগারেট ধরিয়ে, স্বরসত্তিয়াকে ফিরিয়ে দিল। তিন জনে মিলে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আর তিন জনেরই কি হাসি। বিশেষ করে দুই বোনের। খুব যে উপভোগ করছে, বোঝা যায়। টানা দেখে মনে হচ্ছে, ধূমপানে তেমন একটা অভ্যস্ত না। তা বলে ইচ্ছা বলে কথা নেই? বিশেষত অমন মিঠা গন্ধ যখন নাকে লেগেছে?

স্বরসত্তিয়া আবার ওদের নিজেদের ভাষায় গুনগুনিয়ে গান করে উঠল। কয়েক লাইন পর পর। সেই একই স্বরে গাইল। শুরু বনের দিকে চেয়ে সিগারেট টেনে চলেছে। সোমারি মিটিমিটি হাসছে বোনের দিকে চেয়ে। স্বরসত্তিয়ার মুখেও হাসি। স্বরীন বলে উঠল, ‘ক্যায়ারে, ডিয়েং পিয়া? মনমে এতনা ফুঁতি কাহে?’ স্বরসত্তিয়া আর সোমারি খিলখিল করে হেসে উঠল। মোহনবাবু বললেন, ‘যা যায না, হয়তো সকালবেলায় হাঁড়িয়া গিলে মরেছে।’

স্বরীন আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘ও ছুঁড়ি গান গেয়ে কী বলছে জানেন তো? বলছে, মাহুঘটার মন বড় দরাজ। আমি চাইলে বোধহয় একটা পুরো পাহাড় দিয়ে দেবে। মাহুঘটার মন বেশ ভাল।’

অদ্ভুত গান, পুরো একটা পাহাড়ের আকাজক্ষা স্বরসত্তিয়ার। আসলে সেটাই বোধহয় এদেশের চাওরা, একটা পাহাড় পাওয়া মানে ভূমি আর বন-লক্ষদ পাওয়া। কিন্তু অবাক লাগছে, গান গেয়ে একথা বলছে কেমন করে?

ছন্দ একটা আছে বুঝতে পারি। মিল আছে কী? স্বরীনকে জিজ্ঞেস করি,
‘ও কী ভাবায় গাইছে?’

স্বরীন বলল, ‘মুণ্ডা।’

জিজ্ঞেস করি, ‘ও কি সত্যি গান বেঁধে গাইছে?’

স্বরীন বলল, ‘হ্যাঁ। ওদের কারোর কারোর মধ্যে একরকম দেখা যায়।’

অবাক লাগে। আমাদের কবিগানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। স্বভাবকবি
যাদের বলা হয়, যারা মুখে মুখে গান বাঁধে, স্বর করে গায়। এ ক্ষেত্রে তফাৎ,
স্বর একটাই।

মোহনবাবু বললেন, ‘আপনি যখন এদেলবায় আমার কাছে আসবেন, তখন
আপনাকে ওদের নাচ দেখাব, গান শোনাব।’

সেই হবে আমার বন দেখার নতুন স্ব। আমি বীরভূমের, সাঁওতাল পরগণা
প্রান্তে, মলুটি গ্রামে সাঁওতালদের নাচ দেখেছি। বনের গভীরে বনবাসীদের
নাচ কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এরা কি আপনার সঙ্গে যাচ্ছে?’

মোহনবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ, এদের দেখা আপনি আমার কাজের জায়গায়
গেলেই পাবেন। তবে দেখুন সিংজী আপনাকে কবে ছাড়ে। এখন তো
আপনি তাঁর মেহমান। উনিও অবিদ্রি নাচ-গান দেখার ব্যবস্থা করতে পারেন।’

তা পারেন, কিন্তু সেখানে তো স্বরসত্তিয়া থাকবে না। এই স্বরসত্তিয়া তার
ভাগর কালো চোখের কোণে বারে বারে আমার দিকে দেখছে। দিদির দিকে
তাকিয়ে হাসছে। যেন এই হাসির মধ্যেও, নিঃশব্দে কোনো কথা বলাবলি
হচ্ছে। স্বরসত্তিয়া কি আমাদের ওদের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করছে? উইলিয়ম কি
এমনি চোখের টানেই মুণ্ডা হয়ে গিয়েছেন? স্বরসত্তিয়া যেন এই গভীর বনের
এক উল্লাস আমার রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমরা আর একবার পাহাড়ের ওপর উঠে, আবার নেমে চলেছি। একবার
কোয়েনার জলস্রোতের ওপর দিয়ে পার হলাম। নিচে পাথরের চাঙড়া।
গাড়ি খুব আস্তে আস্তে পার হল। তারপরেই একটি উপত্যকার মতো জায়গায়
এলাম, যেখানে কিছু ঘর-বাড়ি দেখা গেল। উপত্যকাটি অনেকখানিই সমতল
মতো। কাঁকর পাথরের লাল রাস্তার মাঝখানে, ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েকটি
বাড়ি। সবই মাটির ঘর, বেশির ভাগ বাড়ির মাথা-ই খোলায় চালে ঢাকা।
কিছু বা এক জাতীয় ঘাসের, যা বাংলাদেশে দেখা যায় না। খড় না, স্কন্দরবনের
গোলপাতা না পূর্ববঙ্গের ছন বলতে যা বোঝায়, তাও না। অনেকটা কাঠির
মতো শক্ত।

গাড়ির গতি কমে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দু-একটি এখানে সেখানে খেলা করছে। সকলেই তারা উল্লস। অন্তান্ত বনবাসী মেয়ে পুরুষও দু-চারজন চোখে পড়ছে। তারা আমাদের দিকেই দেখছে। চোখে পড়ল একটি উঁচু করে পাড় বাঁধানো ইদার। কপিকল রয়েছে। কয়েকটি বনবাসিনী অঙ্গ তুলছে, মাটির কলসীতে ঢালছে। তা ঢালছে, কিন্তু কাজ খামিয়ে আগে, দু-চোখ মেলে আমাদের দেখছে। সমতলের যে-কোনো গ্রামেই বোধহয়, এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। মেয়েরা সেখানে মুখ ঢেকে দিত, অথবা ঘোমটা টেনে মুখ কিরিয়ে নিত। তাদের রীতি-নীতি যে আলাদা। পরপুরুষকে মুখ দেখাতে নেই।

আর এখানে? নারী পুরুষের তফাত কোথায়? সব কিছুতেই, তারা সমান। একসঙ্গে পান, একসঙ্গে কাজ। মুখ লুকাবার অবকাশ কোথায়? তা বলে কি সহবত নেই? বনেরও সহবৎ আছে। সেই নিষ্পাপ সরল প্রাণের সহবতটি পাবে। এমন অনায়াসে, অবাক চোখে তাকানো দেখলেই বোঝা যায়, একটি বস্ত্র কোঁতুল ছাড়া আর কিছু নেই।

ইদারটা পেরিয়ে, খানিকটা গিয়ে লরি দাঁড়াল। মোহনবাবু বললেন, ‘আপনার জায়গায় এসে গেলেন। এ জায়গার নাম নাগরা—ছোট নাগরা।’

লরিটা যেখানে দাঁড়াল, তার পাশেই একটি রক্তবর্ণ কুহুম। আমাদের গায়ে রক্তিম আভা ছড়িয়ে, সে, যেন রৌদ্র-মাখা উল্লাসে, অঙ্গ অঙ্গ তুলছে। আশে-পাশে আরো অঙ্গুল গাছ। বনের মধ্যেই, সামান্য খানিকটা জায়গা ছাটকাট করে, গুটি কয় বসত।

আগে নামল সুরীন, তারপরে মোহনবাবু। জিজ্ঞেস করলেন, ‘নামতে পারবেন তো?’

‘উঠতে যখন পেরেছি, নামতেও পারব।’

গাড়ির সামনে দিক দিয়ে নামলাম। কুহুম গাছের উটো দিকে ছুটি মাটির ঘর, টালি-ছাওয়া। মাটির নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সবই রক্তলাল। ভিতর থেকে খানিকটা পর্বস্ত্র কালো রঙ দেখে মনে হয়, আলকাতরা মাখানো। উইপোকার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিশ্চয়। মোহনবাবু বললেন, ‘সুরীন, তুমি ওর স্কটেকেলটা নামাও, গাড়ির সামনের দিকে আছে।’

এই সময়ে, মাটির বাড়ির সামনে একটি লোক এসে দাঁড়াল। তাকে বনবাসী বলে মনে হল না। মাঝবয়সী লোকটির গায়ে একটি শার্ট, পরনে ধুতি। ককমছাঁট চুলের পিছনে, শিখাটি জানিয়ে দিচ্ছে, সে বনের বাইরের

লোক। সে আগে সেলাম করল মোহনবাবুকে তারপরে আমাকে।’ মোহনবাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন, ‘রতন, ও বাবুজী সিংজী সাহাব কা মেহমান।’

রতন আমাকে আর একবার সেলাম জানিয়ে বলল, ‘সবেরে খবর মিল গয়া, উন্কো খানা ভি বনতা।’

মোহনবাবু হেসে বললেন, ‘বহোত আচ্ছা। হয় এদেলবা চলা যাতা, বাবুজীকো ঠিকসে দেখ্ জাল করো।’

রতন হাতজোড় বলে বলল, ‘কোই কম্বর না হোগা বাবুজী। সব ঠিক হো য়ায়েগা।’

স্বরীন স্ম্যটকেসটা নামিয়ে নিয়ে এল। তার হাত থেকে নিল রতন। মোহনবাবু বললেন, ‘চল তা হলে। সিংজী সাহেব আসবেন দু-এক দিনের মধ্যে।’ আমার ওখানে আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন। নিজেও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন।’

মোহনবাবু নমস্কার করে গাড়িতে উঠলেন। স্বরীনও উঠল। স্বরনতিয়াবা আমার দিকে তাকিয়েছিল। স্বরনতিয়া জিজ্ঞেস করল, ‘হমলোগকা সাখ্ নাই য়ায়েগা?’

আমি তাড়াতাড়ি সিগারেটের কোটো খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম, বললাম, ‘দু-চার রোজ বাদ য়ায়েগা।’

স্বরনতিয়া কোটোর দিকে হাত বাড়াল না। মুখে তার হাসিটি লেগে আছে, চোখের দৃষ্টি অপলক। বললাম, ‘নাও।’

স্বরনতিয়া মাথা নেড়ে বলল, ‘না।’

সোমারিও নিল না। হঠাৎ শুক্রম হাত বাড়িয়ে একটি সিগারেট ভুলে নিল।

সোমারি বলে উঠল, ‘তুম এদেলবা য়ায়েগা, তব পিয়েগা।’

গাড়ি গর্জন করে উঠল। বস্ত্র কুলিরেজাদের কাছ থেকে বিদায়পর্বকে এত মূল্য দিতে কেউ রাজী না। মোহনবাবুর গলা শোনা গেল, ‘চলি স্তার।’

গাড়ি চলে গেল। গাড়িটা পাহাড়ের ওপর উঠছে। বাকের মুখে হারিয়ে যাবার আগে, স্বরনতিয়াবা এদিকে তাকিয়ে রইল। গাড়িটাও চোখের বাইরে গেল, আর আমার কানে হাসি বেজে উঠল। পাশ কিয়ে দেখি গুটিকন্ন বনবালা মাথায় কলসী নিয়ে, আমার পাশ কাটিয়ে চলেছে। সকলের মুখই হাসি-হাসি। কিন্তু কেউ আমার দিকে তাকিয়ে নেই। তবে শব্দ করে হাসল কারা? ওরা কিছুটা গিয়ে, ডান দিকের একটি পাছতলা দিয়ে পাশ কিয়ে

দিয়ে, তিন জনেই, মাথায় কলসীলহ, পিছন কিয়ে তাকাল। তিন জনেই হালল, যে হাসির শব্দ একটু আগেই শুনেছি। তারপরে তিন জনেই, ডান দিকে বনের আড়ালে, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসি কেন? সুরমতিয়াদের বিদায় দৃশ্যের প্রতি বিজ্ঞপ নাকি? কিন্তু ওরা কি বিজ্ঞপ করতে জানে? অথবা নিতান্তই একটি হাসির স্বলক?

‘আইয়ে বাবুজী, অন্দর আইয়ে।’

রতন ডাকছে। আমি বাড়ির ভিতরে গেলাম। লেপা-পৌছা মাটির উঠোন। উঠোনের একপাশে একটি অজুর্ন গাছ। তার নিচের ছায়ায় একটি খাটিয়া পাতা রয়েছে। দুটি ঘরের কোলে, চালা-চাকা দাওয়া রয়েছে। সবই লাল, লেপা-মোছা স্বকসকে। আরো একটি ঘর রয়েছে, ছোট নিচু ঘর, মাথায় পুরানো টিনের চাল। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখে বুঝতে পারলাম, রান্নাঘর।

দাওয়ার উঠে দুটো ঘরই দেখলাম। দুটো ঘরেই খাটিয়ার বিছানা পাতা আছে। একটি ঘরের সাজসজ্জা একটু বেশি। বড় একটি আয়না, কাঠের আলমারি, জামাকাপড় রাখবার আলনা, সবই আছে। আর একটি ঘরে খাটিয়া আর চেয়ার-টেবিল। রতন কিছু না বলেই, আমার জুতা চা আর ডিম-সেদ্ধ নিয়ে এল। ডিমের জুতা না, মনটা বোধহয় অবচেতনে চা চা করছিল। খুশি হয়ে উঠলাম। হিন্দীতে বললাম, ‘ঘরে বসে খাব না, বাইরের গাছতলায় খাটিয়ায় বসব।’

রতন বলল, ‘যেখানে আপনার খুশি বাবুজী। কখন চান করবেন?’

হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, ‘এখন তো মাত্র দশটা। দেরি আছে।’

‘ঠিক আছে আমাকে বলবেন, আমি জল এনে দেব।’

অজুর্ন গাছের নিচে বসে চা আর ডিম-সেদ্ধ খাওয়া গেল। খেতে খেতে, চোখ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, নীল আকাশ আর বন। লোকজনের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। ঝিঁ-ঝিঁ-ডাকা নিরুদ্ভ, অথচ এটা একটা গ্রাম। রতন এসে খানিকক্ষণ নানান কথা বলল। জানা গেল, এখানে ঘর জমি বলতে নিজেদের কারো কিছু নেই, সবই বনবিভাগের। বনবিভাগ থেকে ঘর জমি দিয়ে এখানে লোকজন রাখা হয়েছে। সময়ে অসময়ে কাজের লোকের দরকার হয়। অনেক সময় বনে আগুন লেগে যায়। নিয়মিত বন পরিষ্কার রাখা দরকার হয়। তখন বাইরের লোকের সাহায্য নিতে গেলে চলে না।

তাহলে সিংজী কেমন করে থাকেন? সিংজী হচ্ছেন মস্ত বড় মানুষ, বন-

বিভাগ থেকে তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রামটা খুব ছোট না, বড়ই। গ্রাম তিরিশ চল্লিশ ঘর লোক আছে। ব্লক ডেভেলপমেন্টের একটি ছোটখাটো স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নাকি এখানে আছে। ডাক্তার মাঝে-মধ্যে আসে। একজন নার্স অবিশিষ্ট থাকে। আর এই যে এ সব বাড়ি, এ সব বাড়ি নাকি খুবই শক্ত। মাটির দেওয়াল বলে যেন কেউ মনে না করে ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। হাতি এসে গায়ের ধাক্কা দিলেও, হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়ে যাবে না। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হাতির উৎপাত মাঝে মাঝে হয়, যখন চাষাবাস হয়। এখন অবিশিষ্ট সবগুজার চাষ কিছু হয়েছে আশে-পাশে। গ্রামের মধ্যে না হলেও, হাতিরা গ্রামেও ঢুকে পড়ে। তখন আগুন জালানো, টিন পেটানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তবে ভয়ের কিছু নেই। দু-বছরের মধ্যে এরকম ঘটনা রতন মাত্র দু'বার দেখেছে।

রতনের গল্প শুনে শুনে, চা-পান শেষ করে, সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

রতন বলল, 'তা যান বাবুজী, তবে গ্রামের বাইরে যাবেন না, বনের মধ্যে ঢুকবেন না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ঢুকলে কী হবে?'

'না, তেমন কিছু হবে না। এ সময়ে মহুয়া ফলেছে তো। অনেক সময় ভালুকরা মহুয়ার ফল খেতে আসে।'

বনের ব্যাপার, সবই বিচিত্র। রতন হেসে বলল, 'বেচারিরা মহুয়া খেতে এসে মরে।'

'কেন?'

'মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। তখন মাল্লবের মতোই পা টলমল করে, চলতে পারে না। আর সবাই মিলে তীর-ধনুক দিয়ে, কুঠার দিয়ে কুপিয়ে মেরে কেলে।'

আহ, কী নিষ্ঠুরতা। তোমরা পান করে মাতাল হতে পার, আর সে তার বনের ফল খেয়ে একটু মজ্জা হতে পারে না? এ কি অবিচার। বললাম, 'মেরে ফেলার কী দরকার। সে তো কারোকে মারতে আসে না?'

রতন অবাক হয়ে বলল, 'মারতে আসে না? বলেন কি বাবুজী। ভালুকের হাতে পড়লে কারোর রক্ষা থাকে না। পালাতে না পারলে, ভালুক তাকে খতম করে দেবে। এই তো বছর দুয়েক আগে, একটা পোয়াতি মুণ্ডা বোঁকে মেরে কেলেছিল। ছিঁড়ে-খুঁড়ে আর কিছু রাখেনি।'

সেটাও নিষ্ঠুরতা। একটি গর্ভবতী মৃগা বা বধু নিশ্চয় ভালুক শিকার করিতে যায়নি। শুনেছি, যে পশু যত হিংস্র, প্রকৃতপক্ষে সেই পশু তত ভীরা। আক্রান্ত হবার, এবং মৃত্যুভয়, তার সব থেকে বেশি। দাঁতাল বস্ত্র বরাহ তার মধ্যে আছে। বস্ত্র বাইসন—মহিষ ষাটের বলে, অথবা কেউটে সাপ, এরা যাকে দেখে তাকেই আক্রমণ করে। কেউটে সাপ তো তার নিজের আন্দোলিত ছায়াতেও ছোবল মারে। নিরস্তর শকা, নিরস্তর নিষ্ঠুর আক্রমণের আর এক দিক। হাতি সিংহ বা বাঘ সম্পর্কে, বহুতর বিপরীত কাহিনী শোনা যায়, অথচ তারা অনেক সময়েই মানুষ-থেকে, একমাত্র হাতি ব্যতিরেকে। কিন্তু বাঘ সিংহ মানুষ খেতে চায় না, তাদের কাছে তা প্রিয় খাদ্যও না। কখনো অভাবে, অথবা লহসা ভয়ে সে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু দাঁতাল বরাহ, কেউটে, বস্ত্রমহিষ, তাদের কাছে সবাই হস্তারক, সে জন্তু তারা নিজেরা আগেই সেই ভূমিকা নিতে চায়। ভালুকের সম্পর্কেও কোনো মহৎ কাহিনী শুনেছি বলে মনে করতে পারি না।

আসলে বনের রাজ্যে, মানুষের আধিপত্য তারা ভালবাসে না। মানুষকে বিশ্বাস করার কারণও, তাদের প্রবৃত্তিবোধ থেকে কখনো ঘটেনি। অভিজ্ঞতা তো সৃষ্টি করে না।

নিরস্তর শকা, নিরস্তর নিষ্ঠুর আক্রমণের জন্তু প্রস্তুত, সে কি কেবল বস্ত্র পশুদের মধ্যেই? সমাজে সংসারে এমন মানুষ কি নেই? তাদের সংখ্যাও বোধহয় কম নেই। কিন্তু থাক, সে মানুষেরা থাক, আমি বন দেখি, বনে চলি, আমি এসেছি তার ডাকে। পশু বলতে পারি, কিন্তু বন তাদের আশ্রয়। জীবনের এটাও তো অভিজ্ঞতা, বন কেবল চোখ তুলিয়ে, মন ভাসিয়ে, অহুভূতির মধ্যে এক অনির্বচনীয় গভীর অনিন্দ্যবোধের সৃষ্টি করে না। মৃত্যু তার ফাঁদ পেতে বসে আছে নানাধানে। ওহে, বনবিলাসী বনপ্রেমিক হয়ো, মন রেখো মনে মনে। সেই গানের মতো, ‘কিছুদিন মনে মনে যত্ন করে, জ্বামের পীড়িত রাখ গোপনে।’ তেমনি গোপনে একটু মন সজাগ রেখো। রতনকে বললাম, ‘ঘা, শোনালে, তারপরে আর জঙ্গলে একজা ঢুকতে সাহস পাব না।’

রতন বলল, ‘জঙ্গলে অনেকেই ঢোকে বাবুজী, তারা জঙ্গলের ঘাঁত-ঘোঁত জানে। আপনি তো নয়! মানুষ তাই বলছি।’

বললাম, ‘ঠিক আছে।’

বাইরে বেরিয়ে ভাবলাম, কোন দিকে যাই। ভাইনে না বায়ে? বা দিকের পথ ধরে এসেছিলাম। ডান দিকের পথের বাঁকে চলে গেছেন মোহন-

বাবুয়া। যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম, সে পথেই এগোলাম। মনে পড়ল, 'ওদিকে কোয়েনা নদী নির্ঝর পেরিয়ে এসেছি। লরিতে এসেছি, কতটা দূরে ফেলে এসেছি, বুঝতে পারছি না।

যেতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে কুসুম। এখন হোদ আরো চড়েছে, কুসুমের রক্তশিখা আরো যেন জলে উঠেছে। লাল মাটিতে, আমার গায়ে, সবখানে তার রক্তাভ ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে গেলাম। বাধানো ইদারার সিঁড়িতে একটি বনবালা চূপ করে বসে আছে। পায়ে কাছের তার কলসী। চূপ করে গালে হাত দিয়ে সে বসে আছে। বন কি তাদের কারো শরীরেই, অমুক্ত শীর্ণতা দেয়নি? দেখে শুনে আমার তো যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে। তিপু আমাকে কিচরি কাকে বলে শিখিয়ে দিয়েছিল। বনের তাঁতীদের নিজেদের হাতে বোনা এক রকম মোটা কাপড়, হালকা লাল তার পাড়। বনবালাটি সেরকম একটি শাড়ি কোনোরকমে কোমরে বুকে জড়িয়ে চূপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। পাশে একটি বড় শালগাছ। তার শাদা শাদা ছোট ছোট ফুল মাঝে মাঝে করে পড়ছে।

এত কী ভাবনা বনবাসিনীর? বরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে? হাড়িতে চাল নেই? নাকি, এখনো অনুচ্চা? মনের মাহুঘটি দূরে কোথাও গিয়েছে? হাসি পেলে আমার। এমন করে বসে থাকার কত কারণ থাকতে পারে। এখানকার জীবন মনের কতটুকু সমস্তা আমি জানি।

আরো এগিয়ে গেলাম। কয়েকটি বনবাসী পুরুষ মুখোমুখি বসে, রাস্তার ধারে কথা বলছে। দুটো গরু খুঁটিতে বাঁধা। গোটা কয় ছাগল চরছে। পোষা মুরগীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বনবাসীরা সকলেই খালি গা, কোমরে সামান্য একটি কাপড়ের ফালি, সামনেটা ঢাকা। লজ্জা নিবারণ তাতেই যথেষ্ট তারা আমার দিকে অপরিচিত কৌতূহলে তাকিয়ে দেখল। একজন আবার একটু হেসে কপালে হাত ঠেকাল। কেন জানি না, আমিও তাই করলাম।

দু-পাশেই, ছোট ছোট মাটির ঘর। গায়ে গায়ে লাগোয়া না, ছাড়া ছাড়া। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। গাছ না কেটে, যতটুকু সম্ভব, বসত ঘর করা হয়েছে। সব ঘর একরকম না। কয়েকটি আছে, সিংজী সাহেবের বাড়ির মতো। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একাধিক ঘর। যত ঘর, গাছ তার থেকে বেশি। চলেছি যেন ছায়ায়। এক বয়স্ক বনবাসিনী, একটি ঘাসে বোনা মাহুঘের ওপর কী যেন চেলে চেলে দিচ্ছে। ভাল করে চেয়ে দেখি, মহুয়া। মহুয়া শুকোচ্ছে। আর এক জায়গায় দেখলাম, এক বনবালা কাঠের বড় খোলে,

কী যেন ঘবছে। কোঁতুহল হল। এগিরে গেলাম। মেরেটি অবাক চোখে একবার আমার দিকে দেখল। তারপরে হঠাৎ একটু হেসে, আবার নিজের মনে কাজ করতে লাগল। কিন্তু হাসিটি যে মুখে কেবল লেগে রইল, তা না, হাসিটি একটু বেশি উদগত হয়ে পড়ায়, কিচরির আঁচলটি মুখে চাপা দিল। আমি দেখলাম, সে যেন কী গুঁড়ো করছে, যার বড় অনেকটা শুকনো পাতার মতো। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

আমি জানি না, সে আমার বাংলা কথা বুঝতে পারল কী না, কিংবা আন্দাজেই জবাব দিল, 'ভরগো কুকড়ি।' বলেই হাসি।

ভরগো কুকড়ি। এমন জিনিসের নাম কেউ কখনো শুনেছে? বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'জিনিসটা কী?'

বনবালাটি এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বয়স বোধহয় বিশ-বাইশ হবে। মাথার রুক্ষ চুল খোলা পিঠে ছড়ানো। দু-হাতে কাঁসার দুটি বালা। আর কোনো অলঙ্কার নেই। বোঁচা বোঁচা নাক, ভাঙ্গা ভাঙ্গা চোখ। তারপরে হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে হাতে একটি ব্যাঙের ছাতা নিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, 'এ ভরগো কুকড়ি না?'

যেন আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি, এভাবে কথাটা বলল। ব্যাঙের ছাতাকে যে ওরা ভরগো কুকড়ি বলে, সেটা জানা গেল। কিন্তু ওর কাঠের খোলের বস্তুর সঙ্গে, এর যোগাযোগটা কি বুঝতে পারছি না। খোলের বস্তু তো প্রায় ছাতুর মতো দেখতে। আমি বাংলাতেই আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার খোলের মধ্যে ওগুলো কি ভরগো কুকড়ি?'

বনবালা ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া?'

আমি খোলের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'ও ভি ভরগো কুকড়ি হার?'

বনবালা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হাঁ, উসকে শুকায়, আঁভি গুঁড়ো করত। ঘরমে রাখ দেগা।'

'উসকে বাদ?'

'ওতু পাকায়গা, ঝায়গা।'

বলেই হেসে উঠল। যেন এমন নির্বোধ সে আর কখনো দেখেনি। ওতু? সেটা আবার কি। ছাতু নাকি? যেরকম ব্যাঙের ছাতা চূর্ণ করছে, যা জীবনে কোনোদিন দেখিনি, সেই রকমই মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওতু ক্যায়, ছাতু হার?'

বনবালাটির গায়ে যেন কেউ কাতুকুতু দিয়েছে, এমনভাবে হেসে উঠে সে

তার খোলের ওপরেই প্রায় গড়িয়ে পড়ল। আমি বোকার মতো ওর হাসি উজ্জলতা দেখছি। হাসবার মতো এমন কি বলেছি, বুঝতে পারছি না। বললাম, ‘হাসতা কীহে?’

তখনো ওর হাসি ধামল না। কথক্িৎ সামলবার পরে হাসি-আরক্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওতু কীহে ছাতু হোগা? তুমলোগ্ ভাজি নাই বানাতা? তরকারি তরকারি। ওইসা পাকায়গা।’

বুঝহ ব্যাপার। ওতু মানে তরকারি। হায়রে ভাষা, কাদের মুখে যে তুমি কী রূপে বাজো, তা কেউ বলতে পারে না। এতক্ষণে অহুমান করলাম, ব্যাঙের ছাতা শুকিয়ে গুঁড়িয়ে তুলে রেখে দেবে। অভাবের সময় রান্না করে খাবে। যেমন আমাদের বড়ি, পোস্ত, শুকনো ফুলকপি, শুকনো আর নোনা মাছ, দুর্দিনের খাত। বিশেষত বর্ষার দিনের। আমি ঘাড় নেড়ে বোঝালাম, বুঝেছি। আমি যাবার অজ্ঞ পা বাড়লাম। বনবালা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমকো ঘর কই?’

বললাম, ‘কলকাতা।’

এবার তার চোখে একটি বিন্ময়ের ঝলক লাগল। আমার ধুতিপাঞ্জাবি পরা শরীরকে আপাদ-মস্তক দেখল।

তারপরে জিজ্ঞেস করল, ‘জঙ্গলকা ইজারা লিয়া?’

বললাম, ‘নহি। এ্যায়সা দেখনে ঘুমনে আয়া।’

‘ইধার কিসকা ঘরমে আয়া?’

‘সিংলী সাহাবকা ঘর।’

সে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আন্তে আন্তে ঘাড় নাড়ল। তার অভিব্যক্তি সঠিক বুঝতে পারলাম না। সে যেন একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আমার এমন অনায়াসে কথা বলল, কোথাও একটু সঙ্কোচ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমকো নাম ক্যায়া?’

বলল, ‘মিচো।’

বনবালার নাম মিচো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘মুণ্ডা?’

‘ই।’ সে ঘাড় ঝাঁকাল। আমি ঘাড় হেলিয়ে বিদায় নিলাম। খানিকটা এগিয়ে দেখলাম, চাষের জমি। লাল মাটিতে কিসের যেন চাষ করেছে। কচি কচি চারা দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাস্তাটা ক্রমেই ডান দিকে ঘুরে, নিচে নেমে চলেছে। তারপরেই আমার কানে বাজল কুল্কুল শব্দ। নামতে নামতে, এক জায়গায় দেখলাম, কোয়েনা নিষ্কর। ডাইনের দিকে বহে চলেছে। তার ফটিকবচ্ছ জলস্রোতের নিচে, মাকড়া পাখির দেখা যায়। বড় বড় পাখরের

টকরো অনেক। দু-পাশে ঘন বন, নিচে কোথাও সূর্যের আলো পড়েনি। ছায়া নিবিড়, অন্ধকার যেন। ঝিঁঝি ডাকছে বিচিত্র নানা স্বরে। একটানা ঝিঁঝি ডাকার সঙ্গে, অত্যন্ত স্বর যেন কর্কশ ভিন্ন তালে তাল দিয়ে বাজছে। কয়েক জোড়া ঘুঘু এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন আর লতাগুল্মের একটা বিচিত্র গন্ধ। ইচ্ছা করলেই নিকর নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়া যায়। পারের শ্রাওলটা খুলতে হবে। রাস্তাটা ওপারে গিয়ে, আবার চড়াইতে উঠেছে। ইচ্ছাকে দমন করতে পারলাম না। পারের শ্রাওল খুলে কোয়েনার জলে পা ডুবিয়ে, পাথরের ওপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। খানিকটা উঠে, মনে হল, বন আবার একটু অনিবিড় হয়ে এল। তারপরেই দেখি, সামনে অনেকখানি খোলা মাঠের মতো। প্রায় সমতল। মাঠের ডান দিকে আবার বনের সীমা। কিন্তু অবাঁক লাগছে, বনের সীমার কাছেই, মাঠের উপরে যেন একটা মন্দির মতো রয়েছে। সাদা রঙের পাকা ঘর, আসবেসটস দিয়ে, মন্দিরের চূড়ার মতো মাথা ঢাকা। একটা ত্রিশূল তার মাথায় গৌড়া।

পায়ে পায়ে সෙদিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরটার সামনে গিয়ে দেখলাম, কিছুই নেই, মাঝখানে একটি বেদী ছাড়া। কোনো বিগ্রহ নেই। শানের মেঝের ধুলো পড়েছে। বুঝতে পারলাম না কিছুই। ভিতরে মুখ বাড়িয়ে উকি দিলাম। কিছুই নেই। ফিরে বনের দিকে তাকাতে গিয়ে থমকে গেলাম। বলতে গেলে, প্রায় একটি অবিখ্যাত দৃশ্য আমার সামনে। একটি বাইশ-তেরিশ বছরের মেয়ে। ফরসা রঙ, খানিকটা মাজা মাজা বলা যায়। চোখ দুটি ভাসা ভাসা, কালো ভাগর। মুখখানি স্নিগ্ধ। একটি লালপাড় মিলের পাতলা শাড়ি, কুঁচিরে ফেরত দিয়ে পরা। যাকে বলে নাগারিকা পরিধান। গায়ের জামাটি লাল। কাঁধে একটি কাপড়ের ব্যাগ। হাতে ঘড়ি। কানে দুটি সাদা পাথরের ফুল। পায়ে স্নিগার। মুখে একটু ধুলো লেগেছে। চুলে বিহুনি বাঁধা।

অবিখ্যাত এইজন্য মনে হল, এরকম একটি মেয়েকে, একা এই বনের নিগলার দেখতে পাব, ভাবতেই পারিনি। মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু কৌতূহলে। বাঙালী কি অবাঙালী, কিছুই বুঝতে পারছি না। এরকমের পোশাকের মেয়ে, ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু এমন নিবিড় বনে দেখা যায় কী না, আমি জানি না। মেয়েটি নিজেই জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি বাঙালী?’

এই গভীর বনের হাতার, মাঠের রোদে দাঁড়িয়ে, বাংলা কথা কয়টি বেন

সেই উক্তি মনে করিয়ে দিল, ‘পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?’ আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘হ্যাঁ। আপনিও তো তাই দেখছি।’

মেয়েটি হেসে বলল, ‘হ্যাঁ। এভাবে একজন বাঙালীকে দেখতে পার ভাবিনি। কোথায় এসেছেন আপনি?’

বললাম, ‘আপাতত এখানেই, এই ছোট নাগরায়।’

মেয়েটি এবার কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, ‘বেড়াতে এসেছেন নাকি, না কোনো কাজে?’

বললাম, ‘না, নিতান্ত বেড়াতেই।’

মেয়েটি বলল, ‘এখানে বাঙালী ঘরা আসে, তারা তো কাজেই আসে। নিশ্চয় সিংছীর বাড়িতে উঠেছেন।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী করে বুঝলেন?’

‘তাছাড়া আর ওঠবার জায়গা কোথায়? আর তো সবই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ঘর। দু-একটা অবিভক্তি ব্লক ডেভেলপমেন্টেরও আছে।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন?’

মেয়েটি যেন একটু ক্লান্ত আর স্নান মুখে হাসল। বলল, ‘না। আমি এখানে চাকরি করি।’

‘চাকরি?’

আমার অবাক হওয়া দেখে, মেয়েটি শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ। কেন, করতে পারি না?’

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ‘নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু এরকম গভীর বনে, চাকরি করেন একটি বাঙালী মেয়ে, এ আমি যেন ভাবতেই পারছি না।’

মেয়েটি বলল, ‘দায়ে পড়লে, মানুষকে কী না করতে হয় বলুন। সবখানেই যেতে হয়।’

অকপটে বললাম, ‘বাঙালী মেয়েদের প্রতি, আপনি আমার প্রকাবে অনেকখানি বাড়িয়ে তুললেন।’

মেয়েটি চোখে একটু ঝিলিক দিয়ে বলল, ‘কেন, বাঙালী মেয়েদের প্রতি আপনার প্রজ্ঞা ছিল না নাকি?’

‘নিশ্চয়ই ছিল। আপনি তা আরো বাড়িয়ে দিলেন। আর কে থাকেন আপনার সঙ্গে?’

‘কেউ-ই না। আমি একলা।’

ওর লাঙ্গা সিঁথির দিকে আমার আগেই লক্ষ্য পড়েছিল। ক্রমাগত অবাকই হতে লাগলাম। বললাম, ‘একেবারেই একা?’

মেয়েটি হেসে ফেলল। মিষ্টি হাসি, একটু গজদাঁতের লক্ষণ আছে। বলল, ‘একটি মুণ্ডা মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে, কাজকর্ম করে, খায় দায়।’

‘কী কাজ করেন?’

মেয়েটি হতাশভাবে বলল, ‘সে আর বলবেন না। রক ডেভেলপমেন্টের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে এখানে। আমি তার নার্স। কিন্তু না আসেন কোনো ডাক্তার, না আছে ওষুধপত্র। লোক দেখানো, আমি একজন এখানে পড়ে আছি।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সেকি, চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, অথচ ডাক্তার ওষুধ কিছুই নেই?’

মেয়েটি বলল, ‘খাতায় পত্রে হয়তো আছে। মাসে দু’মাসে, ডাক্তার একবার এসে ঘুরে যান।’

বললাম, ‘তবে আপনিও তো খাতা-পত্রেই থাকতে পারেন।’

মেয়েটি হেসে বলল, ‘হয়তো পারতাম, তেমন খুঁটির জোর নেই যে।’

এরকম সহজ কথায়, আমিও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে বললাম, ‘তা ঠিক বলেছেন।’

মেয়েটি আবার বলল, ‘কী মনে করবেন জানি না, বাঙালী হয়ে হয়েছে আরো বিপদ। তা না হলে হয়তো অল্প কোথাও ট্রান্সফার নিতে পারতাম। তাও দেয় না। অনেকবার বলেছি। অথচ আমার এখানে বিশেষ কিছু করবারও নেই। প্রথমত ওষুধপত্র সেরকম কিছু নেই। এখানকার লোকেরাও ওষুধ-বিষুধ খেতে চায় না। ইনজেকশন তো বাঘ। জ্বর জ্বালা হলে, একটু মিকশচার দিই। ম্যালেরিয়ার তেমন উপদ্রব এ জঙ্গলে নেই। সিজুনাল কিতারই বেশি। এই যেমন ধরুন এখন, ‘এই সিজনে এখন অনেকেই জ্বরে ভোগে।’

বললাম, ‘কেন, এখন তো ঠিক চেঞ্জের সময় না। মোটামুটি ঠাণ্ডাই আছে।’

‘তা আছে। কিন্তু এই যে শাল ফুল ফুটেছে। আর এত ফুল, তার একটা রিঅ্যাকশন হয়। শরীরে উত্তাপ বাড়ে। রীতিমতো একশো দুই তিন জ্বর উঠে যায়।’

আমার যেন বিশ্বয়ের আর সীমা থাকে না। জিজ্ঞেস করি, ‘জড়ুত বললেন, ফুলজ্বর নাকি?’

মেয়েটি হেসে বলল, ‘তা বলতে পারেন, একরকম ফুলজরই। কিন্তু আমাদের শুধু খেতে চায় না। ওদের গুণিয়ারা একরকম শুধু তৈরি করে দেয়, গাছের পাতার রস, লেঙ্ক করে খায়। গাছের নাম দিম্জাটি সিম্জানি।’

‘আপনি গাছের নামও জানেন দেখছি।’

‘ওদের সঙ্গে মিশে মিশে জেনেছি।’

‘কতদিন আছেন এখানে?’

‘তা দু’বছর হয়ে গেল। আমাকে দিয়ে এখন একটা কাজই হয়। প্রস্তুতিদের একটু দেখাশোনা করি। প্রসবের সময় কাছে থাকি, এই পর্যন্ত।’

‘মাইনে নেন কী ভাবে?’

‘মাসে একদিন বড় জামদার গিয়ে মাইনেটা নিয়ে আসি। সারা মাসের চাল ডাল আটা তেল কেরোসিন তখনই নিয়ে আসি। মাসে একটি দিন, জঙ্গলের বাইরে যাই। তাও সরকারী গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। ইজারাদারদের গাড়িতেই যাওয়া-আসা করি। সকলেই একটু দয়া-ধর্ম করে। চেনাশোনাও হয়ে গিয়েছে অনেকের সঙ্গে। মুশকিল হয় বর্ষাকালে। তখন তো গাড়ি প্রায় চলেই না। একমাত্র জীপগাড়ি ছাড়া। বনের কাজকর্মও তখন বন্ধ থাকে।’

বলেই মেয়েটি লজ্জিত হয়ে হাসল। বলল, ‘পরিচয় না হতেই আপনাকে কত কী বলে ফেললাম।’

বললাম, ‘তাতে কী হয়েছে, আমার জীবনে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা।’

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি সিংজী সাহেবের গাড়িতে এসেছেন?’

বললাম, ‘না, মোহনবাবু—জরাইকেলার—’

‘বুঝেছি বুঝেছি, মোহনবাবুকে ভালই চিনি। আপনি তা হলে জরাইকেলা থেকে এসেছেন। বাড়ি কোথায় আপনার?’

বললাম। তারপরেই জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না।’

নাম বললাম। মেয়েটি ভ্রূহুটি অবাক জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাল।

জিজ্ঞেস করল, ‘মানে—আপনি—আপনি কি সেই লেখক?’

হেসে বললাম, ‘এই বনে এসে, সে পশ্চিমচরটা দিতে বা শুনতে এখন মন চাইছে না।’

মেয়েটি বলল, ‘কী আশ্চর্য! আমি যে আপনার একজন পাঠিকা। কী আশ্চর্য, আপনি ছোট নাগরায়! আমার ভীষণ ভাল লাগছে।’

দেখলাম সেই ভাল লাগাটা ওর চোখে-মুখে বলক দিচ্ছে। ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল, 'তৃপ্তি ভৌমিক।'

বলেই আবার বলল, 'তুনেছি, এ জঙ্গলে বিভূতিভূষণ ঘুরেছেন।'

বললাম, 'জানি।'

'তারপরে বোধহয় আপনি এলেন।'

'সেটা বলা যায় না। হয়তো অনেকেই ঘুরে গেছেন।'

এই তো বড় গোলমাল, মনে মনে বুঝতে পারছি, পরিচয় পাওয়ার পরে, তৃপ্তির সংকোচ আর লজ্জাটা যেন বেড়ে গেল। একতৃণ ও জানত, একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলছে। যদিও মূলে ব্যাপারটা তা-ই। অসাধারণত্বের কোনো দাবি তো আমার নেই-ই। বরং ভয় পাই, লজ্জা বোধ করি সময়ে দিকারও দিই। তৃপ্তি বলল, 'ছোট নাগরায় এসেছেন, নাগরায় দেখেছেন?'

'সেটা কী?'

তৃপ্তি সামনের জঙ্গলের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'আহ্ন, আপনাকে দেখাই।'

বলে ও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। বেশ ঘন আর ঝাড়ালো বন। গাছগুলোকে চিনতে পারছি না, কিন্তু ছোট ছোট অল্পশ ফল ফলেছে। গাছগুলো খুব উচুও না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কী গাছ?'

'বুনো জাম বলতে পারেন। কেউ বিশেষ ঝায় না। তবে খেয়ে দেখেছি, অবিকল জামের মতোই। স্বাদে, রঙেও।'

বললাম, 'বিষ-টিষ না তো?'

তৃপ্তি তখন উচুতে উঠছে। বলল, 'তা হলে তো খেয়ে মরেই যেতাম। সব জালা জুড়িয়ে যেত।'

হাসতে হাসতে বলল। মনে হল, হাসির অন্তরালে, একটা বিষন্ন স্তব্ধ বাজছে। সত্যিকারের জালা না থাকলে, এমন করে বোধহয় কেউ বলতে পারে না। ও আবার বলল, 'বিষফল কী আছে এ জঙ্গলে জানি না। তবে একরকম পোকা আছে, আমি কখনো দেখিনি, কামড়ালে সারা শরীর ফুলে যায়, তাতে অনেক লোক মরেও যায়। নিজের চোখেই মরতে দেখেছি।'

রীতিমতো উদ্ভিন্ন হয়ে বললাম, 'বলেন কী। তবু পেয়ে যাচ্ছি যে।'

তৃপ্তি হেসে উঠে বলল, 'আপনি বুঝি ভেবেছেন, জঙ্গলে গাছ আর ফলই আছে?'

‘তা ভাবিনি। কিন্তু এমন মাহুষ-মারা পোকার কথা কখনো শুনিনি।’

‘জীবন-মরণের খেলা তো সবখানেই আছে।’

তৃপ্তি বলল, খুব সাধারণভাবে। আমার কানে বাজল অসাধারণ রূপে।

এবার চালুতে নামতে নামতে তৃপ্তি বলল, ‘সাধবানে নামবেন।’

পাখর কাকরের উৎরাই নেমে গিয়ে, বন গভীর হয়ে উঠল। ঝিঁঝির ডাক কানের পর্দা কাটিয়ে দেয়। বললাম, ‘এমন জোর ঝিঁঝির ডাক কোথাও শুনিনি।’

তৃপ্তির পিছনটাই দেখতে পাচ্ছি। অস্বীকার করার উপায় নেই, বনে থেকে, ওর স্বাস্থ্যটিও যেন বনবালাদের মতো টলটলে, গতিটিও উচ্ছল। মুখ না কিরিয়েই বলল, ‘এখানকার লোকেরা বলে, ঝিঁঝি ডাকে না কাঁদে।’

‘কাদে?’

‘হ্যাঁ। রায়তানা শব্দের মানে হল, কান্না।’

ঝিঁঝির ডাক যেন নতুন স্বরে আমার কানে বেজে উঠল। এ কি সত্যি কান্না? নিরন্তর আর্ত কান্না! বনবাসীদের চিন্তা ধ্যান ধারণা বেশবাস, সবই অগ্ররকম। আমাদের ঝিল্লিশ্বর, তাদের কাছে কান্না। তবে, ‘ঝিল্লিশ্বর কাঁদায় রে নিশার গগন,’ এমন পঙ্ক্তি যেন পড়েছি। আর বিজ্ঞান জানিয়েছে, পতঙ্গকুলের এ ডাকাডাকি কেবল প্রেম-কুহর। যেমন জোনাকির আলো কেবল মিলনের ইশারা, ডাঙ্ক-ডাঙ্কির ডাক কেবল বিরহের কান্না।

‘ওই দেখুন।’

তৃপ্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একেবারে নিবিড় বনের ঠাঁও ছায়ায়। সামনেই থানিকটা খোলা জায়গা, দুর্বাঘাসে ছাওয়া। সেখানে উপুড় করা রয়েছে ছুটি লোহার, বিরাট নাকাড়া। একটি একটু ছোট, আর একটি তার চেয়ে অনেক বড়। গায়ে বড় বড় লোহার গজাল গাঁথা। ওপরের দিকটা দেখলেই বোঝা যায়, চিত করে বসানো যায়। আমি বললাম, ‘এ তো নাকাড়ার মতো দেখাচ্ছে।’

তৃপ্তি বলল, ‘তাই তো, নাকাড়া মানেই নাগরা, এখানকার লোকেরা বলে।’

‘এর নিচে কি চামড়া আছে?’

‘মনে হয় না। এখানকার লোকদের বিশ্বাস, উৎসবের সময়, আপনার থেকেই এ নাকাড়া বেজে ওঠে। কিন্তু দু-বছরের মধ্যে আমি কখনো শুনিনি।’

আমি সামনে এগোবার জন্ত পা বাড়াতেই, তৃপ্তি আমার হাত ধরে ফেলল, ‘এখান থেকেই দেখুন না, সামনে বাবার কী দরকার আছে।’

আমি খেমে গেলাম। তৃপ্তি একটু লজ্জা পেয়ে, আমার হাত ছেড়ে দিল। বলল, ‘ভয় লাগে। ওরা বলে, একটা অজগর নাকি এই নাকাড়া দুটো পাহারা দেয়। সত্যি মিথ্যা জানি না, কিন্তু ভয় লাগে সত্যি।’

তৃপ্তির কথা শুনে ভয় যে আরো না লাগছে, তা অস্বীকার করব না। আমার একটু স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছা করছিল। সে ইচ্ছা দমন করে বললাম, ‘এ যদি ছোট নাগরা হয়, বড় নাগরা কোথায়?’

তৃপ্তি বলল, ‘বড় নাগরা বলে কোনো জায়গা আছে বলে শুনি নি।’

তবে মাহাবুরু বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে বড় বড় পাথরের এবড়ো-খেবড়ো থাম এখনো দেখা যায়। সেখানে এরকম আরো কয়েকটি নাকাড়া আছে। মৃগুরা বলে, সেখানে নাকি ওদের রাজার বাড়ি ছিল।’

আমি যেন চোখের সামনে কল্পনায় দেখতে পেলাম, অমস্বপ্ন পাথরের থামে মশালের আলো জ্বলছে। রাজবাড়িতে উৎসব হচ্ছে, বনের রাজার আরণ্যক উৎসব। এই রকম বড় বড় নাকাড়া বাজাচ্ছে, খালি-গা পেশিবহুল বলিষ্ঠ পুরুষ। যার গভীর শব্দ পাহাড়ে জ্বলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তৃপ্তির গলা শুনে পেলাম, ‘কী ভাবছেন?’

চমকে উঠে শব্দ করলাম, ‘জ্যা?’

তৃপ্তি বলল, ‘বিশেষ কিছু বোধহয় ভাবছিলেন, বাধা দিলাম।’

বললাম, ‘না না, সেরকম কিছু না।’

কিন্তু এই কল্পনার পরেই, বনের গভীরে, আমার পাশে তৃপ্তিকে দেখেও যেন, আমার মন কোন্ এক দূর স্বপ্নের জগতে চলে যায়। সহসাই যেন একটি মুগ্ধতা আমার চোখে নেমে আসে। না না, জীবনের কোনো বাস্তবতাই ছকে বাঁধা হয় না। তা না হলে বিহার সরকারের রক ডেভেলপমেন্টের একটি নার্স, বনের গভীরে আমার পাশে দাঁড়িয়ে কেন? আমার সামনে কোন্ এক আত্মিকালের লৌহ-নাকাড়া পড়ে আছে উপড় হয়ে। লোকের বিশ্বাস, এক অজগর এই নাকাড়াঘর পাহারা দেয়।

‘যাবেন এখন?’

আবার সংবিলম্বি করে পেয়ে, তৃপ্তির দিকে চেয়ে দেখি ওর ধূলামাথা স্নিগ্ধ মুখের ওপর যেন রক্তকুসুমের আভা পড়েছে। ওর দৃষ্টি নত। হয়তো আনমনে অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়েছিলাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম, ‘হ্যাঁ, চলুন যাই।’

বন থেকে বেরিয়ে এসে, মাঠের পথ পেরিয়ে আবার আমরা কোয়েনার

উৎরাইতে এসে পড়লাম। বন বিরে এল ছুটিক থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনাদের বাড়ি কোথায়?’

তৃপ্তি বলল, ‘তুনেছি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। আমার জন্ম দমদমে। আমার মা আর ভাইবোনরা দমদমেই থাকে।’

তারপরে আর জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না, ওর বাবা কোথায়। বোকাই যায়, পিতৃহীনা। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি সকলের থেকে বড়?’

‘না, এক দিদি আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।’

আর তৃপ্তি এই গভীর জঙ্গল থেকে, দমদমের জীবনশ্রোতকে বহমান রাখছে। মনটা ভার না হয়ে যায় না। ছ’জনেই হাতে শ্রাওল নিয়ে, কোয়েনা পায় হয়ে যাই। তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল, ‘এখানে ক’দিন থাকবেন?’

‘বোধহয় দু-দিন। তারপরে এদেলবায়, মোহনবাবুর কাছে।’

তৃপ্তি বলল, ‘সেখানে আপনার বেশি ভালো লাগবে। সেখানে এই রকম নদীর ধারে, পাতার ঘরে থাকবেন। অনেক মন্থর দেখতে পাবেন। সম্বরও চোখে পড়তে পারে।’

‘আপনি সেখানে গেছেন বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’

চলতে চলতে তৃপ্তি দাঁড়াল। সামনে একটি মাটির বাড়ি, অনেকটা সিংজীর বাড়ির মতোই। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে ছোট ছোট দুটি ঘর দেখা যায়। দু-তিনটি গাছ বাড়িটাকে ঘিরে আছে। তৃপ্তি বলল, ‘এ বাড়িতে আমি থাকি। আসুন না, পাঁচ মিনিট বসে যাবেন।’

আপত্তির কোনো কারণ দেখি না। এই দূর বনের গভীরে, তৃপ্তি তৌমিক নামে এক তরুণী সেবিকার গৃহস্থালি দেখতে কেমন একটা কোঁতুহল হচ্ছে। বললাম, ‘আপনার অনুবিধা না হলে যাব।’

তৃপ্তি বলল, ‘আমার সৌভাগ্য।’

বলে একরকম ছুটেই বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ডাকলো, ‘করো, এই করো।’

করো। আর একটি নতুন নাম শোনা হল। আমি দরজা দিয়ে বাড়ির উঠানে ঢুকলাম। ঝকঝকে বটেই, কিছু শুকনো পাতা এখানে ওখানে ছড়ানো। একপাশে লাউমাচা, এবং এই ফাস্তনেও কয়েকটি কচি লাউ ঝুলছে। তৃপ্তি ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। ব্যাগটা ঘরে রেখে এসে বলল, ‘বাইরে বসবেন, না ঘরে?’

বললাম, ‘বাইরেই বসি।’

তৃপ্তি বলল, ‘করো, খাটিয়া বের করে দে।’

বাংলাতেই বলল। কয়লা নামে চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে খাটিয়া এনে পেতে দিল। গ্রাম্য বাংলায় যেমন ছেউটি মেয়ে বলে, কয়লা অনেকটা সেইরকম। মেয়েটির চোখ-মুখও বেশ ধারালো। আমার দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল। তৃপ্তি বলল, ‘একটু চা খান।’

বললাম, ‘ধাক না, আপনি এত ঘুরে-টুরে এলেন।’

‘আমি চা করব না, কয়লা করবে। ও করতে পারে।’

বলে কয়লার দিকে চেয়ে বলল, ‘কী রে। তুই যে ইঁ করে বাবুকেই দেখছিল। একটু চা কর।’

কয়লা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে দৌড়ে চলে গেল। আমি খাটিয়ার বসে বললাম, ‘আপনি বসুন।’

তৃপ্তি খাটিয়ার এক পাশে বসল। ও আমাকে বনের কথাই বেশি শোনাল। বৃক্ক মানে পাহাড়, শারঙ্গ মানে শালগাছ। আরো অনেক কথার মানে বলে দিল। গাছ, ফল, পাখি, পশু এবং বনবাসীদের আরাধ্য বোড়াদের কথা। এদের নাকি দেবতা দেবী বলে কিছু নেই, সবই অপদেবতা, অপদেবী। তাদেরই পূজা দিয়ে ওরা সন্তুষ্ট করে। সবই বোড়া। অনেক রকমের বোড়া আছে। বিবিধ কারণে তাদের পূজা দিতে হয়। ঘা-পাঁচড়া এখানে সংক্রামক ব্যাধি রূপে দেখা যায়। তখন এক বোড়ার পূজা হয়। গাছ কাটার সময় আর এক বোড়া। বিয়ের সময় ভিন্নভিন্ন। কেবল সাতবহিনী নামে পরীরা আছে, তারাও অবিশ্রি অপদেবী। তাদের কাজ হচ্ছে, যুবক যুবতীদের মাথা ধারাপ করে দেওয়া। তখন তারা হাসে কঁাদে। তাদের ভুলিয়ে নিয়ে বনের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপর মেয়ে কেলে।

আমি তৃপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলাম, সে এসব বিশ্বাস করে কী না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘সত্যি নাকি?’

তৃপ্তি একটু হেসে বলল, ‘আসলে ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লেই এসব হয়। মেয়েদেরই সাতবহিনী বেশি ধরে। এমনিতেই কেউ বেশি হাসলে, বিশেষ করে হাঁড়িয়া খেয়ে যখন মাতাল হয়ে হাসে, ওরা ঠাট্টা করে বলে, মেয়েটাকে সাতবহিনীতে পেয়েছে।’

রসিকতার মধ্যে সরল সৌন্দর্য আছে। কথা বলতে বলতে আমাদের চা পান হয়ে গেল। দুয়ের দাওয়া থেকে কয়লা হঠাৎ ডায় নিজেসব ভাবায় কী ঘেন বলে উঠল। তৃপ্তির মুখে কুসুমের ছটা লেগে গেল, ঝংকার দিয়ে বলল, ‘দূর মুখপুড়ি।’

কয়ে। আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তৃপ্তির দিকে তাকালাম। তৃপ্তি নতমুখে, নিঃশব্দে হাসছে। মুখখানি লাজে লাজানো।

তৃপ্তি বলল, 'আসলে ওয়া ভারি সরল, সরলভাবেই ঠাট্টাও করে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলল মেয়েটি?'

তৃপ্তি আরো লজ্জা পেল। ঠোট কাঁপল। তবু হঠাৎ কথা ফুটল না। অসুবিধা আছে বুঝে আমি অগ্র দিকে তাকালাম। তৃপ্তি বলল, 'কয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার বর ধরে নিয়ে এলে? ওকে মুখপুড়ি বলব না তো কী বলব বলুন তো?'

আমি হেসে বললাম, 'সত্যিই তো।'

আমার বলার ধরনেই বোধহয় তৃপ্তি শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু ক্যাপা বাউলের মতো ভাবি, মন আছে, তোর মনের ভিতরে। সেই ভিতরের মনটা যেন কেমন বিষন্ন হয়ে উঠল। দমদমে যার বিধবা মা ভাই বোনেরা রয়েছে, যাদের জগৎ তৃপ্তি এই দূর জঙ্গলের নির্বাসনে পড়ে আছে, সেখানে বর ধরবে ও? সে সময় কোথায়, মন, কোথায়? তবে সেই যে কথা, 'মন আছে তোর মনের ভিতরে, তারে ছাখ্ না নেড়ে চেড়ে।' বর ধরে আনা তো আর সত্যি একটা যুবা পুরুষকে ধরে আনা না। তৃপ্তির এই যে কালো আয়ত চোখ, হঠাৎ একদিন কারোকে দেখে এই চোখে হয়তো রঙ ধরে যাবে। যে রঙ চুঁইয়ে মনে ঢুকবে। সে মনটা তার নিশ্চয়ই আছে। আপাতত তথাপি, কয়াকে আমিও মনে মনে বলি, 'দূর হ মুখপুড়ি।'

তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল, 'ছোট নাগরায় কোথায় বেড়াবেন?'

বললাম, 'কিছুই তো জানি না। কোথায় আর যাব। বনে বনে একটু ঘুরে বেড়াব।'

'দেখবেন মাংসহোরোর পাল্লায় পড়বেন না।'

'সেটা আবার কী?'

'এখানকার লোকেরা হাতিকে মাংসহোরো বলে।'

দেখছি, আমার আর একটি তিপু জুটেছে। তিপুর ভাল নামটা কী? তৃপ্তি না তো? বললাম, 'আপনি এদের অনেক কথা শিখে গেছেন দেখছি।'

তৃপ্তি মুখ নিচু করে বলল, 'বলতেও পারি। ওরাও অনেক বাংলা কথা বোঝে। কয়ে তো বেশ ভালই বলতে পারে, বুঝতে পারে। সব থেকে সুন্দর হল ওদের গান।'

আমি ওকে স্বরসতিয়ায় গানের কথা বললাম। তৃপ্তি বলল, 'সেটাও

অনেকে পায়ে। গান ওদের কথায় কথায়। কাজের সময়ও গান করে। উকুন বাছতে বসেও গান করে।’

কথাটা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। তৃপ্তি বলল, ‘তবে মেয়েমন্দ, সবাই বড় হাড়িয়া খায়। খাবেই। আগে হাড়িয়া তারপরে ভাত। চাল বদ্বি কম থাকে, তবে আর ভাত রাধবে না। হাড়িয়া বানিয়ে কেলবে, তাই খেয়ে থাকবে। তবে হাড়িয়া খেলে পেটও ভরে, নেশাও হয়।’

একটু ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞেস করি, ‘আপনি কখনো খেয়েছেন নাকি?’

তৃপ্তি অনায়াসেই বলল, ‘খেয়েছি, তবে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ আর স্বাদ, এক চুমুকের বেশি খেতে পারিনি। মাঘে পরবের সময় ওরা জোয় করে খাওয়াতে চায়। মাঘে পরবের সময় ওরা একেবারে ক্ষেপে যায়। তখন ওরা কিছুই মানে না। ঘর যা প্রাণ চায়, সে তাই করে।’

‘সেটা কী রকম?’

তৃপ্তির মুখে আবার কুসুমের ছটা লেগে যায়। মুখ নিচু করে। পায়ের আঙুল দিয়ে, মাটি ঘষতে ঘষতে বলল, ‘এই আর কি, খুব হাড়িয়া খায়, মাদল বাঁশি বাজিয়ে নাচে, গান করে। আর যাকে ঘর প্রাণ চায়, তাকেই টেনে নিয়ে চলে যায়। তখন ওদের লজ্জা-শরম বলেও কিছু থাকে না। গায়ের কাপড়-চোপড় থাকে না। যেখানে-সেখানে—’

তৃপ্তি থেমে গেল। অনেকটা বলে ফেলেছে। আর বলবার দরকার হয় না। তৃপ্তি বলল, ‘তবে ওই একটা দিনের জগুই। সেদিন আমি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি।’

কারণ তৃপ্তি কার সঙ্গে মাঘে পরব করবে? কিন্তু দরজা-বন্ধ ঘরে, সেই অরণ্যক গণমিলন উৎসব কি ওর রক্তেও ঢেউ তোলে না? সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। দেখলাম তৃপ্তির দৃষ্টিতে অগ্নমনস্কতা।

ওর এই অগ্নমনস্কতা ভাঙতে ইচ্ছা করল না। হঠাৎ এক ঝলক বাতাস এল। চারদিক থেকে শুকনো পাতা উড়ে এল। আমাদের গায়ের কাছেও এসে পড়ল। তৃপ্তি যেন হঠাৎ সংবির কিরে পেয়ে বলল, ‘আপনাকে পেয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম।’

বললাম, ‘আমার স্তনতে খুব ভাল লাগল।’

‘আসলে কী জানেন, কারোকে তো পাই না। বাডালীরা যারা আসে, কেউ থাকতে আসে না, বসতে আসে না, কাজের জন্ত আসে, কাজ মিটলেই চলে যায়। তার মধ্যেই হয়তো দু-একটা কথা হয়। যাবার পথে কেউ হয়তো

লরি দাঁড় করিয়ে ছুটো কথা বলে যায়। হঠাৎ কোনো জিনিসের দরকার পড়লে, কেউ হয়তো এনেও দেয়। তা ছাড়া আমার কথা বলবার কেউ নেই।’

নিষ্ঠুরতা বলে মনে হচ্ছে। মন চল ঘাই বন-ভ্রমণে, মনে মনে বলি, এমন করে বনের হাতছানিতে আসতে ভাল লাগে। কিন্তু দিনের পর দিন, অসীম সময় পার হয়ে যায়, এমন নির্বাসনের কথা ভাবতে পারি না। তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে, চোখ কেরাতে ভুলে যাই। ও একটু লাজুক হেসে মুখ নামিয়ে নেয়। এমন সময় দেখি, দরজার সামনে রতন এসে উপস্থিত। সে আমাকে দেখে হিন্দীতে বলল, ‘খবর পেলাম আপনি নার্সদিদির ঘরে এসেছেন। আমি তো ঘেরি দেখে আপনাকে খুঁজে বেড়াছি।’

তাড়াতাড়ি হাতের কজিতে ঘড়ি দেখলাম, প্রায় পৌনে একটা বাজে। তৃপ্তি হিন্দীতে বলল, ‘রতন, তোমার বাবুজীকে আমি রেখে দিছি, সিংজী সাহেবকে বলে দিও।’

রতন হেসে বলল, ‘তা রাখুন না নার্সদিদি, কিন্তু আমি যে ওঁর খানা পাকিয়ে ফেলেছি।’

‘কী পাকালে?’

‘ডাল ভাজি মুরগীর মাংস আর ভাত।’

‘বড়লোকের ব্যাপার। আমি ডাল ভাত ছাড়া কিছুই খাওয়াতে পারব না। তাহলে নিয়েই-যাও।’

বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি বললাম, ‘ডাল-ভাতে আমার বড়ই রুচি।’

বলে উঠে দাঁড়ালাম। তৃপ্তিও উঠল, বলল, ‘সত্যি? তাহলে কাল হুপুরে আমার এখানে খাবেন। খাবেন তো?’

বললাম, ‘ষেচেই তো নিমন্ত্রণটা নিলাম।’

তৃপ্তি বলল, ‘ইস্! কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য! মাকে চিঠিতে লিখে জানাব।’

বনে আর একটি পাগল মেয়ে জুটল। বিদায় নিয়ে রতনের সঙ্গে ফিরে গেলাম। হুপুরের খাবার পাট মেটবার একটু পরেই সিংজী এলেন জীপে চেপে। সঙ্গে রেক্সার বদরিকাপ্রসাদ। মনে হল ছ’জনেই পান করেছেন। চোখ আবৃত্ত। বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সিংজী বললেন, ‘আগামী কালটা নাগরায় থেকে একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখুন। পরশু সকালে, বদরিকা সাহেব আপনাকে নিয়ে এবেলবার মোহনবাবুর কাছে পৌঁছে দেবেন। সেখানে

হু-একদিন থাকবেন। তারপরে খলকোবাদের কনস্টেবল বাংলোয় আপনার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে কদলিবাদ, গুয়া, ঘাটমুড়ি আর করমপোদা যাবেন। বাংলোর ব্যবস্থা বদরিকাশ্রমসাদই করবেন। আমি এখন চলে যাচ্ছি রাউরকেলা, সেখান থেকে ট্রেনে যাব টাটা, আমার ছেলেকে দেখতে। আশা করি ফিরে এসে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।’

আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। হু’জনে ঘণ্টা খানেক রইলেন। সিংজী রতনকে আমার বিষয়ে নানান নির্দেশ দিলেন এবং এক বোতল বিদেশী পানীয় রেখে গেলেন, বললেন, ‘রাত্রে পান করবেন।’

ব্যস্ত হয়ে বললাম, ‘কোনো প্রয়োজন ছিল না।’

সিংজী বললেন, ‘রেখে গেলাম। ইচ্ছা হলেই পান করবেন।’

বদরিকাশ্রমসাদ লোকটিকেও ভাল লাগল। বয়স অল্প, বেশ হাসিমুখি লোক। গয়া জেলায় বাড়ি। গুঁরা বিদ্যায় নেবার আধঘণ্টা পরে রতন বলল, ‘চলুন ঘুরে ফিরে আসি।’

সে সময়ে তৃপ্তি এসে পড়ল। এখন ও একটা হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি পরে এসেছে। জামাটা লাল। মাথায় খোঁপা বেঁধেছে। আমাকে রতনের সঙ্গে বেরোবার উত্তোগ করতে দেখে, জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় নিয়ে যাবে রতন?’

রতন বলল, ‘এই এদিকে ওদিকে একটু যাব।’

তৃপ্তি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তা হলে আমার সঙ্গেই চলুন।’

আমি রতনের দিকে তাকালাম। সে বলল, ‘তা যেতে পারেন, নার্সদিদি এখনকার সব জানেন।’

‘এখানে জানার আর কি আছে? ঠুকে নিয়ে তারা মাচার উঠব সেখান থেকে সব দেখব। চলুন।’

আমি তৃপ্তির সঙ্গে বেরোলাম। বেলা এখন সাড়ে তিন। ফাস্তনের রোদে কোনো তেজ নেই, বাতাস উত্তলা। চারিদিকে কেবল পাতা ঝরে যাচ্ছে। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তারা-মাচাটা কী?’

তৃপ্তি বলল, ‘হাই ভিউ-ফাউন্ডার বলতে পারেন। কাঠের তৈরি উঁচু মাচা, সেখান থেকে বহু দূরের বনজঙ্গল দেখা যায়।’

জঙ্গলের ধারে, খোলা জায়গায়, বেশ উঁচু তারা-মাচা। হু’জনে পাশাপাশি ওঠা যায়, তবু একটু সাবধানেই উঠতে হল। একেবারে উঁচুতে উঠে, রেজিং ধরে দাঁড়িয়ে মনে হল, পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন কোন এক দূর জগতে এসেছি। যেদিকে তাকাই, নানা বর্ণের সমারোহ। তার মধ্যে নীল আর শাদাই বেশি।

বনকে নীল দেখায়। সবুজেরও যে কত বর্ণবাহার, না দেখলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া কুহুম তো আছেই। একদিকে তাকিয়ে মনে হল, সত্ত্ব কাটা মাংসের মতো লাল পাহাড় অনেক দূরে। তার গা বেয়ে সারি সারি কী যেন চলেছে। জিজ্ঞেস করতে তৃপ্তি বলল, ‘ওটা গুয়া রেঙ্গু, ওখানে আয়রণ ওরের খনি আছে, রোপণে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’

তারি-মাচা থেকে নেমে, আমরা ছোট নাগরার গ্রামের অল্প প্রান্তে গেলাম। সেখানে মেয়ে পুরুষ সবাই তৃপ্তিকে চেনে। একটি মেয়ে ময়ূরের বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃপ্তি নিজের কোলে নিয়ে ময়ূরের বাচ্চাটিকে আদর করল। করলে কী হবে, বাচ্চাটির বড় ভয়, নেমে যেতে চায়। আমিও একবার হাতে নেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

সেখান থেকে বনের গভীরে এসে, কোয়েনার ধারে চলে এলাম। সহসা একটি মন্দির গন্ধে নিশ্বাস ভরে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী ফুলের গন্ধ?’

তৃপ্তি একটি গাছ দেখিয়ে বলল, ‘তিলুয়া।’

ছোট ছোট ফুল, যেন কাগজের মতো পাতলা, তারার মতো পাপড়ি। রঙটা হলদে-শাদায় মেশানো। গাছে হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল নিলাম। তৃপ্তি আমার হাত থেকে দুটি ফুল নিয়ে, দুই কানে এমন ভাবে লাগিয়ে নিল, ঠিক যেন দুটি কানপাশ। বলল, ‘এখানকার মেয়েরা পরে।’

মুহূর্তেই যেন তৃপ্তির রূপ বদলে গেল। বললাম, আপনাকে হৃন্দর দেখাচ্ছে।’

তৃপ্তির মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। মুখ নামিয়ে বলল, ‘আমি আবার হৃন্দর নাকি?’

বললাম, ‘আমি যে তাই দেখছি।’

তৃপ্তি আমার চোখের দিকে, একবার ওর আয়ত চোখ মেলে তাকাল। তারপর যেন একটু ছায়া ঘনাল মুখে, আবার ছায়া অপসারিত হল। হেসে মুখ কেবোতেই, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে একদিকে আঙুল দেখাল। দেখলাম, একটি নীল রঙ গাভী কোয়েনার ওপার থেকে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। পঞ্চাশ হাত দূরেও না। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। চকিতে বনের আড়ালে অদৃশ হয়ে গেল। চিড়িয়াখানার বাইরে, বনের মধ্যে এই প্রথম আমার পশু দর্শন। মনে হল যেন ময়ূরের মতো চকচকে নীল তার রঙ।

তৃপ্তি বলল, ‘জল খেতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।’

বললাম, ‘বেচারির তৃষ্ণা মিটল না।’

তৃপ্তি বলল, ‘এখানে মিটল না, দূরে কোথাও গিয়ে মেটাবে।’
বলে সহসাই যেন ওর খেয়াল হল, আমার হাত ছেড়ে দিল।

পরদিন দুপুরে কর্তা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল, ‘দিদি! আজ সকাল থেকে রান্না করেছে।’

গিয়ে দেখলাম, তৃপ্তির স্নান শেষে চুল খোলা, এমনি আঁচড়ে নিয়েছে।
কপালে একটি লাল টিপ পরেছে, লালপাড় শাড়ির সঙ্গে বাসন্তী রঙের জামা
গায়ে। আমাকে দেখে যেন কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। ডাকল, ‘আহ্নন।’

ওর পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলাম। খাটিয়ার বিছানা। একটি ছোট
টেবিল, একটি চেয়ার, ছোট একটি আলনায় জামা-কাপড়। মাটির দেওয়ালে
একটি আয়না ঝোলানো। পাশের কুলুঙ্গিতে সামান্য টুকিটাকি প্রসাধনের
জিনিস। লাল মাটির মেঝে চকচক করছে। সব মিলিয়ে, তবু যেন কোথায়
একটা অসামান্যতা ছড়িয়ে আছে। তৃপ্তি বলল, ‘গরীবের ঘর।’

বললাম, ‘কিন্তু মনটা যে ধনী, তা যেন ঘর দেখেই বোকা যায়।’

তৃপ্তি হেসে বলল, ‘আপনার সঙ্গে তো আমি কথায় পারব না।’

বললাম, ‘কারণ আপনাদের কাছেই শিখি, গুরু-মারা বিজ্ঞা যে।’

তৃপ্তি হেসে উঠল। বলল, ‘আমাকে ‘তুমি’ করে বলবেন।’

‘চেষ্টা করব।’

তারপরে ও আমাকে বাটীর ডেকে নিয়ে গিয়ে, ঘটি থেকে হাত ধোবার
জল ঢেলে দিল। ঘরের মেঝের আসন বিছিয়ে, কাঁসার গেলাসে জল গড়িয়ে
দিল। পাশের ঘর থেকে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত বেড়ে এনে দিল।
পাতের পাশে পেঁয়াজ দিয়ে পোস্তবাটা। তারপরে দিল মোচার ঘণ্ট আর
ডাল। বলল, ‘করো কোথা থেকে মোচা এনে দিয়েছে।’

তারপরে যখন মাগুর মাছের ঝোল দেখলাম, অবাক না হয়ে পারি না।
তৃপ্তি বলল, ‘কোয়েনার কোথাও কোথাও মাগুর বা ল্যাটা মাছ পাওয়া যায়।
কন্নার দাদাকে বলে রেখেছিলাম। ও সেই অঙ্ককার থাকতে বেরিয়ে
গিয়েছিল। পাঁচটা মাগুর মাছ পেয়েছে।’

খেতে গিয়ে তৃপ্তির দিক থেকে যেন মুখ কেঁদাতে পারি না। সব শেষে
দিল ঘন দুধ স্তরা বাটি। খাবার পরে বলল, ‘একটু বিশ্রাম করুন, আমি
খেরে আসি।’

‘এত খাওয়ালেন, তারপরে আর বিশ্রাম না করে উপায় কী?’

তৃপ্তি ওর বিছানাটাই একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দিল। আমি চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলাম, ও বলে উঠল, ‘না না একটু গড়ান, আমি আসছি। আর এর পরে কিন্তু ‘আপনি’ চলবে না।’

বলে বেরিয়ে গেল। আর এই গভীর বনের একটি ঘরে, গভীর তৃপ্তির মধ্যেও, মনটা কেন যেন ভারি হয়ে উঠছে। একটু পরেই খেয়ে এসে, তৃপ্তি বলল, ‘কাল সকালে, আপনার সঙ্গে যদি আমি এদেলবাস যাই?’

আমি খুশি হয়ে বললাম, ‘খুব ভালো লাগবে।’

‘সত্যি?’ তৃপ্তি আমার চোখের দিকে দেখল।

‘তোমাকে মিথ্যা বলতে পারব না।’

সহসা একটি লজ্জা আর খুশির ঝলকে, ওর মুখ অপরূপ হয়ে উঠল। সন্তবত সহসাই আমার ‘তুমি’ সম্বোধন ওর এই অভিব্যক্তির কারণ। কারণ, পরমুহূর্তেই, ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়েও, তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিয়ে, নিজের শাড়ির আঁচল নিয়ে বাস্তব হয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি, কেবল লজ্জা না, একটা আবেগের ধাক্কাও বোধহয় ওকে সামলাতে হচ্ছে।

আমি উঠে বসে বললাম, ‘বসো।’

তৃপ্তি চেয়ারে বসতে গেল। আমি খাটিয়ার বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে বললাম, ‘এখানেই বসো না।’

তৃপ্তি আমার মুখের দিকে এবার তাকালো। বলল, ‘না, আমি চেয়ারে বসছি। আপনি শুয়ে শুয়ে কথা বলুন কিংবা, তার কী দরকার? আমি বরং বারান্দায় বাইরের খাটিয়ায় বসি। আপনি বিশ্রাম করুন।’

আমি ঠোঁট টিপে হেসে বললাম, ‘তার মানে, তুমি একটি দিবানিদ্ৰা দেবার তাল করছ?’

তৃপ্তি যেন চমকে উঠে, অবাক স্বরে বলল, ‘ওমা, না না, আমি মোটেই দিনের বেলা ঘুমোই না। কয়োকো জিজ্ঞেস করে দেখুন।’

‘কয়োকো জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। তা হলে তুমি ভেবেছ, আমার একটু দিবানিদ্ৰা দেওয়া দরকার, তাই না?’

তৃপ্তি কী জবাব দেবে, ভেবে না পেয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, ‘কিন্তু দিনের বেলা ঘুমোবার অভ্যাস আমার নেই। তুমি বসো।’

তৃপ্তি এবার সহজভাবেই, খাটিয়ার এক পাশে বসল। বলল, ‘তা হলে আপনি আর একটু আরাম করে বসুন।’

তা-ই করলাম। আমি পাশ ফিরে কনুইয়ে ভর দিয়ে, আধশোয়া হয়ে ওর দিকে তাকলাম। ওর ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি, দৃষ্টি নত। কিছু না বলে, আমি ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। ও তাকালো আমার দিকে, আবার দৃষ্টি নত করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ‘কী?’

তৃপ্তি মুখ না তুলেই বলল, ‘আপনার সঙ্গে কেন এদেলবায় যেতে চাইলাম, জিজ্ঞেস করলেন না তো?’

‘কোনো কারণের কথা আমার মনে আসেনি। ভাবলাম, তুমিও নিশ্চয়, বেড়াতেই যাবে।’

তৃপ্তি বলল, ‘তা ঠিক। কিন্তু আমি তো এদেলবায় আগেই গিয়েছি। এবার যাবো আপনার সঙ্গে। এদেলবার জঙ্গল আপনাকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। মোহনবাবু ইজারাদার মানুষ, উনি গাছ কাটার জন্তু কুলি রেজাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আমি বেড়াবো আপনাকে নিয়ে।’

বলে, তৃপ্তি যেন সম্মতি পাওয়ার জন্তু জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো। কতোটা যে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, ওকে সে কথা বলতে পারছি না। কেবল বললাম, ‘সত্যি। শুনে খুব ভালো লাগছে, ভাবতেও।’

আবার আগের মতোই খুশি আর লজ্জার ঝলক লেগে গেল তৃপ্তির মুখে।

সকাল আটটার সময় রেজার বদরিকাপ্রসাদ জীপ নিয়ে এলেন। আমিও প্রস্তুত। তাঁকে তৃপ্তির কথা বলতে দেখলাম, খুশিই হলেন। রতনকে বললেন, তৃপ্তিকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসতে। কিন্তু তার দয়কার হল না। তৃপ্তি নিজেই এল। কাঁধে ব্যাগ। সঙ্গে কয়টা, তার হাতেও একটা চামড়ার ব্যাগ ঝোলানো। এসে স্বান হেসে বলল, ‘যাওয়া হল না।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন?’

তৃপ্তি বলল, ‘একটি মুণ্ডা বউয়ের ব্যথা উঠেছে। প্রসব হ’বে। দুদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে।’

আমি ওর দিক থেকে চোখ কেঁরাতে পারছি না। ওর চোখ দুটো হঠাৎ টলটলিয়ে উঠল। আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম, ‘তৃপ্তি।’

তৃপ্তি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, ‘মাত্র তো একটা দিন, তবু কেমন যেন

হয়ে গেল। তবে, আপনি এদেশবার থাকবেন, সন্তান প্রসব করিয়ে, আমি কারোর কোনো লরিতে চলে যাব।’

বললাম, ‘তখনো যদি কারোর প্রসব-যন্ত্রণা ওঠে?’

তৃপ্তি জবাব দিতে পারল না। সংসারের নিরন্তর প্রসব-যন্ত্রণা, তৃপ্তি কি তা শেষ করে কোনো দিন আসতে পারবে। বললাম, ‘চলি। তুমি এসো।’

ও নিচু হয়ে হঠাৎ প্রণাম করল। আমি তাড়াতাড়ি ওর দুটি হাত চেপে ধরলাম। ওর চোখ আবার ভিজে উঠেছে। ভাকলাম, ‘তৃপ্তি!’

তৃপ্তি সরে গিয়ে বলল, ‘গাড়িতে উঠুন।’

উঠতেই হবে। বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে জীপে উঠলাম। এতদিন গর্জে উঠল।

তৃপ্তি বক্তৃতাফর্মের রক্তাভার দাঁড়িয়ে। খুলো উড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। ওকে আর দেখতে পেলাম না। জীপ বাক নিয়ে, গভীর বনের চড়াইতে উঠতে লাগল।

বনের মাগে থেনা

ফরেস্ট রেঞ্জার বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে চলেছি। যাত্রা এদেলবা। জীপ গাড়ি গভীর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে, পাহাড়ের ওপর উঠছে। বদরিকাপ্রসাদ টংরেজিতে বললেন, ‘এখানকার সব জায়গার নাম, মুণ্ডা বা ওরাও ভাষার। প্রত্যেকটা নামেরই একটা মানে আছে। আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গার নাম এদেলবা। মুণ্ডা ভাষায়, এদেল মানে শিমূল, আর বা মানে ফুল— অর্থাৎ শিমূলফুল। তার মানে, সেখানে জঙ্গলের মধ্যে, মুণ্ডাদের একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের নাম ‘শিমূলফুল।’

শোনা মাত্র মনে হলো, আমার শ্রবণের ভিতর দিয়ে, অল্পভূতির মধ্যে, একটি স্বপ্ন চুইয়ে চারিয়ে গেল। গ্রামের নাম কী? না, শিমূলফুল। বাঙলার অনেক গ্রামের অনেক জায়গার, অনেক মিষ্টি নাম শুনেছি। যেমন গ্রামের নাম সন্ধ্যা। হুগলি জেলারই কোন্ এক গ্রামের নাম যেন। নদীর নাম কুন্তী। সেও হুগলি জেলারই এক নিরালার ক্ষীণ স্রোতস্বিনী। তার পারাপারের সাক্ষ্য দাঁড়িয়ে, পড়ন্ত বেলার সেই সূর্যালোকে কথা মনে পড়ে যায়। কুন্তীর ছ’পাশের চড়ায় রবিশস্তুর গায়ে বেলা শেষের স্নানিমা। হয় তো এমন মিষ্টি বাঙলার অনেক জায়গায় অনেক আছে। যেমন মনে পড়ে যাচ্ছে, কোচবিহারের একটি গ্রামের নাম, যেখানে একদা গিয়েছিলাম। গ্রামের নাম চ্যাংড়াবান্ধা। হঠাৎ শুনলে, নামের অর্থ করা দায় হয়ে ওঠে। যে দেশের যেমন কথা। সেখানে চ্যাংড়া মানে, যুবক—যুব। পুরুষ। যেখানে যুবক বাঁধা থাকে, তার নাম চ্যাংড়া-বান্ধা কিন্তু কেন বাঁধা থাকে? যুবকরা যে কারণে বাঁধা পড়ে। নিশ্চয়ই বিপরীত কিছু আছে। যুবক বাঁধা পড়ে যুবতীর কাছে। সেইজন্য সেই দেশে গান আছে :

চ্যাংড়াবান্ধার রেশমী চুড়ি

পাইসা পাইসা দাম।

তাহার মধ্যে লিখা আছে

চ্যাংড়া বন্ধুর নাম ॥

চ্যাংড়া বন্ধু মানে, যুবক বন্ধু, যে গায়, সে নিশ্চয়ই যুবতী, কারণ তার চুড়ির গায়ে, চ্যাংড়া বন্ধুর নাম লেখা আছে। মিষ্টি নামের কিস্তি দিতে গিয়ে, স্বস্তির ভাণ্ড হাতছাতে গেলে, ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে। তেমন মিষ্টি নামের সংখ্যা বিস্তর। কিন্তু ভারতের এই নিবিড় গভীর অরণ্যের একটি গ্রামের নাম শিমুলকুল, শুনেই হঠাৎ মনের মধ্যে, বিস্ময় খুঁশি বলকের সঙ্গে, রঙ চলকে ওঠে। প্রাণে বেজে ওঠে দুটি কলি, শিমুল পাগল হইয়া মাতে। অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দয়িত্ব শাখাতে? সেই গ্রামবানি কি লালে লাল? শিমুলের রক্তচ্ছটায়, রক্ত চোয়ায় কি সেখানকার বনে বনে, স্বস্তিকায়, পাহাড়ী স্বর্গায়, মাহুষের মনে?

যাই, দেখি। ঘর ছাড়া প্রাণ এখন আমার অরণ্যের ডাকে পাগল। বনের ডাকে বাজে। তার ডাক শুনেছি অনেকদিন, দেখেছি হাতছানিও। বলতে পারো, সেই গানের মতো, ‘আমার মন পাগল হইল রে, গৌরাঙ্গ রূপ দেখে।’ কিন্তু যাই কেমন করে। তার আগে যে সেই গানবানি আছে, ‘যাই যাই মনে করি/যাইতে না পারি/মহামায়া আমার পিছনে ধায়।’...

আমি বিবাগী বৈরাগী বাউল না, তবু কোন্ বাউলের একতারা সদাই বাজে আমার শ্রবণে। সুরে বাজে; ‘মন চলো যাই ভ্রমণে। কৃষ্ণ অহুরাগীর বাগানে।’...

তথাপি, মহামায়া কি আর এমন বলেছে। সে ঘরছাড়ার ডাক বোঝে না। সে মুক্তাঙ্গনের অহুরাগ বোঝে না। দশের সঙ্গে এক আমি, দশজনের সঙ্গে ঘর। ডাক শুনে পাগল হয়ে ছুটলেই হলো? সব খেলায়ই দান দিতে হয়। দান দিয়ে যাবে না? ছক পেতে বসেছ, খেলা সাক্ষ করে। দান শেষ করে, ঘর ছাড়ার খেলা খেলতে যাও।

ঘর ছাড়ার কি কোন খেলা আছে? আছে বোধহয়। নানা রূপের নানা খেলা, নানান সময়ে। শিশু যে খেলা খেলতে ভালোবাসে, খেলার ডাক শুনে সে ছোটে। বন আমাদের খেলতে ডেকেছে, তাই আমি বনে ছুটে এসেছি। আমি তাপস নই, তপস্কর্ষ্য করতে আসিনি। আমার জ্ঞান নেই, তবে আমার কিসের ধ্যান? না, আমার কোনো ধ্যান নেই যে, গভীর বনের মহীকহের তলে ধ্যানে বসবো। আমার একটা ধ্যান আছে, খেলা। অরণ্য আমাদের খেলতে ডেকেছে, তার নিবিড় গভীর রূপসাগরে। এ খেলার নিয়মকানুন, সব আমার জানা নেই। খেলতে খেলতে জানবো। জানতে জানতে খেলবো। সে আমাকে যেমন করে খেলা দেবে, আমি তেমনি করে খেলবো। খেলতে খেলতে

আবাত যদি লাগে, চোখের কুল ছাপিয়ে আসে জল, খেলার কানুন মেনে চলবে।

সেই খেলা খেলতে এসেছি, তার আগে, ঘরের খেলার দান দিয়ে আসতে হয়েছে। এখন বনের খেলা।

বনের নাম সারেঙা খণ্ড।

ধলভূমগড় পেরিয়ে এসে, ছোটনাগপুরের সীমানায়। প্রথম এসে যে ইস্টিশনে নেমেছিলাম, তার নাম জরাইকেলা। ভৌগোলিক সীমারেখা যদি টানতে চাও, ইস্টিশনের অর্ধেক বিহারে, অর্ধেক উড়িষ্যায়। ইস্টিশনের গায়ে কোনো দাগ কাটা নেই। তবে দলিল দস্তাবেজে এই রকম লেখা আছে।

জরাইকেলার পৌছবার অনেক আগেই, সেই মনোহরণুরেরও আগে থেকেই বনকে পেয়েছিলাম, যে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। তখনই আমার মনোহরণ, তারপরে পুরোপুরি নয়নহরণ তখন হয়েছিল, যখন হাঁসুয়া বাঁকের ঝলক দেখেছিলাম, সোনালি বালুচরের মধ্যে, যার বুকে জড়াজড়ি করা বিশাল কালো পাখরের চাংড়া। যেন শ্রোতের বুকে গজেন্দ্রগণ শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে জনকেনি করছে। মনোহরণ নয়নহরণ কেবল না, বাক্যহরণও হয়েছিল। গাজুলিমশাই বলেছিলেন, 'নদীর নাম কোয়েল।'

নদীর নাম কোয়েল! তখনো গ্রামের নাম শিমুলফুল শুনিনি, নদীর নাম শুনেই অবন ভরে উঠেছিল। রূপের তো কথাই নেই। চলন্ত গাড়ি থেকে, অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে, সোনার কূলে রূপোর নদীর হাঁসুয়া গতি দেখেই মনে হয়েছিল, লাখো লাখো যুগ হিয়াতে রাখলেও, রূপময় হিয়া জুড়াবে না। রেলগাড়ি থেকে তার কলকল ধ্বনি শুনেতে পাইনি, নাম শুনেই মুছাঁ! কোয়েল! তার মানে কি, কোকিল নাকি? তার কলধ্বনিতে কি সেই বিহঙ্গটির ডাক বাজে? গাজুলিমশাই বলেছিলেন, 'জরাইকেলায় গিয়ে, কোয়েলের ধারে যেতে পারবেন।'

যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার আগে গাজুলিমশাইয়ের পরিচয়টিও একটু বলে নিই। মহাশয় আমার সহযাত্রী হয়েছিলেন, ইম্পাতগড় টাটানগর থেকে। সঙ্গে প্রৌঢ়া গিল্লী, যার মাথায় অনেকখানি ঘোমটা। হাতের কাছে পান সাজবার সবজ্যাম, আর পানের গোছা। একটু পরে পরেই, ছোট ছোট খিলি লেজে, একটি স্বাধীর দিকে, আর একটি ঘোমটা টেনে নিজের মুখে। সঙ্গে কিশোরী কড়া ভিণ্ডু। স্বর্ণলতার মতো চিকন নয়ন আর স্নেহের ঝিলিকে

কলকানো ঘেন। মাথায় ছিল বাসী বিড়নি। পোষাকের মধ্যে সামান্য ডুবে শাড়ি। ভাগর চোখের কালো তারায়, হাসির ঝিলিক।

মহাশয় যে পরিচয়ে গাজুলিমশাই বা মেয়ের নাম তিপু, তা আমার জানবার কথা না। জানালেন উনি নিজেই, কারণ আর কিছু না, ম্যাচবাস্তি—অর্থাৎ দেশলাই। তাঁর বিড়ি বায়ে বায়েই নিতে যাচ্ছিল। নিজের দেশলাইয়ের কাঠিও খতম, অতএব, দেশলাইয়ের খোঁজ করতে গিয়েই, ছুঁ এক কথার পরে জানা গিয়েছিল, তাঁর নাম। তাঁরও গম্ভ্য ছিল জরাইকেলা। সেখানে কোয়েলের কাছাকাছিই তাঁর একটি কুটির আছে। ইস্পাতগড় টাটানগরে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাস। চাকরি-বাকরি না, ছোটোখাটো ব্যবসা আছে। মৃদী দোকান, আলানি কার্ঠের একটা গোলা। তাতেই কোনো রকমে দিন গুজরান হয়ে যায়। জরাইকেলায় বাসের কারণ, গাজুলিমশাই এক সময়ে নাকি বনের ইজারাদার ছিলেন, সে সময়ে জরাইকেলায় একটি বাসস্থান করেছিলেন। কিছুদিনের জন্ত সেখানে থাকতে যাচ্ছেন।

প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দেখলে মনে হবে, তাঁর মতো বিরক্ত অসন্তুষ্ট আর কেউ নেই। তার কারণও ছিল। টাটানগরের কোথাও নাগাই নামে একজন বিড়ি প্রস্তুতকারক আছে, যার বিড়ি দিয়ে তিনি ধূমপান করে থাকেন। সেই নাগাই তাঁকে ঠকিয়েছে, বিড়িতে তামাকের অভাব, এবং ভাল করে নাকি সঁায়া হয়নি। তার ওপরে ম্যাচবাস্তি—অর্থাৎ দেশলাই। তামাকের অভাবে বিড়ি বায়ে বায়ে নিতে যাচ্ছিল, কলে বায়ে বায়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলতে হচ্ছিল, কিন্তু গণ্ডা গণ্ডা কাঠি জ্বলেই নিতে যাচ্ছিল, তাহলে তিনি বলবেন না কেন, ‘শালাগোর ব্যবসা দেখিছেন, অ্যা ? এই করেই বাঙালীর ব্যবসা ভোবে। এত ফাঁকি দিলে হয় ?’

বাতাসের কথা তাঁর খেয়াল ছিল না, ধরাবার কায়দাটিও তাঁর নিজস্ব, তার ওপরে বায়ে বায়ে নিতে যাওয়া বিড়ি যে কখন ঘুনসিতে এসে ঠেকেছিল, এবং ধরবার কোনো উপায় ছিল না। অতএব ঘোষ তো বিড়ি আর দেশলাইয়েরই। নাগাই বিড়ি প্রস্তুতকারক একটি জুরাচোর, দেশলাই কোম্পানিগুলোও তাই। কিন্তু দেশলাই কোম্পানি যে বাঙালীর, তা উনি জানলেন কেমন করে ? কেমন করে আবার ? বাঙালী কোম্পানির না হলে, গুরুত্ব বায়ে বায়ে নিতে যায় ?

অবাব শুনে আমি আর কথা বাড়াতে চাইনি, কিন্তু লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল কত। তিপু এখন দেখছিল, আমার দেশলাইটি ওর বাবা ধরেন করে চলেছেন, আর ম্যাচ কোম্পানিকে গালাগালি দিয়ে চলেছেন, তখন প্রৌঢ়-পুত্রটিকে কানকূট (পক্ষ) —২৮

কিশোরী-রাতা ধমক না দিয়ে পারেনি! ‘বাবার যা কাণ্ড! সেই তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি, ঘুন্সি পোড়ানো বিড়িটা ধরাবার জন্ত, দশ গুণা কাঠি পুড়িয়ে নষ্ট করলে।’

মহাশয়ের তখন কিছু কক্ষিৎ ধ্যান হয়েছিল, পোড়া বিড়িটা চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, গিন্নীর দিকে ক্রিয়ে বলেছিলেন, ‘একটা পান দাও গো।’

বিড়ি আর পান। গিন্নী পানের সঙ্গে সমানে পান্না দিয়ে চলছিলেন। ইতিমধ্যে তিপু সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথাবার্তা না হলেও, বাবার বিড়ি দেশলাইয়ের পর্বে, দৃষ্টি আর হাসি বিনিময় হচ্ছিল। আসল মজাটা আময়াই ভোগ করছিলাম। তার সঙ্গে ছিল, অরণ্যের রঙবাহার। অরণ্যের কথা অনেক শুনেছিলাম, ছবিতে তার অনেক রঙ দেখেছিলাম, বাস্তবে অরণ্যের এমন বর্ণসমারোহ যে দেখতে পাবো, ভাবিনি। মনে হয়েছিল, আমার চোখে যেন একটি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র লাগানো রয়েছে। সে যেন আপনি আপনি ঘুরে যাচ্ছিল, আর অরণ্যের নানা বর্ণ, নানারূপে সেজে উঠছিল।

তার মধ্যেই গাজুলিমশাইয়ের পরিচয় আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হচ্ছিল। তাঁর আদি বাড়ি ছিল যশোরে। সেটা তাঁর কথার টানে আর উচ্চারণেই জানা যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি আমার মনোহরণ করেছিলেন, একটি কথায়, ‘বিত্তুতি বন্দ্যোপাধ্যায়—নাম শুনেছেন তো, সেই যে বই লিখতেন, তিনি আমার জরাইকেলার বাড়িতে দুই রাত বাস করেছিলেন।’

কথা শুনে, গাজুলিমশাইয়ের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারিনি। বিত্তুতি বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁর বাড়িতে! উনি যে তীর্থক্ষেত্রের মন্দিররক্ষক পূজারী, তা কে জানতো? যিনি বিড়ি দেশলাই নিয়ে তিতিবিরক্ত, গিন্নীর কাছ থেকে কেবল পান চেয়ে চেয়ে খাচ্ছিলেন, তিনি যে বিত্তুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আতিথেয়তা করেছেন, কথাটা ভাবতে সময় লেগেছিল। তখন তাঁর গোটা পরিবারই আমার কাছে তীর্থক্ষেত্রের মাছুষ।

তারপরে জরাইকেলার, আমি বাবের অতিথি হয়েছিলাম, দেখেছিলাম, সেই বাঙালী পরিবারের সঙ্গে, গাজুলি পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তিপু স্নানপেরেছিলাম সেখানেই, ও আমাকে নিয়ে বাবে কোয়েলের ধারে। তুপুস্টা কোনো রকমে কেটেছিল, বিকালেই তিপু এসেছিল, আমাকে নিয়ে যেতে। নিয়েও গিয়েছিল কোয়েলের ধারে। সঙ্গে ছিল নিতু। আমি যে বাড়ির অতিথি, নিতু সেই বাড়ির হাসকুটে প্রাণবন্ত আঠারো উনিশ বছরের

ছেলে। অহুমান করতে অসুবিধা হয়নি, তিপু ওর কিশোরী বাছবী। হু'বনের হাসি খুনসুটি ঝগড়া দেখেই তা বোঝা গিয়েছিল।

কোয়েলের ধারে গিয়ে, মুন্ডপ্রাণ, কথা ভুলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের কোল থেকে সহসা কোয়েল বেরিয়ে এসে, হাঁহুয়া বাঁকে বহে চলেছে, হারিয়ে গিয়েছে, অন্তমুখী বাঁকে, ওপারের আর এক অরণ্য সীমায়। নিতুর মুখে শুনেছিলাম, সেই অরণ্যের নাম পোড়াহাট ভিভিসন। আর, প্রায় নগ্ন একটি মূণ্ডা বৃদ্ধ, নদীর চরে বসে, কাটি দিয়ে কী খোঁচাচ্ছিল? তিপু বলেছিল, 'সোনা। ওদের 'সোনাখোঁচা বলে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সোনা? কিসের সোনা?'

তিপু হেসে চলে পড়ে বলেছিল, 'কিসের সোনা আবার? সোনা—যে সোনা দিয়ে হার চুড়ি হুল তৈরি হয়। সেই সোনা।'

তার মানে স্বর্ণ, নদীর চরায়? হ্যাঁ, সোনা, নদীর কূলে, নদীর জলে। কোয়েল স্বর্ণপ্রসবিনী-স্বর্ণবাহিনী। সোনাখোঁচার বাতির সঙ্গে সেই সোনা খুঁচিয়ে তোলে, তারপরে জরাইকেলার মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর কাছে, সেই বালি সের দরে বিক্রি করে। এক সের বালিতে কতোখানি সোনা আছে, সোনাখোঁচা মূণ্ডারা তা জানে না। বালি থেকে সোনা বের করবার লোক আলাদা। এক সের বালিতে, এক আনা থাকতে পারে, আধ আনা থাকতে পারে। কে বলতে পারে, হু' আনা তিন আনাও থাকতে পারে। কিন্তু বালির সের চার আনার বেশি না। তাও এমন বালি না যে, কোয়েলের চর থেকে, তুলে এনে দিলেই শেঠজী সেই বালি কিনে নেবে। বালি যাচাইয়ের লোক আছে। সোনা-খোঁচারও জানে, কোন্‌খানের কোন্‌ বালিতে সোনা মিশে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, হয়তো তেমন বালি হু' সেরের বেশি সংগ্রহ হয় না। সারা দিনের বালি খুঁচিয়ে সোনা সংগ্রহের আর স্বাক্ষর আট আনা।

অবিচারের জগৎ কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু ভারতের নদীর বালিতে যে সোনা মেলে, এ সংবাদে আমি অবাক বতো, খুশি ততো। সোনার বাঙলা না কেবল, সত্যি সত্যি সোনার ভারত!

প্রমাণ একেবারে হাতে কলমে।

তারপরে তিপু আর নিতুর সঙ্গে গাকুলিমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গাকুলিমশাই তার কাঁচা মাটির উঁচু দাঁড়ায় একটি জারগা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তিপু'র ম্মা এখানে আসন পেতে দিত, বিজুতিবাবু এখানে বসতে ভালোবাসতেন। এখানে বসে বসে, চুপ করে বনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।'

দেখেছিলাম, দাওয়ায় সেখান থেকে, লাল আগুনের শিখায় ভরা আকাশমুখো কুহুম গাছ। মনে হয়েছিল, আমার রক্তে আগুন লেগে গিয়েছে। তারপরে অজু'ন, অখগন্ধা, গাব, লুদাস, করণ্ডের মিলেমিশে যাওয়া, নানা বর্ণের মহীকুহের ওপরে গভীর শালবন, যার ডালে ডালে ফুলের ছড়াছড়ি। মাথার ওপরে আকাশ। তারপরে, আর তো কিছু বলার থাকে না, থাকতে পারে না। তখন বনের সঙ্গে আপন মনের খেলা, অহুত্বতির সঙ্গে, হু'জনের মিশে যাওয়া।

গাজুলিমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি করতেন তখন?'

গাজুলিমশাই দূর বনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ইজারাদারি ছাড়বার পরে, এখানে আর তো কিছু করতে আসি না। এই জঙ্গল আমার একটা গোলমাল করেছে। কিছুদিন পরে পরেই না এসে থাকতে পারি না। বিভূতিবাবুর মতন বসে থাকতে পারি না, উনি ধ্যানী মানুষ, ধ্যান করতেন। আমি কি দেখেছি জানেন, আমাদের মতন বনেরও প্রাণ আছে, আমাদের যেমন আলাদা আলাদা চেহারা, তাদেরও তাই। এক একজনকে হাসলে, এক একরকম দেখায়, কাঁদলেও তাই। গাছ কথা বলে, আপনি জানেন?'

আমি গাজুলিমশাইয়ের দিকে সংশয় বিম্বিত চোখে তাকিয়েছিলাম উনি কি স্বপ্ন মস্তিষ্কের লোক? পরে বুঝেছিলাম, শুধু স্বপ্ন না, বিড়ি দেশলাই নিয়ে যে বিরক্ত লোকটিকে দেখেছিলাম, আসলে তিনি এক অরণ্যপ্রেমিক। যিনি গাছের হাসি কান্না কথা, সবই বোঝেন, এবং বিশ্বাস করেন গাছেরা সজীব। তারপরে বুঝেছিলাম, কেন তিনি বনের ইজারাদারিতে ইন্তফা দিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি হত্যাকাশী খুনী ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, 'অনেক প্রাণী হত্যা করেছি, আর পারলাম না। চোখের সামনে, জ্যাস্ত প্রাণীগুলোকে হত্যা হতে দেখে, আর সহিতে পারিনি। আমি তাদের কান্না শুনেছি, অনেক অভিষাপ কুড়িয়েছি, আর না।'

বলতে বলতে, ঠুর প্রোট রাঙা চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। তখন মনে হয়েছিল, গাজুলিমশাই অরণ্যপ্রেমিক নন, অরণ্যেরই আর একটি মহত্বরূপী সত্তা। তিনি অরণ্যের আত্মীয়, বনের তাই। সেইখানে শিল্পীপ্রেমিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তফাত। গাজুলিমশাই আমার কাছে একটি মৃদু বিষয়। তাঁকে আমি আগে চিনতে পারিনি।

চেনা কি যায়? চেনা কি এতই সহজ? আমাদের বড় অহংকার, মনে করি, এক রূপে দেখেই মানুষকে চেনা যায়। কিন্তু কভো যে তাক

রূপান্তর, সে খোঁজ করি না। যখন খোঁজ পড়ে, তখন কথা হারিয়ে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রের কাছে করজোড়ে বসে থাকি। হাসতে গিয়ে, চোখের জলে সব যেন ঝপসা হয়ে যায়। সে অনির্বচনীয়তা, হাসির থেকে মধুর, গভীর। মনে মনে বলি, 'নমস্কার অজানাকেই। প্রণাম অপরিচয়ের বিশ্বয়কে।'

জরাইকেলার অবস্থানটা, আধুনিক ভারতের একটি ইন্টিশনের নামেই বোঝা যায়। জরাইকেলা ইন্টিশনের যে-অর্থেক বিহার ছাড়িয়ে উড়িষ্যায় পড়েছে, তারপরে গাড়িতে করে ছুট দিলেই, প্রথম ইন্টিশনের নাম দেখা যাবে ভালুলতা। তারপরে বিস্মা। জানি না, মুণ্ডা জাতির ঐচ্ছ পুরুষ, বিদ্রোহী, ঘোঁকা, বিস্মা মুণ্ডার নামের সঙ্গে ইন্টিশনের নামের কোনো যোগসূত্র আছে কী না। রাঁচি অঞ্চলের অরণ্যের অধিবাসী বিস্মা মুণ্ডা, উনবিংশ শতাব্দীতে, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বনে পাহাড়ে লড়াই চালিয়েছিলেন অনেক দিন। ব্রিটিশ সিংহকে তিনি উদ্ভিন্ন করেছিলেন, বিদ্রোহ দমনের জন্য, সেই সিংহকে নানা কৌশলে লড়তে হয়েছিল। সেই থেকে বিস্মা মুণ্ডা এক ইতিহাস।

ইতিহাসের পাতায় তাঁর বিদ্রোহ কাহিনী। অনেক কিংবদন্তীর তিনি নায়ক। আজও ছোটনাগপুরের পাহাড়ে, জঙ্গলে, অনেক ছড়া আর গানে, বিস্মা মুণ্ডার নাম উচ্চারিত। কিন্তু ভারতের সামগ্রিক জীবনে যা চির উপেক্ষিত, ইতিহাসেও, অতএব তা সমানভাবেই উপেক্ষিত। অরণ্য পর্বতের বিদ্রোহের সঙ্গে, ভারতের সমতল ভূমির বিদ্রোহ কখনো যোগ দেয়নি। এই চিরবিচ্ছিন্নতা, ভারতের প্রতি এক অভিশাপ। অরণ্য পর্বত যদি এক সঙ্গে মিলতে পারতো, কে জানে, আজকের ভারতের ইতিহাস অন্য কথা বলতো কী না।

থাক সে কথা। আমি ইতিহাসের পথ ধরে আসিনি। বনের সঙ্গে খেলা আমার। অরণ্যের ডাকে এসেছি। বনের কথা বলি। বিস্মা ইন্টিশন দেখেছি, মনের কোনো দোষ নেই। সেই ঐতিহাসিক ঘোঁকার কথা মনে এসেছিল অনিবাধ্যভাবে। কেতাবে পড়া ছিল কী না! বিস্মা ইন্টিশনের পরেই, বাণ্ডামুণ্ডা, যেখানে জঙ্গল কেটে চলেছে, নতুন ইতিহাসের পথ তৈরির কাজ। দেখে এসেছি, সেখানে চলেছে পাশাপাশি অনেকগুলি রেললাইন পাতার কাজ, কারণ বাণ্ডামুণ্ডার পরেই, ইন্টিশনের নাম রৌরকেলা, আজকের অতি চেনা নাম,

উড়িয়ার ইম্পাতগড়। দেখেছি, মুণ্ডা ওরাও মেয়েরা সেখানে, অশ্লাদুল করে চুল বেঁধেছে, ইংরেজিতে যাকে বলে নাকি হর্সটেল। নাগরিকাদের মতন তাদের শাড়ির বাধুনি, তাও আবার কলে বোনা রঙীন শাড়ির। তিপু মুখে শুনেছিলাম, বনের মেয়েদের নিজেদের কাপড়ের নাম শাড়ি না, কিচুরি। বনের তাঁতীরা নিজেরা বোনে। মোটা জমিনের ওপরে, লাল মোটা স্ততোর একটি মোটা রেখা। এক খণ্ড না, দু'খণ্ড। একটি কোমরে জড়াবার জন্ত, আর একটি গারে। বাণামুণ্ডার কর্মী মেয়েদের গারে সে কিচুরি দেখিনি, বরং গারে তাদের রঙ-বেরঙের জামা, পায়ে স্রাণ্ডেল, ফটফট চলা, তথাপি পায়ে আলতা, মাথায় ফুলেল ভেল। অনেকের তাতে হয়নি, ওঠরজনী দিয়ে ঠোঁট রাঙিয়েছে, কপালে তারই ফোঁটা, মুখে পাউডারের প্রলেপ। ডিয়েং-এ তাদের বিতৃষ্ণা, ডিয়েং—বাকে বলে হাঁড়িয়া পচুই, জন্মের থেকে বা খেয়ে তাদের দেহের পুষ্টি, মনের রঙ।

বাণামুণ্ডায় তারা ছবির কাগজ লাগানো, রঙ-বেরঙের বোতল থেকে সুরা পান করে। বাবুদের কাঁধে হাত দিয়ে বেহেড, নয় তো জার্মান সাহেবের গললর হয়ে, খিলখিল হাসে, তাও দেখেছি। তাদের আরণাক মিঠে স্ববে, হিন্দী ছবির গান শুনেছি।

শুনলে মনে হবে, মাস্কাতা আমলের বুড়োর মতো কথা বলছি। কিন্তু তা না। বাণামুণ্ডায় যে বনবালারা খাটতে গিয়েছে, কিছুদিন আগেও তারা ছিল, গভীর অরণ্যের আদিবাসী। তাদের ছিল শিকার, আদিম প্রথার চাষ, নানান বনজ খাদ্য, নানান অপদেবতার (বোঙা) পূজাপাটের রাজ্য নিয়ে বাস। জরপরেই হঠাৎ বাণামুণ্ডায় গিয়ে একেবারে আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ। বার বাইরের চিত্রটা দেখলেই, ভিতরের চরিত্রটা বোকা যায় না। গভীর অরণ্য থেকে, সেই জগতের যোগযোগের মাঝখানে থেকে যায় অনেক সময় আদও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তার কোনোটাই সেই বনবালাদের হয়নি, হয়নি বলেই বাণামুণ্ডায় বনবালাদের সেই রকম দেখেছিলাম। তারা কেবল নিজেদের অস্তিত্ব হারাননি, আধুনিক জগৎ তাদের সবটুকু শোষণ করে নিয়েছে।

কিন্তু আবার আমি শিবের গীত গাইতে আরম্ভ করেছি। আমার ধান ভানা রইলো পড়ে। জরাকেলার অবস্থানটা বোকাতেই, এত কথা।

আমার সৌভাগ্য, গাজুলিমশাইয়ের ঘরের দাওয়ায় আমি বসতে পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। তিপু তার আগেই বলেছিল, ও আমাকে কোয়েলের ছোট ছোট মাছের ঝাল খাওয়াবে।

কথা রেখেছিল। কোয়েলের ছোট মাছের সে স্বাদ ভোলবার না। ভোলবার না, তিপু সন্ধে, নিতুর সন্ধে, জরাইকেলার সামুটা রকের বনে বনে বেড়ানো।

জরাইকেলাতেই আলাপ হয়েছিল, বিরাট ব্যবসায়ী আর জুজলের মস্ত ঠিকাদার সিংজী সাহেবের সন্ধে। আর বনের ইজারাদার মোহনবাবু। বলতে গেলে এখনো আমি, সারেণ্ডা অবশ্যই এই গভীরে তাঁদেরই অতিথি। আর ভোলা সম্ভব না, জরাইকেলার উইলসন সাহেবকে। যিনি একদা ছিলেন, তাঁর ঘোঁষনে ডি. এফ. ও.। ছিল খাস বিলিতি মেমসাহেব বোঁ। কিন্তু মেমসাহেবের সন্ধে জীবনযাপন তাঁর কপালে নয়নি। মৃত্যু ওরাওঁদের সন্ধে, অতিরিক্ত মেলামেশা, মেমসাহেব যেনে নিতে পারেননি, তাই তিনি তাঁর সাগরপারের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। সাহেবের কাছে, ছেলেমেয়েদের কারোকে রেখে যাননি। একাকী সাহেবের বয়সও তখন কম না। তিনিও ইচ্ছা করলে বিলাতে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু বন তাঁকে ছাড়েনি। বনের মায়ায় তিনি বশীভূত হয়েছিলেন। এখন তাঁর ঘরে, কৃষ্ণকালো মৃত্যু গৃহিণীর কোল জুড়ে গোরা ছেলের খেলা। উইলসন সাহেবের চাকরি গিয়েছে অনেকদিন। এখন জরাইকেলাতে তিনি কাঠ চেবাইয়ের কল খুলে বসেছেন। বাস করেন মাটির ঘরে। মৃত্যু বোঁয়ের হাতের রান্না ভাত খান পরিতোষ করে। আর ত্রাণি হইন্সিতে আকাজ্ঞা নেই, বোঁয়ের সন্ধে মদগম্ খেয়েই রসে বশে আছেন। মদগম্ হলো মহয়ার রস।

সাহেবকে ভারি ভাল লেগেছিল। বসে বসে অনেক গল্প করেছিলেন, তারপরে জোর করে, চায়ের মতো একটু গরম মদগম্ খাইয়ে দিয়েছিলেন।

তবে উইলসনের কথাতেই, জরাইকেলার সব কথা শেষ হয়ে যায় না। অতি বড় রইস্ আদমি সিংজীর পরিচয় একটু না দিলে নয়। চালে তিনি আদমীর মাহব। মেজাজখানিও তাই। জরাইকেলার বিজলীবাতির আশা নেই, তাঁর গৃহে হাজাকের আলোর ঝলক। প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যাতেই, কবাসের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে, আলবোলায় নল মুখে দিয়ে, নোকরকে হুয়া আনবার আদেশ দিয়েছিলেন। গভীর বনের এক ছোট লোকালয়ে, সিংজীর কবাসে পরিবেশিত হয়েছিল, বিদেশের শ্রেষ্ঠ দামী হুয়া। অবাক হওয়ার সন্ধে, সংকুচিত হয়ে, পানে আপত্তি প্রকাশ করেছিলাম। সিংজী বলেছিলেন, 'মেহমান হয়ে, আমার সম্মান একটু রাখুন, আমি আপনার জুতা মাধার করে বইবো।'

তারপরে আর কথা চলেনি, সহযোগিতা করতেই হয়েছিল। মোহনবাবু

মানুষটি আপাতদৃষ্টিতে অসামান্য, মিষ্টভাবী, সুপুরুষ। পরেও তাঁর কোনো ব্যতিক্রম দেখিনি, কিন্তু সুরাসক্তিতা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সিংজীর গৃহেই প্রথম দেখেছিলাম, তাঁর কাছেই, সিংজী সম্পর্কে নানান বিস্ময়কর কাহিনী শুনেছিলাম। সিংজী ধনবান। বনের ইজারা ছাড়াও, টাটানগর থেকে রৌরকেলা পর্যন্ত তাঁর নানা ব্যবসা। বিস্তৃত তাঁর পরিচয়, ক্রমতাশালী ব্যক্তি তিনি। আমার অরণ্য ভ্রমণের দারিদ্র্য তিনিই নিয়েছিলেন।

জরাইকেলা ছেড়ে এসেছিলাম মোহনবাবুর সঙ্গে, তাঁর ট্রাকে। তিনি চলেছিলেন এদেলবায়, এখন যেখানে চলেছি বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে। কিন্তু সিংজীর নির্দেশে, মোহনবাবু আমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, ছোট নাগরায়। যেখান থেকে, এখন আমার যাত্রা, এদেলবার দিকে।

জরাইকেলা থেকে আসবার সময়, তিপুর্ ঝাপসা চোখের দিকে তাকিয়ে বলে এসেছিলাম, ফেরার পথে জরাইকেলা হয়ে ফিরবো। এখন জানি না, সে কথা থাকবে কী না। বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে, কোথায় আমার সেই খেলা সাক্ষ্য হবে, এখন আর আমি তা জানি না। কে জানে, তিপুর্ কাছে হয় তো চিরদিনের জন্য মিথ্যুক হয়েই থাকতে হবে।

ছোট নাগরায়, বন আমার জন্য রেখেছিল একটি পরম বিস্ময়। ই্যা, পরম বিস্ময়ই বলতে হবে। যা একেবারেই অভাবিত, অচিন্ত্যনীয়, তা ঘটলে তো পরম বিস্ময়ই বলতে হয়। সেই পরম বিস্ময়ের নাম, তৃপ্তি ভৌমিক, দমদমে যার বাড়ি। অন্য পূর্ববঙ্গে, ছেলেবেলায় দেশ বিভাগের পরে, বাবা মায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। ছোট নাগরায় কোয়েনা নামে পাহাড়ী নদী পেরিয়ে প্রাক্ দ্বিপ্রহরে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বনের ফাঁকায়। বন যেখানে সাত রঙে মেজে, আমার চারপাশে। তখনই হঠাৎ দেখা পেয়েছিলাম তৃপ্তি ভৌমিকের। লাল পাড় শাড়ি পরা, সামান্য সাদা কাপড়ের একটি জামা, কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো। দেখেছিলাম গৈরিক তার গায়ের রঙ, কালো ডাগর দুটি চোখ, রূপসী না, শ্রীময়ী স্নিগ্ধা। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। এক বিহুনি ঝোলানো, কুখু চুলে, মুখে ধুলার ছাপ। ধূলা পায়ে সামান্য দুটি স্ত্রাণ্ডেল, অহংকার, বজ্রিত, হাতে একটি ঘড়ি।

শালীনতা রক্ষা করতে, মুখ ফেরাতে গিয়েই, সেই কথাটি ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল, ‘আপনি কি বাঙালী?’

আমি যেন শুনেছিলাম, ‘পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?’

সেই ঝিঁঝি ডাকা, ছোট নাগরায় অরণ্য গভীরে, আমার সেই রকমই মনে

হয়েছিল। তারপরে নিজের বেশভূষার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, বাঙালীর
যুতি পবার ধনরনটা, একান্ত বাঙালীর, এক নজরে চেনা যায়। আমাকে বিস্মিত
সম্মতি জানিয়ে, জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, 'হ্যাঁ। আপনিও বাঙালী ?'

তৃপ্তি ভৌমিক তার হাসি আর ঘাড় ঝাঁকানোতে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল।
তারপরে ক্রমে ক্রমে পরিচয়। তৃপ্তি, এই অরণ্যের মধ্যে, রক হেলথ সেন্টারের
নার্স, চাকরিটা বিহার সরকারের। বাঙালী মেয়ে হয়ে, বিহার সরকারের এই
চাকরিটা পাওয়ার কারণ, এখানে চাকরি করার স্বীকৃতি। এই গভীর জঙ্গলে
বারো মাস কেউ চাকরি করতে আসতে চায় না। মাসে একদিন, বনের
ইজারাদারদের গাড়িতে, বড় জামদায় গিয়ে, মাসের মাইনে নিয়ে আসতে হয়।
তখনই, সারা মাসের চাল ডাল তেল হুন, বাবতীর জিনিস কিনে নিয়ে আসতে
হয়। ছোট নাগরার পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোনো দোকানপাট কেনাবেচার
ব্যাপার নেই।

শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, তবে নাকি বাঙালীরা কর্মে বিদেশ-বিমুখ ?
তৃপ্তি ভৌমিক ঘেন, তারই একটি নীরব কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব প্রতিবাদ। ছেলে
না, এন্ট মেয়ে, বিধবা মা আর ছোট ভাইবোনদের জীবনের দায়িত্বে, সারেশুণ
অরণ্যের গভীরে। মুক্ত বিশ্বয়ে, তৃপ্তির দিকে না তাকিয়ে পারিনি।

তারপরে, তৃপ্তি প্রথম আলাপেই, আমাকে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে
দেখিয়েছিল, আদিম রাজ্যের সেই উপুড় করা দুটি নাকাড়া। লোহার চালাই
করা বিশাল নাকাড়া, দেখলেই বোকা যায়, কোনো এক কালে সেই নাকাড়া
যখন বাজতো, তখন এই পাহাড় অরণ্য এক আদিম উল্লাসে ঢকল হয়ে উঠতো।
প্রথম দিনেই, তৃপ্তি ওর লাল মাটির নিচু পাঁচিল ঘেঁষা, লাল মাটির গৃহাঙ্গনে
নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে ওর দাসী এবং সখী মুণ্ডা মেয়ে কয়েক ছিল যে তার
নিজের ভাষায় ঠাট্টা করে তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি জঙ্গল থেকে বর
ধরে নিয়ে এলে দ্বিদি।'

আমি বুঝতে পারিনি, তৃপ্তি চকিত লজ্জা স্ফুরিত ধমকে বলে উঠেছিল,
'দূর হ মুখপুড়ি।' তারপরেও আমাকে কথাটা বলেছিল, এবং এ কথাও
বলেছিল, বনের এই সব মাহুঘেরা তারি সরল। যা মনে আসে, মুখেও তা
অনারসেই ভাবে। তৃপ্তি বলেছিল, কয়েক কথায়, আমি যেন কিছু মনে না
করি।

আমার মনে করার কিছু ছিল না। লজ্জা পাবার কথা তৃপ্তির, পেয়েও ছিল,
কিন্তু কয়েক নামে দাসী বা সখী মেয়েটিকে ও ভালোবাসে, তার সরলতার বিশ্বাস

করে। কয়েক কথার ও বরং হজা পেয়েছে, কোনো মালিঙ্গ ওর মনকে স্পর্শ করেনি।

প্রথম দিনের দেখান, তৃপ্তি চা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল, ওর বনের বাসায়। অহরোধ ছিল দ্বিতীয় দিনের খিপ্রাহরিক আহারের। সৌভাগ্য বলতে হবে। সারোগা অরণ্যের গভীরে। একটি বাঙালী মেয়ের হাতে, বাঙলা রান্না খাবার জুটবে, সেটা আশাতীত। জীবনের বাস্তব এবং বিশ্বয়গুলো এই রকম। সংসারে বাস্তব বাস্তব করে যারা দিনরাত্রি গলাবাজি করে, তাদের কাছে, এই তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎটা নিতান্ত কল্পকাহিনী বলে মনে হতে পারে। এক শ্রেণীর ছুশী লোক আছে, যাদের চৌচৌ কোণ বাঁকা, চোখে অবিবাহের হাসি। দুঃখের মধ্যেও, জীবনের সরসতা যাদের কখনো স্পর্শ করেনি, কটু হেসে জিজ্ঞেস করে, ‘গুহে কালকূট, যেখানেই যাও, সেখানেই একটি মেয়ে কোথা থেকে আসে? আমাদের জীবনে তো এ রকম আসে না?’

যেন মেয়েরা সংসারের এক এক অত্যাশ্চর্য ডুমুরের ফুল, তাদের দেখা সহজে মেলে না। অথচ জানি, ঘরে বাইরে, সর্বত্র নারী পুরুষ এক সঙ্গে চলেছে। আমার মতো, সেও সর্বত্র। দেখা না পাবার কী আছে। দেখা পাওয়াটা একদিক থেকে ভাগ্য বলতে হবে, আর সেই ভাগ্যের জন্ত দরকার, চোখ আর মন। নিজের বাইরের দরজাটা তো বটেই, ভিতরের দরজাটাও খুলে রাখা দরকার। যদি কেউ উকি দেয়, সে যেন প্রবেশ নিষেধের নোটিশ দেখতে না পায়। বিচিত্র আর বিশ্বয়কর ঘটনা, মানুষের জীবনেই ঘটে। কল্পকাহিনী দেখানে অতি ভুল, মানুষের জীবন তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, ব্যাপক, বিচিত্র।

তৃপ্তির নিমন্ত্রণে ছুশী হয়েছিলাম। ওর সামান্য ব্যঞ্জন, অসামান্য ব্যঞ্জনায় সৃষ্টি করেছিল, পরের দিনের দুপুরটিতে। কানুন মাসে, শালের পাতা ঝরে যায়, ফুল দোলে। কুসুমের বাঙা ঝলক যেন আকাশকেও রাঙিয়ে দেয়। ছোট নাপরার সেই দুপুরটিকে তোলা যায় না। প্রবাসিনী এক বাঙালী মেয়ে, তার ঘরের কাঁচা মাটির নিকনো মেঝের বসে, আমাকে পরিবেশন করেছিল। আসনে বসে আমি খেয়েছিলাম। তার মধ্যে অনেক কথা ও বলেছিল। ওর বনের জীবনের কথা। বনকে ও আস্তে আস্তে, দিনে দিনে ভালোবাসতে শিখেছে, তার সঙ্গে বনের মানুষদের। এদের অপরিণীত দায়িত্ব, ক্ষুধা আর ব্যাধির কথা বলেছিল। বলেছিল, মাসে একদিনের জন্তও ডাক্তারের দেখা পাওয়া কঠিন। ওষুধের তীব্র অভাব। তৃপ্তির নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়, যখন

প্রয়োজনের সময়, ঠিক অস্থখের জন্ত, ঠিক ওষুধ দিতে পারে না। কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা ওর দ্বারা সম্ভব হয় না। মাসে একবার যখন বড় জ্বাধদায় যায় মাইনে আনতে তখন যতোটা পারে, ওষুধ নিয়ে আসে। তাও বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেই যেখানে ওষুধ ঠিকমতো পাওয়া যায় না, সেখানে এই গভীর বনের মধ্যে, বনবাসীদের জন্ত নিয়মিত ওষুধ পাওয়া যাবে, সে আশা হুবাশা।

হু'দিন ছোট নাগরায় ছিলাম। ছোট নাগরায় বনের গভীরে, কোয়েনার কি'কি ডাকা ঠাণ্ডা অন্ধকার কোপঝাড় তীরে তীরে, তৃপ্তি আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। তারার মতো দেখতে তিলুরা নামে ফুলের আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ, সেই ফুল দিয়ে তৃপ্তি ওর কানের ফুল করে পরেছিল। ছোট গাছে, থোকা থোকা লাল ফুল, নাম মধুফুল, অরণ্যবাসীরা বলে। ইচ্ছা করেছিল, সেই ফুল নিয়ে, তৃপ্তির চুলে গুঁজে দিই। পারিনি, সংকোচ হয়েছিল, ওর খেত সিঁথির রেখা কি কোনোদিন রক্তিম হবে না? জীবনটা কি কেবল জীবিকার জন্তই কেটে যাবে?

তৃপ্তির মন সম্ভবত একটু মেতুর হয়েছিল। আমি এদেলবায় যাবো শুনে, স্থির করেছিল, আমার সঙ্গে যাবে। মোহনবাবু ওর ঘেঁষে পরিচিত, এদেলবা, এক সারেওয়ার অনেক জায়গাই ওর চেনা। যাওয়ার কোনো অস্ববিধা ছিল না। ও আমাকে বন ঘুরিয়ে দেখাবে, এই ওর ইচ্ছা।

যাবার সময়, রেজার বহরিকাপ্রসাদ এলেন জীপ নিয়ে। নির্দেশ ছিল সিংজীর। দাঁড়িয়েছিলাম তৃপ্তির অপেক্ষায়। ও এসেছিল সময় মতোই, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, সঙ্গে কয়টা ছাড়াও একটি মুণ্ডা পুরুষ। এসে বলেছিল, আমার সঙ্গে ও যেতে পারছে না। একটু দূরে, একটি বনবধুর প্রসববেদনা উঠেছে, ও প্রসব করতে যাচ্ছে। তবে হু'এক দিনের মধ্যেই, কারোয় গাড়িতে ও এদেলবায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

না যেতে পাবার জন্ত, ওর নিরাশার চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছিল, কিন্তু নবজাতকের আহ্বান অস্বীকার করতে পারেনি। আমি অবাক হয়ে তৃপ্তি ভৌমিকের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর ভেবেছিলাম, যার জীবনে ফুল কোটেনি, সে কতোকাল প্রসূতির সেবা করবে? সংসারের নিরন্তর প্রসব-যন্ত্রণা, তৃপ্তি কি তা শেষ করে কোনোদিন আসতে পারবে?

গাড়ি চালাচ্ছেন বদরিকাপ্রসাদ নিজেই। যতোই এগিয়ে চলি, পাহাড়ে উঠি, আবার নেমে আসি, বন যেন গভীরতর নিবিড়তর হয়ে ওঠে, আর তার রঙের ঝলক ঝলকে উঠতে থাকে। আগে জানতাম, বনের রঙ সবুজ। তুল জানতাম। বনের রঙের কোনো শেষ নেই। একলা কুসুমই অনেকখানি। দাবায়িতে বন জলে যায়। কিন্তু কুসুমও যেন সমস্ত অরণ্যে, আগুন জালিয়ে দিয়েছে, তার ঊর্ধ্বাহু শিখা আকাশের দিকে। গাছে গাছে নানা বর্ণের ফুলের অস্ত নেই। পাতাবিহীন শাখায় শাখায়, হলুদ নীল সাদা বেগুনি লাল ফুলে ফুলে ভরা। মাঝে মাঝে, অবাক করে দিচ্ছে, পাহাড়ী মৃত্তিকা। এক এক জায়গায় তার এক এক রকম রঙ। হলুদ নীল লাল ধূসর শাদা।

বদরিকাপ্রসাদ হিংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। গাড়ি তিনি খুব জোরে চালাচ্ছিলেন না। জোরে চালানো সম্ভবও ছিল না। বিশেষ করে ওপরে ওঠবার সময়। এক জায়গায় নীল মৃত্তিকা দেখে, বিশ্বাস করতে পারিনি, সে রঙ প্রাকৃতিক। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওটা কি সত্যি প্রাকৃতিক রঙ?’

বদরিকাপ্রসাদ বললেন, ‘হ্যাঁ, নেমে দেখবেন?’

বললাম, ‘অস্ববিধা না থাকলে দেখতে চাই।’

বদরিকাপ্রসাদ হেসে বললেন, ‘এতে আমার অস্ববিধার কী আছে। আপনার যখন যা ইচ্ছা হবে, বলবেন। আপনি সিংজী সাহেবের মেহমান, আমাদেরও।’

বদরিকাপ্রসাদ রাস্তার এক ধারে গাড়ি দাঁড় করালেন। আমি নেমে গিয়ে, নীল পাহাড়ের গায়ে হাত দিলাম। পাথর না, মাটি, কিন্তু পাথরের মতোই প্রায় শক্ত। বদরিকাপ্রসাদ কয়েকটি ছোট ছোট নীল মাটির থণ্ড তুলে নিলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এই সব রঙীন মাটি নিয়ে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যদি বাড়ি ঘর রঙ করা যায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজে লাগানো যায়নি।’

সংসারের তাই নিয়ম, প্রকৃতি থেকে সে রূপ রস নিয়ে, নিজেকে একরকম ভাবে সাজায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি কখনো সার্থক হয়, তখন এই পাহাড়ে অরণ্যে গর্জন করে ছুটে আসবে ট্রাক লরি। শাবল গাঁইতির আঘাতে রঙীন মৃত্তিকা ঘাব কারখানায়, নগরে নগরে। তখন আর বনপাহাড়ের রঙ-মৃত্তিকা আর থাকবে না।

বনপাহাড়ের মুগ্ধতা থেকে, সংসারের প্রয়োজনের মূল্য বেশি। তবু মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করে। লোকে বলে, বস্ত্রেরা বনে সুন্দর, শিল্প মাতৃক্রোড়ে। কিন্তু সেই মানানসই রূপ বজায় রাখা বড় কঠিন। নীল খণ্ড কটি নিয়ে গাড়িতে ওঠবার আগেই, বদরিকাপ্রসাদ ভুরু কঁচকে আশেপাশে তাকালেন। তাঁর নাকের পাটা ফোলা। জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিছু গন্ধ পাচ্ছেন?’

ঘ্রাণের বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। গন্ধ নেবার চেষ্টা করে, একটি বনজ গন্ধ ছাড়া আর কিছুই আমি পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিসের গন্ধ বলুন তো?’

বদরিকাপ্রসাদ বললেন, ‘মনে হচ্ছে বাঘের। উঠুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন!’

এর পরে আর কথা চলে না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসলাম। মুহূর্তের মধ্যেই, একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় চকিত হয়ে উঠলো। এতক্ষণের দর্শনেন্দ্রিয় আর অমুভূতির মধ্যে ছিল একটি মুগ্ধতা। কিন্তু যাকে দেখে মুগ্ধ হই, তুলে ধাই, তার গভীরে বসবাসকারী আরো অনেকে আছে, যারা শেষ পরোয়ানা নিয়ে হাজির হতে পারে। এ অরণ্যের সেও হয় তো একটি সৌন্দর্য, মাহুঘের জীবনের ক্ষেত্রে কালাস্তক। রূপের মধ্যে, সর্বনাশও এমনি করেই মিশে থাকে। কখন কী ভাবে তার আবির্ভাব হবে, কেউ বলতে পারে না।

বদরিকাপ্রসাদ ততক্ষণে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার ঘ্রাণ দেখছি বেশ তীব্র।’

বদরিকাপ্রসাদ বাইরের দিকে, আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন। হেসে বললেন, ‘বনে বনে ঘুরে, এখন শুটা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটু সাবধান থাকতেই হয়, অনেক সময় একা একাই ঘুরতে হয় কী না!’

বললাম, ‘আমি তো গন্ধ পেলাম না?’

বদরিকা বললেন, ‘না পাবারই কথা, আপনি তো কোনো জানোয়ারের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তা ছাড়া, আপনি হয় তো খেয়াল করেননি, আমরা যেখানে নেমেছিলাম, সেখানে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা ছিল। পাখি পতঙ্গ কিছুই ডাকছিল না। গন্ধটা খুব হালকা ছিল, হয় তো অনেক দূর থেকেই এসেছিল, তবু সাবধান হওয়া ভাল।’

আমার অভিজ্ঞতার, বাঘের গন্ধ, একমাত্র চিড়িয়াখানা আর পার্কসের বেটনীতে। বনের বাঘের গন্ধের মধ্যে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কী না, জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কখনো বস্ত্র বাঘ দেখেছেন?’

বদরিকা বললেন, ‘দেখেছি হু’একবার, দু’ থেকে। সামনাসামনি কখনো পড়তে হয়নি। তবে এ জঙ্গলে বাঘ কমই আছে। বড় জানোয়ার বলতে, হাতিই বেশি আছে। জানোয়ারের আক্রমণ বলতে, এখানে হাতির দ্বারা ই মানুষ বেশি আক্রান্ত হয়, মরেও।’

গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে, বদরিকা প্রসাদ রেজার মহাশয়ের কথাগুলো কেমন যেন বুক গুরগুরিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞাস করলাম, ‘কী ভাবে আক্রমণ করে?’

‘কোনোরকম আটঘাট বেঁধে আক্রমণ করে না। চিরকাল ধরেই জঙ্গলের মানুষ আর পশুরা এখানে, বলতে গেলে পাশাপাশি বাস করছে। নিশ্চিন্ত হাতির সামনে, হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে, দে সন্দিক্ত হয়ে ওঠে, সে জগ্জেই আক্রমণ করে।’

জিজ্ঞাস করলাম, ‘কী করে?’

বদরিকা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, আবার সামনের দিকে দৃষ্টি কিরিয়ে বললেন, ‘কী আর, শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে, পাহাড়ের গায়ে আছাড় মারে, নয় তো নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, পায়ে পিষেও ফেলে অনেক সময়।’

‘তার মানে, মৃত্যু?’

‘নিশ্চিতরূপেই। ক্রম হাতির শুঁড়ে একবার ধরা পড়লে বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না।’ বদরিকা বললেন প্রায় নির্বিকারভাবেই। আবার বললেন, ‘তবে জঙ্গলের মানুষেরাও খুব সাবধান থাকে। হাতির সামনে হঠাৎ পড়ে গেলে, কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, সেটাও তারা ভাল জানে। কিন্তু হাতির মেজাজের কথা কিছু বলা যায় না। সামনে মানুষ পড়লেই যে সে আক্রমণ করবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। অনেক সময় শাস্তভাবেই হয় তো চলে যায়, মোটে ভ্রক্ষেপ করে না। পাগলা হাতি ছাড়া কখনোই অকারণ মানুষকে তারা আক্রমণ করে না। কেবল হল বেঁধে ক্ষেতের কসল খেতে আসে। তখন টিন শিট দিয়ে, হল্লা করে, নানানভাবে হাতির হলকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে।

হাতি কম দেখিনি জীবনে। চিড়িয়াখানা বা সার্কাস ছাড়াই ছেলেবেলা থেকে অনেক জায়গায় পোবা হাতি দেখেছি। সেকালের জমিদার বাড়ি, বা কোনো মিছিলে। তার মধ্যে সব থেকে ভাল লেগেছিল, প্রয়াগের কুন্ড মোলার, হাতির পিঠে নাগা সাধু দেখে। সম্পূর্ণ নগ্ন সাধু, উন্মুক্ত রূপাণ তাদের হাতে, মিছিল করে যেতো হাতি ষোড়ার পিঠে বসে। নাগা সাধু না, যেন সশস্ত্র যোদ্ধা।

কিন্তু বস্তুহন্তী কখনো দেখিনি। এখন এই গভীর বনের মধ্যে, চিন্তাটা উদ্বল হতেই, বাঘের থেকে উদ্বেগটা কম হলো না। জিজ্ঞাস করলাম, ‘এ সময়ে কি জঙ্গলে হাতি বেয়োতে পারে?’

বদরিকা বললেন, ‘যে কোনো মুহুর্তে, যে কোনো পাহাড়ী মোড়ের থাকে।’

বুকের মধ্যে কাঁপ দিল যেন। বললাম, ‘বলেন কী? কী করবেন তা হলে?’

বদরিকা হেসে বললেন, ‘লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে দূর থেকেই চোখে পড়ে, পালাবার সময় পাওয়া যায়। আমার জীবনে একবারই হয়েছে, জীপ নিয়ে হাতির মুখোমুখি পড়ে গেছিলাম।’

প্রায় আতকে উঠি, ‘সর্বনাশ! কী করলেন?’

বদরিকা বললেন, ‘করার কিছু ছিল না, সেই বিশাল হাতি একেবারে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ী রাস্তায় পিছনের ঢালুতে ব্যাক করা বিপজ্জনক। কিরিলেও হাতি তাড়া করতো, সেটা আরো মারাত্মক। সামনে যাবার কোনো প্রদ্বই ছিল না। গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে, চূপ করে বসেছিলাম।’

‘তারপর?’

‘তারপর আর কী, তারপর চললো আমার অগ্নিপরীক্ষা, আর সেই প্রাগৈতিহাসিক পশুর পরীক্ষকের ভূমিকা।’ বদরিকা হাসলেন, আবার বললেন, ‘হাতিটির মুখ আমার দিকে ছিল না, দেওয়ালের মতো রাস্তা জুড়ে সে দাঁড়িয়েছিল। সে এক চোখ দিয়ে আমাকে দেখছিল, কিন্তু একেবারে স্থির। শুঁড় কান ল্যাজ কিছুই নড়ছিল না, যেন পাথরের মূর্তি। আমিও পাথর। তার একটি দাঁত আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। গাড়ির এঞ্জিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দৃষ্টি হাতির দিকে। হাত ঘেরকম স্টিয়ারিং-এর উপর ছিল, সেইরকমই রেখেছিলাম, কেন না, আমাকেও হাতির মতোই স্থির থাকতে হবে। এটাই সাধারণ নিয়ম, হাতির সামনে পড়লে, হাতি যদি আক্রমণ করতে উদ্ভত না হয়, তা হলে তার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। আসলে সে জানতে চায়, শত্রু হিসাবে আমার উদ্দেশ্য কী? আক্রমণ? অথবা আপোসে পাশ কাটানো? নড়তে চড়তে দেখলেই সে সন্দিহান হয়ে ওঠে, তখন ঝুটিতি আক্রমণ করে বসতে পারে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ একেবারেই ওরা পছন্দ করে না, বিরক্ত হয়, রেগেও যায়। তবে স্থির হয়ে বসে থাকলেও, আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, হাতি যদি হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে, কী ভাবে পালাবো। দুটি মাত্র রাস্তা আমার ছিল। এক নব্বয়, তান দিকে নেবে পড়েই রাস্তার ধারের ঢালুতে নেমে পড়া। হাতি ঢালুতে নেমে আক্রমণ করতে পারে না।’

চালুতে সে পারতপক্ষে নামে এই চায় না, কারণ বাধা তার বিশাল ওজনের শরীর, গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। দু' নম্বর ছিল, নেমেই পিছন দিকে দৌড় দেওয়া।'

বদরিকা গাড়ি চালাতে চালাতে, অদ্ভুত এক রুদ্ধশাস ঘটনা ব্যক্ত করছেন, কিন্তু বলছেন অত্যন্ত সহজভাবে। আর আমি তাঁর হস্তীকাহিনী শুনতে শুনতে, প্রত্যেকবার পাহাড়ী মোড়ের দিকে, ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছি। একবার যখন শুনছি, 'যে কোনো মুহূর্তেই' নাকি তার দেখা পাওয়া যেতে পারে। শুনছিও সেই ঘটনাই।

বদরিকা বলে চলেছেন, 'অবিশ্রুত যতোটা সহজে পালাবার পন্থা ভাবছি, ততোটা সহজ নয়। হাতি দেখতে যতো বিশালই হোক, সে অত্যন্ত দ্রুতগতি। নিমেষের মধ্যেই সে হয় তো আমাকে ছুঁড়ে ছাড়িয়ে ফেলতে পারে। আর যদি আমি পালাতেও পারি, জীপটা দুমড়ে সে পাহাড়ের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, এটাও আমি জানতাম। সবটাই নির্ভর করছিল, আমি কতো তাড়াতাড়ি বাঁপিয়ে পড়ে ছুটতে পারি। নিচের চালুতে অথবা পিছনের আঁকাবাঁকা পথে। আঁকাবাঁকা রাস্তাও, হাতির পক্ষে খুব প্রশস্ত না, মোড় বঁকতে তার সময় লাগে।'

এ সব জানা না থাকলেও, হাতি তার বিশাল শরীর নিয়ে যে অত্যন্ত দ্রুত ছুটতে পারে, ওটা আমার কেতাবী জ্ঞান ছিল। অল্প বয়সে পড়েছি, ধনগোপাল সুখোপাধ্যায়ের 'স্বপতি'। কিন্তু স্বপতি পড়ে, ছেলেবেলায় হাতিদের আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম। এখন এই অরণ্য গভীরে, তার যে কোনো মুহূর্তে আর্জিবেবর আশঙ্কায়, সে ভালোবাসার বোধ বড়ই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রসাদজী, আগে বলুন, হাতি আপনাকে আক্রমণ করেছিল কী না।'

বদরিকা হেসে বললেন, 'না। করলে হয়তো আজ আপনার সঙ্গে, এভাবে দেখতে পেতেন না। সে আমাকে আধ ঘণ্টার ওপর বসিয়ে রেখেছিল, নিজেও নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। সেই ঝকঝকে দুই দাঁতওয়ালা হাতি নিজে যেমন নির্ভীক ছিল, তেমনি তার মহত্বও ছিল,। সে যখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, আমি ষোট্টেই তার শত্রুতা করতে আসিনি, তাকে আক্রমণ বা বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্যই আমার নেই, তখন সে অত্যন্ত ধীরে ধীরে, আমার বাঁহিকের নিচু চড়াইয়ের ওপর দিয়ে, শাল বনের মধ্যে ঢুকে গেছলো।'

বাঁচা গেল, স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। বললাম, 'আমাদের সামনে যদি কোনো হাতি পড়ে, সেও কেন নির্ভীক আর মহৎ হয়।'

বদরিকা হেসে উঠলেন, বললেন, ‘সেটা আশা করাই ভাল। তবে দৈবদুর্ঘটনার কথা বলা যায় না, তার অন্ত সঙ্গাগ থাকাই উচিত। যেমন, শহরের রাস্তায় চলতে কিরতেও আমাদের সঙ্গাগ দৃষ্টি রেখে, সাবধানে চলতে হয়, তা না হলে পাড়ি চাপা মরতে পারি।’

বদরিকার কথায়, চকিতেই আমার চোখে ভেসে উঠলো, কলকাতার রাস্তায় ক্ষত ধাবমান বিশাল দোতলা বাস। তার নিচে চাপা পড়লে, হাতের পায়ে পিষ্ট হওয়ার থেকে, কিছু কম মর্মান্তিক না। কিংবা ক্ষত গতি ট্রাম। কবি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে গেল, যিনি ট্রামের তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। মনে পড়ে যায়, তার কিছুদিন আগেই গর্ভিত ক্রুক ট্রামের আক্রমণের উপরে তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন। যেন ভবিষ্যতের ছবিটা তিনি আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। আমি বললাম, ‘খুব ঠিক কথা বলেছেন। আমরা অনেক সময়েই ভয়ংকরতা ভুলে বাই। মনে করি, বনেই বুরি পড়ে পড়ে বিপদ, কিন্তু শহরে বিপদের সম্ভাবনাও কম না।’

বদরিকা বললেন, ‘হয় তো বেশি-ই। শহরের বিপদের কথা আমাদের মনে থাকে না, কারণ শহরে বাস করতে আমরা অভ্যস্ত, বিপদ কাটিয়ে চলতে জানি। বনের পশু বা, এমন কি এই সব বনের গভীরে যে সব মানুষেরা ঘুগ ঘুগ বাস করছে, তারা শহরের রাস্তায় পড়লে, নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়বে।’

কথা বলতে বলতে, বদরিকাপ্রসাদ ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছিলেন। তিনি যে কিছুটা শহরবিমুখ, তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি আন্তে আন্তে এমন গভীর হয়ে উঠলেন কেন। গাভীরের মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই, তথাপি গভীর মুখে চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে যাবার মধ্যে, তাঁকে অগ্নরকম লাগছে।

আমরা এখন অনেক উচুতে, আমাদের বাঁ দিকে, কোয়েনা বয়ে চলেছে। নিচে একটি সর্পিল নীল রেশমী ধারা, রোদে চলকায়। দূরের উচু থেকে তার কুলুকুলু ধ্বনি শুনেতে পাই না, কাছে গেলেই, তার আরণ্যক গান বেজে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই গভীর বনের সবখানি জুড়ে, সে গান করে চলেছে। সুর যদি বা জানা গিয়েছে, ভাষা কোনোদিনই বোঝা যায়নি। নিরন্তর সে তার নিজের ভাষায় বেজে চলেছে। মনে হয়, কোয়েনা যেন এই বিশাল বন পাহাড়কে আঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। যেখানেই বাই, কোয়েনা সবখানেই আছে। যখন নিচের দিকে নামি, তখন সে কাছেই চলকে ওঠে। আবার উচুতে উঠতে উঠতে, হঠাৎ হারিয়ে যায়, আবার হঠাৎ-ই দূরের নিচে চিকচিক করে ওঠে।

বদরিকা প্রসাদ বললেন, ‘আমার জীবনে একটা বড় অপরাধ এই সারেগার জঙ্গলেই ঘটেছিল। আপনি জরাইকেলা থেকে আসার সময়, সামুটার ওপর দিয়ে এসেছিলেন, মনে আছে?’

একটু অবাক কৌতূহলিত চোখে, বদরিকার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘আছে।’

বদরিকা বললেন, ‘তা হলে নিশ্চয়ই মনে আছে, সামুটা অনেকটা সমতল অঞ্চল?’

বললাম, ‘হ্যাঁ। আমি সামুটা নালাও দেখেছি।’

বদরিকা ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, ‘নালাটা জঙ্গলের মধ্যে, তার ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। আমি সেদিকটার কথা বলছি না, গ্রামের কথা বলছি। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। সিংজী সাহেব কী রকম জেদী লোক, আপনি হয় তো ঠিক জানেন না।’

বললাম, ‘কতোটা জেদী, সেটা ঠিক বলতে পারবো না, তবে মনে হয়েছে, তিনি যা করতে বন্ধপরিকর, তা করবেনই।’

বদরিকা বললেন, ‘ঠিক তাই। বছর দুয়েক আগে, একটা বিশেষ কাজে, আমি কয়মপোদায় গেছিলাম। সেখানে সিংজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি সাধারণত মত্তপানে অভ্যস্ত না। কিন্তু সিংজী কিছুতেই ছাড়েননি, তাঁর সঙ্গে আমাকে পান করতেই হয়েছিল। আর, পানের মাত্রাও একটু বেশি হয়ে গেছিলো। কিন্তু সেদিনই আমার সামুটার অকসেসে ফেরার কথা। দিনের বেলাতে পান করে, জীপ নিয়ে আমি সামুটার পথে বেরিয়েছিলাম। অন্ধকার হয়ে আসার আগেই যাতে ফিরতে পারি, সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা মোটেই ভাল ছিল না। মত্তপান করে, দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আসার মধ্যে অনেক বিপদ ছিল। হয় তো পাহাড়ের নিচে ছিটকে পড়ে, মারা যেতে পারতাম। কিন্তু মারা পড়িনি, মেরে কেলেছিলাম।’

বদরিকা চুপ করলেন। আমি যেন তাঁর কথার অর্থ না বুঝে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মেরে কেলেছিলেন?’

বদরিকা বললেন, ‘হ্যাঁ, একজনকে না, দু’জনকে মেরে কেলেছিলাম। দুটি অল্প বয়সের মেয়েকে।’

সম্ভবত সেই দৃশ্যই বদরিকার চোখের সামনে ভাসছিল। একটা আবেগকে দমন করার অভিব্যক্তি তার মুখে। ঠোঁটের ওপর চাপ দিয়ে, নিঃশব্দে কয়েক সেকেন্ড, আস্তে আস্তে গাড়ি চালান, তারপরে বললেন, ‘বিকেলের মধ্যেই

আমি সামুটায় পৌঁছেছিলাম। সমতল রাস্তা পেয়ে আমি তখন আরো ক্ষতগামী। আমি দূর থেকেই, মেয়ে দুটিকে দেখতে পেয়েছিলাম। হর্নও দিয়েছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম, ওরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবে। কিন্তু মেয়ে দুটি হঠাৎ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কেন, তা আজো আমার অজানা। গাড়ির সামনে মুরগী পড়লে যেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, ওদের অবস্থা যেন সেইরকম। কোন্ দিকে যাবে, যেন ঠিক করতে পারছিল না, কেবল ছুটোছুটি করছিল। অথচ সরে যাবার জায়গা প্রচুর ছিল, এবং আমার তখনো স্থির বিশ্বাস, ওরা নিশ্চয়ই সরে যাবে। আমার স্থির বিশ্বাসটা তখন মস্তিকে বিঁধে গেছে। কেন, তাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ওটাকে বলে দ্রব্যগুণ। সে বস্তু যদি আমার পেটে না থাকতো, রক্তে ক্রিয়ালীল না থাকতো, তা হলে স্থির বিশ্বাসের পরিবর্তে, দ্বিধা করে আমি গাড়ি থামিয়ে দিতাম। তা' দিইনি, বরং যে বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, সেই বেগেই ছুটেছিলাম, আর চকিতেই দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, হাত ধরাধরি করেছিল। গাড়িতে একটা ঝাঁকুনি, আর একটা আর্দ্রনাভ স্তনতে পেয়েছিলাম, গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলাম। কিন্তু তখন যা ঘটবার, তা ঘটে গেছে, যত্না অচিরায়ৎ।'

বদরিকা চুপ করলেন। জীপ চালাচ্ছেন আস্তে, সপিল উৎরাইয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

বদরিকা বললেন, 'তারপরে অনেক কিছুই ঘটতে পারতো ঘটেনি। পুলিশের কাছে আমি নিজেই আত্মসমর্পণ করেছিলাম। আমাকে সবাই চিনতো, আমি অধিকাংশ মানুষের প্রীতিভাজন, কোনো মানুষের সঙ্গে আমি কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। জঙ্গলের আদিবাসীই হোক, আর বিহারী ও ওড়িয়া হোক, সকলের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। সেটাই আমাকে ঝাঁচিয়ে দেয়। তা ছাড়া মেয়ে দুটির বাবায় আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা রুজু করতে চাননি, পুলিশও আমাকে রেহাই দিয়েছিল, এবং সৌভাগ্য, তার জন্ত পুলিশকে আমার কোনোরকম ঘুষ দিতে হয়নি। মেয়ে দুটি ছিল কুরমি জাতির মেয়ে, তাদের বাবাদের কিছু টাকা দিয়েছিলাম। সে টাকা সামান্যই। টাকা দিয়ে, কোনো জীবনের মূল্যই হয় না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে দুটির বয়স কতো ছিল?'

বদরিকা বললেন, 'সেটা বিশেষভাবেই মনে গঁথে আছে, বছর পাঁচ-ছয় বয়স। আমার একমাত্র মেয়ের বয়সও তখন তাই ছিল। নিজের মেয়েকে

জরুরে আব্ব করতে গেলেই, সেই কুরমি মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ে যেতো, কেন না, আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ ছিল, আমি হত্যা করেছি। সেই অপরাধবোধটা আমার আজও যায়নি।’

বদরিকা একটি লম্বা নিখাস নিলেন, কিন্তু অনায়াসে নিখাস ভাগ করতে পারলেন না। তাঁর বকের খাঁচার মধ্যে যেন তা কাহ্নসের মতো ফুলে উঠলো। কথাটা উঠেছিল দৈব দুর্ঘটনা নিয়ে, জঙ্গলে বা শহরে। সম্ভব নেই কুরমি মেয়ে দুটি দুর্বৃত্তগতি গাড়ি দেখে ভয়চকিত বিভ্রান্তিতে, আত্মরক্ষার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। আচমকা কালান্তক বস্তু পত্ত দেখলে, শহরের মাহুবেবও একই অবস্থা হতে পারে। আত্মরক্ষার উপায় ভাবনা, ভয়ের গ্রাসে বিলীন হয়ে যাওয়া, কিছুমাত্র আশ্চর্য না। কিন্তু আমি ভাবছি বদরিকাপ্রসাদের কথা। আমরা মনে করি, মাহুবেব কেবল পুণোর মধ্যেই হৃদয় আর মহৎ। সেটা বোধহয় লব সত্যি না। পাপবোধের মধ্যেও, মাহুবেব হৃদয়ের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। বদরিকাপ্রসাদকে দেখে, আমার তাই মনে হচ্ছে। দুর্ঘটনা-দুর্ঘটনা-ই। উনি নিশ্চয়ই ঘাতক নন, হত্যাও করেননি। কিন্তু ওঁর মহত্ত্ববোধের মধ্যে, মানবিকতায় সেই স্বরূপ জাগ্রত, দুর্ঘটনা যে ভাবেই ঘটুক, নিজের দায়িত্বকে তিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতে পারেন না। এই ‘বোধযুক্ত’ মাহুবেব সংখ্যা, পৃথিবীতে বিরল।

আমি বললাম, ‘কিন্তু, এতো গভীরভাবে মনে রেখেই বা কী হবে, কষ্টই পাবেন।’

বদরিকা বিব্রত হেসে বললেন, ‘জানি, তবু মন থেকে যেতে চায় না। এখনো জীপ চালাই, কিন্তু মত্তপান করে কদাচ না।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটাই কি সেই জীপগাড়ি?’

বদরিকা হেসে বললেন, ‘না, নিশ্চিন্ত থাকুন, এটাই সেই ঘাতক জীপ না।’

বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ‘আমরা এদেলবায় ঢুকেছি। বাহিকের নিচে লক্ষ্য রাখুন, কোয়েনা নদীর ধারে, মোহনবাবুর অস্থায়ী পাতাশ্রম দেখতে পাবেন। আমাদের সামনে এদেলবা গ্রাম।’

আমরা শিমুলফুলে ঢুকলাম, এ কথাই আমার প্রথম মনে হলো। এদেলবানে শিমুল, বা মানে ফুল। গ্রামের নাম শিমুলফুল। অথচ শিমুল গাছ তো তেমন দেখি না। শাল, করম, অজুন, সেগুন আর প্রচুর কাঁঠালি চাপা ফুলের গাছ। এদেলবা যেন চম্পাগছা, বাতাসে ফুলের গন্ধ। তা ছাড়াও আছে, নাম

না জানা, নানা গাছ, ঘাসের ডালপালা নানান রঙীন ফুলে ভরা। তার মধ্যে আমার চেনা ভিলুয়া, যার ফুল দিয়ে, তৃপ্তি কানের ভূষণ করেছিল।

সামনেই দেখতে পাচ্ছি কিছু মাটির ঘর। বড় দেখলে মনে হয়, লাল রঙে ঘরের দেওয়াল রাঙানো। আসলে মাটির রঙেরই স্বলক। এখানে ওখানে কয়েকটা গরু বাধা। ছাগল চরছে আশেপাশে। প্রায় নয় একটি বুদ্ধ মুণ্ডা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আমাদের দিকে দেখছে, এবং যেন চেনে, এমনভাবে হাসছে। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানালো। বদরিকা মাথা নাড়লেন, আমি কপালে হাত ছোঁয়ালাম। এসময়েই আমার চোখ পড়লো বাঁ দিকে। প্রায় দুশো ফুট নিচে কোয়েনা নদী, বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে, বন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে হারিয়ে গিয়েছে, গভীর বনের মধ্যে। নদীর জলের কাচঞ্চ নিচে, রক্তিম মাকড়া পাথর স্পষ্টই দেখা যায়। জল বোধহয় এক হাঁটুও হবে না। নদীর ওপারের পাহাড়ে, অনেকগুলো বিশাল বনস্পতির ঘন ছায়া, তারপরেই নিচু হয়ে, অনেকটা উপত্যকার মতো নেমে এসেছে কোয়েনার জলে। এপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, যেন সবুজ মখমল পাতা সমতল, কয়েকটি শাল চম্পা আর দেবদারু গাছ। নদীর ধারে, একটু উঁচু জায়গায়, বড় একটি পাতার ঘর। নিচুতে অনেকগুলো পাতার তৈরি ছোট ছোট দোচালা ছাউনি। তার পাশে পাশে, মাটি খুঁড়ে উনোন করা হয়েছে। ছাই আর পোড়া কাঠ জালিয়ে দেয়, ওখানে রান্না হয়।

বদরিকা বললেন, ‘আমরা ঘুরতে ঘুরতে ওখানেই নেমে যাবো। ছোট ছোট পাতার ঘর যেগুলো দেখছেন, ওগুলো মোহনবাবুর গাছ কাটার কলোকা মিনদের। ওদের ভাষায়, পাতার ঘরগুলোকে বলা হয় গুইয়ো।’

‘গুইয়ো?’ আমি উচ্চারণটা ঠিক করে নেবার জন্তু জিজ্ঞেস করলাম।

বদরিকা বললেন, ‘হ্যাঁ, গুইয়ো মানে পাতার ঘর।’

এর নাম ভাষা। বিশেষ শব্দের মূলটা থাকে, এক একটি ভাষার আদিত্তে। আমি জানি না, মুণ্ডারি ভাষার আদি কী। বুঝতে পারছি, আমরা ক্রমে চক্র দিয়ে বাঁ দিকে নেমে চলেছি। ইতিমধ্যে শিমুলফুল গ্রামের আরো কয়েকজন অধিবাসীকে দেখতে পেলাম। একটি গৃহের গাছের নিচে, মা বুক খুলে শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। যেন কচি ঘাসের মাঠটিতে গোবৎস চরে বেড়াচ্ছে। মায়ের জিহ্বাস্ব কোঁতুহলিত দৃষ্টি জীপের দিকে। বাড়ির উঠোনের ধারে উনোনে হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করছে একটি যুবতী, তার সামনে বসে এক খালি গা নেংটি পরা জোয়ান। নিজেদের মধ্যে হেসে কথা বলতে বলতেই

রাস্তার ওপর জীপগাড়িকে একবার দেখে নিল। তারপরেই হঠাৎ ঘন গাছপালা নিবিড় হয়ে এলো। কিঁকির ডাক শোনা গেল। শুকনো পাতার খসখস শব্দ শুনে তাকাই, আর মনে হয় যেন বিশ্বের পরমার্শ্ব আমার চোখের সামনে। হাত দুয়েক দূরেই, একটি ময়ূর। ঠোট দিয়ে মাটিতে কী খুঁটছে। স্বদীর্ঘ পুচ্ছ মাটিতে লুটোচ্ছে। কোনো জ্রুপ নেই, যেন গৃহস্থের ময়ূরগী উঠোনে দানা খুঁটে খাচ্ছে। আমি বলে উঠলাম, ‘এ কি বস্তু ময়ূর?’

বদরিকা বললেন, ‘হ্যাঁ। এদেলবার এই অংশে প্রচুর ময়ূর আছে, অনেক দেখতে পাবেন।’

‘আমি প্রায় শিশুর উত্তেজনায় জিজ্ঞেস করলাম, ‘ধরা যায় না?’

বদরিকা বললেন, ‘নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু আপনার আমার মতো আনাড়ী পায়বে না।’

বললাম, ‘কেন, এই তো একেবারে হাতের সামনেই রয়েছে। মনে হচ্ছে নেমে হাত বাড়ালেই ধরা যায়।’

বদরিকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘চেষ্টা করে দেখবেন?’

বদরিকার হাসিতে যেন রহস্য মাখানো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘নামলেই বোধহয় ভয় পেয়ে পালাবে?’

বদরিকা বললেন, ‘মোটাই না। ওর চলাফেরা ভাবভঙ্গি দেখে কি আপনার মনে হচ্ছে, ও ভয় পেয়েছে? ভয় পেলে, গাড়ি দেখে, তার শব্দ শুনেই পালাতো। সেদিক থেকে বলতে পারেন, এ বনে ময়ূরেরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের দৃষ্টি খুব সজাগ, মারণাত্মক খুব ভাল চেনে। আপনার হাতে যদি ‘সার আসার’ দেখতে পেতো, চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়ে যেতো।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘সার আসারটা কী?’

বদরিকা হেসে বললেন, ‘তীর ধনুক। মুণ্ডরা সার আসার বলে। ওরা সাধারণত তীর ধনুক দিয়েই ময়ূর বা বস্তু মোরগ শিকার করে। সে জন্তাই, বনের পশু পাখিরাও তীর ধনুক ভালভাবেই চেনে। অবিজ্ঞি বনের মানুষরা অনেক সময় ফাঁদ পেতেও ময়ূর ধরে।’

আমি অবাক হয়ে দেখছি, ময়ূরটার যেন কোনো জ্রুপ নেই, আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কয়েক হাত দূরেই সে নিজের মনে চরে বেড়াচ্ছে। দুটো মানুষ, একটা গাড়ি যেন ওর কাছে কিছুই না। সত্যি, বসে থাকতে পারলাম না, জীপ থেকে নেমে পড়লাম। পায়ে পায়ে ময়ূরটার কাছে এগিয়ে গেলাম।

আমি যখন তার দু' তিন হাতের মধ্যে, তখনো সে খুঁটে খেতেই ব্যাপ্ত । উত্তেজনার আমার বুকের তাল তড়র হলো, আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে, নিচু হয়ে কাটিতি হাত বাড়ালাম । মনে হলো, প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছি, কিন্তু নিমেষের মধ্যেই, ময়ূর আমার ডান দিকে, হাত পাঁচেক দূরে সরে গিয়েছে । আমি আশা ছাড়তে পারলাম না, ডান দিকে কিরে, হাত বাড়িয়ে, প্রায় ঝাঁপ দেবার মতো লাফিয়ে পড়লাম । কিন্তু চোখের পলকেই, ময়ূর আমার বাঁ দিকে, চার পাঁচ হাত দূরে ।

বদরিকা গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন । ওর দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন, শিশুর খেলা দেখছেন । কিন্তু আমার বিন্ময়ের সীমা নেই । দু' বারই মনে হলো, যেন ধরেই ফেলেছি, অথচ অথরা ময়ূর নিমেষেই আমার নাগালের বাইরে । কিন্তু সে কখনোই অনেক দূরে যাচ্ছে না । নির্ভয় স্বাচ্ছন্দ্যে সে তার নিজের কাজ করে চলেছে ।

বদরিকা বললেন, 'আপনি অনেক চেষ্টা করতে পারেন, পারবেন না । ও আপনাকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে ক্লান্ত করে দেবে, এইরকম ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আপনাকে আশেপাশে, কিন্তু ওর একটি পালকও স্পর্শ করতে দেবে না ।'

সে বিষয়ে এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই । তবু যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না । মনে হয় যার ছায়া স্পর্শ করতে পারছি, তার গায়ে স্পর্শ করতে পারছি না । ময়ূর তো নয় এ যেন মায়ার হরিণ । স্বর্ণ মারীচ । কয়েক মুহূর্ত হতাশ চোখে অপরূপ ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপরেই নিজের বালখিল্যাত্ম্য নিজেই হেসে উঠি । কেন মাতি এই ধরা বাঁধার খেলায় ? আমার হাতের পাঞ্জায়, বুক চেপেও যদি আদর করে ধরি, পাখিটির সেই বন্দীদশার রূপটিই আসল না । বনের এই অঙ্গনে, এই যে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাণ্ড খুঁজছে, এটাই আসল রূপ । যার যেখানে ঠাই । আমার নিতান্ত মাহুয়িক লোভ, স্বন্দরকে অস্বন্দরই করবে ।

ময়ূরটিকে দেখতে দেখতেই, জীপের কাছে কিরে যাই । বদরিকা হেসে বললেন, 'এখানেই এখন থাকবেন, অনেক ময়ূর আপনার আশেপাশে এমনি করে ঘুরে বেড়াবে । হয়তো আপনার পাতার ঘরের সামনে এসেও আপনাকে লোভ দেখাবে, কিন্তু ধরা কিছুতেই দেবে না ।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, 'আমি আর ধরতে চাই না । উত্তেজিত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু বনের পাখিকে কব্জা করার ইচ্ছাটা মোটেই ভাল না ।

বহরিকা হেসে উঠে, ঠাট্টা করে বললেন, ‘আঙুর কল তা হলে টক বলছেন?’

আমিও হেসে বললাম, ‘এ কথা বলতে পারেন, আমি কিন্তু সেই ভেবেই বলিনি। হঠাৎ উদ্ভেজনার মধ্যে হতাশ হয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু তারপরেই ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে, নিজের ইচ্ছাটাকে থিকার না দিয়ে পারলাম না। মনে হলো, বস্তুরা বনেই স্থলর।’

বহরিকা বলে উঠলেন, ‘আমি কিন্তু আপনাকে ঠাট্টা করেছি।’

বললাম, ‘সেটা বুঝেছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।’

বহরিকা হাসতে হাসতে গাড়ির এঞ্জিন চালু করলেন। ময়ূরটি এক পলকের জন্ত চমকে তাকালো, তারপরেই আবার খুঁটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। গাড়ি এগিয়ে চললো। আন্তে আন্তে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে, গাড়ি নেমে এলো সমভল সবুজ মাঠে, বড় বড় শাল সেগুনের ছায়ায়। জীপ এসে দাঁড়ালো একেবারে মোহনবাবুর পাতার ঘরের কাছে। কারোর কোনো লাড়া শব্দ নেই। ঝাঁঝি ডাকা নিরুন্নতার মধ্যে কেবল কোয়েনার কুলুকুলু গান।

বহরিকা বললেন, ‘মনে হচ্ছে, এখানে কেউ নেই। সবাই গাছকাটার জায়গায় চলে গেছে।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘সেটা কোথায়?’

বহরিকা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, ‘মোহনবাবু এখানে যখন আস্তানা করেছেন, নিশ্চয় আশেপাশের কোনো জঙ্গলেই হবে। কিন্তু না ভেনে, শুধু শুধু ঘোরা যাবে না। সঠিক জঙ্গল না জেনে, এসব জায়গায় অকারণ ঘুরতে হয়।’

বহরিকা এগিয়ে গেলেন মোহনবাবুর বড় পাতার ঘরের দিকে। একটু নিচেই কোয়েনার বালুচরের ওপরে অনেক কয়টা ছোট ছোট দোচালা পাতার রূপড়ি। সেগুলো কোনো খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। দেখলেই বোকা যায়, নিচু হয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। ওপর থেকেই দেখেছিলাম, কুলী রেজাদের পাতার খুপরি। মোহনবাবুর পাতার ঘরটি বেশ বড়, আর মাথার চালাটাও উঁচু। বালুচরের ডান দিকেও একটি বড় পাতার ঘর রয়েছে। সেটা কার ঘর, কে জানে। তবে সে ঘরটাই সব থেকে বড় মনে হচ্ছে।

সমস্ত জায়গাটিকে অনেকটা তপোবনের মতো লাগছে। তপোবনই বলতে হবে। তপস্বী তপস্রায় বসে গেলেই হয়। ডানদিকে, কোয়েনার ওপারে রক্তিম আর কালো পাথরের পাহাড় আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, আর পাথরের খাঁজে খাঁজে শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে বিশাল মহীকহ। আরো অন্তর

অনেক গাছ, বাঘের পাতার নানা রঙের খেলা, ফুলে নানা বর্ণের কলক। কন পাহাড়ের যে এতো নানা বর্ণের কলক ফুলের গাছ থাকে, আগে জানা ছিল না। কিন্তু ওপারের পাহাড়টা, আমার মুখোমুখি হঠাৎ-ই যেন নেমে এসেছে, আর ঝাঁকানো পিঠের মতো একটা উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। তার কোল দিয়ে কোয়েনা একটা ঝাঁকের মুখে উধাও। উঁচু পাহাড়টার কোল ঘেঁষেও, অর্ধ-বৃত্তাকারে কোথায় যেন কলকলিয়ে ছুট দিয়ে, কোয়েনা চলে গিয়েছে চোখের আড়ালে। আমার ইচ্ছা করে, কোয়েনার এই হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া লুকোচুরি খেলার সঙ্গে মেতে যাই। আমিও ছুটে ছুটে তাকে খুঁজে বের করি।

বদরিকা মোহনবাবুর দরজার সামনে থেকে বললেন, ‘ঘরের আগল ভেদেখছি শক্ত করে বাঁধা। কিন্তু এই পাতার শিবির তো, কারোর পাহারার না রেখে, মোহনবাবু যেতে পারেন না।’

আমি বদরিকার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, ‘কেন?’

বদরিকা বললেন, ‘নিশ্চয়ই মোহনবাবুর বিরাট ভাঁড়ার এখানে আছে। সমস্ত কুলীকামিনদের চাল আটা খাবার-দাবার, নিজেদের খাবার-দাবার তেল ঘি মসলা সবই তো মজুদ রাখতে হয়। রোজ রোজ তিরিশ মাইল দূর থেকে সে সব আনা যায় না!’

তুলেই গিয়েছি, আমরা আছি, এমন একটা গভীর বনের মধ্যে, যেখানে থাকতে হলে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়। যেমন সমুদ্র যাত্রা করতে হলে, খাদ্য আর পানীয় মজুদ রাখতেই হয়। এখানে হয়তো পানীয় মজুদ রাখতে হয় না, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাক ইদার আছে।

বদরিকাপ্রসাদ এবার ইংরেজি ছেড়ে, দেশীয় বচনে হাঁক দিলেন, ‘হেই, ইখার কোই হায়?’ বলতে বলতে, নিচের দিকের ঝুপড়িগুলোর সামনে নেমে গেলেন। এ সময়ে আমার চোখে পড়লো, ডা-দিকের বড় পাতার ঘরের বেড়ার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে। হঠাৎ যেন মাটি ছুঁড়ে উঠলো। মাঝ-বয়সী খালি গা লোকটির পরনে একটা ময়লা হাক প্যাণ্ট, গলায় কালো কারের সঙ্গে ঝোলানো একটি ক্রস টিকচিক করছে। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, ভাবলেশহীন মুখ, ছোট ছোট চোখ দুটি লাল। মনে হয় পাথরের মুখ, কোনো অভিব্যক্তি নেই। তার দৃষ্টি আমার দিকে। লোকটার ভাব ভঙ্গি বুঝতে পারি না, একটু অস্বস্তি বোধ করি।

বদরিকায়ও চোখ পড়ে লোকটার দিকে। তিনি হাঁকলেন, ‘এই, তুমি কোন হায়?’

মুহূর্তে যেন একটা ব্যাজিকের মতো, সেই ভাবলেশহীন মুখে অত্যাশ্চর্য হাসি ফুটে উঠলো। চোখ নেই, নাক নেই, বজ্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত, গালে অনেকগুলো ভাঁজ। প্রায় কয়েক সেকেন্ড সেই অবস্থায় থেকে, সে কপালে হাত ঠেকিয়ে নিচু হতে গিয়ে, টলে পড়তে গিয়ে টাল সামলালো। বদরিকা বললেন, ‘হঁম্! বুঝছি।’

আমি বদরিকার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। বদরিকা বললেন, ‘বুঝতে পারছেন না, হাঁড়িয়া খেয়ে, মাতাল হয়ে গেছে। বোধহয় আড়ালে আবডালে কোথাও পড়েছিল, ডাক শুনে এগিয়ে এসেছে।’

আমি লোকটির দিকে ক্রিয়ে তাকালাম। হাসিটি মুখে অমলিন। কপালে হাতটি ঠেকানোই আছে, যেন কাঠের সেপাই। ষো হুঁমু ভাব। আমার হাসি পেল।

বদরিকা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুম দারু পিয়া?’

লোকটি প্রায় হেসে গুড়িয়ে বললো, ‘হবোয়া।’

বদরিকা আবার ধমক দিলেন, ‘হবোয়া ক্যায়া, তুম জরুর পিয়া।’

লোকটি ঘাড় বাঁকিয়ে একরকম ভাবেই বললো, ‘ই ই, জরুর পিয়া।’

বলেই যেন গল্গল্ করে হাসতে লাগলো, আর বাতাস লাগা কচি ডালের মতো ছলতে লাগলো। বদরিকা গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, ‘এদের কাছে এটা কোনো অস্ত্র নয়, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তা ছাড়া একলা চুপচাপ বসে করেই বা কী। খানিকটা পান করে ব্যোম্ হয়ে পড়েছিল।’

বলে আবার লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ক্যায়া নাম হায় তুমহার।?’

লোকটা যেন হাত নেড়ে নাম বলবার চেষ্টা করলো, তারপরে উচ্চারণ করলো, ‘হোরো হোরো।’

বদরিকা বললেন, ‘হোরো?’

লোকটি ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, ‘হোরো, অই অই হোরো।’

‘তুম মোহনবাবুকা কাম করতা হায়?’

হোরো ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, ‘মোহনবাবুকা।’

জবাবের ভঙ্গিটি অদ্ভুত। বদরিকা জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ কোন্ সন্ধ্যা কাম হোতা হায়, জানতা?’

হোরো ঘাড় ছলিয়ে বললো, ‘জানতা। এহি বোলক, পাঁচোয়া লাট।’

বদরিকা কয়েক সেকেন্ড ভেবে, আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘গাড়ি উধার বাতা হায় না?’

হোরো জবাব দিল, 'গাড়ি উধার যাতা।'

বদরিকা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে বসে থেকে কী হবে, চলুন গাছ কাটা দেখা যাক। বনের মধ্যে গাছ কাটা দেখেছেন কখনো?'

বললাম, 'না, চলুন দেখে আসি।'

যাবার আগে বদরিকা হোরোর দিকে, গভীরভাবে বললেন, 'ঠিকসে দেখে ভাল কবো, দারুণ পিকে মত শো যাও।'

হোরো গলগল করে হাসলো, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'আপন রেজার সাব না?'

বদরিকার গোফের ফাঁকে হাসি, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হী।'

হোরো আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সামুটা বোলক না?'

বদরিকা ফিরে চলতে চলতে শব্দ করলেন, 'হুঁম।'

হোরো চিংকার করলো, 'সালাম সাব।'

বদরিকা কোনো জবাব দিলেন না, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, জীপের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এখন সামনে থাকলেই বকবক করবে। অব্যক্তের মাহাত্ম্য থাকে বলে।'

হোরো লোকটিকে আমার ভাল লেগেছে। প্রথমে তার মুখ দেখে, একটু যেন ভয়ই পেয়েছিলাম। সেই মুখে যে এরকম একটি হাসি ফুটে পায়, ভাবতে পারিনি। তার সারল্য প্রশ্নাতীত, কথার ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে। জীপে গুঁরবার আগে, আর একবার পিছন ফিরে তার দিকে তাকলাম। সে সেই হাসি মুখটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বন পাহাড়ের ভিতরে, কোনো রাস্তাই পিচ্ বাঁধানো না। শক্ত পাথর মাটির ছরমুশ করা রাস্তা। ভারী ভারী ট্রাক কাঠ বোঝাই করে অনায়াসে চলে। কিন্তু বদরিকা এবার যে পথে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন, তা অনেকটা হুড়ং-এর মতো। বন গভীরতর, প্রায় অন্ধকার। অস্বর্ষস্পর্শ ভূমি ভেজা। কোনোরকমে কাটানো রাস্তা, বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়ানো। খানে খানে খানা খন্দ। গাড়ি সাবান্দনে চালাতে হচ্ছে। উচু নিচু মোড় আর বাঁক ফেরা কিছুটা অস্বস্তির। তারপরেই হঠাৎ চোখে পড়ে, জঙ্গলের এক পাশে মোহনবাবুর লরী দাঁড়িয়ে। উচুতে অনেকের গলার স্বর, গাছের গোড়ায় একাধিক কুড়োলের আঘাতের শব্দ। বদরিকা যেখানে গাড়ি দাঁড় করান, তারপরে আর এগোবার

রাস্তা প্রায় নেই। খানিকটা চড়াই নামলেই, একটি পারের পাতা ভোবানো নালা, তার ওপরেই কয়েক শো ফুট ওপরে, গাছ কাটা চলছে।

বদরিকার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। বদরিকা ওপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'উঠতে পারবেন তো ?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

বদরিকা একবার ধুতি পাঞ্জাবি আর পারের চপ্পলের দিকে দেখলেন। তিনি ট্রাউজার শার্টের সঙ্গে বুট পরেছেন। আমি বললাম, 'আমার কোনো অহুবিধা হবে না।'

বদরিকা এগোতে এগোতে বললেন, 'জানি। মোহনবাবু তো ধুতিতে কাছা এঁটেই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাজ করেন। সবই অভ্যাসের ব্যাপার।'

তা বটে, কিন্তু নালাটা পার হওয়া যায় কেমন করে। বদরিকা লাক্ষিয়ে পার হলেন। ঠুর পায়ে বুট। চপ্পলে একটু অহুবিধা। তবু দিলাম লাফ, বদরিকা আমাকে ধরে নিলেন। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকে আমাদের দিকে দেখছে। কে একজন ধমক দিয়ে, তাদের কাজে লাগিয়ে, নিজেই আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। মোহনবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না, এদেলবায় আমি যার অতিথি। পাহাড়টা তেমন খাড়াই না, কিন্তু ওপরে ওঠবার পথ বলে কিছু নেই, জায়গা বুঝে পা দিয়ে উঠতে হচ্ছে। একটু অমনোযোগী হলে পতনের সম্ভাবনা, আর পতন মানেই হাড়গোড় নিয়ে খেতে শক্তির কারণ আছে।

হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলো স্বর চিংকার করে উঠলো, তারপরেই প্রচণ্ড একটা শব্দ, মূল থেকে ছিন্ন হওয়া গাছের গুঁড়ির। তারপরেই গাছটির পতনের শব্দও শোনা গেল। আমরা ওপরে উঠে দেখলাম, সেখানে আর খাড়াই নেই, উপত্যকার মতো অনেকখানি অঞ্চল, গভীর বন। সবই প্রায় শাল। সুখালোকের প্রবেশে বিশেষ বাধা। বদরিকা আমাকে নিয়ে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ালেন। যে কোনো মুহূর্তেই গাছ কাটাদের সমবেত চীৎকারের সঙ্গে, বিশাল মহীকহ, ছিন্নমূল হয়ে বাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে। পড়লে যা হতে পারে, সেই পরিণতি নিয়ে চিন্তা না করাই ভাল। কেন না, তারপরে আর চিন্তা করার কিছু থাকে না।

আমাদের আসতে দেখেই, অনেকে দেখাছিল। এবার যেন সাময়িক কর্মবিরতিও দেখা গেল। সকলেই প্রায় আমাদের দিকে দেখছে। এ সময়ে,

মোহনবাবু কোথা থেকে, আমাদের সামনে হাসতে হাসতে এসিয়ে এলেন।
আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘একেবারে জঙ্গলে চলে এসেছেন?’

বললাম, ‘জঙ্গলের বাইরে আর কোথায় আছি। চারদিকেই তো জঙ্গল।’

মোহনবাবুর ধর্মা মূখ এখন একটু লাল, ঘামছেন। বললেন, ‘তা হলেও, এরকম জঙ্গলে বেশিখন থাকে কষ্টকর। ছোট নাগরী থেকে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?’

বলতে বলতে তিনি বদরিকাপ্রসাদের দিকে তাকালেন। আমি বললাম, ‘আমার সৌভাগ্য, প্রসাদজীর সঙ্গে পেয়েছি। সারাটা পথ কেমন করে এলাম, জানতেই পারিনি।’

বদরিকা এবার হিন্দীতে মোহনবাবুকে বললেন, ‘উনি তো আর এখন আপনার একলার মেহমান নন, আমাদের সকলের।’

মোহনবাবু হাত বাড়িয়ে, বদরিকার একটি হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। মোহনবাবুর এখন আর ঝোলানো কৌচা নেই। কৌচা পশ্চাদ্দেশে গিয়ে এখন মালকৌচা হয়েছে। গায়ে অবিস্ত্রি মটকার পাঞ্জাবি আছে। কিন্তু হাতা গুটানো। তিনি এমনিতেই দেখতে সুপুরুষ, এখন যেন বয়সের থেকেও অনেক বেশি যুবক দেখাচ্ছে। কিন্তু তিনি কি এর মধ্যেই কিঞ্চিৎ পান করেছেন? গাছে যেন তাই মালুম দেয়? জবাইকোলায় প্রথম দিন সন্ধ্যারাত্রে, সিংজীর বৈঠকধানাতেই গুঁকে পান করতে দেখে মনে হয়েছিল, মহাশয়ের ও ত্রব্যটিতে বিলক্ষণ আসক্তি আছে। জঙ্গল ঘুরে কাজের সময়ও যে গলা ভেজান, এটা জানা ছিল না।

এ সময়ে স্ত্রীলী এসে সামনে দাঁড়ালো, হেসে হাত তুলে আমাকে আর বদরিকাকে নমস্কার জানালো। আমাকে বললো, ‘বাক, এসে গেছেন তা হলে?’

বললাম, ‘না এসে থাকি কেমন করে বলুন। এই বনকে আপনারা একলা ভোগ করবেন, তা কি হয়?’

মোহনবাবু জবাব দিলে, ‘আমাদের ভোগ করা তো দেখছেন। নিজের হাতে গাছ কাটি না বটে, কিন্তু সঙ্গে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়।’ আইন-কাহ্ননের অনেক ঝামেলা। যে গাছে মার্কিং রেঞ্জারের মার্ক দেওয়া নেই, সে গাছে যদি কোনো কুলী ভুল করেও কুড়োল বসায়, ইজারাদার হিসাবে আমার নাম উঠে যাবে ব্লাক লিস্টে। জঙ্গল থেকে বিদায়। কোথাও আর টেওয়ার দিতে পারবো না। তা ছাড়া, আন্তানা ছেড়ে বেরিয়েছি কখন জানেন? সেই অঙ্ককার থাকতে।’

এত কথা জানা ছিল না। সংসারে কোনো কাজটাই খুব সহজ না। গ্যারে হাওয়া লাগিয়ে যাদের চলে, তাদের চলে, তারা কোটিকে গোটক। অধিকাংশকেই নিজের নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়।

সুরীন হঠাৎ টেচিয়ে উঠলো, ‘হেই যোশেক, ক্যায়্য হ্যায় ? কাম বন্ধ হো গয়া ?’

যোশেক ! এখানে আবার সাহেব এলো কে ? নরনারী সবাইকেই তো বনবাসী দেখছি। আছে, তার মধ্যেও সাহেব আছে, যদি নামেতেই সাহেব হয়। যার নাম যোশেক সে থাকি হাক প্যাণ্টের মধ্যে, ধূসর রঙের হাক শার্ট গুঁজেছে। তার পায়ে দেখছি, মোটরের টায়ার কাটা শ্রাণ্ডেল। সে হঠাৎ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে টেচিয়ে উঠলো, ‘হেই হেই, ক্যায়্য দেখতা হ্যায় ? সিনিমা দেখতা হ্যায় ? কাম করো, কাম করো।’

মেয়ে পুরুষের হাসি কথাবার্তার মধ্যে, আবার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। ঝপাঝপ কুড়ালের আঘাত পড়তে থাকে। একদল পতিত বনস্পতির ডালপালা কাটছে। আর একদল বড় গুঁড়ি দড়ি বেঁধে পাহাড়ের নিচে নামাচ্ছে, লরীতে তুলবে বলে। অল্প দল মহৌরুহের গোড়ায় কুড়োল কোপাচ্ছে। একটা আশ্চর্য দেখি, এই নিবিড় বনের মধ্যে, বেশ গরম। আমিও ঘেমে উঠছি। তার কারণ বোধ হয়, ঠান্ডা বুনাট বন। বয়ং সূর্যালোকের ফাঁকায় হাওয়া বহে, সেখানে শরীর জুড়ায়।

মোহনবাবু বললেন, ‘সুরীন তোমার তো আর তা হলে এখানে থাকা চলে না। এখন সব থেকে বড় দায়িত্ব তোমার।’

সুরীন আমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসলো। মাহুটি হয় তো সে মোহনবাবুর থেকেও বয়সে কিছু বড়। তাতে কিছু আসে যায় না। সুরীন হলো জরাইকেলার মোটর মেকানিক। মোটর মেকানিক ছাড়া, এ অঞ্চলে কাজ চলে না। কখন কোন্ গাড়ি বিগড়ে বসে থাকবে, সেজন্ত কলকাতা বা টাটা বা রৌরকেলার মুখ চেয়ে বসে থাকা যায় না। তথাপি, শুনেছি, বর্ষাকালে, কলকাতার মোটর মেকানিকদের এখানে ডেকে নিয়ে আসা হয় মোটা মজুরি দিয়ে। জুন জুলাই আগস্ট, তিন মাস বনের গাছ কাটা আইনের দ্বারা বন্ধ। সে সময় যে কেবল গাছেরাই বাড়ে, তা না। ট্রাক লরী চলবার মতো অবস্থাও রাস্তা-ঘাটের থাকে না। তখন লরীগুলোর সেরামতি কাজ চলে।

একলা সুরীন আর কতো লরী সেরামতি করবে। তবে, সে হলো বারো

মাসের লোক। তার মেয়ামতি কাজ বারো-মাসই চলে। মোহনবাবু ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মাঝ পথে গাড়ি খারাপ হলে যেন পথে পড়ে থাকতে না হয়।

মোহনবাবু স্ত্রীনের কোন্ দায়িত্বের কথা বলছেন? আমার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীনের সলজ্জ হাসিরই বা কারণ কী? মোহনবাবু নিজেই তার জবাব দিলেন, ‘স্ত্রীন আজ আপনাকে মুগী পাতুরি খাওয়াবে।’

‘মুগী পাতুরি? কশ্মিনকালেও কুস্কুটরন্ধনের এমন নাম শুনিনি। মাছের পাতুরি হয় জানি, মুগীর পাতুরি বস্তুটি আবার কেমন? বললাম, ‘মুগী পাতুরির কথা কখনো শুনিনি তো?’

মোহনবাবু বললেন, ‘শোনেননি, আজ একেবারে স্বাদ নিয়েই দেখবেন। স্ত্রীন অনেক কিছুই রঁধতে জানে, তার মধ্যে মুগী পাতুরি একটি।’

স্ত্রীন বললো, ‘তা হলে আমি চলে যাই, বেলা তো কম হলো না।’

মোহনবাবু বললেন, ‘ই্যা, তুমি চলে যাও। আমরা একটু পরে যাচ্ছি।’

দায়িত্বপরায়ণ স্ত্রীন আর দেরি করলো না, আর একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে, নমস্কার করে চলে গেল। স্ত্রীনের বিনয়, নমস্কার বারে বারে দেখতে হয়। জরাইকেলাতেও দেখেছি, দিনে যতবারই দেখা হোক, নমস্কার আর হাসিটি ঠিক আছে।

স্ত্রীন বিপত্নীক, দুটি না তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। এখনো সে ঘরে কোনো ঘরনী আনেনি, কিন্তু এক রকমের ঘরনী তার আছে। জরাইকেলায় আমি যে-বাড়ির অতিথি ছিলাম, সেই বাড়িতে সংসারের রান্নাবান্না দেখাশোনা যাবতীয় যে করে, তার নাম জেমা, একটি মুণ্ডা যুবতী। সে বাড়িতে এখন মহিলা বলতে কেউ নেই, জেমা ছাড়া। জেমা গুর জন্ম থেকে সে বাড়িতে আছে। তার মা যখন সে বাড়িতে কাজ করতো, তখন সে বাড়ির ইজারাদার পরিবারটি ছিল জমজমাট, লোকও ছিল অনেক। তারপরে কালের প্রবাহেই, সংসারের নানান ভালপালা, নানা দিক ছড়িয়ে গিয়েছে। ইজারাদারি গিয়েছে, এখন কিছু জমি আর লরীর ব্যবসা। বাড়িটিও বিরাট। দেখাশোনার জন্ত আছে দুই ভাই, গোপাল আর নিতু, দু’জনেই অবিবাহিত। বাকি সব কলকাতায়।

জেমা কেন সেখানে? তার তো এতদিনে বিয়ে হয়ে, ছেলেমেয়ের মা হয়ে, কোনো জল্পলে থাকার কথা। না, তা হয়নি। তবে জেমার বিয়ে হয়েছিল এক মুণ্ডা জোয়ানের সঙ্গেই। বিয়ের পরে বোঝা গিয়েছিল, বাঙালী পরিবারে

অন্ন থেকে বাঁচব হয়ে, বাঙালী আচার আচরণে অভ্যস্ত, আর বাঁচ থেকে, সে একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। স্বামীর ঘর সে করতে পারেনি, ফিবে এসেছিল সেই বাড়িতেই। স্বামী ছেড়ে আসাটা এই বনেন সমাজে, তেমন একটা কিছু অভাবনীয় ব্যাপার কিছু না। সাবেক কালের বড়ো কর্তার কাছে তার প্রার্থনা ছিল, সে চিরদিন তাঁর বাড়িতে থাকবে, কাজ করবে, অল্প কোথাও যাবে না।

কর্তা রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু জানতেন না, ভবিষ্যতে একদা, সেই বৃণ্ডা ঘেরটিই তাঁর জরাজীর্ণ সংসারের কর্ত্রী হয়ে উঠবে। জেমার সেই কর্তারূপ আমি দেখে এসেছি। কর্ত্রী বলতে, কর্তৃত্ব সে কিছুই করে না। অথচ তাকে বাঁচ দিয়ে, কিছুই চলে না। গোপাল তাকে বোনের মতো দেখে, নিতু দিদির মতো। সে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা জেমার আছে। তার কালো স্ত্রী চেহারা মধ্য আমি একটি বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখেছি। তার অত্যাধিকার ভু মুখ হইনি, তার হাতের স্বাভাৱী বাঙালী ব্যক্তির স্বাভাৱে রসনাও তৃপ্ত করেছি।

সেই জেমার সঙ্গে যে স্বরীনের সম্পর্কটি কেমন, তার সঠিক ব্যাখ্যা কেমন করে করা যায়। জানি না। দেখেছি, স্বরীন রান্না ঘরে বসে বসে জেমার সঙ্গে গল্প করে। তাদের কথাবার্তা হাসির টুকরো কানে এসেছে। অথচ, আমাদের সামনে এলেই, জেমা স্বরীনের দিকে সহজভাবে তাকাতো পারে না। তার চোখের দৃষ্টি বদলে যায়, ভাষা আর স্বরের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি।

নিতুর মুখেই শুনেছি, জেমা তার বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে যায় স্বরীনের বাড়িতে। রান্নাবান্নায় সাহায্য করে আসে। স্বরীনের ছেলেমেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে আসে। ছুপুরবেলা নিতু আর গোপালকে খাইয়ে স্বরীনের বাড়ি গিয়ে, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে আসে। সকাল ছুপুর বিকাল সন্ধ্যায়, নিজের শত কাজের মধ্যেও। স্বরীনের সংসারের দায়িত্ব সে এভাবেই পালন করে চলেছে।

এবার ভাবো, জেমা স্বরীনের সম্পর্ক কী? সেই বাউল গানের কথা মনে পড়ে যায়, ‘আমি না হবো সতী, না হবো অসতী, স্বামীর ঘর তো করবো না।’ স্বরীন-জেমা, সেই বাউল গানের রহস্তে বিবাজ করে নাকি, কে জানে?

তবু জেমার আরণ্যক স্ফুটিত শরীরের দিকে তাকিয়ে, মনের মধ্যে একটা কল্পনাজিহ্বা জাগেই। ওর জীবনে ফুল কি ফুটেবে না? ফল কি ধরবে না? কার কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে, জানি না।

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার, এত অন্তমনস্ক কেন?’

সচকিত লজ্জায় হেসে বললান, ‘না না, অন্তমনস্ক হবো কেন?’

মোহনবাবু বললেন, ‘জানি, আপনি স্বরীনের কথা ভাবছিলেন।’

আমি বদরিকার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে বললাম, ‘ঠিকই বলেছেন। লোকটিকে আমার সত্যি ভাল লেগেছে।’

মোহনবাবু বললেন, ‘আপনার হয় তো! এমনিতে দেখে ভাল লেগেছে। আমি আমার জীবনে এমন সৎ বিশ্বাসী অথচ গরীব মানুষ কখনো দেখিনি। আর স্বরীন অত্যন্ত সরল। মেকানিক হিসাবেও বেশ ভাল। লোকে ওকে প্রচুর খাটায়, কিন্তু পুরোপুরি মজুরীটুকু দেয় না। ও তার অস্বাভাবিক করে না। এ নিয়ে অনেকদিন বলেছি। হাসে, চুপ করে থাকে।’

স্বরীন হলো, সেই জাতের মানুষ, নিজের কাজে বার গাফিলতি নেই, বিরোধ থেকে দূরে। নিজের মনের জগতে বিরাজ করে, সেই জগতেই তার চলাফেরা। এমন লোকেরা অমূল্যভূমির মানুষের স্নেহ পায়, স্বার্থান্বেষীদের কাছে জোটে বিক্রপ, কারণ ও যে নির্বিরোধী ভাল মানুষ। আমি তাই অল্প কথা। স্বরীন ওর যে মনের জগতে চলে ফিরে বেড়ায়, সেই জগতে জেমা নানো বস্তু-মুণ্ডানীর অবস্থানটি কেমন, এবং কোথায়?

হঠাৎ গানের সুরে, বাঁ দিকে তাকাই। ঘাড় বাঁকিয়ে একটি মেয়ে, আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে। হাতে তার একটি ধারালো কাটারি, যার শানিত বলক যেন তারই কালো চোখে। মুখখানি চিনি চিনি মনে হচ্ছে, অথচ চিনতে পারছি না। সে একবার যেন ঘাড়ও দোলালো, তার পরে খিলখিল হেসে, কটিপাথরের শরীরে, প্রাণ-সঞ্চারি লহরী তুলে, কাটারি দিয়ে মহীকহের ভালপালা কাটতে লাগলো।

মোহনবাবু বললেন, ‘চিনতে পারলেন না? এ তো সেই স্বরতিয়া, জরাইকেলা থেকে আসার সময়, লরীতে উঠেছিল।’

মনে পড়ে গেল। জরাইকেলা থেকে ছোট নাগরার পথে, স্বরতিয়াকে দেখেছিলাম। সে একলা ছিল না সঙ্গে ছিল ওর দিদি সোমারি, সোমারির স্বামী গুরুম। নামের সঙ্গে মানে আছে, একজনের জন্য সোমবারে, আর একজনের গুরু। কিন্তু স্বরতিয়া নামটি খাটি মুণ্ডা বলে মনে হয়নি। এ নাম যেন সমতলের গ্রাম জনপদের, মুণ্ডা ওরাওরা যাদের দীর্ঘ বলে। হয়তো সরস্বতী থেকে স্বরতিয়ার আটপোরে উচ্চারণ। মোহনবাবুর লরীতে আসবার সময় দেখেছিলাম, প্রায় নেংটি পরা একটি শিকারী পুরুষ, হাতে তার তীর ধরুক, সঙ্গে ছই সঙ্গিনী। প্রথমে মোহনবাবুরই চোখে পড়েছিল, চিনতে পেরেছিলেন, ওরা তাঁরই ঠিকাদারীর অধীনস্থ কুলী আর রেজা। এদেলবান যাদের পাতাল

ঘর তৈরি করার কথা, তারা স্বচ্ছন্দে শিকারে বেরিয়ে পড়েছিল। মোহনবাবু লরী খামিয়ে, ওদের বকে ধমকে তুলে নিয়েছিলেন। আমি ইচ্ছা করেই, লরীর পিছনে সুরীনের সঙ্গে বসেছিলাম, খোলা আকাশের নিচে বন দেখতে আসবো বলে।

সুরসতিয়া ওর দিদি আর ভগ্নপতির সঙ্গে, পিছনেই উঠেছিল। সোমারির খাটো কাপড়ের কৌচড়ে ছিল, নিহত রক্তাক্ত একটি বনমোরগ। তিনটি টায়ারের মাঝখানে ওরা বসেছিল। শুক্রম অনায়াসে ওর যুবতী পত্নী সোমারির কোমর জড়িয়ে ধরে বসেছিল। সুরসতিয়ার খাটো উদাস আঁচলের কাছে যেন পাখরের মূর্তির বুকে রোদ পড়েছিল। আমার দুটি কঁপে গিয়েছিল যেন। ভেবেছিলাম, কোণারকের শিল্পীরা কি এই সব মূর্তি দেখেছিল। ভাস্কর্যে যেন এদেরই দেখেছিলাম মন্দিরের গায়ে।

নামধামগুলো বলে দিয়েছিল সুরীন। সুরসতিয়া ছোট, বোধহয় সত্যের আঠারো, তার চেয়ে কিছু বেশি সোমারি। শুক্রম সোমারির থেকে বিশেষ বড় না। একটু পরেই, সুরসতিয়ার একটা করে গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠেছিল, আর দুই বোন আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। তারপরে এক সময়ে দুই বোনই গুনগুন করে এক এক কলি গাইছিল, আর আমাকে দেখে দেখে হাসছিল। ব্যাপার যখন কিছুই বুঝতে পারছি না, তখন সুরীন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ওরা আমার সিগারেটের টিন আর সিগারেট খাওয়া নিয়ে, গান করছিল, যার ভাষাটা ছিল এইরকম, 'অচেনা নতুন এক ইজারাদার দেখছি। তার ধূমপানের গন্ধটি মিঠে। বাবুর হাতের টিনে মনে হয় অনেক সিগারেট আছে, বাবু বেশ খানদানি। এমন মিঠা গন্ধের সিগারেট, বাবু কি আমাদের দিতে পারে না? একলা খাওয়াতে কোনো স্থখ নেই।'।

খুব অবাক হয়েছিলাম, যখন সুরীনের কাছে গুনলাম, গানগুলো তখনই তৈরি করে ওরা গাইছিল। অনেকেই নাকি এরকম পারে। অনেকটা কবিগানের মতোই, তাত্ক্ষণিক সৃষ্টি! ওদের সিগারেট দিয়েছিলাম। তারপরে সুরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে, বোনের দিকে ফিরে হেসে হেসে গান গেয়েছিল, যার অর্থ; 'মাহুঘটার মন বড় দরাজ। আমি চাইলে বোধহয় একটা পুরো পাহাড় দিয়ে দেবে। মাহুঘটার মন বেশ ভাল।'।

অদ্ভুত গান, পুরো একটা পাহাড়ের আকাঙ্ক্ষা সুরসতিয়ার। আসলে সেটাই বোধহয় এদেশের প্রার্থনা, একটা পাহাড় মানে, ভূমি আর বনসম্পদ লাভ। গান শুনে অবাক না হয়ে পারিনি, তার চেয়ে বেশি মুগ্ধতা। স্বীকার না করে উপায়

নেই, স্বরসত্তিয়া যখন আমার দিকে তাকিয়ে, আবার ওর দ্বিধা চোখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল, মনে হচ্ছিল, আমাকে যেন ও ওদের আহিব মন্ত্রে মুগ্ধ করছে। স্বরসত্তিয়া যেন এই গভীর বনের উদ্ভাস আমার রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ছোট নাগরা থেকে, ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কথা ছিল এদেরবার আবার দেখা মিলবে। স্বরসত্তিয়া গান গেয়ে, হেসে, জানিয়ে দিল, এই সেই প্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। আমি কুলী রেজাদের ভিড়ে সোমারি আর শুক্রমকে খুঁজলাম। দেখতে পাচ্ছি না।

বদরিকা প্রসাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাকে কি ওই মেয়েটি চেনে?’

তিনি চোখের ইশারায় স্বরসত্তিয়াকে দেখিয়ে দিলেন। বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি ওকে কখনো সিগারেট দিয়েছিলেন?’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী করে জানলেন?’

বদরিকা হেসে বললেন, ‘মেয়েটি গান গেয়ে, সে কথাই বললো।’

কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বললো?’

বদরিকা বললেন, ‘ও বলছে, এই যে আমার সেই সিগারেটবাবু এসেছে।

কিন্তু বাবু আমাকে এখনো দেখতে পায়নি।’

আমি অবাক আনন্দে স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকালাম। পাতার আড়ালে ওর মুখ, কিন্তু চোখ দুটি আমার দিকে। যেন ইচ্ছা করেই মুখখানিকে একটু আড়াল করার চেষ্টা, লুকাচুরি খেলা। চোখে হাসির ঝিলিক। ওর দুই কাঁধই খোলা, সেখানে বোদ পড়েছে যেন কোমল কষ্টিপাথরের গায়ে। বোধহয় কাজের সুবিধার জন্ত, বুক ঢেকে, আঁচল কুক্ষিতলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে, আবার বুকের এক পাশেই গুঁজে দিয়েছে। ওর সঙ্গিনী কর্মরত মেয়েরা, ওকে দেখছে, আমাকে দেখছে, আর হাসাহাসি করছে।

মোহনবাবু বললেন, ‘আমি আবার ওদের মুণ্ডা ভাষার মুণ্ডুও বুঝি না। প্রসাদজী না থাকলে, আপনাকে বুঝিয়ে বলবার কেউ ছিল না।’

বদরিকা বললেন, ‘আসলে মেয়েটি নিজের উপস্থিতি জানানোর জন্তই, গান গেয়ে উঠেছিল।’

মোহনবাবু বললেন, ‘স্বরসত্তিয়া মেয়েটা বেশ ভাল, চালাক-চতুর, কিন্তু পাজী আছে।’

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাই নাকি?’

মোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আমার কাজ করে, দলের ছেলেরা সবাই ওর পেছনে ঘুর ঘুর করে। ও সবাইকেই ভাল দিয়ে চলেছে, কিন্তু কারোর কাছে ঘেঁষে না, ঘেঁষতেও দেয় না। রীতিমতো কমপিটিশন চলছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কমপিটিশন? কিসের?'

'কমপিটিশন একটাই, তাকে বিয়ে বলুন, আর প্রেমই বলুন।' মোহনবাবু বললেন।

বদরিকা বললেন, 'সেটাই তো নিয়ম। না খেললে আর মিলনের মজা কোথায়? কিন্তু মোহনবাবু, আমি এবার যাই। আমাকে বড় জামদার যেতে হবে, আজই আবার ফিরতে হবে।'

মোহনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব! না খেয়ে আপনি কোথাও যাবেন না। স্নায়ু চলে গেছে, এক ঘণ্টার মধ্যে ওর রান্না শেষ হয়ে যাবে।'

বদরিকা বিব্রতভাবে হেসে বললেন, 'আপনার কাছে খেয়ে, তারপরে বড় জামদার গিয়ে আজ সন্দের মধ্যে আমি আর ফিরতে পারবো না।'

মোহনবাবু বললেন, 'একটা রাত থেকে যাবেন বড় জামদার। আপনাদের এতো তাড়াহুড়ো কিসের? এখন সিংজীর কথা বলুন, তিনি কবে আসবেন?'

'বদরিকা বললেন, 'যে কোনোদিন আসতে পারেন, আমাকে সেইরকমই বলে দিয়েছেন।'

আমার আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনতে ইচ্ছা করছিল না। চারপাশে ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করছে। মোহনবাবুকে বললাম, 'আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখবো?'

মোহনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখবেন। আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'আমার জন্তু ব্যস্ত হবেন না। আপনারা কথা বলুন, আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি।'

মোহনবাবু বললেন, 'দেখুন, তবে একটু সাবধানে। যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানে লক্ষ্য রাখবেন, গাছটা কোন্‌দিকে পড়ে। আর যেখান থেকে গাছের গুঁড়ি ঠেলে গড়িয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে সেদিকেও খুব সাবধান।'

আমি চলতে চলতে বললাম, 'লক্ষ্য রাখবো।'

সামনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে, আমার প্রথমেই, আবার দৃষ্টি গেল অসুস্থতার দিকে। এখন ওর মুখ পাতার আড়ালে লুকানো নেই। ভালের

গারে কাটারির কোপ দিচ্ছে, কিন্তু দৃষ্টি সেদিকে নেই। কৌতূহলিত চোখে, তাকিয়ে আছে, আমার দিকে।

পিছন থেকে মোহনবাবু বললেন, ‘আপনি একটু স্বরসত্তিয়ার সঙ্গে দেখা করে যান, ও আমার জন্তই বোধহয় আসতে পারছে না, আমার কাজেও কীকি দিচ্ছে।’

বলে হেসে উঠলেন। আমিই যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিন্তু লজ্জার অবকাশ স্বরসত্তিয়ার নেই। ‘এই হচ্ছে বনের মাহুকের বস্ত্র সরলতা। তার লুকোছাপার কিছু নেই। সে তার নিজের মতো করেই, নিজের উপস্থিতির সংবাদ দেয় এবং অনায়াসেই হুঁচোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমি যে ওর সিগারেটবাবু। ওকে চোখে পড়েনি বলে, গান গেয়েই সেটা শুনিয়ে দিয়েছে।

আমি ওর দিকে এগোতে গিয়ে, থানিকটা এগিয়ে থমকে গেলাম। কী করে ওর কাছে যাবো? ও তো রয়েছে এক পতিত বৃহৎ বনস্পতির ডালপালার গভীরে। কিন্তু তার জন্ত আমাকে ভাবিত হতে হলো না। ও কাটারির অগ্রভাগ ডালের গায়ে কোপ দিয়ে বসিয়ে, ডালপালা সরিয়ে, উঁচু নিচু হয়ে, নানান ভাবে, আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর কপালে, নাকে, চিবুকে ঘাম জমেছে। কিন্তু কাজ করতে আসা মানে তো কেবল কাজই না, প্রসাধনেরও প্রয়োজন আছে। অতএব খোঁপায় গোঁজা এক গুচ্ছ শাদা ফুল রয়েছে, যদিও রোদে এখন কিঞ্চিৎ মলিন। ফুলের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি সবুজ পাতাও আছে। ফুলের নাম জানি না। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে, শাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসলো। একটু লজ্জার ছটা আছে মুখে কিন্তু তা লজ্জাবতী লতার মতো গুটিয়ে যাওয়া না। আমার মুখের দিকে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, তার নিজস্ব হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, ‘চলা যাতা?’

বললাম, ‘না। আমি একটু তোমাদের কাজ দেখছি।’

স্বরসত্তিয়া ঘাড় কাত করে আমার কথা শুনলো, হাসি মুখেই তুম্ব কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ‘কাজ দেখুঁসি ক্যান্না?’

হেসে ফেললাম, বুঝলাম, আমার খাটি বাঙলা কথা ও বুঝতে পারেনি। তবে স্ববিধা একটাই, হিন্দী আমার বা ওর কারোরই মাতৃভাষা না। অতএব ব্যাকরণের তুল নিয়ে, আমাদের মধ্যে কথা বিনিময়ের অস্ববিধা হবে না। বললাম, ‘চলা নহি যাতা, তুম্ লোগ্কা কাম দেখতা।’

স্বরসত্তিয়া ঘাড়ের একটা জোরে, ঝাঁকুনি দিয়ে হাসলো। অর্থাৎ আমার কথা বুঝেছে। জিজ্ঞেস করলো, ‘তুম্ হিঁন্না রহেগা? এদেলবা?’

যেন মাথা চুলিয়ে ও নিজেকেই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, 'হাঁ, রহেগা।'

স্বরসতিয়ার চোখে ঝিলিক, জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়া কিনার গুইয়ো মে?'

গুইয়ো শব্দের মানে, বদরিকাশ্রসাদেব কাছে জেনেছিলাম, পাতার ঘর। কিন্তু গাড়া কিনারাটা কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়া কিনার কই?'

স্বরসতিয়া হাত তুলে একদিকে দেখিয়ে বললো, 'কোয়েনা গাড়া কা কিনার মে গুইয়ো বানায় না?'

কোয়েনা গাড়া! অর্থাৎ কোয়েনা নদীর ধারে পাতার ঘরের কথা বলছে। বললাম, 'হাঁ হাঁ, কোয়েনাগাড়া কিনার গুইয়ো মে রহেগা।'

স্বরসতিয়া চোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো। হাসি মুখে হাত চাপা দিয়ে, ঝুঁকে পড়লো। আমার কথায় হঠাৎ হাসির কী ছিল বুঝতে পারলাম না। আমিও হেসেই জিজ্ঞেস করলাম, 'হাসতা কাহে?'

স্বরসতিয়ার ক্রমশ কালো মুখ হাসিতে উজ্জল, বললো, 'খুশি লাগতা না?'

কথার স্ত্রী অদ্ভুত। খুশি লাগতা না? মানে কী? খুশি লাগছে না? স্বরসতিয়া তর্জনী দিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বললো, 'তুম গুইয়ো মে রহেগা, হামকা খুশি লাগতা।'

বলে তর্জনীটি নিজের বুকে ঠেকালো। কথা বুঝে নিতে হবে। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হাঁ হাঁ, হাম তি খুব খুশি। তুম কা দিদি অর শুক্রম কই?'

স্বরসতিয়া বাঁ হাত তুলে দেখিয়ে বললো, 'উধার মে কাম করতা।'

আমি বললাম, 'বাদ মে দেখা হোগা। আভি হম ঘুমকে দেখতা।'

স্বরসতিয়া ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো, কিন্তু কিক ফিক করে হাসতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'হাসতা কাহে?'

স্বরসতিয়া ভুরু কঁচকে, ঘাড় নেড়ে বললো, 'খুশি লাগতা না?'

তাও তো বটে, খুশি লাগছে না? আর খুশি লাগলে তো এরকম করে হাসতেই হয়। ওর কাছ থেকে চলে যাবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'সিগারেট পিয়েগা?'

ও ঘাড় নেড়ে বললো, 'আতি:নহি। সাঁজ মে পিয়েগা।'

বলে ওর কালো চোখের তারায় ঝিলিক দিল। আমি অন্ধ দিকে গেলাম। যাবার সময় লক্ষ্য পড়লো, অনেক জোয়ান-জোয়ানীরা আমার দিকে তাকিয়ে বেখছে, হাসাহাসি করছে। একটি প্রকাণ্ড মহীকহের গোড়ায়, তিনটি কুড়াল চলছে এক সঙ্গে, তিন দিক থেকে। গাছটির ওপর দিকে, মোটা দড়ি বেধে,

হুঁ করে কয়েকজন টেনে ধরে আছে। সময় হলেই টান দেবে। নিহত বনস্পতি ভূতলে পড়বে।

গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বৃক্ষের হাসি কান্না শুনতে পান, বৃক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। সে কথা মনে হলে, একে বলতে হয় বৃক্ষমেধ। গাঙ্গুলিমশাই হলে বোধহয়, এই মরণোন্মুখ বিশাল বৃক্ষের মৃত্যু আত্মনাদ শুনতে পেতেন। আমি পাই না। তাঁর মতো এমন গভীর আরণ্যক অহুভূতি আমার নেই। তবে এ কথা মনে হয়, যে বৃক্ষটিকে কাটা হচ্ছে, তার বয়স সম্ভবত শতবর্ষ, কিংবা তারো বেশি। এই বনের শত শত বৎসরের অনেক প্রাকৃতিক উত্থান পতনের সাক্ষী এই সব বনস্পতিরা। যাদের দেখলেই ঋষির মতো, বৃক্ষ গভীর অথচ স্নিগ্ধ মনে হয়।

কাঠুরিয়াদের মধ্যে একজন হঠাৎ কোপানো ধামিয়ে আমার দিকে তাকালো। খালি গা, গলদঘর্ম লেংটি পরা কাঠুরিয়া হেসে, কপালে হাত ঠেকালো। দেখলাম, শুক্রম। সুরসতিয়ার ভগ্নীপতি। চিনতে পারিনি। তাকে প্রথম দেখেছিলাম, তাঁর ধুক হাতে, শিকারীর বেশে। তারপরে নিতান্ত বনবাসী স্বামী, যে সারির পিছনে, যুবতী স্ত্রীকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। লজ্জার অবকাশ কারোই ছিল না। তাদের কাছে জীবনটা এই বকমই। এখন সে কুঠার হাতে কাঠুরিয়া। আমি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললাম, ‘শুক্রম না?’

শুক্রম জবাব দিল, ‘হাঁ তো। তুমি কব আয়া বাবু?’

বললাম, ‘খোড়া আগো’।

তারও সুরসতিয়ার মতোই জিজ্ঞাসা, ‘রহেগা?’

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। সে বললো, ‘বহুত আচ্ছা।’

ইতিমধ্যে অচ্য কাঠুরিয়ারাও আমার দিকে, আর জিজ্ঞাসা নিয়ে দেখছিল। আমি সরে গেলাম। চারদিকেই বৃক্ষমেধের বিরাট যজ্ঞ চলেছে। কর্তন পতন ক্লেপন, সেই সঙ্গে সকলের নানা স্বরের চিংকার, বনভূমি সচকিত। আমি ঘুরতে ঘুরতে, একটু ওপরের দিকে গেলাম। ওপরের দিকে বন একটু ফাঁকা, পায়ের তলায় অজস্র ঝরাপাতা, মাটি দেখা যায় না। এক এক জায়গায়, এক ধরনের লম্বা ঘাস, হলুদে সবুজ মেশানো। ঘাসের গা খরখরে। হঠাৎ চোখে পড়লো, একটি গাছতলার ছায়ায়, ঘাসের ওপরে একটি লোক শুয়ে আছে। খাকী হাক প্যাণ্ট আর হাক শার্ট তার গায়ে। কোমরে চণ্ডা বেন্ট, সামনের দিকে পেতলের তক্তায় কিছু খোদাই করে লেখা আছে। লোকটি কাত হয়ে

শুয়ে খাকার জন্ত, লেখা পড়তে পারছি না। তার কোলের কাছে একটি কুঠার। কুঠারের হাতলের কাঠটি চকচকে, কুঠারের লোহার ফলাও স্বক স্বকে, একেবারে লাধায়ণ কুঠারের মতো না।

আমি পাশ দিয়ে ষাণ্ডয়ার সময়ই লোকটি চোখ মেলে তাকালো। আরম্ভ চোখ। আমাকে দেখেই সে উঠে বসলো। না দাঁড়িয়েই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলো। প্রায় হোবোর মতোই, নাক চোখ বিহীন একটি হাসি দেখা গেল তার মুখে। আমিও কপালে হাত ঠেকিয়ে, প্রত্যুত্তরে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোঁন ছায় ?'

সে বললো, 'হম ফরেষ্ট গার্ড ছায়। ইয়ে ছায় হমারা সরকারি তবলা।'

বলে কুঠারটা হাতে তুলে দেখালো। দেখাচ্ছে কুঠার, বলেছে তবলা, তার মানে কী ? কুঠার দিয়ে কর্তন হয়, তবলায় বাদন। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবলা কয়রা ছায় ?'

ফরেষ্ট গার্ডের মুখে সেই অনির্বচনীয় হাসি, বললো, 'ইসকো হমলোগ তবলা কহতা ছায়, তবলা। আপ-লোগ্কা কুঠার। না ?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইসকো মৃণ্ডমে তবলা কহতা ছায় ?'

সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'জী। এ ছায় সরকারি তবলা, ফরেষ্ট গার্ডকা লিয়ে।'

বলে সে তার কোমরের বেণ্টের তকমা দেখিয়ে বললো, 'ইসমে জঙ্গল অর হমারা ব্লক কা নাম লখর লিখ্খা ছায়। আপ কাহাসে আয়া বাবুজী ?'

বললাম, 'কলকাতা সে।'

'জঙ্গলকা ইজারা লেনে খাতির ?'

নতুন বাবু দেখলে, সকলের একটাই ধারণা, একটাই জিজ্ঞাসা। হেসে বললাম, 'নহি। হম জঙ্গল ঘূমনে আয়া।'

ফরেষ্ট গার্ডের মুখে আবার সেই নাক চোখ চাকা পড়া হাসি, ঘাড় ছুলিয়ে বললো, 'আপ মোহনবাবুকা মেহুমান ছায় ?'

বললাম, 'ইয়া, আভি মোহনবাবুকা মেহুমান ছায়। সিংজী সাহাব আনে সে, উনকো মেহুমান হো যারেগা।'

আমার কথা শেষ হতে পেল না, ফরেষ্ট গার্ড উঠে দাঁড়িয়ে, আর একবার আমাকে সেলাম ঠুকে বললো, 'আই বাপ্., আপ সিংজী সাবকা মেহুমান ? জঙ্গল মে সিংজী সাবকো সবকোই রহত ইজ্জত দেতা ছায়।'

সিংজী সাহেব দেখছি, বনের অগতের সবথানেই একটি বিশেষ চরিত্র।

কেবল যে সম্মান, তা না। সিংজী সাহেবকে ঘিরে, একটা ভয় মেশানো সম্মান সর্বত্র। ব্যক্তিটিকে দেখে, আমিও কিছুটা তাই অহুমান করেছিলাম। তা ছাড়া, মোহনবাবুর কাছে, ইতিমধ্যেই তাঁর বিষয়ে অনেক কোতূহলোদ্দীপক কথা শুনেছি। তার মধ্যে সিংজী নিজের ট্রাজেডিটাই এখনো পর্যন্ত আমার কাছে বহু বলে মনে হয়েছে। তাঁর একমাত্র সম্মান পোলিওতে ভুগছে, ছেলেকে চলতে ফিরতে পারে না। তাঁর স্ত্রী থাকেন টাটায়। ছেলের কথা যখন বলেছিলেন, মনে হয়েছিল তার স্বচ্ছ হৃদয় বলকানো চোখের কূলে যেন একটি অসহায় পিতার কান্না থমকে আছে। আর একটি মেয়ের কথাও শুনেছি, যার নাম সীমা। সীমা একটি ওড়িয়া-বাঙালী সংমিশ্রিত ভারতীয় মেয়ে, যার রূপ যৌবন নাকি পুরুষ মাত্রেই রক্তে দোলা দেয়। সে নাকি নাচ গানও জানে। সিংজী সাহেব তাকে কটক থেকে এনে রাউরকেলার রেখেছেন। মোহনবাবুর ভাষায়, ‘প্রেমিকা বা কংকোবাইন’ যা খুশি ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সেই সীমাকে ভাল লেগেছে এক জার্মান সাহেবের, রাউরকেলার ইম্পাতগড়ে যার প্রতাপ প্রতিপত্তি অখণ্ড। সিংজী সাহেবের স্টীলের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসাও ছোটোখাটো না। অগত্যা, অনিবার্যভাবেই, সীমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে সেই জার্মান সাহেবের হাতে। কারণ, মোহনবাবুর ভাষায়, ‘জগৎটা চলেছে, গিভ আপাণ্ড টেক পলিসিটে।’

আমি ফরেস্ট গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমলোগ্ সিংজী সাহেবকে সবকোই বহুত মান্তা।’

ফরেস্ট গার্ড সিংজী সাহেবের উদ্দেশ্যেই কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, ‘স্ট্রা বাবুজী, সবকোই মানতা। ডিকো তক উনকো বহুত মানতা।’

ডিফো মানে ডি. এফ. ও.। ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার যাকে বলে। ফরেস্ট গার্ডের উচ্চারণে, সেটাই ডিফো।

আমি হেসে বললাম, ‘তুমকো খাড়া হোনে কা কোই অকরন্ত নহি হ্যার, বয়ঠো।’

ফরেস্ট গার্ড অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললো, ‘নহি সাব, আপকো সামনে বৈঠনে নহি সক্তা।’

ইতিমধ্যেই সামান্য বাতাসে, ফরেস্ট গার্ডের নিঃশ্বাসে, মমের গন্ধ পেয়েছিলাম। তার আরক্ত চোখ আগেই তা জানিয়ে দিয়েছিল। তার ওপরে সিংজী সাহেবের মেহমান আমি, থাকে ওরা প্রায় আলৌকিক ব্যক্তি বলে মানে, ওকে বসাই, সাধ্য কী আমার। অতএব, নিজেকেই সরে গিয়ে, ওকে শ্রদ্ধা দিতে হয়। সবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুম ইখার ক্যারা করতা?’

ফরেস্ট গার্ড বললো, 'মোহনবাবুকা কাম হোতা হায়। হম ফরেস্ট গার্ড হায়। হমকো দেখনে হোতা হায়, ঠিক ঠিক গাছ কাটতা কি নহি।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'উ ক্যায়া হায়?'

ফরেস্ট গার্ড ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য, যে গাছের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, সেটা দেখিয়েই বললো, 'এ যো পেড় হায়, ইসকো ছাপ মায় দেতা হায় মারাকিং রেঞ্জার। হম দেখতা হায়, ইজারাদারবাবু ওহি মারকাবালা পেড় ছোড়কে, দুসরা নহি কাটতা হায়।'

অনেকটা বোঝা গেল। মারাকিং রেঞ্জার মানে, মার্কিং রেঞ্জার। সে যে পাছে মার্ক করে দেয়, সেই গাছ ছাড়া, ইজারাদারের কাটবার অহুমতি নেই। ফরেস্ট গার্ড সেটা দেখাশোনা করে। দেখাশোনা যে কী রকম করছে, সেটা তো তার সুরাপান এবং নিদ্রা থেকেই অহুমতি। জানি না, তার এই নিদ্রার মধ্যেও, সেই 'গিভ অ্যাণ্ড টেকের' নীতি আছে কী না। এটা মোহনবাবুরই কাছে শুনেছি, অনেক লোভনীয় বৃক্ষ বনস্পতিকেই ইজারাদারদের লোভের বলি হতে হয়। মোহনবাবুর লোভের বিষয় আমার জানা নেই। বললাম, 'ঠিক হায়।'

আমি কয়েক পা যেতেই, ফরেস্ট গার্ড বলে উঠলো, 'সাব, কোই গোস্তাকি না লিজীয়ে।'

পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, সে প্রায় কৌজী কায়দায় কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হেসে হাত তুলে বললাম, 'তুমকো কুছ গোস্তাকি নহি হয়। আরাম সে রহো।'

সে আবার বললো, 'সাব, মেরা নাম চিকো।'

বলতেই, সেই সাদা দাঁত, নাক চোখ ঢাকা। বললাম, 'ঠিক হায় চিকো, হম বহুত খুশি হায়।'

বলে আরো উঁচু দিকে খানিকটা এগোতেই, চিকোর উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, 'সাব, এ পাহাড়কে উস্ বগল মত যাইয়ে, মারাংহোরে রহনে সক্তা।'

মারাংহোরে! সে আবার কী প্রাণী? এক তো, কোয়েনানদীর ধারে, পাতার ঘরের আস্তানায়, একজন হোরো নামে পাহারাদারকে দেখে এলেছি। মারাংহোরোটা আবার কে? আমি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মারাংহোরো কোন হায়?'

চিকো ফরেস্ট গার্ড কয়েক পা এগিয়ে বললো, 'মারাংহোরো হাথীকো কথা জাতা হায়।'

হাথী। মানে হাতি? সর্বনাশ! সেরকম সাহস আমার মোটেই নেই,

ভায় আবার একলা। কিন্তু এদের কি, সবই এরকম অদ্ভুত উচ্চারণ? হাতিকে বলে মারাংহোরো! অবিদ্রি গুনলে বৃহৎ বা বিশাল কিছু বলেই মনে হয়। আমি বাধ্য হয়ে নেমে আসি। অবাক লাগে, কাছেই এতো লোক কাজকর্ম করছে, তাদের হাঁকডাক কলরব শোনা যাচ্ছে। আর এর ঠিক পাশেই বস্ত্র হাতিরা থাকতে পারে! যদিও, কোঁতুহল আর উত্তেজনা বোধ করি, ইচ্ছা করে, বস্ত্রহাতি প্রত্যক্ষ করি, বনের মধ্যেই, কিন্তু সাহস পাই না। শত হলেও পশু, তার মেজাজ কখন কী রকম থাকে, কে বলতে পার। বদরিকাপ্রসাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী, এর মধ্যেই আমি ভুলে যাইনি। আমি চিকোর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কায়সে জানতা, উধার মে হাতি বহনে সক্তা?’

চিকো বললো, ‘হম জানতা হায় সাব। উস্ বগল মে, কোয়েনা গাড়া হায়, বহত ঘাস জমিন হায়, ভারী জঙ্গল ভি হায়। উধার মে হাথী হরবখ্ত আনা যানা করতা হায়, জঙ্গল মে সবকোই জানতা হায়।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইধার নহি আতা?’

‘আতা।’ চিকো ঘাড় হুলিয়ে বললো, ‘কভি কভি আতা হায়। আদমী বহত হায়। আভি নহি আয়েগা।’

‘তুমি কভি জঙ্গল মে হাতি দেখা হায়?’

‘বহত দফে সাব।’ চিকোর মুখে আবার সেই হাসি।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কো মারনে নহি আয়া?’

‘কভি নহি।’

এ সময়েই মোহনবাবুর গলা গুনতে পেলাম, ‘এই যে, আপনি এদিকে এসেছেন? আমরা আপনাকে অগ্নিদিকে খুঁজছি।’

দেখলাম মোহনবাবু, সঙ্গে বদরিকাপ্রসাদ এগিয়ে আসছেন। বললাম, ‘আপনাদের ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে একটু আলোচনা করছিলাম।’

মোহনবাবু বললেন, ‘চিকো আমাদের খুব ভালো গার্ড। চলুন এবার ডেরায় ফেরা যাক।’

বললাম, ‘চলুন। আমি’ এই পাহাড়টার ওপরের দিকে যাচ্ছিলাম। চিকো বারণ করলো, বললো, ‘ওপাশে বুনো হাতি থাকতে পারে।’

মোহনবাবু বললেন, ‘মিথ্যা বলেনি। ওদিকটার হাতিদের চরে বেড়াবার মতো বড় বড় ঘাস আর সমতল নরম মাটি আছে। কোয়েনাও বেশ চওড়া, তাছাড়া চারদিকে জঙ্গলে ঢাকা, একটা স্কাচায়েল দীঘির মতো আছে, বেশ গভীর। হাতিরা ওখানে চান করে। সম্ভব হলে, আপনাকে দেখাবো।’

বললাম, ‘তা তো দেখাবেন, কিন্তু তারা যখন আমাদের দেখতে পাবে?’

বদরিকাশ্রমাদ হেসে উঠলেন। মোহনবাবু বললেন, ‘দেখতে পেলেই যে তেড়ে আসবে, এমন কোনো কথা নেই। বিপদের গন্ধ সবাই পায়। আমাদের দেখতে পেলেই যে ওরা বিপদের গন্ধ পাবে, তা নয়। ওরাও বোকে, আমরা নিরীহ দর্শক মাত্র। বড় জোর, দু’একটা হুংকার দিতে পারে। তখন সরে গেলেই হবে। নিজেদের খেলা ছেড়ে, আমাদের পেছনে সব সময় ওরা ছুটে চায় না।’

বদরিকা বললেন, ‘তা চায় না ঠিকই। সবই নির্ভর করে ওদের মেজাজের ওপর। বিশেষ করে, দলের মধ্যে, কখন কী ঘটে, কার কখন কী মেজাজ থাকে, কিছুই বলা যায় না। হয় তো বিশেষ একটি হাতিই আপনার দিকে তেড়ে এলো।’

মোহনবাবু বললেন, ‘তা আসতে পারে। ক্যাপা হাতির কথা কিছুই বলা যায় না। সে তো মারাত্মক। পালিয়ে যাবার আগেই হয় তো দেখা যাবে, সে নিঃশব্দে একেবারে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।’

আমি প্রায় কৈপে উঠে বলি, ‘নিঃশব্দে?’

‘একেবারে নিঃশব্দে। অত বড় শরীরটা নিয়ে কী করে যে ওরকম ভাড়াভাড়া নিঃশব্দে দৌড়তে পারে, জানি না।’

রীতিমতো ভয় পেয়ে যাচ্ছি। বললাম, ‘তারপরেও বলছেন, হাতি দেখতে যাবো?’

মোহনবাবু আর বদরিকাশ্রমাদ, দু’জনেই হেসে উঠলেন। মোহনবাবু বললেন, ‘আপনি এ কথা বলছেন? বাহাদুর একবার আমরা নদীর ধারে পাতার ঘরের আস্তানা করেছিলাম। সেটা ছিল ভিসেক্সর মাস। শীতের জন্মই, রাত্রিবেলা খোলা জায়গায়, খুব বড় করে, আগুন জ্বলে বসেছিলাম আমরা কয়েকজন। বললে বিশ্বাস করবেন না, হঠাৎ মনে হলো, হোলপাইপ থেকে যেন, আমাদের গায়ে আর আগুনে জল ছিটকে এলো। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি, হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িলাম। তখনো সমানে জলের ধারা আসছে। হঠাৎ কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো, মারাংহোরো, মারাংহোরো! শুনেই, ক্রিয়ে দৌড় দিলাম। মারাংহোরো বুঝতে পেরেছেন তো?’

আমি প্রায় কুঁকশালে বললাম, ‘একটু আগেই চিকোর মুখে শুনেছি, হাতি। তারপর?’

মোহনবাবু হেসে বললেন, ‘তারপরে আর কিছুই না। কেবল দেখলাম,

সমস্ত আগুন নিভে গেল, আর কয়েকটা ছায়া, বেন আকাশের গা দিয়ে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তারা মোটেই আমাদের আক্রমণ করতে আসেনি।’

‘তবে কী করতে এসেছিল?’

‘হয়তো কিছুই না। হতে পারে, নদীর ওপার দিয়ে, ওরা কোথাও যাচ্ছিল, হঠাৎ আগুন চোখে পড়তে, মেজাজ একটু খারাপ হয়ে যায়। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জলে নেমে, শুঁড় ভরতি জল শুষে, আগুনের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। যখন দেখেছে, আগুন একেবারে নিভে গেছে, তখন হাওয়া। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেছলো, ক’টা ছিল, তা দেখতে পাইনি। মনে হয়, তিন চারটে ছিল।’

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওরা তো আপনাদের আক্রমণ করতে পারতো?’

মোহনবাবু বললেন, ‘তা হয় তো পারতো। তবে, অকারণে ওরা বিশেষ আক্রমণ করে না। তা যদি করতো, তাহলে এ জঙ্গলে মানুষ থাকতে পারতো না, কাজও করতে পারতো না।’

তথাপি যেন স্বস্তি পেলাম না। প্তরা বনেই সুন্দর, যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি বোধহয় মানুষের তাদের সম্মুখীন হওয়া। অবিজ্ঞি মানতে হবে, তাদের জগতে মানুষ যতো বিয় ঘটিয়েছে, মানুষের জগতে তারা, তার সিকি ভাগও করেনি, করে না।

মোহনবাবু বললেন, ‘চলুন, যেতে যেতে কথা হবে। ভয় পাবেন না, আমরাও তো আছি, আর জঙ্গলই আমাদের রুজি রুটি।’

সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মোহনবাবু চিকোর দিকে ফিরে বললেন, ‘তুম খানা খানেকা টাইম মে, চলা আয়েগা।’

চিকো ঘাড় দুলিয়ে বললো, ‘ই বাবুজী।’

আমরা আবার বৃক্ষমেষ যজ্ঞের এলাকায় চলে এলাম। মোহনবাবু ঘোশেক নামক ঝুটান মুণ্ডাকে ডেকে বললেন, ‘হম খানা খানে যাতা। দো বটা বাদ আয়েগা। আজ এ লাটকা পুরা কাম হোনা চাহি। কিসীকো বৈঠনে মাত ধো। হজা করকে কাম চালাও।’

ঘোশেক বললো, ‘ঠিক হায় বাবুজী। ই লোক জানতা, আজ ইধারকা কাম সব পুরা করনে হোগা।’

মোহনবাবু আমাদের সঙ্গে চলতে চলতে বললেন, ‘ই লোগ্ তো সব কুছ জানতা, মগর কাম ঠিক নহি হোতা।’

আমি বাঁদিকে মুখ করিয়ে, স্মরণতিয়াকে দেখলাম, ও এদিকেই তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই, ও হেসে, যেন লুকোচুরি খেলার মতো, মুখ একটু আড়াল করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এরা খেতে যাবে কখন?’

মোহনবাবু বললেন, ‘এদের খাওয়ার নিয়মকানুন সব আলাদা। এরা সারাদিনে একবার খায়, ভোরবেলা। আর খায় রাত্রে। এখান থেকে কাজ সেরে গিয়ে, ওদের প্রথম কাজ রান্না করা। রান্না করে খায়, ভাত রেখে দেয় ভোরের জন্য, সেই ভাত খেয়ে কাজে আসে। সারাদিন এদের খাওয়ার সঙ্গে কোনো ব্যাপার থাকে না। রান্না রাত্রে একবারই করে।’

মোহনবাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি আর একবার স্মরণতিয়ার দিকে তাকালাম। ও হাত নাড়লো, আমি ঘাড় ঝাঁকালাম। ওর আশেপাশে যেসব মেয়েরা কাজ করছিল, তারা সবাই হাসাহাসি করছে। আমি নিচের দিকে নামতে লাগলাম।

মোহনবাবু মিথ্যা বলেননি, পাতার ঘরের আস্তানায় ফিরে দেখছি, স্মরণতির রান্না শেষ। আসল রান্না যেটি, মুরগি-পাতুরি। তার গন্ধ কোয়েনা তীরের বনের গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে, পেঁয়াজ সম্বর দেওয়া মুসুর ডাল। ভাত এখনো উলুনে ফুটেছে, নামার অপেক্ষায়। পাত পেড়ে বসে গেলেই হয়। স্মরণি তার ধুতির খোঁটায়, হাত মুছতে মুছতে, সলজ্জ হেসে বললো, ‘রেঁখে তো ফেললাম, জানি না মুখে দিতে পারবেন কী না।’

নিঃসন্দেহেই স্মরণির এটি বিনয়। বললাম, ‘গন্ধ যা বের করেছে, তাতে তো জিতে জল এসে পড়ছে। রান্নার ভাল মন্দ গন্ধতেই বোঝা যায়।’

স্মরণি বললো, ‘আগে খেয়ে দেখুন, তারপরে বলবেন।’

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘মুরগি পাতার মোড়ক থেকে খুলে ফ্যালোনি তো?’

স্মরণি বললো, ‘না। পাতার মোড়ক খুললে ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে যাবে। একেবারে খাওয়ার সময় খুলে দেব।’

মোহনবাবু বললেন, ‘তা না হলে মুরগি-পাতুরি খেয়ে স্ব্থ হয় না। সামনে পাতার মোড়ক খোলা হবে, তাতেই খাওয়ার অর্ধেক স্ব্থ। আসল গন্ধ তো তখনই পাওয়া যাবে।’

বলে আমার দিকে তাকালেন। মোহনবাবু ভোজন-রসিক, সন্দেহ নেই।

আমার কাছে নতুন খাতের অভিজ্ঞতা। সূর্যীন ইতিমধ্যে হোরোকে কাছে লাগিয়েছে। এখন আর সে রক্তচক্ষু মাতাল না। চক্ষু রক্তবর্ণ বটে, কিন্তু দেখছি সে কোয়েনা থেকে বালতি করে জল আনছে। এই বনবাসের ব্যঞ্জন তৈরির জন্ত শিল-নোড়াও এসেছে। হোরো শিল-নোড়া ধুয়ে পরিষ্কার করছে।

মোহনবাবুর পাতার ঘরে দুটি খাটিয়ার বিছানা। এক পাশে চাল ডাল আটা তেল মসলা, যাবতীয় বস্তু রয়েছে। পুরো দুটি চটের বস্তা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এর মাধ্য কী আছে?’

মোহনবাবু বললেন, ‘চাল। কুলী রেজাদের চালের ব্যবস্থা আমাদেরই রাখতে হয়। বিকেলবেলা ওরা যখন কাজ থেকে আসবে, তখন সবাইকে মেপে মেপে, রোজকার চাল দিতে হবে, টাকাটা ওদের মজুরি থেকে কাটা হবে। দাম বাজার দর, দামে কিনেছি, সে দামেই দিই।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওরা নিজেরা নিজের চাল কিনতে পারে না?’

মোহনবাবু গা থেকে জামা খুলে বললেন, ‘পারে, কিন্তু টাকা কোথায়? তাহলে ওদের রোজের মজুরির টাকা আগাম ধরে দিতে হয়। আর আগাম টাকা যদি দিয়ে দেন, তাহলে সব বেপান্তা হয়ে যাবে।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বেপান্তা?’

মোহনবাবু আর বদরিকা, দু’জনেই হাসলেন। মোহনবাবু বললেন, ‘নিশ্চয়ই! টাকা যদি হাতে থাকলো, তবে আর কাজের কী দরকার? সবাই জঙ্গলের এদিক ওদিক দিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। আর ওদের ব্যাপার হলো, ওরা কিছু মজুদ করে রাখতে জানে না। এরকম দু’ বস্তা চাল যদি ওদের কাছে থাকে, তাহলে একদিনের মতো ভাত রান্না করে, বাকী সব চাল দিয়ে হাঁড়িয়া পচুই তৈরি করে, খেয়ে মাতাল হয়ে নেত্য কেত শুরু করে দেবে।’

অবাক কাণ্ড! এভাবেই বোধহয় এক এক শ্রেণীর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আমরা জানি, ভবিষ্যতের জন্ত মজুদ না রাখলে, দুর্দিনের দ্বারস্থ হতে হয়। এদের হলো বস্ত্র আয়, তত্র ব্যয়। না হবার কোনো কারণ নেই বোধহয়। বন আছে, বনের পশুপক্ষী আছে, তীর ধুক আছে। মেটাও বাঁচবার এক রাস্তা। বয়ং চাষবাসের আয়োজন কম।

বদরিকা বললেন, মোহনবাবুকে, ‘সে কথাই বা বলছেন কেন। ভাত রান্না করার জন্ত, রোজ যে চাল নেয়, সেই চালই অনেকে হাঁড়িয়া পচুই করে।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ভাত খাবেই না?’

বদরিকা বললেন, 'না। পচুইয়ের একটা স্ত্রীবিধা হলো, ওতে পেটও ভরে, নেশাও হয়।'

চমৎকার! এমন বস্তু থাকতে আর কেবল ভাত খেয়ে পেট ভরিয়ে কী হবে? তার চেয়ে পেট ভরানো, নেশা করা, এক সঙ্গেই ভাল। মোহনবাবু তেলের পাত্র নিয়ে, তৈল মর্দন করতে বসলেন। চিংকার করে, পাতার ঘর থেকে বললেন, 'স্বরীন, হোরোকে আমার চানের জলটা রোদে রাখতে বলো।'

স্বরীন হোরোকে হিন্দীতে সেই নির্দেশ দিল। হোরোর অবাব শোনা গেল, সে তো অনেকক্ষণ আগেই রেখে দিয়েছে। মোহনবাবু বললেন, 'প্রসাদজী, ষোড়া পিনে মাড়ু তা তো পি লিজীয়ে, দাদাকো তি পিলাইয়ে।'

মোহনবাবু এই প্রথম, বদরিকার সঙ্গে, ইংরেজি ছেড়ে হিন্দী বললেন। কিন্তু কী পানের কথা বলছেন মোহনবাবু? আমি বদরিকার দিকে তাকালাম। বদরিকা হেসে, ইংরেজিতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি পান করবেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী পান করবো?'

মোহনবাবু তাঁর রক্তাক্ত স্ত্রবর্ণ অঙ্গে তৈল মর্দন করতে করতে বললেন, 'হুইঙ্কি রাম, দুই-ই আছে। 'যা আপনার ইচ্ছা, তাই নিন।'

সর্বনাশ! বনের মধ্যেও হুইঙ্কি রাম! তাও কী না, এই দিনের বেলা! বললাম, 'না না, আমার কোনো দরকার নেই।'

মোহনবাবু বললেন, 'একটুখানি নিন, খিদেটা বাড়বে।'

হেসে বললাম, 'মাফ করবেন, খিদে আমার এমনিতেই যথেষ্ট বেড়ে আছে, তার জন্য স্ত্রাপানের দরকার হবে না।'

বদরিকা বললেন, 'আমারো তাই, তাছাড়া আমাকে গাড়ি ড্রাইভ করে বড় আমদা যেতে হবে।'

মোহনবাবু যেন হতাশ হয়েই, তৈলমর্দন বন্ধ করে উঠে পড়লেন, বললেন, 'তাছলে আর কী হবে। ঘাই, চানটা করে আসি।'

বললাম, 'চান করে এসে, আপনি একটু শ্বিন।'

মোহনবাবু পাতার ঘরের বাইরে যেতে যেতে বললেন, 'আমার নেওয়া অনেক আগে থেকেই হয়ে গেছে, আর দরকার হবে না।'

আমি আর বদরিকা চোখাচোখি করে হাসলাম। এ সময়ে, কাছেই কোথা থেকে যেন, অদ্ভুত, অনেকটা নারী কণ্ঠের শব্দ ভেসে এলো, কে—ক্! কে—ক্! আমি জিজ্ঞাসু চোখে বদরিকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের শব্দ বলুন তো?'

বদরিকা বললেন, 'এটা তো ময়ূরের ডাক।'

তার মানে কেকাধনি! এই ধ্বনির কথা সাহিত্যে কাব্যেই পড়া ছিল। আজকের আগে, পোষা ময়ূরও দেখেছি, বস্ত্র ময়ূর আজ প্রথম। কিন্তু কেকাধনি কখনো শুনিনি। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গেলাম। চারদিকে তাকালাম। কোয়েনার এপারে ওপারে, বিশাল বনস্পতি-ছায়া ঘেরা সামনের পাহাড়ের বৃকে। কোথাও ময়ূরের চিহ্ন নেই। আমার পিছনে পিছনে বদরিকাপ্রসাদও বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'ডাক শুনলে মনে হয়, পাশ থেকে ডেকেছে। আসলে বনের আড়ালে কোথাও আছে, এখান থেকে দেখা যাবে না। তবে হতাশ হবেন না। যে কোনো সময়ই, আপনার ঘরের পাশেও দেখা দিতে পারে। দিনে রাত্রে বহুবারই ময়ূরের ডাক শুনতে পাবেন।'

আমার কাছে যেন অনেকটাই অবিশ্বাস। অথচ, অবিশ্বাসের কিছুই নেই। সত্যি আমি দাঁড়িয়ে আছি, এক তপোবনের মতো স্থানেই। রামায়ণ মহাভারতে মূনি ঋষিদের যে তপোবনের বর্ণনা পড়েছি, অবিকল সেইকরম। সহসা যেন আমার মনে ও দেহ, এক অপক্লম কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হয় তো হাজার বছর আগে, এখানে মূনি ঋষিরা ছিলেন। তাঁরা হয় তো এখানেই তপস্বী করতেন। শকুন্তলা, তাঁর সখী প্রিয়দর্শনার মতো ঋষি-কন্যারা, এই তপোবনেই হয় তো বিচরণ করতেন, আর তাঁদের সঙ্গে পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতো ময়ূর হরিণেরা।

আমাকে এই বন সম্বোধিত করলো, না আমি নিজে আত্মসম্বোধিত হলাম, জানি না। কোয়েনার তীর ধরে, ডানদিকে হাঁটতে হাঁটতে, আমি ছায়াছন্ন গভীর বনের মধ্যে চলে গেলাম। যতোই এগিয়ে গেলাম, মনে হলো, যেন সূর্যের আলো সেখানে কখনো প্রবেশাধিকার পায়নি। মাটি থেকে যেন ঠাণ্ডা বাষ্প উঠছে। কোয়েনের জল গভীর, তার জলের রঙ বদলে গিয়েছে। অনেকটা কালো দীঘির জলের মতো। ঝিল্লির যে এতো তীব্র হতে পারে, জানতাম না। তারপরে এক সময়ে, ঝিল্লির ডাক স্তিমিত হয়ে গেল। সমতল ছাড়িয়ে, আমি যেন ক্রমেই একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু বন গভীর, ফাঁকা নয়। আমাকে ঘিরে অনেকগুলো কলকি ফুলের গাছ। অসংখ্য বৃক্ষও অনেক। আমি একটি মজুঁন গাছের নিচে, প্রস্তর ভূমির ওপরে বসলাম। ডুবে গেলাম, পুরাণের পুরাকালের কল্পনায়। আমাকে ঘিরে, তপোবনের জীবন সংসার, নানা রূপে ও শব্দে জেগে উঠলো।

কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না, মোহনবাবুর গলা শুনতে পেলাম, তিনি

আমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছেন, আর সে ডাক, সামনের পাহাড়ে, চারপাশের অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি সচকিত হয়ে, উঠে দাঁড়াবার আগেই, আমার সামনে বদরিকাপ্রসাদ এসে দাঁড়ালেন, এবং চিৎকার করে বললেন, ‘মোহনবাবু, পাওয়া গেছে, এদিকে আসুন।’

বলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, ‘মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন।’

আমি একটু লজ্জা পেয়ে হাসি। মোহনবাবুও ইতিমধ্যে এগিয়ে এলেন, তাঁর চোখে মুখে, এখনো একটু উৎকর্ষার ছায়া। জিজ্ঞেস করলেন, ‘এখানে কী করছিলেন?’

বদরিকা বললেন, ‘আমি এসে দেখলাম, চূপচাপ বসে আছেন।’

মোহনবাবু বললেন, ‘আমি এদিকে ভয়ে মরি। অশ্রু কোনো ভয় না থাক, বনের মধ্যে হারিয়ে যাবার ভয় তো আছে।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায় নাকি?’

মোহনবাবু বললেন ‘যায় নাকি মানে? বনের মধ্যে একবার পথ হারালে, কোন্ দিক থেকে, কোথায় চলে যাবেন, তার ঠিক আছে? এখানকার মানুষরাই অনেক সময় পথ ভুল করে, সারা রাত মাথা খুঁড়ে মরে। একলা কখনোই বনের বেশি ভেতরে যাবেন না। কতো রকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে।’

তপোবনের কল্লনায়, বিপদের কথাটা মনে ছিল না। অথচ, পদে পদে নানা বিপদের কথা অনেকবারই শুনেছি, এবং তা অবিশ্বাসও করি না। বললাম, ‘ভুল হয়ে গেছে।’

মোহনবাবু বললেন, লেখক মানুষ তো ভুলেই যাবেন। কিন্তু বিপদের কথাটাও একটু মনে রাখবেন। এখন চলুন, সুরীন ভাত বেড়ে বসে আছে।’

শুনেই, মহাপ্রাণীটি যেন খুব কাতর হয়ে উঠলো। এক্ষেত্রে উদয়ের নামই মহাপ্রাণী। বললাম, ‘হ্যাঁ চলুন, খিদের কথাটা ভুলেই গেছলাম।’

বদরিকা বললেন, ‘একেবারে লেখকোচিত কথা।’

মোহনবাবু চলতে চলতে বললেন, ‘আমার বাচ্চা ছেলেটি প্রায়ই তার মাকে জিজ্ঞেস করে, ‘মা আমি খেয়েছি? তার খেলেও মনে থাকে না, না খেলেও ভুলে যায়।’

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। পাতার ঘরের আস্তানায় সুরীনও উষেগে ছিল। দেখতে পেয়ে, স্বস্তির হাসি ফুটলো তার মুখে। দেখলাম, ঘরের মধ্যে, মাটির মেঝের শতরঞ্জি পেতে, আসন করা হয়েছে। জল দেওয়া হয়েছে

এলুমিনিয়ামের গেলালে। খাবার পাত্র কলাইয়ের খালা। স্বরীনই পরিবেশন করলো, প্রথম পাতে-গরম ভাত, মুহুর ডাল আর আলুভাজা। মুখ দিয়ে মনে হলো, অমৃতবৎ। মোহনবাবু তাড়া দিলেন, ‘তোমার মুরগি-পাতুরি নিয়ে এসো।’

স্বরীন হেসে বললো, ‘আনছি, ডাল দিয়ে খান।’

বলে সে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো শালপাতার একটি পুঁটলি নিয়ে। সেটি মেঝেতে রাখতে দেখা গেল, সবুজ শালপাতা পোড়া আর ঝলসানো, দুটি মোড়ক। কোনো বস্তু লতা দিয়ে, পাতার মোড়ক আঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা। এখনো মোড়কের গা থেকে একটু ধোঁয়া উঠছে। স্বরীন বস্তু লতার বন্ধন খুললো নিপুণ হাতে। তার ভিতর থেকে বেরলো, মসলা মাখানো আস্ত মুরগি। যেমন তার খোসবাই, তেমনি তার রঙ, ধোঁয়া উঠছে। মোহনবাবু ঠিকই বলেছিলেন, সামনে পাতার মোড়ক খুললে, তাতেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। দুটি মোড়ক থেকে, দুটি আস্ত মসলা মুরগি বেরলো। জানি না, কলকাতার শহরে, এর নামই মুরগা মসলান্ কী না। কিন্তু এমন পাতার মোড়া মুরগি কখনো খাইনি। মোহনবাবুর ভাষায়, মুরগি-পাতুরি।

স্বরীনের ব্যবস্থা পাকা। সে সুসিদ্ধ মুরগি, ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আমাদের ভাগ করে দিল। মোহনবাবু বলে উঠলেন, ‘তোমার জ্ঞান আর একটু রাখো স্বরীন, সবই তো আমাদের দিয়ে দিলে।’

স্বরীন বললো, ‘খান না। দেখুন তো হুন ঠিক হয়েছে কী না?’

সবই ঠিক আছে। আশ্চর্য, শালপাতার কোনো গন্ধ নেই, অথচ এ রান্নার স্বাদই আলাদা। বললাম, ‘স্বরীনবাবু, চমৎকার! কোনোদিন ভুলবো না।’

স্বরীন সলজ্জ হেসে বললো, ‘তাহলে, আপনার বইয়েতে একটু লিখে দেবেন।’

মোহনবাবু উচ্চস্বরে হেসে বললেন, ‘বেশ বলেছ স্বরীন। তোমার সঙ্গে তাহলে, আমাদের নামও ছাপা হয়ে যাবে।’

বললাম, ‘এই বনের কথা যদি কখনো লিখি, তাহলে আপনার বাক্য দিয়ে কী করে লিখবো? আপনারা ছাড়া বন নেই, বন ছাড়া আপনারা নেই।’

মোহনবাবু বললেন, ‘স্বরীন, এই বেলা বলে রাখো, লেখা হলে, আমরা বেন একথানা বই পাই। এই এদেলবার জঙ্গলে বসে বসেই সে বই পড়বো।’

সবাই হেসে উঠলাম। আমার চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠলো, এই বনের কথা লেখা আমার বই, এই বনে বসে স্বরীন পড়ছে। হঠাৎ তৃপ্তির

সুখখানি আহার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ছোট নাগরার নার্স, তৃপ্তি ভৌমিক। তার শেষ কথা ছিল, সে এসেবাবু দেখা করতে আসবে।

হঠাৎ অনেকগুলো স্বরের কলরবে, জলের ঝাপটার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ মেলতে, প্রথমে দেখলাম, আড় করা গাছের ডালের ওপরে পাতার চালা। পাশ ফিরতে, পাতার দেওয়াল। নিভ্রাভক্তের চকিত মুহূর্তে, তুলে গিয়েছিলাম, কোথায় আছি? মনেও পড়ে গেল চকিতেই। অনেক কাল এরকম নিবিড় দিবানিত্রা দিইনি। এটাও বোধহয় বনেরই। স্বরীনের যাত্রা খেয়ে একটু গল্পগুজবের পরেই বদরিকাশ্রমাদ চলে গিয়েছিলেন। তার পরে আমি আর মোহনবাবু খাটিয়ার একটু গড়িয়ে নেবার জন্তু শুয়েছিলাম। পাশ ফিরে দেখলাম, অল্প খাটিয়া শূন্য, মোহনবাবু নেই। উঠে বসলাম, একটু শীত বোধ হচ্ছে। পায়জামার ওপরে, একটি পাঞ্জাবি চাপিয়ে, বেরিয়ে এলাম। হট্টগোলের কারণ বোঝা গেল, কাজের লোকেরা সব ফিরে এসেছে। কোয়েনার ওপারে, বনের মাথায় আকাশ লাল, সন্ধ্যা আসন্ন। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি।

দেখলাম, বনবাসীরা কেউ কেউ হাঁটু জলে বসে মাথায় মুখে ছিটা দিচ্ছে। কেউ কেউ হাঁটু জলেই উপুড় হয়ে, জলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিচ্ছে। কাজের পরে ফিরেই আন। কোনো কোনো মেয়ে-পুরুষ জলে নামবার আগে, উহুনে আঙুন ধরাতে বাস্তু। তার মধ্যে স্ত্রীকর্মও আছে। বউ, শালী থাকতে, সে কেন উনোন ধরাচ্ছে? আমি আবার তাকলাম কোয়েনার স্রোতের দিকে। দেখতে পেলাম, সোমারি আর সুরসতিয়া, দু'জনেই জলে। সুরসতিয়ার সর্বাঙ্গ ভেজা। সে এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, সে তার একটি বলিষ্ঠ হাত তুলে নাড়ালো। আমি হেসে মাথা ঝাঁকালাম। কয়েকটি মেয়ে, সুরসতিয়ার গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। একজন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক ঝুঁতের জন্তু, সুরসতিয়ার পাখরপ্রতিমা বুক থেকে ভেজা ঝাঁচল খসে গেল, রক্তিম আকাশের অম্পট আলোর রেখা সেই বুক।

‘এই যে উঠে পড়েছেন?’ বলতে বলতে মোহনবাবু এগিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাস করলাম, ‘আপনি কোথায় গেছিলেন?’

মোহনবাবু বললেন, ‘গাছ কাটার জায়গায়। ট্রাক বোকাই করে, জমাই-কেলার রওনা করিয়ে দিয়ে এলাম।’

জিজেস করলাম, ‘জরাইকেলা কিয়তে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।’

মোহনবাবু বললেন, ‘আজ জরাইকেলা যাবে না। ছোট নাগরার নাকাতেই রাজে থাকবে। কাল ভোরবেলা জরাইকেলার রওনা হয়ে যাবে। আবার খালি ট্রাক কিয়বে একদিন বাদে।’

তারপরেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে, আশেপাশে দেখে, ডাক দিলেন, ‘সুন্নী কোথায় গেল।’

জবাব এলো, ঘরের পিছন থেকে, ‘এখানে। চায়ের জল বসিয়েছি।’

মোহনবাবু বললেন, ‘চায়ের জগুই বলছিলাম।’

বনের গভীরে হলে কী হবে, মোহনবাবুর ব্যবস্থা সব পাকা। অভ্যাসের বস্ত্র সমুদয়, প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে। হোরো কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মোহনবাবু তাকে, বাইরে একটা খাটিয়া বেয় করে দিতে বললেন। হোরো বিছানাস্বত্ব খাটিয়া বেয় করে নিয়ে এলো। মোহনবাবু বললেন, ‘বসুন।’

পা তুলে বেশ আরাম করে বসলাম। কয়েকটা উম্মনের কাঠ জলে উঠেছে। ফুল গাছ পাতা কাঠপোড়ার একটি অভূত গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা বাতাসে। গাছে গাছে, ফিরে আসা পাখির কিচির মিচির করছে। তার সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক। ঠিক এমনি বনবাস জীবনে কখনো ঘটেনি। চিরদিন হয়তো, আমার মতো মানুষ এরকম জায়গায় থাকতে পারে না। এখন মনে হচ্ছে, যেন চিরকালই এই বনবাসে থাকতে পারি।

বারা স্নান করতে নেমেছিল, তারা ফিরে আসছে। নতুনরা গিয়ে নামছে। দেখতে পাচ্ছি, স্মরসতিয়া ফিরে এলো, পাতার ঘরে নিচু হয়ে ঢুকলো। একটু পরে একটি ভোরাকাটা শাড়ি হাতে আবার বেরিয়ে এলো, এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে, হেসে, ভেজা কাপড় জড়ানো পাথরপ্রতিমা শরীর নিয়ে চলে গেল একটু দূরে, গাছের আড়ালে। অসুস্থমান করতে অসুবিধা হয় না, গুপের ছোট ছোট পাতার ছাউনিতে, মাথা নিচু করে কাপড় পরা যায় না।

সোমারিকে দেখছি, সে এখনো জলে। নদীর এপার ওপার, হাতড়ে হাতড়ে যেন কিছু খুঁজছে। নিশ্চয়ই কোরেরার জলে, এ ভাবে হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরা যায় না? সোমারি কি হুড়ি খোজে?

হোরো একটা চালের বস্তা আর পাল্লা বাটখারা, খাটিয়ার সামনে এনে রাখলো। মোহনবাবু খাটিয়ার বসলেন। কুলী মজুরেরাও একে একে এলে লাইন দিল। কারোর হাতে মাটির মালসা, কারোর এলুমিনিয়াম বা কলাই কড়া লোহার বাটি। মোহনবাবুর হাতে একটি খাতা আর কলম। ডাক হলো

চান বাপা আর বেগুনা এবং মোহনবাবু লিখে নিচ্ছে জাগলেন, নাথ এবং চালের জ্ঞান। স্বরীন ধ্যায়িত চা নিয়ে এলো কাঁচের পেন্সলে করে। মোহনবাবু বললেন, ‘স্বরীন তাই, চা খেয়ে হারিকেনটা জালো, ভরপরে হাজারটা ধরিও।’

স্বরীন মাল্টিটিকে আমার বড় ভাল লাগছে। সব সময়েই একটি হাসি তার মুখে লেগে আছে। অথচ তার চোখের দৃষ্টি কঠোর। কখনো তাকে বসে থাকতে দেখি না, সব সময়েই কাজ করছে। কিন্তু চলাকার মধ্যে, তেমন ব্যস্ততা নেই। সে একটু পরেই হারিকেন ধরিয়ে নিয়ে এলো, অল্প হাতে চায়ের গেলাস। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘রাত্রে কী থাকেন?’

বললাম, ‘রাত্রে খাওয়ার কথা এখনো ভাবতেই পারছি না। পেট এখনো ভরা।’

স্বরীন বললো, ‘সে ঠিক হয়ে যাবে। রাত্রে যদি মুরগি খেতে চান, তাও হতে পারে। তা না হলে ডিমের ঝোল। এখানে মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না।’

মোহনবাবু তাঁর কাজের মধ্যেই বললেন, ‘সে সবও তো তোমার স্বলুক সজ্জান জানা আছে, কোথায় মাছ পাওয়া যায়।’

স্বরীন বললো, ‘দেখবো, কাল এককর গাঁয়ের মধ্যে যাব।’

আমি বললাম, ‘এ বেলা আর মুরগির দরকার নেই। রাত্রে কুটি হবে তো?’

স্বরীন বললো, ‘যা আপনার ইচ্ছা। ভাতও হতে পারে কুটিও হতে পারে।’

বললাম, ‘আপনারা সবাই যা খাবেন, তাই করুন।’

এই সময়ে, স্বরসতিয়া এসে দাঁড়ালো। একটি মাটির হাঁড়ি দু’হাতে ধরা, কোলের কাছে। ধোয়া খয়েরি ভোরাকাটা শাড়িটি পরেছে অদ্ভুতভাবে। নিচের দিকে দু’ভাজে জড়িয়েছে, তাতে যেন সহবত প্রকাশিত, তেমনি ওর পরিজমী দৃষ্ট কোমরে যেন, ভোরাগুলো লেপটে গিয়েছে। এক ভাঁজ শাড়ি টেনে দিয়েছে বুকের ওপর দিয়ে। ভেজা চুল মুছে আঁচড়েছে। কপালে একটি মেটে সিঁহুর টিপ, কেন এই সারেণ্ডা অরণ্যের মৃত্তিকারই ফোঁটা। জানি না, ও মুখে তেজ মেখেছে কী না, কিন্তু মুখখানি দেখাচ্ছে যেন তেলতেলে। সে এসে দাঁড়িয়েই, দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো। হাসির ঝিলিকটি ওর কক্ষ ভাগর চোখেও। সেই কথাটাই আমার আবার মনে হলো, স্বরসতিয়া যেন আমাকে অরণ্যের আহ্নি মধ্যে, মুগ্ধ করে। আমি সহসা দৃষ্টি ফেরাতে ভুলে যাই। ওর আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, বিশেষ করে মেয়েরা, সবাই আমাদের দু’জনকে দেখছে, হাসাহাসি করছে, নিজেদের মধ্যে কিছু বলবলিও করছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে, স্বরসতিয়ারই বয়সী প্রায় গুনগুন করে গার মেয়ে উঠলো।

কয়েকজন খিলখিল করে হেসে উঠলো। স্বরসতিয়াও মুখে বাঁ হাত চাপা দিয়ে হাসি চেপে, আমাকে দেখলো। আমি স্বরীনের দিকে তাকালাম।

স্বরীন বললো, ‘মাংরিটা স্বরসতিয়ার পেছনে লেগেছে। ও গান গেয়ে বলছে, একটা সিগারেট দিয়েই যদি বাবু তোমার এতোটা মন ভুলিয়ে থাকে, তা হলে দুটো মুরগি দিলে, কী হবে?’

মোহনবাবু হেসে বললেন, ‘ছুঁড়ি দেখছি একেবারে মজ্জাছে। একটু সাবধান থাকবেন।’

আমি হেসে উঠলাম। স্বরীন বললো, ‘গতিক সেই রকমই দেখছি।’

ইচ্ছা করে, আমিও স্বরীনকে জেমার কথা জিজ্ঞেস করি। তার আর জেমার গতিকটা কী? এ সময়েই মাংরি আবার গুনগুন করে গান গেয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে, এক সঙ্গে ই হ শব্দ করে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে উঠলো। আমি স্বরীনের দিকে তাকালাম। স্বরীন হেসে বললো, ‘মাংরি গান গেয়ে বলছে, বাবুর মনগুণ করা সিগারেট আমারও খেয়ে দেখতে চাই, বাবু কী তা দেবেন?’

মোহনবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাংরির দিকে তাকিয়ে ধমকের স্বরে বলে ওঠেন, ‘কভি নহি। তুমুলোগকা হম বহুত মার মারেগা।’

মোহনবাবুর ধমক শুনে, হেসে ও এর গায়ে ঢলে পড়লো। মারের ধমক শুনে যে, কর্মদাতার সামনে দাঁড়িয়ে কর্মীরা এমন করে হাসতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মোহনবাবুও ঠোঁট টিপে টিপে হাসছেন, আর হিসাব লিখছেন। আমি স্বরীনকে বললাম, ‘সিগারেটের স্টক আমার খুব কম নেই, কোটো চারেক আছে। একটা কোটো ওদের দিয়ে দিন।’

মোহনবাবু বলে উঠলেন, ‘আরে না না, এতো দামী সিগারেট ওদের দেবেন না, শুধু শুধু নষ্ট। দিতে চান, বড় জামদা থেকে আপনাকে আমি সস্তার সিগারেট আনিয়ে দেব, তাই দেবেন।’

স্বরীন বলে উঠলো, ‘মোহনদা বাদ সাধছেন কেন। ওনার দিতে ইচ্ছা হয়েছে, দিন না। সস্তা সিগারেট না হয় পরে এনে দেওয়া যাবে।’

মোহনবাবু স্বরীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি তো তোমার সাধই বেশি দেখছি।’

স্বরীন হাসলো। আমি পাতার ঘবে গিয়ে, আমার স্মার্টকেশ খুলে, একটি আন্ত সিগারেটের টিন বের করে নিয়ে এলাম। মুখটা কেটে, টিনের পাতটা কেলে দিয়ে, আমি স্বরীনকে দিতে গেলাম।

স্বরীন বললো, ‘আপনি নিজের হাতে দিন, আরো খুশি হবে। তবে স্বরসত্তিয়ার হাতে দিয়ে সবাইকে বেঁটে দিতে বলুন।’

মোহনবাবু বললেন, ‘স্বরীন, তুমিই ঝামেলা বাড়াচ্ছে।’

আমি স্বরসত্তিয়ারকে কৌটোটা দিয়ে বললাম, ‘তুম সবকোই কো বাট দো।’

সব মেয়েরাই প্রায় এক সঙ্গে হেসে উঠলো, সেই সঙ্গে পুরুষরাও। সংখ্যায় মিলিয়ে, সবসুদ্ধ পঞ্চাশ জনের বেশি ভ্রমিক হবে না। সবাই একটা করে নিশ্চয়ই পাবে। স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞেস করলো, ‘হম নহি পিয়েগা?’

বললাম, ‘অকর পিয়েগা। ইস্‌মে নাই হোগা তো, আওর দেগা।’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘ইস্‌ মে হো যায়েগা।’

স্বরীন বললো, ‘বাবুকো নাচ দেখায়েগা তুমলোগ।’

সোমারির বয়সী একটি মেয়ে বলে উঠলো, ‘দেখায়েগা, হমলোগকো ডিয়েং পিয়ানে হোগা, সিরগেট ভি দেনে হোগা।’

লক্ষণীয়, স্বরসত্তিয়া উচ্চারণ করে সিগ্রেট, অনেক শিক্ষিত মানুষও যেমন করে, আর এই মেয়েটি উচ্চারণ করলো সিরগেট। অনেক গ্রামা বাঙালীর মুখে, ছিরগেট শব্দও শুনেছি। মোহনবাবু বললেন, ‘তু লোক তো অ্যায়সাই দার পিকে নাচতা হায়, বাবুকো পাস্‌ ডিয়েং কাঁহে মাংতা?’

মেয়েটি ঝটিতি একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, ‘বাবুকো দিল বহত বড়া হায়।’

অনেকেই ইয় ইয় বলে সাই দিয়ে উঠলো। মোহনবাবু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘ই, বাবুকো দিল আভি বহত বড়া দেখত্যা হায়। ডিয়েং নাই পিলানেসে, দিল ছোট হো যায়েগা।’

স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞেস করলো, ‘তুম নাচ দেখনে মাংতা?’

আমি ঘাড় কাত করে বললাম, ‘ই।’

স্বরসত্তিয়া আবার জিজ্ঞেস করলো, ‘তুম্‌ ভি হমারা সাধ্‌ নাচেগা?’

বললাম, ‘হম নাচ নহি জানতা।’

স্বরসত্তিয়া ওর বুকের দিকে চিবুক ঝুঁকিয়ে দেখিয়ে বললো, ‘হম তুমকো শিখায়েগা।’

স্বরসত্তিয়ার কক্ষ ভাগর চোখের দিকের তাকিয়ে, মনে হয়, আমি যেন কোন্‌ দূরের অতলে ডুবে যাই। বললাম, ‘তব হম নাচেগা।’

স্বরসত্তিয়ার চোখের ঝিলিক যেন, ওর সারা গায়ে লেগে গেল। মোহনবাবু বললেন, ‘এই স্বরসত্তিয়া, চাগ লেও পহলে, বাবুকো দিমাক মত্‌ খারাপ করে।’

আমি মোহনবাবুর দিকে তাকালাম, মোহনবাবু হাসলেন। হোরো চাল ওজন করে, স্বরসত্তিয়ার হাড়িতে ঢেলে দিল। স্বরসত্তিয়া যাবার আগে বললো, ‘আভি আয়েগা।’

বলে প্রায় দৌড়েই চলে গেল। আমি সরে এসে স্বরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ডিয়েং মানে তো হাড়িয়া?’

স্বরীন বললো, ‘হ্যাঁ।’

আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওদের সকলের ডিয়েং খেতে কতো টাকা লাগতে পারে?’

স্বরীন বললো, ‘খাওয়াবেন নাকি?’

বললাম, ‘ক্ষতি কী? এদের যদি একটু খুশি করতে পারি, আমি হুশী হবো।’

স্বরীনের মুখে যেন একটি খুশির কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো, বললো, ‘কতো আর, পনেদ্রো বিশ টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। এখানে সূর্যমণি বলে একটি বিধবা মেয়ে আছে এই দলে। সে তার নিজের পরসায় মোহনদার কাছ থেকে চাল কিনে, ডিয়েং বানায়, এরা কিনে খায়। দেখুন না, একটু বাদেই সব ডিয়েং নিয়ে বসবে। আপনি সূর্যমণিকে টাকা দিলে, ও ডিয়েং তৈরি করে দেবে। ওর হাতের ডিয়েং সবাই ভালবাসে।’

সূর্যমণি নামটা, মৃত্যুদের মধ্যে, একটু অস্বস্তিকর। সময়তলের হিন্দুদের মতো শোনাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তার হাতে কি বিশেষ গুণ আছে?’

স্বরীন বললো, ‘তা আছে। এক একজনের হাতের রান্না যেমন ভাল হয়, ডিয়েংও এক একজনের হাতে ভাল হয়।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার কি সূর্যমণির ডিয়েং-এর স্বাদ জানা আছে?’

স্বরীন সলজ্জ হেসে বললো, ‘তা একটু আধটু আছে। আপনি কখনো হাড়িয়া খেয়েছেন?’

বললাম, ‘না। কীরকম খেতে?’

স্বরীন বললো, ‘আপনারা খেতে পারবেন না। অনেকটা, কয়েকদিনের বাসি পাস্তাভাতের মতো, কচলানো, ছাঁকা। দেখতে অনেকটা ঘোলের মতো লাগে, তার থেকে ভারী, স্বাদ টোকো।’

কিছুটা অস্বস্তি করে, খুব স্বেচ্ছায় মনে হলো না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘গন্ধটা কেমন?’

স্বরীন বললো, ‘অনেকটা পচা ভাতের মতন।’

সর্বনাশ! অমন বিদ্যুটে বস্তু গলাধঃকরণ করে কী করে? বললাম, 'কোনোদিক থেকেই তো ভাল মনে হচ্ছে না?'

স্বরীন হেসে বললো, 'সবই অভ্যাসের ব্যাপার। ওরা পেট থেকে পড়েই খায়, ওদের কিছু মনে হয় না। খেতে খেতে নেশা হয়ে যায়, তখন আমরা কিছু মনে হয় না। আমি এখনো নাক টিপে, কোনরকমে এক চুমুকে খেয়ে কেলি।'

বললাম, 'তা হলে আপনার হাতে আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি সূর্যমণিকে দিয়ে দেবেন।'

স্বরীন বললো, 'দেবেন এখন। আজ তো কিছু হবে না। আজ রাতে ওকে টাকা দিয়ে রাখবো, ও মোহনদার কাছ থেকে চাল নিয়ে, ফুটিয়ে রাখবে। বাই, আমি হাজাকটা জালি গিয়ে।'

স্বরীন চলে গেল। সকলের চাল নেওয়া সাক্ষ। নিচের চরায়, ছোট ছোট পাতার চালার ধারে ধারে, প্রায় দশ বারোটা উমুন জলছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এসেছে। পুরোপুরি অন্ধকার নামেনি, এখনো আকাশের হালকা রঙ দেখা যায়। তারা ফুটে আরম্ভ করেছে। মোহনবাবু খাটিয়ার কাঠের পায়ার গোল জায়গায় হারিকেন রেখে, এখনো হিসাব করছেন। তাঁর বনবাস মানেই কাজ এবং জীবিকা। হোরো চালের বস্তা আর পাল্লা বাটখারা রেখে, খাটিয়ার কাছাকাছি কাঠ জড়ো করছে, আগুন জ্বালাবে।

এই বনের বুকে নেমে আসা অন্ধকারের মধ্যেও, কেকাধনি প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি, দূরে অদূরে। অনেকক্ষণ কোয়েনার কুলুকুলু দুর্বোধ গান শুনতে পাইনি। অনেক লোকের নানা কলরবে, নিজের অগ্ন্যম্নস্বতায় সেই নিরন্তর ধ্বনি হারিয়ে গিয়েছিল, এখন আবার শুনতে পাচ্ছি। নিরালা বনকে অনেক সময় মনে হয়, নিঃশব্দ। কিন্তু কখনোই তা না। যেখানে কোয়েনা নেই, সেখানেও এই সারেঙা বন নিরন্তর বেঁচে থাকার স্রুপিণ্ডের স্পন্দনের মতো, ঝিঁঝির ডাকে মুখর। অথচ ঝিল্লিস্বর যেন নৈঃশব্দেরই আর এক অঙ্গ। তা যে নিরন্তর বাজে, আমরা মনে করে রাখি না। মনে পড়ছে, ছোট নাগরায়, তৃপ্তি বলেছিল, 'মুণ্ডারা মনে করে রাখি না। মনে পড়ছে, ছোট নাগরায়, তৃপ্তি বলেছিল, 'মুণ্ডারা মনে করে রাখি না, কাঁদে।' মনে পড়ে যায় সেই কবিতার পঙ্ক্তি, 'ঝিল্লিস্বরে কাঁদায় রে/নিশার গগন।'

এখন আমার মাথার ওপরে নিশার গগন। ঝিল্লিস্বরে সে কাঁদে কী না, বুঝতে পারি না। আমার কেবলই মনে হয়, আমি যেন মর্ত্যভূমে নেই। কোন এক দূরকালের, দূরলোকে এসে পৌঁছেছি, যার রূপ বর্ণ গন্ধ, সবই আমার।

স্বাধীন পতীরে ঢুকে, আমাকে নিশির ঘোরে টেনে নিয়ে চলেছে। এখনো অনেক ঘর শোনা যায়, কিন্তু তা কলরব বলে মনে হয় না। মনে হয়, সবই যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে। আগুনের শিখার ধারে ধারে নারী পুরুষের ছায়া মূর্তিগুলোকে দেখে মনে হয়, যেন মন্দিরের গা থেকে প্রাচীন শিল্পীর প্রস্তর মূর্তিগুলো প্রাণ পেয়ে নেমে এসেছে।

আমি নিচের দিকে আস্তে আস্তে নেমে গেলাম। একটি উল্লুনের ধারে সোমারি আর শুক্রমকে চিনতে ভুল হয় না, যদিও উল্লুনের কাঠের আগুনের আলো ছাড়া কিছু নেই। আগুনের শিখার আলো ওদের গায়ে কাঁপছে। শুক্রম হাসলো, সোমারি ডেকে বললো, ‘আও বাবুজী। তুমি হমলোগ্‌কে এক টিনা সিগ্রেট দিয়া?’

আমি হাসি, কোনো জবাব দিই না। সোমারি আবার বললো, ‘স্বরসতিয়া আভি সবকো সিগ্রেট বাটতো। বয়ঠো না বাবুজী।’

এ ঘরের আঙিনা না, যে আসন পেতে বসতে দেবে। এখানে ওরা কাজে এসেছে, কোনোরকমে জীবনধারণ। সকলেরই মৃত্তিকা আসন। আমি বসলাম না। ওদের উল্লুনে ভাতের হাড়িতে, ভাত রান্না হচ্ছে। সোমারির গায়ে, ছোটখাটো একটি শাড়ি জড়ানো, কোনোরকমে হাঁটুর ওপর থেকে বুকে জড়ানো। চুল খোলা, পিঠে ছড়ানো। শুক্রমকে মনে হয়, যেন একটি উল্লু পুরুষ। কিন্তু আমার মনে কৌতূহল আগে, সোমারির সামনে মাটির ওপরে কতগুলো কী চিকচিক করে? জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ কেয়া চিজ্‌ ছায়?’

সোমারি হেসে বললো, ‘লোয়াক না?’

যেন আমি একেবারেই অবুঝ অন্ধ, এমনভাবে সে বলে। কিন্তু লোয়াক আবার কী বস্তু। আমি একটু নিচু হতেই, সোমারি হাতে তুলে দেখায়। আগুনের আলোয় দেখলাম, গোলমতো ঝিঙ্কক। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইস্কো তুমলোগ লোয়াক কহতা?’

সোমারি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, ‘হাঁ।’

আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেয়া করেরগা?’

সোমারি যেন অবাক হয়ে বললো, ‘খায়েগা তো।’

বলে, হাতের ঝিঙ্ককটির মুখ জোর করে খুলে ফেলে, ভিতর থেকে জীবটিকে বের করে, আমাকে দেখালো। প্রায় রক্তিম একটি ছোট ডালা। তার থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন তুলে নিয়ে ফেলে দিল। তারপরে ভাতের হাড়ির ঢাকনা

থলে, তার মধ্যে সেই ডালাটি ছেড়ে দিল। দিতে গিয়ে, ওর বকের আঁচল সরে গিয়ে, ঈষৎ নম্র পুষ্ট একটি বুক উদ্গাস হলো। কিন্তু ও নিজেও উদ্গাস, চাকবার কোনো প্রয়োজন মনে করলো না, হেসে বললো, ‘ভাতকো লাখ খায়গো।’

এমন বিচিত্র খাওয়া কখনো দেখিনি। অগতঃ কোথায় কতোটুকুই বা দেখেছি। সবই তো, প্রকৃতি পরিবেশ আর জন্ম-নির্ভর। একজনের খাদ্য, আর একজনের অখাদ্য হতে পারে, তার জন্ত ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার কিছু নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রোটিন, এও তো তা-ই। বাঙালীরা গুগুলির ঝোল খায়। তা নাকি বিশেষ ব্যাধিতেও ফলপ্রসূ। যার নাম চিংড়ি, সেও খোলের মধ্যে থাকে, বলা যায়, জলজ কীট বিশেষ। নাক সিঁটকে কিছু বলতে গেলে, তাবৎ পৃথিবীর লোকেরা আমাদের ভাঙা নিয়ে তেড়ে আসবে। চিংড়ি খায় না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল।

খাওয়ার কথা বলতে গেলে, পুরো এক কেতাবের ফিরিস্তিতেও কুলোবে না। সকল জাতি তাদের খাওয়ার, রন্ধনের গৌরবে গৌরবান্বিত। পূর্বে পশ্চিমের বাঙলাতেই কতো তর্কাত! এর পাতালকোঁড়কে ওরা বলে ব্যাঙের ছাতা, ওদের শুকনো মাছের গন্ধে এরা নাকে কাপড় দিয়ে পালায়। এ আর এমন কি কথা, বাঙলাদেশের সোনা ব্যাঙের ঠ্যাং নাকি পড়তে পায় না, বিদেশে তার জ্বর কদর। জিজ্ঞেস করলাম, ‘উসকো ক্যায়সে পাকায়গো?’

সোমারি বললো, ‘বাস্, ভাত কো লাখ পাক যাতা।’

অর্থাৎ ঝিহকের মাংস, ভাত সেকই থাকবে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘অওর ক্যায় পাকায়গো?’

সোমারি সারা মুখে আগুনের শিখা কাঁপা হাসি মেখে বললো, ‘অওর ক্যায়? বাস্, ভাত, অওর নিমক তো হায়।’

ভাত আর হুন! অবিশ্বাস্য মনে হলো। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘অওর কুছ নহি? ডাল ভাজি?’

সোমারির হাসিতে ওর উদ্গাস বুকও ধেন হাসলো, বললো, ‘ডাল ভাজি? কই মিলেগো?’

জিজ্ঞেস করাটাই বোধহয় ভুল হয়েছে। বুঝতে পারিনি। নিজের জীবনে অনেক দুর্বিপাক গিয়েছে, বৃষ্টিভেজা অতৃষ্ণ কালের মতো, ভবিষ্যতের আশায় বৈচে থাকতে চেয়েছি। তবু মনে হয়, মানুষের জীবনমরণের অনেক সংবাদই অজানা রয়ে গিয়েছে। তারপরে, আর কিছু না, এই ভেবে অবাক লাগে, আর

এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত্তায় বোবা হয়ে থাকি, তারপরেও এমন হাসিটি ওরা হাসে কেমন করে ? যেন জন্মলগ্নে, এই হাসিটি মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে । অথচ, সেই বিরসা মুণ্ডার কথাও মনে পড়ে, যিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে, কামান বন্দুকের সঙ্গে, তীর ধহুক নিয়ে, দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়েছিলেন । বুঝতে পারি, এই হাসি মুখে, যুগ্ম আর ক্রোধও লেলিহান হয়ে জলে উঠতে পারে ।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘সবকোই অ্যারসাই খাতা ছায় ?’

সোমারি ষাড় কাত করে যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করলো, ‘তব ?’

আগুনের কল্পিত শিখার ভিতর দিয়ে, স্বরসত্তিয়া আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, একটি সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘তুম পিও ।’

আমি বললাম, ‘হমকো তো ছায় ।’

স্বরসত্তিয়া তবু বললো, ‘তুম হমকো দিয়া, তুমকো হম দেতা ।’

বলে সিগারেটটি সে প্রায় আমার মুখের কাছে তুলে দিল । আমি ওর হাত থেকে সিগারেটটা নিলাম । ওর আর এক হাতে কোঁটোটা ছিল । তার মধ্যে একটি সিগারেটই অবশিষ্ট ছিল । সেটি নিয়ে, কোঁটোটা আমাকে দেখিয়ে বললো, ‘ইটো হম রাখ দেগা ।’

সামান্য একটা সিগারেটের টিন । জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইঠো লেকে ক্যায়্য করেরগা ?’

স্বরসত্তিয়া ষাড় ঝাঁকিয়ে বললো, ‘হমকো পুনহার রাখেরগা ।’

পুনহার ? সেটা আবার কী বস্তু । জিজ্ঞেস করলাম ‘পুনহার ক্যায়্য ?’

স্বরসত্তিয়া ওর গলায় হাত দিল, তারপর পাশ কিরে, ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকি, মাংরিব গলার পুঁতির হার হাত দিয়ে ধরে দেখালো, ‘এ তো পুনহার ।’

পুঁতির মালার নাম পুনহার । স্বরসত্তিয়ার গলায় পুঁতির মালা নেই । ওর গায়ে কোনো অলঙ্কারই নেই, কানের বড় ফুটোয় ছোটো কাঠের তৈরি ঝড়কে ছাড়া । বললাম, ‘তুমকো পুনহার তো নহি ছায় ?’

স্বরসত্তিয়া মুখ নিচু করে মাথা নাড়লো, তারপরে মাংরিব দিকে তাকিয়ে হাসলো । সোমারি হেসে উঠে কী যেন বললো । শুক্রম দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, আপন মনে একটা ফিকা টেনে যাচ্ছে । বিশ্ব সংসারের সঙ্গে যেন তার কোনো যোগাযোগ নেই, একটি গভীর দার্শনিকতা যেন প্রায় নগ্ন পুরুষটির মুখে ।

স্বরসত্তিয়া আমাকে ষাড় নেড়ে, কৃষ্ণ চোখের ইশারা করে ডাকলো, পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো । আমি ওর সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলাম । বোঝা

যায়, কারোরই হারিকেন বা লম্প বলে কোনো বাতি নেই, যা কিছু সবই কাঠের আঙনের আলো। কে যেন স্বর করে, গান গেয়ে চলেছে। মনে হয় এদের গানের স্বরে কোনো বৈচিত্র্য নেই, একটাই স্বর, অনেকটা কোয়েনার কুলকুল, ঝিঁঝির ডাকের মতো।

এদের গানে কথাই প্রধান।

আমি স্বরসত্তিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সোমারি ক্যায় বোলতা রহা?'

স্বরসত্তিয়া হাসলো। মাংরি জবাব দিল, 'সোমারি বোলতা রহা কি, স্বরসত্তিয়াকে পুনহাং নহি, তুমকো ছুখ্ লাগতা।'

কথাটা একেবারে মিথ্যা না। দারিত্র্য নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি, আমাদের নগরে গ্রামে জনপদে আর এই বনের দারিত্র্য নিজের চোখেই দেখছি। একটি সিগারেটের কৌটো রেখে দেবে, ভবিষ্যতে কোনো একদিন যখন সে একটি পুঁতির হার পাবে, তার মধ্যে রাখবে বলে। আমি জানি না, এই পাথরপ্রতিমা স্বরসত্তিয়ার সুগঠিত কাঁধে এবং গলায়, একটি পুঁতির মালা কতোটুকু সৌন্দর্য দান করবে, তথাপি, মনের বাসনা বলে একটি কথা আছে। নগরবাসিনী আর বনবাসিনী, যে-ই হোক, নিজেদের নিজেদের মতো করে, সাজাতে চায় সকলেই। স্বরসত্তিয়ার গলায়, একটি পুঁতির হার দেখতে ইচ্ছা করে বৈকি। কিন্তু সোমারি আমার দুঃখের কথা বলেছে, একথা বলেনি, আমি যেন একটি পুঁতির হার স্বরসত্তিয়াকে দিই। যেটা বলা অশোভন বা অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। হয়তো সিগারেট চেয়ে খাওয়া যায়, পুঁতির হার চাওয়া যায় না।

আমি বললাম, 'হাঁ ছুখ্ লাগতা।'

স্বরসত্তিয়া আমার দিকে তাকালো। আমি ওর কালো চোখের ঝিলিক দেখতে পলাম। বললো, 'হুমকো সরম লাগতা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কাহে?'

স্বরসত্তিয়া বললো, 'নাই জানতা।'

বলে হেসে উঠলো, একটি হাত তুলে দিল মাংরির কাঁধের ওপর। মাংরি গুনগুন করে, গান গেয়ে উঠলো।

স্বরীন নেই যে, মানে বলে দেবে। আমি মাংরিকেই জিজ্ঞেস করি, 'তুম ক্যায় গানা গাতা?'

স্বরসত্তিয়া মাংরি, দু'জনেই হেসে উঠলো। মাংরি বললো, 'হুম গাতা ছায়, তুম কোন মলুককা হাওয়া আয়া, হুমকো সাতবহিনি বোলাতা।'

ভায় মানে, তুমি কোন্ দেশের বাতাস এলে, আমাকে সাতবহিনি ভাকছে। কোন্ দেশের বাতাসের ব্যাপারটা বুঝতে পারি, সাতবহিনির ভাক বুঝতে পারি না। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করি, ‘সাতবহিনি ক্যারা হায়?’

স্বরসতিয়া আর মাংরিও দাঁড়িয়ে পড়লো। মাংরি বললো, ‘তুম পয়রী জানতা, পয়রী? খুবস্বরত লেড়কি, উড়নে সক্তা?’

পয়রী—মানে কি পরী? স্বন্দরী মেয়ে উড়তে পারে, বোধহয় পরীর কথাই বলে। বললাম, ‘হমলোগ পরী বোলতা।’

মাংরি বললো, ‘ওইনা সাতবহিনি পরী হায়। উ লোগ্ ভায় জঙ্গলমে কতি কতি দর্শন দেতা, যোয়ান লেড়কা অপর লেড়কিকে। সাতবহিনিকে দর্শন হোতা তো, দিল মে মহবত আতা, লেকড়া লেড়কি পাগল হো যাতা, ঘর ছোড়কে চলা যাতা।’

ভীষণ ব্যাপার। সাতবহিনি সাত পরী, গভীর জঙ্গলে তারা যুবক যুবতীদের দর্শন দেয়, তাদের প্রাণে প্রেম সঞ্চারিত হয়, তারা পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে যায়। অর্থাৎ প্রেমের হাতছানি, প্রেমসম্মোহন। এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিদেশী এক হাওয়া লেগে সাতবহিনির ভাক শোনা মানে, প্রেমে পাগল হওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, স্বরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশে-পাশের কাঠের আগুন ওর গায়ে চোখে মুখে কাঁপছে। সেই অরণ্য-আদিম মন্ত্র ওর চোখের তারায়, মুখের হাসিতে। ও নিঃশব্দে ষাড় হুলিয়ে, আমাকে ভাক দিয়ে, এগিয়ে গেল। আমার সাতবহিনি সাত পরী দেখছি একলা স্বরসতিয়া নিজেই। প্রেম পাগল হই কী না, বুঝি না। মন্ত্রমুগ্ধ যে হয়েছি, তা বুঝি।

ও বেলা প্রথম হোরোকে, সব থেকে বড় যে পাতার ঘরের পাশে দেখেছিলাম, স্বরসতিয়া আর মাংরি আমাকে সেই ঘরে নিয়ে এলো। এ ঘরের চেহারা আলাদা। সমস্ত কাঁচা মাটির মেঝের ওপরে শুকনো পাতা মোটা করে বিছানো। তার ওপরে, চট, হোগলার মাদুর বিছানো। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে কাঠের আগুন জ্বলছে। ঢোকবার মুখের কাছেই, ওপরে শাল কাঠের চালার খুঁটির সঙ্গে, একটি হারিকেন জ্বলছে। ঘরের শেষ প্রান্তে, কিছু মেয়ে পুরুষ গোল হয়ে বসে আছে। তারা হাসছে, কথা বলছে, সেখানেও একটা আলো রয়েছে মনে হয়। কয়েকজন এদিকে ওদিকে বসে আছে। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখে হাসলো, একজন কপালে হাত ঠেকালো। আমিও ঠেকালাম।

স্বরসতিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘উদার মে ক্যারা হোতা হায়?’

স্বরসত্তিয়া এবার অসংকোচে আমার একটি হাত ধরে বললো, ‘দেখগা, চোমো।’

বলে মাংরির দিকে তাকিয়ে হাসলো। পাতার দেওয়াল বেঁবে, এক এক জনের ছোট সংসারের জিনিসপত্র রাখা। খালা বাটি-বাটি হাঁড়ি মালসা পুঁটলি এমন সব জিনিস। বোকা যায়, এ ঘরটা এক সঙ্গে অনেকের শয়ন ঘর। স্বরসত্তিয়ার হাত ধরা হয়ে, আমি গোল হয়ে বসা গুচ্ছের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখনই বুঝতে পারলাম, মোতাতের জটলা জমেছে। এবানেও কাঁচা মাটি কাঁকা, কিছু বিছানো নেই। একটি লম্বা লিখা কাঁপছে। থাকে ঘিরে সবাই বসেছে, সে একটি যুবতী। সে ঠিক কালো না, প্রায় মাজা মাজা কবসাই বলা যায়। বোধহয় স্বান করেছিল, খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। মুখটি অবিভি পুরোপুরি বনবাসীর। কিন্তু চোখের তারা দুটি খয়েরি। হু’ হাতে দুটি ঝকঝকে কাঁসার বলয়। গলায় বোধহয় রূপোর সরু হার, কানে রূপোরই মশকড়ি। বোকা যায়, যুবতী বেশ সম্পন্ন। তার সামনে একটি মাটির বড় জালা। জালায় মুখ ঝাঝড়া দিয়ে ঢাকা। জালায় পাশে, শালপাতার ওপরে, ঝকঝকে একটি কাঁসার জামবাটি। বাকিদের হাতে, শালপাতার দোনা, অনেকটা ছোট ছোট নৌকার মতো। তার মধ্যে, স্বরীনের বলা সেই পানীয়, অনেকটা শাদা পাতলা ক্যানের মতো।

কেউ কেউ মুখ তুলে চুমুক দিচ্ছিল, কারোর হাতে ধরা। হু’ একজনের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, একজনের কানে গোঁজা। বুঝলাম, জালায় পাশে বসে থাকা যুবতী আর কেউ না, শুণ্ডিনী সূর্যমণি, বাকিরা ক্রেতা ক্রেতী। আমাকে দেখেই, সূর্যমণি মুখে বাঁ হাত চাপা দিয়ে, হেসে স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকালো। বাকিরাও হাসলো, কেউ সশব্দে, কেউ নিঃশব্দে। সবাই যেন একটু নড়ে চড়ে বসলো, ভাবটা যেন আমাদের সম্মান করে, জায়গা করে দিতে চাইছে। যে হু’ তিন জন জোয়ান মুণ্ডা বসেছিল, তাদের দৃষ্টি স্বরসত্তিয়া আর মাংরির দিকেই বেশি। তাদের মধ্যে একজন মাংরির দিকে তাকিয়ে কী বললো। মাংরি তার জবাবে কিছু বললো না, কেবল মাথা নাড়লো। স্বরসত্তিয়া আমার দিকে তাকালো, ওর চোখে সেই আদিম মন্ত্র, আমাকে সম্মোহন করছে। হাতে একটু টান দিয়ে বললো, ‘নহি বয়ঠেগা?’

বললাম, ‘বৈঠেগা।’

এ সময়ে সূর্যমণি স্বরসত্তিয়ার নাম ধরে কিছু বললো। মাংরি তার জবাবে কিছু বলে, ঘরের অন্ধ দিকে চলে গেল। স্বরসত্তিয়া আমার হাত ধরে বসলো।

ও বসলো মাটিতে চেপে, আমিও তাই বসলাম। ও অনারসে আমার কোলের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, ‘ভিয়েং পিয়েগা না?’

আমি হরসতিয়ার চোখের দিকে তাকালাম। মাথা নেড়েও যে ‘না’ বলবো, তা পারলাম না। বনের ডাকে এসেছি, বনের সঙ্গে খেলতে। এই খেলাটা কী? বনের খেলার সঙ্গে, বনবালার এই খেলাটাও অন্ধাকী? কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে আমাকে, কতোদূরে। ওকি, ওদেরই লাভবহিনির কেউ নাকি? বললাম, ‘কতি পিয়া নহি।’

হরসতিয়ার ভুরু কাঁপলো, জিজ্ঞেস করলো, ‘তুম্ দারু কতি নহি পিয়া?’

দারু যদি হয়, তা হলে, অস্বীকার করার উপায় নেই, তার স্বাধীন প্রতিক্রিয়া সকলই আমার জানা আছে। কিন্তু হাঁড়িয়া নামক এ বস্তুর স্বাধীন আমার জানা নেই, যার আমানি টকো গন্ধ আমার নাকে আসছে। আমানি পাশ্চাত্য ভারতের গন্ধ অনেকটা এইরকমই। বর্ধমানে, বীরভূমে, মাঠে ঘাটে খেটে-খাওয়া মানুষদের দেখেছি, দু’দিনের ভিজিয়ে মাথা হাঁড়ি থেকে ভাত ভুলে খেতে। জলহুচ্চ চটকে, মুন মেখে, একটু বা তেঁতুলের আচারের টাকনা দিয়ে। সম্বল থাকলে, একটু কিছু ভাজাতুজি। নিজেও যে খাইনি, তা না। বর্ধমানেই রীতিমতো সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাড়িতে, পোরের ভাজা দিয়ে, আমানি খাওয়া একটি বিলাসিতা। গরম গরম ভাজা, তার সঙ্গে হাঁড়ির ঠাণ্ডা আমানি, অমৃততুল্য। তারপরে যে নিদ্রাটি আসে, নাক না ভাকিয়ে যায় না। হরসতিয়াকে বললাম, ‘পিয়া।’

হরসতিয়া বললো, ‘ই তো দারু হায়, ভিয়েং হায়, হয়ারা দারু। তুম্কেও আচ্ছা নহি লাগতা?’

আমি হেসে বললাম, ‘ক্যায়সে কহেগা, আচ্ছা কি খারাপ। এ চিজ্ তো কতি নহি পিয়া।’

হরসতিয়ার মুখ কি আমার মুখের কাছে নিবিড় হয়ে আসে? ওর নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ের গলায় লাগছে। বললো, ‘আজ পিও।’

সূর্যমণি হেসে উঠে বললো, ‘এ তো বামাইবুরুকা বহত রূপা, বাবুজী কোঁ এক কুড়ি দারু পিলানে মাংতা।’

সূর্যমণির কথা বেশ পরিষ্কার, বলার ভঙ্গির মধ্যেও একটি স্বচ্ছতা আছে। কিন্তু বামাইবুরুকা রূপা কী, আর কুড়ি-ই বা কাকে বলে, জানি না। ইতিমধ্যে সূর্যমণির কথায়, অনেকেই ঘাড় তুলিয়ে তুলিয়ে, হেসে বললো, ‘ইয় ইয়।’

আমি হরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বামাইবুরু ক্যায় হায়?’

স্বরসত্তিমা চোখের তারা ছুরিয়ে, এক হাত তুলে বললো, 'দেওতা, পাহাড় কে দেওতা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'অণ্ডর কুড়ি।'

স্বরসত্তিমা হেসে, সূর্যমণির দিকে তাকালো। সূর্যমণি বললো, 'কুড়ি নহি জানতা বাবুজী? কুড়ি ছায় লেড়কি, যবান লেড়কি। কোড়া ছায় যবান লেড়কা, হমারা মুণ্ডা বাত আয়সা ছায়।'

একটি মেয়ে, সূর্যমণির থেকে বোধহয় একটু বড় হবে, তার চোখ তুলুতুলু, কথাও যেন জলে ভরা। বললো, 'স্বরসত্তিমা কুড়ি নহি, কোটরি ছায়, কোটরি।'

সকলেই যেন উল্লাসে হেসে বেজে উঠলো। আর স্বরসত্তিমা, আমার কোলের কাছে, আমা চেপে ধরে, আমারই কাঁধের কাছে, ওর মুখ চেপে ধরলো। আমাদের গ্রাম অনপদ শহরে, এমন ঘটনা অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়। একটি ষোল সন্তেরো বছরের পাথরপ্রতিমা মেয়ে, অন্যায়সে একটি ভিন্দেনী পুরুষের কাঁধে মুখ চাপে। যার সঙ্গে তার পরিচয়ের সময়ের হিসাব করলে, সাকুল্যে কয়েক ঘণ্টা। একে কি প্রেম পিরীতি বলে? যদি বলে, আমি তার রীতি জানি না। প্রেম কি এতগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারীর সামনে হতে পারে? কিন্তু কোটরি মানে কী? যার অণ্ড সবাই এমন হেসে বাজে, আর 'যবান লেড়কি' আমার কাঁধে মুখ লুকায়? আমি সূর্যমণির দিকেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকলাম। সূর্যমণির গেকুরা ফর্সা মুখ হাসিতে লাল, যেন সারেশুর রক্ত মুক্তিকায় সূর্যের ছটা লেগেছে। আমার জিজ্ঞাসা বুঝতে পেরে বললো, 'কোটরি কহতা ছায়, যো মুরগী আভিতক আগা নহি দিয়া।'

এক মধ্যবয়স্ক মুণ্ডা চিংকার করে হাঁকলো, 'হাঁ হাঁ, যো মুরগীকা উপার আভিতক মুরগা নহি চটা।'

বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে, ছ' বার লাফিয়ে, কোমর ছলিয়ে ছলিয়ে বলে উঠলো, 'লাকের লকের লকের।'

স্পষ্টতই, মুণ্ডা মহাশয়ের দ্রব্যগুণ উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। সকলেই হেসে উঠলো, আর এদিকে স্বরসত্তিমা আরো জোরে, আমার কাঁধে মুখ চাপছে, চেপে ধরেছে আমার একটি ডানা। মুণ্ডার কথায় লজ্জা যে আমিও পাই না, তা না। কিন্তু আমার লজ্জা পাবার অবকাশ কম, যতটা পায় স্বরসত্তিমা। কারণ, স্বরসত্তিমার পরিচিত নরনারী আর সমাজ ওর সামনে। তারা ঠাট্টা করলে, ও লজ্জা পাবেই। আমি বিদেশী, অনেকখানি অপরিচিত। অবাক লাগে, এদের

আশ্চর্য সরলতায়! এখানে ভাল লাগার প্রকাশ কি এমন-ই অনাবিল? আরো মুখ হই এদের ভাবায়, এবং উপযুক্ত সময়ে তার প্রয়োগে। হয় তো, পরিবেশের গুণে এই একটি কথাই, আমাদের সমাজে অঙ্গীল শোনাতে। এখানে নিত্যসুই ঠাট্টা। কুমারী মেয়েকে বিশেষণ দিচ্ছে ‘কোঠারি’—যে মুরগী এখনো ডিম পাড়েনি।

এ সময়ে এলো মাংরি, গর হাতে একটি ঝকঝকে কাঁসার বাটি। মধ্যবয়স্ক মুণ্ডা তখন, শালপাতার নৌকা বাড়িয়ে, সূর্যমণির কাছ থেকে ডিয়েং নিচ্ছে। মাংরি এসে, ব্যাপার দেখে একটু অবাক হয়। সুরসতিয়া আমার কাঁধ থেকে মুখ সরিয়ে, মাংরির দিকে তাকালো। মাংরি ওকে কী জিজ্ঞেস করলো, তার জবাবে, খুব ক্ষুণ্ণ, সূর্যমণি কিছু বললো। সকলেই এবার হেসে উঠলো, মাংরিও। মাংরির হাত থেকে কাঁসার বাটিটি সুরসতিয়া নিল, এগিয়ে দিল সূর্যমণির দিকে। সূর্যমণি তার নিজের জামবাটি দিয়ে, জালায় মুখ খুলে ডিয়েং তুলে, সুরসতিয়ার বাটিতে ঢেলে দিল। সুরসতিয়া ছ’ হাতে বাটি ধরে, আমার সামনে ধরলো। এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করলাম। সুরসতিয়ার অরণ্য-আদিম, যেন অলৌকিক চোখের দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে বাটি নিলাম।

সূর্যমণি ইতিমধ্যে ছুটি শালপাতার নৌকা মাংরির হাতে তুলে দিয়েছে। মাংরি একটি নৌকা দিল সুরসতিয়ার হাতে। দু’জনেই শালপাতার নৌকায় সূর্যমণির কাছ থেকে ডিয়েং নিল। সকলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। - বিশেষ করে, আমার দিকে তারা বারে বারে তাকিয়ে দেখছে। সুরসতিয়া আমার দিকে তাকালো। অস্বীকার করতে পারছি না, ডিয়েং-এর গন্ধ আমার ভাল লাগছে না। - কিন্তু সে কথা বলতে পারি না।

আমার একপাশে সুরসতিয়া, আর এক পাশে মাংরি। মাংরি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, ‘হমার্য দোস্তানি কো বে-ইজ্জতি মত্ করো বাবুজী। কোই লেড়কি দেনে সে পিনে হোতা।’

সুরসতিয়া কেন আমাকে এমন একটি কঠিন পরীক্ষার ফেললো। অন্তত এই বিষয়ে, আমার স্বাধীনতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সে কথাই বোধহয় সব না। সুরসতিয়া যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আচ্ছা নাই লাগতা?’ ভায় মানে একটাই দাঁড়ায়, ওদের পানীয়কে আমি ঘৃণা করছি কী না। এ কথা যদি কোনো প্রেমীর মায়ের মনে হয়, তাদের ভোজ্য আর পানীয় কেউ ঘৃণা করে, তা হলে সেখানে কেবল দুঃখ পাওনাটাই বড় হয়, বিরোধের সঞ্চার হতে পারে।

স্বরসত্তিয়া আমার দিকে চোখ রেখে, আন্তে আন্তে হাতের শাল পাতার নোকা, ওর ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলো। মাংরিও ওর নিভেরটা নিভের ঠোঁটের কাছে। আমি ভাবি, বিব তো না। জীবনে তো অনেক কিছুই স্বাদই নিয়েছি। সেখানে ইচ্ছার প্রসন্ন, নেখানে তা রক্ষা করতেই হবে। আমি কাঁসার বাটি মুখে তুলে ধরলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে, চুমুক দিলাম। ইচ্ছা করলো, ইংরাজিতে চিৎকার করি, ‘হরিব্লু!’ কিন্তু স্পর্শ বন্ধন করেছি, স্বাদ নিয়েছি, এই টক পচা মাড়ের মতো গন্ধযুক্ত পানীয়, তখন ধাম্বো না। স্বরসত্তিয়ার মতো আমিও নিঃশ্বাস বন্ধ করে, এক চুমুকে বাটি শুষ্ট করে দিলাম। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি ক্রমাল বের করে, মুখ মুছে, একটি সিগারেট ধরলাম। স্বীকার না করে উপায় নেই, আমার যেন বমনোদ্বেগ হতে চাইছে। গলার কাছে ঠেকে থাকা স্বাদটা বারে বারে চোক গিলে, ভিতরে চালান করতে চাইলাম।

সকলেই আমার দিকে তাকিয়েছিল। স্বরসত্তিয়া একবারের জন্ত চোখ সারান্ননি। আমি ওর দিকে তাকালাম। স্বরসত্তিয়ার চোখের গভীর কালো দৃষ্টিতে যেন স্রুদের টান। ঠোঁটে হাসি। জিজ্ঞেস করলো, ‘ক্যায়সা?’

আমি বললাম, ‘খাট্টা।’

সবাই আমার কথা শুনে হেসে উঠলো। স্বরসত্তিয়া বললে, ‘সবকোই বোলতা রহা কি, তুম কভি হমারা ডিয়েং নহি পিয়েগা। কলকাতা কা দীধু বাবু ডিয়েং নহি পিতা।’

জলের বাইরে, সমতলবাসী মাঝেই, ওদের কাছে দীধু। কিন্তু স্বরসত্তিয়ার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য না। আমার অনেক বন্ধুর মুখেই শুনেছি, ইন্ডিয়া পচুইয়ের স্বাদ তাদের জানা আছে। এবার আমিও তাতে যোগ দিতে পারবো, বলতে পারবো, আমরাও জানা আছে।

স্বরসত্তিয়া আমার হাত থেকে বাটি নিয়ে, আবার সূর্যমণির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। সূর্যমণি ডিয়েং ঢাললো। আমার মুখ খুলেছে। একবার যা মুখ করতে পেরেছি, তা আবার পারবো। স্বরসত্তিয়া বাটি আমার হাতে তুলে দিল। ও আর মাংরি আগের মতোই শালপাতার নোকায় ডিয়েং নিল। আবার আগের মতোই চুমুক। লক্ষণীয়, সকলেই এক চুমুকে পাত্র শুষ্ট করে। বোধহয় আমার মতোই, এ পানীয় মুখের মধ্যে কেউ ধরে রাখতে পারে না।

স্বরসত্তিয়া ডিয়েং পান করে, শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে, অনায়াসে আমার হাত থেকে জলন্ত সিগারেট নিয়ে টান দিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আমার

দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দে হাসলো। দ্রব্যগুণের প্রতিক্রিয়া সামান্য অনুভব করছি। সুরসভিয়ার চোখ গভীর কালো জলে স্পর্ষচ্ছটার মতো চিকচিক করছে। ও মাংবির দিকে তাকিয়ে কী যেন বললো। কিছু না বুঝলেও, সুরীনের নামোচ্চরণটা ধরতে পারলাম। মাংরি উঠে, ঘরের বাইরে চলে গেল। হিন্দীতেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বললে শুকে?’

সুরসভিয়া হিন্দীতে বললো, ‘শুকে সুরীনের কাছে পাঠালাম, তোমার জন্ত কিছু ভেজে পাঠিয়ে দেবো ব্রহ্ম।’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন?’

সুরসভিয়া বললো, ‘আমি জানি, তোমার কষ্ট হচ্ছে। ভিয়ে পান করে, কিছু খাবার মুখে দিলে, তোমার খারাপ লাগবে না।’

কথাটা মিথ্যা না। কিন্তু বনবালায় ইচ্ছত রক্ষা করছি, কেন না, সেটা আমারো ইচ্ছত। দেশে দেশান্তরে এমনিই তো নিয়ম। কাদের যে কিলে ইচ্ছত যায় আর থাকে, নির্ভর করে তার সমাজ সামাজিকতার উপর।

কালকূট! এখন তুমি কার?

এখন আমি বনের।

তবে চলো বনের সঙ্গে, খেল বনের লীলায়। সুরসভিয়া সিগারেটটি আবার আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ওর দৃষ্টি আমার চোখের দিকে। সম্মোহিত আমি, সিগারেট নিলাম ওর হাত থেকে, স্পর্শ করলাম ঠোটে। যে-যেয়েটি সুরসভিয়াকে ‘কোটুরি’ বিশেষণ দিয়েছিল, সে সঙ্গ গলায় স্পষ্ট গেরে উঠলো,

‘হো হোরে কুড়ি নোরো জে নাম

বরসিড নাংগিন

লংদা জনর হিতি-প্রীতি।’...

একজন বলে উঠলো ‘অই অই!’

আমি তাকালাম সুরসভিয়ার দিকে। সুরসভিয়া হাসলো, বললো, ‘ও গাইছে, ওরে লেড়কি, বিহানবেলায় কেন তোর হুড়েরি। আর এখন যে বড় তেজি দেখছি।’

ও হিন্দীতে যা বললো, কথাগুলো এইরকম শোনার। সেই মেয়েটি তখনও গাইছে,

‘নে জীবন পাতিউ

নে জীবন কাহি নাযোগো।’

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি পুরুষের যেন গভীর আবেগে শব্দ করে উঠল,
‘আ আহু!’

স্বরসত্তিয়া আমার কানের কাছে যেন কিস্কিস করে বললো, ‘ও গাইছে,
জীবনটা পলকের রে। কুড়ি, এমন জীবন আর পাবি না।’

সেই মুহূর্তেই বনের অন্ধকার থেকে ভেসে এলো কেকাধনি, কে—কু!
কে—কু! আমি যেন কোন্ স্বপ্নের বৃকে হারিয়ে যাই। আমার কানের
কাছে বাজতে থাকে, জীবনটা পলকের। এমন জীবন আর পাবি না। মুহূর্তেই
যেন এক আরণ্যক জীবন তার স্বরূপকে মেলে ধরলো, আর কেকাধনি সেই
স্বরূপের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। এমন মানব-জীবন কেউ বিকলে
দিতে পারে না, কেন না, জন্মিলে মরিতে হইবে। অরণ্যে আবৃত ছায়া-ঘন
গভীর এই পার্বত্য অঞ্চলের জীবনবোধের সঙ্গে, কোথায় তফাত, সভ্যতার
আলোকের পারে জীবন-চিন্তার সঙ্গে? সব যেন মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়।
স্বরসত্তিয়ার দু’ হাত আমার কোলে পাতা, যেন অতীব স্বাভাবিক আর অনায়াস।

এই সময়ে স্বরীনের গলা শোনা যায়, ‘হাঁ, ঠিকই, এই তো এখানেই বসে
আছেন।’

মোহনবাবুও সঙ্গে, মাংরি তাঁর পিছনে। কাছে এসে বললেন, ‘এইমাত্র
স্বরীনকে বলছিলাম, আপনি কোথায় গেছেন, দেখে আসতে। তখনই মাংরি
গিয়ে হাজির। আমি ভাবছি, আপনি বাইরে, নদীর ধারে এদের রান্নাবান্না
দেখছেন। স্বরসত্তিয়া আপনাকে এখানে টেনে এনেছে।’

বললাম, ‘টেনে আনেনি, আমি নিজেই এসেছি ওর সঙ্গে।’

মোহনবাবু স্বরসত্তিয়াকে একবার দেখে বললেন, ‘সে তো বুঝতেই পারছি।
এখন আপনাকে ফেরত নিয়ে যেতে পারলে ঠাঠি। দীখুদের নিয়ে এরকমটা
করতে তো ওদের বিশেষ দেখি না?’

বলে হেসে উঠলেন। স্বরীনও হাসলো। স্বরসত্তিয়া কিন্তু আমার কোল
থেকে ওর হাত সরিয়ে নেয়নি।

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি নাকি হাঁড়িয়া খাচ্ছেন?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, স্বরসত্তিয়া আমাকে অফার করেছে।’

মোহনবাবু সত্যি অবাক, বললেন, ‘মশাই, খেলেন কী করে? আমি আজ
পর্যন্ত ও জিনিস নাকের কাছে আনতে পারিনি।’

স্বরীন তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ‘এটা আবার মোহনবা আপনার বাড়াবাড়ি।
আপনি না পারলে, আর কেউ বুঝি পারবে না?’

মোহনবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ ঠাঁড়ির সাক্ষী মাতাল, তুমি তো বলবেই। তোমাকে জেমা পচুই ধরিয়েছে, এবার ঠাঁকেও সুরসতিয়া ধরাক।’

সুরীন যেন হঠাৎ-ই কেমন বোকা হয়ে গেল, আর সেভাবেই হাসতে লাগলো। মোহনবাবু হেঁকে ডেকে কথা বললেন, তার মধ্যে বিবর্তিততা নেই। আমার দিকে আবার ফিরে বললেন, ‘কষ্ট করে ওগুলো খাবেন না, আমার কাছে তো সবই আছে।’

আমি বললাম, ‘আমি আবশ্যিক মৌতাতের জন্ত খাচ্ছি না, নিতাস্তই এদের সঙ্গে, এদের মতো করে একটু মেলামেশা করবার জন্ত খাচ্ছি।’

সুরসতিয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইছে, আমি কী বলছি। মোহনবাবু আমার কোলের ওপর রাখা, সুরসতিয়ার হাতের দিকে তাকিয়ে, সুরীনের বললেন, ‘ব্যাপার কী বলো তো সুরীন, আমি তো এদের ভাব-সাব বুঝি না, তুমি বোঝ। আজ পর্যন্ত একটাও মেয়ে আমার সঙ্গে এভাবে মিশলো না, আর ঠাঁর কোলের কাছে, এই সাপিনীর মতো মেয়েটা মাথা নামিয়ে পড়ে আছে?’

সুরীন হেসে উঠলো। আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। সাপিনী! একবারও মনে হয়নি তো? তবে, এই পাথরপ্রতিমা, প্রয়োজনে বোধহয়, ফণা ধরা সাপিনীও হয়ে উঠতে পারে। দেখে মনে হয়, এখন যে-চোখের ভাষায় অরণ্যের আদ্যম মন্ত্র, তা দূরন্ত মাথনে ঝলকে উঠতে পারে। এই কৃষ্ণ কালো টলটলে শরীর মুহূর্তেই যেন ফণা তোলা ভঙ্গি নিতে পারে। মুখের মিষ্টি কথা, উঠতে পারে ফুঁসিয়ে।

সুরীন আমাকে দেখিয়ে বললো, ‘লেখকদাদা একটা মন্ত্র জানেন।’

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘সেটা আবার কী?’

সুরীন বললো, ‘আপন করার মন্ত্র। আপনি কি কখনো এমন করে ওদের সঙ্গে, মাটিতে বসে হাঁড়িয়া খেতে পেয়েছেন? দীখুদের ওয়া সঙ্গেহ করে, কারণ দীখুরা ওদের দিকে কুনজরে তাকায়। লেখকদাদার দেখুন, চেহারাতেই যা ভন্দরলোক মালুম দিচ্ছে। বসে আছেন, যেন কতকালের বন্ধু।’

মোহনবাবু ঘাড় ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে একটু বহস্তের স্বরে শব্দ করলেন, ‘হঁম্‌ম্‌!’

তারপরে ঠোট টিপে হাসলেন। সুরীন জিজ্ঞেস করলো, ‘কী ব্যাপার মোহনদা, কী যেন বলতে গিয়ে চেপে যাচ্ছেন?’

মোহনবাবু বললেন, ‘না, চাপাচাপির কিছু নেই। তুমি বললে, লেখকদাদা

বিলেমিশে যেন কতকালের বন্ধু হয়ে গেছেন। কিন্তু ঠুঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি তো। সেটাও একটা কারণ।’

এবার আমি তুফ কৌচকাই। আমার চোখে আবার তিনি কী আবিষ্কার করলেন? স্বরীন হেসে বললো, ‘সেটা তো হাজারবার। চোখে পাপ থাকলে, ওরা বিদেশীদের সঙ্গে এমন করে মেশে না।’

মোহনবাবু ধমকে বললেন, ‘খুস্তোরি তোমার পাপ। তুমি কুনজরের কথাই খালি ভাবছো। যাক্ গে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।’

বলে তিনি কিয়তে উদ্ভত হন। আমি বলে উঠলাম, ‘মোহনবাবু আপনার হস্তব্যটা বলে যান।’

মোহনবাবু ফিরলেন, হেসে বললেন, ‘কী আর বলবো বলুন, আপনার চোখে কী আছে, তা আপনার পাশে যে বসে আছে, সে-ই জানে। আমরা বাজারে মাল বেচে খাই, আমাদের চোখের নজর অন্তরকম হয়ে গেছে, আপনার মতো অমন মন টলানো নজর আমাদের নেই।’

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাবার আগে, আবার বললেন, ‘আমি বোতল পাঠিয়ে দিচ্ছি, না হয় ওর মনোরঞ্জনের জন্তই, ওকেও বোতল থেকেই খাওয়ান, আপনি আর ওগুলো খাবেন না, লজ্জা হবে না।’

বলে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কথাগুলো ঠিক বললেন না। মাল, তা সে যেমনই হোক, কে না আপন মালা বিক্রিয়ে খায়। আমার জীবন কী তার থেকে বাদ, মালাগাছি বিকোতে গিয়ে, অনেক পরখের পরেও, মেহনত চিন্তা নিয়ে কিয়তে হয়? কিন্তু মন টলানো নজর? সে আবার কী? যতো দূর জানি, সেটাও তো আমার মালা গাঁথা, মালা বেচা, সব কিছুই মধ্যোই জড়ানো। আর এখন? টলাই, না নিজেই টলি? বরং আমি তো দেখছি, লম্বোহনের মত একজনের কৃষ্ণ চোখের তারায়, আমি মগ্নমুগ্ধ!

স্বরীন একটা চোঙা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘এর মধ্যে চানাচুর আছে, রাখেন। মাংসি আমাকে বলতে গেছল, আপনাকে আলু বা ডিম কিছু ভেজে দেওয়া যায় কী না। দেওয়া যাবে, দেরি হবে, তার আগে এই খান।’

আমি বিব্রত লজ্জায় বললাম, ‘না না, এ সবের কোনো দরকার ছিল না। আমি সব পারি, বলি না। কিন্তু ওদের ভিয়ে একবার বখান আমার গলা দিয়ে নেমেছে, তখন আর মুখ বদলাবার জন্ত কিছু দরকার নেই।’

স্বরীন হেসে, স্বরসভিয়ারকে মুণ্ডা ভাবাতেই কিছু বললো, স্বরসভিয়ার ওর মস্তক চোখে, খুশির কিলিক হেনে, আমার দিকে দেখলো। তারপর স্বরীনের

হাত থেকে চানাচুরের ঠোঙাটি নিয়ে, চানাচুর তুলে, আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, বললো, 'খাও।'

আমি বললাম, 'তুমি খাও।'

স্বরসত্তিয়া বললো, 'আমি খাবো, আগে তুমি খাও।'

স্বরীন বললো, 'খান। দিচ্ছে, খান। দেখুন দাদা, জীবনে হয়তো আপনারা অনেক কিছু পেয়েছেন। এটাও কিন্তু একটা পাণ্ডরানা, সবাই পায় না।'

স্বরীনের এমন করে বলার দরকার ছিল না। পাণ্ডরানা তো নিশ্চয়ই। বনের ডাক শুনে যখন যাত্রা করেছিলাম, তখন কি জানতাম, এমন একজন স্বরসত্তিয়ার সাক্ষাৎ পাবো। ভাবিনি, বনের গভীরে এক বনবালা এমনি করে 'হু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কিছু দেবে। জীবনে যাদের আমরা কিছুই দিইনি। এখন মনে পড়ে যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর পালার্মো রচনায়, এই স্বরসত্তিয়াদের কথাই লিখেছিলেন। আরো মনে পড়ে যায়, এঙ্গেলস্-এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, সভ্য সমাজের মাহুঘেরা যখন, অরণ্যের আদিবাসীদের দিকে চেয়ে দেখে, তখন তাদের চোখে থাকে, স্পেকটিকল অব প্রেসটিটিউশান, কারণ এদের জীবনযাত্রায়, যৌন ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। সভ্যতার দান বেস্তাবুত্তি, এখনকার জীবনের কাঠামো অনেকখানি ভেঙেচুরে গেলেও, এখনো আদির সাম্যবাদের মূল সূত্রগুলো একেবারে হারিয়ে যায়নি। এদের অধিকার বোধ, সত্যের সংজ্ঞা একেবারে আলাদা। যারা বেস্তাবুত্তির স্রষ্টা, অবিশ্রিই তারা সত্যের বিষয়েও সেইরকম বিপরীত ব্যাখ্যা করে গিয়েছে। আরো এক কথা, অরণ্যে পাহাড়ে বহু দীপে এখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য, নারীকে পুরুষের সমকক্ষতার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না, তা অনিবার্য, স্বাভাবিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর চিন্তার ধ্যান-ধারণা তার বিপরীত।

স্বরসত্তিয়া তার একটি অতি বাস্তব প্রমাণ। ও যার অধীনে কাজ করে জীবনধারণ করে, সেই মোহনবাবুর সামনেও আমার কোল থেকে হাত নামিয়ে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং লজ্জাটা ছিল আমারই। আমি স্বরসত্তিয়ার হাত থেকে, চানাচুর নিয়ে খেলাম। স্বরসত্তিয়া নিজেও মুখে দিল, মাংরিকে দিল, এবং সবাইকেই একটু একটু দিল। চানাচুরের ঠোঙা হয়ে গেল, পঞ্চ পাণ্ডবের দ্রোণদী, যা আছে, সবাই ভাগ করে খাও, একলার জন্য কিছু না। এটা এদের কাছে কোনো শিক্ষা না, এটাই নিয়ম। আদির সাম্যবাদের সামাজ্য একটি চিহ্ন। কারোকে জিজ্ঞেস করারও দরকার হলো না, বাকি সবাইকে দেবে কী না।

স্বরীন বললো, ‘ভাতটা বসিয়ে এসেছি, হাতে একটু সময় আছে।’

বলতে বলতে স্বর্ধমণির কাছে গিয়ে বসলো। স্বর্ধমণি হেসে একটি শালপাতার নৌকা তার দিকে বাড়িয়ে দিল। স্বরীন তা নিল, স্বর্ধমণি ভাতে ডিয়েং দিল। স্বরীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। স্বরসতিয়া আবার কাসার বাটি বাড়িয়ে ধরলো। আবার ডিয়েং পান হলো পুরো পাঁচ দফার পরে, দ্রব্যগুণ আমার মধ্যে রীতিমতো ক্রিয়ালীল হয়ে উঠলো, আর ভারী হয়ে উঠলো আমার পেট। মনে হলো, প্রচুর পেট ভরে খেয়েছি।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এলো, কয়েকজন সরেও গেল। স্বরীন দু’ পাড় খেয়েই চলে গিয়েছে। মাংরি গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে, আর স্বরসতিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি করে হাসছে। আমি বারে বারে আর গানের অর্থ শুনতে চাইছি না। ওদের ভঙ্গি আর হাসি আর দৃষ্টি থেকেই যেন, গানগুলো একরকম অর্থ বলে দিচ্ছে।

এ সময়ে হোরো এলো, তার হাতে একটি ছইন্ধির বোতল। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল আমার দিকে। মোহনবাবু জ্বালালেন দেখছি। এ আসরে আবার এসব কেন? আমি বললাম, ‘এটা নিয়ে যাও, দরকার নেই।’

স্বরসতিয়া বললো, ‘না বাবো, ইজারাদারবাবু গোসা করবে, বেইজ্ঞত হবে।’ ইজ্ঞতের ঠেলায় অঙ্গকার। অতএব খাই না খাই, বোতলটি রাখতেই হলো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি খাবে?’

ও বললো, ‘এ জিনিস আমার ভাল লাগে না। আমার ভাল লাগে মদগম।’

মদগম, মছয়া নিঃসৃত স্বরার নাম মদগম। জরাইকেলায় প্রথম দিনই উইলসন সাহেবের বাসায় দেখেছিলাম। দেখেছিলাম বললে মিথ্যা হয়, মূণ্ডা মেয়ের বুড়া বিলাতী স্বামী, প্রাক্তন ডি. এক. ও. পান করতেও দিচ্ছেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে মদগম পাওয়া যায় না?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘এদেলবার গাঁয়ে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এখন পাওয়া যাবে না। তুমি এই বোতলের দারু পান করো।’

বললাম, ‘আমার আর পানের দরকার নেই।’

স্বরসতিয়ার চোখে ঈষৎ রক্তাক্তা, এবং সেই মন্ত যেন তার ক্রমে উচ্চ ধাপে উঠছে। আমি সমতলের সেই এক সভ্য জগতের অধিবাসী। আমার গায়ে স্পর্শ করে বলে আছে পাখরপ্রতিমা, তার বাম বক্ষ আঁচলবিহীন উন্মাদ। যজ্ঞ আমার সংস্কার, দৃষ্টিতে আমার ধন্দ, নানা ধন্দ। কিছুতেই কেন সহজ হতে

পারছি না। অথচ কতো সহজ, শুধু স্বরসতিয়া না, এখানকার সকল নরনারী। কারোর অবস্থাই আমার মতো না।

এবার সূর্যমণি তার ডিয়েং-এর পাট চেকাচ্ছে। তার জালা শূন্য হয়ে গিয়েছে। সকলকেই অতএব উঠতে হয়। আমি স্বরসতিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সূর্যমণিকে কতো দিতে হবে?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘তোমাকে আমরা পান করিয়েছি, তুমি কিছু দেবে না।’

আমাদের কাথাবার্তা হিন্দিতেই হচ্ছে। মাংরি বললো, ‘কিন্তু বাবুজী, তোমাকে খাওয়াতে হবে। ডিয়েং চানা ঘুগ্নি আর সিগ্রেট। আমরা নাচবো।’ বললাম, ‘তোমরা ব্যবস্থা করো।’

স্বরসতিয়া বললো, ‘দাঁড়াও বাবুজী, তোমাকে এখন আমি নাচ শেখাবো।’

বলে ও আমার হাত তুলে দাঁড় করালো। দাঁড়িয়ে বুঝলাম, দ্রব্যগুণের ক্রিয়াটি ভালই হয়েছে। ও মাংরিকে ডাকলো। তারপর আমাকে দাঁড় করালো হু’জনের মাঝখানে। আমার একটি হাত মাংরি ওর পিঠের ওপর দিয়ে ওর বক্ষের নিচে স্থাপিত করলো। ওর এক হাত দিয়ে, আমাকেও তেমনি বেঁটন করে ধরলো। একই ভাবে, স্বরসতিয়া আমার অপর একটি হাত টেনে, ওর পিঠের ওপর দিয়ে, ওর বক্ষের নিচে রাখলো, ওর নিজের এক হাত দিয়ে, আমাকে বেঁটন করলো। আমাদের ঘিরে কয়েকজন নরনারী দাঁড়িয়ে, তাদের মুখে কোঁতুহলের হাসি।

যে স্পর্শ আমার অচেনা না, তা আমি অনায়াসে স্পর্শে অভ্যস্ত না। ফলে আমার শরীর থাকে আড়ষ্ট হয়ে, হাতের বেঁটনী শিথিল হয়ে পড়ে। স্বরসতিয়া আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললো, ‘শক্ত করে ধরো, তা না হলে পড়ে যাবে।’

এক নারী মৃণ্ডা ভাষায় কী গেয়ে উঠলো। স্বরসতিয়া আর মাংরি সেই গানের তালে তালে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেল, পেছিয়ে এলো, অথচ ডান দিকে থানিকটা সরেও গেল। আমি ওদের পায়ের আঘাত খাওয়া ছাড়া, আর কিছুই করতে পারছি না। ছুটি তরুণীর একটি জীবন্ত বোঝা।

এখন স্বরসতিয়ার চোখে আর সেই মত্ত নেই, গুরুত্ব দৃঢ়তা। সে নাচতে নাচতেই আমাকে, পায়ে পা দিয়ে মেয়ে, বলে দিতে লাগলো, ‘আগে হু’ পা, পিছনে এক পা, ডাইনে এক পা। সব সময় সামনে আর ডাইনে এগোবে। ডাইনে শেষ হলে, আবার বাঁয়ে কিরে আসবো, এক ভাবেই। হ্যা—চলো—চলো, আহু, পিছে হটো! আহু ডাইনে পা দাও।’

হায়, এবার ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া, উপায় দেখি না। একদিকে, বাকের বলে, সুরসতিয়ার পায়ের লেজি খাওয়া, আর একদিকে ছুটি তরুণীর সঙ্গে এমন আঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা, আমার কাছে শাঁথের করাভব মনে হচ্ছে। যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। কে জানতো, এ শিক্ষাটি আমার কপালে লেখা ছিল। কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। সেখানকার বিদেশী নাচের শিক্ষায় তবু তালিমের ব্যাপারটা একটু অন্তরকম। ধীরে, গুণে গুণে দেখিয়ে দেওয়ার পাঁচ আছে, হাতে ধরে আস্তে আস্তে প্রতিটি গতি ও ভঙ্গি বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে। তথাপি, ছ'একটি দৃশ্যের কথা মনে হলে, আমার থেকেও ভয়ংকর কাণ্ড সেসব। প্রায় নব্বই একশো কে. জি-এর বিশালবপু ব্যক্তিকে দেখেছি, নাচ শিখতে শিখতে, মহিলা পার্টনারের হাত থেকে ছিটকে পপাত ধরগীতল। সেটা ছিল শান বাঁধানো মেঝে, আমাকে আছাড় খেতে হবে ধুলায়।

এরকম করে হয় নাকি? সুরসতিয়া একটু বুঝতে চেষ্টা করুক না। ব্যাপারটাই তো আমার মাথায় নেই। তার ওপরে আমার পেটে বা, ওর আর মাংরি পেরটেও তাই আছে। ওদের থামাবার মন্ত্র তো আমার জানা নেই।

আমি বাধ্য হয়ে, হাত নামিয়ে দিয়ে, দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'শিখবে না?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'শিখবো। তুমি এক কাজ করো। তোমরা কয়েকজন নাচো, আমি ভাল করে দেখি, তারপরে আমি চেষ্টা করবো।'

সুরসতিয়া কথাটা গ্রহণযোগ্য মনে করলো। তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে, আরো দুটি মেয়েকে নিয়ে, ওরা পরস্পরকে, পিঠের দিক থেকে এক এক হাতত বেটন করে, পাশাপাশি দাঁড়ালো। এবার মাংরি নিজেই গান ধরলো, যার ভাষা এইরকম,

‘দোলাং দোলাং সবেন কুড়ি

গাড়ারেবু জুড়াজুড়ি

হহোরে কুড়ি!’...

অর্থ বুঝলাম না, কিন্তু ওদের চারটি মেয়ের মুখে, হাসি দেখে বুঝলাম, গানে সবাই খুশি। আমি মনোযোগ দিয়ে ওদের পদক্ষেপ লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, কখনোই সোজাঙ্গি এগিয়ে আসছে না। প্রথম ছ' বাপ এগোচ্ছে, ডান পা লামনে রেখে, যখন পিছনে যাচ্ছে, তখন বাঁ পা পিছনেই থাকছে, এবং পিছনে যেতে না যেতেই, ডান পা, ডান দিকে ক্লেপ করছে সঙ্গে বাঁ পাও টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বলতে বা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক দ্রুত ওদের পদক্ষেপের তাল।

লক্ষ্য করবার বিষয়, ওরা চারজন যেন একটি অবিচ্ছিন্ন শরীর, এবং আমি যা ভেবেছিলাম, উদ্ভব্ধে ক্রিয়ামূল না, তা মোটেই না। নাচের সৌন্দর্য সেখানেই। বুক আর কোমরের কাছে, একটি বিচিত্র দোলায়, মনে হয়, যেন, সব দেহগুলো একভাবে সাপের মতো এঁকেবঁকে উঠছে, উঠছে নিরন্তর। কখনো নিয়গামী না, সব সময়েই উদ্ভগামী, আর যেন এই অবিচ্ছিন্ন দেহলতাগুলো, যান্ত্রিকভাবে ডাইনে গোল হয়ে সরে যাচ্ছে, আবার এক সময়ে বাঁয়ে গোল হয়ে ফিরে আসছে।

হঠাৎ একটি যুবক, ছ' হাত মুষ্টিবদ্ধ, মাটির দিকে ছোড়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে পড়লো ওদের সামনে, হিন্ হিন্ শব্দ করে, কোমর ভেঙে কয়েকবার ওদের সামনে শরীর নাচিয়ে, ওদের মতোই পদক্ষেপ করতে লাগলো, আর গান ধরলো,

‘হহোরে কুড়ি
বানো তামুড়ি
নেয়ালে কেন সোময় গেনোতানা
হহোরে কুড়ি।’...

তারপরেই সে তার শরীরের নিম্নভাগ, মেয়েদের নিম্নভাগের কাছে দ্রুত বেগে এগিয়ে নিয়ে, আবার চোখের পলকেই ফিরে আসতে লাগলো, মুখে শব্দ তালে তালে, হিন্ হিন্ হিন্। পুরুষের নাচের ভঙ্গি আলাদা, মনে হয় অনেকটা বীরত্বব্যঞ্জক।

এই সময়ে সুরান এনে আমার পাশে দাঁড়ালো, বললো, ‘মেতে গেছে সব?’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটা কী নাচ?’

সুরান বললো, ‘তা বলতে পারি না, তবে ওদের নাচের ধরন-ধারণ সব প্রায় একসরকমই। এই যে ছেলেটা নাচছে, ওর নাম কাণ্ডেয়র। এক ধরনের গাছের নামও কাণ্ডেয়র। ও খুব ভাল পিকা নাচতে পারে।’

‘পিকা নাচটা কী?’

‘এক ধরনের লড়াইয়ের নাচ। ওরা তখন মাথায় পালক গোঁজে, কোমরে পরে হাঁটুর ওপরে এক ধরনের পোশাক, তাতেও পালক থাকে। পিকা নাচের সঙ্গে, নাকাড়া বাজে। আর এই যে সব নাচ দেখছেন, এসব ওরা সব পরবেই নাচে। বিশেষ করে চাষ আবাদের সময়।’

বলে সুরান নাচের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘দেখছেন না, যেন মেয়ে পুরুষের লীলে হচ্ছে। ওরা মনে করে, মাটির মেয়ে, পুরুষকে দেখা যায় না, কিন্তু ওদের যেমন ছেলেমেয়ে হয়, মাটিরও সেইরকম হয়। এই নাচও সেইরকম।’

স্বপ্নের কথা বুঝতে পারি। সে যা বলতে চাইছে, আমি জানি তার কেতবী ব্যাখ্যা। আসলে, নারী পুরুষের দৈহিক মিলনকেই এই নাচে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাদের আচরণের মধ্যেও তা স্পষ্ট। তাদের এই ধারণা, তাদের শারীরিক মিলন হলেই, বহুমতীও ফসল দেবে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘গানের কথাগুলো কী?’

স্বপ্ন হেসে বললো, ‘গানের কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, বেশ রসের গান ধরেছে। গানটা আগেও শুনেছি। দোলাং দোলাং সবেন কুড়ি/গাড়ায়েবু জুড়াজুড়ি—মানে চল চল সব মেয়েরা, নদীর জলে গিয়ে সবাই জড়াজড়ি করি। তারপরে বলছে, হহোরে কুড়ি/বানো তাম্মুড়ি/নেয়ালে কেন সোময় গেনো-তানা/হহোরে কুড়ি—ওরে মেয়ে, এটুকু বোঝ না, মধুর সময় যাচ্ছে। এটা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সব থেকে বেশি গায়।’

যতোবারই চোখ তুলে নাচের দিকে তাকাই, স্বরসত্তিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। ও কোনো সময়েই আমার দিক থেকে চোখ সরাসরি না। মুখে হাসি, নাসারন্ধ্র স্ফীত, অপলক রক্তিম চোখ, জীবন্ত পাখরপ্রতিমার দেহ এমনভাবে সাপের মতো নিরন্তর ঢেউ দিয়ে উঠছে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, নিজের রক্তে নাচের দোলা লেগে যায়। যায় না, নাচের দোলাটা আমি অল্পভব করছি আমার রক্তে। আমার মস্তিষ্কের সচল সীমায় যেন নাচ বিকশিত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে স্বরসত্তিয়া ওর চোখে, নিজেকে দেখিয়ে, কিসের ঈশারা করছে, বুঝতে পারি না, মনে হয়, নিশ্চয় আমার বুকের কাছে ঠেকে থাকছে।

কাণ্ডের আবার চোঁচিয়ে গান ধরলো, সেই সঙ্গে মাংসিও ;

‘বিরিং আবু লীলশাড়ি
তাটিওড়া পিড়ি পিড়ি
খাসিয়া চানা বুচি বোওতল
হুকি দাংনো হেরি আকো
হহোরে কুড়ি।’...

স্বপ্ন সঙ্গে সঙ্গে মানে বলে দিল, ‘চল নীল শাড়ি কিনে দিই। ভাটিখানা তো আজ ঘরে ঘরে। হাতে নেব ঘুগুনি আর মুখ খোলা বোতল। তুমি ইঁা করবে, আমি ঢেলে দেব, ওহে মেয়ে।’

যেন এক মন পাগল করা উৎসব, যার সঙ্গে দেহ মন জড়িয়ে থাকে। বাধাবন্ধনহীন মিলনের ডাক যেন গানে। হঠাৎ নাচ থামিয়ে, স্বরসত্তিয়া ছুটে এলো আমার দিকে। হাত টেনে ধরে বললো, ‘এবার এস, তুমি নাচবে।’

চৈকি বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। আমার হলো সেই গোত্র।
আমাকে আমার কাজে বলিয়ে দাও, পারবো। কিন্তু নাচ এতো সহজে আমার
দ্বারা সম্ভব না। অসহায়ভাবে একবার সুরীনের দিকে তাকালাম। তার
হাসিতে কোনো সহায়তার আশা নেই। সুরসতিয়া শুধু টেনে নিয়ে গেল না,
সব থেকে মর্যাদিক হলো, ও সকলের সামনে, অনার্যাসে, ওর প্রতিমা বন্ধের
ওপর আমার হাতটি চেপে ধরলো। এ রাত্রি আরণ্যক, নয়নারী সকলই
আরণ্যক। কিন্তু আমার আরণ্যক হয়ে ওঠার অর্থ আলাদা। কী বিষম
পরীক্ষা! আমার উদ্দেশ্য আমি কেমন করে যাবো? আমার প্রতিক্রিয়া যে
অনিবার্য।

সুরীনের দিকে আমার চোখ পড়লো। সুরীনও আমার দিকে তাকিয়েছিল।
তার মুখে হাসি। লজ্জায় আমারই মাথা নত হয়ে যেতে চায়। অথচ সত্যি
যার লজ্জা পাবার কথা, সে তখন আমাকে কঠিন বেঠনে আঁকড়ে ধরেছে।
আগের মতোই মাংরি আমার আর এক পাশে।

সুরীন যেন কেমন মেতে গেল, সে সুরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বললো।
সুরসতিয়া মুখ তুলে আমার দিকে একবার দেখে, মুখ টিপে হাসলো। এখন ওর
মুখে বিন্দু বিন্দু ধাম। ওকি সত্যি আমাকে সাতবহিনির মায়ার টেনে নিয়ে
চলেছে? বললাম, 'তাড়াতাড়ি করো না, আস্তে আস্তে নাচো, আমি চেষ্টা
করছি।'

সুরসতিয়া বোধহয় ওর ভাষায়, সবাইকেই তা বলে দিল। কিন্তু সুরীন
কী বললো, সুরসতিয়া কেন হাসলো, বুঝতে পারলাম না। বোধহয় স্পষ্ট করে
বোঝার কিছু নেই। মাংরি গান ধরলো, অস্ত গান। নাচ শুরু হলো। সুরীন
হাততালি দিচ্ছে। আমি নাচের দিকে মনোযোগ দিলাম, কিন্তু কেবল
পদক্ষেপের দিকে। এ সময়ে আরো দু'জন জোরান এসে, দু'দিকের অস্ত
মেয়েদের সঙ্গে নাচে যোগ দিল। সুরসতিয়া আমাকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলে
উঠলো, 'মাইয়ং কেটে পে।'

আমি না বুঝে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও হেসে হিন্দীতে বললো,
'কোমর শক্ত করো।'

কোমর শক্ত করা কাকে বলে, আমি জানি না। এখনো আমার সমস্ত
শরীর শক্ত হয়ে আছে। আমি জানি, আমার পক্ষে কখনোই, শরীরকে সাপের
মতো দোলানো সম্ভব না। সুরীন বললো, 'আপনার তো বেশ হচ্ছে দেখছি।'

আমার সমস্ত ধ্যান এখন পায়ে। সেটাই বাঁচোয়া, অস্ত কোনো চিন্তা

মস্তিকে নেই। কিন্তু নাচ এমনি এক শিল্প, বিশেষত এদের নাচ, তা কখনোই ধীর গতিতে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। নাচের ভাল যতোই জ্ঞাত হতে লাগলো, আমি ততোই বেতাল হতে লাগলাম। মিনিট পনেরো পরে, স্বরসত্তিয়ারকে বললাম, ‘এবার আমাকে ছেড়ে দাও, পরে আবার কয়বো।’

স্বরসত্তিয়া ছাড়লো না, বললো, ‘দেখে তো তোমাকে জোয়ান বলেই মনে হয়।’

বললাম, ‘আমার শক্তি কম।’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘না।’

মাংরি হঠাৎ নাচ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো, হৈসে কিছু বললো। সকলেই নাচ শেষ করলো। স্বরসত্তিয়া বললো, ‘মাংরি বলছে, নাচের থেকে এখন কথাই ভাল চলবে।’

বলে ও নিচু হয়ে, মোহনবাবুর পাঠানো ছইক্ষির বোতলটা হাতে তুলে নিল। জিজ্ঞেস করলো, ‘পান করবে?’

আমি মাথা নাড়লাম। ও বললো, ‘স্বর্ধমণির ডিয়েং ফুরিয়ে গেছে, আমার আর একটু পান করতে ইচ্ছা করছে। এ জিনিস কেমন?’

বললাম, ‘ভাল। কিন্তু জল মিশিয়ে পান করতে হবে।’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘আমরা জল মিশিয়ে মদগম্ব পান করি না। এটা কি মদগম্বের থেকেও ঝাঁঝালো হবে?’

বলে, আমার মতামতের অপেক্ষা না করেই, বোতলের মুখ ধুলে গলায় খানিকটা ঢাললো। ঢেলেই গলায় হাত দিল, মুখ বিকৃত হলো। তাড়াতাড়ি বোতল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, একটা কষ্টের শব্দ করলো। তথাপি, পানীয়টুকু গিলে নিল। ওর চোখ দুটো আরো লাল হয়ে উঠলো, খানিকটা থুথু ফেললো। বললো, ‘ভীষণ কড়া। আমাকে একটা সিগ্রেট দাও।’

আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম, ধরিয়ে দিলাম দেশলাই দিয়ে। স্বরীন তখন মাংরির সঙ্গে হেসে হেসে মুণ্ডা ভাবায় কী যেন বলছে, আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। স্বরসত্তিয়া বললো, ‘চলো বাইরে ঘাই।’

এখন ও আগের থেকেও, অনেক বেশি অনায়াস স্বাভাবিকভাবে আমার হাত ধরলো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘মাংরিকে ডাকবে না?’

স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞেস করলো, ‘আমার সঙ্গে যেতে ভয় করে?’

বললাম, ‘না। ও তোমার বন্ধু।’

স্বরসত্তিয়া ঝাড় নেড়ে বললো, ‘না, ও আমার বন্ধুণী, তুমি আমার বন্ধু।’

স্বরসত্তিয়ার হাত ধরা হয়ে, বাইরে বাবার আগে, আমি একবার স্ত্রীনের দিকে তাকালাম। স্ত্রীন আর মাংরি, দু'জনেই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পাতার ঘরের বাইরে এসে মনে হলো, বনের রূপ যেন বদলে গিয়েছে। যে দিকে উলুন জলছে, রান্নাবান্না হচ্ছে, স্বরসত্তিয়া সেদিকে গেল না। দুর্বা ঘাস ছাওয়া, সমতলের ওপর দিয়ে, বিশাল মহীক্ষহগুলো যেখানে একটু দূর দূরে, অঙ্ককারকে নিবিড়তর করে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু গাছের ছায়ার নিবিড়তর অঙ্ককারের মধ্যে, কোথাও কোথাও অস্পষ্ট আলো পড়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আকাশে কোথাও পাণ্ডুর্ণ চাঁদ রয়েছে, এই অস্পষ্ট কুহেলি আলো তারই। জেনাকি জলে উঠতে দেখা যায়। বাতাস প্রায় নেই, বাইরে এমন ঠাণ্ডা। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আর আমি এক অবিশ্বাস, অনেকটা যেন আলৌকিক ঘটনার মধ্যে, নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, ভুলে যাচ্ছি নিজের সত্তাকে। আমার অভ্যন্তর জীবনযাত্রার সঙ্গে, কোথাও এর কোনো যোগসূত্র নেই। বিশ্বের দুয়ার আমি পার হয়ে এসেছি, এখন আমি এক অনির্বচনীয় আলৌকিকতার দুয়ারে পাই দিয়েছি।

কী একটা পাখি, বনের গভীর থেকে ডেকে উঠলো, একটু কর্কশ। মন্থরের ডাক না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী পাখি ডাকছে?'

স্বরসত্তিয়া বললো, 'ধনেশ।'

বড় আশ্চর্য লাগে। অনেক পাখির নাম শুনেছি, চোখেও দেখেছি, এমন নিবিড় বনের অঙ্ককারে কখনো শুনিনি। আর এমন নিবিড় বনের অঙ্ককারে, আমার হাত ধরে এক বনবালা, সম্পূর্ণ নিরালায়। কিন্তু স্থির জানি, সে অবলা কোনোক্রমে না। তার নিজের সমাজব্যবস্থানুযায়ী, সে স্বাধীনতা ভোগ করছে। জানি না, এই স্বাধীনতার সীমা কতো দূর। স্বরসত্তিয়া বললো, 'এসো, আমরা এখানে বসি।'

এ সময়েই অনেকটা গাভীর মতোই, গভীর ডাক শুনে চমকে উঠলাম। আমার চমকানো স্বরসত্তিয়া টের পেলো, আমার হাতে চাপ দিয়ে, একটু হেসে বললো, 'সব্বর তো!'

সব্বর? সব্বর হরিণ! আশ্চর্য, বন ঘন তার সমগ্রতার মধ্যে আমাকে আরো গভীর করে ডুবিয়ে নিচ্ছে। সব্বরের ডাক ঘন, স্বরসত্তিয়ার সান্নিধ্যকে,

অন্ত এক রূপ দিচ্ছে। আমি ওর পাশে বসলাম। পাতার ধর আর লোকজনের কাছ থেকে, এতোটা সরে, অন্ধকারে বসে যে একটু ভয়ও না লাগছে, তা না। জিজ্ঞেস করলাম, 'স্বপ্নটা যে ডাকলো, বাবা যদি শুনতে পেয়ে থাকে ?'

স্বপ্নসত্তিয়া হেসে, ওর মাথাটা আমার ডানায় একবার ঠেকালো, বললো, 'লাকরা তুমি কোথায় দেখছ ?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'লাকরা কী ?'

ও বললো, 'তুমিই তো বললে বাবের কথা। লাকরা মানে তো বাবা। এদিকে লাকরা বিশেষ নেই। বাবা আছে, জামাইবুকের দিকে বেশি। তবে এমন হতে পারে, স্বপ্নটা কোনো বিপদ টের পেয়ে, দলের সবাইকে জানিয়ে দিল।'

'ওরা বুঝি দল বেঁধে বেড়ায় ?'

'হ্যাঁ।'

স্বপ্নসত্তিয়া সিগারেটে টান দিল। সিগারেটের উজ্জল অন্ধারে ওর বোঁচা নাক, চকচকে গাল, চিকচিকে চোখ দুটো দেখতে পেলাম। ও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'তুমি যে এভাবে আমার সঙ্গে এখানে চলে এলে, তোমাদের লোকেরা কিছু মনে করবে না ?'

স্বপ্নসত্তিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ?'

বললাম, 'আমাদের দেশে আর সমাজে হলে, মনে করতো।'

স্বপ্নসত্তিয়া বললো, 'তোমরা তো দীখু, আমরা তোমাদের মতো না। তুমিও অল্প দীখুদের মতো না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে জানলে ?'

স্বপ্নসত্তিয়া বললো, 'দেখে। দীখুরা আমাকে দেখলেই, অগ্ররকম করে তাকায়। পয়সা ছুঁড়ে দেয়, হাতছানি দিয়ে থাকে। জরাইকেলার কয়েক মাস আগে এক দীখু, দিনের বেলা আমাকে তার গাড়ির মাধ্যমে জোর করে তুলে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

স্বপ্নসত্তিয়া বললো, 'কেন আবার ? সে আমাকে যা খুশি তাই করতো, তারপরে কেলে দিয়ে পালিয়ে যেতো। বাগামুণ্ডার এরকম অনেক হয়েছে, রেল লাইন পাভবার সময়। অনেক মেরে কখনো আর ঘরে ফেরেনি। তারা বাগামুণ্ডা আর রজরকেলার থাকে। তাদের জীবন অগ্ররকম।'

বোল সতরো বছর বয়সের এই বনবালা কী বলে, তা কিছুটা অস্বাভাবিক

পারি। তবু আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ ভাবে আমার সঙ্গে একলা চলে এলে, কেউ কিছু মনে করবে না?’

ও বললো আমার দিকে অনেকখানি খুঁকে, ‘কেন মনে করবে। আমি কি কোনো দোষ করেছি?’

তাও তো বটে, এখানে যে দোষের সংজ্ঞাও আলাদা। ও আবার বললো, ‘তুমি তো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসোনি, আমিই তোমাকে ডেকে এনেছি, এটা সবাই দেখেছে।’

বলে একটু হাসলো, আমার ডানায় একটু হাতের চাপ দিয়ে বললো, ‘কাণ্ডের একটু মনে মনে বাগ করেছে। তুমি যদি আমাকে জোর করে টেনে আনতে, আমার অনিচ্ছায়, তা হলে কাণ্ডের তোমাকে কুঠার দিয়ে মাঝে আসতো!’

সর্বনাশ! ইংরেজিতে যারে কয় সিভ্যালরি, আমার সেরকম কিছু নেই। আমি কোনো মুণ্ডার কুঠারে ছিন্ন ভিন্ন হতে চাই না। আবার বললো, ‘হয় তো অঙ্ককার থেকে, ও আমাদের লক্ষ্য রাখছে।’

চমকিত বিন্ময়ে বলে উঠি, ‘তাই নাকি?’

স্বরসতিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললো, ‘ভয় পাচ্ছ কেন? দেখুক না। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।’

আমি নিবিড় অঙ্ককারের আশেপাশে তাকালাম। এখন অঙ্ককার অনেকখানি নিয়ে এসেছে, কিন্তু কারোকেই দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও না?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘না। আমি কাকে বিয়ে করবো, এখনো ঠিক করিনি।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কাকে বিয়ে করবে, সেটা কি তুমিই ঠিক করবে?’

সহজভাবে বললো, ‘নাও করতে পারি, বাবা মা ঠিক করতে পারে। কিন্তু আমার দাবি মেটাতে হবে।’

‘তোমার দাবি?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

স্বরসতিয়া বললো, ‘তবে কী? আমাকে না দিলে, কেমন করে বিয়ে হবে?’

‘কী দিতে হবে?’

‘তা কী করে বলবো? কোনো মেয়ের মা বাবা, টাকা চায়। কেউ জমি গরু ভেড়া ছাগল মোরগ চায়। মেয়েকে কিছু না দিলে বিয়ে হয় না।’

যাকে বলে, আমাদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, বরপণ না, কন্ডাপণ। এই

স্বাভিও বোধহয় এসেছে, ওদের বীৰ্য্যবান নীতি থেকে। যে আমাকে জিতে নিতে পারো, আমি সেই বীৰ্য্যবান পুরুষের। একদা হয় তো যুদ্ধ হতো, যুদ্ধে জিতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হতো। এখন তা পণে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই পণ টাকা পয়সা, গৃহপালিত পশুপক্ষী এবং জমিও হতে পারে। প্রকৃতির জগতে অনেকখানিই এই নিয়মে চলে বোধহয়। বিনা যুদ্ধে কিছুই মেলে না। আমাদের বরপণের নোঙরা ইতরতার থেকে, নিস্তরঙ্গ সমাজের ভক্ততা মাথানো, দুর্গন্ধ হাসির থেকে, শিক্ষা প্রগতিশীলতার কুংসিত ভাঁড়ামি থেকে, সে যুদ্ধও অনেক ভাল।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘যে সব থেকে বেশি দিতে পারবে, তার সঙ্গেই কি তোমার বিয়ে হবে?’

স্বরসতিয়া হেসে উঠে বললো, ‘তা কেন? আমি ইচ্ছা করলে, কিছু না নিয়েই একজনকে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু পুরুষেরা বউকে কিছু না দিয়ে, বিয়ে করতে সন্মত হয় না।’

নারীর অধিকারই প্রথম বিবেচ্য। সমাজের চেহারাটা এমনই, পুরুষ কিছু না দিলে, তার পৌরুষ প্রমাণিত হয় না। হয় তো সমাজের আর দশ জনের কাছেও নিজেকে হেয় মনে করে।

ইতিমধ্যে অনেকবারই ময়ূর ডেকে উঠেছে। এখনো মাঝে মাঝে ডাকছে। সন্ধ্যা ময়ূর ধনেশ পাখি ডেকে যায়, ফুল ফল পাতা জলের গন্ধ ছড়ায়। স্বরসতিয়া জলন্ত সিগারেটের শেবাংশ দূরে ছুঁড়ে ফেললো। আমি আবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, ‘কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে?’

স্বরসতিয়া তেমনি অনায়াসেই বললো, ‘ভাল লাগছে।’

এর পরেও কী জিজ্ঞেস করা যায়, বুঝে উঠতে পারি না। অন্ধকারে আমি ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাই না, আন্দাজ করতে পারি, ও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমার খাবার লাগছে।’

বললাম, ‘না। কিন্তু আমি খুব তাজ্জব বোধ করছি।’

‘কেন?’

‘আমি তো তোমাকে পীড়ন করতে পারি। বেইজ্ঞত করতে পারি।’

আশ্চর্য জিজ্ঞাসা। এই ‘কেন’-এর কী জবাব থাকতে পারে? ও নিজেই হেসে, আবার বলে উঠলো, ‘তুমি কি সেই গাড়িওয়ালা দীখুর মতো আমাকে টেনে নিয়ে যাবে?’

জিজ্ঞেস করলুম, ‘যদি যাই?’

‘আমি যাবো না। তুমি নিয়ে যেতেও পারবে না। আমার ইচ্ছা না হলে, তুমি কিছুই করতে পারবে না।’

স্বরসতিয়া স্পষ্ট বললো। সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সে প্রমাণ তো ওর এখানে উপস্থিতিই জানিয়ে দিচ্ছে। স্বরসতিয়া আবার বললো, ‘তোমাকে আমি ষখন প্রথম দিন দেখেছি, তখনই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল।’

‘কেন?’

‘তা জানি না। আমার দিদি আর তার স্বামীরও তোমাকে ভাল লেগেছে। সবাই বলেছে, তুমি লোক ভাল।’

মনে মনে ভাবি, কেন, আমি সিগারেট দিয়েছিলাম বলে? কিন্তু এভাবে জিজ্ঞেস করতে বাধে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ভাল লোক কী করে চেনো তোমরা?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘কী করে আবার। ভাল লোককে দেখলেই তো চেনা যায়, এ লোকটা ভাল।’

এ অনেকটা অন্ধ সারল্যের মতো মনে হয়। তথাপি, আমরাও কোনো কোনো মাহুষের প্রতি এরকম অহরহ হয়ে পড়ি, তার পশ্চাদ্গত না জেনেই। কিন্তু আমি জানি, ওর চোখের ভালত্ব, হয় তো আমার মধ্যে নেই। স্বরসতিয়া ওর আরণ্যক আবগে আচরণ করছে। তারপরেই স্বরসতিয়া যা বললো, তা যেন এই গোটা বনকেই আমার মতো নির্বাক আর মুগ্ধ করে দিল। ও বললো, ‘আমাকে তোমার ভাল লেগেছে, আমি জানি।’

আমি স্বরসতিয়ার মুখ দেখবার চেষ্টা করলাম, যা একান্তই অসম্ভব। তবু মনে হলো, অন্ধকারের মধ্যে, আমি যেন ওর চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি। যে-চোখে সম্মোহনের মন্ত্র। আসলে কল্পনার চোখ দেখতে পাচ্ছি। কথাটা বলেছে ও অব্যর্থ, ভাষা আর ভঙ্গিটা ওদের নিজস্ব। আমার নিজের বলার অবকাশ ও রাখলো না, নিজের বিশ্বাসকে অনায়াসে ব্যক্ত করে, আবার জিজ্ঞেস করলো, ‘ঠিক বলিনি?’

জবাবের প্রত্যাশা কেন। বললাম, ‘তোমাকে যে দেখবে, তারই ভাল লাগবে।’

স্বরসতিয়া অনায়াসেই, আমার গায়ের স্পর্শে বসেছিল, হাত রেখেছিল আমার কোলের কাছে। কতই দিবে, আমার গায়ে একটু খাড়া দিয়ে মাথাটা প্রায় আমার কোলের কাছে নামিয়ে এনে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

কথাটা কি নিতান্ত বোকার মতো বললাম নাকি ? হতে পারে। মুগ্ধ মাহুকের আচরণকে অনেক সময় বোকার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু এই বন, এই অন্ধকার, ফুল পাতা লতা গুল্মের এই গন্ধ, কেকাদ্বনি, সন্ধ্যের গভীর নাদ, আর যেন পুরাকালের কোন এক পাথরপ্রতিমা নারিক। আমার দেহলগ্ন আসীন। লগ্নায়ে মুগ্ধ হওয়ার আর কী লক্ষণ থাকতে পারে।

এ সময়েই হঠাৎ, খুব কাছে থেকেই যেন কোনো মেয়ের নিচু স্বর শুনতে পেলাম, যার ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। কেবল যে আমিই চমকে উঠলাম, তা না। স্বরসত্তিয়াও মাথা তুলে, স্বর লক্ষ্যে ঘাড় ফেরালো। একটি পুরুষ-গলার হাসি শোনা গেল। স্বরসত্তিয়া ওর নিজের ভাষায়, গলা তুলে কিছু বলে উঠলো। জবাবে, আমার ঝাঁ দিকের সামান্য দূর থেকেই, আগের মেয়ের স্বর কণা শোনা গেল। স্বরসত্তিয়া হেসে উঠলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘চিনতে পারছ না। সোমারি তো, আমার বোন, আর ওর মরদ।’

অর্থাৎ শুক্রম। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওরা কখন এলো?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘একটু আগে। সোমারি বলছে, আমাকে লাকরায় ধরে নিয়ে গেছে, তাই খুঁজতে বেরিয়েছে।’

অর্থাৎ বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছে। স্বরসত্তিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, আমাদের কাছাকাছি দুটি অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পেলাম। যতোটা নিরালা মনে করেছিলাম, ততোটা না। আরো কেউ কেউ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কী না কে জানে। কাণ্ডের নামে সেই জোয়ান যে দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে পারে, তা আগেই শুনেছিলাম। সোমারির গলা শুনতে পেলাম, ‘তা কী বলবো বাবুজী, বলো। আমার ভাত পাকানো হয়ে গেল। বোন আমার সারা দিন খেটেছে, কিন্তু তার ভুখ্ পিয়াস নেই। শুনলাম সে ডিয়েং পিয়ে, বনে চলে গেছে। আবার একজন বললে, তোমার বোনকে লাকরায় ধরে নিয়ে গেছে, এতক্ষণে বোধহয় খেয়ে ফেলেছে, আর খুঁজে পাবে না।’

স্বরসত্তিয়া হাসলো, সেই সঙ্গে শুক্রম বেশ জোরে, বেখাপ্লাভাবে হেসে উঠলো। এখন আর আমাকে বলে দিতে হয় না, সোমারির মরদ মহাশয় কিকিৎ পান করেছেন। উপচে পড়া হাসি শুনলেই বোকা যায়। স্বরসত্তিয়া হিন্দীতে তার বোনকে বললো, ‘বাবুজী লাকরা না, ওকে আমিই টেনে এনেছি।’

সোমারি তার নিজের ভাষায় কিছু বললো। স্বরসতিয়া ধর্মকের মতো শব্দ করে, হেসে উঠলো। শুক্রম আবার তেমনি করে হাসলো। স্বরসতিয়া এবার ওর নিজের ভাষায় কিছু বললো, জবাবে সোমারিও। আর শুক্রম একভাবে হেসেই চললো। আমি নিরেট অন্ধকারে। অহুমান করে নিতে পারি, তাদের কথাবার্তা হয় তো কিঞ্চিৎ রসাত্মক, তা না হলে শুক্রম হেসে ও-ভাবে তাল দিয়ে যেতো না। ভগ্নিধ্বয়ের কথোকপখন উপভোগ করতে পারছি না। দুই বোনের হাসির মাঝখানে, বললাম, ‘তোমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

স্বরসতিয়া বললো, ‘সোমারি বলছে, আমাদের দু’জনের মাঝখান থেকে মারাত্মক যদি করমের ডালটি তুলে নেয়, তা হলে আমার গতি কী হবে।’

বহুশ্রম কথ্য বলে মনে হচ্ছে। ভিজ্জেন করলাম, ‘সেটা কী?’

সোমারি আর শুক্রমও তখন আমাদের সামনে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছে। স্বরসতিয়া বললো, ‘সেটা আমাদের ধর্মের কথা। তুমি শুনবে?’

কৌতূহলিত হয়ে বললাম, ‘বলে।’

স্বরসতিয়া বললো, ‘তুমি আমাদের ঠাকুরের কথা কখনো কারোর কাছে শোননি। ঠাকুর নামে আমাদের একজন মহাদেবতা আছে। তিনি কচ্ছপকে ছকুম করেছিলেন, সমুদ্র থেকে মাটি তুলে নিয়ে আসতে। কচ্ছপ সেই মাটি তুলে আনলো, আর তাই দিয়ে এ জগৎটা তৈরি হলো। সেই জগতে হলো অনেক পাহাড় জঙ্গল, যেখানে চরে বেড়ায় কতো পশু পাখি। কিন্তু হলে কী হবে, মহাদেবতা ঠাকুরের মনে বড় দুখ। তার বড় একলা লাগে। সুন্দর জগতে, একলা থাকতে কার ভাল লাগে?’

সোমারি যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গলায় একটি শব্দ করে। আর আমি স্বরসতিয়ার স্বরেলা গলায়, যেন এক আদিম রূপকথা শুনি।

স্বরসতিয়া বলে যায়, ‘তখন মহাদেবতা দুটো গাছ থেকে, দুটো মাহুঁক বানালেন, তার মধ্যে একটা কোড়া, আর একটা কুড়ি। কোড়া কুড়ি দুটো পারাদিন বনে বনে ঘোরে, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়। বনের ফল খায়, ঝরণার জল পান করে। আর রাত্রে যখন শেষ, তখন তাদের দু’জনের মাঝখানে থাকে একটা গাছের ডাল। মহাদেবতা ঠাকুরই সেটা রেখে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তোমরা এই ডালের দু’দিকে দু’জনে শোবে, কখনো পারাপার করবে না। কিন্তু হায়, মহাদেবতার মতো, ওদেরও কেমন একলা একলা লাগে। ওরা বুঝতে পারে না, ওদের প্রাণ কী চায়।’

‘ঈয় ঈয়, ঝাড়ুড়ি।’ শুক্রম বলে উঠলো।

সোমারি তাঁকে খামিয়ে দিল। স্বরসতিয়া বলতে লাগলো, ‘ওদের প্রাণ কী চায়, মারাংবুরু—যিনি বড়পাহাড়, তিনি বুঝলেন। তিনি ওদের কাছে এলেন। ওরা কোনো দিন চাউল দেখেনি। উনি চাউল দিয়ে, ওদের মাণ্ডি বানানো শেখালেন। তারপর মাণ্ডি থেকে ডিয়েং। ডিয়েং বানিয়ে ওদের পান করতে দিলেন। ডিয়েং পান করে ওরা ঘুমিয়ে পড়লো। মারাংবুরু তখন ওদের মাঝখান থেকে সেই গাছের ডালটি তুলে নিয়ে গেলেন। ওদের ঘুম ভেঙে গেল, আর দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরলো।...কিন্তু ওদের ভয় হলো, মন বললো, ওরা পাপ করেছে। মারাংবুরু এসে বললেন, তোমাদের পাপের দায় আমার। এবার তোমাদের ছেলেমেয়ে হবে। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

স্বরসতিয়া চুপ করলো। আমি যেন আদি পাপের সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কাহিনীই, আর এক রূপে শুনলাম। নিষিদ্ধ ফলের বদলে, এখানে নিষিদ্ধ বৃক্ষকাণ্ড। পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনো গেক্তীয় মাহুয নেই, পৃথিবীর জন্মের, মাহুযের আবির্ভাব আর তার জীবনলীলার কোনো কাহিনী নেই।

স্বরসতিয়া একটু হেসে, কথার প্রসঙ্গে এলো, ‘সেই গাছের ডালটা ছিল করমের।’

সোমারির বহুস্ত এবার পরিষ্কার। আমার আর স্বরসতিয়ার মাঝখান থেকে যদি, সেই নিষিদ্ধ করমের ডালটি মারাংবুরু নিয়ে যান, তা হলে স্বরসতিয়ার কী গতি হবে। নিতান্ত ঠাট্টা, এর কোনো জবাব নেই। মুণ্ডা উপকথার সঙ্গে, আমার জীবনের ধ্যানধারণার কোনো মিল নেই। কোনো নিষিদ্ধ গাছের ডালের অহুভূতি নেই আমার। মুগ্ধতা নিশ্চয় আছে, তার জগৎ স্বরসতিয়ার নতিজ্ঞার কথা আসে না।

শুরুম আবার বলে উঠলো, ‘জাঁড়দি হবোয়া, জাঁড়দি হবোয়া।’

দুই বোন খিলখিল করে হেসে উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘শুরুম কী বলছে?’

সোমারি জবাব দিল, ‘বলছে বিষে হবে।’

মুখ কেরাতে দেখলাম, স্বরসতিয়ার মুখ আমার দিকে। এই সময়ে, সুরীনের গলা শোনা গেল, সে আমার নাম ধরে, দাদা বলে ডাকছে। আর টর্চ লাইটের আলো, এদিকে ওদিকে ঘুরছে। আমি সাড়া দিলাম, ‘এখানে।’

সুরীন কাছে এসে বললো, ‘বাবা, তিন জনেই ঘিরে ধরেছে? ওদিকে মোহনদা খুব ব্যস্ত হয়েছেন, ‘চলুন, খাওয়া-দাওয়া করবেন।’

আমি স্বরসতিয়ার দিকে তাকলাম। টর্চের আলোর ওর মুখ এখন স্পষ্ট দেখতে

শাচ্ছি। ওর মস্তুরা চোখে যেন একটি আচ্ছন্নতা। আমার কোলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বললো, ‘যাও। কাল দেখা হবে।’

আমি উঠে সুরীনের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

রাত্রে কোনো হিসাব নেই। আমি আর সুরীন জেগে আছি। মোহনবাবু কেবল খাবার অপেক্ষাতে ছিলেন। থেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুটো খাটিয়ার মাঝখানে, পাতার আজিমের ওপরে, সুরীনের বিছানা। ঘরের এক পাশে আগুন জ্বলছে। গায়ে কয়ল চাপাতে হয়েছে। অথচ ফাস্তন মাস।

গভীর জঙ্গলের রাজিবাসের মধ্যে, ছোট নাগরাও ছিল। কিন্তু সেটা ছিল, বনের একটি গ্রাম, মাটির ঘর। আর একেবারে বনের মধ্যে, এমনভাবে রাজিবাস এই প্রথম। একটু আগেই, কয়লস্বন্ধ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিলাম, অতি কর্কশ ভোঁ ভোঁ চিংকারে। সুরীন অভয় দিয়ে বলেছিল, ‘ভয় পাবেন না, কোংরা ভাকছে।’

জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কোংরা? সেটা আবার কী ভাই?’

সুরীন হেসে বলেছিল, ‘কোংরা হরিণ। আপনাদের ইংরেজিতে যারে কয় বাকিং ডিয়ার।’

ইংরেজি আমাদের কী না, বলতে পারবো না, বাকিং ডিয়ার বলে, কোনো কিছু আমার জানা ছিল না। আর কোনো হরিণের ডাক যে, এমন কুকুরের ডাকের মতো বনভূমি প্রতিধ্বনিত করতে পারে, তাও আমার জানা ছিল না। কোথায় হরিণ, আর কোথায় কুকুরের ভোঁ ভোঁ। বনের রাজ্যে সবই আজব।

অন্ধকার ঘরে, সুরীনের বিড়ির আগুন মাঝে মাঝে জ্বলছে, আর তার নিচু স্বর শোনা যাচ্ছে, ‘আজ পর্যন্ত এমন লোক দু’ একটা ছাড়া দেখিনি, এদের দিকে ভাল চোখে তাকিয়েছে। শেয়াল যেমন হাঁস মুগুগীর দিকে তাকায়, সকলের নজর সেইরকম। ওরা নজর দেখলেই চিনতে পারে।’

সুরীন একবার বিড়ি টেনে আবার বললো, ‘চিনতে সবাই পারে। শেয়াল কুকুরের নজর আবার চেনে না কে। আমাদের মতন মানুষদের কথা বলছি, তারা সবাই যেন শেয়ালের মতন এদের দিকে তাকায়। অথচ আপনি ভাল মনে হেসে কুঁদে নেচে গেয়ে, হাত ধরেন, একটু যদি টানাটানিও করেন, কিছু মনে করবে না। ওরা নিজেরা ওটা ভাল জানে। ওদের খারাপ যদি কেউ করে থাকে, তবে জঙ্গলের বাইরের লোকেরা করেছে, ভিতরের লোকেরা না।’

এ বিষয়ে, স্ত্রীনের মতামতকে মানতে আমার অনীহা নেই। সে শুধু ওদের দেখেনি, ওদের সমাজ গৃহে শুধু মেশেনি। জেমা যতো বাঙালীই হোক, তবু সে মুণ্ডা, স্ত্রীনের সম্ভবত হৃদয়েখরী। কেতাবের সাক্ষীও, স্ত্রীনের কথার মতোই। স্ত্রীন হঠাৎ বললো, ‘তবে আপনাকে এক গল্প বলি। আপনারাই বন্ধু, কলকাতার লোক, যথেষ্ট লেখাপড়া জানা, নাম বললেই চিনবেন।’

বলে স্ত্রীন নাম বললো, না চেনবার কোনো কারণ নেই, এবং বন্ধুও বটে। সে কেবল লেখাপড়া জানা বললে ভুল হবে, সাহিত্য জগতেও তার কিছু নাম আছে। স্ত্রীন বললো, ‘ওই যে দেখলেন স্বর্ধমণি, সে তাকে জ্বর শিক্ষা দিয়েছিল। উনি একটু নেশা-টেশা করে, স্বর্ধমণিকে বোধহয় কোনোরকম, শহুরে ঠাট্টা করেছিলেন, শহুরে খারাপ ইঙ্গিতও বোধহয় করেছিলেন। ঘটনা ঘটেছিল ষাটকুড়িতে, এই মোহনবাবুর ইজারাতেই, এইরকম ছাউনি পড়েছিল। স্বর্ধমণি রেগেছিল তখনই। ওই সব আকার-ইঙ্গিতগুলোকে ওয়া খুব খারাপ চোখে দেখে। আপনি সরাসরি ঠাট্টা ইয়ারকি করেন, বন্ধুত্ব করতে চান, সেটা আলাদা। মন না চাইলে সরে যাবে, চাইলে ভাল। আসল কথা কি জানেন, আমরা মনে করি, ওদের বুদ্ধি মান জ্ঞান নেই। দেখলে আমরা বুদ্ধি না, মান জ্ঞান আমাদের থেকে বেশি। তা যাই হোক—’

স্ত্রীন বিড়িতে আর একটা টান দিয়ে বললো, ‘সেই ভদ্রলোক স্বর্ধমণিকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছিলেন, বোধহয় টেনে নিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন। রাত্রে ঘটনা। ভদ্রলোককে যখন আমরা দেখলাম, তখন তাঁর কপাল কাটা, চোখের নিচে নীল দাগ। উনি নিজে কিছু বলেননি। স্বর্ধমণি বলেছিল বোশেককে, কুলী কামিনদের সর্দার। সে বলেছিল মোহনবাবুকে। মোহনবাবু অবশ্য সে সব নিয়ে আর ষাঁটাষাঁটি করেননি, পরদিন ভদ্রলোককে জরায়-কেলার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্বর্ধমণি মেরেছিল বুদ্ধি?’

স্ত্রীন বললো, ‘হ্যাঁ। স্বর্ধমণির হাতে মোটা মোটা কাঁসার বালা দেখেছেন তো? তা সেই বালার এক ঘায়ে কপাল কেটেছে, আর এক ঘায়ে, একটা চোখই যেতো, বেঁচে গেছে, কেবল কালশিটা পড়ে গেছেলো।’

হাসি পায়, হুঃ হুঃ হয়, কেমন একটা রাগও হয়। যে বন্ধুটির কথা শুনলাম, তার কথা মনে পড়লো। মাহুঘের কোন্ পরিচয় যে কোথায় কী ভাবে সহসা ফুটে ওঠে, তা একমাত্র তার অন্তরবাসী ভেতটি ছাড়া কেউ জানে না। অথচ কলকাতায়, তার কথাবার্তা শুনে মনে হয়, অমন কচিবান, শালীন একের

অধিক মেলে না। ঠোঁটের বক্রতায় চিনতে অস্ববিধা হয় না, ইংরেজিতে যাকে বলে সিনিক।

আমি বললাম, ‘তা যেন হলো, এই স্বরসত্তিয়ার ব্যাপারটা কী বলুন তো?’

স্বরীন হেসে বললো, ‘ব্যাপার তো দাদা সোজা, আপনাকে ওর ভাল লেগে গেছে। ওদের ভাল লাগাটা ওপরের না, মুশকিল সেখানে। মনে কষ্ট পাবে, এই আর কী! আর কিছু না।’

স্বরীন এমন সহজভাবে বললো, যেন ব্যাপারটা কিছুই না। আমরাই মনে, কেমন ছায়া নেমে আসে, বিষণ্ণ বোধ করি। ছোট নাগরার তৃপ্তি ভৌমিক নামে, সেই নার্সটিকে বুঝি। দমদমে যার বাড়ি, অরক্ষণীয় ভাই বোন বিধবা মাকে বাঁচাবার জন্ত, যে এই গভীর বনে পড়ে আছে। একজন বাঙালীকে কয়েক দিনের জন্ত পেল, তার মনের পরিবর্তন স্বাভাবিক। হয় তো, সেই বাঙালীর মনেও কোথাও একটি দাগ লেগে যায়। কিন্তু, কোনো এক বনবালাকে কষ্ট দিতে, আমি বন ভ্রমণে আসিনি। এসেছি, বনের সঙ্গে খেলতে, অনেক দিনের আশা পূরাতে। সে কেন তার সাতবহিনির হাতছানি দেয় আমাকে, শোনায় সেই উপকথার নিষিদ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের কথা।

হয় তো, বনের সঙ্গে খেলার, এটাও একটি রীতি, কেবল মাত্র খুশির ডালি নিয়ে, এখান থেকে ফেরা যায় না। একটা কষ্ট, যা স্বরসত্তিয়ার কানে বাজবে, তা আমাকেও নিয়ে যেতে হবে। যে কষ্ট দেবার বিষয়ে আমার হাত নেই, যে কষ্ট পাবার বিষয়েও আমার হাত নেই; তা নিয়ে ভেবেও আমি কিছু করতে পারি না। যাক বনের নিজের খেলার বিষয়, সে তার সেই নিয়মে খেলুক।

এই মুহূর্তে কোনো পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি না। সমস্ত বন যেন স্তব্ধ, ধ্যানে মগ্ন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, কেউ নেই, সবাই গাছ কাটতে চলে গিয়েছে। মোহনবাবুও চলে গিয়েছেন। রয়েছে খালি স্বরীন আর হোরো। সকালের রোদে, বন যেন গলানো সোনায় স্নান করে উঠেছে। যাকে বলে বিছানা-চা, স্বরীন তা দিতে ভুল করলো না। প্রাতঃকৃত্যাদির পরে, কোয়েনার জলে স্নান করতে যাবার উদ্ভোগ করতেই, স্বরীন বাধা দিয়ে বললো, ‘করবেন না, সহ্য হবে না হয় তো।’

কথাটা মানতে পারলাম না। নিরন্তর এই পাহাড়ী স্রোতধারা যদি সহ করতে না পারি, তাহলে আর কী সহ হবে। এমন নয় যে, পাড়াগাঁয়ের এঁদোপুকুর। অচল জল, যে সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বন্ধ জলকেই ভয়। স্বরীনের কথা না শুনে, আমি কোয়েনায় স্নান করলাম। প্রাত্যহিক খাওয়া হয়ে গেলে, স্বরীন জিজ্ঞেস করলো, ‘এদেলবা গ্রামটা একটু দূরত্বে যাবেন নাকি? নাকি গাছ কাটার ওখানে যাবেন?’

বললাম, ‘গ্রামেই যাওয়া যাক।’

স্বরীন বললো, ‘আমিও তাই ভেবেছিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখি যদি কিছু মাছ-টাছ পাওয়া যায়।’

স্বরীনের ভাবনা অস্বাভাবিক। অবিশি আমার জন্তাই। কিন্তু আমি বনের গ্রামই দেখতে চাই। স্বরীন হোরোকে কিছু বললো, তারপরে দু’জনে বেরোলাম। যে পথ দিয়ে, গতকাল বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে, জীপে করে নেমে এসেছিলাম, ডান দিকে, সেই উঁচুতে আমরা উঠতে লাগলাম। বন এখানে খুব ঘন না। তবে বড় বড় গাছ অনেক, তার লম্বা ছাওয়া পড়েছে পশ্চিমে।

খানিকটা যাবার পরেই, ঝপ্ করে আমার গায়ে কিছু পড়তেই, চমকে, প্রায় একটা লাফ দিলাম। তাকিয়ে দেখি, এক ধোকা সাদা সাদা ফুল, নাম না জানা। আমার গায়ে এখনো তার কয়েকটা পাপড়ি। স্বরীনও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মাটির উপর ফুলগুলো দেখে, তুরু কুঁচকে, সন্দিগ্ধ চোখে আশেপাশে দেখলো। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী হতে পারে বলুন তো?’

স্বরীন বললো, ‘একটা ব্যাপারই হতে পারে। দাঁড়ান, দেখছি।’

বলে সে বাঁ দিকে পাশাপাশি কতগুলো বিশেষ গাছের দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে ওদিকে প্রদক্ষিণ করে, হঠাৎ একটা আড়ালে সে থেমে গেল, আর সেখান থেকেই, আমাদের ডাকলো, ‘পাওয়া গেছে, এদিকে আসেন।’

স্বরীনের ডাকে কোঁতুহলিত হয়ে, একটি গাছের আড়ালে, কাছে গিয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যেই প্রায় যা সন্দেহ করেছিলাম, সুরসতিয়া। দাঁড়িয়ে আছে, গাছের গায়ে পিঠ চেপে। এখন ওর ধোয়া পরিষ্কার শাড়ি গায়ে নেই, ছোট-খাটো একটি পুরনো শাড়ি। কাজের পোশাক। কিন্তু চুল পিছন দিকে টেনে আঁচড়ে, শক্ত করে খোঁপা বাঁধা, সুরু সাপের ফণার মতো, লম্বা স্রাসের ডগার মতো একটি অদ্ভুত ফুল গোঁজা, বাতাসে কাঁপছে। চোখে মুখে হাসি।

স্বরীন বললো, ‘না, লক্ষণ মোটেই ভাল না দেখছি। কাজকর্ম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, রোজের চিন্তা নেই, পেটে খাবার কথা ভুলে গেছে।’

বলে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমিই যেন সঙ্কোচ বোধ করলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ‘মোহনবাবু রাগ করবেন না?’

স্বরীন বললো, ‘মোহনবাবুর রাগের কী আছে। তিনি গুরু বোজের বেতন কেটে নেবেন। জ্যোশেককে ফাঁকি দিয়ে, কেউ নাম হাজিরা করাতে পারবে না।’

আমি স্বরসতিয়ার দিকে তাকালাম। ও স্বরীনকে হিন্দীতে বললো, ‘বাবুজীকে কী সব বলছ?’

স্বরীনও হিন্দীতেই বললো, ‘বলছি, তুই মরেছিস।’

স্বরসতিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো, ‘কী করে মরলাম, আমি তো বেঁচেই আছি।’

স্বরীন সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুই কি কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিস?’

স্বরসতিয়া পরিষ্কার ষাড় ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, তা-ই। স্বরীন জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন?’

স্বরসতিয়া চোখের কোণে আমাকে দেখলো। গুরু সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল। স্বরীন বললো, ‘তা তো বুঝলাম, রোজ না পেলে, পেটে খাবি কী?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘এক রোজ সোমারি খাওয়াবে।’

স্বরীন আমার দিকে তাকিয়ে, ষাড় ঝাঁকিয়ে বললো, ‘শোনেন মেয়ের কথা।’

তা তো স্তন্যতেই পাচ্ছি। স্বরসতিয়ার এই সহসা উপস্থিতি যে আমাকে অশুশি করেছে, তা বলতে পারবো না, বয়স সত্যি বললে, স্বীকার করতে হয়, আমার খুশির মধ্যে, একটা ক্লান্ততাও যেন পাশাপাশি রয়েছে। তথাপি, আবার কোথায় যেন খচ্‌খচ্‌ করে। না-ই বা রইলো তার ঘরকন্নার কাজ, কাজ তো ছিল বনে। এ বনে, আরো অনেকে রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তাদের কথা মনে হয়। তাদের প্রতিক্রিয়া ভেবেই যেন মনে অস্বস্তি লাগে। যদিও, শেষ পর্যন্ত বলতে হয়, ‘তুমি নিমিত্ত মাত্র।’

স্বরীন জিজ্ঞেস করলো স্বরসতিয়াকে, ‘তা এখন কী করবে?’

স্বরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি বাবুজীকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?’

স্বরীন বললো, ‘আমি যাচ্ছি গ্রামে, মাছ পাওয়া যায় কী না দেখবো।’

স্বরসতিয়া ষাড় হুলিয়ে বললো, ‘চলো, আমিও যাবো।’

স্বরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। স্বরীন ততক্ষণে চলতে আরম্ভ

করেছে। স্বরসতিয়া কিন্তু আমার পাশে না এসে, আমার দিকে ফিরে ফিরে, স্বরীনের পাশে পাশে চললো। স্বরীনের সঙ্গে ও কী সব কথাবার্তা বলে, ওর নিজের ভাষায়। স্বরীনও সেই ভাষাতেই জবাব করে। ওরা আমার আগে আগে চলে। স্বরসতিয়া ফিরে ফিরে তাকায়, হাসে।

গাছতলায় বসেছিল একটি প্রায় নয় বৃদ্ধ। গায়ে একটি ময়লা পাতলা কাপড়ের টুকরো। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো, আমার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকালো। মনে করতে পারি না, গতকাল জীর্ণে আসবার সময়, এ বৃদ্ধকেই, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে দেখেছিলাম কী না। তার কালো মুখে, অজস্র ভাঁজ, হাসতে গিয়ে, তা আরো গভীর হলো। মনে হলো, দাঁত নেই একটিও, চোখ দুটো হলুদ বর্ণ, হাত পা কোলা।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্বরীন আর স্বরসতিয়া খানিকটা গিয়ে, পিছন ফিরে থমকে দাঁড়ালো। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার নাম কী?’

বৃদ্ধ আবার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, ‘ক্যারকাটা।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোথায় থাকো?’

সে হাত দিয়ে গ্রামের দিকে দেখালো, ফিরে আমাকে ঘড়ঘড়ে স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি ইজারাদার হায়?’

‘মাথা নেড়ে বললাম, ‘না, জঙ্গল ঘূমনে আয়া।’

বৃদ্ধ হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে আমার কথা বুঝেছে। তারপরে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাঁ মুখে হাসি, জিত খানিকটা বেরিয়ে আছে। অতঃপর কী জিজ্ঞেস করবার আছে, বুঝতে পারছি না। বললাম, ‘বয়ঠো।’

সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার সেলাম করলো, কিন্তু বসলো না। স্বরীন আর স্বরসতিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। উচিত অসুচিত বুঝতে না পেলেও, আমি পকেট থেকে পয়সা বের করলাম, ঘাড় হুলিয়ে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করলাম। বৃদ্ধের হাসি আর একটু বিস্তৃত হলো, এবং ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানানো। আমি তার হাতে পয়সা তুলে দিলাম। সে আবার কপালে হাত ঠেকালো। বললো, ‘বুডা হো গয়া।’

আমি ঘাড় হুলিয়ে, এগিয়ে গেলাম। এদেলবার ক্যারকাটা নামে বুড়ো, বুডা হয়েছে নিশ্চয়, সম্ভবত অসুস্থও। তবে তার সংসারে কেউ নেই, সেটা ঠিক না বোধহয়। এগিয়ে যেতে স্বরীন বললো, ‘কী বলে বুড়ো ক্যারকাটা, পয়সা চাইলো।’

বললাম, ‘চাওয়ার মতো করে চাননি।’

স্বরীন বললো, ‘বাইরে থেকে কেউ এলে, ও সেলাম করবে। এক সময়ে ও কনস্টেবল গার্ড ছিল।’

গতকাল দেখা আর একজন কনস্টেবল গার্ডের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা এখন গ্রামের মধ্যে। গ্রাম বলতে কিছু মাটির ঘর। এখানে ওখানে ছাগল চরছে, দূরের সবুজ মাঠে, গরু বাঁধা। কিন্তু নিরুদ্ভ, লাড়া শব্দ বিশেষ নেই। ছোট নাগরার থেকে, ছোট গ্রাম। এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো, বেড়া ঘেরা কিছু শাক সব্জীর চাষ হয়েছে। সামনে এগিয়ে পথের ধারেই, একটা পাতকুয়া।

হঠাৎ একটি বাড়ির, মাটির দেওয়ালের আড়াল থেকে, স্বরসত্তিয়ার বয়সী একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। এসে ধমুকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলো, যেন এমনটি আর কখনো দেখেনি। তার দৃষ্টি, স্বরসত্তিয়ার দিকেই বেশি, তারপরে আমার প্রতি। স্বরীন কী যেন জিজ্ঞাসা করলো। জবাবে সে বাঁদিকে হাত দেখালো। স্বরসত্তিয়া তার কাছে গিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করলো। দু’জনেই কয়েকটি কথা বিনিময় করলো, তারপরে, দু’জনেই হেসে উঠলো। নতুন মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিল। আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। বোকা যাচ্ছে, আমরা চড়াই উঠতে উঠতে এসেছিলাম, এখন আবার নেমে চলেছি।

স্বরীন বললো, ‘আপনার বিষয়ে হেন কথা নাই, স্বরসত্তিয়া জানতে চাইছে। আপনি কী করেন, কোথায় থাকেন, বিয়ে করেছেন কী না, করলে ছেলেমেয়ে ক’টি।’

বলতে বলতে স্বরীন হেসে উঠলো। আমিও হাসলাম। স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে তাকালো। একটু যেন লজ্জা পেয়েছে। স্বরীনকে জিজ্ঞেস করলো, ‘কী বলছো?’

স্বরীন কোনো জবাব দিল না, হাসলো। স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞাসু চোখে, আমার দিকে তাকালো। আমিও জানি না, কী জবাব দেবার আছে। স্বরসত্তিয়া একটু দূরত্ব রেখে, আলাদা চলতে লাগলো, তারপরেই স্পষ্ট উচ্চারণে, গান গেয়ে উঠলো;

‘ওকোও কাজী তেনা মাই

সেতঃ হোস তরসু বসুনা।’

স্বরীন ষাড় ফিরিয়ে স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো। স্বরসত্তিয়াও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আবার গাইলো,

‘চিমস বংকড়া তেতা মাই

নিমত্তঃ দোমো চালী বালোনা।’

এই কটি লাইন ও বায়ে বায়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগলো, আর সেই সঙ্গেই যেন ওর কোমর কটি আর একটা তালে তালে ঢুলছে, অথচ চলছে। আমি স্বরীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বলছে গান গেয়ে?’

স্বরীন বললো, ‘বলছে ওর মনেরই কথা। বলছে, সখী কার চুপিচুপি কথায় এখন তুমি ছটফট করছো? বন্ধুণী কার কানাকানিতে এমন উথালি পাখালি করছো?’

আমি স্বরসতিয়ার দিকে তাকালাম। স্বরসতিয়া এখনো কারাকে চলছে। ইদারী পেরিয়ে মনে হলো, আমরা যেন গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু বাঁ দিকে দেখা গেল, পাশাপাশি আরো কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ঘর। স্বরীন সেই দিকে এগিয়ে চললো। বাঁ দিকে যেন অস্পষ্টভাবে একটি জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়, যা ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। জল নেই, একটা ভেজা ভাব, আর ছোট বড় অজস্র পাথরের হুড়ি, কোথাও চওড়া মাকড়া পাথর, যার গায়ে শাওলা লেগে আছে। বাঁ দিকে খানিকটা গিয়েই আবার চড়াই, গভীর বন।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের দেখে, দু’একজন বেরিয়ে এলো। এখানে কিছু লোকজন আছে। জলস্ত উনানে হাড়ি, দুটি মেয়ে জড়াজড়ি বসে। একজন আর একজনের উকুন বেছে দিচ্ছে। একটি ঘরের বাইরে, বাঁশের গায়ে, ছোট একটি মাছ ধরার, বাঙলাদেশের আটোল জালের মতো জাল শুকোচ্ছে। স্বরীনের হাঁকে, নেংটি পরা, খালি গা একটি পুরুষ বেরিয়ে এলো। স্বরীন তাকে কী বললো, সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, কপালে হাত ঠেকালো। আমি প্রত্যুত্তর দিলাম। তারপরে সে স্বরীনকে কী সব বললো। স্বরীন মাথা ঝাঁকিয়ে শুনে, আরো কিছু বললো। তারপরে আমার দিকে ফিরে বললো, ‘ও এখন আপনার জন্ত মাছ ধরতে যাবে। তার মানে, মাছ পেলে, খেতেন ওবেলা।’

আমি বললাম, ‘কোনো দরকার ছিল না।’

স্বরীন বললো, ‘দরকারের জন্ত না। পেলে মন্দ কী।’

বলে সে স্বরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, ‘এখন কী করবে?’

স্বরসতিয়া স্বার্থহীন জবাব দিল, ‘তুমি চলে যাও, আমি বাবুজীকে নিয়ে যাবো।’

স্বরীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, স্বরসতিয়াকে বললো, ‘দেখিস, বাবুজীকে নিয়ে হারিয়ে যাস্ না।’

স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞাসার সুরে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, ‘কেউ কি ইচ্ছা করে হারায় ? তোমাদের নারাজ বাবুকে জিজ্ঞেস করো না।’

নারাজ বাবু! সেটা আবার কী ? সুরীন জিজ্ঞেস করলো, ‘বাবুকে আবার তুই নারাজ দেখলি কখন ?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘এক রাজ্যের পর।’

আমার অবুঝ বিশ্বয়ের মধ্যে সুরীন হোহো করে হেসে উঠলো, আমার দিকে ফিরে বললো, ‘এক রাত্রি পরেই, আপনি নাকি ওর ওপরে নারাজ হয়ে গেছেন।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী রকম ?’

সুরীন বললো, ‘ও ভাবছে, আপনি আর ওর সঙ্গে মিশতে চাইছেন না।’

আমি স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকালাম। বনবালা তাকিয়েছিল, অন্য দিকে মুখ ঘোরালো। মুখখানি যেন একটু ভার ভার। এইমাত্র না গান করছিল ? এমন কি সুরীনকে চলে যেতে বললো। আবার এখনই মুখভার ? এই একটি জায়গায়, বন আর বনের বাইরে ওরা এক। বিশেষত, এই বয়সটা। নগর জীবনে, স্বরসত্তিয়ার পরিচয় কিশোরী। এখানে সে স্বাবলম্বী বনবালা, যে আপন শ্রমে উদরারের সংস্থান করে। ওর পাথর ঢালাই বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যে, কৈশোর ছাড়িয়ে যেন যুবতী। আমি সুরীনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সুরীন স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকিয়ে সম্মুখে হেসে, আমাকে বললো, ‘আপনি ওর সঙ্গে ঘুরে আসুন, আমি যাচ্ছি।’

সুরীন সহজভাবেই কথাটা বললো। বললাম, ‘ঠিক আছে।’

সুরীন স্বরসত্তিয়াকে বললো, ‘যা, বাবুজীকে নিয়ে যা। জলদি জলদি কিরিস।’

সুরীন তার পথে চলে গেল। স্বরসত্তিয়া আমার দিকে তাকালো, আবার তাকালো স্বর আর লোকজনের দিকে, তারপরে আন্তে আন্তে চলতে আরম্ভ করলো, সামনের চড়াইয়ের বনের দিকে। কয়েক পা গিয়ে, আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি ইচ্ছা করেই পা বাড়াইনি। ও আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে কী না, এখনো বুঝিনি। স্বরসত্তিয়া স্থির চোখে তাকিয়ে, ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, ‘আসবে না ?’

দেখছি, উলটে আমাকেই দায়ী করছে। বললাম, ‘তুমি থাকলে বাবো।’

স্বরসত্তিয়া কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে, জিজ্ঞেস করলো, ‘আমি কি তোমাকে ডাকিনি ?’

বলেই পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো। অভিমান এর নাম। কেন না, আমি যে নারাজ হয়ে গিয়েছি। মনে মনে হেসে, ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে যাই। চণ্ডা পথ শেষ, চড়াইয়ে উঠেছে সন্ধ্যা রাস্তা। খানিকটা উঠতেই, বন হয়ে এলো ঘন, ছায়ানিবিড়। ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো গায়ে, ঝিঁঝিঁর ডাক শ্রুত হয়ে উঠলো।

স্বরসত্তিমা ওপরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, ডান দিকে এক খণ্ড পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালো, দৃষ্টি আমার দিকে। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানো ওর চোখে সেই অভিমানের ছায়া। কিন্তু মস্তের সেই নিঃশব্দ ধ্বনি আমি যেন শ্রুতই শুনতে পাচ্ছি। ওর ছোটখাটো পুরোনো কিন্তু মোটা শাড়িটি, শরীরের পক্ষে, যেন কেবল একটু লজ্জা নিবারণের জন্তই। তথাপি যেন ওর পাথরপ্রতিমা শরীর এইটুকু আবরণে কুলাতে চায় না। বলতে ইচ্ছা করে। এই শাড়িতে ও অধরা। জিজ্ঞেস করলাম, ‘রাগ করেছ আমার ওপর?’

স্বরসত্তিমা কয়েক পলক, স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপরে হাত বাড়িয়ে দিল ধরবার জন্ত। আমি হাত বাড়ালাম, ও ধরে আমাকে টান দিল। পাথর খণ্ডের ওপর উঠে, ওর কাছে দাঁড়ালাম। আমার গায়ে ছায়া, ওর গায়ে রোদ। ওর খোঁপায় গোঁজা, সন্ধ্যা পালকের মতো সেই সবুজ ফুল কণার মতো ছলছে। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি নারাজ হয়েছ, আমি কেন রাগ করবো?’

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেমন করে বুঝলে, আমি নারাজ হয়েছি?’

স্বরসত্তিমা মুখ নামিয়ে নিয়ে বললো, ‘আমার মনে হলো।’

এই মনে হওয়ার পরে, আর কোনো কথা থাকে না। মন এমন এক বস্তু, কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। তার আপন গুণে সে ধনী, তুমি তাকে কী দিয়ে বোঝাবে? আমি এই প্রথম, চিবুকে হাত দিয়ে, ওর মুখ তুলে ধরলাম, বললাম, ‘কিন্তু আমি নারাজ হইনি।’

স্বরসত্তিমা ওর ভাগর কালো চোখে, আমার চোখের দিকে তাকালো। ওর চিবুকে রাখা আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে, জিজ্ঞেস করলো, ‘আমি কাজে যাইনি বলে, তুমি রাগ করেছ?’

বললাম, ‘না, রাগ করিনি। একটু হুশিয়ারি হলো।’

স্বরসত্তিমা চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন?’

বললাম, ‘তোমার রোজগার হবে না।’

স্বরসতিয়া ঘেন অবাক হেসে, আমার হাতে বাঁকুনি দিয়ে বললো, ‘আমি কি সব সময় ইজারাদারবাবুদের কাজ করি নাকি ? আমি কি রোজ রোজগার করি ?’

সে কথা আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা, ওরা বারো মাসই, ইজারাদারদের কাজ করে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তবে সারা বছর কী কর ?’

স্বরসতিয়া এখন সহজ, হেসে বললো, ‘কেন, কডেন্ হাতুতে থাকি। সেখানে আমাদের কিছু জমি আছে, চাষবাস করি।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘কডেন্ হাতু কী ?’

স্বরসতিয়াও অবাক হয়ে, ভুরু কঁচকালো, বললো, ‘কডেন্ কডেন্, এই যে দেখছো না, এই যে জঙ্গল, একে তো তোমরা কডেন্ বলো, তাই না ?’

বুঝতে, তবু আমার কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল, তারপরেই বললাম, ‘করেন্ট ?’

স্বরসতিয়া হেসে, জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, ‘হাঁ তো, কডেন্ !’

আমারই তো দোষ। আসল কথাটা তুমি উচ্চারণ করতে পারো, আর একজন যদি না পারে, বুঝে নেবার দায় তো তোমারই। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিন্তু হাতুটা কী ?’

ও হেসে বললো, ‘গাঁও।’

‘মুণ্ডা কথা ?’

‘হাঁ।’

স্বরসতিয়া খিলখিলিয়ে হাসলো। তারপরে আমার হাত ধরে, পাখর খণ্ডের বিপরীত দিকে নেমে, শুকনো পাতার উপর দিয়ে, রাস্তা ছেড়ে উঠতে লাগলো। মনে হয়, ফুল আর বনের গন্ধ ঘেন ওর গা থেকেই নির্গত হচ্ছে। বুঝতে পারলাম, বনের কোনো গ্রামে ওরা বাস করে, সেখানে ওদের চাষের জমি আছে। ও আবার বললো, ‘সরকার আমাদের ঘর আর চাষ করবার জমি দিয়েছে, আমরা সেখানে থাকি। তার জন্ত, আমরা সরকারের কাজ করি।’

‘কী কাজ করো ?’

‘কেন, জঙ্গল পরিষ্কার রাখি। পাতা জমে জমে, জঙ্গলে আগুন লেগে যায় না ? আমরা পাতা ঝাঁট দিই, আগুন নেভাই, রাস্তাঘাট খারাপ হলে, তাও ঠিক করে দিই।’

‘জমিতে কী চাষ করো ?’

‘ঝেড়ি, মকাই, তুট্টা।’

‘ধান চাষ করো না ?’

‘ধান চাষের মতো আমি নেই।’

‘কিন্তু চালের তে দরকার?’

স্বরসত্তিয়া ষাড় বাঁকিয়ে বললো, ‘হ্যাঁ, দরকার, কিন্তু কোথায় মিলবে? অনেক দাম তো। এখন ইজারাদারবাবুর কাজ করছি, এখন ভাত খাচ্ছি। তারপরে আর ভাত খাবো না।’

অবিশ্বাস্ত বলে মনে হয়, জিজ্ঞেস করি, ‘কী খাবে?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘মহুয়ার ছাতু, সাঙ্গা, কান্দা, লোয়াক, ডুমরী। কিছু পয়সা পেলে চাল কিনে, ভাত খাবো, ডিয়েং বানিয়ে পান করবো।’

ডিয়েং-এর নামটি বাদ যাবার না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ডিয়েং বুঝি তোমাদের চাই-ই।’

স্বরসত্তিয়া আবার চোখ বড় করে বললো, ‘হঁ, চাই তো। ডিয়েং আমাদের সব কিছুতে লাগে। পুজোতেও লাগে।’

এ দেখছি, শাক্তের কারণবারি। শক্তিপূজা, তত্ত্বমতে হলেই, কারণবারি অনিবার্য। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি, আদিবাসী ধ্যান ধারণার সঙ্গে, তান্ত্রিক নানান সিদ্ধান্তের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মিল খুঁজে পেয়েছেন। স্বরসত্তিয়া আবার বললো, ‘যখন মায়ের তোয়াক্কা দুধ থাকে না, তখন বাচ্চাদের পাতলা করে ডিয়েং খাওয়ায়। পেট ভরে, তাগদ হয়, বাচ্চা বহুত ঘুম করে।’

চমৎকার। কিন্তু তোয়াকা কী? জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোয়াকা কী?’

‘দুধ না?’ ষাড় বাঁকিয়ে কথাটা বলেই, একটি অপরূপ লজ্জায় বনবালা যেন মুহূর্তে একেবারে প্রাণমোহিনী হয়ে উঠে, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে, নিজের দ্রুত উদ্ধৃত বক্ষ দেখিয়ে দিল।

স্বরসত্তিয়ার লজ্জা যদি অপরূপ, আমার লজ্জাটা সম্ভবত কলঙ্কজনক, কেন না, আমি ওর মতো অনায়াস সৌন্দর্যের জগতে ফিরি না। বুলাম, তোয়াকা অর্থে দুধ বোঝায়, স্তনও বোঝায়। আমি বাঙাল। ছেলেকেলায় আমরাও তাই জানতাম। ঢাকার ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে মহিলাদের বলতে শুনেছি। আমার মা দিদির মুখে তো শুনেছিই। কিন্তু, এই যে নিঃশব্দে, অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া, এই দেহের এই নামও, এমন অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি।

কয়েক মুহূর্ত স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকাতে পারলাম না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকস্মিক চমককে একটু সামলে নিতে হচ্ছে। অতঃপরও, ও আমার হাত ধরে আছে। অসম্মান পথ চলতে, গায়ে গা লেগে যায়। হয় তো সূর্যমণি বা

সোমারির মতো মেয়ে হলে, এমন অনায়াসে পারতো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বরসত্তিয়ার জীবনের অভিজ্ঞতা এখনো তাদের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। কিংবা, একটু ঘনিষ্ঠতা হলে এরা বোধহয় তা পারে। তথাপি, স্বরসত্তিয়া লজ্জা পেয়েছিল।

আমি প্রসন্ধান্তরে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ‘লোয়াক কাকে বলে, তা জানি। কিন্তু সাক্ষা কান্দা আর ডুমরী যা বললে, সেগুলো কী?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘কেন, সাক্ষা আর কান্দা তো মাটির নিচে হয়। তোমাদের যেমন আলু মুনী হয়, সেইরকম, তবে সাক্ষা আর কান্দা এত বড় বড় হয়।’

বলে, দু’ হাত দিয়ে সে যে-আকার দেখালো, তা আমাদের সঁাতরাগাছির ওলের চেয়েও বড় মনে হলো। আবার আমার হাত ধরে বললো, ‘সাক্ষা আর কান্দা আমরা বোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে রাখি। যখন দরকার হয়, রেঁ খে খাই। ওতু করে খাই।’

ওতু শব্দটা জানা ছিল, ছোট নাগরায় এক বনবাসিনীর মুখে শুনেছিলাম। ওতু মানে তরকারি। আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হতে চায় না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেমন করে তোমরা ওতু পাকাও?’

স্বরসত্তিয়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে, ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘ওতু কাকে বলে, তুমি জানো?’

আমি গম্ভীরভাবে হেসে বলি, ‘জানি।’

‘কেমন করে? স্বরীন বলেছে?’

‘না। ছোট নাগরায় এক মেয়ের কাছে শুনেছি।’

‘মেয়ে?’

হায় বনবালা! তেমন উদার না দেখছি, দৃষ্টিতে একটু ভ্রূহুটি সন্দেহ। আমি একটু মজা দেখতে পাই, মনে মনে হাসি, বলি, ‘হ্যাঁ, কিন্তু কোটুরি না।’

স্বরসত্তিয়া আমার ধরে থাকা হাত জোরে চাপ দিল, হাতের পাতার প্রায় নখ বসিয়ে। গতকাল রাজ্জেই কথটা শুনেছিলাম, কোটুরি মানে, ডিম না পাড়া মুরগী। একটি মেয়ে, স্বরসত্তিয়াকেই কোটুরি বলেছিল। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কুড়ি কি হাপানাম?’

কুড়ি মানে কিশোরী বলা যায়, হাপানামটি আবার কী? জিজ্ঞেস করলাম, ‘হাপানাম কাকে বলে?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘জোয়ানী।’

অর্থাৎ, খুবভী নাকি ? সম্ভবত । বললাম, ‘হ্যা, তোমার থেকে বড় ।’

‘কী নাম ?’

আমি এবার হেসে কেললাম, বললাম, ‘নাম তো জানি না । ছোট নাগরায় গ্রামে এসে দেখলাম, সে হামানদিস্তায় কী গুঁড়ো করছে । জিজ্ঞেস করলাম, কী গুঁড়োচ্ছ ? সে বললে, শুকিয়ে রাখা কচুর ডাঁটা গুঁড়োচ্ছে, ওতু বানাবে । তারপরে আর কোনো কথা হয়নি ।’

স্বরসত্তিয়া করেক পলক আমার চোখের দিকে দেখলো, তারপরে হেসে উঠে, আমারই হাতটা টেনে নিয়ে, নিজের চোখে চাপা দিল । আমরা এখন পাহাড়ের ওপরে, প্রায় একটা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে বড় বড় শাল শিয়াল করম অর্জুন সেগুন আর স্বর্ণচাঁপার বড় বড় গাছ ছড়ানো, লাল মুক্তিকায় শুকনো পাতা বিছানো । ঘাস তেমন নেই ।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘ডুমুরীটা কী ?’

‘উইপোকা তো !’ স্বরসত্তিয়া ঘাড়ে ঝাঁকুনি নিয়ে বললো ।

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, জুরাইকেলায় গাঙ্গুলিমশাইয়ের কত্তা তিপু মূখে ডুমুরীর কণাটা শুনেছিলাম । বর্ষায় উইপোকারা যখন বেরিয়ে পড়ে, এক জায়গায় উড়তে থাকে, তখন এরা লাকিয়ে লাকিয়ে পোকা ধরে । পাখীগুলো কেলে দিয়ে, পোকাগুলো নাকি হুনের টাকনা দিয়ে, পরম পরিতোষ সহকারে খায় । এর জন্য গায়ে পাক দিলে, কী করবো । খাত্তব্রব্যের ব্যাপারে, আমি আমার সীমা কতোটা আর ছাড়াতে পারি ? চীনা খাত্তের জগৎ জুড়ে নাম । চতুস্পদ বাদ দিলে, হাঙরের পাখীরা অবধি যেতে পেরেছি । কিন্তু লোকপ্রচারিত, আরশোলা নামক পতঙ্গ । রক্ষা করো আমার মহাপ্রাণীকে ! আজ অবধি কোনো পতঙ্গ খেয়েছি বলে মনে করতে পারি না । তবে বাঙাল হিসাবে না, একেবারে খাস এ দেশের প্রভাবেই, সরীসৃপ জাতীয় কুঁচে মাছ খেয়েছি, যার অবয়ব, অনেকটাই সাপের মতো, আশবিহীন । স্বীকার করতেই হবে, আলু পেরাজ সহযোগে, খেতে খারাপ লাগেনি । রান্নার ব্যাপার আলাদা । আমরা তো অনেক লতাপাতাফুলও, বেশ মচমচিয়ে ভাজা খাই । খেতে খেতে মনে হয়, গুচ্ছের ঘাস তুলে এনে, ওরকম তরবিত করে ভেজে দিলে, তাও খেয়ে ফেলতে পারি । কিন্তু পোকা ! ঘটনাচক্রে এই স্বরসত্তিয়ার সঙ্গেই যদি আমাকে সারাজীবন কাটাতে হয়, তথাপি পতঙ্গ কদাপি না ।

স্বরসত্তিয়া সেটা কিছুটা নিশ্চয় বোঝে, তাই বোধহয় জিজ্ঞেস করলো, ‘ডুমুরীর কথা শুনে তোমার খুব খারাপ লাগছে, না ?’

বললাম, ‘ওটা আমি ভাবতে পারি না। তুমি মন খারাপ করছ?’

স্বরসত্তিয়া অবাক হয়ে বললো, ‘কেন? না তো!’

আমি বললাম, ‘কিন্তু তোমাদের ওতু রান্নার কথা কিন্তু বললে না।’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘বলছিলাম তো। যদি তেল মরিচ আর হুন ঘরে থাকে, তবে তাই দিয়ে পাকাই। না থাকে তো, সেক্ষ করি।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তেল হুন ঘরে থাকে না?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘সব সময় না। কুমড়িতে হুয়ায় একদিন হাট হয়। তেল হুন আসে। তখন যদি পয়সা থাকে, তা হলে কিনে রাখি, না থাকলে কিনতে পারি না, এমনি সেক্ষই খাই।’

‘হুন ছাড়া?’

‘হুন ছাড়া।’

স্বরসত্তিয়া হেসে বললো, ‘হুন ভাত, এসব কি রোজ কেউ খেতে পারে। বনের মাছধেরা কেউ-ই তা খেতে পারে না। হুয়ায় হুয়ায় কেনবার এত পয়সা কারোর নেই।’

নির্বাক থাকা ছাড়া, বাক্য খুঁজে পাই না। সাক্ষা কান্দা ডুমুরী মহায়া ছাতু, যা বলো, সবই প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া খাদ্য, কেবল আহরণ করে নেওয়া। যদি অল্প খাদ্য জুটতো, তা হলে আর ও সব খেয়ে জীবনধারণের দরকার হতো না।

স্বরসত্তিয়া আবার বললো, ‘আমাদের একটা গরু আছে, একজন দিয়েছে। এক বছর পরে, তার তোয়া হবে।’

জিজ্ঞেস করলুম, ‘দুধ থাকে, না বেচবে?’

‘কাকে বেচবে? কে কিনবে? যাদের দুধ কেনবার পয়সা আছে, তাদের নিজেদের ঘরেই গরু আর দুধ আছে।’

সে কথাও সত্যি। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার আর কে আছে ঘরে?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘কেউ না। আমি সোমারির কাছে থাকি।’

‘তোমার বাবা মা নেই?’

স্বরসত্তিয়া মাথা নেড়ে বললো, ‘না। মরে গেছে।’

কথাটা যেন সহজভাবেই বললো। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। না, তেমন কোনো ব্যথা কাতরতা, বা বিষণ্ণতা দেখতে পাচ্ছি না। যা নেই, তার জ্ঞান মুখ ভাষা করার যেন কোনো অর্থ নেই। জীবনটা এমনই সরল, পাথরের বাস্তবতার মতো। আমাদের চোখ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে হয় তো, তুলনার

বিচারে, দরিদ্র আর নিষ্ঠুর বলে মনে হবে। কিন্তু আইনস্টাইন সাহেবের আপেক্ষিকতাবাদকেই বা চিন্তা থেকে বর্জন করি কী করে। তবে সেটা হলো অনেকখানিই অল্পভূতির, অল্পাঙ্গ ভারসাম্যের। হয় তো জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও। কিন্তু ভারতবর্ষের এই মানুষরা, আমরা যাদের ‘আদিবাসী’ বলতে শিখেছি, যা বলতে আমি লজ্জা ও গ্লানি বোধ করি, যাদের কাছে প্রতিদিন দুটো ছুন এবং ভাতই বিলাসিতা, তখন নিজেদের স্বদেশ চিন্তার দৈন্তাই প্রকাশ পায়। ওরা ভারতবাসী না, ভারতীয় আদিবাসী। আমরা কি নববাসী? চিহ্নিত করতে হলে, তা-ই তো বলা উচিত। ভাষায় ধ্যানধারণায় আমাদের বিভিন্ন প্রদেশেও অনেক তফাত আছে। তথাপি আমরা শুধু ভারতবাসী। ওরা আদিবাসী হয়, রাজনীতির খেলাটা তা না হলে বোধহয় ভাল জমে না। বিভক্তি বিভক্তি আর বিভক্তি। যতো বেশি ভাগাভাগি, ততো বেশি অপরিচয় আর সংঘর্ষ। যাদের হাততালি দেবার, তারা হাততালি দিয়ে লুটে খেয়ে যাবে।

স্বরসত্তিরা আমার হাত টেনে, ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ‘তুমি কী ভাবছ?’

একটু চমকে উঠে বললাম, ‘এমন কিছু না। আচ্ছা, স্বরসত্তিরা, একটু কথা আমাকে বলো।’

স্বরসত্তিরা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। তার কোঁতুহলিত গাভীর দিকে আমার হাসি পেল। বললাম, ‘সেরকম কোনো কথা না। তুমি—তুমি, মানে, তোমার কেমন লাগে?’

স্বরসত্তির চোখে জিজ্ঞাসা তীব্র, বললো, ‘কী কেমন লাগে?’

বললাম, ‘এই যে তোমার এই জঙ্গলের জীবন, এই ঘে কাজ করো, খাও, ডিয়েং পান করো, নাচো গান করো, এ সব নিয়ে, তোমার কেমন লাগে?’

স্বরসত্তিরা খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলো, তারপরে সহজ স্বরে বললো, ‘ভাল লাগে।’

আমি তথাপি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ভাল লাগে?’

স্বরসত্তিরা একটু অবাক হয়ে বললো, ‘হাঁ তো, ভাল লাগে।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার কি মনে হয় না, রোজ ভাত খাবে, ছুন মেখে, গুতু দিয়ে, দুধ খাবে, জঙ্গলের বাইরে বেড়াতে যাবে।’

স্বরসত্তিরা আমার কথার মর্ম বোধহয় ঠিক ধরতে পারে না, বলে, ‘রোজ খাবো? তা হলে, কান্দা সাজাগুলো কী হবে? ওগুলো যে খেতে ইচ্ছা করে। ভাতও খুব খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাদের ছুনের খুব অভাব। মক্কাই

ভুট্টা হলে, তা দিয়ে, মহুয়া দিয়ে, আর জঙ্গলে যখন খুব আমকল হয়, তা দিয়ে আমরা হাটুরেদের কাছ থেকে হুন নিয়ে রাখি।’

আমি স্বরসত্তিয়ার দিকে তাকালাম। ওর বয়সের কথা না ভেবে পারি না। হয় তো, মনের সব কথা, এখনো ওর অভিজ্ঞতা আর অহুভূতির অগোচরে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে কতো দিন কাজ করবে?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘যতোদিন এখানে গাছ কাটা হয়, ততোদিন।’

‘তারপর?’

‘কিরে যাবো গাঁয়ে। সরকারি কাজ করবো কিছুদিন। আবার কারোর ইজারায় খাটতে যাবো। তারপরে বর্ষার তিন মাস তো গাছ কাটা মানা। তখন আমরাও চাষবাস করবো।’

বলতে গেলে এই হলো সমগ্র জীবন। তা ছাড়াও আছে, কিছু পরব। শুনেছি, তার মধ্যে মাঘে পরব সব থেকে উল্লাস আর আনন্দদায়ক। স্বরসত্তিয়া আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এখনো দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলো, ‘এতো পুছ্ পাছ্ কেন করছো?’

বললাম, ‘এমনি।’

স্বরসত্তিয়া কী বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে ইশারায় চূপ করিয়ে দিলাম। শুকনো পাতার ওপরে, খড়খড় শব্দ আগেই পেয়েছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, প্রকাণ্ড স্বর্গচাপা গাছের আড়াল থেকে, চকচকিয়ে উঠলো একটি প্রকাণ্ড ময়ূর। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে, স্বরসত্তিয়াও তাকালো। কিন্তু ময়ূরটার কোনো আকর্ষণই নেই। যেন আমরা কেউ না। আমাকে অবাক করে দিয়ে, ময়ূরটা ঠিক মূরগীর মতো, পা দিয়ে, জোরে জোরে পাতা সরতে লাগলো, আর চকু ঝুঁকতে লাগলো।

স্বরসত্তিয়া আমার দিকে তাকালো। বললো, ‘ময়ূর তো!’

বললাম, ‘হ্যাঁ। ধরতে পারো?’

স্বরসত্তিয়ার চোখ হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠলো। বললো, ‘তুমি নেবে?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, শুধু একবার হাত দিয়ে ধরবো, আবার ছেড়ে দেব।’

স্বরসত্তিয়া খিলখিলিয়ে বেজে উঠলো। ময়ূরটা সেই শব্দে ছ’ পা সরে গেল মাত্র, বললো, ‘শুধু ধরবে আর ছেড়ে দেবে? কেন?’

বললাম, ‘আমার একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘ওকে তো এমনি ধরা যাবে না। ফাঁদ পাততে হয়।’

‘তা না হলে, ভীষ ধনুক দিয়ে মারতে হয়।’

বললাম, ‘না, আমি মায়তে চাই না।’

আমি ময়ূরটাকে দেখতে লাগলাম। গতকালের অভিজ্ঞতা আমার আছে, অতএব আজ আর আমি এই ময়ূর মরীচিকার পিছনে ছুটতে চাই না। ছুটে ধরা যদি সম্ভব হতো, তা হলে, সুরসতিয়া বোধ হয় এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতো না। সুরসতিয়া যে মুখে হাত চাপা দিয়ে, নিঃশব্দ হাসিতে কাঁপছে, তা খেয়াল করিনি। খেয়াল যখন হলো, ময়ূরটা চলে গিয়েছে খানিকটা দূরে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হাসছো কেন?’

সুরসতিয়া শব্দ করে হেসে, আমার একটা হাত টেনে ধরে বললো, ‘তোমাকে দেখে। মনে হচ্ছে, তোমার নজর আর দিল, সব এই ময়ূরটা নিয়ে চলে যাচ্ছে।’

কথাটা মিথ্যা না, যতোই আমার আচরণ ওর কাছে শিশুসুলভ হোক। আমি জবাব না দিয়ে হাসলাম।

সুরসতিয়া হেসে বললো, ‘ময়ূর বহুত চালাক। তবে দানা ছড়িয়ে তিন চারজনে মিলে ধরা যায়। তোমার খুব দুখ লাগছে?’

আমি সুরসতিয়ার চোখের দিকে দেখলাম। দুঃখ না, আমার চোখের তৃষ্ণাটাকে ও ভুল করছে, আর তাই নিজেই প্রায় বিমর্ষ হয়ে উঠছে। বললাম, ‘কোনো দুঃখ লাগছে না। এটা একটা শখ।’

সুরসতিয়া তথাপি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপরে চোখের পাতা নিবিড় হয়ে এলো, একটু হাসলো। যেন কিছু বলতে গিয়েও, না বলে, নিচে গ্রামে যে গান গুনগুন করছিল, সেই গানই গুনগুনিয়ে উঠলো। সখী, কার চুপি চুপি কথায় এখন তুমি ছটকট করছো? কার কানাকানি শুনে তুমি উধালি পাখালি করছো। হঠাৎ মনে হয়, ও যেন বোল সতরো বছরের বনবালা কুড়ি না, হাপানম্। কিংবা, মনে যখন রঙের সঞ্চার হয়, তখন এমনি করেই তা প্রকাশ করে।

সুরসতিয়া গুনগুন করতে করতে, আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। তারপরে হঠাৎ গান থামিয়ে দিয়ে বললো, ‘আমি একটা ময়ূর হলে বেশ মজা হতো, তাই না?’

ওর কথার গতি যে একেবারে বুঝতে পারি না, তা না। ভবু জিজ্ঞেস করি, ‘কেন?’

সুরসতিয়া বললো, ‘তুমি আমাকে ধরবার জন্য ছুটতে।’

বললাম, ‘তুমিই তো বললে, ছুটে ওদের ধরা যায় না। ফাঁদ পেতে ধরতে হয়।’

স্বরসতিয়া স্পষ্টই বললো, ‘তুমি তো ফাঁদ পাততে জানো না।’

সে কথা মানতেই হবে। আমি জবাব দিতে পারলাম না, স্বরসতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও আমার দিকে তাকিয়েছিল। এখন আবার ওর দৃষ্টি মগ্ননিবিড়। আমার চোখ সরিয়ে নিতে একটু দেরি হলো।

ও জিজ্ঞেস করলো, ‘কী?’

আমি মাথা নাড়লাম। কেন না, যে কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, তা কাল রাত্রেই অন্ধকারে, ঘন সান্নিধ্যেই জিজ্ঞেস করেছি। জবাব আমার জানা। তা ছাড়া, স্বরসতিয়া কি নিজেকে খুব অস্পষ্ট রেখেছে? আমার বিশ্বাস এখন অনেকখানি তীব্রতা হারিয়েছে। আমাদের সমাজ জীবনের কাছে, বনভ্রমণের এই ছবি, বিশ্বয়কর।

স্বরসতিয়া দাঁড়ালো, বললো, ‘কিছু বলছো না কেন?’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বলবো?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘আমি কি জানি?’

বলে মূখ নিচু করলো। আবার মূখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, ‘কোথাও বসবে?’

আমি ওর কথা আর মনের যোগসূত্র ধরতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝতে পারছি, ওর মুখের কথা আর মনের কথা এক না। আমি বললাম, ‘তোমার ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না?’

স্বরসতিয়া বললো, ‘আমার সবই ভাল লাগছে।’

বলে হাসলো। আমি থমকে দাঁড়লাম। আমাদের সামনে, আকাশ খোলা, নিচের দৃশ্য একেবারে বদলে গেল। দেখলাম, পাথুরে মৃত্তিকার রাস্তা নেমে গিয়েছে নিচে, কোয়েনার ধারে। এখন আমি বুঝতে পারি, যেখানেই যাই, কোয়েনা এঁকেবঁকে সবখানেই আছে। আমরা যে পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, তার নিচে, ষাঁ দিকে ষাঁক নিয়ে কোয়েনা হারিয়ে গিয়েছে। নিচে অনেকখানি অংশ সমতল, হাঁটুর থেকে লম্বা ঘাস, নানাবিধ গাছ, কিন্তু সবই ফাঁক ফাঁক, অনেকটা গ্রামের মতো, আর সেই সমতলকে প্রায় বৃত্ত করে ঘিরে আছে, গভীর অন্ধকার বন। অথচ কোয়েনার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, গভীর বনের বৃত্ত পাক দিয়ে আলছে না, বনের এক অংশে হারিয়ে গিয়েছে।

আমি পাশ কিয়ে স্বরসতিয়ার দিকে তাকালাম। কারণ ছিল। ও ওর দেহ স্পর্শ করে, আমার এমন ঘন সান্নিধ্য দাঁড়িয়েছে, আমার দূর সমতলবাসী

মন ভিতরে ভিতরে সচকিত হয়ে উঠছে। সহসাই মনে হলো, চোখের মল্ল, এখন ওর সর্বান্তে। ও বাঁ হাত দিয়ে, গতকালের নাচের মতো আমার কোমর বেঁধেন করে আছে। রৌদ্র ওর, প্রায় উদাস বাম বক্ষে। খোঁপার সেই সুরু নাগের মতো ফুলটি কাঁপছে। কিন্তু ও আমার দিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে, বাঁ দিকের দূরে, এই পাহাড়েরই উৎরাইয়ের জঙ্গলের দিকে। ঠোটে হাসি, চোখের দৃষ্টিতে যেন একটি নিবিড় কৌতুহল।

আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সুরসতিয়া যে কিছু দেখছে, তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। ও আমার দিকে তাকালো, আশ্চর্য! ওর চোখে যেন একটা কেমন আচ্ছন্নতা, এবং ঈষৎ রক্তিম। ও প্রায় আমার বুকের কাছে মুখের এক পাশ চেপে দিয়ে, বাঁ দিকে আঙুল তর্জনী দিয়ে দেখালো।

আমি ওর তর্জনীর লক্ষ্যে তাকালাম। প্রথমটা সহসা বুঝতে পারলাম না, মনে হলো, কোনো জীবন্ত প্রাণী নড়াচড়া করছে। পরমুহূর্তেই সমস্ত দৃষ্টটা এমন অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় মনে হলো, মস্তিষ্ক চিন্তাশূন্য বোধ হলো। বনবাসী দুটি নগ্ন যুবক যুবতীকে, এর থেকে স্পষ্ট করে দেখার কিছু নেই। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। বনের জীবন, বা তার বাস্তব অবাস্তবতা, তার সামাজিক ধ্যানধারণা, কোনো কিছু সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে, এ মুহূর্তে আর তা বলতে পারবো না। আমার একটা নাগরিক জীবন আছে। জীবন সেখানেও নানান লীলার লীলারিত। সেখানে অনেক দ্বন্দ্ব ধন্দ্বের ছড়াছড়ি। নানা প্রমোদ নিকেতনের খোলা বিজ্ঞাপনেই, অনাচারের সংকেত, সভ্যতার অহংকার। নগ্নতাকে সেখানে সাজানো হয় নানান কুটকচালি বসনে, নগ্নতার থেকে যার ওজন বিরাণী সিকা বেশি। সেখানে মাল কাটে ওজনে। কার্যণ সব ব্যাপারটাই ব্যবসায়িক। আমি সেখানে কুটকচালি রঙ্গে অভ্যস্ত।

এখানে, এই গভীর জঙ্গলে, যেখানে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ মস্তিষ্কের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে, যেখানে রঙ-বেরঙের প্রজাপতিরা, ভ্রমর সকল গুড়ে ফুলে ফুলে, বিচরণ করে ময়ূরেরা, ঝরা পাতা মর্মরিয়া ওঠে, সেখানে, মহাদেবতা ঠাকুরের সৃষ্ট সন্তানেরা, নগ্ন দেহে জীবলীলা করে। বরং বলি, মানবলীলা করে, এবং এমন লয়ল গভীর লীলা যেন আমার দৃষ্টি দখল করে দেয়।

সুরসতিয়া আর এদিকে ফিরে তাকালো না। আমার চোখের বিষ্ময়, ওর চোখে নেই। আমার দ্বন্দ্ব, বা কিছু, তা আমারই চোখে, আমারই ভিতরে। ও অনেকটাই নির্বিকার। ও আছে ওর আপন মনে। ঘটনার মধ্যে, কোনো

আকস্মিকতার চমক ওর নেই, দিনগত জীবনের একটি চিত্র মাত্র, হয় তো যা সচরাচর দেখা যায় না। দৃশ্যটি আমাকে দেখিয়েই, ওর আনন্দ। আমাকে তেমনি করে, বেঠন করে রেখেই, সামনের ডান দিকের গভীর অন্ধকার বনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ‘ওখানে লোর।’

আমি জানি, এখন যদি স্বরসত্তিয়ারকে আমার শরীর থেকে ওর হাতের বেঠনী খুলে নিতে বলি, ও ভূখিত হবে। ও আমার মুখ চেয়ে, আমাকে বুঝে, আচরণ করছে নু, আচরণ করছে, নিজের হৃদয়ের নির্দেশে। কিন্তু যা ওর কাছে আন্বাতাবিক না, আমার কাছে তা রুদ্ধশ্বাস বিন্ময়কর, তারও বেশি কিছু। ওর চোখের মন্ত, ক্রিয়া করে আমার মস্তিষ্কে, ও এই বনের সঙ্গে, নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কিন্তু সব ইচ্ছা আর ভাল লাগাকে আমি দায়হীনতার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি না। ইংরেজিতে যাকে বলে, রেসপনসিবিলিটি আর কমিটমেন্ট, সে সবও আমারও রক্তে।

স্বরসত্তিয়ার দিকে না তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, ‘লোর কী?’

স্বরসত্তিয়া মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। আমি ওর দিকে দেখলাম। প্রশ্নাতীত এক আবগ ওর চোখে, হেসে বললো, ‘লোর জানো না? লোর লোর চলো তোমাকে দেখিয়ে আসি।’

বললাম, ‘চলো।’

স্বরসত্তিয়ার ডান হাতের বেঠনী ছাড়লো না। নিচের অনেকটা খাড়াই উংরাই নামতে নামতে, স্পর্শের কোনো বাধাও রাখলো না, গুনগুন করে উঠলো, ‘অলাকন বা লেকা ডিগা সোময়।’...

গেয়ে উঠে, আমার দিকে তাকালো, তারপরে আমার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে, ওর ঘাড়ের ওপর রেখে দিল। আবার গুনগুন করলো, ‘হো কুড়ি, আপে স্বস্বন মে/অলাকন বা লেকা ডিগা সোময়।’...

নামতে নামতে আমরা কোয়েনার স্রোতের ধারে চলে এলাম। এখানে মাকড়া পাথরের শক্ত তল নেই, হুড়ি পাথর অজস্র, কিন্তু লাল মৃত্তিকা, কাকর মেশানো, শক্ত অথচ নরম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী গান করছো তুমি?’

স্বরসত্তিয়া কোয়েনার কুলুকুলু ধ্বনির স্বরে স্বর মিলিয়ে হেসে উঠে বললো, ‘অলাকন বা লেকা ডিগা সোময়। জোয়ানী সময় যেন ফুল ফোটার মতো। হো কুড়ি, আপে স্বস্বন মে। হে লেড়কি, তোমরা নাচো।’

যতো শুনি, ততো অবাক লাগে। বনের বাইরে, গান কাব্য নিয়েও, আমাদের কতো অহংকার। কিন্তু দেখছি, রবীন্দ্রনাথ যে বিবিধ সময় ও সময়ের

ফল বলে প্রচাষিত, এখানে তার অংশবিশেষ প্রকৃতি নিজের হাত দিয়েই করিয়ে নিয়েছে। এসব গানের কবি কে, কে জানে। কিন্তু সে অমৃতব করেছিল, ঘোবন সময়টি ফুল ফোটার মতো। অতএব মেয়েরা নাচো। কেন না, অবশ্যের মানুষদের কাছে, নাচ আর গানই হলো ফল ফলের সৃষ্টি-প্রতীক।

স্বরসত্তিমা কোয়েনা পার হলো না, ডান দিকের ধার দিয়ে দিয়ে চলতে লাগলো। এখানে কোয়েনার জল আর জল্লের ধারে, পথ সরু, অথচ তা যেন মানুষের সৃষ্টি না। নরম মাটি, দু' পাশে বড় বড় ঘাস, মাটির ওপর চাপা পড়েছে অনেক লতা গুল্ম। যেন কোনো ভারী বস্তু চেপে গিয়েছে পথ দিয়ে। স্বরসত্তিমা গুনগুন করেই চলেছে, 'অলাকন বা লেকা ডিগা সোময়'...

খানিকটা এগোতেই, চোখে পড়ে, ঘন অন্ধকার বন সামনেই। পায়ের নিচে থেকে যেন ঠাণ্ডা বাতাস উঠছে, কোয়েনা ক্রমে চওড়া হয়ে যাচ্ছে, আর গভীরও বটে। সেই মুহূর্তেই, নিচের দিকে তাকিয়ে নরম মাটির পথে, স্পষ্ট পায়ের চিহ্ন আমার চোখে পড়লো। পথের সামনে তাকিয়ে দেখলাম, পদচিহ্ন-সমূহ আরো স্পষ্ট। আমি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে, স্বরসত্তিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ওগুলো কী?'

স্বরসত্তিমা অবাক হলো না, ভয়ও পেল না, বললো, 'মারাংহোরোর পায়ের দাগ, এ পথ দিয়ে ওরা চলাফেরা করে, লোরে যায়।'

আমার গায়ের মধ্যে প্রায় কাঁটা দিয়ে উঠলো। মারাংহোরো মানে হাতি। লোর এখনো বুঝতে পারছি না। কিন্তু স্বরসত্তিমা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? বস্তু হস্তীর আস্তানায়? এতো জায়গা থাকতে, এর থেকে নিরিবিলি জায়গা কি এই বনে মিলতো না? আরো কয়েক পা এগিয়েই, পথের ওপর সত্ত পরিত্যক্ত হস্তীবিষ্ঠা দেখতে পেয়ে, আমার বক্ষীয় চিন্তা অতিমাত্রায় কাতর হয়ে উঠলো। বনবালার স্পর্শের যে মাদকতা আমার নৈতিক প্রব্লে জটিল হয়ে উঠেছিল, তা আমার অমৃতভূতি থেকে হারিয়ে যেতে বসলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'সামনের জল্লের মধ্যে যদি হাতি থাকে?'

স্বরসত্তিমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, ওর নিবিড় কালো চোখে সাতবহিনির মত, জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় লাগছে?'

কোনো বীরত্বের প্রদ্বয় নেই, সরলভাবেই বলি, 'হ্যাঁ।'

স্বরসত্তিমা বললো, 'কোনো ভয় করো না। বহমেজাজী না হলে, ওরা কারোকে মারে না। যদি দেখতে পাও, চূপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ো। আর যদি তাড়া করে, তাহলে এ পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠে যাবে।'

বলে, আমার পিছনের পাহাড়টা দেখালো। যার খাড়াই বেয়ে উঠতে গেলে, অন্তত হাফ মাইলটেনিয়ার হওয়া দরকার। আমি স্বরসত্তিয়ার চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে কি আমার মরণের মন্ত্র। ডাইনীতন্ত্র আমার জানা নেই, শুনেছি, বনের জগতে, এটা আকটার ঘটে। স্বরসত্তিয়াকে আমার ডাইনী বলে একবারও মনে হচ্ছে না। এখনো ও যে আমার কোমর বেঁধেন করে আছে। আমার আলগা হাত ওর কাঁধে। আমাদের দু'জনের গায়ে রোদ। আমার গায়ের ছায়া ওর, পাহাড় উদ্ভূত বৃকে। ওর খোঁপার সফ্র লম্বা বাঁকা ফুলটি কাঁপছে। একে কি নাগকেশর বলে? জানি না। নাগকেশর দেখিনি, এরকম ফুলও দেখিনি।

আমরা থেমে নেই। সামনের ঘন অন্ধকার নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, শত সংখ্যক হস্তী যুথ যেন সেখানে গায়ে গা দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখছে, আমাদের জন্তু প্রতীক্ষা করছে। একটা ভীপ গাড়ি শুঁড় দিয়ে ভূমড়ে পাহাড় থেকে যারা ছুঁড়ে দিতে পারে, একটা মানুষ তার তুলনায় কী?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে বাচ্ছিলাম। দেখলাম, ঘাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি ময়ূর আর ময়ূরীটি। ময়ূরটা দেখতে ছোট, পিছনের পুচ্ছ বলে বিশেষ কিছু নেই, ময়ূরের যেটা সুদীর্ঘ এবং ভূমি স্পর্শ করে। ময়ূরীটির পাখার রঙের কলকণ্ড অনেক ম্লান। তারা বেরিয়ে এসে, একবার আমাদের দেখলো, কিন্তু মাটিতে ঠোট ঠুকতে ঠুকতে, অকুতোভয়ে আমাদের আগে আগে, হাতি চলা রাস্তার ওপর দিয়েই চলতে লাগলো।

হুটি পাখির অস্তিত্বে যেন নতুন করে একটু সাহস পেলাম। এবং এই আমার প্রথম মনে হলো, এইখানে দাঁড়িয়ে, আমার দ্বিধা হৃদয় অর্থহীন। সাক্ষা কান্দা খেয়ে জীবন ধারণের থেকে, এ অবস্থাও কম নিষ্ঠুর না, কেন না, এখানে বাঁচাটা অনেকখানিই মৃত্যুর সঙ্গে নিরন্তর হাত মিলিয়ে। আমি স্বরসত্তিয়ার কাঁধে আলিঙ্গন করে ধরলাম। আমার আলিঙ্গনের হাত, স্বরসত্তিয়া অনায়াসে ওর বাম বক্ষে স্থাপন করলো। ওর ডান হাতের বেঁধেনী আরো শক্ত করলো। ওর দক্ষিণ বক্ষ, কটি কোমর সকলই আমার বামে ঘনবদ্ধ। আমরা রোদ থেকে নিবিড় ছায়ায় ঢুকলাম। সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়লো, কালো জল টলটল করছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে। স্বরসত্তিয়া ওর বাদিক দেখিয়ে বললো, 'লোর। তোমরা কি তালাও বলাও?'

মোহনবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি যেটাকে ঝিল বা দীঘি বলতে

চেয়েছিলেন, তা এই। স্বরসত্তিয়ার ভাবায় যা লোর। বুঝতে পারছি, এ জলাশয় প্রকৃতির সৃষ্টি, কোয়েনার চলে যাওয়ার পথের মাকথানে, এক বিলুপ্ত গহীন গহ্বর, যা বারো মাস তরে থাকে জলে। হাতিরা এখানে স্নান করে, জলখেলা করে। প্রকৃতি যেন বিশাল দেহ, প্রাগৈতিহাসিক সেই বস্তু পত্তনের জন্তই, এমন একটি জলাশয়, নিবিড় বন, নরম মৃত্তিকা সৃষ্টি করেছে।

ভয় পাই সত্যি, তবু আমার অপার কৌতূহলের মধ্যে একটি বিশ্বাসের আনন্দ, অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে। জানি না, সেই সব অতিকায় জীবেরা কোথাও আছে কী না, আমি স্বরসত্তিয়ার সঙ্গে, পায়ে পায়ে জলের দিকে একটু এগিয়ে যাই। বাতাস নেই কিন্তু রীতিমতো ঠাণ্ডা, এবং এই প্রথম আমি স্বরসত্তিয়ার শরীরের উদ্ভাপ অনুভব করি। যেখানেই জলাশয় আর জঙ্গল, সেখানেই তীব্র ঝিল্লির শোনা যায়। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখছি। ঝাঁঝি ডাকছে, কিন্তু করাতকলের বান-ফাটানো শব্দ না। মাঝে মাঝে এক একটা পাখি ডেকে উঠছে। মধুর মধুরী দুটো কোথায় চলে গিয়েছে, আর দেখতে পাচ্ছি না। বনের অধিকাংশ গাছই শাল। অগ্ন্যগ্ন গাছও কিছু কিছু আছে। সেগুন, অজুন, স্বর্ণচাঁপা। স্বর্ণচাঁপা আছে টের পাই ফুলের গন্ধে।

জলাশয়ের কাছে এসে স্বরসত্তিয়া দাঁড়ালো। ভেবেছিলাম, জলাশয়ের ধারে ধারে নরম মৃত্তিকা আছে। ভুল ভাঙলো, দেখলাম, জায়গায় জায়গায়, হাতির থেকেও বিশাল প্রস্তরখণ্ড, কোথাও মাকড়া পাখরের আশ্রয়ণ, জলের নিচে চলে গিয়েছে। জলাশয় ঠিক গোল না, বাড়লা সংখ্যা পাঁচের মতো, একটা ঝাঁক নিয়ে পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে, সরু হয়ে, বনের বাইরে হারিয়ে যাবার আগে একটা শাপিত রেখা বোঁদে বলকাছে।

জানি না, কেমন করে, আমার সমস্ত ভয়কে দূর করে দিয়ে, এক গভীর আনন্দ মূগ্ধতা জেগে ওঠে। যদি স্বরসত্তিয়ার ভাগ্য কালো চোখের, সম্মোহনের মন্ত্র, আমাকে এখানে টেনে এনে থাকে, তবে আমি সম্মোহিত। স্বরসত্তিয়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদি সত্যি সত্যি সেই সব অতিকায় প্রাণীরা এখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আমার প্রাণের মূল্যেই, সেই অনিশ্চয়তাকে গ্রহণ করতে হবে।

একবার আমার মনে হলো, ধীর চরণচিহ্ন ধরে, এই সারেশু অরণ্যে এসেছিলাম, তিনি কি এই লোর দর্শন করেছিলেন?

স্বরসত্তিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে বসবে?'

বললাম, 'বসবো।'

আমি বললাম, স্বরসত্তিয়ার ওর বেটেনী মুক্ত করলো না, কিন্তু অনেকখানি মুখোমুখি হয়ে বললো। আমার হাত ওর গা থেকে অনেকখানি শিথিল হলো, সেই সঙ্গেই, ওর অধরা শাড়ি, অধরা বক্ষ মুক্ত। এখন আমার পিছনের জগৎ, আমাকে চকিতভ্রান্ত করছে না, আমার দৃষ্টি সংকুচিত না। তবু জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্বরসত্তিয়া, আমার কাছে, তুমি কি কিছু চাও?’

স্বরসত্তিয়া নিঃশব্দে ঘাড় ঝাঁকালো। ওর উদ্দেশ্য মুক্ত অঙ্গে প্রকৃতির আবেগ। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী?’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘তোমাকে।’

আমি ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললাম, ‘কেমন করে? আমার দিন শেষ হলে, আমি তো চলে যাবো।’

স্বরসত্তিয়া বললো, ‘জানি। তুমি তো কলকাতায় চলে যাবে।’

বললাম, ‘হ্যাঁ।’

স্বরসত্তিয়া আবার বললো, ‘জানি তো। আমি কখনো যাবো না।’

বলে, ও নিচু হয়ে, আমার কোলের ওপর মাথা পেতে দিল। দীর্ঘ ঘাসের মতো ফুলটি আমার গায়ে স্পর্শ করলো। আমি ওর থোলা পিঠে হাত স্পর্শ করলাম। আমার মনে যেমন নানান কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা, তেমন একটা ব্যাধা ধরা কষ্টে, কথা বলতেও পারছি না, কেন না, আমি বুঝতে পারছি, স্বরসত্তিয়াকে, যে যেভাবেই বিচার করুক, ওর সমস্ত আচরণ এবং চিন্তার মধ্যে, কেবল এক প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি কাজ করছে না, মানবীর এক অনিবার্য স্বভাবও সেখানে মূক হয়ে আছে। ও যা করছে, তা কিছুই পূর্বপরিকল্পিত না। যা কিছু ঘটছে, তা অনেকটা কোয়েনার গতির মতো, ভূপ্রকৃতির যেখান দিয়ে সে আপনাকে প্রবাহিত করার পথ পেয়েছে, সেখান দিয়েই নেমে গিয়েছে কল্কল করে। ওর ভিতরের হ্লাদিনী শক্তি কোথায় কেমন করে, কল্লোলিনী হয়ে উঠবে, আমি জানি না।

আমি স্বরসত্তিয়ার মুখ তুলে ধরলাম। না, চোখে জল নেই, যেন আপন মনের জিজ্ঞাসায়, বনবালা হুড়ি, কাতর। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী ভাবছো?’

স্বরসত্তিয়া উচ্চারণ করলো, ‘এনাচি অবেনেবেন উড়কুতন।’

বলেই উঠে বসে, ও আমাকে হুঁহাতে জড়িয়ে ধরলো, বললো, ‘আমি তো এই বন বুকর ঘেয়ে। তুমি এখানে থাকবে না, আমি জানি। আমি কখনো তোমার সঙ্গে যাবো না, তাও জানি। তোমার সঙ্গে মিশলাম, আমাকে সবাই খারাপ বলবে। তুমি কেন মৃগা হলে না?’

বলে ও হাসলো, কিন্তু হাসিটা ঝরঝরানো না। আমি কী জবাব দেব, জানি না। ও আবার বললো, ‘তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে তাহলে আমরা দু’জনে খ্রীষ্টান হয়ে যেতাম। সবাই তাই করে। কিন্তু আমি বন ছেড়ে যাবো না।’

আমি যে চিরদিন বনে থাকতে পারবো না, তা ও নিজেই বলেছে। আমার বলতে হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি একটু আগে মুণ্ডা ভাবায় কী বললে?’

স্বরসতিয়া হেসে বললো, ‘এনাচি অবেনেবেন উড়ক্ততনা। এ বয়সটা গাছে জড়ানো লতার মতো। এমন কোনো কর্মের ভাল আমি পাইনি, যাকে জড়াতে পারি। তুমি অনেক বড় মুণ্ডা।’

বলে স্বরসতিয়া আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, ‘লোরে চান করবে? এসো করি।’

স্বরসতিয়া ওর গা থেকে, খাটো শাড়িটা খুলে, মাটিতে নিক্ষেপ করলো। ডাকলো, ‘এসো।’

আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্বরসতিয়া কাছে এসে বললো, ‘জামা-কাপড় রেখে দাও।’

বলে নিজেই আমাকে পোশাক মুক্ত করলো। হাত ধরে নিয়ে গেল, জলে ডোবা পাথরের ওপর। তারপরে আরো একটু গুভীরে। অন্ধলিভরে জল ভুলে, আমার বুকে কাঁধে ছড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা শীতল, কবেকার সেই দূরকালে বহমান আদিম জলের স্পর্শ আমার গায়ে। মাতৃপূজার ছবি আমার চোখে। শক্তিশ্বরূপিণী মহামায়া তোমার সামনে। আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন পূজার লগ্ন।

পাতার আন্তানার যখন ফিরে এলাম, তখন আমার সঙ্গে স্বরসতিয়া আসেনি। আমাকে থানিকটা এগিয়ে দিয়ে, চলে গিয়েছে, বলেছে, ‘তুমি যাও, আমি পরে আসবো।’

সুদীন তো ঘেন হারানো মানিক ফিরে পেলো। সে আর হোরো আমাকে চারদিকে খুঁজছে। এমনকি, যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানেও গিয়েছিল, স্বপ্ন অর্থ, মোহনবাবুও আমার হারানোর খবর পেয়েছেন। তারপরেই চোখে পড়ে, একটা ঝকঝকে নতুন জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সুদীনের মুখে গুনলাব, সিংজী সাহেব আমাকে নিতে এসেছেন, যেতে হবে ঝলকোবাদ। পার্ভীর ঘরে

গিয়ে দেখলাম সিংজী খাটের ওপর বসে আছেন, তাঁর সামনে অল্প খাটিরান্ন স্বরার বোতল, গেলাসে ঢালা। ডেকে বললো, ‘আম্নন। তুনলাম এক স্নহ্নন কুড়ি আপনাকে তুরু করেছে। তুনে খুব খুশি হয়েছি।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কতক্ষণ এসেছেন?’

সিংজী বললেন, ‘কিছুক্ষণ। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে, আমরা বেরিয়ে পড়বো। স্নহ্নন কুড়ির জন্ত, নিশ্চয়ই আপনার মন কেমন করবে?’

সিংজীর রক্তিম চোখ, তার ঝলক ঠুর করসা মুখেও। ঠুর সমস্ত চেহারার মধ্যেই, একটা শানিত আভিজাত্য। স্নহ্নন কুড়ির অর্থ এখন আমি জানি। নাচের মেয়ে। কিন্তু সেকথা ঠুরে বলার কোনো অর্থ বোধহয় নেই। গভীর অবগাহনের স্নিদ্ধতা আমার সমস্ত অহুভূতি জুড়ে। বললাম, ‘বাবার আগে একবার দেখা করে যাবো।’

বল্লেই, সিংজী অহুমতি নিয়ে, তাড়াতাড়ি স্নহ্নীনের সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলাম। রান্না শেষ, স্নহ্নীন কোয়েনার জলে আন করে উঠে আসছে। কাছে গিয়ে বললাম, ‘স্নহ্নীনবাবু, আপনাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যাচ্ছি, আপনি ওদের খাসিয়া চানা আর ডিয়েং-এর ব্যবস্থা করে দেবেন। ওরা নাচবে, গাইবে।’

স্নহ্নীনের হাসিটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো, বললো, ‘আপনি থাকবেন না, ওরা আপনার টাকার খানাপিনা করে নাচবে? তা কখনোই করবে না।’

আমি অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তা হলে?’

স্নহ্নীন বললো, ‘আবার স্নযোগ স্নবিধা এলে হবে।’

আমি জানি, ‘কারেবেন নামেরারে সিদা সোময়।’ পুরনো দিনগুলো যে আর ফিরবে না। কিন্তু এও জানি, সিংজী আজ আমাকে নিয়ে যাবেনই। স্নহ্নীনও ভালই জানে, কোনো স্নযোগস্নবিধাই আর কখনো আসবে না।

স্নহ্নীন আবার বললো, ‘ওরা এমনিতে বেশ আছে। বেশি দয়াটর্রা দেখাতে গেলে, গোলমাল করে ফেলে।’

আমি আহত বোধ করলাম, বললাম, ‘আমি দয়া দেখাবার জন্ত, টাকাটা দিতে চাইনি। আমি ওদের কথা দিয়েছিলাম।’

স্নহ্নীন তাড়াতাড়ি জিত কেটে বললো, ‘আহা হা, আমি সে কথা তুলিনি, আমাকে তুল বুঝবেন না দাদা। আপনি থাকবেন, দেখবেন, ওদের সঙ্গে আনন্দ করবেন, সেটাই ওদের ইচ্ছা। আপনাকে বাদ দিয়ে, ওরা কিছু করতে চাইবে না।’

সে কথাও অস্বীকার করতে পারি না। তারী মন নিয়ে পাতার ঘরে কিরে আসি। সিংজী সাহেব পকেট থেকে, একটি খাম বন্ধ চিঠি বের করে, এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনার চিঠি।’

এই বনে, আমার চিঠি? খাম খুলে, ছোট কলটানা কাগজে, আগে, চিঠির নিচে নাম দেখলাম, ‘ইতি, প্রণতা, তৃপ্তি ভৌমিক।’

সিংজী বললেন, ‘ছোট নাগরা হয়ে এলাম। আমি এদেলবার আসছি তুনে, এ চিঠিটা দিল।’

আমি পড়লাম, ‘শ্রীচরণেশ্ব, বলেছিলাম, দু’একদিনের মধ্যে এদেলবার গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু আজ সিংজী যাচ্ছেন, আপনাকে নিয়ে থলকোবাদ যাবেন। এখন আপনি আমাদের ধরা হোয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন। সিংজী থাকলে, সেখানে আমরা বেমানান। তবু খোজ নেব, থলকোবাদে কতোদিন থাকবেন। কপালে দর্শন থাকলে, কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যাবে। আমাকে মনে আছে তো?’—

সিংজী বলে উঠলেন, ‘কী ব্যাপার রাইটার সাহেব, আপনার যেন মন খাপাপ হয়ে গেল?’

হেসে বললাম, ‘না, তেমন কিছু না।’

‘জগৎটা আলাদা। মনও তাই। আমরা সব বুঝবো না।’

তথাপি জানি, এই শাপিত অভিজাত ব্যক্তিটির প্রাণে কী গভীর অন্ধকারের যাতনা।

সিংজী সাহেবের সঙ্গে যাবার জন্ত প্রস্তুত। মোহনবাবু নাকি পরে থলকোবাদ গিয়ে দেখা করবেন। কিন্তু স্বয়ংভিয়ারকে না জানিয়ে, না দেখা করে যাবো কেমন করে? স্বয়ীনকে ডেকে সে কথা বললাম। স্বয়ীন একটু হাসলো। হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, ‘আসেন।’

অবাক হয়ে স্বয়ীনের পিছনে পিছনে, ছোট একটি পাতার ঘরের লামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তার ইজিতে, নিচু হয়ে দেখলাম স্বয়ংভিয়া বুমোচ্ছে। গায়ে তার সেই খাটো শাড়িটি জড়ানো। এক হাত মাথার নিচে, আর একটি হাত বুকের ওপর।

স্বয়ীন ঠোটে তর্জনী রেখে, নিচু হয়ে বললো, ‘ডাকার ঘরকার নেই, বুঝাক।’

স্বপ্নানের চোখের দিকে তাকিয়ে, বুকের কাছটা কেমন থচ্ করে উঠলো।
 আমি মুখ নাড়িয়ে, জীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। স্বপ্নলভিরা ঘুমোক। ঘুম
 ভাঙিয়ে বিদায় নেবার থেকে, নিঃশব্দ বিদায় ভাল। কারণ, আগ্রভ, চান্দ্র
 বিদায়, অনেক সময়, বিদায়ের স্বরূপকে চিনতে দেয় না।

বিদায় স্বপ্নলভিরা! আমার প্রণাম তোমার কালো শীতল ছুটি পায়ে।